# আর্য্যদর্শন।

সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র,
জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি-বিষয়ক

## মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১২৮২।

৬৬

কলিকাতা।

১১ নং পটুয়াটোলা লেন, নূতন ভারতযন্ত্রে,
শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩৷৹ টাকা।

ডাক মাশুল সমেত ৪৲ টাকা।

# সূচী পত্র।

# আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় খণ্ড। বৈশাখ ১২৮২ সাল। ১ম সংখ্যা।


## বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

মনু যে আট প্রকার বিবাহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ ভিন্ন আর কোন বিবাহেরই মূলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ নাই। হৃদয় ও মনের অদ্বৈত ভাবেই অনুরাগ জন্মে। যে বিবাহের মূলে বর ও কন্যার হৃদয় ও মনের অদ্বৈত ভাব ও তজ্জনিত অনুরাগ নাই, তাহা উৎকৃষ্ট বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের মূলে এই অদ্বৈতভাব আছে বলিয়া এই দুই বিবাহকে আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া গণনা করিলাম। এবং অন্য ছয় প্রকার বিবাহের মূলে এই অদ্বৈতভাবের অভাব আছে বলিয়া সে সকলকে আমরা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এক জন বর বিদ্যা-সদাচার-সম্পন্ন হইলেও যদি তিনি বিবাহার্থী না হন, যদি তিনি কন্যার প্রতি অনুরাগী না হন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই ভীত হইবেন সন্দেহ নাই। বিদ্যা-সদাচার-সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যা সম্প্রদান করার নামই ব্রাহ্ম বিবাহ। এই ব্রাহ্ম বিবাহ অধুনা বিস্তীর্ণরূপে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত থাকায় আজকাল যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, তাহা কাহার অবিদিত? কন্যা অষ্টমবর্ষীয়া হইলেই জনক জননী তাহার বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া বস্ত্রালঙ্কার ধনাদির প্রলোভন দ্বারা কোন সুশিক্ষিত পাত্রকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করেন। কন্যা—অষ্টমবর্ষীয়া, সুতরাং সে বিবাহ কাহাকে বলে, স্বামী কাহাকে বলে, আর পরিণামেই বা কি হইবে, কিছুই অবগত নহে। সুশিক্ষিত যুবক ভাবিলেন বয়ো-বিদ্যাগুণে তাঁহার অনুরূপ ভার্য্যাত দুর্ল্লভই, তবে যাহা কিছু অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারা যায় তাহাই লাভ। কিন্তু এরূপ

বিবাহের বিষময় ফল অচিরাৎ ফলিতে আরম্ভ হয়। অর্থ বা অন্য কোন দ্রব্যের প্রলোভন শীঘ্রই তিরোহিত হয়। স্বামী ও স্ত্রী ক্রমেই দাম্পত্য প্রেমের অভিলাষী হইয়া উঠেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেক সময়েই তাঁহারা ইহাতে বঞ্চিত হন। যাঁহাদিগের অমানুষ ধৈর্য্য আছে, তাঁহারা এইরূপে হতাশাপ্রপীড়িত হইয়াও চিরজীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে পারেন। কিন্তু জীবন তাঁহাদিগের নিকট জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কোন কার্য্যেই তাঁহাদিগের উৎসাহ থাকে না। এইরূপ মানসিক অবস্থার আবার ইন্দ্রিয়সংসর্গ যে কিরূপ ক্লেশদ ও প্রীতিপ্রদ, তাহা যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহারাই জানেন। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে অনেক পরিণতবয়স্ক পুরুষ পরিণীতা দশমবর্ষীয়া বালিকার কৌমারব্রত ভঙ্গ করিতেও সঙ্কুচিত নন। বালিকা নবোঢ়া ও ভয়ে বিহ্বলা; সুতরাং স্বামীর অপবিত্র আলিঙ্গন নিবারণে অসমর্থা। কি ভয়ানক! বলাৎকার আর কাহাকে বলে? কিন্তু এই প্রভেদ যে এ বলাৎকার আইনে দণ্ডার্হ নহে।

দাম্পত্যপ্রেমে হতাশ দম্পতীর যদি ধৈর্য্য বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে সংসার যে কি ভয়ঙ্কর স্থান হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। স্বামীর স্ত্রীতে ও স্ত্রীর স্বামীতে যদি প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ না হয়, তাহা হইলে সেই বৃত্তি অন্য স্ত্রীতে বা অন্য পুরুষে চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ বলবতী হইয়া থাকে। যদি বিয়োজনপ্রথা (System of divorce) প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্ত্রী বা অন্য পুরুষকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারেন। তাহা হইলে কোনও বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যে বিয়োজনপ্রথার প্রার্থী, তাহা ইংলণ্ড বা অন্যান্য ইউরোপীয় সভ্য সমাজের বিয়োজন প্রথার অনুকারিণী হয় ইহা আমাদের অভিলাষ নয়। স্বামী বা স্ত্রী বিচারালয়ে আসিয়া আপনাদের পরস্পরকে বা অন্যতরকে ব্যভিচারিণী বা ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা করে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় বা লজ্জাকর বিষয় জগতে আর কি হইতে পারে জানি না। এরূপ প্রথা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা আমরা কখন ইচ্ছা করি না। স্বামী ও স্ত্রীর একত্র অবস্থিতি অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিলেই তাহাদিগকে পরস্পর বিয়োজিত করা উচিত। এরূপ অবস্থায় বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সংযোজিত রাখিবার চেষ্টায় যে কত গরলময় ফল উৎপন্ন হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দম্পতী সহিষ্ণু হইলে কোন বাহ্য অনিষ্ট সংঘটিত হয় না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মন সতত বিষণ্ণ ও স্ফূর্ত্তিবিহীন হওয়ায় তাঁহারা উৎকৃষ্ট সন্তান জনন বা জগতের আর কোন হিত সাধন করিতে পারেন না। ক্রমেই তাঁহারা মনুষ্যবিদ্বেষী হইয়া

উঠেন। যাহাহউক এরূপ লোক জগতের পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইলেও তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজস্থিতির বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে না। কিন্তু এরূপ ধৈর্য্য জগতে অতি বিরল! প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ স্থলে দম্পতীর উভয়ের বা অন্যতরের ধৈর্য্য-চ্যুতি হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির ধৈর্য্য-চ্যুতি হইলেও তাঁহারা অনেক সময় কলহ বিবাহাদি দ্বারাই ক্রোধ শান্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষ জাতির স্বাধীনতা আছে, সুতরাং তাঁহাদিগের ধৈর্য্য চ্যুতি হইলে তাঁহারা অনেক সময় নির্ভয়ে নায়িকান্তর অবলম্বন করিয়া অতৃপ্ত প্রণয়-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্ত্রীজাতির অতৃপ্ত প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার স্পৃহা বলবতী হইলেও তাঁহারা পুরুষ জাতির ন্যায় নির্ভয়ে ইহা চরিতার্থ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে নানা প্রকার গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু পুরুষ জাতির ন্যায় তাঁহারা সহজে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। পুরুষ জাতি প্রায় গৃহের বাহিরেই স্বাভিলাষ পূর্ণ করেন, সুতরাং স্বীকার না করিলে প্রায় ধরা পড়েন না। কিন্তু স্ত্রীজাতির অবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে প্রায় গৃহের অভ্যন্তরেই মনোরথ পূর্ণ করিতে হয়। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ করিলে তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত হইয়া অবশেষে অগত্যা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। যত দিন গর্ভ সঞ্চার না হয়, ততদিন তাঁহারা গৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া কথঞ্চিৎ মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু গর্ভসঞ্চার প্রণয়-সম্মিলনের অনিবার্য্য ফল। গর্ভ সঞ্চার হইলে প্রসূতির দুইটী বই পথ থাকে না (১) গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গর্ভ রক্ষা (২) অথবা স্বহস্তে কুক্ষিস্থ সন্তানের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক গৃহে অবস্থিতি। অসহায়া রমণী গৃহ পরিত্যাগ করিতে সাহসিনী না হইয়া অনেক সময় অগত্যা প্রিয়তম সন্তানের প্রাণ সংহার করেন। কোন কোন সময় সদ্য সন্তানের প্রাণ বিনাশে অসমর্থা হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। যাঁহারা সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ করেন, সমাজ তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহণ করেন না। সুতরাং বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ভিন্ন তাঁহাদিগের আর উপায়ান্তর থাকে না। হতভাগিনী রমণীর প্রণয়-নাটকের শেষ অঙ্ক এইরূপে প্রায়ই নরহত্যা বা বেশ্যাবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়। এই সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাতের জন্য কে দায়ী? আমরা বলি প্রধানতঃ সমাজ, দ্বিতীয়তঃ সমাজের অনুবর্ত্তন দ্বারা রাজবিধি। যদি সমাজ ও রাজবিধি নর নারীর বিবাহের অন্তর্ব্বর্ত্তি না হইতেন, যদি তাঁহাদিগকে বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন, যদি মনোনীত করণে আত্মকৃত ভ্রম প্রমাদ নিরাকরণ জন্য অনিয়ন্ত্রিত বিয়োজন প্রথার প্রবর্ত্তন করিতেন; তাহা হইলে নরনারীর গোপনে প্রণয়ের অনুসরণ করার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। সুতরাং জগতে ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা,

বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি কিছুই থাকিতনা। অনেকে বলিবেন ইউরোপেত বিবাহে স্বাধীনতা ও বিয়োজন প্রথা প্রচলিত আছে, তবে সেখানে ভ্রূণহত্যা, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি কেন বিদ্যমান রহিয়াছে। তদুত্তরে আমরা এই বলিব যে সেখানেও রীতিমত বিবাহে স্বাধীনতা এবং বিয়োজন প্রথা প্রচলিত নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যতদিন সমাজে বিবাহে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অবিশৃঙ্খলিত বিয়োজন প্রথা প্রচলিত না হইবে, ততদিন ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি সামাজিক দুর্ঘটনা সকল কথনই নিবারিত হইবে না।

মনু যে কয়প্রকার বিবাহের লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাজাপত্য বিবাহের লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে এ বিবাহে কন্যা ও বর পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়া পরস্পরকে মনোনীত করেন। পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ তাঁহাদিগের বিবাহের অনুমোদন করেন মাত্র। ব্রাহ্মবিবাহে বর ব্রহ্মবিদ্যা ও সদাচারাদি সম্পন্ন এবং অপ্রার্থক হইবেন। সুতরাং সে বিবাহের মুখ্যঅংশ বরের গুণ—কন্যার প্রতি বরের অনুরাগ বা বরের প্রতি কন্যার অনুরাগ তাহার গৌণ অংশ মাত্র। কিন্তু প্রাজাপত্য বিবাহে বরের ব্রহ্মবিদ্যাতে প্রবেশ থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে; কিন্তু বরের প্রার্থক হওয়া চাই। এই প্রাজাপত্য বিবাহে অনুরাগ এবং পিতা মাতা বা অভিভাবকগণের অনুমোদন এ দুইই আছে বলিয়া মনু এই বিবাহকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি আর এক স্থলেও লিখিয়াছেন যে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই পাঁচ প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই তিন প্রকার বিবাহ সকল বর্ণেরই ধর্ম্ম্য (১)। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আমরাও মনুর অনুগমন করিলাম। কিন্তু রাক্ষস বিবাহ বলাৎকারমূলক বলিয়া মনুর সহিত আমরা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিতে পারিলাম না। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের মূলে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ব্যবস্থাপিত আছে বটে; কিন্তু মনু— অষ্টম ও দ্বাদশবর্ষ রূপ কন্যার বিবাহের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন (২) সে সময়ে কন্যার অন্তরে অনুরাগের উদ্ভূতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে এবং চতুর্ব্বিংশতিবর্ষবয়স্ক ব্যক্তি অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে—মনুর এই বিধি প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের উপযোগী হইতে পারে না। এই উভয় প্রকার

(১) পঞ্চানান্তু ত্রয়োধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্মৌ স্মৃতাবিহ। ৩।২৫

(২) ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥৯।৯৪

বিবাহেই বর ও কন্যার যুবা ও যুবতী হওয়া আবশ্যক। নতুবা—বরও কন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রায় একই রূপ। উভয়েতেই বর ও কন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ থাকা প্রথম প্রয়োজনীয়। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে প্রাজাপত্য বিবাহ পিতা মাতা বা অভিভাবগণের অনুমোদন-সাপেক্ষ এবং গান্ধর্ব্ব্যবিবাহ পিতা মাতা বা অভিভাবকগণের অনুমোদন-নিরপেক্ষ। এই বিবাহদ্বয়ের পুনঃ প্রবর্ত্তনা অতীব প্রয়োজনীয়।

মনু প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ববিবাহকে বিধিবদ্ধ করিয়া বিবাহে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি মনোনীত করণে ভ্রম প্রমাদাদি নিরাকরণ জন্য অবিশৃঙ্খলিত বিয়োজন প্রথার প্রবর্ত্তন করেন নাই। বিবাহ তাঁহার মতে চিরস্থায়ী। একবার প্রজাপতি কর্ত্তৃক পতি ও পত্নী সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে, বিক্রয় ও ত্যাগেও সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে (১)। তাঁহার বিধানানুসারে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, বা দশবর্ষ পর্য্যন্ত মৃতপ্রজা হইলে, বা একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীজননী হইলে, অথবা অপ্রিয়বাদিনী হইলে স্বামী তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন বটে (২) কিন্তু স্বামী সদাচার-বিহীন, অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত, বা বিদ্যাদি-গুণবিহীন হইলেও স্ত্রীর তাঁহাকে সতত দেবতার ন্যায় সেবা করিতেই হইবে (৩)। স্ত্রীর কিছুতেই নিস্তার নাই, পতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন বা ভার্য্যান্তর গ্রহণ করুন্, স্ত্রীকে আজীবন তদনুধ্যান করিতেই হইবে। ইহাতেও স্ত্রীর যন্ত্রণার অবসান হইবে না। পতি প্রেত হইলেও স্ত্রী পুষ্পমূল ফলাদি দ্বারা বরং দেহের ক্ষপণ করিবেন, তথাপি পরপুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না (৪)। মনু যদি কম্‌টের ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির পক্ষে আজীবন এক বিবাহ ব্রত প্রতিপালনের ব্যবস্থা দিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে পারিতাম না। কিন্তু তিনি যখন স্বামীর হস্তে অপ্রিয়বাদিত্ব-রূপ সামান্য অপরাধেও এক ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যান্তর গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তখন ভার্য্যাকে স্বামী বিষয়ে আজীবন

(১) ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্‌প্রজাপতি-নির্ম্মিতম্ ॥৯।৪৬

(২) বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥৯।৮১

(৩) বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ ॥৫।১৫৪

কঠোর ব্রত প্রতিপালনের আদেশ করা তাঁহার মত উচ্চাশয় ব্যক্তির অনুচিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারদিগের এরূপ স্বজাতি-পক্ষপাতিতা অতীব দোষার্হ সন্দেহ নাই।

পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা নারী পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া, উহা দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব নামক পুত্র হয় এবং সেই নারী পুনর্ভূ নামে আখ্যাত হন (১)—এই বচন দ্বারা মনু পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীর বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন বটে; কিন্তু বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে তাহা কন্যা অর্থাৎ অক্ষতযোনি স্ত্রীর বিষয়েই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অকন্যা-দিগের বিষয়ে নহে, যাহার কন্যাত্ব নষ্ট হয়, তাহার ধর্ম্ম্য বিবাহের অধিকার লোপ হইয়া যায় (২) এবং—বিবাহ-বিধায়ক শাস্ত্রে এমন উক্তি নাই যে, বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হয় (৩) ইত্যাদি বচন দ্বারা তিনি আবার বিধবা প্রভৃতির বিবাহের প্রতিষেধ করিয়াছেন। এরূপ সংশয় স্থলে কোন্ পক্ষ তাঁহার অভিমত তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। কিন্তু নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসরণ করিলে প্রতীতি হয় যে বিধবা বা পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা নারী পত্যন্তর গ্রহণ করেন ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা নয়, তবে তাঁহারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন অগত্যা এরূপ অনুমোদন করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার অনুমোদনের উদ্দেশ্য এই যে তাঁহাদিগের বিবাহ—তাঁহার সম্পূর্ণ অভিমত না হই-লেও তদানীন্তন প্রচলিত আচার ব্যব-হার বা শাস্ত্রের বিরোধী হইবে না। এইরূপে তাঁহার পরস্পর-বিসম্বাদি মত-দ্বয়ের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায়। যে মনু—দ্বিজাতিদিগের প্রথমে সবর্ণা বিবাহই বিধেয়; যাহারা কাম-প্রবৃত্ত হইয়া বহু বিবাহ করিতে চায়, তাহারা অনুলোম ক্রমে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিবে (৪) এই বচন দ্বারা এক স্ত্রী সত্ত্বেও পুরুষের বহুবিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন; যে মনু স্ত্রী মদ্যপানে আসক্তা, কদাচারা, ভর্ত্তার প্রতিকূলাচরণ-শীলা, কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্তা,

---

(১) যাপত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥৯।১৭৫

(২) পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ ॥৮।২২৬

(৩) ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥৯।৬৫

(৪) সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দার-কর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো-বরাঃ ॥৩।১২

হিংস্রস্বভাবা, অর্থনাশকারিণী (১) বা অপ্রিয়বাদিনী (২) হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করার ভার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; সেই মনুই স্ত্রী স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা হইলেও তাঁহার পক্ষে আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধন্য রে পুরুষজাতি! ধন্য তোমার স্বার্থপরতা! স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার নিষ্ঠুরতা এতদূর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, যে যাঁহারা তোমার ভূষণ স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত তাঁহারাও এই পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

এক্ষণে আমরা এই মাত্র বলিয়া বিবাহ বিষয়ে মনুর মতের সমালোচনার উপসংহার করিলাম। সম্প্রতি পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যে ঔদার্য্যগুণে মনু—বিপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দিগকে হত ও আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ করতঃ রোরুদ্যমানা ক্রোশন্তী রমণীর বলপূর্ব্বক কৌমার ব্রত ভঙ্গ করাকেও বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া এবং নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা স্ত্রীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করাকেও বিবাহ নামে আখ্যাত করিয়া, বলাৎকৃতা হতভাগিনী রমণীর ও তদ্‌গর্ভজাত নিরপরাধ সন্তানের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন; এবং যে ঔদার্য্যগুণে মনু—কন্যা এবং বরের পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়া নির্জ্জনে সংসর্গপূর্ব্বক পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়াকে উৎকৃষ্ট বিবাহ মধ্যে পরিগণিত করিয়া ভারতের রত্নস্বরূপ শকুন্তলা, সীতা ও ভরত প্রভৃতিকে "ব্যভিচারজাত" এই অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন; সেই ঔদার্য্যগুণেই মনু—ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত ও পারশব—ঔরস ভিন্ন এই একাদশ প্রকার পুত্রকে বিধিবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বীরবর ভীমসেন, মহারথী কর্ণ ও অর্জ্জুন, মহামতি নকুল ও সহদেব, মহারাজ পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র এবং ধার্ম্মিকপ্রবর বিদুর প্রভৃতিকে সমাজের উচ্চ সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। মানুষের যত প্রকার সন্তান হওয়া সম্ভব, মনু তৎসমস্তকেই বিধিবদ্ধ করিয়া প্রগাঢ় বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চৈতন্য ও মহম্মদ ভিন্ন জগতের আর কোন ব্যবস্থাপক অদ্যাবধি মনুর এই গভীর মর্ম্মের উদ্ভেদ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রকৃতির স্রোত বলপূর্ব্বক রোধ করিতে গিয়া অনেক সময় সমাজে ভীষণ তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া থাকেন। মনু—প্রকৃতির স্রোত রোধ না করিয়া ইহার অনুসরণ করিয়া

(১) মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥৯।৮০

(২) বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥৯।৮১

গিয়াছেন মাত্র। আমরা দ্বাদশ প্রকার পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক মনুর মতের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি।

স্বামী—স্বকীয়া পরিণীতা ভার্য্যাতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করেন, তাহাকে ঔরস পুত্র বলে। এই পুত্র মুখ্য পুত্র বলিয়া গৃহীত। (১)

অপুত্র মৃত নপুংসক বা ব্যাধিত ব্যক্তির ভার্য্যা, নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, সপিণ্ড-ব্যক্তির দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষেত্রীর ক্ষেত্রজ পুত্র বলে। (২) পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা সকলেই ক্ষেত্রজ পুত্র।

স্বজাতীয় কোন ব্যক্তির অপুত্রত্বরূপ আপৎকালে জনক জননী প্রীতিপূর্ব্বক যে পুত্রকে দান করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার দত্তক পুত্ররূপে পরিগণিত হয়। (৩)

যদি কেহ—গুণ দোষ-বিচক্ষণ পুত্রোচিতগুণোপেত স্বজাতীয় কোন ব্যক্তিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার কৃত্রিমপুত্ররূপে খ্যাত হয়। (৪)

আপনার পরিণীতা ভার্য্যাতে অজ্ঞাত পুরুষ কর্ত্তৃক জনিত পুত্র, ভর্ত্তার গূঢ়োৎপন্ন পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়। (৫)

জনক জননী উভয়েই যে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা জননীর মরণানন্তর জনক, বা জনকের মরণানন্তর জননী, একাকী যে পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই পুত্রকে যিনি গ্রহণ করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার অপবিদ্ধ নামক পুত্র হয়। (৬)

পিতৃগৃহে থাকিয়া অবিবাহিতা কন্যা নির্জ্জনে যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ কন্যাকে যে বিবাহ করে, সেই পুত্র

---

(১) স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধিযম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥৯।১৬৬

(২) যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্যবা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ ॥৯।১৬৭

মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ স্মৃতঃ ॥৯।১৬৮

(৪) সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্‌যং গুণদোষবিচক্ষণম্।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ ॥৯।১৬৯

(৫) উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ।
স গৃহে গূঢ়-উৎপন্নস্তস্য স্যাদ্ যস্য তল্পজঃ ॥৯।১৭০

(৬) মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যং পুত্রং পরিগৃহ্লীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে ॥৮।৭১

তাহার কানীন নামক পুত্র হয় (৭) এই নিয়মানুসারে অঙ্গরাজ কর্ণ পাণ্ডুর কানীন পুত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

জ্ঞাতগর্ভা বা অজ্ঞাতগর্ভা কন্যাকে যে বিবাহ করে, সেই গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র পরিণেতার সহোঢ় নামক পুত্র হয়। (৮)

মাতা পিতার নিকট হইতে অপত্যার্থ মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে ক্রয় করা যায়, সেই পুত্রকে ক্রেতার ক্রীত পুত্র বলা যায়। (৯)

পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা স্ত্রী পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্যের ভার্য্যা হইয়া উহা দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করেন, ঐ পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব নামক পুত্র হয়। (১০)

মাতৃ-পিতৃ-বিহীন, অথবা অকারণে মাতা পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র যদি স্বয়ং আপনাকে দান করে, তাহা হইলে সেই পুত্র গ্রহীতার স্বয়ংদত্ত পুত্র হয়। (১১)

যে ব্রাহ্মণ কামাতুর হইয়া শূদ্রাতে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের অনধিকারী প্রযুক্ত মৃততুল্য, এই জন্য এই পুত্র ঐ ব্রাহ্মণের পারশব পুত্র নামে আখ্যাত। (১২)

এইরূপে মনু যে দ্বাদশপ্রকার পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা প্রাকৃতিক ও গৃহীত এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিলাম। যে সকল পুত্রের সহিত স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বা অন্যতরের রক্ত-সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে আমরা এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিলাম। (১) ঔরস (২) পৌনর্ভব (৩) পারশব (৪) ক্ষেত্রজ (৫) কানীন (৬) সহোঢ় এবং (৭) গূঢ়োৎপন্ন এই সপ্তবিধ পুত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তন্মধ্যে ঔরস পৌনর্ভব ও পারশব এই ত্রিবিধ পুত্রের সহিত স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই রক্তসম্বন্ধ এবং অবশিষ্ট

---

(৭) পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্॥ ৯।১৭২

(৮) যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাঽজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে॥৯।১৭৩

(৯) ক্রীণীয়াদ্ যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রোর্যমন্তিকাৎ।
স ক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোঽপি বা॥৯।১৭৪

(১০) যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥৯।১৭৫

(১১) মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ।
আত্মানং স্পর্শয়েদ্ যস্মৈ স্বয়ন্দত্তস্তু সস্মৃতঃ॥৯।১৭

(১২) যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়ন্নেব শব স্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥৯।১৭৮

চতুর্ব্বিধ পুত্রের সহিত শুদ্ধ স্ত্রীর রক্তসম্বন্ধ আছে। (৮) দত্রিম (৯) কৃত্রিম (১০) অপবিদ্ধ (১১) ক্রীতক এবং (১২) স্বয়ন্দত্ত এই পঞ্চবিধ পুত্র গৃহীত বিভাগের অন্তর্গত। এই পঞ্চবিধ পুত্রের সহিত গ্রহীতা বা গ্রহীতৃপত্নীর রক্তসম্বন্ধ থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ পুত্রত্ববিষয়ে মনুর উদার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দায়ভাগপ্রণেতা জীমূতবাহনের সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জীমূতবাহন পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশপ্রকার পুত্রের মধ্যে শুদ্ধ ঔরস ও দত্তক পুত্রকে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আর দশপ্রকার পুত্রকে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সমাজ ও বিধির বহির্ভূত করিয়াছেন। মনুকে এরূপ অবমাননা করিয়া জীমূতবাহন হিন্দুসমাজের উপকার বা অপকার করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। উপকার বা অপকারের নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে হইবে বর্ত্তমান সময়ে অবশিষ্ট দশপ্রকার বা তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার পুত্রের অস্তিত্ব সম্ভবপর কি না। যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সমাজ ও বিধির বহির্ভূত করা অতি সঙ্কীর্ণমনা ও নৃশংসের কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। জীমূতবাহন যে শ্রেণীর পুত্রকে বিধিবহির্ভূত করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে সেই শ্রেণী হইতেই পুরাকালে অসংখ্য হিন্দুকুলতিলক উৎপন্ন হইয়াছেন। যে ব্যাস ও পাণ্ডুপুত্রগণ না জন্মিলে মহাভারতের সৃষ্টি হইত না, যে সতীত্বভূষণা সীতা জন্মগ্রহণ না করিলে রামায়ণের সৃষ্টি হইত না, কোন্ পাষাণহৃদয় ব্যক্তি তাদৃশ পুরুষরত্ন ও রমণীরত্নদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহেন আমরা জানিতে চাই। ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিলে হিন্দু পুরাবৃত্তে ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হয়, হিন্দুসাহিত্যসিন্ধু শুকাইয়া যায়, হিন্দুহৃদয়ের প্রীতিস্রোত সংরুদ্ধ হয়। এক সীতার সতীত্ববলে ভারতললনা অদ্যাপি জগতের রমণীকুলের শিরোমণি হইয়া রহিয়াছেন, এক ব্যাসের রচনাবলে ভারতসাহিত্য জগতের সাহিত্যসমাজে অদ্যাপি উচ্চ সিংহাসন অধিকার করিতেছে, এক যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবল দুর্ব্বল ভারতবাসীদিগের অন্তরে অদ্যাপি ধর্ম্মবল প্রদান করিতেছে, এক ভীমের গদা ও এক অর্জ্জুনের গাণ্ডীব এখনও নির্ব্বীর্য্য আর্য্যসন্তানদিগকে ভাবী স্বাধীনতার আশা দিতেছে। যে আর্য্য নামে আমরা এত গর্ব্বিত, যে আর্য্যনাম শুনিবামাত্র আমরা উন্মত্ত হইয়া উঠি, সেই আর্য্যনামের এত গৌরব ইহঁদিগেরই জন্য। আমরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করি, সেখানেও দেখি এই শ্রেণীর পুত্রের গৌরবে ইউরোপের মুখ উজ্জ্বল। যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ও খৃষ্টীয় বীর্য্যের জয়ধ্বনি এক্ষণে জগতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যে খৃষ্টীয় বীর্য্যের নিকট অকূল সাগর ও গগনস্পর্শী পর্ব্বতও আর দুর্ল্লঙ্ঘ্য নাই, সেই খৃষ্টীয়ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় বীর্য্যের প্র-

গোদক—ক্রাইষ্ট—মেরীর গর্ভজাত কানীন পুত্র। যে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন লাপ্‌লাস জন্ম পরিগ্রহ করায় বিজ্ঞানভূমি ফ্রান্স নিউটনজননী ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে পারিয়াছিলেন, সেই লাপ্‌লাসও এই শ্রেণীর পুত্র। কিন্তু লজ্জার কথা সুসভ্য ইউরোপও অদ্যাপি এরূপ সন্তানদিগকে বিধিবদ্ধ করণে মনুর ন্যায় ঔদার্য্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মনুর মত রহিত হওয়ায় মনুষ্যপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। মনুষ্যপ্রকৃতি সেই একভাবেই রহিয়াছে। প্রকৃতির কার্য্য সমাজ ও রাজবিধি দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রকৃতির স্রোত রোধ করিতে গিয়া পাপের স্রোত পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন মাত্র।

পুরাকালে স্বামী মৃত, নপুংসক অথবা শক্তিবিহীন হইলে স্ত্রী নিয়োগধর্ম্মানুসারে গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, সপিণ্ড ব্যক্তিদ্বারা পুত্র উৎপাদন করিতেন, এবং সেই পুত্র স্বামীর ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে গৃহীত হইত। এক্ষণে নিয়োগধর্ম্ম প্রচলিত নাই, তথাপি অনেক স্থলে স্বামী মৃত, নপুংসক অথবা শক্তিবিহীন হইলে স্ত্রী প্রকৃতি-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সপিণ্ড বা অসপিণ্ড ব্যক্তি দ্বারা গর্ভ উৎপাদন করেন, কিন্তু সমাজভয়ে সেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরাকালে অনুপস্থিতি কালে অন্যপুরুষ কর্ত্তৃক আপনার ভার্য্যাতে গূঢ়ভাবে পুত্র উৎপাদিত হইলে, স্বামী সেই অপরাধে ভার্য্যার প্রাণসংহার না করিয়া সেই পুত্রটীকে আপনার গূঢ়উৎপন্ন পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে অনুপস্থিতি কালে অন্যপুরুষ কর্ত্তৃক আপনার ভার্য্যাতে গূঢ়ভাবে পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে জানিতে পারিলে স্বামী স্ত্রীর প্রাণসংহার করিবেন এই ভয়ে স্ত্রী সেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরাকালে কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া অপ্রকাশে সন্তান উৎপাদন করিলে, ঐ কন্যাকে যিনি বিবাহ করিতেন সেই ব্যক্তিই ঐ সন্তানটীকে আপনার কানীন পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে কন্যা কন্যাবস্থায় পিতৃগৃহে থাকিয়া গর্ভবতী হইলে, তাহার আর বিবাহের আশা থাকে না, এই জন্য জনক জননী লোকলজ্জাভয়ে কন্যার সেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরাকালে জ্ঞাতগর্ভা বা অজ্ঞাতগর্ভা কন্যাকে যিনি বিবাহ করিতেন, ঐ গর্ভজাত পুত্র সেই পরিণেতার সহোঢ় পুত্ররূপে জনসমাজে পরিগৃহীত হইত। এক্ষণে জ্ঞাতগর্ভা কন্যার বিবাহই অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাকে বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভ নষ্ট করিতেই হইবে, নতুবা তাঁহার বিবাহ হইবেই না। অজ্ঞাতগর্ভা কন্যার গর্ভ যদি দুই এক মাসের হয় তবেই তাঁহার রক্ষা, নতুবা, স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষাৎ ভার্য্যান্তর অবলম্বন করিবেন, এবং তাঁহাকে অগত্যা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ ঘটনা কুলীনদিগের মধ্যে বিরল নহে। পুরাকালে স্ত্রী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা

হইলে আবার অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়া উহাঁ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করিতেন, সেই পুত্র পরিণেতার পৌনর্ভব পুত্র নামে সমাজে গৃহীত হইত। এক্ষণে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে তাঁহার আর বিবাহের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং সে অবস্থায় তাঁহার গর্ব্ভ হইলে সে গর্ব্ভ নষ্ট না করিলে তাঁহার আর সমাজে থাকার আশা নাই। আহ্লাদের বিষয় এই যে এক্ষণে বিধবার বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে এবং পরিণীতা বিধবার পুত্র ঔরস পুত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু অবিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভ সঞ্চার হইলে সেই গর্ব্ভস্থ সন্ততির রক্ষার কোন উপায় নিরূপিত হয় নাই। এই সকল কারণে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রতিদিন ভীষণ ভ্রূণ-হত্যার পাপে দূষিত ও কলঙ্কিত হইতেছে। প্রায় প্রতিগৃহ এই পাপের স্রোতে প্লাবিত হইতেছে। আমরা কন্যাকে মনোমত পাত্রে ন্যস্ত করিব না, অথচ স্বামিসহবাসে অসুখিনী কন্যার অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক গর্ভ সঞ্চার হইলে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিব এবং যে কোন উপায়ে সেই নিরপরাধ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণসংহার করিব। আমরা বিধবার বিবাহ দিব না, অথচ সেই বিধবার গর্ভ হইলে তাহা রক্ষা করিব না। আমরা পুত্র কন্যাদিগকে প্রকৃত প্রেমের অনুসরণে বিবাহ দিব না, অথচ তাহারা স্বয়ং প্রকৃত প্রেমের অনুসরণ করিলে তাহাদিগকে আমরা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলিয়া অধঃকৃত করিব। হয়ত অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে যাহাকে আমরা ব্যভিচার বলি, তাহাই প্রকৃত বিবাহ; এবং যাহাকে আমরা পবিত্র বিবাহ বলি, তাহাই প্রকৃত ব্যভিচার। যতদিন বিবাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত না হইবে, তত দিন এই ব্যভিচার কখনই সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে না। বিবাহ বিষয়ে সমাজের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার নামই ব্যভিচার। যতদিন সমাজ বিবাহ বিষয়ে অন্যায় নিয়ম সংস্থাপন করিবেন, তত-দিন নর নারী সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেই করিবে কেহই রক্ষা করিতে পারিবেন না। কোন কালে কোন দেশে বিবাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত হয় নাই, সুতরাং কোন কালে কোন দেশে ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় নাই। কোন কালে কোন দেশে বিবাহ প্রথা যে সম্পূর্ণ রূপে বিশোধিত হইবে তাহার আশা দেখা যায় না, সুতরাং কোন কালে কোন দেশে ব্যভিচার যে সম্পূর্ণ-রূপে নিবারিত হইবে তাহারও আশা দেখা যায় না। এই জন্যই মনুর ন্যায় উদারচেতা সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যভি-চারোৎপন্ন নিরপরাধ সন্ততিগণকে বিধি ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে "ব্যভিচারজাত" এই অপবাদ হইতে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনু জানিতেন যে ইহাদিগকে সমাজের বহির্ভূত করিলে ইহারা মনুষ্যবিদ্বেষী হইয়া উঠিবে, সুতরাং ইহাদিগ দ্বারা জগতের অনিষ্ট

বই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু ইহাদিগকে সমাজের ক্রোড়ে গ্রহণ করিলে ইহারা জগতের অশেষ হিতসাধন করিবে। এই জন্যই তাঁহার এত প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা।

প্রতি গৃহে যাহা চলিতেছে, যাহা নিবারণ করিতে কেহই সক্ষম নহেন, সেই মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা লুকাইতে গিয়া আমরা গুরুতর ভ্রূণহত্যা পাপে নিমগ্ন হই। নরহত্যা মাত্রই গুরুতর পাতক সন্দেহ নাই, কিন্তু নিরপরাধ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণসংহাররূপ নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ জগতে আর নাই। মনু অতি সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন, সুতরাং এই সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাত নিবারণের জন্যই তিনি নানা প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। আধুনিক স্মার্ত্তেরা তাঁহার এই গভীর বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া, তাঁহার অতি শুভকর নিয়ম সকল উঠাইয়া দিয়া হিন্দুসমাজের শত্রুর কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সমাজসংস্কারক ও ব্যবস্থাপকেরা মনু প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের গভীর বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা।

আমরা উপসংহার কালে এই প্রস্তাব-রচয়িতা বাবু ঈশানচন্দ্র বসু মহোদয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও তিনি মনুকে যে ভাবে লোকের নিকট অবতারিত করিয়াছেন, মনু অনেক স্থলে সে ভাবের লোক ছিলেন না, যদিও অনেক স্থলে আমরা তাঁহার সহিত মতে মিলিতে পারি না, তথাপি এরূপ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া তিনি যে আমাদিগকে বিশেষ প্রীত করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি তিনি এইরূপ প্রস্তাব লিখিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগের চিন্তাশক্তিকে আকৃষ্ট করিবেন।

---

# ভারতের একতা।

আমরা "পল্লীসমাজ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, এই সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমিতে কখন রাজনীতি ও রাজতন্ত্র বিষয়ক একতা ছিল এমন বোধ হয় না; কিন্তু ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের শাসন নিবন্ধন আর এক প্রকার একতা বহুকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন প্রাচীন গ্রীসদেশ বহুরাজ্যবিভক্ত হইলেও তথায় আম্ফিক-তিয়নিক সভা ও অলিম্পিক উৎসব উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে সন্ধিবিগ্রহসম্বন্ধীয় ও সমাজঘটিত নানা বিষয়ের আন্দোলন ও মীমাংসা হইত; ভারতবর্ষে জাতিসাধারণ প্রশ্নের নিরূপণার্থ তদ্রূপ কোন বিধান ছিল কি না তাহার প্রমাণ নাই। তবে যে কোন কোন রাজচক্রবর্ত্তী প্রভূত পৌরুষ ও প্রভুশক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, অশ্ব-

মেধ, বিশ্বজিৎ বা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সময়ে সময়ে অন্যান্য রাজগণের নিকট কর গ্রহণ করিতেন, তাহা রাজনৈতিক একতার চিহ্ন নহে। অগাধ জলধির উপরে বাত্যার প্রতিঘাতের ন্যায়, তদ্দ্বারা রাজ সমাজে ক্ষণিক চাঞ্চল্য সংঘটিত হইত মাত্র। উহা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় কিয়ৎক্ষণের জন্য তুমুল বাঁধাইয়া দিত; পরে আবার দীর্ঘ নিদ্রার প্রভাবে, সব নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। মৌর্য্যবংশীয় ভূপতিগণ ভারতরাজ্যের একতা সম্পাদন করিলে করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের বিপক্ষে অভ্যুত্থান করাতে সে আশা উন্মূলিত হইয়া যায়। তথাপি জাতিসাধারণের বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যে তাঁহারা ততদূর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে তাঁহাদের অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ও পৌরুষের চিহ্ন সন্দেহ নাই। ইহার বহুশতাব্দী পরে যবনের আততায়িতা নিবারণার্থ আর্য্যাবর্ত্তবাসী রাজগণ অভ্যুত্থান করেন। কিন্তু সে কেবল একতার ছায়ামাত্র, অমাবস্যার নিশাতে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায়। তাহাতে কেবল ভারতের নিরুৎসাহরূপ অন্ধতমসের অভূতপূর্ব্ব প্রগাঢ়তা জানিতে পারা যায়, আর কিছুই নহে। ইহার পর বহু শতাব্দী অতীত হইলে, রাজর্ষি আকবর ভারতের একতা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার অসাধারণ মনস্বিতা, প্রভুশক্তি ও প্রতিভা এবং তাঁহার অভূতপূর্ব্ব অপক্ষপাতিতা অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আরঙ্গজীবের ধূর্ত্ততা ও ধর্ম্মান্ধতা নিবন্ধন সকলই বিফল হইয়া যায়।

অতএব ইংরাজ জাতির পূর্ব্বে ভারতভূমিতে কখন রাজনৈতিক একতা ছিল না, ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। আমরা রাজনৈতিক একতা পদের এই অর্থ করিতেছি যে, ভারতভূমি প্রাচীন পারস্য ও রোম রাজ্যের ন্যায় পূর্ব্বে কখন একচ্ছত্রা হয় নাই। অথবা আধুনিক জর্ম্মাণ সাম্রাজ্যের মত এক নিয়মের অধীন পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে সুসম্বদ্ধা ছিল না। পুরাণে যে পুনঃ পুনঃ একচ্ছত্র রাজ্যতন্ত্রের কথা বর্ণিত দেখা যায়, সে কেবল কবিকল্পনা মাত্র। আর মনুতে যে দ্বাদশ রাজমণ্ডলের বিষয় উক্ত আছে, তাহাতে সমুদয় ভারতবর্ষ নিঃশেষিত হয় না। মহাভারতের সভাপর্ব্বে উক্ত লক্ষ রাজার কথা পরিত্যাগ করিলেও দিগ্বিজয় প্রকরণে উদ্যোগপর্ব্বে ও আশ্বমেধিক পর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে তৎকালে ভারতবর্ষ শত শত রাজ্যে বিভক্ত ছিল সপ্রমাণ হইতেছে। পরন্তু যদিও রামায়ণের ঘটনা মহাভারতের ন্যায় ভারতবর্ষের সমগ্রব্যাপিনী নহে, তথাপি রামায়ণ দৃষ্টে রাজ্যসংখ্যার বড় ন্যূনতা লক্ষিত হয় না। যৎকালে মহাবীর আলেক্জাণ্ডার আক্রমণ করেন, তখনও এদেশে ন্যূনাধিক দেড় শত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যাহাহউক প্রাচীন ভারত একতা-বর্জ্জিত ছিল না। ধর্ম্মই এই সুবিস্তীর্ণ দেশকে এক সূত্রে সংবদ্ধ রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ জাতির অভূতপূর্ব্ব প্রাদুর্ভাব ও অনিবার্য্য শাসন বহুকাল সেই ধর্ম্মের সজীবতা রক্ষা করিয়াছিল। ক্রমে বৈদিক, সাংহিতিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক রূপ ধারণ করিয়া ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্ম অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু কিছুতেই উহার স্বরূপ ও একতা নষ্ট হয় নাই। সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র মন্ত্র সকলই বেদের অবিসম্বাদী ও অনুগত বলিয়া বরাবর পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। সেই ধর্ম্মের অধিকার জগৎ জুড়ে, আধুনিক সভ্যতম জাতির ধর্ম্মের ন্যায় সংকীর্ণ ও ব্যাহত ছিল না। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, ভোজন, পান প্রভৃতি দৈনন্দিন সামান্য সামান্য কার্য্য হইতে অক্ষয়-স্বর্গ-ফল-সাধন যাগ যজ্ঞ পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্যে তাহার শাসন খাটিত। কামরূপী মারুতির ন্যায় তাহার পাদদেশ ভূতলস্থিত কিন্তু মস্তক গগনস্পর্শী। অধুনা রাজ্যতন্ত্র হইতে ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত করিতে উদ্যোগ চলিতেছে। কিন্তু পুরাতন ভারতে শাসন প্রণালী ও পররাষ্ট্র বিভাগ ধর্ম্মের একটিশাখা মাত্র ছিল। নিত্যনৈমিত্তিক ব্রত হোমাদির ন্যায় প্রজাপালন ও সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যেও তাঁহার শাসন অনিবার্য্য ছিল। ধর্ম্মের এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি নিবন্ধন প্রাচীন ভারতের শুদ্ধ সামাজিক একতা কেন? শাসনপ্রণালীসম্বন্ধীয় একতাও রক্ষিত হইত। তৎপ্রযুক্ত বহুরাজ্যবিভক্তা এই ভারতভূমিকে কতক পরিমাণে একচ্ছত্রা ও একরূপ রাজনীতিসূত্রে সম্বদ্ধ বোধ হইত। পরে কালক্রমে পারসীক, মুসলমান ও খৃষ্টান ভারতভূমিতে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মের একতা নষ্ট হইল। তন্নিবন্ধন সামাজিক পার্থক্য ঘটিল এবং শাসন সম্পর্কে যাহা কিছু ঐক্য ছিল, অন্তর্হিত হইল। অধুনা ইংরাজদিগের খরতর শাসন বশতঃ রাজনৈতিক একতা সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক ঐক্য কোথায়? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও পারসীকেরা সকলেই বিভিন্নমতাবলম্বী ও বিভিন্নপথানুসারী। এক রাজার অধীনে অবস্থান ভিন্ন, তাঁহাদের কোন বিষয়ে মিল নাই; কোন কার্য্যে সমদুঃখসুখতা ও সম্ভূয়সমুত্থান নাই। এখন ভারতবাসী বলিলে, কোন জাতি বা কোনপ্রকার সাধারণ মত প্রতীয়মান হয় না। যাঁহারা আগন্তুক পারসীক, মুসলমান ও খৃষ্টান, তাঁহারা স্বার্থসাধনের জন্য এদেশে বাস করিয়াছেন, ভারতমাতার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ অকৃত্রিম নহে। যাঁহারা ভারতের প্রকৃত সন্তান, যাঁহাদের সমুদয় স্মৃতি ও পূর্ব্বকাহিনী এবং সমস্ত আশা ভরসা ভারতকে লক্ষ্য করিতেছে, তাঁহারা চিরদাসত্বে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পর সমবেদনা নাই। পঞ্চাশৎ বৎসরেরও অধিককাল ইংরাজেরা ভারতের সর্ব্বত্র আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক রাজ-

নৈতিক একতা বদ্ধমূল করিয়াছেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে পরিমাণে ভারত-সমাজের ঐক্যগ্রন্থি সংযোজিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দুঃখের বিষয় এই যে পূর্ব্বতন ইংরাজরাজপুরুষগণ ভারতের ঐক্য ও দৃঢ়তাকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল মনে করিতেন, এবং তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিলে আর কিছুই চাহিতেন না। কিন্তু অধুনা সে মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতএব এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যদি কোন উদ্যোগ হয়, সরকার বাহাদুর তাহাতে সুবাতাস দিবেন ও আনুকূল্য করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অধুনা প্রশ্ন হইতেছে, কিরূপে ভারতের ঐক্য সাধনার্থ উদ্যোগ হইতে পারে। অধুনা ধর্ম্ম দ্বারা কোন দেশের বা সমাজের একতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা পাওয়া দুরাশামাত্র। বিশেষতঃ ভারতে যে দিন যবন পদার্পণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে ধর্ম্মের একতা ভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহার পুনরুদ্ধার বাসনা দিবাস্বপ্নের ন্যায় অলীক কল্পনার বিলসিতমাত্র, কদাপি কার্য্যে পরিণত হইবার যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। সে আশা কখন কখন হীনমস্তিষ্ক খ্রীষ্টীয় মিষণরির এবং স্থূলদর্শী অত্যুন্নতি-দলাক্রান্ত ব্রাহ্মের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিতে সমর্থ, কিন্তু কোন মনীষীর মনোবিকার জন্মাইতে পারে না। পরন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়, পারসীক ও বৌদ্ধধর্ম্ম সকলই উচ্চশ্রেণীর কল্পনাপ্রসূত ও সভ্যতম জাতির উপযোগী, কিন্তু মূলে ও পরিণামে পরস্পর এত বিসদৃশ, যে তাহাদের মধ্যে একের জয় ও অন্যান্যের সম্পূর্ণ নিরাস, অথবা সকলের সমবায়ে একটী সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্মের সৃষ্টি কোনমতে সম্ভাবিত নহে। অতএব যে দেশে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম গুলির প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মদ্বারা সমাজের ঐক্য সাধন সুদূরপরাহত। যিনি এখন ধর্ম্মের প্রভাবে সামাজিক একতা সাধন করিতে উৎসুক, তিনি আন্দামান দ্বীপে গমন করুন, অথবা মরীসসের কুলি ও সাঁওতাল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি লইয়া প্রবৃত্ত হউন, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। এখন বিজ্ঞান ও যুক্তির রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। তৎপ্রভাবে ধর্ম্ম একপাদ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার আর তিনটি পাদের পুনঃস্থাপন সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত পোপ—জীশুর রাজ্য; মোল্লাজী—প্যাকম্বরের প্রাদুর্ভাব ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়—কল্কীর অবতার পুনর্ব্বার প্রত্যাশা করেন করুন, তাহাতে সংসারের অধোগতি ও মানবজাতির অবনতি হইবার আর আশঙ্কা নাই। এই জন্য আমাদের বোধ হয় যে, প্রিন্স বিসমার্ক পোপ ও কাথলিক সম্প্রদায় লইয়া ইয়ুরোপে যে হুলস্থূল তুলিয়াছেন, তাহা বাতিকের কর্ম্ম, কিম্বা নিজের দুষ্পরিহার্য্য বিদ্বেষের ফল, অথবা কোন কোন দুরবগাহ দুর্নীতির স্বস্তিবাচন হইবেক। আমাদের মতে শেষোক্ত কারণটি প্রকৃত বোধ হয়। ইহা সেই "লৌহময় শোণিতলোলুপ"

নরের প্রকৃতির অনুরূপ। তাহা না হইলে, তিনি মিছামিছি এত মস্তিষ্ক খরচ ও যাতনা ভোগ করিবেন কেন? যাহা হউক বর্ত্তমান ইয়ুরোপে ধর্ম্মবিপ্লব নিবন্ধন রাজ্যবিপ্লব বা সমাজবিপ্লব ঘটিবার সম্ভবনা নাই। অধুনা ইয়ুরোপে লুথার ও নক্সের প্রাদুর্ভাব অথবা ভারতে বুদ্ধদেব ও চৈতন্যের অবতার প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কালমাহাত্ম্যে ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির পার্থক্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এবং উত্তরোত্তর ইহার অধিকার আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবেক। এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে ধর্ম্ম গবর্ণমেণ্ট ও সমাজসাধারণের আশ্রয় ও সংস্রব পরিত্যাগ করিবেক এবং কেবল ব্যক্তিবিশেষের মতের উপর নির্ভরপূর্ব্বক নিজের প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইবেক। তখন ধর্ম্ম নিবন্ধন তত শোণিতবর্ষণ, পরধর্ষণ, আক্রোশ ও দ্বেষাদ্বেষি থাকিবেক না। তখন পরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইবেক; কোন প্রকারে অনধিকারচর্চ্চা ঘটিবেক না। তখন ধর্ম্ম প্রকাশ্য-আড়ম্বর-বর্জ্জিত হইয়া অন্তর্নিগূঢ় বিশ্বাসের বিষয় হইবেক; কোনরূপ বাহ্যিক কর্ম্মকাণ্ড ও চিহ্নপরম্পরা দ্বারা সম্বদ্ধ থাকিবেক না। ধর্ম্মের যদি এরূপ পরিণাম কখন সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এক গ্রামের মধ্যে, অধিক কি এক পরিবারের মধ্যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পারসীক প্রভৃতি কুশলে ও সন্তুষ্ট মনে অবস্থান করিতেছে। কোন কালে ধর্ম্মের ঈদৃশ পরিণতি ঘটিবে কিনা সন্দেহ স্থল। আমাদের বোধ হয়, বর্ত্তমান ধর্ম্মপরম্পরার পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই বিশ্বজনীন যে ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহাকে মানব ধর্ম্ম (Religion of Humanity) বলে, তাহা ভূরাজ্যে প্রবর্ত্তিত হইবেক। ফলতঃ আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ তিতিক্ষা ও অবিসম্বাদিতার ছবিটি চিত্রিত করিলাম, তাহা ঘটিবার পূর্ব্বে মানব ধর্ম্মের বহুতর প্রচার হইবেক; নতুবা তাদৃশ শান্তি, নির্বৃতি ও পরস্পর প্রীতির সম্ভবনা কি? অতএব মানব সমাজের বর্ত্তমান অর্দ্ধসভ্যতা অবস্থাতে, সামাজিক ব্যাপারে ধর্ম্মকে একবারে নির্লিপ্ত রাখা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ এখানে ধর্ম্মকে লইয়া সামাজিক উন্নতির প্রশ্ন চলিতে পারে না। যদি সম্ভব হয়, তবে কোন্ ধর্ম্ম লইয়া চলিবেক? হিন্দু, মুসলমান না খৃষ্টীয় ধর্ম্ম? মুসলমান ভূপাল যখন সমাজসাধারণকে ছাড়িয়া স্বধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলেন, তখনই সিংহাসনচ্যুত হইলেন। কাকতালীয় ন্যায়েই হউক, ঐকান্তিক অর্থলালসা বশতই হউক, অথবা স্বাভাবিক ঔদাসীন্য নিবন্ধনই হউক, কিম্বা দূরদর্শী রাজনীতির অনুশাসন প্রযুক্তই হউক, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ থাকাতে ভারতের

সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, নতুবা ইংরাজ জাতিকে অদ্যাপি ভারতে কেবল আমদানি রপ্তানি করিয়া কাল কাটাইতে হইত। ইংরাজ, স্পেনীয়ের ন্যায় পরধর্ম্মদ্বেষী হইলে, আকবরের পাদপীঠও স্পর্শ করিতে পারিতেন না। যাঁহারা আমেরিকা ও ভারতের অন্তর বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা বাহ্যদর্শী ও আপাতপক্ষপাতী; ইতিহাসের কোনই ধার ধারেন না। অতএব তাঁহাদের পক্ষে ইংরাজ ও স্পেনীয়ের রাজনীতি ও কৃতকার্য্যতা বিষয়ে ভেদাভেদ দুর্ব্বোধ হইবেক সন্দেহ নাই। তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলন করিতে প্রয়াস পাওয়া দুরাশা মাত্র।

যখন ভারতে ধর্ম্মসম্বন্ধে ঐক্য ছিল, তখন তদ্দ্বারা সমাজের একতা রক্ষিত হইত; তাহাতে সমাজের ইষ্টও ঘটিত, অনিষ্টও ঘটিত। কিন্তু অধুনা ধর্ম্মের পার্থক্য ও বিরোধ ঘটিয়াছে। অতএব তদ্দ্বারা ইষ্ট সাধনের সম্ভাবনা নাই, বরং যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এই জন্য অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতে সামাজিক কার্য্যে ধর্ম্মের সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করা উচিত। এখন প্রশ্ন হইতেছে কি উপায়ে ভারতের ঐক্য ও সামাজিক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর তত দুরূহ নহে এবং ইহার মীমাংসার অনুকূলে দৃষ্টান্তরও অসদ্ভাব নাই। তথাপি ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা প্রগাঢ় অভিনিবেশ, অবিচলিত অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক স্বদেশানুরাগ ব্যতীত সম্ভাবিত নহে। এই সকল সুমহৎ গুণ ভারতে নিতান্ত দুর্লভ। তৎপ্রযুক্ত উক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর নির্দ্দেশ করিতেও ভরসা হয় না। যাহা হউক সম্প্রতি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত ঘটিয়াছে; তাহাতেই আমাদিগকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে।

অনেকে শুনিয়াছেন যে বিগত নবেম্বর মাসে লণ্ডন নগরে একটি মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার নাম "প্রাচীসভা" (Oriental congress)। গত বৎসর ফ্রান্সের রাজধানীতে এই সভার সূত্রপাত হয়। ফরাসির প্রতিভা হইতেই ইহার সৃষ্টি। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বদেশীয় প্রাচীনতম সভ্য রাজ্যগুলির পুরাবৃত্তের উদ্ধার করা হইবেক। ইজিপ্ত, আসিরিয়া, বাবিলন; ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে সভ্যতার স্রোত কি ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ ইয়ুরোপীয় মনীষিগণ উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা প্রাচীন নগর গুলির ভগ্নাবশেষ, কীর্ত্তিস্তম্ভ, সমাধি স্থান প্রভৃতি হইতে অনুশাসনপত্র, পূর্ব্বপ্রচলিত মুদ্রা, ক্ষোদিত চিত্রিত নানাবিধ লিপি প্রাপ্ত হইতেছেন এবং অসাধারণ কৌশলে সেই সকলের ভাবার্থ নির্ব্বাচন ও সংকলন করিতেছেন। তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা হইতে মানব ইতিহাসের অনেক

মহামূল্য তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বেই উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু বরাবর এবিষয়ে একটি গুরুতর অভাব রহিয়াছে। বিভিন্নদেশীয় পুরাবিদ্গণ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া নিজ নিজ ভাষায় স্ব স্ব গবেষণার ফল মুদ্রিত করাতে, তাহা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীতে উচিত মত প্রচারিত হয় না এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্টরূপ সমদুঃখসুখতা ও সন্তূয়সমুত্থান ঘটে না। সকলেই স্বয়ং হইয়া কার্য্য করেন এবং অন্য কোন সহযোগীর মত দূষণপূর্ব্বক নিজ মত স্থাপন করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ ভাবেন। ইহার ফল কেবল পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা ও কুসংস্কার। তন্নিবন্ধন প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে দারুণ মতভেদ ঘটে এবং একটি বিষয়কে সর্ব্ববাদি-সম্মত করিতে অনেক সময় লাগে। জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে এই গুরুতর অন্তরায়ের নিবারণার্থ গতবৎসর পারিসে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইয়ুরোপের তাবৎ প্রাচ্য পুরাবেত্তৃগণ তাহাতে সাদরে আহূত হন। তাঁহারা সমবেত হইয়া নিজ নিজ মতের প্রতিপোষক প্রমাণ পরীক্ষা প্রদর্শন করিলেন। যাহা সর্ব্বাদিসম্মত, তাহাই সিদ্ধান্ত রূপে পরিগৃহীত হইতে লাগিল। এইরূপে অনেক বিবাদ ও মত ভেদের সামঞ্জস্য হওয়াতে ভাবী উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। আমরা পারিসের সভা সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ পাঠ করি নাই। কিন্তু লণ্ডনস্থ সভার কার্য্যপ্রণালী পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ফ্রান্স, জর্ম্মনি, অস্ত্রিয়া, রুসিয়া ও সুইডেন হইতে পণ্ডিতগণ ব্রিটনের রাজধানীতে এবৎসর সমবেত হইয়াছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষও উদাসীন ছিলেন না। বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ পুরাবিৎ শুকরাম পান্দুরাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। পুরাবৃত্ত সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হয়। কিন্তু একটি দারুণ ব্যাঘাত বশতঃ যথোচিত ফল লাভ হয় নাই। মনীষিগণ নিজ নিজ ভাষাতে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করাতে ভিন্নদেশীয় শ্রোতাদিগকে বধিরের ন্যায় শুদ্ধ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। যখন জর্ম্মান্ পণ্ডিত বলেন, তখন ইংরাজ, ফরাসি, রুশ কিছুই বুঝেন না। আবার যখন রুশ সভ্য উঠেন, তখন ইংরাজ, ফরাসি, অস্ত্রিয় শ্রোতা কিছুই অবগত হন না। কিন্তু শিষ্টাচারের অনুরোধে সকলকেই প্রকৃত শ্রোতার ন্যায় বসিয়া থাকিতে হয় এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া কাল কাটাইতে হয়। কি করেন, কিছু বলিবার যো নাই। আগামী বৎসর সেণ্টপিটর্সবর্গে তৃতীয় সভার অধিবেশন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে এই প্রতিবন্ধকতাটি নিরস্ত হইবেক, বলা যায় না। সমগ্র ইয়ুরোপের কোন সাধারণ ভাষা নাই, হইবারও সম্ভাবনা নাই। যাহাহউক আপাততঃ উক্ত অসুবিধা যত দুষ্পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হউক না, ইয়ুরোপীয় প্রতিভা বলে অনতিচিরকালের মধ্যেই উহার অন্ততঃ আংশিক নিরাকরণ হইবেক, এমন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যেই

এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে যে, এক দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা একপ্রকার ভাষার সৃষ্টি হইবেক। তদ্দ্বারা পৃথিবীর ভিন্নজাতীয় লোকের প্রয়োজন মত পরস্পরের সহিত কথা বার্ত্তা চলিতে পারে। যাহাহউক বর্ত্তমানে নানাভাষী ( Interpreter ) দ্বারা কথঞ্চিৎ উক্ত সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে চলে।

যখন ইয়ুরোপীয়েরা অপেক্ষাকৃত লঘুতর প্রয়োজন সাধনার্থ এইরূপে সভ্যূয়সমুত্থান করিতেছেন, তখন ভারতবাসীগণের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কি ভাল দেখায়? ভারতবাসীর উদ্দেশ্য কত বড়, তাহা মনে করিলেও লোমহর্ষণ হয়। অধুনা ভারতের সামাজিক অস্তিত্ব নাই; দেহে প্রাণ নাই, ইহা দেখিয়া যে ভারতসন্তান উদাসীন থাকিতে পারেন, তাঁহার চিত্ত নিশ্চয়ই দয়া মায়া ও স্নেহ মমতা বর্জ্জিত এবং তাঁহাতে লজ্জা ও মনুষ্যত্বের লেশ মাত্র নাই। এই মৃতকল্প ভারত সমাজের সজীবতা সাধনার্থ কোন্ যত্ন না আবশ্যক? কোন্ কষ্ট না সহনীয়? কোন্ স্বার্থ না পরিহার্য্য? ইয়ুরোপীয়েরা ভিন্নদেশীয় প্রাচীন ইতিবৃত্তের উদ্ধারার্থ এত প্রয়াস পাইতেছেন এবং এত ব্যাঘাতকে তৃণজ্ঞান করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের কি লজ্জা হয় না? মনে ভরসার কি সঞ্চার হয় না? ইয়ুরোপীয়গণের কত প্রতিবন্ধকতা আর আমাদের কত সুবিধা আছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ইয়ুরোপ নানা গবর্ণমেণ্টের অধীন, কিন্তু ভারত এক গবর্ণমেণ্টের অধীন। ইয়ুরোপে রাজনীতি সম্বন্ধে প্রায়ই অনেক গোলযোগ ও অকৌশল চলিতেছে; কিন্তু ভারতে অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান আছে। ইয়ুরোপে বিভিন্ন ভাষা নিবন্ধন যে প্রতিবন্ধকতা তাহা দুষ্পরিহার্য্য। কিন্তু ভারতে ইংরাজি ভাষা এত প্রচলিত যে, তদ্দ্বারা সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব যাহা ইয়ুরোপে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাঘাত, ভারত সম্বন্ধে তাহার অস্তিত্ব মাত্র নাই। ইয়ুরোপ পরার্থের জন্য এত ব্যাঘাত সত্ত্বেও উদ্যোগী হইয়াছেন। ভারত কি স্বার্থের জন্য তাদৃশ গুরুতর প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকেও উদ্যোগী হইবেন না? ইহা মনে করিলেও হৃদয় ব্যথিত হয় এবং এরূপ ইচ্ছা জন্মে যে পৃথিবী স্থান দান করুন, রসাতলে প্রবিষ্ট হই, অথবা বর্ব্বরজাতির প্রতিবেশী হইয়া অরণ্যে বা পর্ব্বতকন্দরে গিয়া উন্নত আর্য্য-মস্তক লুক্কায়িত করিয়া থাকি। আমাদের সাহায্য পাইবার কি কোন প্রত্যাশা নাই? আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না যে, যাঁহারা মানবজাতির উন্নতি কার্য্যে বরাবর সকলের অগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই ইংরাজজাতি আশ্রিত ভারতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট এরূপ কার্য্যে নিজে সূত্রপাত করিতে পারেন না। ইহা সমাজসাধারণের কার্য্য। তবে আশ্বস্তচিত্তে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, কার্য্যা-

রক্ত হইলে, তাহার স্থায়িতা ও উৎকর্ষ সাধনার্থ, সরকার বাহাদুর যথোচিত আনুকূল্য করিতে কৃপণতা করিবেন না।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি হইতেছে? আমাদের উচিত কাল বিলম্ব না করিয়া সেই "প্রাচী সভার" দৃষ্টান্তে একটি মহৎ সভার স্থাপন করা। সেই সভার স্থান ভারত জুড়ে; তাহার সভ্য সকল সম্প্রদায়ের; তাহার উদ্যোগ সমাজের উন্নতি পক্ষে। তাহার অধিবেশন কার্য্য বৎসর একবার করিয়া, কথন কলিকাতায়, কথন বা এলাহাবাদে, লাহোরে, বোম্বায়ে, মান্দ্রাজে, লক্ষ্ণৌনগরে সমাহিত হইবেক। সমাজের ধুরন্ধরগণ সভার সভ্য হইয়া সাধারণের, সম্প্রদায় বিশেষের ও বিভাগ বিশেষের হিতার্থ নানা বিষয়ের আন্দোলন ও মীমাংসা করিবেন; সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবেন এবং হিতপথ্য উপদেশ দিবেন।

এইরূপ সভাস্থাপনের কীদৃশ শুভ ফল হইবেক, তাহার বিশেষ বিবরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা হইলে অনেকে আমাদিগকে দুরাশার দাস বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতে পারেন। কিন্তু আমরা একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঈদৃশ সভা দ্বারা ভারতের যে একটি মহৎ অভাবের পরিহার হইবেক, তাহাতে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। ভারতহিতৈষী মাত্রেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, এদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণ মত অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু আপত্তির ভয় না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত সভার যাহা অভিমত, তাহাকে সাধারণ মত বলিয়া স্বীকার করিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজজাতি সাধারণে৷ প্রস্তুত হইবেন। তাহা হইলে এমন প্রত্যাশা করা অসঙ্গত নহে যে ভারতবর্ষের শাসন সম্পর্কে ব্রিটনের সাধারণ মত ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অঙ্গীকার পত্র, সম্পূর্ণ ভাবে না হউক, অনেকাংশে কার্য্যে পরিণত হইবেক।

---

# বঙ্গবামার ধর্ম্ম নৈতিক অবস্থা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

আমরা ভাণ করিয়া থাকি, আমাদিগের রমণীগণ সতীত্ব ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠতম। বঙ্গকামিনীকে সতী বলিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত, তাহার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা কি, এবং আমাদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের ভাব কি প্রকার?

বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া আমরা তাহাকে যেন পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখি। বহুকাল ধরিয়া অন্তঃপুরী মধ্যে তিনি অবগুণ্ঠনবতী রহেন। শ্বশুরালয়ে অনেক দিন অতিবাহিত না করিলে দেশের রীত্যনুসারে কাহারও সহিত তাঁহার বাক্যালাপ করিবার যো নাই। পুরুষজাতীয় কোন গুরু জনের সহিত কথা বার্ত্তা কওয়া দূরে থাক, তাহাদিগের সমক্ষে অবগুণ্ঠন বিমুক্ত করিয়া যাইতেও পারেন না। অসাবধান বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার ছায়া স্পর্শ করিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তদ্রূপ ভ্রাতৃশ্বশুরের কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেও ভ্রাতৃবধূর প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান আছে। গুরু জন যতক্ষণ অবরোধ মধ্যে অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ নববধূর উচ্চ রবে কথা কওয়াও দূষণীয়। একলা এক দণ্ড অপর পুরুষের সহিত কথা কওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। কথা কওয়া দূরে থাক, সম্মুখে যাওয়াও বৈধ নহে। বাহিরের পরিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিবার নিমিত্ত গবাক্ষ দ্বারে ক্ষণকাল অবস্থান করিলে তাঁহার অপযশ হয়। পল্লীর মধ্যে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। জনসমাজ কেমন তাহা নারীজাতি কিছুই অবগত নহে। প্রেম-বিদ্বেষ-পরতন্ত্র হইয়া আমরা নারীজাতিকে নিতান্ত অধীন করিয়া রাখিয়াছি। তাহারা কেবল জ্ঞানে অন্ধ নহে, পৃথিবীর সমস্ত বিষয়েই অন্ধ। তাহারা অন্ধকারে জীবন পরিগ্রহ করিয়া, অন্ধকারেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে। জনসমাজের সহিত যাহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই, চিরদিন একাকিনী গৃহমধ্যে যাহাদিগের পশুবৎ অবরুদ্ধা থাকিতে হয়, তাহাদিগের জীবন নিতান্ত অধীন ও জড়বৎ নিশ্চেষ্ট বলিতে হইবে। যাহাদিগের এতদূর অধীনতা তাহাদিগের আবার সত্ত্বা কি? যাহারা জনসমাজের কিছুই অবগত নহে, যাহাদিগের ভাল মন্দ এবং সদসৎ বিবেচনা কিছুই নাই, স্বার্থপর পুরুষের দুই চারিটা উপদেশ যাহাদিগের জ্ঞানের পরিসীমা, গৃহ ধামের একটী কুটীর মাত্র যাহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র, যাহাদিগের কোন শক্তি নাই তাহাদিগের অধীন জীবনের গৌরব কি? ক্রীত দাসীর ন্যায় যাহারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধা থাকিবে তাহাদিগের কার্য্যের নিন্দা অথবা প্রশংসাই বা কি? স্বামী ভিন্ন কাহারও সহিত স্ত্রীজাতি বিশ্রব্ধ আলাপ করিতে পায় না। অন্যের সহিত বিশ্রব্ধ আলাপনে তাহাদিগের শত সহস্র প্রতিবন্ধক। স্বামী ভিন্ন শ্বশুরালয়ে বঙ্গবধূর আর কেহই নাই। স্বামী যে প্রকার হউন, তাঁহার নিতান্ত আশ্রিত ও দাসীর ন্যায় অধীন থাকিতেই হইবে। কারণ স্বামী ভিন্ন তাঁহার কোন গতি নাই। স্বামীকে পরিত্যাগ করা স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াও স্বামী অনায়াসে ভদ্রসমাজে পূজনীয় হইতে পারেন। স্বামী অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া রাখিতে পারেন বলিয়া, পাছে তাঁহার বিরাগভাজন হন,

এই ভয়ে স্ত্রী তাঁহার সর্ব্বথা মনস্তুষ্টি সাধন করিতে ক্রুটি করেন না। পাছে স্বামীর কোন বিষয়ে ক্রুটি হয়, তজ্জন্য স্ত্রী তাঁহার সম্পূর্ণ বাধ্য ও অধীন হইতে স্বীকৃত হন। বৈধব্য দশার আশঙ্কায় পত্নী অহোরহ স্বামীর পদাশ্রিত থাকেন। দিবা রাত্রি তাঁহার স্বামীর জন্যই ভাবনা। পরের উপর যাঁহার এতদূর নির্ভর, পরের স্বার্থের সহিত যাঁহার নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তাঁহার অনুরাগ ও পতিপরায়ণতা কতদূর বিশুদ্ধ ও হৃদয়গত তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। নিতান্ত অধীনতা নিবন্ধন, স্ত্রীর পরম বিশুদ্ধ প্রণয়ের প্রতিও আমাদিগের একদা সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহার পবিত্র প্রণয়ের সুখে আমরা সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারি না। আমাদিগেরই দোষে আমরা এই সুখে কিয়ৎ পরিমাণে বঞ্চিত হইতেছি। বাস্তবিক আমাদিগের স্ত্রী-জাতির পতিপরায়ণতায় এতদূর স্বার্থ-পরতা বিদ্যমান দেখি, যে তাহা বিশুদ্ধ ও পরম পবিত্র কি না তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ পতিপরায়ণতা অধীনতার নামান্তর মাত্র। স্বার্থপর পুরুষজাতি এইজন্য ইহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া ইহাকে স্ত্রীজাতির একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। ধর্ম্ম বলিয়া অনভিজ্ঞা স্ত্রীজাতি ইহা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সমাজের রীতি, নীতি, ও অবস্থার গতিকে বাধ্য হইয়া তাহারা এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ব্রতী হইয়াছে। কিন্তু যদি দাসীত্বের গৌরব থাকে তবে স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ও গৌরব আছে।

যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে ধর্ম্ম নাই। যেখানে পাপ করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে পুণ্যের গৌরব নাই। যেখানে নড়িবার শক্তি নাই, সেখানে স্থিরভাবে থাকিতেই হইবে। সেরূপ জড়ভাবের আবার প্রশংসা কি? যে স্বাধীন হইতে না পারে, তাহার অধীনতা দাসত্ব। যে যথেচ্ছাচারী হইতে না পারে, তাহার স্বাধীনতা, অধীনতার নামান্তর মাত্র। বাস্তবিক যিনি স্বাধীন-ভাবে এবং স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে না পারেন, ধর্ম্মজগতে তিনি জড়বৎ ও মৃত-বৎ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ধর্ম্ম-নৈতিক সত্ত্বা কিছুই নাই।

আমাদিগের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে উক্ত বাক্যনিচয় সম্পূর্ণরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে। স্বাধীনতার পথে তাঁহাদিগের যে প্রকার অশেষ কণ্টক তাহা আমরা প্রতীত করিয়াছি। যথেচ্ছাচারিতা কাহাকে বলে তাহা তাহাদিগের অনুভবও নাই। যদি কিছু স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তাহারা সে স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে সাহসিনী নহে। চির-অভ্যস্ত অধীনতা ও পরবশতা তাহা-দিগের নিত্য ও এক প্রকার স্বাভাবিক ভাব হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ তাহাদিগকে অগ্রসারিণী করাও সামান্য কথা নহে। কত যুগান্তর অতীত

না হইলে আর আমাদিগের রমণীগণের প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধন হইবে না। তাহাদিগের আধুনিক পশুবৎ ও দাসীর অবস্থায় প্রকৃত ধর্ম্মজীবন অসম্ভব। তাহাদিগের এমত জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি নাই, যদ্দ্বারা ভাল মন্দ বিচার করিয়া লয়। নিজে সদসৎ বিবেচনায় যাহারা সমর্থা নহে, অগত্যা তাহাদিগকে অপরের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, যাহাদিগের বিবেচনার উপর রমণীগণ নির্ভর করিবে তাহারা অপর জাতি ও একপ্রকার বিপক্ষ জাতি। কারণ ছুই জাতির স্বার্থ কখন এক হইতে পারে না। পুরুষ জাতির যাহাতে সম্পূর্ণ সুখ স্বচ্ছন্দতা, স্ত্রীজাতির তাহাতে ঘোর অসুখ ও অধীনতা। একের অবনতিতে অপরের উন্নতি নির্ভর করে। নারীকুল সম্বন্ধে পুরুষ জাতি যে সমস্ত ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, সে সমস্ত ব্যবস্থা কখন নিস্বার্থ ধর্ম্ম-সঙ্গত হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবেও আমরা এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করি। সংসার ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে পুরুষ, নারীকে এতদূর অধীন করিয়াছে, যে নারীর আর সতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র জীবনের প্রয়োজন, এবং স্বতন্ত্র সুখ নাই। পুরুষের স্বার্থ, প্রয়োজন এবং সুখের সহিত তাহা একীভূত হইয়া গিয়াছে। এক জাতির প্রভুত্বে অপর জাতির সত্ত্বা বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্র ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা ও জীবন কিছুই নাই।

যেখানে স্বাধীনতা আছে, সেখানে যথেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা আমরা অস্বীকার করি না। বাস্তবিক যথেচ্ছাচারী হইবার শক্তি না থাকিলে কেহ স্বাধীন হইতে পারে না। কিন্তু তা বলিয়া স্বাধীন হইলেই যে সর্ব্বসাধারণে যথেচ্ছাচারী হইবে একথাও অসম্ভব। একথা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে সমগ্র পুরুষ জাতি যথেচ্ছাচারী। তাহা যদি সত্য হয়, তবে পুরুষ জাতির স্বাধীনতা অগ্রে হরণ করা আবশ্যক। কিন্তু একথার প্রস্তাব করিতে কে সাহসী হইবে? কাহার সাধ্য পুরুষ জাতির স্বাধীনতা হরণ করে? পুরুষের জাতিসাধারণ স্বাধীনতা পাইয়া তাহার এক সামান্য অংশ মাত্র যথেচ্ছাচারী হইয়াছে বলিয়া স্বাধীনতার গৌরব কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। বরং তাহাতে প্রতীত করিয়াছে যে, অধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতার অপেক্ষা স্বাধীনতা কত শ্রেষ্ঠ ও সুখকর। যথেচ্ছাচারিতা থাকাতে, স্বাধীনতার গৌরব বরং সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে স্বাধীনতার সুফল ও মঙ্গল যেমন দেদীপ্যমান হইয়াছে, কেবল অধীনতায় তেমন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। স্ত্রীজাতির সম্বন্ধেও একথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রীজাতি স্বাধীন হইলে যে তজ্জাতিসাধারণ যথেচ্ছাচারিণী হইবে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা ইহার ঠিক বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করি। কিয়দংশ পতিত হইয়াও যদি জাতি-

সাধারণ স্বাধীন হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মপথে উত্থিত হয় তাহা কি শ্রেয়স্কর নহে? কিন্তু পুরুষজাতি নিতান্ত বিদ্বেষী, নিতান্ত অহংকারী। বামাকুলের স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা তাহার অসহ্য। পুরুষের স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা নারীর অসহ্য হইলেও তাহার সহিষ্ণুতার গুণে তাহাকে সকলই সহ্য করিতে হইবে। পুরুষ সে প্রকার সহিষ্ণু হইতে পারেন না, কারণ তিনি প্রভু। পুরুষ জাতি সহসা আপনাদিগের একাধিপত্য বিনষ্ট করিতে পারে না। আমরা বলি, পুরুষ জাতি যে এতকাল ধরিয়া একাধিপত্য সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট, ইহাই তাহাদিগের গর্ব্ব। গর্ব্ব না কলঙ্ক? হায়! এতকালের পর বুঝি সেই একাধিপত্যে কুঠারপাত আরম্ভ হইয়াছে। যিনি আমেরিকার স্ত্রীসমাজের প্রতি দৃষ্টি করিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন। সেখানে স্ত্রীজাতি যে প্রকার স্বাধীনভাব অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, ত্বরায় আমেরিকার ধর্ম্মনৈতিক সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। "আমাদিগের রমণীগণ যথেচ্ছাচারিণী হইল" বলিয়া এখনই আমেরিকার পুরুষগণ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার স্ত্রীজাতি সে রবে ভীত নহে। তাহারা বুঝাইয়া দিতেছে যে, যাহা পুরুষজাতি যথেচ্ছাচারিতা বলিয়া রটনা করিতেছে তাহা কেবল অপেক্ষাকৃত অধীনতার হ্রাসমাত্র। আমরা স্বীকার করি, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিলে প্রথমে অনেক পরিমাণে যথেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা বটে, যেহেতু তাহা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। শৃঙ্খলভগ্ন পশু একবার দৌড়িয়া বিচরণ করিয়া আইসে। সদ্যসক্ষেত্রে একবার তৃণজাত উদ্দামিত হইয়া উঠে। যৌবনকালে রিপুগণের প্রাবল্য হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম, ইহা অনিবার্য্য। কিন্তু তা বলিয়া কি করিব? কিছুকাল পরেই পশু বশ্য হয়, ক্ষেত্র ফলবতী হয় এবং যৌবন প্রৌঢ়াবস্থায় পরিণত হয়। এত কাল যাহাদিগকে ঘোর অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিছুকাল তাহাদিগের যথেচ্ছাচারিতা সহ্য করিতে আমরা এত কাতর হই কেন? আমরা যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, সেই দুষ্কৃতির ফল ভোগের জন্য আমাদিগের শঙ্কিত হওয়া উচিত নহে। আমরা যদি একবার এই ফলভোগ করিয়া সহিয়া থাকি, অনতিবিলম্বেই চিরদিনের জন্য প্রকৃত সুখের সম্ভোগী হইব। কিছু কাল অতীত হইলেই, স্ত্রীজাতি প্রকৃত স্বাধীনভাব অবলম্বন করিবে। প্রথমে যদি তাহারা বহুসংখ্যায় যথেচ্ছাচারিণী হয়, ক্রমশঃ তাহাদিগের উষ্ণশোণিত শীতল হইবে।

আমেরিকাতে এখনই স্ত্রীজাতির জ্ঞানধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। এখনই শত সহস্র বামাগণ পুরুষের সহিত আপনাদিগের অধিকার সম্বন্ধে ঘোর বিতণ্ডা উত্থাপিত করিয়া জনসমাজ বিলোড়িত

করিয়া দিতেছে। পুরুষের জনসমাজ মধ্যে যে পরিমাণে পাপস্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই বিতণ্ডায় তাহারা অনেক সময় জ্ঞানবলে আপনাদিগের পক্ষ চমৎকার কৌশলে সমর্থন করিতেছে। অনেক বার তাহারা জয়লাভও করিয়াছে। এদিকে পুরুষজাতি তাহাদিগের কলঙ্ক রটনা করিয়া কতই পুস্তক প্রচার করিতেছে। বামাগণ সেই সকল গ্রন্থের সদুত্তর দিয়া আপনাদিয়ের দোষ ক্ষালন করিতেছে। এখন এই জ্ঞানযুদ্ধ বহুকাল চলিবে। ইহার সূত্রপাত মাত্র এই। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, ইহা হইতে ভবিষ্যতে ঘোর গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। সামাজিক বিপ্লবে যে সমস্ত অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা তাহা সকলই ঘটিবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিয়া যদি পরিণামে মঙ্গল হয়, তাহাও শ্রেয়। ইউরোপে এই তরঙ্গ একদিন উত্থিত হইবে, ইহাও আমাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু এসিয়ায় যখন এই তরঙ্গ উত্থিত হইবে, তখন বোধ হয়, গ্রহে গ্রহে বিঘর্ষণ হইলে যেমন ভীষণ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা তদ্রূপ ভয়ানক সামাজিক তুফানে দেশ আন্দোলিত করিয়া ঘোর প্রলয় উৎপন্ন করিবে। এপ্রকার সামাজিক বিপ্লব না ঘটিলে,ভারতবর্ষের কখন প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত ধর্ম্মের পথে সহস্র কণ্টক স্থাপিত থাকুক, প্রকৃত সত্যের পথ ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন থাকুক, প্রকৃত ন্যায়ের পথে সহস্র প্রতিবন্ধক থাকুক, সে পথ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইবেই হইবে, এই আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। পৃথিবী বহুকাল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকুক, বহুকাল ধরিয়া পাপকলুষিত ব্যবস্থাবলি তাহাতে প্রভুত্ব করুক, কিন্তু এমত সময় উপস্থিত হইবে, যখন সেই তিমিরাবলি জ্ঞানবিভার ঈষৎ কটাক্ষে ক্রমে তিরোহিত হইতে থাকিবে, যখন ধর্ম্মের জয় এমত উচ্চরবে প্রতিঘোষিত হইবে যে সেই কলঙ্কিত ব্যবস্থাবলি লজ্জায় পলায়ন করিবার পথও পাইবে না। জনসমাজের শত সহস্র লোক কেন কুপথে পদার্পণ করুক না, শতসহস্র লোকে সমবেত হইয়া কেন কোন দূষিত মতের পোষকতা করুক না, কিন্তু সত্য মত যদি পৃথিবীতে একবার ক্ষীণরবেও ধ্বনিত হয়, সে রব ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হইবে। কিছুতেই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। গ্যালিলিও কারাবাসে নিযন্ত্রিত হইল বটে, কিন্তু তদবলম্বিত সত্য মত অপ্রচারিত রহিল না। প্রমাদ বশতঃ জনগণ-মনে করিয়াছিল আমরা স্থির রহিয়াছি, কিন্তু তা বলিয়া পৃথিবীর কিছুতেই গতিরোধ জন্মিলনা। পৃথ্বীবাসিগণের বিরুদ্ধ মত সত্বেও মেদিনী গ্যালিলিওর কথা প্রমাণার্থই যেন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে দৈনন্দিন গতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ডেকার্টের মতাবলি যখন প্রথম প্রচারিত হয়,

তখন নাস্তিক বলিয়া তিনি হলণ্ডে কতই না নিপীড়িত হইয়াছিলেন। ইউট্রেটের সেই পাষণ্ড ভোয়িটস তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। হার্ভি একদা বিদ্রুপের জ্বালায় জ্বালাতন হইলেও জনসমাজ ক্রমশঃ রক্তের চলাচলের সত্যতা উপলব্ধি করিতে লাগিল। বাস্তবিক সত্য যদি একবার পৃথিবীতে ধ্বনিত হয় সে সত্য কখন অপ্রকাশিত থাকিবার নহে। স্ত্রীজাতি যদি এতকাল নিপীড়িত হইয়া থাকে, তাহাদিগের অধিকার যদি পুরুষ-জাতির সহিত বাস্তবিক সমান হয়, তাহারা যদি স্বাধীনতা পাইবার উপযোগিনী হন, আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস এই, তাঁহাদিগের অবস্থা অবশ্য উন্নত হইবে। আজি কেন জনসমাজে বিরুদ্ধমত প্রচলিত থাকুক না, সেমত কখন সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্ম মতের প্রভাবে তিষ্ঠিতে পারিবে না।

ঐ শুন কবিবর ভিক্টর হিউগো কি বলিতেছেন। সে দিন ইউরোপীয় বামাকুল-উন্নতি-সাধিনী সভা তাঁহাকে এক খানি পত্র লেখে। স্ত্রীজাতির সহায়তায় কবিবর যদি তাঁহার লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করেন, যদি তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি জনসাধারণকে তৎপক্ষে উত্তেজিত করেন, এইরূপ অনুরোধ করিয়া উক্ত সভা কবিবরকে যে একখানি পত্র লেখেন তাহার প্রত্যুত্তরে দেখুন ভিক্টর হিউগো কেমন সদ্ভাবসম্পন্ন একখানি প্রতিলিপি প্রেরণ করেন।

"মান্যা মহিলাগণ! আপনাদিগের পত্র পাইয়া আমি আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছি। আপনাদিগের যে সমস্ত উচ্চ অধিকার, যাহার অভাবে আপনারা যথার্থই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। আজি পর্য্যন্ত আমাদিগের সমাজ যেরূপে সংগঠিত হইয়াছে, তাহাতে বাস্তবিক স্ত্রীজাতির অত্যন্ত হীনাবস্থা স্বীকার করিতে হয়। এজন্য আপনাদিগের উন্নতি প্রার্থনা নিশ্চয় যুক্তিসিদ্ধ। আমি যদিও পুরুষ বটে, কিন্তু আপনাদিগের যে সমস্ত ন্যায্য অধিকার তাহা আমি জানি, এবং সেই সমস্ত সামাজিক অধিকার যাহাতে আপনারা প্রাপ্ত হন তৎসাধনে যত্নশীল হওয়া আমার কর্ত্তব্য। অতএব আপনারা আমার সদভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ভালই করিয়াছেন। পুরুষজাতি যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোচ্য বিষয় ছিল, স্ত্রীজাতি তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। এই বিষয় অত্যন্ত গুরুতর। ইহার সিদ্ধান্তের উপর ভবিষ্যতের সমুদায় সামাজিক অবস্থা নির্ভর করিতেছে। ইহাতে একটি প্রকাণ্ড সামাজিক সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। এপ্রকার সংগ্রামে মনুষ্যনামের গৌরব আছে। আমাদিগের সামাজিক অবস্থা কি বিচিত্র! কি অসঙ্গত! বাস্তবিক পুরুষ জাতি, স্ত্রীজাতিরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর

করে। পুরুষ জাতির হৃদয়ের রশ্মি স্ত্রীজাতিরই হস্তে। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থাবলি নারীকুলকে যেন নাবালগ জ্ঞান করে। অক্ষম, সামাজিক-শক্তিবিহীন, রাজকীয়-অধিকার-শূন্য, এমত কি, তাঁহারা কিছুই না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গৃহধামে ও পরিবারমণ্ডলে নারীগণের কর্ত্তৃত্বই অধিকতর, সেখানে তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা। কারণ তাহারাই সন্তান সন্ততির জননী। তাহাদিগেরই হস্তে পারিবারিক শুভাশুভ, ও সুখ দুঃখ সকলই নির্ভর করে। যে ব্যবস্থাবলি সেই সরলা বামাগণকে এত দুর্ব্বলা করিয়াছে সে ব্যবস্থাবলি নিতান্ত দূষিত। নিশ্চয় তাহাদিগের সংস্কার আবশ্যক। এক্ষণে বামাজাতির সামাজিক দুর্ব্বলতা আমাদিগের স্বীকার করা উচিত, এবং সেই দুর্ব্বলতা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাও বিধেয়। প্রকৃত মানুষের এই কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য সাধনে তাহার লাভও আছে। আমি চিরকালই বলিব যে, আপনাদিগের বিষয় এক্ষণে বিচার্য্য এবং সেই বিচারের সিদ্ধান্ত আবশ্যক। যাহাদিগের উপর সকল বিষয়েরই অর্দ্ধেক ভার রহিয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্য সামাজিক সমস্ত অধিকারেরও অর্দ্ধভাগী করা বিধেয়। এ বড় আশ্চর্য্য যে মানব জাতির অর্দ্ধভাগ হীনতর হইয়া রহিয়াছে। সমান অধিকার তাহাদিগকে অর্পণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এ যদি সম্পন্ন হয়, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা হইলে একটি সুমহৎ অনুষ্ঠান হইয়া যাইবে। পুরুষ জাতির অধিকার যেরূপ, স্ত্রীজাতিরও অধিকার তদ্রূপ প্রবলভাবে সুরক্ষিত হউক। সামাজিক ব্যবস্থাবলি যেন দেশকালপাত্র বিবেচনায় নিয়মিত ও সুনীতির অনুমোদিত হয়, এই আমার প্রার্থনা। আপনারা অনুগ্রহ পুরঃসর আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

ইউরোপীয় ইদানীন্তন বামাকুলের অবস্থা, তথাকার সহৃদয় জনগণের সদভিপ্রায়, সময়ের গতি এবং সামাজিক ব্যবস্থাবলির প্রকৃতি, এ সমস্তই এই পত্রিকায় প্রতীত হইতেছে। তাহার সমগ্র পরিচয় দেওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইউরোপে বহুকাল ধরিয়া বামাগণের হীনাবস্থা জনসমাজে অবিদিত ছিল না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই তাহার রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এতকাল ধরিয়া কিসের চেষ্টা হইয়াছে? যাহাতে সেই হীনাবস্থা হইতে বামাগণ উঠিতে না পারেন তাহারই অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। মিল্ প্রভৃতি সুধীগণ যে স্বাধীনতার উচ্চরব উদ্ঘোষিত করিয়াছেন, তাহা সকল সহৃদয় জনগণের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যথন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র দেখা দিয়াছে, সে অগ্নি কখন নির্ব্বাপিত হইবার নহে। অনতিবিলম্বে সেই অগ্নি হইতে ধূমোৎপত্তি হইবে। ধূমোৎপত্তির পর তাহা ক্রমশঃই প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিবে।

সত্যের জয় যদি অখণ্ডনীয়, তবে সে সত্যের গতি প্রতিরোধ করা নির্ব্বোধের কার্য্য। সে দিন বিলাতে রাজকীয় মহাসভায় বামাজাতির "অনুমতি দিবার" ক্ষমতা লইয়া যে ঘোর বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আপাততঃ স্ত্রীজাতির পরাজয় বলিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে মহিলাগণের পক্ষ আরও প্রবলতর প্রভাব ধারণ করিয়াছে। স্রোতঃ প্রতিরুদ্ধ হইলে তাহা দ্বিগুণ বলে ধাবিত হয়। ইহা কার্য্যের স্বাভাবিক গতি, ইহা অনিবার্য্য। এতদ্দেশে স্ত্রীজাতির প্রস্তাব এক্ষণে উত্থাপিত করা অনেকে অসাময়িক বলিবেন বটে, কিন্তু তৎপ্রতিবিরোধে যতই আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তাহাতে বামাগণের পক্ষ বলসঞ্চয় করিবে এই আমাদিগের বিশ্বাস। আমরা জানি আমাদিগের মত সাধারণ মতের বিরোধী। কিন্তু সাধারণমত বহুকাল ধরিয়া একই ভাবে সুস্থির হইয়া রহিয়াছে। সেই মতের একবার সঞ্চালন আবশ্যক। সঞ্চালন হইলে তন্মধ্যে যাহা কিছু দূষিত থাকে, অন্যূন সেই দূষিত অংশ বিদূরিত হইবে। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে এই প্রস্তাবের আন্দোলন করেন এই আমাদের ইচ্ছা। আমরা যদি ভ্রান্ত হই, অবশ্য আমাদিগের ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে, এবং আমাদিগের পূর্ব্বপক্ষ পাষাণের উপর পরিস্থাপিত হইবে।

সামাজিক সকল বিষয় হইতেই আমরা বামাগণকে দূরে রাখিয়াছি। সাধারণ জনগণের মত ও বিশ্বাস এই যে, সমাজের সহিত নারীগণের সম্পর্ক নাই। তাহারা গৃহধামে আবদ্ধা থাকিয়া গৃহকার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিবে। এই মতানুসারে আমাদিগের সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, রমণীগণকে আমরা কখন বাটীর বহির্দ্বারে আসিতে দিই না। তাহাদিগের রক্ষার জন্য নপুংসকের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও ফল কি? বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, যে এক জন রাজার নিকট কোন গুরুতর মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, তিনি অমনি জিজ্ঞাসা করিতেন—ইহার মূলে কোন্ স্ত্রীলোক আছেন, সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের মূলে যে স্ত্রীলোক থাকে, বহুদর্শনে তাঁহার এই সংস্কার জন্মিয়াছিল। স্ত্রীলোক নহিলে কখন কোন ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত, এবং সমাজের শান্তি ভঙ্গ হয় না। স্ত্রীজাতিকে নিতান্ত গোপন করিয়া রাখাই ইহার কারণ। স্ত্রীজাতিও যদি পুরুষের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্থানে প্রকাশ্য ভাবে গমনাগমন করিতে এবং মিশ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা কখন সামাজিক শান্তিভঙ্গের কারণ হইত না। পুরুষের মত তাহাদিগকেও সামান্য জ্ঞান হইত। এক্ষণে রমণীগণ যেমন পুরুষের উপভোগ্য সামগ্রীর ন্যায় বিবেচিত হয়, তাহাদিগের স্বাধীনতা হইলে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তখন পুরুষজাতিও রমণীগণের সমান সম্ভোগ্যরূপে প্রতীয়মান হইবে। তখন সুন্দরী ললনা পরম

দর্শনীয় পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি হইবে না। সুন্দরীর একবার দর্শন পাইবার জন্য লোকে লালায়িত হইবে না। এখন যেমন হস্তগত হইলেই দুর্ব্বলা সুন্দরী সম্ভোগ্যা হয়, তখন তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন সুন্দর পুরুষের ন্যায় সুন্দরী মহিলাও সামান্যা হইবে। তখন মহিলাগণ সাহসিনী ও ধর্ম্মবলে বলবতী হইবে। এখন এক জন পুরুষের প্রতি বল প্রয়োগ করা যেমন কঠিন, তখন স্ত্রীলোকের প্রতিও তদ্রূপ কঠিন হইবে। তখন রমণীগণ কি কায়িক, কি মানসিক উভয়বিধ বলেই বলবতী হইয়া পুরুষের সহিত সমযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। দেশীয় ব্যবস্থাবলি অবশ্য স্বাধীন স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করিবার উপযোগী হইবে। কারণ এক বিষয়ের সংস্কার হইলে সকল বিষয়েরই সংস্কার আবশ্যক হয়।

অবলাগণকে আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছি, এবং তাহাদিগকে আমরা যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, তজ্জন্যই পৃথিবীতে নানা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদিগেরই জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবী শোণিতপাতে ভাসিয়া গিয়াছে। কত রাজবংশ বিধ্বংস হইয়াছে, কত দেশ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। ট্রয় ও লঙ্কার বিধ্বংস হইবার কারণ কি?—সুন্দরীর কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য। সুবিখ্যাত "গোলাপ যুদ্ধকে" কে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল?—মার্গেরেট অব আঞ্জু। ফ্রণ্ডীর যুদ্ধ ঘটনার কারণ কি?—ফরাসি রাজপ্রাসাদে সুন্দরীদ্বয়ের মন্ত্রনা ও কুহকজাল। হোয়াইটহলে প্রথম চার্লসের ফাঁসি হইবার মূলে কে ছিল?—তাঁহার রাজ্ঞী—হেনরায়টা মেরিয়া। প্রকাণ্ড ফরাশি বিদ্রোহের অধিনায়কেরা কাহাকে তাহাদিগের পরম শত্রু বলিয়া স্থির করিয়াছিল?—সুন্দরী রাজ্ঞী মেরায়া এন্‌টনেট। সপ্তবর্ষ ধরিয়া যে প্রকাণ্ড যুদ্ধ ব্যাপারে ইউরোপ রুধিরস্রোতে ভাসিয়া যায়, কাহার অজেয় রিপুর কারণে তাহা সমুত্থিত হয়?—সপ্তদশ লুই নৃপতির বিখ্যাত ব্যভিচারিণী। আর আমরা দৃষ্টান্তের সংখ্যা প্রবৃদ্ধ করিতে চাহি না। আমরা অবলাগণকে যে ভাবে রাখিয়াছি তাহারই ফল ভোগ করিতেছি। সমাজে আমরা তাহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না; কিন্তু তাহারা কেমন্ আমাদিগের দাসত্বশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া আমাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছে এবং অশেষ দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিতেছে।

স্বাধীনতার সহিতই লোকের সাহস ও বল বৃদ্ধি হয়। সাহস ও বলবৃদ্ধির সহিত লোকের গৌরবও বৃদ্ধি হয়। এখন বিবেচ্য এই কোন্ সময়ে স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক। যিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, তিনি স্বাধীনতার প্রকৃতি ও নিয়ম অবগত নহেন। অনেকে মনে করেন, অগ্রে বামাগণের সাহস ও বল চাই, তৎপরে স্বাধীনতা

প্রদান করা উচিত। আমরা ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী। আমরা বলি অগ্রে স্বাধীনতা দেও, তৎপরে স্বাধীনতা রক্ষার বল ও সাহস ক্রমশঃ স্বতই জন্মিয়া উঠিবে। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শিক্ষার স্থল। স্বাধীনতা থাকিলে জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, সাহস ও স্ফূর্ত্তি সকলই জন্মায়। যিনি কখন না স্বাধীন হইয়াছেন, তিনি স্বাধীনতায় কত দূর বল ও সাহস আবশ্যক করে, কিছুই জানেন না। শিশুগণ যখন হাঁটিতে শিখে তখন সহস্রবার নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তবে পদগতি অভ্যাস করে। একদিনে তাহাদিগের পদদ্বয়ের বলসঞ্চার হয় না। শিশুগণের পক্ষে হাঁটিতে শিখা যদ্রূপ, স্বাধীন হইতে শিক্ষা করাও তদ্রূপ। অবলাগণকে স্বাধীন হইতে দিলে তাহারা যে প্রথমে সহস্র বার নিপতিত হইবে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও আমাদিগের স্থিরসিদ্ধান্ত যে, তদ্রূপ সহস্রবার নিপতিত না হইলে কখন তাহারা প্রকৃষ্টরূপে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইবে না, এবং অগ্রে স্বাধীন হইতে না দিলে তাহাদিগের সম্যক্ ধর্ম্মবল ও সাহস সঞ্জাত হইবে না। অনেকে মনে করেন, অগ্রে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মবলে ও সাহসে বলবতী করি, তৎপরে তাহাদিগের অবগুণ্ঠন বিমুক্ত করিয়া দিব। তখন তাহারা সমাজে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন সময় কখনই উপস্থিত হইবে না। গৃহমধ্যে আবদ্ধা থাকিয়া বামাগণ সম্পূর্ণ ধর্ম্মবলে বলবতী হইতে কখনই পারিবে না। বাহিরে না আসিলে তাহারা জানিতে পারিবে না, কি কি আপদ্ তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে। সমাজপথে ভ্রমণ না করিলে কেহ জানিতে পারে না; সে পথে কি প্রকারে পদস্খালন হইবার সম্ভাবনা। পাঁচবার পদস্খালন না হইলে কেহ জানিতে পারিবে না, পথপর্য্যটনে কত সাবধানতা ও বলের আবশ্যক। তবে যদি স্ত্রীজাতির পদস্খালনে কিছু দোষ হয়, তৎপক্ষে আমরা দরিদ্র গোল্ডস্মিথের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিব যে "কখন পতিত না হওয়া মানবের পক্ষে তত গৌরবের বিষয় নহে, কিন্তু যতবার পতিত হইবে ততবার সমুত্থান করাতেই তাহার গৌরব।"

এই বচনে যে সারতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাই মানবপ্রকৃতি-সঙ্গত ও মানবীয় ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম কহে—"মানব, তুমি একেবারে নিষ্পাপী হও" সে ধর্ম্ম মানবের জন্য নহে। তাহা মনুষ্য অপেক্ষা কোন উচ্চতর প্রাণীর উপযোগী হইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। যেহেতু সে ধর্ম্ম মানব কখন পালন করিতে সমর্থ হইবে না। মানব প্রকৃতি কখন একেবারে নিষ্পাপী হইবার নহে। মানব সহস্রবার পাপে পতিত হয়, সহস্রবার পাপ হইতে উত্থিত হয়। যে না উঠিতে পারে তাহারই

অধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই প্রকার ভাব জানিয়া শুনিয়াও আমরা অবলা স্ত্রীজাতির প্রতি বড় কঠিনতর নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহাদিগকে আমরা একেবারে নিষ্পাপী ও নিষ্কলঙ্ক চাই। কি বিষয়ে? —সতীত্ব বিষয়ে। তবে আমরা সতীত্ব কাহাকে বলি তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপূ—

# ভূমিকম্পের উপকারিতা।

প্রবল বাত্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রাঘাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাত সমূহ অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইয়া মনুষ্যের জীবন সম্পত্তি বিনষ্ট করে। মনুষ্য এই সমুদয়ের অত্যাচার নিবারণ করিতে অক্ষম। জ্ঞান প্রভাবে স্ববশে আনিয়া মনুষ্য প্রকৃতিকে কামদুঘা করিতে সমর্থ হইয়াছে, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ একত্র হইয়া নিয়তই মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিতে ব্যাপৃত হইতেছে। জ্ঞানবলে মনুষ্য ভীষণ তরঙ্গ মালা-বিলোড়িত অপার সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক নিজ অভীষ্ট দেশে উপনীত হইতেছে, বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে মনুষ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শত সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী প্রদেশে যাতায়াত করিতেছে, ও নিমেষের মধ্যে এক দেশের সংবাদ দেশান্তরে প্রেরণ করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি মনুষ্যের ক্ষমতা অব্যাহত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। কখনই নহে। প্রকৃতি যখন স্বয়ং প্রকৃতিস্থ তখনই মনুষ্য প্রকৃতির উপর আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ, কিন্তু প্রকৃতি যখন ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন মনুষ্য, ক্ষুদ্র কীটবৎ তাঁহার ভয়ে আত্মরক্ষার্থ দূরে অপসরণ করে। কিন্তু আত্মরক্ষা মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে। প্রকৃতির ইচ্ছা হইলে মনুষ্যের অব্যাহতি, নতুবা বিপত্তি। মৃদুগন্ধ গন্ধবহের মন্দগতি কি মনোহর, ইহা যখন মন্দ মন্দ বহন করিতে থাকে, তখন আমরা সুখাসীন হইয়া আনন্দ অনুভব করি। বায়ু আমাদিগের প্রাণ সঞ্চারের নিদান। কিন্তু এই অসীম মঙ্গলালয় বায়ুও মধ্যে মধ্যে বিষম উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে ত্রাসিত করিয়া থাকে। বায়ুর ন্যায় অগ্নি জল প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থও মধ্যে মধ্যে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্যের প্রাণসংহার করিয়া থাকে। মনুষ্য সহস্র বুদ্ধির প্রভাবেও উহার প্রতিবিধান করিতে পারে না।

এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে

পারে, যে ভূমিকম্প, পবনোন্মাদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতসমূহের কি কিছুমাত্র উপকারিতা আছে? ইহাদের দ্বারা মনুষ্যের কোনপ্রকার ইষ্ট সাধন হয় কি না? স্থূলদৃষ্টির সহিত এই সকল বিষয়ের প্রতি নেত্রপাত করিলে আপাততঃ প্রতীয়মান হইবে যে মনুষ্যজাতির অথবা সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের উচ্ছেদসাধনার্থই এই সকল উৎপাতপরম্পরার আবির্ভাব হয়। যখন লিস্‌বন, কালাও, রাইওবাম্বা প্রভৃতি অসীমসমৃদ্ধিশালী নগর সকল যে যে ভূমিকম্পের অত্যাচারে ধূলিসাৎ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিষয় আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, যখন আমরা স্মরণ করি সিসিলি, এণ্টিয়ক প্রভৃতি প্রাচীন স্থানসমূহ ভূমিকম্পের উৎপাতে উৎসন্ন হইয়াছে, এবং অসংখ্য মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তুসমূহ উহার সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উদরসাৎ হইয়াছে, যখন বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের অগ্নিস্রোতে বিনষ্ট পম্পী নগরীর কথা আমাদের হৃদয়ে উত্থিত হয়, তখন উপরিউক্ত সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই আমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। তখন সহস্র যুক্তি সত্ত্বেও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে ঐ সমস্ত ব্যাপার দ্বারা মনুষ্যজাতির অণুমাত্র উপকার সাধিত হইতে পারে।

পৃথিবীর অপরিসীম বৃহদাকারের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, অত্যল্পমাত্র স্থানব্যাপী ভূমিকম্পকে অতিঅকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে; কিন্তু এই যৎসামান্য ব্যাপার হইতেই এক এক বৃহৎ দেশ, শত সহস্র জনাকীর্ণ প্রধান নগরী, অসংখ্য জীবজন্তু ও অপরিমেয় ধনরাশি রসাতলে বিলীন হইয়াছে। অতএব অল্পমাত্রস্থানব্যাপী হইলেও এরূপ সংহারমূর্ত্তিকে কি প্রকারে সামান্য ঘটনা বলা যাইতে পারে? পক্ষান্তরে এই সামান্য ব্যাপার দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয়, যে মনুষ্য অতিমাত্র অকিঞ্চিৎকর পদার্থ! প্রকৃতি যখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজ শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক মনুষ্যের দৃঢ়বদ্ধমূল অট্টালিকাসমূহকে ধূলিসাৎ করিতে থাকেন, মনুষ্য হয় ত ঐ অট্টালিকাসমূহের সহিত নিজেও ধূলিসাৎ হইয়া যায়, নতুবা যদি কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও কম্পান্বিত কলেবরে ও ম্লানমুখে প্রকৃতির সংহারকার্য্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি পূর্ব্বক চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করে। বাঙনিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করিতে সাহসী হয় না। এরূপ ভীষণাকৃত যমদূতদিগকে মনুষ্যের উপকারক পদার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হইলে আপাততঃ উন্মত্তপ্রলাপবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে পর্য্যবসানে অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে যতই কেন অপকারক হউক না, ভীষণ ভূমিকম্পও মনুষ্যের সুমহৎ উপকার সাধন করিয়া থাকে, এমন কি ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবী আবহমানকাল অবধি সমভাবে রক্ষিত হইয়া মনুষ্যকে আশ্রয়প্রদানপূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যদি সৃষ্টির

সময় হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত একবারও ভূমিকম্প না হইত, তাহা হইলে এতদিন পৃথিবীতে মনুষ্যের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত, যদি ভবিষ্যতে আর কখন ভূমিকম্প না হয়, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যে সমগ্র ভূভাগ যাবতীয় জীবজন্তু সমূহের সহিত রসাতলে বিলীন হইয়া যাইবে।

বহুকাল পূর্ব্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠ একমাত্র অনন্ত জলরাশিতে আবৃত ছিল, পৃথিবীর গোলাকার মৃত্তিকাভাগ সেই অসীম জলরাশির নিম্নে নিলীন ছিল, অনেক বিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। যদি এই অনুমান প্রকৃত তথ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বতই এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে যদি সমস্ত পৃথিবী একমাত্র অবিচ্ছিন্ন জলরাশিতে আবৃত ছিল, তাহা হইলে কি প্রকারে অধঃস্থ ভূভাগ জলরাশির উপর উত্থিত হইল, আর কি প্রকারেই মহাদেশ দেশ, উপদ্বীপ, দ্বীপ প্রভৃতি জীবজন্তুর আবাসভূমি স্বরূপ ভূভাগের সৃষ্টি বা উত্থান হইল? অসীম সাগরজলের হ্রাস হওয়াতে পৃথিবীর উদ্ধার হইয়াছে এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ সমুদ্রজলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উহা নিয়তই একভাবে অবস্থিত। আর যদিই বা হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সমভাবে সর্ব্বত্র হ্রাস হইলে পৃথিবী যেরূপ জলের নীচে তাহাই থাকিয়া যায়। আমার বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত আবশ্যকমত স্থানের জল কমিয়া গেল, বা স্থানান্তরে সরিয়া গেল, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। জগদীশ্বর বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রলয়পয়োধিজলবিলীনা বসুমতীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারি না। ফলে ঈশ্বরেচ্ছায় পৃথিবীর উদ্ধার সাধন হইয়াছে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এক ঈশ্বরেচ্ছার উপর দোহাই দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সৃষ্ট বা ঈশ্বরের সমসাময়িক জড়পদার্থের আভ্যন্তরিক শক্তি আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অধুনাতন কালে যেরূপ ভূগর্ভের আন্তরিক শক্তি প্রভাবে ভূমিকম্প হইয়া থাকে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা, সেইরূপ সৃষ্টির শৈশবাবস্থাতেও ভূগর্ভের আন্তরিক শক্তির প্রভাবে অগাধসাগরবারি অপসারিত করিয়া ভূমির উত্থান হইয়াছিল এইরূপ নির্দ্দেশ করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

সে যাহাই হউক, ঈশ্বরেচ্ছা বা পৃথিবীর আন্তরিক শক্তি এই উভয়ের যে কোনটীর প্রভাবেই পৃথিবীর অভ্যুত্থান হউক না কেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে সাগরের বক্ষঃস্থলে একবার মৃত্তিকার অভ্যুত্থান হইয়া মহাদেশ দ্বীপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইবার পর অবধি প্রকৃতির সংহারিকা শক্তি ও

পারে, যে ভূমিকম্প, পবনোন্মাদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতসমূহের কি কিছুমাত্র উপকারিতা আছে? ইহাদের দ্বারা মনুষ্যের কোনপ্রকার ইষ্ট সাধন হয় কি না? স্থূলদৃষ্টির সহিত এই সকল বিষয়ের প্রতি নেত্রপাত করিলে আপাততঃ প্রতীয়মান হইবে যে মনুষ্যজাতির অথবা সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের উচ্ছেদসাধনার্থই এই সকল উৎপাতপরম্পরার আবির্ভাব হয়। যখন লিস্‌বন, কালাও, রাইওবাম্বা প্রভৃতি অসীমসমৃদ্ধিশালী নগর সকল যে যে ভূমিকম্পের অত্যাচারে ধূলিসাৎ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিষয় আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, যখন আমরা স্মরণ করি সিসিলি, এণ্টিয়ক প্রভৃতি প্রাচীন স্থানসমূহ ভূমিকম্পের উৎপাতে উৎসন্ন হইয়াছে, এবং অসংখ্য মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তুসমূহ উহার সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উদরসাৎ হইয়াছে, যখন বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের অগ্নিস্রোতে বিনষ্ট পম্পী নগরীর কথা আমাদের হৃদয়ে উত্থিত হয়, তখন উপরিউক্ত সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই আমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। তখন সহস্র যুক্তি সত্বেও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে ঐ সমস্ত ব্যাপার দ্বারা মনুষ্যজাতির অণুমাত্র উপকার সাধিত হইতে পারে। পৃথিবীর অপরিসীম বৃহদাকারের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, অত্যল্পমাত্র স্থানব্যাপী ভূমিকম্পকে অতিঅকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে; কিন্তু এই যৎসামান্য ব্যাপার হইতেই এক এক বৃহৎ দেশ, শত সহস্র জনাকীর্ণ প্রধান নগরী, অসংখ্য জীবজন্তু ও অপরিমেয় ধনরাশি রসাতলে বিলীন হইয়াছে। অতএব অল্পমাত্রস্থানব্যাপী হইলেও এরূপ সংহারমূর্ত্তিকে কি প্রকারে সামান্য ঘটনা বলা যাইতে পারে? পক্ষান্তরে এই সামান্য ব্যাপার দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয়, যে মনুষ্য অতিমাত্র অকিঞ্চিৎকর পদার্থ! প্রকৃতি যখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজ শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক মনুষ্যের দৃঢ়বদ্ধমূল অট্টালিকাসমূহকে ধূলিসাৎ করিতে থাকেন, মনুষ্য হয় ত ঐ অট্টালিকাসমূহের সহিত নিজেও ধূলিসাৎ হইয়া যায়, নতুবা যদি কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও কম্পান্বিত কলেবরে ও ম্লানমুখে প্রকৃতির সংহারকার্য্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি পূর্ব্বক চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করে। বাঙনিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করিতে সাহসী হয় না। এরূপ ভীষণাকৃত যমদূতদিগকে মনুষ্যের উপকারক পদার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হইলে আপাততঃ উন্মত্তপ্রলাপবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে পর্য্যবসানে অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে যতই কেন অপকারক হউক না, ভীষণ ভূমিকম্পও মনুষ্যের সুমহৎ উপকার সাধন করিয়া থাকে, এমন কি ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবী আবহমানকাল অবধি সমভাবে রক্ষিত হইয়া মনুষ্যকে আশ্রয়প্রদানপূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যদি সৃষ্টির

সময় হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত একবারও ভূমিকম্প না হইত, তাহা হইলে এতদিন পৃথিবীতে মনুষ্যের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত, যদি ভবিষ্যতে আর কখন ভূমিকম্প না হয়, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যে সমগ্র ভূভাগ যাবতীয় জীবজন্তু সমূহের সহিত রসাতলে বিলীন হইয়া যাইবে।

বহুকাল পূর্ব্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠ একমাত্র অনন্ত জলরাশিতে আবৃত ছিল, পৃথিবীর গোলাকার মৃত্তিকাভাগ সেই অসীম জলরাশির নিম্নে নিলীন ছিল, অনেক বিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। যদি এই অনুমান প্রকৃত তথ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বতই এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে যদি সমস্ত পৃথিবী একমাত্র অবিচ্ছিন্ন জলরাশিতে আবৃত ছিল, তাহা হইলে কি প্রকারে অধঃস্থ ভূভাগ জলরাশির উপর উত্থিত হইল, আর কি প্রকারেই মহাদেশ দেশ, উপদ্বীপ, দ্বীপ প্রভৃতি জীবজন্তুর আবাসভূমি স্বরূপ ভূভাগের সৃষ্টি বা উত্থান হইল? অসীম সাগরজলের হ্রাস হওয়াতে পৃথিবীর উদ্ধার হইয়াছে এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ সমুদ্রজলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উহা নিয়তই একভাবে অবস্থিত। আর যদিই বা হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সমভাবে সর্ব্বত্র হ্রাস হইলে পৃথিবী যেরূপ জলের নীচে তাহাই থাকিয়া যায়। আমার বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত আবশ্যকমত স্থানের জল কমিয়া গেল, বা স্থানান্তরে সরিয়া গেল, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। জগদীশ্বর বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রলয়পয়োধিজলবিলীনা বসুমতীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারি না। ফলে ঈশ্বরেচ্ছায় পৃথিবীর উদ্ধার সাধন হইয়াছে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এক ঈশ্বরেচ্ছার উপর দোহাই দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সৃষ্ট বা ঈশ্বরের সমসাময়িক জড়পদার্থের আভ্যন্তরিক শক্তি আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অধুনাতন কালে যেরূপ ভূগর্ব্ভের আন্তরিক শক্তি প্রভাবে ভূমিকম্প হইয়া থাকে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা, সেইরূপ সৃষ্টির শৈশবাবস্থাতেও ভূগর্ব্ভের আন্তরিক শক্তির প্রভাবে অগাধসাগরবারি অপসারিত করিয়া ভূমির উত্থান হইয়াছিল এইরূপ নির্দ্দেশ করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

সে যাহাই হউক, ঈশ্বরেচ্ছা বা পৃথিবীর আন্তরিক শক্তি এই উভয়ের যে কোনটীর প্রভাবেই পৃথিবীর অভ্যুত্থান হউক না কেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে সাগরের বক্ষঃস্থলে একবার মৃত্তিকার অভ্যুত্থান হইয়া মহাদেশ দ্বীপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইবার পর অবধি প্রকৃতির সংহারিকা শক্তি ও

নষ্টোদ্ধারিকা পুনঃসংস্থাপিকা শক্তির পরস্পর অবিশ্রান্ত বিবাদ হইতে আরম্ভ হয়।

জল ভূমির পরম শত্রু। জলের উপদ্রবে নিয়তই ভূমির ক্ষয় হইয়া থাকে। দুই প্রকারে জলের শক্তি দ্বারা ভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সমুদ্রের জল নিয়তই চঞ্চল। এই জল সর্ব্বদাই প্রবলবেগে বা নিঃশব্দে ভূমির উপকূলভাগে আঘাত করিয়া থাকে। এই আঘাত দ্বারা মৃত্তিকারাশি অনবরত ধৌত হইয়া সাগরগর্ভে বিলীন হয় ও ভূভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু এই প্রকারে ভূমির যে ক্ষতি হয় তাহা অতি মন্দ গতিতে হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা হইতে অনেক কালেও অত্যল্পমাত্র ক্ষতি হইয়া থাকে। উহা দ্বারা অত্যল্প মাত্র ক্ষয় না হইলে মহাদেশ দ্বীপ প্রভৃতির অবশ্যই আকার পরিবর্ত্ত হইতে দেখা যাইত, কিন্তু তাহা কখনই হয় না। সমুদ্রতরঙ্গের অভিঘাত প্রতিঘাত দ্বারা কি পরিমাণে ভূমির ক্ষয় হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কারণ যেরূপ অনুক্ষণ ক্ষয় হইতেছে, সেইরূপ অনুক্ষণই আবার প্রকৃতির নষ্টোদ্ধারিকা শক্তির অবিরত কার্য্যবশতঃ উক্ত ক্ষতির পূরণ হইতেছে, সুতরাং সমুদ্রের বেলাতিক্রম দ্বারা বহুল পরিমাণে ক্ষতি হইলেও উহা বুঝিয়া উঠা যায় না। তবে এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে ক্ষতির পরিমাণও যেরূপ প্রভূত, বৃদ্ধির পরিমাণও তদনুরূপ, নতুবা বৃদ্ধি না হইয়া অনবরত কেবল ক্ষতি হইতে থাকিলে ভূভাগ অল্পকালের মধ্যেই একবারে বিনষ্ট হইতে পারিত।

কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সমুদ্রতরঙ্গের উৎপাতে ভূমির যেরূপ ক্ষয় হইয়া থাকে তাহা সপ্রমাণ করা যাইতেছে। এসকল স্থলে অবশ্যই ক্ষতির সহিত বৃদ্ধিও হইয়াছে, কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে, যে বৃদ্ধি না হইয়া অনবরত ক্ষতি হইতে থাকিলে অল্পকালের মধ্যেই কি ভয়ানক ব্যাপার সম্পাদিত হইত?

সেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপশ্রেণী কঠিন প্রস্তরময় উপকরণে নির্ম্মিত, সেই সকল উপকরণ জলের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার পদার্থ নহে। কিন্তু সাগরতরঙ্গের এরূপ অভাবনীয় সংহারিকা শক্তি যে এতাদৃশ কঠিন পদার্থময় দ্বীপের উপরিও অতি অদ্ভুতরূপে আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। সার চার্লস লাইয়েল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে অ্যাটলাণ্টিক মহসাগরের প্রবল তরঙ্গে এবম্বিধ দ্বীপের উপকূল-অবস্থিত গিরিশৃঙ্গস্থানে সুগভীর গহ্বর নির্ম্মিত হইয়াছে, আর মধ্যে মধ্যে বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড সকল দূরে অপসারিত হইয়া সমুদ্রের অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে। ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলেও স্থানে স্থানে সমুদ্রতরঙ্গের এরূপ ভয়াবহ উপদ্রব, যে

প্রাচীনকালের অনেক প্রসিদ্ধ স্থান এক্ষণে সাগরগর্ভে নিহিত হইয়া নাম-শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের বঙ্গ-দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পদ্মা-নদীর উপদ্রবে অনেক সমৃদ্ধস্থান বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা অনেকেই অবগত আছেন, আবার বঙ্গসাগরের অত্যাচারে এক্ষণে সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে, এরূপ অবস্থা চিরস্থায়ী হইলে আমাদের দেশেরই বা কিরূপ দুর্দ্দশা হইবে তাহাও বলিতে পারা যায় না। উপরি-উল্লিখিত উদাহরণ গুলির বিষয় বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে এই সংহার কার্য্য কোন বিশেষ দেশ বা ভূভাগে নিয়মিত নহে, প্রত্যুত উহা এই বিশাল পৃথিবীর সকল স্থানেই সমানরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সমুদ্রতরঙ্গে পৃথিবীর যে পরিমাণ অংশ ধৌত হইয়া পৃথগ্‌ভূত হয়, উহার অতি সামান্য অংশ পুনর্ব্বার একত্র হইয়া চররূপে পরিণত হইয়া যৎ-কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু অধিকাংশই অপুনরা-বৃত্তির জন্য সাগরের অতলস্পর্শ গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। উক্তরূপ চরের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি সাগরের অতিশয় সংহারকতার স্বাক্ষীস্বরূপ। কারণ যতই মাতৃভূমির অধিকতর ক্ষয় সাধিত হয় ততই উক্তরূপ ক্ষুদ্র বা ভাসমান চরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব এক স্থান হইতে অপসারিত মৃত্তিকা স্থানান্তরে অপসারিত হইয়া যদিও বহুকাল পরে নূতন ভূভাগ সমুৎপন্ন করে, তথাপি উহা যে এক ভূভা-গের স্থানান্তরে অপসরণ মাত্র প্রকৃত বৃদ্ধি নহে তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। যদি সমুদ্রের সংহার কার্য্য কোন গুরুতর শক্তির দ্বারা প্রতিহত না হইয়া অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিত তাহা হইলে উল্লিখিত প্রকার চরের উৎপত্তি সত্ত্বেও পৃথিবী সাগরের জলরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যাইত, ক্রমে চর উৎ-পন্ন হওয়া রহিত হইত ও আবার বরাহ অবতারের আবির্ভাব ব্যতীত পৃথিবীর পুনরুদ্ধার সাধিত হওয়া দুর্ঘট বা অস-ম্ভাবনীয় হইয়া উঠিত।

কিন্তু সাগরতরঙ্গ দ্বারা পৃথিবীর যে ক্ষতি হয় উহা কেবল সমুদ্রের উপকূলেই সংঘটিত হইয়া থাকে, উপকূল ব্যতীত ভূমির মধ্যভাগে সাগরতরঙ্গ-জনিত ক্ষতির নাম মাত্র নাই, কিন্তু তত্তৎস্থলে কি ভূভাগের ক্ষতি হয় না? নিরন্তরই হইয়া থাকে। মহাদেশ প্রভৃতি স্থল-ভাগের মধ্যে যেখানে সমুদ্রতরঙ্গের প্রসর নাই তথায়ও নিয়তই ভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে যে বৃষ্টির জল দ্বারা ভূমির বিশিষ্ট-রূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, ফলেও বৃষ্টির জল দ্বারা যে কয় প্রকারে স্থলভাগের ক্ষয় সাধিত হয়, তাহা এতাদৃশ মন্দ গতিতে হইয়া থাকে, যে হটাৎ উহা হইতে যে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে মনে এরূপ আশঙ্কা হয় না। কিন্তু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে

অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, যে বৃষ্টির জল দ্বারা ভূমির যেরূপ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হয়, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা দ্বারাও তাদৃশ ক্ষতি হইতে পারে না। ফলতঃ ভূবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা ভূমিক্ষয়ের যাবতীয় কারণের মধ্যে নিয়ত সাগরাভিমুখে ধাবমান বৃষ্টির জলকে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃষ্টির জল নদী উপনদী প্রভৃতি নানাবিধ পথে সমুদ্রের অভিমুখে ধাবমান হয়, আবার সূর্য্যের উত্তাপে মেঘাকারে আকাশে উত্থিত হইয়া বায়ুর প্রভাবে নানা দেশ দেশান্তরে বিকীর্ণ হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। এইরূপ প্রক্রিয়া অবিশ্রান্ত চলিতেছে। সুতরাং সমুদ্রের জল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পৃথিবীর উপকূলাবচ্ছিন্ন অংশকে ও পরম্পরা সম্বন্ধে অন্যান্য যাবতীয় অংশকে নিয়তই ক্ষীণ করিতেছে। অনেকানেক বৃহৎ নদীর মুখে অর্থাৎ সাগরসঙ্গম স্থলে দ্বীপ সংঘটিত হইতে দেখা যায়। এই সকল দ্বীপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া কালে বৃহৎ দেশ ও জনপদ স্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সমুদয় বঙ্গদেশ এই প্রকারেই উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। সার চার্লস লাইয়েল একবার স্পেন দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় ক্যাটালোনিয়া নামক একটী প্রদেশের অধিকাংশই বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া সাগরে পতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে যে মহাদেশের উপকূলভাগে সমুদ্রের উপদ্রব ও দেশের অভ্যন্তর ভাগে বৃষ্টির নিয়ত উপদ্রব হেতুক পৃথিবীর এরূপ ক্ষয় হইতেছে, যে উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রতিরোধক শক্তির কার্য্য না থাকিলে উহাদের সংহারিকা শক্তির দিন দিন বৃদ্ধি হইতে পারে, উপকূলের ক্রমিক বিধ্বংস দ্বারা সমুদ্র ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারে, আর সমুদ্রের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইলেই আবার সমুদ্রের প্রতি সূর্য্যের আকর্ষণেরও বৃদ্ধি হইয়া বৃষ্টিরও পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে; সুতরাং উভয় শক্তিই অন্যোন্যের সাহায্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইয়া কালক্রমে সমুদায় ভূভাগকে গ্রাস করিতে পারে। বিজ্ঞানবিশারদ সার জন হর্শেল বলিয়াছিলেন, যে যদি পৃথিবী সৃষ্টির সময় যেরূপ আকারের নির্ম্মিত হইয়াছিল, কালক্রমে উহার কোন প্রকার পরিবর্ত্ত না হইয়া উহার আকার অব্যাহতই থাকিত, তাহা হইলে এত দিনে এত সংহারিকা শক্তির কার্য্য বশতঃ সমগ্র ভূভাগের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান থাকিতে পারিত না।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে এতাদৃশ নিয়ত কার্য্যতৎপর সংহারিকা শক্তির প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত নষ্টোদ্ধারিকা শক্তির কতদূর আবশ্যকতা? ফলতঃ ক্ষতির সহিত বৃদ্ধি যুগপৎ কার্য্যতৎপর না থাকিলে পৃথিবী বিলুপ্ত হইতে অধিক বিলম্ব লাগে না। ভূমিকম্প এই অবিশ্রান্ত ক্ষয় রোগের ঔষধ স্বরূপ। ভূমিকম্প দ্বারাই এই সমগ্র পৃথিবী জলজনিত ক্ষয়ের

হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে। ভূমি না থাকিলে পৃথিবী কোন প্রকারেই তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ ভূমিকম্প দ্বারা আমাদিগের অধিকতর উপকার না অধিকতর অপকার সাধিত হইয়া থাকে। এই মহোপকারের সহিত একত্র বিবেচনা করিলে ভূমিকম্পজনিত সমুদায় উপদ্রবই অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি হইবে। সমুদ্র ও বর্ষার জলে পৃথিবীর ক্ষয় হইয়া উহার মৃণ্ময় ভাগ বিশুদ্ধ গোলত্ব প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হয়, অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে সমানরূপ ক্ষয় হওয়াতে গোলাকার পৃথিবী বিশুদ্ধ গোলাকারে পরিণত হইতে থাকে, ফলতঃ এইরূপ বিশুদ্ধ গোলাকারে পরিণত করিবার উদ্যোগেই জলরাশির নিরন্তর চেষ্টা। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে প্রতিরোধক শক্তি দ্বারা উক্ত সংহারিকা শক্তির কার্য্যবিপর্য্যয় হইবে, তাহার এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তাহার কার্য্য বশতঃ ভূপৃষ্ঠ সর্ব্বদাই উচ্চনীচ হইতে থাকে, অর্থাৎ ভূভাগ এক স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিবে, আর অন্যান্য স্থান সমুদ্রের অতলস্পর্শ তল অপেক্ষা নিম্নে নামিয়া যাইবে। এরূপ হইলেই ক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংহারিকা শক্তির প্রকৃত প্রশ্রয় রোধ হইতে পারিবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূভাগের অধিকতর ঔন্নত্য যেরূপ আবশ্যক, বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে সমুদ্রতল অপেক্ষা ভূমির অধোগতিও স্থষ্টির ক্ষয় পক্ষে তদপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয় নহে। কারণ প্রথমোক্ত উপায়ে পৃথিবীর রক্ষা হয় বটে, কিন্তু শেযোক্ত নিয়মেও সমুদ্রের জলভাগেরও অধোগতি হওয়াতে অবিকল সেই প্রকারেই পৃথিবীর রক্ষা হইয়া থাকে।

এক্ষণে ভূমিকম্প দ্বারা আমাদিগের কি মহোপকার সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে। জলের সংহারকার্য্যের প্রতিরোধার্থ স্থলভাগের কোন অংশের উন্নত হওয়া ও কোন কোন অংশের নিম্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ইহা নির্ব্বিবাদে সপ্রমাণ হইয়াছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তির প্রভাবে ভূমিকম্প হইয়া ঐ ভূমিকম্প দ্বারা উল্লিখিত উভয় কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির কি অদ্ভুত নিয়ম, পৃথিবীর যে অংশে সমুদ্রের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অধিক তত্তৎস্থানে ভূমিকম্পও অধিক পরিমাণে হইতে দেখা যায়। প্রায় সমুদয় আগ্নেয় গিরিই সমুদ্রের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত। এই সকল আগ্নেয় পর্ব্বতের কার্য্য দ্বারা সমুদ্রের উৎপাত হইতে ভূভাগ সর্ব্বদাই সংরক্ষিত হইতেছে, আবার ভূমিকম্পের কার্য্যপরম্পরার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই প্রতীতি হইবে যে সমুদ্রের অধস্থ ভূভাগই প্রায় ভূমিকম্পের কার্য্য বশতঃ নিম্নতর হইয়া পড়ে, সুতরাং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলও নিম্নে পড়িয়া যায় ও উচ্চতর ভূভাগকে সহসা

আক্রমণ করিতে পারে না। আবার ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে যে যে স্থানে ভূমিকম্প হইয়া থাকে তথায় প্রায়ই ভূপৃষ্ঠ পূর্ব্বতন অবস্থা হইতে অধিকতর উন্নত হইয়া উঠে। এক স্থান উন্নত হইলে অপর স্থান অবশ্যই সমতা রক্ষার জন্য অবনত হইবে ইহা নিশ্চয়ই বটে, কিন্তু উন্নতি ও অবনতির যুগবৎ হওয়া বা এক স্থানেই হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয় না। ফলতঃ প্রকৃতির অদ্ভুদ নিয়মে এক স্থানে উন্নতি ও স্থানান্তরে অবনতি হইয়াই সাধারণতঃ ভূভাগ-পরিমাণের সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে প্রায়ই আগ্নেয়-গিরি নাই, কিন্তু ঐ সকল স্থানেও ভূমিকম্পদ্বারা আবশ্যকমত ভূপৃষ্ঠের ঔন্নত্য সাধিত হয়, তবে আগ্নেয়গিরি থাকিলে অধিকের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে, যে সকল স্থানে আগ্নেয়গিরি নাই, তথায় অগ্ন্যুৎপাত হয় না এইমাত্র প্রভেদ; নতুবা কার্য্য উভয়ত্রই সমানরূপে সাধিত হয়। এতাবতা ভূমিকম্পের উপকারিতার বিষয় এক প্রকার সপ্রমাণ হইল। এক্ষণে কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগের প্রস্তাব শেষ করিতেছি। খৃ ১৮২২ অব্দে আমেরিকার অন্তর্গত চিলি দেশে একটী ভয়ানক ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। উক্ত ঘটনা হইবার পরদিন দৃষ্ট হইল যে ঘটনাস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উভয়দিকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ পর্য্যন্ত উপকূলের সন্নিহিত সমুদ্রের জল দূরে অপসৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দেশের অভ্যন্তর ও ভূপৃষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৩৫ ও ১৮৩৭ খৃ চিলি প্রদেশে পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হয়। এই দুই ভূমিকম্প দ্বারা সমুদয় প্রদেশ ছয় সাত হাত উচ্চ হইয়া উঠে।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের সন্নিহিত কচ্ছ দেশে একটী ভূমিকম্প হয়। উহাতে ভূপৃষ্ঠের উন্নতি ও অবনতি উভয় সাধিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে সিন্ধু নদীর মুখে বালুকা জমিয়া নৌকা যাতায়াত এক প্রকার রহিত হইয়াছিল। তথায় জোয়ারের সময় চারি হাত ও ভাটার সময় এক হাত মাত্র জল থাকিত। কিন্তু উক্ত ভূমিকম্প হইবার পরই উক্ত স্থান এতদূর গভীর হইয়া যায়, যে ভাটার সময় তথায় ১২ হাত জল দৃষ্ট হয়। সিন্দ্রী নামক স্থানের সন্নিহিত এক খানি গ্রাম ও তত্রত্য দুর্গ সমুদয়ই জলের নীচে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিও চমৎকারজনক রূপে হইয়াছিল। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই তত্রত্য লোকের সিন্দ্রীর অনতিদূরে প্রায় ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ ও গড়ে ৮ ক্রোশ প্রশস্ত একটী উচ্চ স্থান নিরীক্ষণ করে। তথাকার অধিবাসীরা উহার "আল্লাবাঁধ" অর্থাৎ ঈশ্বর-বিনির্ম্মিত বাঁধ এই নাম রাখে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে উক্ত ভূমিকম্প দ্বারা যে স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা গভীর হওয়া

আবশ্যক তাহা হইয়াছিল। তথায় যে স্থান উন্নত হওয়া প্রয়োজনীয় তাহাও হইয়াছিল, কারণ ঐ আল্লাবাঁধ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে সমুদ্রের উপদ্রবে সন্নিহিত স্থান গুলি নিয়তই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছিল, এক্ষণে তাহার নিবৃত্তি হইল।

# জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত

## ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

যে রমণী বিংশতি বৎসর পরে মিলের গৃহ-লক্ষ্মী হইতে সম্মত হন, এবং যে রমণীর সাহায্য ব্যতিরেকে মিল্ জগতের চিন্তা-সাগরে নূতন তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারিতেন না, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেই রমণীর সহিত মিলের প্রথম পরিচয় হয়। এই সময়ে মিলের বয়স পঞ্চবিংশতি এবং সেই রমণীর বয়স ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছিল। এই রমণীর স্বামীর নাম মিষ্টার টেলর। টেলরের সহিত মিলের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। মিল্ বাল্যকালে কখন কখন তাঁহাদিগের বাটীতে ক্রীড়া করিতে যাইতেন। সেই সময়ে টেলরের সহিত তাঁহার বাল্যসুলভ সৌহার্দ্দ জন্মে। এই বাল্যসৌহার্দ্দের অনুরোধেই টেল্‌র্ তাঁহাকে স্বীয় পত্নীর নিকট পরিচিত করিয়া দেন। টেলর স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে মিল্ ও তাঁহার পত্নী—ইহাঁদিগের পরস্পরের মধ্যে এই সময় যে পরিচয় জন্মিল, এই পরিচয় তাঁহার জীবদ্দশাতেই গাঢ়তর প্রণয়ে, এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, বিবাহে পরিণত হইবে। যদিও মিল্ ও টেলর-পত্নীর আত্মীয়তা সর্ব্বপ্রথমে তত ঘনীভূত হয় নাই, তথাপি প্রথম দর্শনাবধি টেলর-পত্নী মিলের হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া উঠিলেন। টেলর-পত্নী পরিণত-বয়সে বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণে যেরূপ বিভূষিতা হইয়াছিলেন এই নবীন বয়সে তাঁহাতে সে সকলের অঙ্কুরমাত্র দেখা গিয়াছিল। বয়সের পরিণতির সহিত তাঁহার মানসিক বৃত্তি-সকল দিন দিন বিকশিত হইতে লাগিল। দিনমণির কিরণে নলিন যেন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। যে সকল কমনীয় গুণে স্ত্রীজাতি জগতে বিখ্যাত এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেই সকল গুণেরই বিশেষ পরিণতি হইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে মিলের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার প্রতি-ফলনে, যে সকল উর্জ্জস্বলগুণে পুরুষজাতি জগতে বিখ্যাত, তাঁহাতে সে সকল গুণেরও পরিণতি হইতে লাগিল। আত্মীয়গণ যেমন তাঁহার গভীর ও প্রবল

হৃদয়ভাব, অন্তর্ব্বোধকারিণী স্বাভাবিক বুদ্ধি, এবং চিন্তাশীল ও কবিত্বপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হইতেন; বাহিরের লোক তেমনই—তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইত। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী—সত্যনিষ্ঠ, সাহসী, নিষ্কলঙ্ক স্বাধীনমতাবলম্বী এবং সুশিক্ষিত ছিলেন। যদিও তাঁহার উপর তাঁহার স্বামীর প্রেম চিরকাল অবিচলিত ছিল, যদিও তিনিও চিরকাল সমভাবে স্বামীকে ভক্তি করিতেন ও ভাল বাসিতেন, তথাপি তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও সজীব সহৃদয়তায় স্বামী তাঁহার ন্যূন হওয়ায় তাঁহার প্রকৃত সহচর হইতে পারেন নাই। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায় তাঁহার উচ্চ বৃত্তি সকল কার্য্যে পরিণত হইয়া বিকাশ পাইতে পারিতনা, সুতরাং তাঁহার জীবন সতত ধ্যানমগ্ন থাকিত, কেবল কতিপয় বন্ধুর সমাগমে সেই-ধ্যান মধ্যে মধ্যে ভগ্ন হইত। মিল তাঁহার সেই-কতিপয় বন্ধুর অন্যতম ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি সমাজের অনেক চিররূঢ় কুপ্রথার বিরুদ্ধে সতত অসন্দিগ্ধভাবে স্বাভিমত ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও স্বভাবাদি অনেক পরিমাণে কবিবর সেলির ন্যায় ছিল। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ উদ্দীপিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় সেলিকে একটী বালক বলিলেও অসঙ্গত হয় না। উচ্চ চিন্তা বিষয়ে ও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পদার্থনিচয়ের অন্তর্ব্বোধ করিতে পারিত। কার্য্যকরণে তাঁহার যেমন ক্ষিপ্রকারিতা তেমনই সুদক্ষতা ছিল। তাঁহার কল্পনা ও অনুভূতি এত তেজস্বিনী ছিল, যে তিনি শিল্প বিদ্যায় অভিনিবিষ্ট হইলে অসাধারণ শিল্পী হইতে পারিতেন। তাঁহার মনের এরূপ তেজস্বিতা ও কোমলতা ছিল এবং তাঁহার বক্তৃতা শক্তি এতদূর বলবতী ছিল, যে তিনি বক্তৃতা বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইলে অদ্বিতীয় বাগ্মী হইতে পারিতেন। তিনি মনুষ্যপ্রকৃতি এত গভীররূপে বুঝিতে পারিতেন এবং মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল, যে স্ত্রীজাতির রাজ্যের শাসনকার্য্যে কোন অধিকার থাকিলে, তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ ভাব তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক মনুষ্যপ্রেম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, কর্ত্তব্যাবলীর উপদেশের ফল ছিল না। তাঁহার পরদুঃখানুভাবকতা শক্তি এতদূর বলবতী ছিল, তাঁহার কল্পনা এরূপ তেজস্বিনী ছিল, যে তিনি অনেক সময় পরের দুঃখে অধিকতর বর্ণবিন্যাস করিয়া বদান্যতা ও সহানুভূতির সীমা অতিক্রম করিতেন। তাঁহার ন্যায়পরতা বদান্যতা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাঁহার সহৃদয়তা এতদূর বলবতী ছিল যে, যে কেহ তাঁহার

ভালবাসা প্রত্যর্পণ করিতে পারিত, তাহার উপরই তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তিনি স্বভাবতঃ নম্র ছিলেন বটে, কিন্তু অহঙ্কার প্রদর্শনের স্থল উপস্থিত হইলে অহঙ্কার প্রদর্শন কবিতেও ক্রুটী করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সরলা ও বিলাসবিবর্জ্জিতা ছিলেন। নীচতা ও ভীরুতার উপর তাঁহার স্বাভাবিকী ঘৃণা এবং নৃশংস বা অত্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক বা অভদ্র চরিত্রের লোকের উপর তাঁহার দীপ্তিমান্ ক্রোধ ছিল। কিন্তু তিনি প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘনে কার্য্যের যে অসাধুতা জন্মে তাহার সহিত, মনুষ্যকৃত নিয়ম লঙ্ঘনে কার্য্যের যে অসাধুতা জন্মে, তাহার অন্তর বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে যাহারা প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহারাই প্রকৃতিতঃ অসাধু। কিন্তু যাহারা কেবল মনুষ্যকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহারা প্রকৃতিতঃ অসাধু না হইতেও পারে; অধিক কি অনেক সময় তাহাদিগের মধ্যে অনেক উচ্চদরের লোকও দেখিতে পাওয়া যায়।

এরূপ অপূর্ব্ব রমণীর সহিত মানসিক সহবাসে মিলের মনোবৃত্তিসকল যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমাৰ্জ্জিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই অদ্ভুত রমণীর নিকট হইতে মিল্ যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সে সমস্তের কখন প্রতিশোধ দিতে পারেন নাই, তথাপি উন্নতি বিষয়ে তিনিও যে মিলের নিকট বিশেষ ঋণী ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবল অনুভূতি বলে তিনি যে সকল উন্নত মত আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মিল্ প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তি দ্বারা সেই সকল মতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং মিলের প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তির সাহায্যে টেলর-পত্নী আপনার স্বভাবজ জ্ঞানের দুর্ব্বলতা অপনীত করিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধির প্রখরতা ও অসামান্য মানসিক ক্ষিপ্রকারিতা বলে তিনি যেমন সর্ব্ব পদার্থ হইতেই জ্ঞানের উপকরণনিচয় সংগ্রহ করিতেন, তেমনই মিলের নিকট হইতেও অসংখ্য জ্ঞানোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মিল্ তাঁহার "স্বাধীনতা" নামক গ্রন্থ এই রমণীকে উৎসর্গ করিতে গিয়া তাঁহায় বিষয়ে এইরূপে লিখিয়াছেন:—আমি যত কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, ইনি সে সমুদায়ের উত্তেজক বা আংশিক রচয়িত্রী ছিলেন। ইনি আমার গৃহিণী ও সখা ছিলেন। ইনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন তাহাতেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিত। ইনি কোন কার্য্যে অনুমোদন করিলে, আমি সেই অনুমোদন আমার প্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে করিতাম। আমার অন্য পুস্তক গুলির ন্যায়, এখানিও আমাদের উভয়ের রচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানি তাঁহার অমূল্য পুনর্দর্শন দ্বারা বিশোধিত হয় নাই। যে সকল মহতী চিন্তা ও গভীর হৃদয়ভাব তাঁহার

সহিত সমাধিনিহিত হইয়াছে, আমি যদি সে সকলের অর্দ্ধেকও জগতে ব্যক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমা দ্বারা জগতের অসীম উপকার সংসাধিত হইতে পারিত। কিন্তু এ উপকারের সহিত তুলনায়, আমি এক্ষণে একাকী তদীয় অমূল্য জ্ঞানের সাহায্য বিরহিত হইয়া যাহা কিছু লিখিব, তাহা হইতে জগতের যে উপকার সাধিত হইবে, তাহা অতি সামান্য"।

টেলর-পত্নী যে কি অপূর্ব্ব রমণী ছিলেন, ইহাতেই তাহার বিশেষ পরিচয় হইতেছে। অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

ক্রমশঃ।

# প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

**পুরুবিক্রম নাটক** মূল্য ১৲ টাকা, বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশিত।

**শরৎ-সরোজিনী নাটক**—মূল্য ১৵০ কলিকাতা নূতন ভারতযন্ত্রে-মুদ্রিত। ৺ দুর্গাদাস দাস প্রণীত। বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

গতবৎসর যে কয়েক খানি নাটক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই দুই খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা এবার এই দুই খানিরই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

**পুরুবিক্রম**—যৎকালে মহাবীর সেকেন্দারসা ভারত আক্রমণ করেন, তৎকালে ক্ষত্রিয়কুলতিলক পুরু, কল্লূপর্ব্বতের রাণী ঐলবিলা, এবং সপ্তনদ প্রদেশের আরও কতিপয় ক্ষত্রিয়রাজের সাহায্যে তদীয় গতি প্রতিরোধে মরণ সঙ্কল্প করেন। তক্ষশীল নগরের অধীশ্বর—সেকন্দরসার সহায়তা না করিলে এই সমরের কি পরিণাম হইত বলা যায় না। যাহা হউক পুরু অসাধারণ রণনৈপুণ্য প্রদর্শনের পর সমরে পরাজিত হইলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তথাপি তাঁহার ক্ষত্রিয়তেজ নির্ব্বাণ হইল না। সেকন্দারসা তাঁহার অদ্ভুত সাহস ও পরাক্রমে বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং বিজিত শত্রুর প্রতি মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। যখন পুরুরাজ সেকন্দারসার দুর্গমধ্যে কারাবদ্ধ ছিলেন, তখন তক্ষশীল তাঁহার পতনে হর্ষপ্রকাশ করিতে গমন করেন। পুরুরাজ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে হত করেন। সেকেন্দারসা প্রথমে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠেন কিন্তু পরে, পুরুর সাহসে সন্তুষ্ট হইয়া পুরুর নিজের রাজ্য ও তক্ষশীলের রাজ্য এই উভয় রাজ্যই পুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন। তক্ষশীলের ভগিনী অম্বালিকা সেকন্দারসার

প্রণয়িণী এবং ঐলবিলা পুরুরাজের প্রেম-ভিখারিণী ছিলেন। পুরু ও তক্ষশীল ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দুরাচার তক্ষশীল সদুপায়ে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিয়া পুরুরাজের মনে ঐলবিলার প্রতি অবিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ভগিনী অম্বালিকার সহিত নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করেন। এই ষড়যন্ত্র কৃতকার্য্য হয়। পুরু ঐলবিলাকে অবিশ্বাসিনী মনে করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণে অসম্মত হন। তক্ষশীলের মৃত্যুর পর অম্বালিকা অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান মানসে পুরুরাজের নিকট আপনাদিগের ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদ করেন। ইহাতে ঐলবিলার প্রতি পুরুরাজের প্রেম দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাহারপর তাঁহারা পবিত্র পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া সমস্ত পঞ্চনদ প্রদেশে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। এদিকে হতভাগিনী অম্বালিকা যে সেকন্দারসার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া-সহোদর ও জন্মভূমির স্বাধীনতা তাঁহার করে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই দিগ্বিজয়ী সেকন্দারসা জিগীষাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রেমে জলাঞ্জলি দিলেন। এই ঐতিহাসিক উপন্যাস অবলম্বন করিয়া পুরুবিক্রম নাটক লিখিত হইয়াছে।

পুরুবিক্রমের প্রধান দোষ রসবৈচিত্র্যের অভাব। ইহার প্রথম পত্র হইতে শেষ পত্র পর্য্যন্ত কেবল বীররস। ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেকন্দারসা হইতে উদাসিনী পর্য্যন্ত সকলেই বীররসে উন্মাদিত, ইহার সামান্য প্রহরী ও সৈনিক্যগণের মুখেও কেবল বীররসের উদ্ঘোষণ। ইহার দ্বিতীয় দোষ ইহার ভাষাবৈচিত্র্যাভাব। ঐলবিলা, অম্বালিকা, সুহাসিনী, সুশোভনা ও উদাসিনী প্রভৃতি স্ত্রীদিগের ভাষাও যেরূপ; সেকন্দরসা, পুরু, তক্ষশীল, এফেষ্টিয়ান প্রভৃতি পুরুষদিগের ভাষাও প্রায় সেইরূপ। ভাষা শুনিয়া স্ত্রী কি পুরুষ নির্ণয় করা দুরূহ।

পুরুবিক্রমের এই দুই মহৎ দোষ সত্ত্বেও এখানি যে একখানি অতি রমণীয় কাব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার প্রত্যেক পংক্তিতে অতি গভীর হৃদয়ভাব নিহিত আছে। ইহার প্রত্যেক পত্রে অপূর্ব্ব দেশহিতৈষিতার ভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে। পুরুর অসাধারণ বীরত্ব এবং ঐলবিলার গভীর দেশহিতৈষিতা দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠে। অমনি আমরা উদাসিনীর সহিত একস্বরে এই গান গাইতে থাকি ;—

রাগিনী খাম্বাজ,—তাল আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মন প্রাণ,<br>
গাও ভারতের যশোগান।<br>
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান,<br>
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?<br>
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,<br>
শতখনি. রত্নের নিদান।<br>
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,<br>
গাও ভারতের জয়।<br>
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা,
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।
ভীষ্মদ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ ?
আর যত মহাবীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়।
কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

পুরুবিক্রমের ন্যায় গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ নাটক অদ্যাপি বঙ্গভাষায় একখানিও প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গভাষার প্রায় অধিকাংশ নাটক স্থানে স্থানে অশ্লীলতা-দোষ দুষ্ট। ইহাতে সে দোষের লেশমাত্র নাই। ইহার ভাষা অতি পরিপাটী। আমরা শুনিয়াছি গ্রন্থকার অতিতরুণবয়স্ক। এরূপ তরুণ হস্তে এরূপ মনোহর কাব্য রচিত হওয়া অতি গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

**শরৎ-সরোজিনী** এই নাটকখানি বঙ্গসমাজে এতদূর সমাদৃত হইয়াছে, এবং সম্বাদপত্র সমূহে ইহার প্রশংসা এত প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়াছে, যে ইহার স্তুতিবাদে আমরা যাহাই বলিব, তাহাই পুনরুক্তি মাত্র হইবে। ইহা জানিয়াও আমরা ইহার স্তুতিবাদে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি অভিনয়ের উপযোগিতা দ্বারা নাটকের গুণ বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে নাটককারদিগের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের নিম্নেই শরৎসরোজিনীর গ্রন্থকারের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। বাস্তবিক আমরা শরৎসরোজিনীর অভিনয়ে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, দীনবন্ধু মিত্রের দুই এক খানি নাটকের অভিনয় ভিন্ন আর কোন নাটকের অভিনয়েই এতদূর আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। শরৎসরোজিনীর অভিনয়ে কৃতকার্য্যতার মূল—নানারসসমুদ্ভূতি। ক্রমাগত এক রসের বর্ণনায় শ্রোতৃবর্গের বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। এই জন্য গ্রন্থকার ইহাতে শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, করুণ, বীভৎস প্রভৃতি নানারসের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এই নানা রসের অবতারণা করিতে গিয়া গ্রন্থকার নাটকের একটী প্রধান ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। নাটকে যেমন নানারসের সমুদ্ভূতি আবশ্যক—তেমনই ইহাতে এক রসের অঙ্গিত্ব অর্থাৎ প্রাধান্যও বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু শরৎ-সরোজিনীতে কোন রসেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হইল না।

শরৎ-সরোজিনীর আর একটী প্রধান দোষ এই যে ইহাতে এত অন্যাবশ্যক গর্ভাঙ্কের বিনিবেশ করা হইয়াছে যে ইহার অভিনয় অনেক সময় ধৈর্য্যবিলোপী হইয়া উঠে। কোন কোন গর্ভাঙ্কে অবতারিত চরিত্রগুলি যাত্রার সঙের ন্যায় অতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়। তাহাদিগের সহিত গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই। এরূপ অসম্বদ্ধ ও অন্যাবশ্যক চরিত্রের অবতারণা দ্বারা গ্রন্থবাহুল্য করা গ্রন্থকারের উচিত হয় নাই। আশা করি প্রকাশক মহাশয় সংস্করণের সময় সেই অনাবশ্যক অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থখানিকে নিষ্কলঙ্ক করিবেন। চন্দ্রে কলঙ্ক থাকিতেই হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।

নাট্যোল্লিখিত পুরুষগণের মধ্যে শরৎ, বিনয়, মতিলাল ও হরিদাস এবং স্ত্রীগণের মধ্যে সরোজিনী, সুকুমারী, বিন্দুবাসিনী, ও ভুবনমোহিনী এই কয়েক জনের চরিত্র বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ সরোজিনী, সুকুমারী ও ভুবনমোহিনীর চরিত্র অতি চমৎকাররূপে চিত্রিত হইয়াছে। সরোজিনী দুর্ল্লভজনানুরাগিনী কিন্তু দুঃখিনী ও পরাধীনা; এইজন্য লজ্জায় ও হতাশায় আশ্রয়দাতা শরৎ-কুমারের বাটী পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে ও ভ্রমণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পথিমধ্যে কতিপয় মাতালের হস্তে পতিত হইয়া অদ্ভুত কৌশলে আত্মরক্ষা করিলেন। এদিকে শরৎ-কুমার সরোজিনীর বিয়োগে কাতর হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সরোজিনী কোন সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মের একটী ঘোষণাপত্র দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। সহসা পুরুষবেশে শরতের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শরতের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। ইহার পর অনতিবিলম্বেই উভয়ের পরিণয় সম্পাদিত হইল। সুকুমারী সরলা ও আদরিণী। সুতরাং শীঘ্রই বিনয়ের আদরে গলিয়া গিয়া তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিলেন। বিন্দুবাসিনী সাবিত্রীসমা। স্বামী নরাধম পাপিষ্ঠ তথাপি তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশালিনী। স্বামীর পদাঘাত তাঁহার অঙ্গের ভূষণ। প্রতিহিংসা বা ঈর্ষা কাহাকে বলে তিনি জানেন না। এদিগে ভুবনমোহিনী রুদ্ররূপিণী। মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা। মূর্ত্তিমতী ঈর্ষা। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে যেন সতত অগ্নি উদ্গীরিত হইতেছে। পুরুষদিগের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করি দেখি, শরৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে আসীন। শান্তি ও মনুষ্যপ্রেম তাঁহার মুখমণ্ডলে সতত বিরাজমান। অধর্ম্ম কাহাকে বলে তিনি জানেন না। পরোপকার তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। এদ্দিকে মতিলাল দুর্দ্দান্ত ভীষণ জমিদার। পরের সর্ব্বনাশ করা তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য। নরহত্যা পরস্বাপহরণ তাহার দৈনিক কার্য্য।

চরিত্রবৈচিত্র্য শরৎ সরোজিনীর একটী রমণীয় গুণ। ভাষাবৈচিত্র্য, রসবৈচিত্র্য, চরিত্র্যবৈচিত্র্য প্রভৃতি গুণে এখানি বঙ্গভাষার অলঙ্কারস্বরূপ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

# সন ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে

# মূল্য প্রাপ্তি।

দং ১২৮১ সাল।

শ্রীমতী-সরস্বতী দেবী—মুড়াগাছা ৩৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী
তাতিবন্দ ৩৷৵০
মুন্সী তস্লীমুদ্দিন তালতলা ৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
জোড়াসাঁকো ৸০
„ রামদয়াল গুপ্ত চাঁপাতলা ১৲
„ বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গালসেক্রেটেরিয়েট ৩৲
„ প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
খিদিরপুর ৩/০
„ প্রসন্নকুমার নিয়োগী
ময়মনসিংহ ২৲
„ সুবলচন্দ্র ঘোষ হাইকোর্ট ১৲
„ দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী নাটোর ১৸৶
„ শশিভূষণ চৌধুরী ইচ্ছাপুর ৷৵০
„ গোপালকিশোর ধর বগুড়া ৩৶০
„ ত্রৈলোক্যনাথ বসু আলিপুর ৩৷৵০
„ নরসিংহচন্দ্র সিংহ হাওড়া ১৲
„ মধুসূদন রায় জামালপুর ৩৷০
„ বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা ৩৲
„ দুল্লর্ভচন্দ্র মজুমদার
জামাল পুর ৩৷৵০
„ বিপ্রদাস ভাদুড়ী কলিকাতা ৩৲

শ্রীযুক্ত বেহার বন্ধু সম্পাদক
কলিকাতা ২৷৵০
„ বাবু নিবারণ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
গোবরডাঙ্গা ৩৷৵০
„ চাঁদমোহন মৈত্র
ফরিদপুর ৩/০
„ গোপালচন্দ্র সান্যাল
শান্তিপুর ৩৷৶
„ যদুনাথ সেন জয়পুর ১৸৶০
„ হরমোহন রায় মহাশয়
বর্দ্ধমান ৩৷৵০
„ অতুলচন্দ্র মিত্র ছাপরা ৸৶০
„ রমেশচন্দ্র লাহিড়ী মুন্সেফ
মুখসুদপুর ৩৷৵০
„ হরিদাস ঘোষ জামালপুর ৩৷৵০
„ রাসবিহারী-চৌধুরী জমিদার
রাণীসঙ্কল ৵০
„ হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা ১৲
„ অনুকূলচন্দ্র সাহা কলিকাতা ১৲
„ কালিপদ মজুমদার জামালপুর ৩৷৵
„ মহেশ্বরপুর পুস্তকালয় ৷০

দং ১২৮২ সাল।

রাখালদাস অধিকারী
চন্দননগর ৩৶০
„ গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী তাঁতিবন্দ ৩৷০

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী নাটোর ৩।৵০
" বেহার বন্ধু সম্পাদক কলিকাতা ৩৲
নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
গোবরডাঙ্গা ॥৵০

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সেন কুচবিহার ৩৶০
" হরিদাস ঘোষ জামালপুর ১॥৶০
" রাসবিহারী চৌধুরী রাণীসঙ্কল ৩।৵০
" গঙ্গাচরণ সেন উকীল যশোহর ৩।৵০

# বঙ্গবামার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

আমরা সতীত্ব ধর্ম্মের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া স্ত্রীজাতীয় স্বাধীনতার কথার অবতারণ করিয়াছি। এই স্বাধীনতার প্রস্তাব সম্যক্‌রূপে আন্দোলন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তবে আমাদিগের মূল প্রসঙ্গের আনুষঙ্গিক হইয়াছে বলিয়া আমরা স্বাধীনতার কথা উত্থাপন করিয়াছি। কারণ বুদ্ধিশীল প্রাণী মাত্রেরই ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে তাহার কতদূর স্বাধীনতা আছে তাহা অগত্যা বিচার্য্য হইয়া পড়ে; যেহেতু স্বাধীনকর্তৃত্ব নহিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্ভাবিত হইতে পারে না। আমাদিগের বামাগণের এবম্প্রকার কর্ত্রীত্ব আছে কি না, তাহাই বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত। এই নিমিত্ত এই বিষয়ে আমরা বামাজাতির স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতে উদ্যত হইয়াছি। অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিতে হইলেও সাধারণতঃ স্ত্রীস্বাধীনতা হইতে কোন প্রকার সামাজিক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই ইহাও আমাদিগের সংস্কার। এই সংস্কার কেবল অন্ধ বিশ্বাস নহে, ইহা অনেক বিবেচনার ফল। আমাদিগের প্রবন্ধের অপ্রাসঙ্গিক না হইলে আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতাম। আমরা স্থিরচিত্তে সর্ব্বদিক্‌ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রদান করা?—কে প্রদান করিবে? আমরা কি প্রদান বা গ্রহণ করিবার কর্ত্তা? তবে যে আমরা তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছি, তাহা কেবল বলে ও কৌশলে। স্বাধীনতা বুদ্ধিজীবী প্রাণী মাত্রেরই স্বাভাবিক ভাব ও সম্পত্তি। প্রাকৃতিক ভাব হইতে যদি অমঙ্গল ঘটে, তবে প্রকৃতি নিজে অসম্পূর্ণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতি কখন অসম্পূর্ণ ও দোষগর্ভ হইতে পারে না। প্রকৃতির অযথা-প্রবলতা ও প্রতাপ সুশাসন করা কর্ত্তব্য তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু প্রকৃতিকে সুশাসনে রাখিতে হইলে, তাহাকে যে একেবারে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য এ কথা আমরা স্বীকার করি না। প্রকৃতির সুশাসন ও বিনাশন এ দুই স্বতন্ত্র কথা। প্রকৃতির সুশাসন স্বাভাবিক, প্রকৃতির বিনাশন অস্বাভাবিক। স্বাধীনতা-সমুৎপন্ন যথেচ্ছাচারিতার সুশাসন করা স্বাভাবিক, স্বাধীনতার বিনাশন অধীনতা—অস্বাভাবিক। যাবতীয় স্বাধীন প্রাণী যে সর্ব্বদা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, অথবা তাহা সুশাসনে রাখিবে ইহা সম্ভাবিত নহে। তাহা বলিয়া, অপর জাতির যে তাহা অপহরণ করার

অধিকার আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সে যাহা হউক স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার প্রস্তাব আন্দোলন করিতে হইলে যে একখানি বৃহৎ গ্রন্থেও তাহার সমাপ্তি হয় না তাহা বলা অনাবশ্যক। এই স্বাধীনতার বিপক্ষে সমগ্র পুরুষজাতি বৈর সাধন করিতেছেন। ইহার প্রসঙ্গ উথাপিত না হইতে হইতে অমনি সমগ্র পুরুষজাতি উচ্চরবে খড়্গাহস্ত হইয়া উঠেন। কতই গুরুতর ও সামান্য পূর্ব্বপক্ষ উথাপিত করিতে থাকেন। কিন্তু দেখিতে গেলে, কোন আপত্তিরই সারবত্তা নাই। সকল আপত্তিরই মূলে স্বার্থপরতাকে প্রচ্ছন্ন দেখা যায়। আজি পর্য্যন্ত কতশত পূর্ব্বপক্ষ উথাপিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যে কতশত কূটপক্ষ উথাপিত হইবে তাহারও গণনা নাই। এই সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করা একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব বলিয়া আমরা তাহা হইতে এক্ষণে বিরত হইলাম। উপস্থিত বিষয় বিচার করা এক্ষণে আবশ্যক হইতেছে।

আমরা সচরাচর সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি নারীগণকে সতীত্ব ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কি কি গুণে তাঁহারা সেই মহৎ নামের অধিকারিণী হইয়াছেন তাহার আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে, আমাদিগের সতীত্বের ভাব কি প্রকার। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাঁরা সকলেই পরম পতিপরায়ণা ছিলেন। অতএব পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যে সতীত্ব ধর্ম্মের অন্যতর অঙ্গ, তাহার আর সংশয় নাই। এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ভাব কি প্রকার।—

পরিণয় সংস্কারে আবদ্ধ হইলে, স্বামীর প্রতি কলত্রের যে প্রকার অনুরাগ হওয়া উচিত এবং তজ্জনিত যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য বিধেয় হয়, আমাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম তদপেক্ষা অধিকতর আবশ্যক। আমাদিগের শাস্ত্রে কহে পতিই, পত্নীর পার্থিব দেবতা। অতি শৈশবকাল হইতে আমাদিগের বামাগণ এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। শুধু দীক্ষিত নন, পিত্রালয়ে বালিকাবস্থা হইতে মাতৃদৃষ্টান্তে ইহার আদর্শ দেখিতে থাকেন। সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বজনের মুখেই এই ধর্ম্মের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। প্রতিবেশিনীগণও ইহাই শিক্ষা দেন। তাঁহারা শিক্ষা দেন :—তাঁহাদিগের স্বামীর কতদূর প্রভুত্ব, সেই স্বামীর অনুরাগভাগিনী হইবার জন্য তাঁহারা কতই যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করেন ; কত কষ্ট স্বীকার করিয়া হয়তো কেহ কেহ কৃতার্থ হইতে পারেন না এবং পতিই সকলের একমাত্র গতি। যখন কোন শিক্ষা আরম্ভ হয় না, যখন কোন মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয় নাই, যখন সমুদায় জ্ঞান সংস্কার মাত্র, যখন সংস্কার সকল সঞ্জাত না হইতে হইতে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, কিছুই বিচারস্থানীয় হয় না ; সেই জ্ঞানবিরহিত শৈশবকাল

হইতে বালিকারা অহোরহ পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতে থাকে। দেখে পতিবিরহে কত অবলার যন্ত্রণার আর ইয়ত্তা নাই। তৎসঙ্গে শিক্ষা পায়, পতি কামিনীকুলের কি অমূল্য ধন; পত্নীর জীবিত বিনিময়েও সে ধনের মূল্য হয় না। দেখে কত বিরহবিধুরা পত্নী শোকাতুরা হইয়া দিনযামিনী অশ্রু বিমোচন করিতেছে। দেখে, পতি নিতান্ত নির্দ্দয় হইলেও পত্নী নিরতিশয় যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত আছেন এবং দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছেন, কি প্রকারে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিবেন। পতি আতুর ও অক্ষম, মূর্খ ও কোপনস্বভাব, নির্ব্বোধ ও পানাসক্ত, এবং পরম দুর্ব্বৃত্ত হউন, বালিকা দেখে, তথাপি সেই পতি গৃহে আসিলে স্ত্রীর নিকট তাঁহার সমাদরের পরিসীমা নাই। পতি হাসিলে পত্নীকে হাসিতে হইবে; কাঁদিলে, কাঁদিতে হইবে। পত্নীর প্রতি পতি যে প্রকার বাক্য প্রয়োগ করুন না কেন, পত্নীকে অতি সাবধানে এরূপ উত্তর দিতে হইবে যেন কোন মতে আর্য্যপুত্রের অসন্তোষ না জন্মায়। পতি কখন কি আদেশ করেন পত্নীকে তজ্জন্য সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, পতির অনুগামিনী হইয়া সেই আদেশ বহন করিতে হইবে। পতি যদি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন অথবা প্রহার করেন, নিরীহ মেষের ন্যায় পত্নীকে তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। পতির প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা অথবা কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করা পত্নীর পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় ও গুরুতর পাতক। পতিপরায়ণতার এই প্রকার দৃষ্টান্ত বালিকা চারিদিকেই দেখিতে থাকেন। নিরক্ষরা বালিকা সেই তরুণ বয়সে আর কিছুরই শিক্ষা পান না। তাহার হৃদয়ে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যেমন বদ্ধমূল হইয়া যায় এমত আর কিছুই নহে। আশৈশব তাহার এই সংস্কার জন্মায় যে, পতিই স্ত্রীর সর্ব্বস্বধন, সে ধন বিরহিত হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র, সে ধন লাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া অনাবশ্যক নহে।

বালিকার এই সংস্কার এতদূর বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, ইহা ক্রমশঃ রিপুর আকারে পরিণত হয়। বাস্তবিক পতির প্রতি অনুরাগ, বঙ্গবামার হৃদয়ে এক প্রকার অন্ধরিপুবৎ কার্য্য করে। এই অন্ধরিপুর বশবর্ত্তিনী হইয়া সাবিত্রী মৃতপতির অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। নহিলে কিছুদিনের মধ্যে সত্যবানের প্রতি সাবিত্রীর তত প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। সীতাকে বরং একদা প্রণয়ানুরোধে পতি সঙ্গে বনগামিনী হইতে দেখিলে আমরা তাহা সম্ভাবিত জ্ঞান করি, কিন্তু সত্যবানের প্রতি সাবিত্রীর অনুরাগ কখন সম্ভাবিত বোধ হয় না। অতএব সাবিত্রীর পতিপরায়ণতাকে আমরা একটী অন্ধ রিপুর কার্য্য ভিন্ন

আর কিছুই বলিতে পারি না। যে পতিপরায়ণতার মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহার কতদূর ধর্ম্মনৈতিক গৌরব আছে তাহা ঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন। আমাদিগের অনুমান এই, এবম্বিধ পতিপরায়ণতার শিক্ষা দিবার জন্যই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাবিত্রীর উপকথার সৃষ্টি করিয়াছেন।

"এক দিকে ভার্য্যা এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া যেমন পতির নিতান্ত আনুগত্য প্রকাশ করে, পতিও তেমনি আপনাকে ভার্য্যার সম্পূর্ণ প্রভু জানিয়া তাহার উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। আমাদিগের এমনি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা যে স্ত্রীকে যত অবজ্ঞা করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামীর কথা ভার্য্যাকে অবশ্য শুনিতে ও মানিতে হইবে। স্বামী দুশ্চরিত্র হইলেও স্ত্রীর কথা শুনিবেন না, পত্নী তাঁহার অসৎ পরামর্শের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য, স্বামীর মনে এতদূর প্রভুত্বের ভাব থাকা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রভুত্বের ভাব এতদূর প্রবল, যে গৃহে প্রবেশ মাত্র সেই ভাবজনিত দম্ভ উপস্থিত হয়। তখন বোধ হয় তিনি যেন একটী বিশাল রাজ্যের রাজা, অমনি তাঁহার মেজাজ রুক্ষ হয়, ভাষা কর্কশ ও স্বর গম্ভীর হইয়া উঠে। তাঁহার বাহিরের ভাব গৃহে আসিয়া সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। স্ত্রীর প্রতি পতি হাজার নিষ্ঠুরাচরণ করুন কেহ দূষিবে না; কিন্তু সাধু ব্যবহার করিলে অনেকে স্ত্রৈণ বলিয়া নিন্দা ও উপহাস করিবে। পরস্পরের এইরূপ মনের ভাব যে কত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে তাহা অনেকে জানেন না। জানিলেও পুরুষজাতি প্রভুত্ব ছাড়িতে রাজি নহেন। যাহার কোন খানে প্রভুত্ব নাই, গৃহে আসিয়া ক্ষণকালের জন্যও তিনি প্রভু হইয়া মনের ইচ্ছা পরিতুষ্ট করেন, ও মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন। এমন বিনা মূল্যের একাধিপত্যকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে?"

স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের এই প্রকার অসমুচিত ব্যবহার সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখা যায়। স্ত্রীজাতি আমাদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ও নিতান্ত অধীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই প্রকার অধীনতা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা হয়। সামাজিক অবস্থা গতিকে আমাদিগের বামাগণ যে অধীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে, যে অনুরাগ বাহিরে দেখাইতে থাকে, প্রভুত্ব-গর্ব্বান্ধ পুরুষজাতি তাহাই পরম পরিশুদ্ধ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াথাকেন কিন্তু আমাদিগের বামাগণকে পতিব্রতা বলিবার অগ্রে বিবেচনা করা উচিত, তাহাদিগের সেই পতিপরায়ণতা কতদূর বিশুদ্ধ, কতদূর সামাজিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল, কত দূর প্রকৃত প্রেমানুরাগের পরিচয়।

"লোকে বলে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা, তাহারা স্বাধীনভাবে চলিতে সমর্থা

নহে। তাহারা বাহিরে কিছু দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমরা যত দুর্ব্বলা বলি, তাহারা স্বভাবতঃ যে তত দুর্ব্বলা নয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অনেক পরিমাণে আমরা তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়াছি, অভ্যাস ও অজ্ঞতা তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়াছে, দেশের আচার ব্যবহার তাহাদিগকে দুর্ব্বলা ও অবৈধ পরিমাণে পরাধীন করিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীজাতি যেরূপ দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের উপর তাহাদিগের নির্ভর করা সমুচিত বটে, কিন্তু তা বলিয়া কি পশ্বাদির ন্যায় তাহাদিগকে আমাদিগের সেবায় নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য? আমরা কি নীচ, যে দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করি! আমরা কি মনে করিয়াছি আমাদিগের এই নীচভাব চিরকাল সুরক্ষিত থাকিবে? পৃথিবীতে কি সাধুভাবের উদয় হইবে না? সংসাররূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া আমরা স্ত্রীজাতির উপর নিপীড়ন করিব, ইহা কোন্ ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে? স্ত্রীজাতিকে আমরা অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছি। তাহাদিগের বিষয়বিজ্ঞতা ও পার্থিববিজ্ঞতা জন্মাইবার শক্তি আমরা হরণ করিয়াছি। সাংসারিক কোন কার্য্যে তাহারা একটু অসাবধান হইল, কোন অপকর্ম্ম করিল, আমাদিগের একটী আদেশ শুনিতে বিলম্ব করিল, অমনি আমরা খড়্গাহস্ত হই। এইরূপে আমরা তাহাদিগের ভীরুতা প্রবল করিয়া দিয়াছি, এবং সেই ভীরুতার সুবিধা লইয়া থাকি। আমাদিগের প্রতি তাহাদিগের কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, বলিলে তৎক্ষণাৎ তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হয়, সুতরাং নিরুপায় স্ত্রীজাতি বশীভূত না থাকিয়া কি করিবে?"

মানুষ সামাজিক অবস্থার দাস। তাহাতে আবার আমাদিগের অবলাগণের কোন শক্তি নাই। নিরক্ষরা ও বিবেচনাবিহীন হইয়া তাহারা আপনাদিগের অবস্থাও সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না। যখন নিতান্ত নিপীড়িত হয়, যখন নির্দ্দয় পুরুষজাতির কঠোর ব্যবহারে দেহ জর্জ্জরিত হয়, তখন একবার শিরে করাঘাত করিয়া আপনাকে হতভাগিনী বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। কিন্তু তাহাদিগের সেই আর্ত্তনাদ পর্য্যন্তই সকলি শেষ। তাহার অতীত আর কোন উপায় নাই। তাহাদিগের এমত জ্ঞান নাই যে পতিবশবর্ত্তিতার সীমা কোথায় এবং স্ত্রীকর্ত্তব্যের সহিত দাসীত্বের প্রভেদ কোথায় তাহা বিচার করিয়া লয়। পতি তাহাদিগকে যত দূর অধীনে আনিতে চান তাহারা ততদূর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। শৈশবলব্ধ পাতিব্রত্যধর্ম্মীয় সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহারা স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞানে পূজা করে, পতির সহস্র দোষসত্ত্বে তাহাদিগের দেবভক্তি অপনীত হইবার নহে। যে ব্রতে স্বামীর পূজা আদিষ্ট আছে, সেই ব্রতই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গ্রহণ করে, এবং সর্ব্ববিধায়ে স্বামীর সম্পূর্ণ দাসী হইয়া মনুষ্যপূজার এক শেষ প্রকাশ করিতে থাকে।

যে পাতিব্রত্যধর্ম্মে এই প্রকার মনুষ্য-

পূজা নিয়োজিত আছে, সেই পাতিব্রত্য কতদূর ধর্ম্মসঙ্গত তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীজাতির কি গভীর জ্ঞানান্ধতা! তাহারা জানে না, যে যাহাকে তাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়াছে, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে, তাহা ঘোর অধর্ম্ম, তাহা মনুষ্যপূজা।

আমাদিগের বামাগণের পাতিব্রত্যধর্ম্মের প্রকৃতি কি তাহা আমরা বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি, এইধর্ম্ম কতদূর কর্ত্তব্যজ্ঞানে শাসিত ও নিয়মিত হয়, পতির প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরাগ ও পতির পূজা কেমন বামাগণের সামাজিক অবস্থার ফল। আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে এই ধর্ম্ম তাহাদিগের কোমলহৃদয়ে যেন রিপুবৎ কার্য্য করে। তাহারা স্বেচ্ছামত পুরুষজাতির নিতান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা অবস্থাগতিকে কেমন অধীনতায় বিনত হইয়াছে। দেশের আচারব্যবহারের বশবর্ত্তিতা, আশৈশব অভ্যাস, সামাজিক দৃষ্টান্ত ও মূঢ়তার প্রভাব তাহাদিগের ইচ্ছাকে এতদূর বিনত করিয়াছে, যে তাহাদিগের সেই দাসীত্ব যেন স্বাভাবিক ও পশুসংস্কারবৎ হইয়া পড়িয়াছে। সেই দাসীত্বে বুদ্ধিশীল ও স্বাধীনপ্রাণীর স্বাভিপ্রেত বশবর্ত্তিতার কিছুই নাই। তাহাতে যেন জড়পদার্থের নমনীয়তা প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগের পতিপরায়ণতা ও পতির প্রতি অনুরাগ স্থির কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতে সমুত্থিত হইতে পারেনা। ইহা তাহাদিগের হৃদয়ে পশুসংস্কারবৎ স্বতঃই সমুদিত হয়। ইহা শিশুর অনুরাগ, পশুর অনুরাগ, জড়হৃদয়ের অনুরাগ। ইহা স্বাধীনভাবে উত্থিত হয় না। ইহা অবস্থাগতিকে নিয়োজিত হয়। ইহা নদীর স্বাভাবিক স্রোত নহে, ইহা বাত্যাতাড়িত তরঙ্গ। ইহাতে স্বাধীন ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সম্পর্ক নাই। স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের কার্য্যবিরহিত হওয়াতে ইহার কতদূর ধর্ম্মনৈতিক মূল্য তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে।

সীতা এবং সাবিত্রীর চরিত্রে আমরা যে কেবল পাতিব্রত্যধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই এমত নহে। তাঁহারা আরও শিক্ষা দেন, সতী নামের যোগ্যা হইতে হইলে, একমাত্র পতি ভিন্ন অন্য পুরুষসংসর্গ পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সতীত্ব ধর্ম্মের ইহাই সুপ্রধান ও প্রথম লক্ষণ। এ গুণ যাঁহার নাই, অন্য সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি সতী বলিয়া গণনীয় হন না। একমাত্র পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ করা এতদ্দেশে ব্যভিচার বলিয়া অভিহিত হয়। এই ব্যভিচারদোষ পরিবর্জ্জন করাই সতীত্বধর্ম্ম! লোকসমাজে ইহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে কতদূর ধর্ম্মভাব বিদ্যমান আছে, তাহা একবার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি, এই পরীক্ষায় আমাদিগের অভিপ্রায় সাধারণ জনগণের চিরপোষিত বদ্ধমূল সংস্কারের বিরোধী হইবে এবং ত-

জন্য আমরা হয় তো তাঁহাদিগের বীতরাগের ভাজন হইব; কিন্তু তা বলিয়া কি করিব? আমরা যাহা সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহার অপলাপ করা আমাদিগের কথনই অভিপ্রেত হইতে পারে না।

সীতাদেবী যে সতীত্ব ধর্ম্মের আদর্শ দেন, সাবিত্রীপ্রদত্ত আদর্শ হইতে তাহা বিভিন্ন। পতির সহিত সীতাদেবী বহুকাল সহবাস কবিয়াছিলেন। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র বহুগুণাধার ছিলেন বলিয়া সীতাদেবীর নিতান্ত মনোহরণ করিয়াছিলেন। দুর্বৃত্ত রাবণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। এমত স্থলে সীতাদেবীর মন স্বভাবতঃ রামচন্দ্রের দিকেই আকৃষ্ট ও রাবণের দিকে বীতরাগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সাবিত্রীর দৃষ্টান্তে এরূপ ঘটে নাই। সাবিত্রী বড় পতিসংসর্গ করেন নাই। সত্যবানের গুণেও সাবিত্রীর বশীভূত হইবার কারণ ছিল না। সাবিত্রীর হৃদয়ে পতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও প্রণয় জন্মিবার কোন কারণ ছিল না। সত্যবান্ আবার জীবিত ছিলেন না। তথাপি সত্যবানের জন্য সাবিত্রীকে লালায়িত হইতে হইয়াছিল। তথাপি সত্যবান্ ভিন্ন আর কেহই তাঁহার প্রণয়ভাজন হইবার যো নাই। আমাদিগের অনেক বালিকা বিধবা কথন পতিসংসর্গ করে নাই। প্রণয় কিরূপ তাহারা হয়তো তাহার আস্বাদও প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ তাহাদিগকে চিরদিন সতী থাকিতে হইবে এবং যাহাকে স্বপ্নেও মনে পড়ে না সেই পতির জন্য চিরজীবন শোকার্ত্ত হইয়া থাকিতে হইবে। প্রকৃতি যাহা করিতে সম্মত নহে, তাহা তাহাদিগের অবশ্য করিতে হইবে। প্রকৃতি যদি না কাঁদে অবশ্য কাঁদাইতে হইবে। প্রকৃতি যদি পুরুষসংসর্গ ব্যতীত না থাকিতে পারে, তাহাকে রুগ্ন করাও শ্রেয়, তথাপি ব্যাভিচার দোষে লিপ্ত হওয়া শ্রেয় নহে। সাবিত্রীর চরিত্রে এই সতীত্বের আদর্শ। সাবিত্রীকে বরং কবি বহুকালের পর সত্যবানের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়া তদীয় সতীত্ব ধর্ম্ম প্রকৃতিসঙ্গত ও সুরক্ষিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গীয় বালিকা বিধবার সে আশাও নাই। তাহাকে আজীবন পুরুষ-সংসর্গ বিরহিতা হইয়া সতী নাম ক্রয় করিতে হইবে। অতএব পতি জীবিত থাকিতে যেমন অন্য-পুরুষ-সংসর্গ পরিবর্জ্জন করা আবশ্যক, সংসর্গের পূর্ব্বে স্বামী সংস্থিত হইলেও তদ্রূপ পবিত্র থাকা সতীত্ব ধর্ম্মের লক্ষণ। আবার শকুন্তলার দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, যে পুরুষের সহিত একবার সংসর্গ হয়, তিনিই রমণীর পতি এবং সেই পতি স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করুন আর নাই করুন, অন্যকে পতিত্বে বরণ করা নিষিদ্ধ, এবং অন্য পুরুষের সংসর্গ পরিহার করা নিতান্ত আবশ্যক। চিরদিন কেন জীবিত পতির সহিত বিচ্ছেদ ঘটুক না, চিরদিন কেন তৎসহবাস হইতে বিরহিত থাকুক না, তথাপি অপরপুরুষ বঙ্গবামার

গ্রহণীয় নহে। অপর পুরুষের সহিত প্রণয় করা সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ। এই প্রকার সতীত্বধর্ম্ম কতদূর মানবপ্রকৃতিসুসঙ্গত তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। এবম্প্রকার ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে যে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয় তাহা অনায়াসেই প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আমাদিগের সহযোগী, "বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত" নামক গ্রন্থের সুবিজ্ঞ সমালোচক, উক্ত সতীত্বধর্ম্মের পাপময় ফলাফল প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে, তাহাকে অবশ্য অধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। তথাপি বঙ্গবামাকে এই ধর্ম্মের বশবর্ত্তিনী থাকিতে হইবে। এবং বাস্তবিক যাহা অধর্ম্ম তাঁহাকে তাহা ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুবর্ত্তনে ধর্ম্মশীলা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে হইবে। নহিলে জন-সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিবে না। আহা! বঙ্গবামার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা কি ভয়ঙ্কর, কি শোচনীয়! কত দিনে তিনি এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইবেন কে বলিতে পারে?

বামাগণের পক্ষে সতীত্বধর্ম্মের নিয়ম এত কঠিন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় সমাজে পুরুষজাতির পক্ষে সেই একই নিয়ম কেমন শিথিল। এক ধর্ম্ম বিভিন্ন জাতির প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহার যে এত বৈপরীত্য ঘটে, এ বড় বিচিত্র কথা। জাতিবিশেষে একই ধর্ম্মের নিয়ম যে বহুবিধ হইবে ইহা ধর্ম্মের প্রকৃতিগত নহে। যাহা ধর্ম্ম, তাহার বিপরীত অবশ্য অধর্ম্ম। শ্বেত কখন কৃষ্ণ হইতে পারে না, কৃষ্ণ কখন শ্বেত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে তাহা সঙ্গত। পুরুষের পক্ষে যাহা ন্যায্য ও ধর্ম্মানুমত স্ত্রীর পক্ষে তাহা ঘোর অধর্ম্ম। স্ত্রীজাতির মধ্যে একাধিক বিবাহ অসিদ্ধ অথচ পুরুষের মধ্যে তাহা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। বহুবিবাহ যদি পুরুষের পক্ষে ধর্ম্মবৈধ হয়, স্ত্রীজাতির পক্ষে তাহার বিপরীত হইবে কেন, আমরা স্থূলবুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আবার আমাদিগের বিবাহসংস্কারের ধর্ম্মবন্ধন পর্য্যালোচনা করিলে অধিকতর আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক বিবাহে বরকন্যা উভয়েই ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। স্ত্রীকে চিরজীবনের জন্য সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। স্ত্রী আর দ্বিতীয় পুরুষের পাণিগ্রহণে ধর্ম্মতঃ সমর্থা নহে। কিন্তু পুরুষজাতি আবার অন্য রমণীর পাণিপীড়নে ধর্ম্মতঃ সমর্থ। স্বামী, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া অনায়াসে প্রথম পরিণয়ের সমুদায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয়েন; স্ত্রী কিন্তু সেরূপ হইতে পারেন না। স্বামী অনায়াসে সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর ভার্য্যার সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। স্বামী অনায়াসে প্রথম পরিণয়ের সমুদায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে এ নিয়ম শাস্ত্রসঙ্গত নহে। স্ত্রীকে পরিণয়ের সমুদায় প্রতিজ্ঞা

পালন করিতে হইবে। একজনের পক্ষে যে বিবাহের বন্ধন অলঙ্ঘনীয় এবং যে প্রতিজ্ঞা পালনীয় অন্য জনের পক্ষে তাহা নহে। পতির সম্বন্ধে বিবাহের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে, কিন্তু স্ত্রীর সম্বন্ধে নহে। যে বিবাহের এই প্রকার শিথিল ধর্ম্ম-নৈতিক বন্ধন তাহাকে কি বাস্তবিক বিবাহ বলা যায়? যে বিবাহ এক পক্ষে পক্ষপাতী, যে প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম দুজনের মধ্যে অন্যতরের পক্ষে কেবল প্রযুক্ত হইবে, সে বিবাহ এবং সে প্রতিজ্ঞার কতদূর ধর্ম্মবল তাহা অনায়াসেই উপ-লব্ধ হইতে পারে। যে ধর্ম্মসংস্কার এক পক্ষে ভঙ্গপ্রবণ তাহা অন্য পক্ষে কেন সুদৃঢ় বন্ধন হইবে তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু পক্ষপাতী পুরুষের নিকট সকলি সম্ভব, ধর্ম্মের নিকট নহে। ধর্ম্ম কহিবে যে, যাহা ধর্ম্মতঃ ভঙ্গপ্রবণ তাহা কখন আবার ধর্ম্মতঃ দৃঢ়বন্ধন হইতে পারে না। অতএব পুরুষের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলেও আমাদিগের বিবাহ-পদ্ধতির কিছুই ধর্ম্মবন্ধন উপলব্ধ হয় না। কারণ যাহা ধর্ম্মতঃ শিথিল, তাহা ধর্ম্মতঃ অচ্ছেদ্য হইতে পারে না। যে বিবাহের কিছু ধর্ম্মনৈতিক বন্ধন নাই সে বিবাহকে কোন মতে ধর্ম্মবিবাহ বলা যাইতে পারে না, এবং তাহাতে দম্পতীর অন্যতর কেহই ধর্ম্মতঃ আবদ্ধ নহে। কিন্তু হায়! এই বিবাহের উপর স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম স্থাপিত রহিয়াছে। যিনি ধর্ম্মতঃ স্ত্রীর পতি নহেন, তাঁহাকে অবশ্য তাঁহার পতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এই হাস্যকর বিবাহের যাবতীয় প্রতিজ্ঞা কেবল তাহার পক্ষে চিরজীবন পালনীয়। যে বিবাহ প্রকৃত বিবাহ নহে, সেই বিবাহনির্দ্দিষ্ট একজন পতি হইল, এবং সেই পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ পরিবর্জ্জন করা আবার সতীত্বধর্ম্ম হইল! আশ্চর্য্য আমাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান, আশ্চর্য্য আমাদিগের কর্ম্মকাণ্ড, আশ্চর্য্য আমা-দিগের ব্যবস্থা, বিবাহ, সতীত্ব ধর্ম্ম, ও আচার ব্যবহার!

পুরুষের পক্ষ হইতে বিচার করিয়া আমাদিগের পরিণয়সংস্কারের কতদূর ধর্ম্মনৈতিক বন্ধন তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, স্ত্রীপক্ষ হইতে দেখিলেও বালিকাবিবাহের কিছু ধর্ম্মনৈতিক বন্ধন উপলব্ধ হয় না। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয় পক্ষ হইতে বিচার করিয়া যে উদ্বাহ কার্য্যের ধর্ম্মবৈধতা প্রতীত হয় না, সেই উদ্বাহ সংস্কারে কেবল অবলাগণকে অতি দৃঢ়বন্ধনে আ-বদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিচার করিতে গেলে প্রতিপন্ন হয়, যে কি স্বপক্ষ, কি স্বামীপক্ষ, কোন পক্ষের বিচারে আমা-দিগের বামাগণের প্রকৃত বিবাহ হয় না। শাস্ত্রপক্ষীয়গণ যদি এই কূট তর্ক উত্থা-পিত করেন, যে পুরুষে তৃতীয় বা চতুর্থ-বার বিবাহ করিলেও তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় বারের বিবাহ বন্ধন খণ্ডিত হয় না, তৎপক্ষে আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তাহা আশ্চর্য্যরূপে বৈধ করা হই-

য়াছে। তাহা কেবল বিধানে বৈধ, ধর্ম্মতঃ এবং যুক্তিতে নহে। পুরুষ জাতির হাতে শাস্ত্র এবং পুরুষ জাতিই প্রবল, সুতরাং পুরুষ জাতি আপনাদিগের স্ববিধার্থ যাহা ইচ্ছা তাহাই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কে তাহার যুক্তি এবং ধর্ম্মনৈতিক মূল বিচার করিয়া দেখিবে? স্ত্রীজাতির জ্ঞানধ্বনি যদি কোন কালে প্রবল হয় তখন সে তর্ক উঠিবার কথা। ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চ বিচারে যখন এই সমস্ত পক্ষপাতী ব্যবস্থার নৈতিক মূল আলোচিত হইবে, তখন ইহাদিগের সিকতাময় ভিত্তিমূল অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। কত দিনে সেই শুভদিনের উদয় হইবে, এই আমাদিগের আশা, এই আমাদিগের হৃদয়ের একান্ত বাসনা।

কিন্তু মনে করুন আমাদিগের বিবাহ ধর্ম্মতঃ বৈধ এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেহই তাহার ধর্ম্মবন্ধন ছেদন করিলেন না। স্ত্রী যেমন পতির প্রতি পতিও তেমনি এক মাত্র স্ত্রীর প্রতি চিরদিনের জন্য অনুরক্ত রহিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, মানবের প্রকৃতি সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা আমাদিগের বিচার্য্য নহে। এক্ষণে বিচার্য্য এই, আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীদিগের যে সতীত্ব ধর্ম্মের আমরা এত অহঙ্কার করি, তাহার ধর্ম্মনৈতিক গৌরব কতদূর। কোন ধর্ম্মের ধর্ম্ম নৈতিক গৌরব পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, যে সেই ধর্ম্মকার্য্য সাধন পক্ষে অনুষ্ঠাতার কতদূর স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব আছে, অথবা কি অবস্থায় তাহা সম্পাদিত হইতেছে। অতএব, পতি ভিন্ন পরপুরুষের সংসর্গ পরিহার করাকে যখন আমরা সতীত্ব ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করি, তখন সেই ধর্ম্ম পরীক্ষার সময় দেখিতে হইবে, প্রথমতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে পরপুরুষের সহিত সংসর্গ ঘটিবার কতদূর অবসর ও সুযোগ আছে; দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত অবসর ও সুযোগ পাইলে আন্তরিক ধর্ম্মবল দ্বারা প্রলোভনকে প্রতিরোধ করিয়া কুপ্রবৃত্তির উপর সুপ্রবৃত্তির প্রভুত্ব স্থাপন করা কতদূর সাধ্য। এই নিকষে যদি তাহাদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের নির্ম্মলতা প্রতিপাদিত হয়, তবে আমরা সে ধর্ম্মের গৌরব করিতে পারি; নহিলে আমরা বলিব, আপনাদিগের সন্তৃপ্তির জন্য, স্ত্রীজাতিকে আমরা ধরিয়া ও বান্ধিয়া সতী করিয়াছি, এবং এইরূপে সতী করিয়া পরের নিকট অহঙ্কার করি, আমাদিগের স্ত্রীজাতির মত সতী আর পৃথিবীতে নাই।

প্রথমতঃ। আমাদিগের বামাগণের পক্ষে পতি ভিন্ন পরপুরুষের সহিত সংসর্গ ঘটিবার অবসর ও সুযোগ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। সামাজিক স্বাধীনতা না হইলে সেরূপ ঘটিবার অল্পই সম্ভাবনা। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আমাদিগের পুরুষজাতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কতদূর সাবধানতা সহকারে বামাগণকে অন্তঃপুরমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহারা আপনাদিগের সন্তৃপ্তির

জন্য এইমাত্র চান্, যেন কোন মতে কুলকামিনীগণ অপর পুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত না হয় এবং তাহাদিগের অসৎ প্রলোভনে না পড়ে। তাঁহারা আন্তরিক সতীত্বের প্রতি তত দৃষ্টি করেন না দৈহিক সতীত্ব রক্ষা হইলেই যথেষ্ঠ মনে করেন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, আমাদিগের রমণীকুল অন্তঃপুর হইতে একবার বহির্গত হইলে অমনি অপবিত্র হইয়া যাইবে। তাঁহারা বিধবাগণের প্রতি অহোরহ নেত্র উন্মীলিত করিয়া আছেন। অতি সন্তর্পণে বিধবা কুলকামিনীগণকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। আপনাদিগের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণও যদি পুরস্ত্রীগণের কুশলবার্ত্তা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করে তাহাও আমাদিগের পুরুষজাতির পক্ষে অসহ্য জ্ঞান হয়। বাহিরে পুরাঙ্গণাগণের কোনপ্রকার রব শুনিতে তাঁহারা ভাল বাসেন না। আমাদিগের বামাগণ পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন, সুতরাং তাহাদিগকে পুরুষজাতির সকল নিয়োগেরই বশবর্ত্তিনী হইতে হয়। সামাজিক আচার ব্যবহার অতিক্রম করিবার তাহাদিগের ক্ষমতা নাই। পুরুষ জাতি যাহাকে সুশীলতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, বামাগণ সেই সুশীলতা লাভার্থ নিতান্ত যত্নবতী হয়। পুরুষজাতি যাহার উপর স্ত্রীজাতির মান ও মর্য্যাদা স্থাপিত করিয়াছেন, রমণীকুল সুতরাং সেই ব্যবহারের অনুবর্ত্তিনী হইয়া মান মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যত্নশীল হয়। তাহাদিগের আন্তরিক ভাব কেন যাহাই হউক না, পুরুষজাতি তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন না। পুরুষজাতি নিশ্চয় জানেন, তাহাদিগের আন্তরিক ভাব বড় বিশুদ্ধ নহে। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁহারা মনে মনে বিলক্ষণ জানেন, যে অবসর ও সুযোগ বিরহিত বলিয়াই তাহাদিগের স্ত্রীজাতির দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা হইতেছে। বামাগণ যদি একবার সমাজে মিশিতে পায়, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে? বাস্তবিক তখন আমরা দেখিতে পাইব, যাহাদিগের সতীত্ব লইয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া বেড়াই, তাহারা চারিদিকে যথেচ্ছাচারিতার একেবারে শেষ করিতেছে। অতএব স্বাধীনতারূপ নিকষে পরীক্ষা করিলে, তাহারদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের গৌরব কখন রক্ষিত হইতে পারে না। তবে সে সতীত্বের ধর্ম্মনৈতিক মূল্য কি? ইহার ধর্ম্মদুর্ব্বলতা দেখিলে, আমরা ইহাকে কোন মতে প্রকৃত সতীত্ব ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। সতীত্ব ধর্ম্মের পরীক্ষাস্থল স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতায় পরিস্থাপিত হইয়া যে সতীত্ব পরীক্ষিত হয় নাই, তাঁহার ধর্ম্মনৈতিক বল কতদূর তাহা আমরা কিছুই অবগত নহি। তাহার ধর্ম্মবল অবগত না হইয়া আমরা কি সাহসে তাহার গৌরব করিতে উদ্যত হই? যখন স্ত্রীজাতি স্বাধীন থাকিয়া সতীত্ব ধর্ম্মে ভূষিতা হইবে তখন আমরা একদা তাহাদিগের সতীত্বের

গৌরব করিতে পারিব। পরাধীন শত সহস্র কুলাঙ্গনার সতীত্ব, এক জন স্বাধীন রমণীর সতীত্বের সহিত তুল্যমূল্য নহে। কারণ এক জন স্বাধীন রমণীর সতীত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে। কারণ এক জন স্বাধীন বামার সতীত্ব, পরবলনিয়োজিত নহে। কারণ স্বাধীন রমণী সামাজিক ধর্ম্মনৈতিক অবস্থায় পরিস্থাপিত হইয়া আপনার ধর্ম্ম সাধন করিতেছে। কিন্তু আমাদিগের রমণীকুল সামাজিক ধর্ম্মনৈতিক অবস্থায় পরিস্থাপিত নহে। স্বাধীন অবস্থাই ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার নিদান, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাহারা সেই স্বাধীনতা বিরহিত, তাহাদিগের কোন ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা সম্ভবে না। যাহাদিগের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা নাই, তাহাদিগের ধর্ম্মের মূল্যও কিছু নাই। যাহারা স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতে পারে নাই, তাহাদিগের কার্য্যের আবার গৌরব কি ?

অতএব এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে, যে আমাদিগের স্ত্রীজাতির সতীত্ব ধর্ম্মের ধর্ম্মমূল কিছুই নাই। তাহাদিগের মধ্যে দুই এক জনের ধর্ম্ম আন্তরিক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে ধর্ম্মের কতদূর বল, স্বাধীনতা ব্যতীত তাহার পরীক্ষা হইতে পারে না। আমাদিগের বামাগণ যে প্রকার অধীনভাবে অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহাতে তাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব কিছুই উপলব্ধ হয় না। তাহারা আপনারা সতী হয় নাই, কিন্তু অবস্থা গতিকে তাহারা অসতী হইতে পারে নাই। নিষ্ঠুর পুরুষ জাতির প্রহারভয়ে তাহারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত বলিয়া তাহাদিগের বিশেষ অপ্রিয় কার্য্য করিতে সাহসিনী হইতে পারে না। জানে সে কার্য্যে লিপ্ত হইলে, চিরজীবনের জন্য তাহাদিগের ইহকাল বিনষ্ট হইবে ; সমাজ দ্বারা পরিত্যক্ত হইবে, যৎপরোনাস্তি নিন্দিত হইবে, প্রহারিত হইবে, অন্নের জন্য লালায়িত হইবে এবং দুরবস্থার একশেষ হইয়া চিরদিন কাঙ্গালিনী হইয়া দিন যাপন করিতে হইবে। এই ভয়ে তাহারা গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকে। অন্ন বস্ত্রের জন্য নিতান্ত লালায়িত হওয়া অপেক্ষা গৃহমধ্যে সকল যন্ত্রণা সহ্য করাকে তাহারা শ্রেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। সামাজিক ব্যবস্থা যদি এ প্রকার না হইত, তাহা হইলে আমরা সন্দেহ করি, যে আমাদিগের স্ত্রীজাতি এক্ষণকার মত নিষ্কলঙ্ক হইয়া আমাদিগের গৌরবের কারণ হইতে পারিত কি না ?

দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের স্ত্রীজাতির আন্তরিক ধর্ম্মবল কতদূর তাহা পরীক্ষা করা উচিত। প্রথম বিষয়ের আলোচনায় অনেক দূর প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে আমাদিগের বামাগণের আন্তরিক ধর্ম্মবল অত্যন্ত অল্পপরিমাণ। যে ভাগ্যবতী পুরস্ত্রীগণ চিরকাল পতির সহবাসে ও পতির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন, কেবল তদ্ব্যতীত দেখ, শত সহস্র পতিবিরহকাতরা কুলীন কন্যা,

বৈধব্যদশাসম্পন্না কুলাঙ্গনা, অরক্ষিত বামাকুল, দুরবস্থ নারীগণ বঙ্গদেশ কি পাপস্রোতে প্লাবিত না করিতেছে ? প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি যদি শ্রেয়স্কর হইত, তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্গদেশের বেশ্যাগণের সংখ্যা কোন দেশের সহিত সমতুল্য হইত না। বাস্তবিক আমরা যে সমস্ত নারীর দৃষ্টান্ত দিলাম তাহাদিগের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, দুই এক জন স্ত্রীরত্ন অতি বীরত্বের সহিত আপনাদিগের সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বাজবাহাদুরের হিন্দুরাণীর বিষয় গ্রহণ করিলাম। তিনি বিষপানে দুর্ব্বৃত্ত আদম খাঁর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। এক্ষণে বিচার করিতে হইবে সেই রাজ্ঞী কিরূপ অবস্থায় স্থাপিত হইয়া লম্পটের লালসা সম্পূর্ণ করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়াছিলেন। যেখানে সময় ও অবস্থার বিশেষ না দেখা যায়, সেখানে দৃষ্ট হয় যে বীরাঙ্গনার সতীত্ব ধর্ম্মবৃত্তি রিপুবৎ কার্য্য করিয়াছে। যাহা রিপুবৎ কার্য্য করে তাহার ধর্ম্মমূল্য অতি অল্প। তবে যে বীরাঙ্গণাগণের সতীত্ব ধর্ম্মভাব, স্বাধীন বামাগণের কর্ত্তব্য জ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। এত অল্প যে তাহা সাধারণ নিয়মের নিপাতনস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে সমাজে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে, তথায় কর্ত্তব্য জ্ঞান দ্বারা বামাগণ যেরূপে আপনাদিগের সতীত্বধর্ম্মভাবকে সুশাসনে নিয়মিত রাখিয়াছেন, সে প্রকার সতীত্বের অধিকতর ধর্ম্মনৈতিক মূল্য। সে সতীত্বের আমরা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ, রিপু * অপেক্ষা নিয়ম † দ্বারা পরিচালিত হওয়া অধিকতর গৌরবের বিষয়। যিনি ইহা না বুঝেন, তিনি রিপু এবং নিয়মের প্রকৃতিও প্রভেদ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

আর এক প্রকার আশ্চর্য্য সতীত্বধর্ম্মের আদর্শ নিম্নে বিবৃত হইল। ইহা আমাদিগের কোন শিক্ষিতা মহিলার রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "দুঃখের বিষয় এই আমাদের হতভাগ্য দেশে যে পতি রাখিয়া মরিল অথবা যে শ্বশুর ভাশুর ও অন্য পুরুষ সকলকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে, ভাল কি মন্দ কোন কথাই যাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে কেহ শুনে নাই, সেই পাড়ার ঠাকুরাণী, সোণাঠাকুরাণী, হরির পিসী, বামার মা, (বিদ্যাসাগর, বাচস্পতি, বিদ্যাবাগীশদের নিকট) সতী উপাধি পাইয়া বসিল। যদি কোন বিদ্যাবতী ভগিনী সরলান্তঃকরণে ভ্রাতৃস্থানীয় পুরুষগণের সহিত একটু সদালাপে প্রবৃত্ত হন, তবে অমনি উপরিউক্ত পণ্ডিতগণ চীৎকার করিয়া উঠেন—ছি ছি অমুকের বউটা কি নির্লজ্জ।" আমেরিকাবাসিগণ ক্রীতদাসের বশ্যতা অনুসারে তাহার প্রশংসা

* Passion † Principle.

করিয়া থাকে। আমাদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় দাসত্বে যাহারা অধিকতর কার্য্যকুশল হন তাহাদিগকে রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি দিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদিগের পুরুষ জাতিও তেমনি স্ত্রীজাতির জড়তা, নীরবতা ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া যে তাহাদিগের সতীত্বের প্রশংসা ও গৌরব করিবেন এ বড় আশ্চর্য্য নহে।

আমরা জ্ঞান করি, স্বাধীন সমাজের স্ত্রীজাতি অধিকতর অসতী; ইহা আমাদিগের একটি কুসংস্কারমাত্র। এই কুসংস্কারটি আমাদিগের বিবেচনার দোষের ফল। আমরা যে সমাজে অবস্থিত আছি, সে সমাজের কঠিনতর নিয়মাদিতে আমরা চির অভ্যস্ত হইয়াছি। আমাদিগের জ্ঞান হয়, ইহার কথঞ্চিৎ অন্যথায় ব্যাভিচারের ইয়ত্তা থাকিবে না। এই মনের ভাব আমরা স্বাধীন সমাজে অর্পণ করি। কিন্তু স্বাধীন সমাজের প্রকৃতি ও ভাব কিছুই অবগত নহি। সময়ে সময়ে দুই একটি ব্যাভিচারের কথা শুনিয়া আমাদিগের কুসংস্কার আরও বদ্ধমূল হইতে থাকে। কারণ অনুকূল দৃষ্টান্ত কুসংস্কারকে ক্রমশঃ বদ্ধমূল করিবেই করিবে। একবার কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে তাহা শীঘ্র অপনীত হইবার নহে। স্বাধীনতার প্রতি কার্য্যে, প্রতি শিষ্টাচারে, প্রতি রীতিতে আমরা কেবল যথেচ্ছাচারিতারই নিদর্শন দেখিতে থাকি। যে সমস্ত দৃশ্য আমাদিগের অভ্যাসের বহির্ভূত তাহাতেই আমরা অপবিত্র ভাব আরোপিত করি। স্বাধীন সমাজে যেসমস্ত সামান্য কার্য্যে কিছুই অপবিত্র ভাব আরোপিত করে না, আমাদিগের অনভ্যাস নিবন্ধন, তাহাতে আমরা কুভাব আরোপিত না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহা আমাদিগেরই চক্ষের দোষ, মনের দোষ। স্বাধীন হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করাই প্রথমতঃ আমাদিগের পক্ষে অসহ্য ও পাপময় জ্ঞান হইয়াছে। সুতরাং তৎপরে সকল ঘটনাই দুর্নীতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা স্বাধীন সমাজের ধর্ম্মবল কিছুই অবগত নহি। সেখানে প্রণয় পরের বলকর্ত্তৃক আবদ্ধ নহে, তাহা স্বাধীন ভাবে প্রবাহিত হয়। সেখানে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত আছে। সেখানে চিরবৈধব্য প্রচলিত নাই। সেখানে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেমন শাসন, আবার স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও তেমনি শাসন। দম্পতীরা, পরস্পরের সুখে সুখী। স্ত্রী সুশিক্ষিতা, পুরুষও সুশিক্ষিত। স্ত্রী যেমন পতির সহচরী, পতিও তেমনি স্ত্রীর সহচর। লোকের চক্ষুলজ্জা ও সামাজিক ভয় অধিকতর। স্বাধীন স্ত্রীমাত্রেই যে ব্যাভিচারিণী হইবে, এরূপ সকলে জ্ঞান করিতে পারেনা। পুরুষজাতির সমধিক বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। স্ত্রীজাতির ধর্ম্মবল অধিকতর। পুরুষমাত্রেই ত্বরায় ব্যাভিচারী হইতে পারেনা। কারণ বিবাহিত পুরুষমাত্রেই স্ত্রীদ্বারা সুরক্ষিত। এই প্রকার সকল বিষয় যদি আমরা সম্যক্‌রূপে স্থির বুদ্ধিতে নিরক্ষেপ হইয়া বিবেচনা করি,

তাহা হইলে আমরা স্বাধীন সমাজকে ব্যাভিচারী সমাজ বলিয়া গণনীয় করিতে পারিনা। সকল সমাজেরই ব্যবস্থা ও গঠন স্বতন্ত্র। কারণ বিশেষ বিশেষ কারণ জন্য সকল সমাজেই বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকে। তদ্দ্বারা সমাজের সংস্থিতি সাধিত হয়। এতদ্দেশেও প্রাচীন কালে স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তখনকার কালের আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতিও স্বতন্ত্র ছিল।

এক্ষণকার লোকসমাজে যে প্রকার সতীত্ব ধর্ম্মের ভাব প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকাংশে প্রতীত হইতেছে। আমরা স্ত্রীজাতির আন্তরিক সতীত্ব বড় দৃষ্টি করি না, তাহাদিগের দৈহিক সতীত্ব রক্ষা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। পুরুষজাতি সহস্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াও দুশ্চারী ও অসল্লোক বলিয়া অভিহিত হয়েন না, কিন্তু দুর্ভাগ্য স্ত্রীজাতি প্রথম পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে গমন করিলেই দুশ্চারিণী ও অসতী বলিয়া অভিহিত হয়েন। আমাদিগের সৎপুরুষের লক্ষণ একপ্রকার, সতী স্ত্রীর লক্ষণ অন্যবিধ। এই লক্ষণদ্বয় পরস্পর বিরোধী। অতএব আমাদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের সংস্কার সম্বন্ধে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে। বিরোধী লক্ষণদ্বয় উভয়েই কিছু এক ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণে হইতে পারে না। পুরুষজাতীয় লক্ষণে যদি ধর্ম্ম হয়, স্ত্রীজাতীয় লক্ষণে তবে অধর্ম্ম। তবে পুরুষজাতীয় লক্ষণে যে অনেক উদারতা ও মানব প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি লক্ষিত হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ যখন আমরা বিবেচনা করি পুরুষজাতি শাস্ত্রকার হইয়া আপনাদের পক্ষে কেন অবিচার করিবেন, তখন পুরুষজাতির লক্ষণে অনেকাংশে ধর্ম্মভাব উপলব্ধ হয়। তবে সেই লক্ষণের একটি অঙ্গ আমাদিগের নিকট নিতান্ত মানব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। এককালে বহুস্ত্রীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সহবাস কখন মানবপ্রকৃতিসঙ্গত নহে। এই স্থলে পুরুষ জাতি অযথা ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে। এই নিয়মটি ব্যতীত সৎপুরুষের অন্যান্য নিয়ম তত যুক্তি অথবা প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। সৎপুরুষের বিশুদ্ধ নিয়ম যখন আমরা স্ত্রীজাতিতে আরোপ করি, তখন আমরা সতীত্ব ধর্ম্মের একটি নূতন ভাব উপলব্ধি করি। যাহা স্বাভাবিক মানবীয় ধর্ম্ম, তাহা আপনাদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছি, এবং প্রেমবিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া, স্ত্রীজাতির উপর প্রভুত্বের অধিকার বিস্তার করিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ও অস্বাভাবিক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। তবে এক্ষণে সার কথা এই, যদি পুরুষজাতির লক্ষণ স্বাভাবিক বলিয়া মানবীয় ধর্ম্মানুমত হয়, স্ত্রীজাতির লক্ষণ তবে অস্বাভাবিক বলিয়া অবশ্য অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কারণ একই ধর্ম্মের লক্ষণ কখন দ্বিবিধ হইতে পারে না। এত কাল

ধরিয়া আমাদিগের স্ত্রীজাতি যে একটি অপ্রাকৃতিক নিয়মের পরতন্ত্র হইয়া, বিকৃত সতীত্ব ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছে, ইহাই তাহাদিগের গৌরব, ইহাই তাহাদিগের সহিষ্ণুতার একশেষ বলিতে হইবে। স্ত্রীজাতির ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধন না হইলে, মনুষ্যসমাজের সুমঙ্গল কখন আশা করা যাইতে পারেনা।

শ্রীপূ——

# পলাশীর যুদ্ধ*।

নবীনবাবুর কবিত্বশক্তি পূর্ব্বেই তাঁহার অবকাশ-রঞ্জিনীনামক অপূর্ব্ব গীতিকাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এখানি তাঁহার কবিত্বশক্তির দ্বিতীয় বিস্ফূরণ। সুপ্রসিদ্ধ পলাশীযুদ্ধের ঘটনা অবলম্বন করিয়া এখানি মহাকাব্যের আকারে সংরচিত হইয়াছে। কিন্তু মহাকাব্যের গঠনে যে সকল উপকরণসামগ্রীর প্রয়োজন ইহাতে সে সকল নাই বলিয়া ইহাকে আমরা মহাকাব্য বলিতে পারিলাম না। বাইরণের চাইল্ড হেরল্ড, এবং কালিদাসের মেঘদূত প্রভৃতির ন্যায় ইহা কতকগুলি খণ্ড কাব্যের সংগ্রহ মাত্র। মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট—ও ডাণ্টের হেল প্রভৃতি মহাকাব্যের ন্যায় ইহাতে অলৌকিকী সৃষ্টি ও অমানুষী কল্পনা নাই। হোমরের ইলিয়ড, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত, এবং কালিদাসের রঘুবংশ প্রভৃতির ন্যায় ইহাতে পরস্পরসম্বদ্ধ ঘটনাবলী নাই। ইহাতে কতকগুলি হৃদয়ভাব, কতকগুলি চিন্তা, এবং দুই একটী ঘটনা বিচ্ছিন্ন ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র।

কিন্তু যদিও ইহা এক খানি মহাকাব্য নহে, তথাপি ইহা যে এক খানি বঙ্গভাষার অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খণ্ডকাব্য তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইহার যে স্থানই আমরা পাঠ করি, সেই স্থানেই আমাদের হৃদয়আনন্দে উথলিয়া উঠে, যেন তালে তালে নাচিতে থাকে। ইহা পাঠ করিয়া আমাদের অন্তর্নিগূহিত হৃদয়ভাব যেন উদ্বোধিত হয়, আমাদের চির-দাসত্ব প্রপীড়িত হৃদয়ে যেন শুষ্ক প্রায় আশালতা অঙ্কুরিত হয়। রাজ্ঞী এলিজেবেথ্! রাজ্ঞী ক্যাথেরাইন্! তোমরা শুন পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবকে সাহায্য করা সম্বন্ধে আমাদের রাণীর কি মত?

* শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র।

"রাণীর কি মত ?" শুনি সুপ্তোত্থিতা প্রায়,
বলিতে লাগিলা রাণী ভবানী তখন ;—
"আমার কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় !
শুনিতে বাসনা যদি, বলিব এখন,
যেই কাল রঙে সবে চিত্রিলে নবাবে,
জানি আমি এই চিত্র অতি ভয়ঙ্কর,
যতই বিকৃত কেন নিকৃষ্ট স্বভাবে
কর চিত্র, ততোধিক পাপাত্মা পামর ;
রে বিধাতঃ ! কোন্ জন্মে করেছি কি পাপ ?
কোন্ দোষে সহে বঙ্গ এত মনস্তাপ ?"

"সহজে অবলা আমি দুর্ব্বল হৃদয়,
নৃপবর ! কি বলিব ? কিন্তু,—এ চক্রান্ত
কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয় ;
কেন মহারাজ ! এত হইলেন ভ্রান্ত ?
কাপুরুষ যোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায়, এক বাক্যে সব
বুঝিতে নাপারি আমি নাবুঝিনু হায় !
ভবাদৃশ বীরগণ,—বীরবংশোদ্ভব—
কেমনে এ হীন মন্ত্রে হলে উত্তেজিত,
আমি যে অবলা নারী আমার ঘৃণিত।"

"লক্ষ্মণসেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ ; তবে জানিনে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পদ্ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে কি ফল পরে ? ভেবে দেখ মনে
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতোধিক হন অত্যাচারী—
ইংরাজ সহায় তাঁর—কি করিবে তবে ?
এ পাণ্ডিত্য আমি নারী বুঝিতে নাপারি।
বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন,
দাসত্বের পরিবর্ত্তে দাসত্বস্থাপন।"

"মহারাজ ! একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিগে কর দরশন,
মোগল-গৌরব রবি আরঙ্গজিব সনে,
অস্তমিত ; নহে দূর দিল্লীর পতন ;
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাসি বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইবের করে ;
বঙ্গদেশে এই দশা—ব্রিটিস কেতন
উড়িছে গৌরবে ফেঞ্চ দুর্গের উপরে ;
কৃষ্ণসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী মৃগপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে, বসিয়া বিবরে"

"চিন্তে মনে মনে যথা : ক্লাইব তেমতি
আক্রমিতে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ,
তাহাতে তোমরা যদি সহ সেনাপতি,
বর তাঁরে, তবে তাঁর প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত ; যে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে পতঙ্গের মত
পুড়াবে নবাবে—মির্জাফরের বল
কি সাধ্য নিবাবে তারে ? হবে পরিণত
দাবানলে ; নাপারিবে এই ভীমানল,
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল।"

"বঙ্গদেশ তুচ্ছকথা—সমস্ত ভারতে
ব্রিটিসের তেজোরাশি বল অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে ? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধুচ্ছাস, ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর ?
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পিত,
দস্যুব্যবসায়ী তারা ; হবে ছারখার
ব্রিটিসের রণদক্ষ সৈনিক সহিত
সম্মুখ সমরে ; যেই শশী, তারাগণ
জিনি শোভে, হততেজ ভানুর কিরণে।"

"যেইরূপে যবনেরা ক্রমে হতবল
হইতেছে দিন দিন ; অদৃশ্যে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
ভারত অদৃষ্ট-যন্ত্রে ; দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূরিত ?
দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্র পতি
হতেছে বিক্রমশালী, কিছুদিন আর
মহারাষ্ট্র পতি হবে ভারত-ভূপতি ;
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত উদ্ধার ;
সার্দ্ধপঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে,
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে।"

"বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজবিপ্লব দুর্ব্বার ;
নাহি কায অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোধীন, দেখি বিধি বিধাতার।
কেন মিছে খাল কেটে আনিবে কুমীরে ?
প্রদানিবে স্বীয় হস্তে স্বগৃহে অনল ?
ধরিয়া ক্লাইবে, খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্তবলে, লভিবে কি ফল ?
ঘুচিবে কি অত্যাচার বল নৃপবর !
অধীনতা, অত্যাচার নিত্য সহচর।"

"জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ !
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবেনা ইংরাজ ;
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন
থামিবে না এইখানে ; হয়ে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে,
পরিণাম ভেবে মম শরীর শিহরে।"

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ ; এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত।
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।"

বিশেষ তাদের এই পতন সময় ;—
কি পাত্‌সাহ, কি নবাব, আমাদের করে
পুতুলের মত, খুজে খোঁজ নাহি হয়,
কে কোথায় ভাসিতেছে আমোদ-সাগরে।
আমাদের করে রাজ্য শাসনের ভার।
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজ-মন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে, শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায়।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয়,
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার-সময়।"

"অন্য তবে—ইংরাজেরা নবপরিচিত।
ইহাদের রীতি নীতি আচার বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি ; নাজানি নিশ্চিত
কোথায় বসতি দূর— সমুদ্রের পার।
বানর-ঔরসে জন্ম রাক্ষসী-উদরে,
এই মাত্র কিম্বদন্তী ; আকারে, আচারে,
ভয়ানক অসাদৃশ্য ; বাণিজ্যের তরে,
আসিয়ে ভারতে, এবে রাজ্যের বিস্তার
করিতেছে চারিদিগে ; দুর্দ্দান্ত প্রভাবে,
কাঁপায়েছে বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবাবে।"

"বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির সে ভবিষ্যদ্ বাণী
ভুলেছ কি মহারাজ? যদি কোন জন
ইংরাজের তেজোরাশি করিবারে গ্লানি
যোগাত মন্ত্রণা, বৃদ্ধ বলিত তখন;—
'স্থলে জ্বলিয়াছে যেই সমর-অনল
নারি নিভাইতে আমি; তাহাতে আবার
প্রজ্বলিত হয় যদি সমুদ্রের জল,
কে বল এ বঙ্গদেশ করিবে নিস্তার?'
এই সংস্কার তাঁর ছিল চিরদিন
অচিরে ভারত হবে ব্রিটিস অধীন।"

"বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়,
এতই প্রভাব যার; ভেবে দেখ মনে
নবাব অবর্ত্তমানে, এই বাঙ্গালায়
কে আটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে?
মেঘাবৃত রবি যদি এত তপ্ত হায়!
মেঘমুক্তে হবে কিবা তেজস্বী বিপুল!
স্বাধীনতা-আশালতা মুকুলিত প্রায়,
ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্ম্মূল
প্রভাব তাহার; নাহি জানি অতঃপর
কি আছে ভারত-ভাগ্যে—একি ভয়ঙ্কর!"

কড় কড় মহাশব্দে বিদারি গগন;
জিনি শত সিংহনাদ সহস্র কামান;
অদূরে পড়িল বজ্র ধাঁধিয়া নয়ন;
গরজিল ঘন, ধরা হৈল কম্পবান্।
সেই ভীম মন্দ্র, রাণী ভবানীর কাণে
প্রবেশিল, বলিলেন—"একি ভয়ঙ্কর!
ওই শুন মহারাজ! বসিয়া বিমানে
কহিছেন স্বরীশ্বর দেব পুরন্দর—
'দুঃখিনী ভারত ভাগ্যে'—অভ্রান্ত ভাষায়—
'লিখেছেন বজ্রাঘাত ভবিতব্যতায়'।"

"অতএব মহারাজ! এই মন্ত্রণায়
নাহি কায; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন;
শিতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়,
অনল শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন?
'রাণীর কি মত?' শুন আমার কি মত—
ইন্দ্রিয়-লালসা মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায়!)
নিশ্চয় প্রকৃত রোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।"

"আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ!—
অসহ্য দাসত্ব যদি; নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাসুক উজলি বঙ্গ;—এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎবেগে আমার ধমনী।"

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে;
সহি কিসে মাতৃদুঃখ? সত্য শেঠবর!—
'বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার;
জঘন্য দাসত্ব-পন্থে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি! দেখাব—আবার!'

শুনিলে! এখন বল দেখি প্রভাব, উৎসাহ, মন্ত্রে আমাদের রাণী তোমাদের সমকক্ষ হইতে পারেন কি না? বল দেখি যদি তিনি হতভাগ্য বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি অসীম সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইতে পারিতেন কি না? মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র! সেঠবর জগচ্চন্দ্র! তোমরা যদি রাণী ভবানীর ন্যায় দাসত্বকে অসহ্য জানিয়া অসি নিষ্কোষণ পূর্ব্বক সমরসাজে সাজিয়া সম্মুখ রণে প্রবেশ করিতে তাহা হইলে কেনা বলিবে যে শত শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যার পর পূর্ণশশীসমা বঙ্গ স্বাধীনতা-ধ্বজা এতদিন উড্ডীন হইয়া বঙ্গীয় আকাশকে উজ্জ্বলিত করিত? আমরাও রাণী ভবানীর সহিত জিজ্ঞাসা করি—

——————এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসী রক্ত ধমনী ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর?

নবীন! আমরা অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন তোমার রাণী ভবানীর এই বক্তৃতাটী হেমবাবুর ভারত-সঙ্গীতের ন্যায় কি দরিদ্রের পর্ণশালা কি ধনীর অট্টালিকা বঙ্গের সর্ব্বত্র গীত হয়, যেন সর্ব্বত্র সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হয়।

ভারতবাসিগণ! তোমরা যদি অতঃপর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া ইহার পরিবর্ত্তে অন্য বিদেশীয় সম্রাট্‌কে ভারতসিংহাসনে বসাইতে চাও তাহা হইলে যেন রাণী ভবানীর এই সারগর্ভ উপদেশটী মনে করো:—

"শিতলিতে নিদাঘের আতপ জ্বালায়,
অনলশিখায় পশে কোন্ মূঢ়জন?"

প্রথম সর্গের নবাববিদ্রোহিণী সভা আমাদিগকে মিল্‌টনের প্যাণ্ডিমোনীয়মকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কবি সেই প্যাণ্ডিমোনিয়মের ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া নবাববিদ্রোহিণী সভার যে ছবিটী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা রাণী ভবানীর বক্তৃতাটী সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছি। এক্ষণে ঈশশত্রু সেটানের ন্যায় জগৎসেঠের ভীষণ প্রতিহিংসা ও অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক বক্তৃতাংশটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না:—

"কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম,—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌল্লার যদি হয় অনুকূল,
অথবা মানুষ ছার, তুচ্ছ ক্ষীণজীবী,
করেন অভয়দান যদি দেবকুল,
তথাপি—তথাপি এই কলঙ্কের কালি
সিরাজদ্দৌল্লার রক্তে ধুইব নিশ্চয়;
যা থাকে কপালে, আর যা করেন কালী
কঠিন পাষাণে দেখ বেঁধেছি হৃদয়,
সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা,
অসম্ভব, হবে লুপ্ত সেঠের গরিমা।"

"যেই প্রতিহিংসা-অগ্নি—ভীম দাবানল,
জ্বলিছে হৃদয়ে মম; প্রতিজ্ঞা আমার,
সিরাজদ্দৌলার তপ্ত শোণিত তরল,
নিভাইবে সে অনল; কি বলিব আর?
সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্রমণ্ডল,

সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল,
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।"

"বঙ্গমাতা-উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার,
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন ;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ ;
আমি এ কলঙ্ক ডালি লইয়া মাথায়,
দেখাব না মুখ পুনঃ স্বজাতি-সমাজে ;
সঁপেছি জীবন মম এই প্রতিজ্ঞায়,
কথায় যা বলিলাম দেখাইব কাযে ;
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার
প্রতিহিংসা বিনে মম কিছু নাই আর।"

বঙ্গবাসী! ভীরু! দৃঢ়তাবিবর্জ্জিত! দাস! যদি তোমাদের শরীরে মনুষ্যত্ব থাকে যদি তোমাদের ধমনীতে আর্য্যশোণিত একদিনও প্রবাহিত হইয়া থাকে, যদি তোমাদের উন্নতির দিকে বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি থাকে, তবে তোমরা জগৎসেঠের নিকট অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ও ভীষণ প্রতিহিংসা অভ্যাস কর। সেই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিহিংসা সাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে আকাশ হইতে নক্ষত্র-মণ্ডল এবং পৃথিবী হইতে গগনস্পর্শিনী গিরিরাজি উৎপাটিত করিয়াও সিন্ধুজলে ভাসাইয়া দেও এবং বক্ষঃস্থল পাতিয়া ইন্দ্রের বজ্র গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত হও। এই প্রতিজ্ঞা সংসাধনে জীবন সমর্পণ কর, কথায় বলিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা কর।

এই নিভৃতসভার প্রত্যেক সভ্যের চিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবে সকল চিত্র গুলি এখানে তুলিতে পারিলাম না। আশা করি পাঠকগণ আপনারা সেই গুলি পাঠ করিয়া অসীম আনন্দলাভ করিবেন।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভেই কাটোয়ায়—ব্রিটিশ-শিবির বর্ণন। ইহার প্রথম শ্লোকটী অতি রমণীয় হইয়াছে :—

দিবা অবসানপ্রায় ; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজি শিরে স্বর্ণ সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নিচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তিমেগতিঃ॥

"অথবা যেমন হিরকশলাকা দ্বারা বিদ্ধ মণিতে অতি কোমল সূত্রেরও গতি অসম্ভব নয়, সেইরূপ বাল্মীকাদি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কৃতবাগ্দ্বার রঘুবংশরূপ দুরূহ বিষয়ে মাদৃশ মূঢ়মতিরও প্রবেশ দুঃসাধ্য নহে।" বাস্তবিক প্রাচীন কবিগণ যে সকল বিষয়ে পুনঃ পুনঃ কবিতা

রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ে কবিত্ব প্রদর্শন করা নবীন কবির পক্ষে দুরূহ ব্যাপার নহে। কিন্তু যে পথ অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, যাহাতে কোন মহাকবি অদ্যাপি বিচরণ করেন নাই, সেই নবাবিষ্কৃত পথে বিচরণ করা সামান্য সাহসের কায নয়! অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় যত কাব্য রচিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির বিষয়ীভূত প্রাচীন ঘটনাবলীর মন্থনের ফল। কোন আধুনিক প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় অধিক কাব্য সংরচিত হয় নাই। নবীন বাবু বঙ্গ কাব্যকাননের এই অভাবটী মোচনের জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমাদের নবীন কবি এই নবীন পথে বিচরণ করিতে যাওয়ার অসম সাহসিকতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই নূতন পথে বিচরণ জন্য কবির মনে যেরূপ ভয় ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তিনি দ্বিতীয় সর্গের আশা নামক প্রবন্ধে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ,
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি,
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি?
বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি।
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি বল, কুহকিনি!
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজ্বলে ধরণী।

কোন পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি, গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে,
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ? কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু হে দুরাশে! তোমার মায়ায়;
কত ক্ষুদ্র নর ধরি পদচ্ছায়া তব
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়;
অতএব দয়া করি কহ, দয়াবতি!
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত সেনাপতি?

কবি ক্লাইবের যে চিত্রটী দিয়াছেন তাহা অতি গম্ভীর ও সাহসব্যঞ্জক। ক্লাইব পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে ভয় ও আশায় চিন্তা-অবসন্ন মনে নিমীলিত নেত্রে আসনে বসিয়া আছেন এমন সময় :—

অকস্মাৎ চারিদিগে ভাসিল সত্বরে
স্বর্গীয় সৌরভরাশি; বাজিল গগণে
কোমল-কুসুম-বাদ্য;—সঙ্গীত তরল;
সহস্র ভাস্কর তেজে গগণপ্রাঙ্গন
ভাতিল উপরে, নিম্নে হাসিল ভূতল,
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগণ,
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।

যুবতীর শুভ্র কান্তি, নয়ন নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব রাগে অলক্ত অধর,
রাজরাজেশ্বরীরূপ, অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন মর চিত্রকর!
শ্বেতাঙ্গ সজ্জিত শ্বেত উজ্জ্বল বসনে,

খেলিছে বিজলী, বস্ত্র অমল ধবলে,
তুচ্ছ করি মণিমুক্তা পার্থিব রতনে,
ঝলিছে নক্ষত্ররাজি বসন-অঞ্চলে।
বেষ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত,
স্বর্গীয় শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।

অৰ্দ্ধ-অনাবৃত পীন পূর্ণ পয়োধর,
তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর—
চির-প্রসন্না-ময়, প্রীতিপারাবার।
নহে উপমেয় সেই বদনচন্দ্রমা,
—কিম্বা যদি দেখিতাম লিখিতাম তবে—
স্বর্গীয়-শারদ-শশী সে মুখ-সুষমা;
বিশ্ববিমোহিনী আহা! অতুলিত ভবে!
বসন্তরূপিণী ধনী; নিশ্বাস মলয়;
কোকিল কোমল কণ্ঠ; নেত্র কুবলয়।

কোটি কহিনুরকান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন, সেই বরাননে;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে,
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম সৌরভ
ঘ্রাণে নর অমরত্ব করে অনুভব।

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির-প্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা,
যেমন প্রখরতেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃত মাখা পূর্ণমধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে।

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—'কিভয় বাছনি'—
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্ন পবনে
বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠধ্বনি
শুনিতে জাহ্নবীজল বহিল উজান;
অচল হইল রবি অস্তাচল শিরে,
মুহূর্ত্ত করিতে সেই স্বরসুধাপান;
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের; বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী-স্রোতে; বাজিল অমনি

শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্রে,—'কি ভয় বাছনি!'
"ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি সুভাগিনী
লক্ষ্মীকুললক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি!
রাজলক্ষ্মী মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী
বিধাতার; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে
আমি চিরগৌরবিণী; ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোত; চিন্তি অনিবার
ইংলণ্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি বিস্তার।"

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন;
আসিনু পৃথিবীতলে, তোমায়ে, বাছনি!
শুনাইতে ভবিষ্যত বিধির লিখন;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি।
এই হতে ইংলণ্ডের উন্নতি নিয়তি;

তোমরা সেই আশ্রিতজনগণের প্রতি নিদারুণ ব্যবহার আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই ইংলণ্ডরাজলক্ষ্মী তোমাদিগের নিকট হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবেন, শ্বেতদ্বীপ শ্রীভ্রষ্ট হইবে, তোমরা অনাহারে অকালে কাল-কবলে পতিত হইবে, ভারতকহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুট হইতে খসিয়া ভূতলে পতিত হইবে। ভারতবাসীরা আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে কখন অস্ত্রধারণ করেন নাই। আশ্রয়দাতারাই অত্যাচারী হইয়া একে একে আপন আপন কর্ম্মফলে এই সোণার ভারতসিংহাসন হারাইয়াছেন ! ]

[illegible] হইলা বামা ; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের ; গেল স্বর্গ, এল ধরাতল।
হায় ! যথা হতভাগ্য জলমগ্ন জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে, সলিল ভিতরে,
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি নিরখিয়া, মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল ;
অন্তর নয়নে বীর ব্রিটননন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিল তেমন।

ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর এই দৃশ্যটী কি রমণীয়। বাঙ্গালা ভাষার অতি অল্প কাব্যে কল্পনার এরূপ অদ্ভুত বিস্ফূরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি যে গীত দ্বারা দ্বিতীয় সর্গের পর্য্যবসান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্বাধীন জাতিমাত্রেরই হৃদয়ে বীরত্ব ও স্বাধীনতার ভাব উত্তেজিত হয়। সমরস্পৃহা বলবতী হয়। কিন্তু চির-পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরে সেরূপ ভাব উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন, যখন তাঁহাদিগের জয়স্তম্ভ অষ্টাদশ দ্বীপে নিখাত ছিল, তখন সিংহল যাত্রা কালে তাঁহাদিগের অন্তরে এরূপ ভাব যে একদিন উদিত হইয়াছিল, আর তাঁহারা যে সিংহলে রণযাত্রার সময় একদিন নিম্নলিখিত প্রকার গীত গাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ;—

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তারা আকাশে যেন নিশামণি,
সুখেতে ভারত আনন্দে বিহরে,
বীরপ্রসবিনী ভারতজননী,
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জ্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
ভারতের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুম্বে ভারতচরণ ;
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয় !"

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ভারতনন্দন ;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।
বহুদূরগত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পাশ্চত্য প্রদেশে,
ভারতের কীর্ত্তি না আছে কোথায় ?

পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"।

সম্পদ সাহস ; সঙ্গী তরবার ;
সমুদ্র বাহন ; নক্ষত্র কাণ্ডারী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার,
শয্যা রণক্ষেত্র ; ঈশ ত্রাণকারি।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার ;
আছে কোন্ দুর্গ ? কোন্ অদ্রিপতি ?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার ?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়" ?

আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে যারে বীর ভারততনয় ?
কেবল ভারতললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয় ;
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে,
স্মরিয়া অন্তরে ; চল রণে তবে ;
হায় ! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে,
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"।

অতএব সবে অভয় অন্তরে,
চীত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান,
ভারতের পুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী খড়্গ ধনুর্ব্বাণ ;
ভারতের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয় ;
কিছার দুর্ব্বল সিংহলভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয় ;

গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"।

কবি তৃতীয় সর্গে যে প্রণয়বিষাদগীতটী বামার বদন হইতে উদ্গীত করিয়াছেন, পাঠক ! অনন্যমনে তাহা একবার শ্রবণ করুন। শুদ্ধ আমাদিগের অনুরোধ নয় কবিরও অনুরোধ ;—

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতলজলে, তবে প্রেমরত্ন মিলে,
কারো ভাগ্যে মুক্তা ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুত-প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশনে অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়,
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে,
কালি হবে অশ্রুজল।

রমণীকণ্ঠ বিনিঃসৃত অশ্রুজলসহিত এই গান শ্রবণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার—

নির্ব্বাসিত কামানল হলো উদ্দীপন,
গগনেতে কাল মেঘ হইল উদয় ;
উছলিল সিন্ধু ; মত্ত হইল যবন।
সুপ্ত বাসনার স্রোত হইয়া প্রবল
ছুটিল ভীষণ বেগে, চিন্তার বন্ধন
কোথায় ভাসিয়া গেল ; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন ;

এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য ভাস্কর;
মধ্যাহ্ন গৌরবে যবে ব্রিটন ভূপতি
উজলিবে দশদিগ. দেশ দেশান্তর;
তাঁর পুত্র ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।"

"সোণার ভারতবর্ষে, বহু দিন আর,
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাসী দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত; দ্বিতীয় 'বাবার'
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন;
কিম্বা অতিক্রমী দূর হিমাদ্রি কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন
ভীম বেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর,
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়,
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।"

"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছু দিন পরে
যেই মহাশক্তি বাছা করিবে প্রবেশ,
মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লীর ঈশ্বরে;
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি, ছাড়ি রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র সিংহ পশিবে বিবরে!
যেমতি উঠিতে থাকে গগণ উপরে,
ততই পাদপছায়া হয় খর্ব্বাকার;
তেমতি এশক্তি যত হইবে প্রবল;
ভারতে ফরাসি তত হবে হতবল।"

তুমি সে শক্তির মূল আদি অবতার;
হইওনা চমৎকৃত, ভেবোনা বিস্ময়,
ভারত অদৃষ্টচক্র, কৃপাণে তোমার
সমর্পিত; যেই দিকে তব ইচ্ছা হয়,
ঘুরিবে ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামত।
বঙ্গে যেই ভিত্তি ভূমি করিবে স্থাপন,
সময়েতে তদুপরি, ব্যাপিয়া ভারত
অটল অচল রাজ্য হইবে স্থাপন।
বিধির মন্দির হতে আনিয়াছি আমি,
ভারতবর্ষের ভাবি মানচিত্রখানি।"

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ উর্দ্ধ শিরে পরশে গগণ;
অদ্রির উপরে অদ্রি অদ্রি তদুপরে,
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ;
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
—উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি উর্ম্মি তদুপর—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে;
অচল পর্ব্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে।"

"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায়;
পঞ্চভূজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,
বিংশতি ব্রিটন নাহি হ'ব সমতুল;
তথাপি হইবে—আর নাহি বহু দিন;
অভাগিনী প্রতি বিধি চির প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র, ব্রিটন অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায়?

"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথী তীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবি রাজধানী;
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র কুটীরে,
শোভিবে অমরাবতী রূপে করি গ্লানি
রাজহর্ম্ম্যে, দৃঢ় দুর্গে, গ্যাসের মালায়!
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা শিরে

ব্রিটিস পতাকা ; যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে ;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে ব্রিটিস রাজ্য করিবে স্থাপন।”

“নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্নসিংহাসনে ;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায় ;
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত,
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য, রাজা, হবে আনত উন্নত ;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে সমরে ;
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
ইংলণ্ডের প্রতিনিধি,—ভারতঈশ্বর।”

“শতেক বৎসর রাজ্যবিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল ;
উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল ;
কঙ্কালবিশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল,
ঘুরিবে বেষ্টিয়া সৌর উপগ্রহ মত ;
আশু রাহুগ্রস্ত হয়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিম্বা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত ;
বিক্রমে শার্দ্দূল, মেষ, অহিংস অন্তরে,
নির্ভয়ে করিবে পান, একই নির্ঝরে।”

“ধর, বৎস! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত ; ব্রিটিসের রাজ্য নিদর্শন ;
যত দিন পূর্ব্ব রাজ্যে ব্রিটিস শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
তত দিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয় ;
এই মহারাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয় ;
এই পাপে কতরাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার অসি, রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে, বিধাতার করে।”

“যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী,—চিরপরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব ; দমি অত্যাচারী,—
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে,—
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন ;
ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে,
উদিবে নিদাঘতেজে ব্রিটিস তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
ডুবিবে ব্রিটিস রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয়।”

“রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর ;
জেতার উপরে জেতা জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস! অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান্ ন্যায়,
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে,
সম ভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে,
সমভাবে সর্ব্বদেশে শ্বেতে ও শ্যামলে
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল ;
সম্মুখে-ভীষণ, বৎস! গণনার স্থল।”

[ দৃপ্ত ব্রিটনগণ! ইংলণ্ড রাজলক্ষ্মীর এই গভীর উপদেশগুলি যেন তোমাদের হৃদয়-ফলকে উজ্জ্বলবর্ণে চির-অঙ্কিত থাকে। যে পরাধীন হতভাগ্য ভারতবাসী যবনের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আজ তোমাদিগের শরণাপন্ন হইতেছে, যে মুহূর্ত্তে

তোমরা সেই আশ্রিতজনগণের প্রতি নিদারুণ ব্যবহার আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই ইংলণ্ডরাজলক্ষ্মী তোমাদিগের নিকট হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবেন, শ্বেতদ্বীপ শ্রীভ্রষ্ট হইবে, তোমরা অনাহারে অকালে কাল-কবলে পতিত হইবে, ভারতকহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুট হইতে খসিয়া ভূতলে পতিত হইবে। ভারতবাসীরা আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে কখন অস্ত্রধারণ করেন নাই। আশ্রয়দাতারাই অত্যাচারী হইয়া একে একে আপন আপন কর্ম্মফলে এই সোণার ভারতসিংহাসন হারাইয়াছেন!]

অদৃশ্য হইলা বামা; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের; গেল স্বর্গ, এল ধরাতল।
হায়! যথা হতভাগ্য জলমগ্ন জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে, সলিল ভিতরে,
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি নিরখিয়া, মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল;
অন্তর নয়নে বীর ব্রিটননন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিল তেমন।

ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর এই দৃশ্যটী কি রমণীয়। বাঙ্গালা ভাষার অতি অল্প কাব্যে কল্পনার এরূপ অদ্ভুত বিস্ফূরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি যে গীত দ্বারা দ্বিতীয় সর্গের পর্য্যবসান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্বাধীন জাতিমাত্রেরই হৃদয়ে বীরত্ব ও স্বাধীনতার ভাব উত্তেজিত হয়। সমরস্পৃহা বলবতী হয়। কিন্তু চির-পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরে সেরূপ ভাব উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন, যখন তাঁহাদিগের জয়স্তম্ভ অষ্টাদশ দ্বীপে নিখাত ছিল, তখন সিংহল যাত্রা কালে তাঁহাদিগের অন্তরে এরূপ ভাব যে একদিন উদিত হইয়াছিল, আর তাঁহারা যে সিংহলে রণযাত্রার সময় একদিন নিম্নলিখিত প্রকার গীত গাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই;—

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তারা আকাশে যেন নিশামণি,
সুখেতে ভারত আনন্দে বিহরে,
বীরপ্রসবিনী ভারতজননী,
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জ্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
ভারতের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুম্বে ভারতচরণ;
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়!"

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ভারতনন্দন;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী;
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।
বহুদূরগত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পাশ্চাত্য প্রদেশে,
ভারতের কীর্ত্তি না আছে কোথায়?

পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"।

সম্পদ সাহস; সঙ্গী তরবার;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডারী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার,
শয্যা রণক্ষেত্র; ঈশ ত্রাণকারি।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার;
আছে কোন্ দুর্গ? কোন্ অদ্রিপতি?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"?

আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে যারে বীর ভারততনয়?
কেবল ভারতললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয়;
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে,
স্মরিয়া অন্তরে; চল রণে তবে;
হায়! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে,
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"।

অতএব সবে অভয় অন্তরে,
চীত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান,
ভারতের পুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী খড়্গ ধনুর্ব্বাণ;
ভারতের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয়;
কিছার দুর্ব্বল সিংহলভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়;
গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"।

কবি তৃতীয় সর্গে যে প্রণয়বিষাদগীতিটী বামার বদন হইতে উদ্গীত করিয়াছেন, পাঠক! অনন্যমনে তাহা একবার শ্রবণ করুন। শুদ্ধ আমাদিগের অনুরোধ নয় কবিরও অনুরোধ;—

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?
ডুবিলে অতলজলে, তবে প্রেমরত্ন মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুত-প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশনে অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়,
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে,
কালি হবে অশ্রুজল।

রমণীকণ্ঠ বিনিঃসৃত অশ্রুজলসহিত এই গান শ্রবণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার—

নির্ব্বাসিত কামানল হলো উদ্দীপন,
গগনেতে কাল মেঘ হইল উদয়;
উছলিল সিন্ধু; মত্ত হইল যবন।
সুপ্ত বাসনার স্রোত হইয়া প্রবল
ছুটিল ভীষণ বেগে, চিন্তার বন্ধন
কোথায় ভাসিয়া গেল; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন;

মুছাইতে অশ্রু কর করিল বিস্তার,
"ধুম্" ক্রোরে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার।

এই ভীষণ তোপধ্বনি শ্রবণ করিয়া নবাবের—

ঘুরিল মস্তক, ভয়ে লুকাল অনঙ্গ
শিরস্ত্রাণ পড়ে ভুমে দিল গড়াগড়ি;

যবনরাজ ক্ষণকাল নীরবে ভ্রমণ করিয়া গবাক্ষে বাহু ন্যস্ত করিয়া অনতিদূরস্থিত শত্রুশিবিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন অমনি :—

চমকিল অকস্মাৎ, ঝরিল ধরায়
একটী অশ্রুর বিন্দু; একটী নিশ্বাস
বহিল ;——

প্রবল ঝটিকা-শেষে জলধি যেমন
ধরে সুপ্রশান্ত ভাব, উন্মত্ত তরঙ্গে
কিছুক্ষণ করি বেগে সিন্ধু বিলোড়ন,
ক্রমশঃ বিলীন হয় সলিলের সঙ্গে ;
তেমতি নিশ্বাস শেষে নবাবের মন
হইল অপেক্ষাকৃত স্থির সুশীতল ;
মুহূর্ত্তেক মনোভাব করি নিরীক্ষণ
বলিতে লাগিল ধীরে চাহি ধরাতল ॥
"কেন আজি মন মম এত উচাটন ?
বোধ হয় বিষে মাখা সকল সংসার !
কেন আজি চিন্তাকুল হৃদয় এমন ?
কেমনে হইল এই চিন্তার সঞ্চার ?"
বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ-রোদন,
সতীত্বরতন-হারা রমণীর মুখ,
নিদারুণ যাতনায় যাদের জীবন
বধিয়াছি, নিরখিয়া তাহাদের মুখ,
হর্ষ-বিকসিত হতো যাহার বদন,
তার কেন আজি হলো সজল লোচন ?"

দেখিলেন যেন শিবিরে প্রত্যেক আলোকের নিকট তাঁহার নিদারুণ অত্যাচার সকল চিত্রিত রহিয়াছে। দৃষ্টিবিভ্রম মনে করিয়া রুমালে দুনয়ন মুছিতেছিলেন ;—

কিন্তু হৃদয়েতে যেই কলঙ্ক বিষম,
ঘুচিবে সে দোষ কেন মুছিলে নয়ন ?
পরিষ্কারি নেত্রদ্বয় দেখিলে আবার,
সেই চিত্র স্পষ্টতর দেখে পুনর্ব্বার !
দেখে বিভীষিকা মূর্ত্তি ভয়াকুল মনে,
নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে,
প্রত্যেকে একটী পাপ চিত্রিয়া গগনে,
দেখায় প্রত্যেক তারা বিবিধ বিধানে।

কি গভীর অনুতাপ! কি হৃদয়দ্রবকারিণী অনুশোচনা! বলিতে লাগিয়ালেন :—

"এই বঙ্গরাজ্যে অতি দীন নিরাশ্রয়
যেই সব প্রজাগণ, সারা দিন হায়
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত অতিশয় ;
অনশনে তরুতলে ভূতল-শয্যায়
করিয়া শয়ন, এই নিশীথে নির্ভয়ে,
লভিছে আরাম সুখে তারাও এখন।
আমি তাহাদের রাজা, আমি এ সময়ে
সুবাসিত কক্ষে কেন বসিয়া এখন ?

কি শোচনীয় অবস্থা! অত্যাচারী রাজার পরিণাম প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বলে ও অত্যাচারে ভারত শাসন করিতে উপদেশ দেন, তাঁহাদিগের নয়নসমক্ষে সিরাজদ্দৌলার জীবনের এই শেষ চিত্রটী ধরিয়া দেওয়া উচিত। দুর্ব্বল ভারতবাসী যেন অন্যায় ও অত্যাচারেও তাঁহাদিগের পদানত হইয়া রহিল, তাহারা যেন অন্তরের

যাতনা অন্তরেই নিগূহিত করিল, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহাদিগের মুক্তি ? কখনই নহে—শক্তি থাকিতে না হউক মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে যখন তাঁহাদিগের দৃষ্টি ও নাড়ী ক্ষীণ হইবে তখনও অন্ততঃ অনুতাপানল তাঁহাদিগের হৃদয় দগ্ধ হইবেই হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সিরাজদ্দৌলার এই গভীর অনুতাপ আমাদিগকে ম্যাক্‌বেথ ও লেডি ম্যাক্‌বেথের শেষাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

সিরাজদ্দৌলার প্রতিহিংসাবৃত্তিও ম্যাক্‌বেথের প্রতিহিংসবৃত্তির ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর। তিনি সেনাপতি মিরজাফরকে অবিশ্বাসী ও আততায়ী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"এখন কোথায় যাই কি করি উপায় ?
বিশ্বাসঘাতকী হায় ডুবালে আমায় !
যদি কোন মতে কালি পাই পরিত্রাণ,
মিরজাফরের সহ যত বিদ্রোহীর,
মনোমত সমুচিত দিব প্রতিদান,
বধিব সবংশে; আগে যত রমণীর
বিতরি সতীত্বরত্ন আপন কিঙ্করে,
তাদের সম্মুখে ; পরে সস্ত্রীক সন্তান
কাটিব, শোণিত পিতা পতির উদরে
প্রবেশি বিদ্রোহতৃষা করিবে নির্ব্বাণ ;
পরে তাহাদের পালা"—

এই বলিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার নিজ অনুচর শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল। নবাব ইহাকে যমদূতস্বরূপ মিরজাফরের দূত মনে করিয়া শিবির-কোণে লুকাইলেন ও ভয়ে কম্পিত কলেবর হইলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার প্রতিহিংসাবৃত্তি যেরূপ প্রবল, বীরত্ব ও সাহস তাদৃশ প্রবল ছিল না। সুতরাং তিনি ম্যাক্‌বেথের ন্যায় সম্মুখ সমরে শত্রুরুধিরে প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে সাহসী হন নাই। এই জন্য তিনি অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলেন :—

"যা থাকে কপালে, আর অদৃষ্ট ভাবিয়া,
ক্লাইবে লিখিব পত্র, দিব রাজ্য ধন
বিনা যুদ্ধে, যদি রক্ষে আমার জীবন।"

এই কথা বলার পর ক্ষণেই তাঁহার মনে ইংরাজদিগের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব উদিত হইল, অমনি বলিয়া উঠিলেন :—

"কি বিশ্বাস ক্লাইবেরে ! নিয়ে সিংহাসন,
নিয়ে রাজ্যভার"—

এইরূপ বলিতেছিলেন এমন সময় সহসা শিবির মধ্যে একটী মানবচ্ছায়া পতিত হইল। নবাব শত্রুচর মনে করিয়া লেখনী ফেলিয়া পুনর্ব্বার প্রাণ ভয়ে শিবিরাভ্যন্তরে লুকাইলেন। কিন্তু বেগমের পরিচারিকাকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জা ও ঘৃণায় নিপীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন :—

"না—এই যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি,
এখনি পড়িব মিরজাফরের পায়ে,
রাখিয়া মুকুট, রাজদণ্ড তরবারি,
তাহার চরণতলে, পড়িয়া ধরায়
মাগিব জীবন ভিক্ষা ; অন্তরে তাহার
অবশ্য হইবে দয়া"—

নবাব অন্তরে এই ভাবিয়া মন্ত্রীর শিবিরের দিকে উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িতেছিলেন, এমন সময় কল্পনাচক্ষে সম্মুখে শত ভীম নরহন্তা দেখিতে পাইলেন। এবং "অবিশ্বাসী! আততায়ী! বধিল জীবন।" এই বলিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন :—

অমনি বিদ্যুৎবেগে করিয়া বেষ্টন,
ধরিল রমণীভূজ মৃণাল যুগলে ;

এক নবাবমহিষী শিবিরের এক পার্শ্বে পর্য্যঙ্কোপরে বসিয়া প্রথম হইতে—

নবাবের ভাব দেখি বিষণ্ণ অন্তরে
শয্যা ভিজাইতেছিল নয়নবারিতে ;

এখন সহসা—

নবাবে ছুটিতে দেখি উন্মাদ আকার,
গিয়াছিল বিষাদিনী পশ্চাতে তাহার।

তাহার পর--

কামিনী কোমল স্নিগ্ধ অঙ্গ পরশিতে
কিছু পরে বঙ্গেশ্বর চেতন পাইয়া,
অবোধ শিশুর মত লাগিল কাঁদিতে ;
বিষাদিনী প্রেয়সীর গলায় ধরিয়া।

* * * * * *

"একি নাথ!" জিজ্ঞাসিল বিষাদিনী ধনী,
অভাগা অস্ফুটস্বরে বলিল তখন—
"অবিশ্বাসী—আততায়ী বধিল জীবন"
বলিতে বলিতে ক্লান্ত হলো কলেবর ;

* * * * *

ভাবনায়, অনিদ্রায়, হইয়া অধীর,
অমনি অজ্ঞাতে ধীরে মুদিল নয়ন ;
বিকট স্বপন যত দেখিল নিদ্রায়,
বলিতে শোণিত, কণ্ঠ, শুকাইয়া যায়।

এইরূপে সিরাজ নিদ্রাবস্থায় উপর্য্যুপরি সাতটী স্বপ্ন দেখিলেন। ঐ সকল স্বপ্নে সিরাজকৃত যে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপারের ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বাস্তবিকই শোণিত ও কণ্ঠ শুকাইয়া যায়। এরূপ ভয়ঙ্কর কল্পনার বিকাশ আমরা বঙ্গভাষায় অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর করি নাই। ম্যাক্‌বেথে ব্যাঙ্কিওর রুধিরাক্ত প্রেত দেহ কেবল আমাদিগের মনে এরূপ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব করিয়া দিয়াছিল।

"বহুপত্নীক যবনদিগের স্ত্রীর অন্তরে প্রেম থাকিতে পারে না" যাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন নিম্নলিখিত চিত্রটী তাঁহাদিগের সেই বিশ্বাসের ভঞ্জন করিয়া দিবে :—

প্রেমপূর্ণ স্থিরনেত্রে আনতবদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ পানে ;
বিলম্বিত কেশরাশি, আবরি আননে
পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শয্যা-উপাধানে ;
এক ভূজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠতলে,
অন্য করে মুছে নাথ বদন-মণ্ডল ;
থেকে থেকে তিতি বামা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল ;
মুছাইতে স্বেদবিন্দু, বামার নয়ন
অমর দুর্ল্লভ অশ্রু করিছে বর্ষণ।

নির্জ্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী,
—নিদ্রিত রাঘবশ্রেষ্ঠ উরুউপাধানে—
কেঁদেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,
চাহি পথশ্রান্তে পতি নরপতি পানে;

অথবা বিজন বনে, তমসা নিশীথে,
মৃতপতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী,
কেঁদেছিল যেই অশ্রু ; এই রজনীতে
কাঁদিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী ;
তুচ্ছ বঙ্গ-সিংহাসন—এই অশ্রু তরে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপদ অম্লান অন্তরে।

এদিকে ক্লাইব নিজ শিবিরাভ্যন্তরে বসিয়া অনিদ্রায়, মনের চাঞ্চল্যে, অতি কষ্টে রজনী যাপন করিতেছেন, অনিশ্চিত ভবিষ্যদ্ভাবনায় থেকে থেকে তাঁহার হৃদয় ভয়ে কাঁদিয়া উঠিতেছে। এত অল্প অদূরদর্শী ও অশিক্ষিত সেনা লয়ে কেমনে অংসখ্য যবন সৈন্যকে পরাজয় করিব, কেমনে ক্ষীণ তৃণদল দিয়া অসংখ্য অশনিবৃন্দ কাটিব, যদি রণে পরাজয় হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের সমস্ত আশা বিফল হইবে, দুলঙ্ঘ্য সাগর পার হইয়া সংবাদ দিতে একজন ইংরাজও শ্বেতদ্বীপে আর ফিরিয়া যাইবে না—এই সকল গভীর ভাবনায় তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল। তিনি একবার স্থির করিলেন :—
"ফিরে যাই, নাই কায বিষম সাহসে,
স্বইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্রমুখে পশে ?"

আবার রণপরাঙ্মুখতার অবশ্যম্ভাবী বিপদ সকল তাঁহার নয়নসমক্ষে আবির্ভূত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন :—
"ফিরে যাব ? কোথা যাব? স্বদেশে আমার ?
বৎসরের পথে বল যাইব কেমনে ?
ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কালসম দুরন্ত যবনে ;
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে
অথবা করিবে বন্দ রাজকারাগারে,
কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীয়ন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে ;"

এই ভীষণ পরিণাম ভাবিয়া ক্লাইব স্থির করিলেন—প্রতিজ্ঞা করিলেন :—
"কি কায পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব, শুইব রণে অনন্ত শয্যায়।
আমরা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী ;
আমাদের স্বাধীনতা বীরতা জীবন ;
রণক্ষেত্রে এই দেহ হলে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন ;
করিব না, করে অসি থাকিতে আমার,
জননীর শ্বেত অঙ্গে কলঙ্ক অর্পণ ;
মরিব, মারিব শত্রু, করিব সংহার,
বলিলাম এই অসি করি আস্ফালন ;
শ্বেতদ্বীপ ! যিনি রণ ফিরিব আবার,
তা না হয়, এই খানে বিদায় সবার !"

ধন্য ব্রিটননন্দন ! ধন্য তোমার সাহস ! ধন্য তোমার বীরত্ব ! তোমার একদিনের সাহসে, তোমার একদিনের বীরত্বে, অনন্তকালের জন্য ভারতকহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরীর মস্তক উজ্জ্বল করিল। কিন্তু বীরবর ! তুমি রণে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিতে সেও তোমার ভাল ছিল, তথাপি নীচ মন্ত্রণায় ও জঘন্য ষড়যন্ত্রে কর্ণপাত করিয়া ইংলণ্ডের নিষ্কলঙ্ক যশে কলঙ্কারোপ করা তোমার উচিত ছিল না। যাঁহার অসীম সাহস ও বিপুল পরাক্রম তাঁহার এ সকলে প্রয়োজন কি ?

সর্গের ন্যায় তৃতীয় সর্গও

একটী সঙ্গীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এটীত সঙ্গীত নয় যেন প্রেমময় মধু-ধারা। কোন বিরহবিধুর ব্রিটিস যুবক প্রিয়তমা কেরোলাইনাকে উদ্দেশ করিয়া এই গানটী গাইয়াছিলেন। ইহার স্থানে স্থানে গোলকণ্ডার হিরকের ন্যায় অমূল্য কবিত্বরত্ন নিহিত আছে।

চতুর্থ-সর্গে পলাশির যুদ্ধ বর্ণন। ক্লাইব পলাশির আম্রবনে অবস্থিত। রজনী প্রভাত। অরুণের কিরণজালে অবনী-মণ্ডল সুবর্ণময়। কবি এই অবস্থাটী কি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

পোহাইল বিভাবরী পলাশি প্রাঙ্গনে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী ;
চিত্রিয়া ভারত-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
উঠিলেন দুঃখভাবে ধীরে দিনমণি ;
শান্তোজ্জ্বল করবাশি চুম্বিয়া অবনী,
প্রবেশিল আম্রবনে ; প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ শতদলে ভাসিল অমনি ;
ক্লাইবের মনে হল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার ;
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

দিনমণি গগনললাটে উদিত হইতে না হইতেই ঃ—

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন, উঠিল সে ধ্বনি।
নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।
নিনাদে সমররঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীমরবে দিগঙ্গনে,
কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে,
উঠিল অম্বর পথে করি ঘোর রোল।
ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে ;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হলো রণস্থল।
অকস্মাৎ একেবারে শতেক কামান,
করিল অনলবৃষ্টি,
যেন বিনাশিতে সৃষ্টি,
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হলো তিরোধান!
অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয় মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রাখিতে সেনায়।
সম্মুখে সম্মুখে বলি সরোষে গর্জ্জিয়া
করে অসি তীক্ষ্ণধার,
ব্রিটিসের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।
ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।
আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।
আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগন।

ছুটিল একটী গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মির্ মদন পতন!

এরূপ ভীষণ যুদ্ধ বর্ণনা আমরা বঙ্গভাষায় আর পাঠ করি নাই। সেনাপতি মির্-মদনের মৃত্যুতে নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছিল এমন সময় বিক্রমকেশরী হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল ক্ষত্রিয়োচিত গাম্ভীর্য্য ও বীরত্বের সহিত বলিতে লাগিলেন :—

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জ্জিল মোহনলাল "নিকট শমন"
"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারোনা থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন!"
"ভারতে পাবিনা স্থান করিতে বিশ্রাম,
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলি ধেয়ে,
মরিবি মরিবি ওরে যবন-সন্তান!"
"সেনাপতি! ছিছি একি! হা ধিক্ তোমারে
কেমনে বলনা হায়!
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে!"
"ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ,
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?"

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার,
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর?"
"সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয়,
দেখিবে তাদের হায়,
রাজা, রাজ্য ব্যবসায়,
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়"।
"নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব শৃঙ্খল ভার,
ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়।"
"যেই হিন্দু জাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।"
"বীরপ্রসবিনী যত মোগোলরমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে,
প্রসবিল কুলাঙ্গারে,
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি।"
"প্রণয় কুসুম-হার রে ভীরু দুর্ব্বল!
পরাইলি যে গলায়,
বলনা রে কি লজ্জায়
পরাইবি সে গলায় দাসীত্বশৃঙ্খল।"
"কোথায় ক্ষত্রিয়গণ সমরে শমন,
ছিছি ছিছি একি কায
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ,
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠ করালি দর্শন?"
"বীরের সন্তান তোরা বীর অবতার;
স্বকুলে দিলিরে ঢালি,
এমন কলঙ্ককালি,
শৃগালের কায, হয়ে সিংহের কুমার!"

'কেমনে যাবিরে ফিরে ক্ষত্রিয়সমাজে,
কেমনে দেখাবি মুখ,
জীবনে কি আছে সুখ,
স্ত্রীপুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে ॥'
"ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সাহস সহায়,
সে বীরত্ব-প্রভাকরে,
অর্পি ভীরু! রাহুকরে,
কেমনে ফিরিবি ঘরে কি ছার আশায়?"
"কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান;
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব সাধিব সবে প্রভুর কল্যান!"
"চল তবে ভ্রাতাগণ চল পুনর্ব্বার;
দেখিব ইংরাজদল,
শ্বেত অঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার?"
"বীর-প্রসূতির পুত্র আমরা সকল,
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ,
শ্বেত অঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল।"
"দেখাব ভারতবীর্য্য দেখাব কেমন,
বলে যদি হীমাচল,
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটী চরণ।"
"যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে,
ডুবায় সিন্ধুর জলে,
তথাপি ক্ষত্রিয় দলে,
টলাইতে না পারিবে বলে কি কৌশলে।"
"সহে না বিলম্ব আর চল ভ্রাতাগণ,
চল সবে রণস্থলে,
দেখিব কে জিনে বলে,
ইংরাজের রক্তে আজি করিব তর্পণ?

ধন্য মোহনলাল! ধন্য! তুমিই শেষ হিন্দু যাহার মুখে আমরা এরূপ অপ্রতিম বীরত্বের পরিচয় পাইলাম। ধন্য নবীন! ধন্য তোমার অমৃতনিঃসান্দিনী লেখনী! মা ব্রিটনেশ্বরি! হিন্দু সেনাপতির অচলা প্রভুভক্তি ও অসীম সাহস অবলোকন করিলে? এক্ষণে অকপটহৃদয়ে বল দেখি কোন্ জাতি হিন্দুজাতির ন্যায় বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী প্রভুর জন্যও সমরে প্রাণ দিতে পারে? বল, মা! এরূপ বিশ্বাস আর কোন সেনার উপর ন্যস্ত করিতে পার কি না? যদি না পার, তবে রাজর্ষি আকবর প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুদিগকে সৈনাপত্যে বরণ না কর কেন? মা! যদি ভারতসিংহাসন অটল রাখিতে চাও তবে হিন্দুজাতির উপর এই গুরুভার অর্পণ কর। দেখিবে ইহারা তোমার সহস্র বাহুর কার্য্য করিবে। ভয় করো না মা! নিশ্চয় জেন যে হিন্দুজাতির হৃদয় বিশ্বাসঘাতকতায় কখনই কলঙ্কিত হইবে না। শত সহস্র প্রলোভনও তাহাদিগের মনকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

হিন্দুসেনাপতি মোহনলালের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া :—

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল, ফিরিল যবন,
যেমতি জলধিজলে,
প্রকাণ্ড তরঙ্গদলে,
ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন!
বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদ্গীরণ
জলধর মধ্যে যেন অশনি সম্পাত।

এমন সময়—

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ,
কর অস্ত্র সম্বরণ,
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

নবাবের এই আকস্মিক ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সৈন্যেরা যেমন হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল,—যেমন তাহাদিগের এক পা টলিল অমনি :—

ইংরাজ শঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।
কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়
লাগিল; শঙ্গিন যায়,
বরিষার ফোটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিসবাজনা,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্তকায়,
অস্ত গেলা রবি, হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর!

এইরূপে সহসা যবনিকা পতিত হইয়া বঙ্গরঙ্গভূমিতে যবনদিগের অভিনয়লীলার পর্য্যবসান করিল।

এরূপ আকস্মিক ঘোষণাপত্র প্রচারিত না হইলে এই সমরের কি পরিণাম হইত কে বলিতে পারে?

কবি যে গম্ভীর-শোক-ব্যঞ্জক শ্লোকচয়ে চতুর্থসর্গের পর্য্যবসান করিয়াছেন তাহার দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার রমণীয় কবিত্বশক্তি ও গভীর হৃদয়ভাবের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোকসিন্ধু জলে?
যাও তবে, যাও দেব, কি বলিব আর?
ফিরিওনা পুনঃ বঙ্গউদয় অচলে;
কি জন্যে বল না আহা ফিরিবা আবার?
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ;
যদবধি হইবে না দাসত্বমোচন,
এস না ভারতে পুনঃ এস না তপন।

এস সন্ধে! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন রাজি করে ঝলমল?
কিম্বা শুনে ভারতের দুঃখসমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত?
এস শীঘ্র, প্রশারিয়া ধূষর অঞ্চল,
লুকাও ভারতমুখ দুঃখে অবনত;
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল;
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন।

সেই দিন যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার;
পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার;
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ,
করিল তিমিরাবৃত ভারতগগণ,

অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি নিয়ম;
কিম্বা জলধরচ্ছায়া থাকে কতক্ষণ

যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে,
পলাশির রণরক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,
বলে না, স্মরে না, ভেবে ভাবে না অন্তরে;
কল্পনে, সে কথা মিছে কহ কি কারণ?
থাকুক পলাশিক্ষেত্র এখন যেমন;
থাকুক্ শোণিতসিক্ত হত যোদ্ধৃবল;
প্রত্যহ ভারত অশ্রু হইয়া পতন,
অপনীত হবে এই কলঙ্ক সকল;

পঞ্চমসর্গে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটী ও পলাশির জেতা ব্রিটিস বীরগণের মদ্যপান কালীন গীতটী ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাইঃ—

হায়! মাতঃ বঙ্গভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বধিতে হায়! মধুমক্ষিকারে,
যদি মকরন্দ নাহি হতো সুধাসার;
পাইত না অনাহার-ক্লেশ মক্ষিকায়,
স্বর্ণপ্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
উঠিত না বঙ্গে আজি এই হাহাকার!
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস পাষাণ,
হতে যদি, তবে মাত! তোমার সন্তান
হইত না এইরূপে ক্ষীণ কলেবর;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার;
ধমনীতে প্রবাহিত হতো উগ্রতর
রক্তস্রোত; হতো বক্ষঃ বীর্য্যের আধার;
আজি এই বঙ্গভূমি হইত পূরিত
সজীব পুরুষরত্নে; দিগ দিগন্তর
বঙ্গের গৌরবসূর্য্য হতো বিভাসিত;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হতো অন্যতর;—
কল্পনে! সে দুরাশায় কায নাই আর,
ব্রিটিস শিবির ওই সম্মুখে তোমার!

এত উদাহরণ প্রদর্শনের পর ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে "পলাশির যুদ্ধ" বঙ্গ ভাষার এক অমূল্য রত্ন। আমরা ইহা হইতে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাই আমাদিগের বাক্যের সত্যতাবিষয়ে স্বাক্ষ্য প্রদান করিবে। উপসংহার কালে আমরা অন্তরের সহিত কেবল এইমাত্র প্রার্থনা করি—যেমন বীরবর সেকন্দরসা আপন উপধানের অধঃস্থলে একখানি করিয়া হোমরের "ইলিয়ড্" রাখিতেন, সেইরূপ যেন প্রত্যেক বঙ্গবাসী আপন আপন উপধানের নিম্নে এক খানি করিয়া নবীনের "পলাশির যুদ্ধ" রাখেন; এবং সময়ে সময়ে ইহা পাঠ করেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের নির্ব্বাণপ্রায় বীর্য্যবহ্নি একদিন অবশ্যই প্রধূমিত হইবে!

# জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

## ( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

১৮৩৬ পর্য্যন্ত তদীয় জীবনের ঘটনাবলী। ১৮৩৩ খৃঃ মিল্ একজামিনার নামক পত্রের সম্পাদক ফন্ ব্লাঙ্কের সহিত তদীয় পত্রিকায় র‍্যাডিক্যালিজম্ মত লইয়া হুইগ্ মন্ত্রিদ'লের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ১৮৩৫ খৃঃ তিনি "মন্থলি রিপজিটরি" নামক মাসিক পত্রিকায় চলিত ঘটনাবলীর উপর "নোটস অন্ দি নিউস্পেপারস" নামক কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ফক্স একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক বাগ্মী ছিলেন। ইনি পরে পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইঁহার সহিত এই সময় মিলের বিশেষ পরিচয় হয়, এবং ইঁহারই অনুরোধে মিল্ তদীয় পত্রিকায় আরও অনেক গুলি বিষয় লিখেন; তন্মধ্যে "থিওরি অব্ পইট্রি" নামক কবিতাবিষয়ক প্রস্তাবটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই প্রস্তাবটী তাঁহার "ডেজারটেসন্স" নামক পুস্তকে অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে ব্যতীতও ১৮৩২—১৮৩৪ পর্য্যন্ত তিনি স্বতন্ত্র ভাবে অন্যান্য যে সকল প্রস্তাব রচনা করেন, সে সমস্ত একত্র করিলে এক খানি সুদীর্ঘ গ্রন্থ হয়। সেই সকলের মধ্যে উপক্রমণিকার সহিত প্লেটোলিখিত ডায়ালগ সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বেন্থামের দর্শনের উপর টিপ্পনী বিশেষ গৌরব লাভে করে।

এই সময় মিল্, তাঁহার পিতা, এবং তদীয় পিতৃবন্ধুদিগের মধ্যে দার্শনিক র‍্যাডিকালদিগের মুখযন্ত্র স্বরূপ একখানি সাময়িক পত্র ও সমালোচন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হয়। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ প্রথমে এই উদ্দেশ্যেই সংস্থাপিত হয়। কিন্তু নানা কারণে ইহা সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। এই প্রস্তাব অনেক দিন হইতে চলিতেছিল, কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে ১৮৩৪ খৃঃ সার উইলিয়ম্ মলেস্ওয়ার্থ নামক এক জন দার্শনিক এই গুরুভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। অর্থ ও বিদ্যা উভয়েতেই তিনি এরূপ গুরুভার গ্রহণের যোগ্য, তথাপি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে মিল্ এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ না করিলে তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং মিল্ এই ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। এই পত্রিকা প্রথমে লণ্ডন রিভিউ নামে প্রকাশিত হয়। পরে মলেস্ওয়ার্থ, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউএর স্বত্বাধিকারী জেনেরাল টম্সনের নিকট হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর স্বত্বাধিকার ক্রয় করিলে

এই দুই পত্রিকা একত্রীভূত হইয়া লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ নামে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃ পর্য্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদনে মিলের অধিকাংশ সময় পর্য্যবসিত হয়। এই পত্রিকার প্রথমাবস্থায় ইহাতে সম্পূর্ণরূপে মিলের মতসকল ব্যক্ত হয় নাই। মিল্‌কে অনেক সময় অপরিহার্য্য সহচরবৃন্দের মতের অনুবর্ত্তন করিতে হইত। এই পত্রিকা দার্শনিক র‍্যাডিকাল্‌দিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ ছিল বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যান্য দার্শনিক র‍্যাডিকালদিগের সহিত মিলের সর্ব্বদাই গুরুতর বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইত। এই পত্রিকার সম্পাদনে জেম্‌স মিলের সাহায্য সকলেই বহুমূল্য বলিয়া মনে করিতেন এবং তিনিও জীবনের শেষ পীড়া পর্য্যন্ত ইহার উৎকর্ষ বিধানে প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তল্লিখিত প্রস্তাবাবলীর অন্তর্ভূত সর্ব্বপরিজ্ঞাত তদীয় মত সকল এবং তদীয় রচনার ওজস্বিতা ও বিশদতা প্রভৃতির জন্য এই পত্রিকা তাঁহার নিকট হইতেই বিশেষরূপে জীবন ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মিল্‌ পিতৃলিখিত প্রস্তাব সকলের উপর তাঁহার সম্পাদকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না; অধিকন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে আংশিকরূপে নিজের মত সকল পরিত্যাগ করিতে হইত। এইরূপে প্রাচীন ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউএর মতসকলই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া এই নব পত্রিকায় প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু মিল্‌ ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ঐ সকল পুরাতন মতের পার্শ্বে নিজের নূতন মতসকলও সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশে তিনি এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে প্রত্যেক লেখককে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া বা কোন সাংকেতিক নাম দিয়া আপন আপন প্রস্তাব প্রকাশিত করিতে হইবে। সম্পাদক কাহারও মতের জন্য দায়ী নহেন। তিনি কেবল এই মাত্র দেখিবেন যেন প্রস্তাবগুলি পত্রিকার উপযোগী হয়। এই সময় সুবিখ্যাত পদার্থবিদ্যাবিদ্‌ অধ্যাপক সেজ্‌উইক্‌ লক্‌ এবং পেলির উপর প্রতিবাদের আকারে বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান ও হিতবাদ মতের উপর ঘোরতর আক্রমণ করেন। মিল্‌ সেজ্‌উইকের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব রচনা করেন। এই প্রস্তাব উপলক্ষে তিনি হিতবাদ প্রভৃতি মতসম্বন্ধে তাঁহার যে সকল নূতনভাব ছিল তাহা ব্যক্ত করেন।

মিল্‌ পিতার সহিত তাঁহার যতদূর মতভেদ ছিল বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাস্তবিক তাদৃশ মতভেদ ছিল না। বিতণ্ডার সময় না হউক অন্ততঃ সহজ অবস্থায় পিতা মিলের অনেক মতের সত্যতা স্বীকার করিতেন, এবং কার্য্যতঃ অনেক উদারতা প্রদর্শন করিতেন। এই সময়ে জেমস মিলের “ফ্রাগ্‌মেণ্ট অন্‌ ম্যাকিণ্টস” নামক পুস্তক লি-

খিত ও প্রকাশিত হয়। মিল্ এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন বটে; কিন্তু যে প্রকারে ইহাতে ম্যাকিণ্টসকে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহা ন্যায় ও ভদ্রতার বহির্ভূত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে এই সময় "ডিমোক্রেসি ইন্ অ্যামেরিকা" নামে টক্‌কুইভিলির একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ইহাতে রাজনীতিঘটিত প্রশ্ন সকল যে প্রণালীতে মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহা জেম্‌স মিলের প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি জেম্‌স মিল্ এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি বলিতেন যে টক্‌কুইভিলি সাধারণতন্ত্রের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বলিয়াছেন সে দুয়ের তুলনা করিতে গেলে স্বপক্ষে যাহা বলিয়াছেন তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হয়। আর একটী আহ্লাদের বিষয় এই যে মিল্ এই সময় সম্মিলিত রিভিউএ সভ্যতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী রচনা করেন, এবং যে প্রস্তাবটী পরে তাঁহার "ডেজারটেসনস" নামক গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়, জেম্‌স সেই প্রস্তাবটীর বিশেষ প্রশংসা করেন। এই প্রস্তাবে মিল্ অনেক নূতন মতের অবতারণা করেন। এইরূপে মিল্ ও তাঁহার পিতা—ইহাঁদিগের উভয়ের মতভেদ ক্রমেই অপনীত হইতেছিল, এমন সময় সহসা অকালমৃত্যু আসিয়া জেম্‌স মিলের বহুমূল্য জীবনের সীমা নির্দ্দেশ করিল। ১৮৩৫ খৃঃ সমস্ত বৎসর তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনত হইতে থাকে এবং তাঁহার পীড়া ক্রমে ক্ষয়কাশে পরিণত হয়। অবশেষে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুন তারিখে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের নিস্তেজ ভাব উপলক্ষিত হয় নাই। প্রাণী ও বস্তুমাত্রের উপর তাঁহার যে বিশেষ যত্ন ছিল, এক দিনের জন্যও তাহার হ্রাস হয় নাই। নিকটবর্ত্তী মৃত্যুর বিভীষিকা এক দিনের জন্যও তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত সকল পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রধান সুখ এই যে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন অক্লান্তভাবে জগতের হিতসাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান দুঃখ এই যে তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারিলেন না। তাহা হইলে তিনি জগতের আরও অনেক হিতসাধন করিতে পারিতেন।

সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে দেশের মধ্যে তাঁহার স্থান অতীব উচ্চ। উনবিংশ শতাব্দীর বংশধরগণ,—যাঁহারা জেম্‌স মিলের লেখনী হইতে অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন—যে তাঁহার নামের তত উল্লেখ করেন না, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। জেম্‌স মিলের যশঃসূর্য্য বেন্‌থামের যশঃসূর্য্যের উজ্জ্বলতর কিরণে ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জেম্‌স মিল্ কখনই বেন্‌থামের শিষ্য বা অনুবর্ত্তক

ছিলেন না। তিনি তাঁহার সময়ের এক জন অদ্বিতীয় স্বাধীন-চিন্তা-শীল ব্যক্তি ছিলেন। অতীত বংশধরগণ তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণের জন্য যে সকল অমূল্য স্বাধীন চিন্তারত্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সেইসকলের মূল্য অনুধাবন করেন, এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের ব্যবহার করেন। বেন্‌থাম ও তাঁহার মনের গঠনের বস্তুতঃ অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল। তিনিও বেন্‌থামের সকল উচ্চগুণের অধিকার প্রাপ্ত হন নাই, এবং বেনথামও তাঁহার সমস্ত উচ্চগুণের আধার হইতে পারেন নাই। জগতের অসীম উপকার সাধন করিয়া বেন্‌থাম যে অতুল যশোরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জেম্‌স মিলের জন্য সে যশ প্রার্থনা করিলে আমরা লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইব। বেন্‌থামের ন্যায় তিনি মানব চিন্তাবিভাগে কোন বিপ্লব উত্থাপিত করিতে পারেন নাই, কোন নূতন সৃষ্টি সংসাধিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বেন্‌থামের প্রতিভার উজ্জলতর কিরণের সাহায্যে জগতের যে সকল হিতসাধন করিয়াছেন সে সকল গণনায় না আনিলেও, বেন্‌থাম বা অন্য কেহ যে বিষয়ে কিছুই করেন নাই সেই বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানে ইনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাঁর নাম ভাবী বংশধরদিগের নিকট অতি আদরের জিনিস হইবে সন্দেহ নাই। আর একটী কারণ—যাহাতে তাঁহার নাম উনবিংশ শতাব্দীর লোকের নিকট তত আদৃত হয় নাই—এই যে যদিও তাঁহার মতসকল সাধারণতঃ প্রায় সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার মত সকলের সহিত বর্ত্তমান শতাব্দীর মতসকলের স্পষ্ট প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হইত। যেমন ব্রুটস রোমান্‌দিগের শেষ আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ জেম্‌স মিল্ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা ও মতসকল পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, জেম্‌স মিল্ তাহার ভাল মন্দ কিছুতেই সংস্রুত ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীকে একটী সুমহৎ যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এই যুগে অসংখ্য বড় বড় লোকের জন্ম হয়। জেম্‌স মিল্ তাঁহাদিগের উচ্চতমের সহচর। তাঁহার রচনা ও চরিত্রপ্রভাবে তিনি তাঁহার সমসাময়িক বংশধরদিগের আলোককেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। ভল্টেয়ার যেমন ফ্রান্সের দার্শনিকদিগের অগ্রণী ছিলেন, ইংলণ্ডে সেইরূপ জেম্‌স মিল্ দার্শনিক র‍্যাডিক্যাল্‌দিগের দলপতি ছিলেন। ইনি ভারতবাসিদিগের অতি আদরের ধন—যেহেতু ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সুমন্ত্রণা দ্বারা ভারতবাসিদিগকে বণিক্‌সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি

এমন কোন বিষয় লিখেন নাই, যাহা তিনি নিজের অমূল্য চিন্তালোকে আলোকিত করেন নাই। নিজ চরিত্র ও মনের বলে অপরের মত ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত করিয়া, স্বাধীনতা ও উন্নতির স্রোত পরিবর্দ্ধিত করিতে সক্ষম—তাঁহার ন্যায় ইংলণ্ডে তৎকালে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না।

এইরূপে পিতৃবিহীন হইয়া মিল্ এখন হইতে উন্নতিক্ষেত্রে একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে তদীয় পিতা যে সকল গুণে জনসমাজে স্বকীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাতে সে সকল সামাজিক গুণের অনেক অভাব আছে। সুতরাং পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ সহজ ও পরিষ্কৃত ছিল এখন আর সেরূপ থাকিবেনা। এখন তাঁহাকে সকল কার্য্যই একাকী ও সাহায্যবিরহিত হইয়া করিতে হইবে। তিনি এখন হইতে সাধারণতন্ত্রপক্ষপাতী উদারচেতা ব্যক্তিদিগের উপর আপন আধিপত্য সংস্থাপনের একমাত্র আশা তাঁহার নব পত্রিকার উপরই ন্যস্ত করিলেন। পিতৃবিহীন হওয়াতে মিল্ যেমন পিতার অমূল্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন, তেমনই পিতার কঠোর শাসন ও অধীনতার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইলেন। এই শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়ায় তাঁহার মতসকল মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। তৎকালে ইংলণ্ডে জেম্‌স মিল্ ভিন্ন র‍্যাডিকালমতাবলম্বী আর কোন লেখক বা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, যাঁহার নিকটে মিলের মস্তক অবনত হইত অথবা তাঁহার লেখনী সঙ্কোচ ভাব ধারণ করিত। এক্ষণে তিনি মলেস্‌ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়া নবপত্রিকায় নিজের স্বাধীন মতসকল ও স্বাধীন চিন্তাপ্রণালীর পূর্ণ প্রসর দিতে লাগিলেন তিনি স্বানুমোদিত উন্নতির পক্ষসমর্থক ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য এই পত্রিকার স্তম্ভসকল উন্মুক্ত রাখিলেন। ইহাতে যদি তিনি প্রাচীন সহচরবৃন্দের সাহায্যে বঞ্চিত হন, তজ্জন্যও প্রস্তুত হইলেন। এই সময় হইতে কার্লাইল্ এই পত্রিকার নির্দ্দিষ্টলেখকশ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং ষ্টার্লিং ইহাতে মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। যদিও প্রত্যেক লেখক ইহাতে স্বাধীনভাবে আপন আপন প্রবন্ধে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, তথাপি এই পত্রিকার সাধারণ ভাব মিলের মতানুযায়ীই হইয়া উঠিল। তিনি সুশৃঙ্খলরূপে এই পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যের নির্ব্বাহ জন্য রবার্টসন নামক একজন স্কচকে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলেন। রবার্টসন অতিশয় কার্য্যদক্ষ বহুদর্শী এবং পরিশ্রমশীল ছিলেন। ইহাঁরই বুদ্ধিকৌশলের উপর মিল্ তাঁহার পত্রিকার বিক্রয় ও প্রচারের অনেক আশা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁর বুদ্ধিকৌশলের উপর মিল্ এত

আশা করিয়াছিলেন যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন মলেস্‌ওয়ার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পত্রিকার প্রকাশনে ক্লান্ত হইলেন এবং যে কোন প্রকারে ইহা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন মিল্ অবিবেচনা-পূর্ব্বক আপন ব্যয়ে ইহা চালাইতে সম্মত হইলেন। একজন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক, এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লেখককে বেতন দিতে হইলে তাঁহাকে একদিনের জন্যও এই পত্রিকা চালাইতে হইত না। কিন্তু তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু ইহাতে বিনা বেতনে লিখিতে সম্মত হওয়ায় অতিকষ্টে ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তথাপি এডিনবরা ও কোয়াটার্লি রিভিউএর নিয়মে কতকগুলি বৈতনিক লেখককে বেতন দিতে হওয়ায় মিল্‌কে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কারণ পত্রিকার বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ হইতে তাহার নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

ক্রমশঃ।

# রাসায়ন শাস্ত্রের আবশ্যকতা ও ইতিবৃত্ত।

যখনই উত্তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, যখনই সংশ্লিষ্ট পদার্থসকল বিশ্লিষ্ট হয়, যখনই অসংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থসকল সংশ্লিষ্ট হইয়া নূতন সংযুক্ত দ্রব্যের স্থষ্টি করে, সে সমস্ত স্থলেই রসায়নশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রভাব উপলক্ষিত হয়। বহুসংখ্যক লোকের প্রতিদিনের খাদ্য যে রুটি, বহুসংখ্যক লোকের প্রতিদিনের পানীয় যে মদ্য, অসংখ্য রাজমার্গ ও অসংখ্য অট্টালিকা সকলের সমুজ্জলকারী যে গ্যাসালোক, আমাদিগের বস্ত্রের রঞ্জনকারী যে বর্ণ, আমাদের পাদসংরক্ষিণী পাদুকার যে চর্ম্ম, আমাদের কোষোজ্জলকারিণী যে মুদ্রা, সে সমস্তেরই উৎপত্তি ও উৎকর্ষ সাধনের মূল—রাসায়নী প্রক্রিয়া। কিরূপে খনি হইতে ধাতু সকল তুলিতে হয়, কিরূপে তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিতে হয়, কিরূপে তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়, সে সমস্ত প্রাণালীই সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক।

রসায়নশাস্ত্রই আমাদিগকে প্রকৃতি-সম্ভূত বা শিল্পজাত পদার্থনিচয়ের অসন্দিগ্ধরূপে গুণ ও মূল্য নির্ব্বাচনে সক্ষম করে। ইহা দ্বারাই আমরা পদার্থসকলের মিশ্রিত-ভাব উপলব্ধি করিতেপারি এবং ইহা দ্বারাই আমরা অপরিপক্ক প্রাকৃতিক দ্রব্যজাতের প্রকৃতিগত দোষ ব্যর্থ করিতে পারি।

**রাসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।**—যদিও অ্যালেক্‌জাণ্ডারের সময়েই তরল পদার্থের গতিশীল (১) ও স্থিতিশীল (২) গুণসকল কতক পরিমাণে নির্ণীত হইয়াছিল, তথাপি রসায়নশাস্ত্র

(1) Dynamical. (2) Statical.

প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল একথা বলা যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ধরিতে গেলে রোমরাজ্যের পতনের পর খৃঃ ৯০০ শকে সারাসেনগণ (১) কর্ত্তৃকই এই শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা আরম্ভ হয়

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বলবৎদ্রাবক দ্রব্য (২) ও মিশ্রিত দাহ্য পদার্থের(৩)আবিষ্ক্রিয়া দ্বারাই রসায়ন শাস্ত্রের মূলভিত্তি সংগঠিত হয়। প্রায় সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্পর্শমনির (৪) অনুসন্ধানই বৈজ্ঞানিকদিগের রাসায়নিক পরিশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই স্পর্শমণি মানবের পার্থিব সুখের একমাত্র নিদান বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎকালের লোকের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ, তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি অধমতর ধাতুসকল সুবর্ণে পরিণত হইতে পারে। লৌহ, তাঁম্র, রৌপ্য প্রভৃতি অধমতর ধাতু সকলকে সুবর্ণে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে প্রাচীনেরা আলকিমি (৫) নামে নির্দ্দেশ করিতেন। এই আল্‌কিমি হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। আল্‌কিমিষ্টেরা তাঁহাদিগের লক্ষ্যের উন্মাদ সত্ত্বেও, যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, এক জন আরবদেশীয় লেখক আলকিমির যে লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে। তিনি বলেন "It is the science of the balance, the science of weight, and the science of combustion." "ইহা তুলামান গুরুত্বপরিমাণ ও দাহন বিষয়ক বিজ্ঞান।"

জেবার (৬) অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার রচনাসকলে, যে পরিমাণে পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত বিষয় সকলের রাসায়নিক জ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদিগের মনে বিস্ময় ও ভক্তির ভাব আবির্ভূত হয়। জাফার (৭) অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি যবক্ষার দ্রাবক (৮) ও আকোয়া রিজিয়ার (৯) আবিষ্কার দ্বারা জগতে অতুল কীর্ত্তিলাভ করেন। ইনি শেষোক্ত দ্রব্য দ্বারা সুবর্ণের দ্রবীকরণ করেন। ধাতুসম্বন্ধীয় তাঁহার মত সকল, যদিও ভ্রান্তিসঙ্কুল, তথাপি সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক-মূল্য বিরহিত নহে। তিনি জানিতেন যে, কোন ধাতু দগ্ধ করিলে (১০) তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। কি প্রণালীতে তরল পদার্থসকল পরিস্রুত(১১)ও পরিস্কৃত (১২) করিতে হয়, তিনি তৎসমস্ত বিষয়

(I) Saracens. (2) Srong acids.
(3) Explosive mixtures.
(4) Philosopher's stone.
(5) Alchemy.

(6) Geber.
(7) Djafar. (8) Nitric acid.
(9) Aqua rejia or nitro-muriatic acid.
(10) Calcined. (11) Distill.
(12) Filtrate.

রাসায়নিক যন্ত্রতন্ত্রের সহিত সবিশেষ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর ৮৬০ খৃঃ রাজেস (১) প্রাদুর্ভূত হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে গন্ধক দ্রাবক (২) আবিষ্কৃত এবং ইহার গুণ সকল নির্ব্বাচিত করেন। ইহার পর আরব চিকিৎসকদিগের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রাসায়ন জ্ঞান প্রচলিত হয়। ড্রাপার (৩) বলেন—"যৎকালে আরবীয়েরা স্পর্শমণির অন্বেষণে একান্ত ব্যস্ত ছিল, তখনও তাহাদিগের ভৈষজ্যপ্রবণতা,—যাহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পীড়ার উপশম হয় এবং যাহা দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায়,—এরূপ একটী বিশ্বজনীন ঔষধির অনুসন্ধিৎসায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। এই ঔষধিকে প্রাচীনেরা ইলিক্সর (৪) নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। এই অদৃষ্টচর দৈব ঔষধির অন্বেষণে মনুষ্যদেহের পীড়ানাশক অনেক প্রকৃত ঔষধির আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। এইরূপে চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন ক্রমে উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি ইহা পূর্ব্ব কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিল।"

পারাসেলসস্ (৫) সর্ব্ব প্রথমে রসায়ন শাস্ত্রকে সুবর্ণানুসন্ধিৎসুদিগের হস্ত হইতে উন্মুক্ত করিয়া বৈদ্যদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ আপন আপন ঔষধি আপন আপন হস্তে প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে রাসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহিত পরিচয়—চিকিৎসকদিগের ও ভৈষজ্য বিজ্ঞানের (৬) অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল।

অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রজার বেকন্ (৭) এবং অ্যালবার্টস ম্যাগ্‌নস্, (৮) নামক দুইজন অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক জন্ম গ্রহণ করেন। ভাবের উর্দ্ধরতা ও প্রকৃতিপর্য্যবেক্ষণের প্রশস্ততা নিবন্ধন ইহাঁদিগের রসায়নশাস্ত্রবিষয়ক মত সকল আধুনিক আবিষ্ক্রিয়া সকলের সহিত তুলনার অযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অ্যাল্কিমিষ্টেরা প্রায় সকল রাজসভাতেই আধিপত্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এবং প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরাই অধমতর ধাতু সকলকে সুবর্ণে পরিণত করার প্রণালী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যদিও রাসায়নশাস্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তৎকালে যে সকল ভ্রান্ত মত প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে সত্যের নির্ণয় বা রাসায়ন শাস্ত্রের কোন উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি সেই ভ্রম হইতে যে বিজ্ঞানের কোন প্রকার উপকার হয় নাই এ কথা বলা যায় না। কারণ সুবর্ণের

(1) Rhazes. (2) Sulphuric acid.
(3) Draper. (4) Elixir.
(5) Paracelsus.
(6) Therapeutics.
(7) Roger Bacon.
(8) Albertus magnus.

অস্তিত্ব অবগত হইবার জন্য, অধিগম্য দ্রব্যমাত্রেরই পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সকল বিষয়ের এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আ্যাল্‌কিমিস্টেরা তাঁহাদিগের গবেষণার সময় যে সকল বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আমরা কল্পনাতেও তাহার অনুভব করিতে পারি না। তাঁহারা যে শুদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করিয়াছিলেন এরূপ নহে, তাঁহাদিগকে রাসায়নিক যন্ত্রতন্ত্রেরও আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। যে সকল উপকরণসামগ্রীর সাহায্যে আধুনিক রাসায়নশাস্ত্রের উন্নতি ও পরিণতি হইয়াছে, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে সেই সকল উপকরণসামগ্রী-বিরহিত ছিলেন। লীবিগ্‌ (১) বলিয়াছেন যে—

"কাঁচ, সিপি, প্লাটিনম্‌ এবং ভারতবর্ষীয় রবার ব্যতীত আমরা এতদিন রাসায়ন শাস্ত্রে এক পাদও অগ্রসর হইতে পারিতাম না। ল্যাভইসিয়ারের (২) সময় যন্ত্রতন্ত্রের বহুমূল্যতা নিবন্ধন অতি অল্পসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তিই রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করিতে সক্ষম হইতেন।"

**আধুনিক রাসায়ন শাস্ত্র।** ক্রমে অ্যাল্‌কিমি রসায়নশাস্ত্রে পরিণত হইল। ষ্টাল্‌ (৩) অসাধারণ পরিশ্রমের সহিত ফ্লজিষ্টন্‌ (৪) মত হইতে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের আবিষ্কার করেন। উক্ত মত অগ্নিসংযোগে ধাতুর পরিবর্ত্তনের এই কারণ নির্দ্দেশ করে—যে দাহ্য পদার্থের সংযোগে যেমন কিয়দংশ পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ কিয়দংশ পুনঃসংস্থাপিত হইয়া থাকে। দাহন প্রক্রিয়া, দ্রাবকের উৎপত্তি, এবং প্রাণিদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ এই সমস্তই উক্ত মতের কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৭৭৪ খৃঃ প্রিষ্টলে (৫) কর্ত্তৃক, এবং ১৭৭৫ খৃঃ স্কীল্‌ (৬) কর্ত্তৃক অম্লযান (৭) আবিষ্কৃত হইলেও এ মত কিছুদিন বলবৎ থাকে। এই মতের দুর্ব্বলতা এই যে যখন কোন ধাতু অগ্নিতে দগ্ধ হয়, উক্ত মতানুসারে তখন ইহা লঘুতর হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা গুরুতর হয়। অবশেষে ব্লাকের (৮) গবেষণা ফ্লজিষ্টিক রসায়নশাস্ত্রের মূলে পরশুপাত করে। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নির্ণয় করেন যে গুঁড়াচুন (৯) ভূবায়ুর সহিত সংযুক্ত হইলে যে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়, তাহার কারণ এই যে ইহা ভূবায়ু হইতে অঙ্গার দ্রাবক (১০) গ্যাস গ্রহণ করে। এই গ্যাস উত্তাপের দ্বারা দূরীকৃত করা যাইতে পারে।

এই আবিষ্ক্রিয়ার সময় হইতে প্রাকৃতিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তুলামানের (১১)

(1) Leibig. (2) Lavoisier.

(3) Stahl.

(4) Phlogiston. (5) Priestley.

(6) Scheele (7) Oxygen.

(8) Black. (9) quicklime.

(10) Carbonic acid. (11) Balance.

ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই তুলামানের ব্যবহার কাল হইতে রাসায়ন শাস্ত্রে একটী নব যুগের আবির্ভাব হয়। এখন হইতে রসায়নশাস্ত্র শুদ্ধ দ্রব্যের গুণের উপর আর ব্যবস্থাপিত রহিল না। দ্রব্যের পরিমাণও ইহার অন্যতর মূলভিত্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইল। ব্লাক্ এবং ল্যাভইসীয়ার তাঁহাদিগের মহতী আবিষ্ক্রিয়া সকলের জন্য এই তুলামানের ব্যবহারের নিকট বিশেষ ঋণী। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে ল্যাভইসিয়ার এবং তাঁহার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্ব্বে অভ্রান্ত বৈশ্লেষণ সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিও সম্পূর্ণভাবে হইতে পারে নাই। সুতরাং আনুমানিক পরিমাণে রাসায়নিক মিশ্রণ দ্রব্যের প্রস্তুত করণ সংসাধিত হইত। এই অভাব নিবারণের জন্য রামস্‌ডেন (১) রয়াল সোসাইটীর ব্যবহারের জন্য যে তুলামান প্রস্তুত করেন, তাহাদ্বারা দশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজন হইতে পারিত। এই তুলামান একটী যবের শতাংশের একাংশ পরিমিত দ্রব্যের ভারেও অবনত হইয়া পড়িত।

১৭৮১ খৃঃ কাভেন্‌ডিস (২) ও ওয়াট (৩) কর্ত্তৃক জলের বিশ্লেষণ (৪) রাসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগের অবতারণা করে।

ক্রমে প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ের রাসায়নিক সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট ভাব অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইতে লাগিল। ভৌতিক পদার্থের (৫) সংখ্যা চারিটী মাত্র—এই প্রাচীন মত ক্রমে পরিত্যক্ত হইল এবং সেরাসেনেরা লবণ গন্ধক ও পারদরূপ যে তিন ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করিত সে মতও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইল। পরিজ্ঞাত ভৌতিক পদার্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ভৌতিক পদার্থের সংখ্যা, এপর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, ক্রমে পঞ্চষষ্টিতে পরিণত হইয়াছে।

তুলামানের আবিষ্ক্রিয়ায় রাসায়ন শাস্ত্রে অনেক নূতন মতের আবির্ভাব হয়। রাসায়নিক সংশ্লেষণ সম্বন্ধে অনেক নিয়ম সংস্থাপিত হয়। ড্যাল্‌টন্ (৬) ১৮০৮ খৃঃ তাঁহার পরমাণুবাদ মত প্রচার করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে রসায়নশাস্ত্রের সবিশেষ উন্নতি হয় নাই। এই সময়ে কতিপয় বিখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় রাসায়ন শাস্ত্র একটী অভ্রান্ত ও কার্য্যোপযোগী বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের যত্নেও পরিশ্রমে রসায়নশাস্ত্র অবিচলিত ও দৃঢ়ভিত্তিতে সংন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে ল্যাভইসিয়ার, রিচার, ওয়েন্‌জেল, প্রাউষ্ট, ক্যাভেন্‌ডিস, ওয়াট্, বার্থলেট্, প্রীষ্টলে, ব্লাক, স্কীল এবং ড্যালটন্ * প্রধান। যে মহাত্মাদিগের নাম নির্দ্দেশ

(1) Ramsden. (2) Cavendish. (3) Watt. (4) Decomposition. (5) Elements. (6) Dalton.

করা হইল, তাঁহাদিগের মধ্যে আবার ল্যাভইসিয়ার সর্ব্বপ্রধান। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভূবায়ু ও জলের অন্তর্ভুক্ত ভৌতিক পদার্থের অবধারণা করেন। তাঁহারই সময়ে তদাপরিজ্ঞাত ধাতু সকলের সংখ্যা অষ্টাদশ হইতে দ্বাত্রিংশতে পরিণত হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে জগতে এই মহৎ ও মৌলিক মত প্রচার করেন,—যে প্রকৃতিতে কোন পদার্থেরই ধ্বংস নাই। যাহা সামান্য দৃষ্টিতে আমরা পদার্থের ধ্বংস মনে করি, তাহা বাস্তবিক ধ্বংস নহে, তাহা পদার্থের রূপান্তরীভবন মাত্র। এই মতের প্রচার অবধি বিজ্ঞানজগতে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু একথা বলা যাইতে পারে না যে ল্যাভইসিয়ারের পূর্ব্বে রাসায়ন শাস্ত্রের কোনও উন্নতি হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্বের বংশধরগণ যে অনেক রসায়ন-সংশ্লেষ-সমুৎপন্ন দ্রব্যের ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তথাপি আবিষ্করণ ও কার্য্যে পরিণমন বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের সহিত তুলনা করিলে দীর্ঘ প্রাচীন যুগও অতি দরিদ্র বলিয়া বোধ হয়। পদার্থ সকলের রাসায়নিক শক্তি ও পরস্পরের প্রতি ঘাত প্রতিঘাতের গভীর অনুসন্ধান নিমিত্তই বর্ত্তমান শতাব্দীতে এত অসংখ্য ও গুরুফল-প্রসবিনী রাসায়নিক আবিষ্ক্রিয়া সকল সংঘটিত হইয়াছে। এই সকল আবিষ্ক্রিয়ার মধ্যে ক্লোরাইনের (১) প্রতিষেধক ও সংক্রমণ-নিবারক কার্য্য, গন্ধক দ্রাবক (২) পাথুরিয়া কয়লা হইতে গ্যাস, কার্ব্বনেট্ অব সোডা (৩) এবং বিটপালম হইতে চিনি প্রস্তুত করণ, প্রধান।

শ্রী কানাইলাল দে।

* Lavoisier, Richer, Wenzel, Proust, Cavendish, Watt, Berthollet, Priestley, Black, Scheele, and Dalton.

(1) Chlorine. (2) Sulphric acid. (3) Carbonate of soda.

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার দ্বাদশ বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণ ১৮৭৪—৭৫। এই সভা—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিলে সংস্থাপিত হয়। দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষা বিধান, দীন রোগিদিগকে ঔষধি দান, দীন দুঃখিনী বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাদিগের ভরণ পোষণ, স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধন এবং উত্তরপাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের সামাজিক নৈতিক ও বুদ্ধিবিদ্যাবিষয়ক উন্নতি সাধন

প্রভৃতি অতি মহৎ কার্য্য সকল এই সভার উদ্দেশ্য। গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর, জষ্টিস ফিয়ার, মিষ্টার হপ্‌কিন্‌স, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি অদ্বিতীয় লোক সকল এই সভার হিত-সাধক। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উকিল-গণের প্রায় অধিকাংশ এবং অনেক গুলি প্রসিদ্ধ জমিদার ইহার সভ্যশ্রেণীর অন্ত-র্গত সুতরাং ইহার উদ্দেশ্যও যেরূপ মহৎ ইহার হিতসাধকগণও সেইরূপ অদ্বিতীয় লোক। এরূপ মণিকাঞ্চনযোগেও কার্য্যের লঘুতা দৃষ্টি করিয়া আমা-দিগের হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। এরূপ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট চাঁদা কিঞ্চিদধিক ৫০০ টাকা মাত্র; কিন্তু ইহার কার্য্যপ্রণালীর মুদ্রাঙ্কনব্যয় ঈষদূন একশতটাকা! এত বড় বড় লোক দ্বারা যখন এত অল্পপরিমিত কার্য্য সংসাধিত হই-য়াছে, তখন ইহা বাহিরে ব্যক্ত না করি-লেই ভাল ছিল। উক্ত টাকা দ্বারা আর কতগুলি দরিদ্রের যে কষ্ট নিবা-রিত হইত তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং সে টাকা এরূপ অপব্যয়ে কোন মতেই ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল না। আ-বার যখন এরূপ কার্য্যবিবরণ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেই হইল, তখন ইহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। ইংরাজীতে বক্তৃতা করা, ইংরাজীতে চিটি পত্র লেখা, ইংরাজীতে হিসাব রাখা, ইংরাজীতে কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করা প্রভৃতি সাহেবী চাল যত উঠিয়া যায় ততই আমাদিগের দেশের মঙ্গল।

যাহা হউক উত্তরপাড়া হিতকারী সভার ন্যায় যদি প্রতি গ্রামে এক একটী করিয়া সভা সংস্থাপিত হয়, এবং প্রতি গ্রামের উন্নতির ও দুঃখ নিবারণের জন্য প্রতিবৎসর ৫০০ পাঁচশত করিয়া টাকা ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের মুখ যে অচিরকালমধ্যে সমুজ্জ্বলিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা প্রার্থনা করি ইহার হিতসাধক সভ্যগণ দীর্ঘজীবী হইয়া আবহমান কাল এইরূপে হতভাগ্য বঙ্গদেশের হিতসাধন করিতে থাকেন। তাঁহারা যে মহৎ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার সমাধান বিপুল অর্থ-সাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ইহাতে সংলিপ্ত আছেন, তাঁহারা মনে করিলে অনায়াসেই তাঁহাদিগকে এই বিপুল অর্থ দ্বারা সংযোজিত করিতে পারেন। এই সভা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার যে বিশেষ উন্নতি হইতেছে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

চিকিৎসাতত্ত্ব—চিকিৎসাবিদ্যা ও তদানুষঙ্গিক বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্র। মূল্য ।০ আনা মাত্র। প্রকাশক বা সম্পাদকের নাম নাই। ইহাতে অনেক গুলি প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশিত হই-য়াছে। ইহার রচনা মন্দ নহে। চিকিৎসা-তত্ত্ববিষয়ক মাসিক পত্রিকা আমাদিগের দেশে অধিক নাই। সুতরাং দুই এক খানি যাহা আছে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করা বিজ্ঞানহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

# ডারউয়িনের মত।

বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হয়, এই অদ্ভুত কথায় সকলেই উপহাস করেন এবং এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা ডারউয়িন সাহেবকে বাতুল বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু কিরূপ যুক্তিপরম্পরাতে উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও ইচ্ছা জন্মে না। বস্তুতঃ সেই সকল যুক্তি সাধারণের বোধগম্য নহে। লোকের স্বভাবই এই যে যাহা চিরন্তন সংস্কারের বিপরীত, তাহার অনুকূল তর্কে কর্ণপাত করে না অথবা তাহার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ তৎপর হয় না। ডারউয়িন সাহেবের মত কেবল অশিক্ষিত দলের কেন? শিক্ষিত দলেরও নিকট সাধারণতঃ অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা খৃষ্টীয়, মহম্মদীয়, হিন্দু প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মের বিরোধী; সুতরাং ইহার প্রতিপোষক প্রমাণাদি শ্রবণ করিলেও প্রত্যবায় আছে, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। সকল ধর্ম্মেই বলে, প্রথমে মানবের সৃষ্টি; তৎপরে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির সৃষ্টি হইয়াছে। মনুতে এরূপ কীর্ত্তিত আছে যে উদ্ভিদেরও সৃষ্টি মনুষ্যের পরে হইয়াছিল। পরন্তু পুরাণের বর্ণনানুসারে পক্ষিসর্পাদি মনুষ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের মত এইরূপ সৃষ্টিকল্পনার বিপরীত। বিজ্ঞান বলেন, প্রথমে উদ্ভিদের উৎপত্তি, তৎপরে জীবের এবং সর্ব্বশেষে মানবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এইরূপ ক্রম-প্রাদুর্ভূত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিজ্ঞানবেত্তাদের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ একথা বলেন, যে জাতি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়; অর্থাৎ প্রত্যেকজাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব যেরূপ সৃষ্ট হইয়াছে, এখনও সেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকালেও অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। যত্ন ও শিক্ষা দ্বারা গুণের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। কোন জাতীয় বৃক্ষ যত্নে রোপিত ও লালিত হইলে, তাহার আয়তন ও ফলপুষ্পাদি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তাহা যে জাতীয় উদ্ভিদ, সে জাতি হইতে পৃথগ্ভূত হইবেক না। তদ্রূপ কোন জাতীয় জীব (যেমন কুক্কুর) শিক্ষা ও যত্ন দ্বারা অধিকতর বলবিক্রম লাভ করিতে পারে এবং অধিকতর পরিমাণে মানবের উপযোগী হইতে পারে; কিন্তু তা বলিয়া উহার পক্ষে জাত্যন্তরে পরিণত হওয়া সম্ভাবিত নহে। লোকে বলে "গাধা পিটিয়া ঘোঁড়া হয় কি?"। আমাদের সমুদয় দর্শন ও ইতিহাস জাতির অপরিবর্ত্তনীয়তা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ইহার অপলাপ করা অসম্ভব। ইজিপ্তদেশের গত

তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস পরিজ্ঞাত আছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে উক্তদেশস্থ কোন জন্তু বা উদ্ভিদ জাত্যন্তরে পরিণত হয় নাই, বরং এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেই প্রকার রহিয়াছে, তাহার প্রকৃতিগত কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্রতিবাদীরা উক্তপ্রকার যুক্তি প্রকটন করেন; এখন ডারউয়িন কি বলেন, বিবরণ করা যাউক। বানর হইতে মনুষ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা তাঁহার মতের একাংশমাত্র। তাঁহার সমগ্র মত কি, তাহাই অগ্রে অনুধাবন করা যাউক। তিনি বলেন কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব চিরস্থায়ী নহে; সকলেই কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ পরিবর্ত্তন আন্তরিক, কেবল বাহ্যিক নহে; ইহাতে শুদ্ধ গুণান্তরাধান হয় এমন নহে, প্রকৃতিগত প্রভেদও জন্মে। এ পরিবর্ত্তনের নাম একজাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব হইতে অন্য জাতির প্রাদুর্ভাব। এই প্রাদুর্ভাব ক্রমিক; অর্থাৎ যুগধর্ম্মানুসারে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, ঋজু হইতে জটিল, ক্রমশঃ উদ্ভূত হইতেছে। প্রথমে এই পৃথিবীতে কতিপয় জাতি মাত্র বিদ্যমান্ ছিল; পরে অসীম কালসহকারে তাহা হইতে অসংখ্যজাতীয় উদ্ভিদ্ ও জীবের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। ডারউয়িন এমন আভাসও দিয়াছেন যে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার চরম আদি ধরিতে গেলে, স্বীকার করিতে হইবেক যে একমাত্র জাতি হইতে বর্ত্তমানের যাবতীয় জাতি অপরিসীম কালসহকারে ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহা হইলে উদ্ভিদ্ হইতে জীবের সৃষ্টি, এরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। পাঠকগণের স্মরণ হইতে পারে আমরা "সৃষ্টি ও প্রলয়" নামক প্রস্তাবে বলিয়াছি যে হারবার্ট স্পেনসরের মতে জড় হইতে উদ্ভিদ্ ও জীবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বস্তুতঃ পরমাণুর অস্তিত্ব মানিতে গেলে এইরূপ সৃষ্টিকল্পনা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। সংহিতা ও পুরাণে যাহাই থাকুক, ভারতীয় দর্শনের মত ইহার বিপরীত নহে।

ডারউয়িন সাহেব নিজের মত সংস্থাপনার্থ যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। তাঁহার যুক্তি সকল কতদূর সারবান্ ও অখণ্ডনীয়, পাঠক স্বয়ং বিচার করিয়া দেখিবেন।—

ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে ভূপঞ্জরের নিম্নতর স্তরে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক উদ্ভিদের ও জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়; কিন্তু যত ঊর্দ্ধস্থিত স্তরে উঠা যায় তত অধিকসংখ্যক জাতির উপলব্ধি হইতে থাকে। ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন যুগে সংঘটিত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বতন কালে অল্পসংখ্যক জাতি বিদ্যমান ছিল; অধুনাতন কালে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে আদিমকাল অপেক্ষা উত্তরকালে

নূতন নূতন জাতির যে চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা কি আজগবী? তাহা কি শূন্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে? তাহার কি কোন উপাদান কারণ নাই? যুক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতি হইতেই উত্তরোত্তর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ভূয়োদর্শনে কি দেখিতেছি? দুই তিন পুরুষের মধ্যে যত্ন ও শিক্ষার গুণে পারাবত, কুক্কুর, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু ও নানা জাতীয় উদ্ভিদ্ অনেকাংশে সম্পূর্ণ পৃথক্ আকার ও গুণ প্রাপ্ত হয়। মানব কেবল উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঈদৃশ অল্প কালের মধ্যে কত না পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইতেছেন। পরন্তু মানুষের জ্ঞান বস্তুর প্রকৃতি ও আন্তরিক অবস্থার মর্ম্ম ভেদ করিতে সমর্থ নহে; যে জন্তু বা বৃক্ষাদি যে অংশে তাঁহার উপযোগী, তিনি সেই জন্তুর ও বৃক্ষাদির সেই অংশের উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। তাহাতেই দুই তিন পুরুষের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী ও ক্ষমতার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহা একটী স্বাভাবিক নিয়ম যে, কোন জীব ও উদ্ভিদের যে অংশটি ও যে গুণটি তাহার নিজের পক্ষে হিতকর, প্রকৃতি সেই অংশ ও সেই গুণের রক্ষণ ও পোষণ করিয়া থাকেন। তাহাতে এই ঘটে যে অপেক্ষাকৃত অধিক গুণসম্পন্ন ও প্রবল জীব বা উদ্ভিদ্ অধিককাল জীবিত থাকে এবং সন্তানসন্ততি রাখিয়া যাইতে পারে। এই সংসারে অস্তিত্বের নিমিত্ত নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। যে অধিক প্রবল ও গুণসম্পন্ন, সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আপনার জন্য স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে। যে বলহীন ও নির্গুণ, সে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাবে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পরিশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একটা স্থানে নানাজাতীয় বীজ বপন কর; দেখিতে পাইবে যে কয়েক জাতীয় বীজের অঙ্কুরোদগম পর্য্যন্ত হইবে না। যে সকল বীজ অঙ্কুরিত হইবে, তাহার মধ্যে সকল চারা কিছু সমানভাবে বর্দ্ধিত হইবে না। তাহার মধ্যে আবার কতকগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর কতকগুলি কৃশ ও নিস্তেজ হইবেক। পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, যে সকল জাতীয় বীজ বপন করিয়াছিলে, তাহার মধ্যে অনেকে বিলুপ্ত হইয়াছে, কতকগুলি নিস্তেজ ভাবে জন্মিতেছে; কিন্তু আর যে কিয়দংশ বিলক্ষণ সতেজ ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে; পরিণামে তাহারাই জীবিত থাকিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়া লইবে। এই নিয়ম সর্ব্বত্র ঘটিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রভাবে যেমন ব্যক্তিবিশেষের ধ্বংস, তেমনি জাতিবিশেষেরও অস্তিত্ব লোপ হইতেছে। এমন অনেক জীব ও উদ্ভিদের চিহ্ন ভূগর্ভে নিহিত আছে, যাহা বর্ত্তমানে জীবিত নাই। ইহা কি সম্ভব নহে, যে সকল জাতি বর্ত্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহারাও অনেক

কালে বিলুপ্ত হইবেক? প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে অহরহ কত জীবের যে ধ্বংস হইতেছে; তাহার ইয়ত্তা হয়না। কিন্তু এরূপ ধ্বংস না হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইতনা এবং সকলের জন্য আহারের সংস্থান থাকিতনা। বিগত পঁচিশবৎসরের মধ্যে মনুষ্যসংখ্যার দ্বৈগুণ্য হইয়াছে। এই হারে প্রজাবৃদ্ধি হইলে, কতিপয় সহস্র বৎসর পরে আমাদের সন্তানসন্ততিগণের পৃথিবীতে আর স্থান হইবেনা। নানা নৈসর্গিক কারণে জীবক্ষয় হইতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্নাভাব, রোগপীড়া ও শিকার তাহার মধ্যে প্রধান। এরূপ জীবক্ষয় না হইলে, যে কোন জাতির এতবৃদ্ধি হইতে পারে যে, তাহাতেই ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া যাইবেক। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যাবতীয় জীবের মধ্যে হস্তীর উৎপাদিকাশক্তি কম। এই জন্তু ত্রিশবৎসর বয়ঃক্রম হইতে ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। অতএব একটি হস্তিদম্পতী হইতে তিন জোড়া অর্থাৎ ছয়টি শাবক উৎপন্ন হয় ধরিলে, অধিক হইল না। এই হারে যদি বৃদ্ধি হয়, আর আদপে ক্ষয় না হয়, তাহা হইলে পাঁচশত বৎসরের পর পঞ্চদশ লক্ষ হস্তী ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেক। তাহাদের খাদ্য যোগান বড় সহজ ব্যাপার হইবেক না। আচার্য্য লিনিয়স বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন উদ্ভিদ নাই, যাহার দুইটি করিয়া বীজ প্রতিবৎসর না জন্মে। তাহা হইলে যদি একটি বৃক্ষের বৎসর দুইটি করিয়া চারা হয়, বিংশতিবৎসরে সেরূপ দশলক্ষ বৃক্ষ জন্মিয়া পৃথিবীর কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইবেক। অতএব প্রতীত হইতেছে, যেমন ক্ষয় ও হ্রাস, তেমনি উৎপত্তি ও স্থিতি প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চলিতেছে। যে সারযুক্ত ও গুণসম্পন্ন, তাহা রক্ষিত হয়, কিন্তু যে নিস্তেজ ও নিকৃষ্ট সে বিনাশিত হয়। প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াকেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (natural selection) বলে। ভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব আপনা হইতে উৎকৃষ্টজাতির উৎপাদন করিয়া ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, হয় একবারে বিলুপ্ত হয়, না হয় হীনভাবে অবস্থান করে। সন্নিকৃষ্ট জাতিদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যত অধিক, বিপ্রকৃষ্ট জাতিদ্বয়ের মধ্যে তত নহে। জলজন্তু ও স্থলজন্তুতে যাদৃশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উভয় জলজন্তুর মধ্যে তদপেক্ষা অধিক। ডারউয়িন সাহেব বলেন যে প্রকৃতির এই প্রক্রিয়া, (অর্থাৎ একজাতি হইতে অন্য জাতির উৎপত্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন সারহীন জাতির ক্ষয়,) যে সকল যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহা অকাট্য; কিন্তু তা বলিয়া, এমতের প্রতিকূলে কতকগুলি আপত্তি হইতে পারেনা এমন নহে। সেই সকল আপত্তির মধ্যে কতিপয়ের নিরাস হইতে পারে, কিন্তু অবশিষ্ট গুলি আমাদের জ্ঞানোন্নতির সহিত তিরোহিত হইবেক, আপাততঃ তাহার খণ্ডন সুসাধ্য নহে। তবে যে প্রতিবাদীরা বলেন যে ভূয়োদর্শনে ও

ইতিহাসে এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না, যে তদ্দ্বারা একজাতি হইতে অন্যের প্রাদুর্ভাব ও জাতিবিশেষের লোপ প্রতিপন্ন হইতে পারে। এতদুত্তরে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, মানবজাতি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। তাহার ইতিহাস আবার অতিস্বল্পকালসম্বন্ধীয়। এদিগে প্রকৃতির প্রক্রিয়া নিতান্ত মন্থর। যুগ যুগান্তরে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং তাহা যে কারণসমূহ হইতে সম্পাদিত হয়; তাহার অধিকাংশ মনুষ্যের পরিচিত নহে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় উক্ত বিষয়ে সমুচিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কালে যে পাওয়া যাইবেক, তাহাতে সংশয় করা সঙ্গত নহে।

ক্রমশঃ।

# জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

১৮৩৭ খৃঃ তিনি তাঁহার ন্যায়দর্শনে পুনর্ব্বার হস্তক্ষেপ করিলেন। ইনডক্‌সন (১) আরম্ভ করিয়াই প্রায় পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহার লেখনী এ বিষয়ে বিশ্রান্ত ছিল। এই বৎসরের প্রারম্ভে ডাক্তার হোয়েওয়েল (২) তাঁহার ইনডক্টিব বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি মিলের আদর্শের অনতিদূরবর্ত্তী হইয়াছিল। এই জন্য মিল্ অতি আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার অন্তর্বর্ত্তী বিজ্ঞান যদিও অভ্রান্ত ছিল না, তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত চিন্তার প্রভূত উপকরণসামগ্রী মিলের যে বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। উক্ত উপকরণসামগ্রী হোয়েওয়েলের হস্তে প্রথম সংস্কার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অল্প পরিশ্রমেই ইহা মিলের কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। এতদিন তিনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার করতলস্থ হইল। হোয়েওয়েলের গ্রন্থ তদীয় চিন্তাসাগরে নূতন তরঙ্গ উত্থাপিত করিল। তিনি হোয়েওয়েলের গ্রন্থ পাঠের পর হার্সেলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (৩) পাঠ করিলেন। এই গ্রন্থ তিনি পূর্ব্বেও পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইহার সমালোচনা পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কখন তাঁহার কোন উপকার দর্শে নাই। কিন্তু এক্ষণে হোয়েওয়েলের

(1) Induction (2) Dr. Whewell.

(3) S. J. Hershell's discourse on the Study of Natural Phylosophy.

গ্রন্থের আলোকে তিনি অনেক নূতন বিষয় দেখিতে লাগিলেন, আপনার মানসিক উন্নতির ইয়ত্তা করিতে পারিলেন। তাঁহার নব পত্রিকার সম্পাদন কালের মধ্যে যে অবসর পাইতেন তাহাতেই তাঁহার সুবিখ্যাত ন্যায়দর্শনের এক তৃতীয়াংশ সমাপ্ত করিলেন। পূর্ব্বে তিনি এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতেও আর এক তৃতীয়াংশ হইল। অপর এক তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ন্যায়দর্শন এই অবস্থায় রাখিয়া তিনি এক্ষণে কম্‌টের দর্শন (৪) লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিলেন।

মিল্ কম্‌টের গবেষণাপ্রণালীর সূক্ষ্মতা ও গভীরতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার দর্শনের এই প্রধান দোষ উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহাতে প্রমাণের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই। এই বিষয়ে মিলের দর্শন কম্‌টের দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। যাহা হউক কম্‌টের দর্শন পাঠে মিলের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছিল। তাঁহার শেষ রচনা সকল অনেকস্থলে কম্‌টের দর্শনালোকে আলোকিত। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কম্‌ট-দর্শনের দুই খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর কম্‌ট-দর্শনের অবশিষ্ট খণ্ড সকল যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল অমনি মিল্ বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। কম্‌টের সামাজিক বিজ্ঞান (৫) মিলের রুচিকর হয় নাই। চতুর্থ খণ্ডে এই বিষয়ের আলোচনা ছিল। সুতরাং চতুর্থ খণ্ড মিল্‌কে সম্পূর্ণরূপে হতাশ করে। কিন্তু পঞ্চম খণ্ড তাঁহার এই ক্ষোভ কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত করে। এই খণ্ডে ইতিহাসের একটী অখণ্ড ছবি প্রদত্ত হয়। এই ছবি অবলোকন করিয়া মিল্ পরম পুলকিত হন। ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে মিল্ বিপরীত ডিডক্‌টিব প্রণালী (৬) বিষয়ে কম্‌টের নিকট বিশেষ ঋণী ছিলেন। এই মতটী সম্পূর্ণ নূতন। মিল্ কম্‌টের দর্শন ভিন্ন আর কুত্রাপি এই মত দেখেন নাই। বোধ হয় কম্‌টের দর্শন অবলোকন না করিলে এই মতে উপনীত হইতে মিলের বহুদিন লাগিত, অথবা হয়ত তিনি স্বয়ং কোনকালেই এমতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না।

কম্‌টের সহিত মিলের কখনই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় নাই, তথাপি মিল্ তাঁহার রচনাবলীর একজন অকপট স্তুতিবাদক ছিলেন। কিছুদিন তাঁহাদিগের মধ্যে পত্রাদি লেখালিখিও চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই পত্র সকল বিতণ্ডায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পরস্পরকে পত্র লেখার আগ্রহও কমিয়া গেল। পত্র লেখা বিষয়ে মিল্ সর্ব্বপ্রথমে শিথিল হন, কিন্তু পত্র লেখা রহিত করা বিষয়ে কম্‌টই অগ্রগামী হন। মিল্ দেখিলেন—আর বোধ হয়

(4) Compte's cours de Philosophe Positive.

(5) Social science.

(6) Inverse Deductive method.

কম্‌টও তাহাই বুঝিলেন—যে তাঁহাদ্বারা কমটের মানসিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এবং কমট দ্বারা তাঁহার যে উপকারের সম্ভাবনা, তাহা কম্‌টের পুস্তক দ্বারাই হইতে পারে। তাঁহাদিগের পার্থক্য যদি সামান্য-মতভেদ-ঘটিত হইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইত না। কিন্তু যে সকল প্রিয়তম মত তাঁহাদিগের গভীর ও প্রবলতর হৃদয়ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, যে সকল প্রিয়তম মত তাঁহাদিগের দুই জনকে দুই স্বতন্ত্র পথে লইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদিগের পার্থক্য সেই প্রিয়তম ও গভীরতম মত সকলের উপর সংস্থাপিত ছিল। কম্‌ট বলিতেন যে যেমন জনসাধারণ ও তন্নেতৃগণ প্রকৃতিতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের মতের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি বিষয়ে দার্শনিকদিগের মতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা উচিত। মিল্ এ বিষয়ে কম্‌টের সহিত সম্পূর্ণরূপ ঐকমত্য অবলম্বন করিতেন। কম্‌টের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ পাঠ করা অবধি এই মত মিলের অন্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। মধ্যযুগে রাজকীয় (১) ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় (২) ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ভূত হওয়ায় আধুনিক ইউরোপের সভ্যজাতি সকল যে কি অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন, কম্‌ট তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। মিল্ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কম্‌ট বলিতেন যে ধর্ম্মযাজকেরা এতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতির উপর যে প্রভুতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কালে সেই প্রভুতা অতর্কিতভাবে দার্শনিকদিগের হস্তেই পতিত হইবে। দার্শনিকেরা যখন নানা মত পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপ ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন, তখনই তাঁহারা এরূপ আধিপত্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন। মিল্ এ বিষয়েও কম্‌টের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কম্‌ট দার্শনিকদিগকে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিলেন; যখন তিনি রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা এক সময় যে আধ্যাত্মিক আধিপত্য ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দার্শনিকদিগকে সেই আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; যখন তিনি এই আধ্যাত্মিক প্রভুতাকে উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালীর একমাত্র অবলম্বন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন; যখন তিনি এরূপ যথেচ্ছাচারপ্রণালী হইতে রাজনৈতিক ও পারিবারিক অনেক উপকারের আশা করিতে লাগিলেন; সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মিল্ স্থির করিলেন যে ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত যতই

(1) Temporal. (2) Spiritual.

কেন এক হউক না, সমাজতত্ব বিষয়ে তাঁহারা আর এক পথে অধিক দিন বিচরণ করিতে পারেন না। কমট (১) "সিষ্টেম্ ডি পলিটিক্ পজিটিব" নামক তাঁহার শেষ গ্রন্থে তাঁহার এই মত সকলকে চরমসীমায় সমানীত করেন। সেই মত এই—কতকগুলি আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও শাসনকর্ত্তাদিগের একটী সুসম্বদ্ধ সমাজ থাকিবে. জনসাধারণ যে যে মতবিষয়ে ঐক্য অবলম্বন করিয়াছে তাঁহাদিগ দ্বারা সেই সেই মত নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জ্জিত হইবে। এই নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জ্জিত সাধারণ মত সমাজের ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যের এবং যতদূর সম্ভব চিন্তারও নিয়ামক হইবেক। সেই কার্য্য ও চিন্তা তাঁহাদিগের নিজ সম্বন্ধেই হউক আর জনসাধারণ সম্বন্ধেই হউক। আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এরূপ ভীষণ যথেচ্ছাচার প্রণালীর প্রতিপোষক মত বোধ হয়, (২) ইগ্নেসিয়স্ লয়্লা ভিন্ন আর কোন মনুষ্যের মস্তিষ্ক হইতে কথন নিষ্কৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক কম্টের এই গ্রন্থখানি হৃদয়ের গভীর ভাব সম্বন্ধে যে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার একমাত্র মূল্য এই যে, "ধর্ম্মে বিশ্বাস ব্যতিরেকে নৈতিক প্রভুতা সংরক্ষিত হইতে পারে না" জগতে যে এই ভ্রান্ত মত প্রচলিত ছিল. ইহা তাহার মূলোচ্ছেদ করে। কারণ কমট মানব ধর্ম্ম (৩) ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। যাহা হউক যাহা জাতিসাধারণ সকলেই ভাল বলিয়া জানে, তাহা ব্যক্তি মাত্রকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে—কমটের এই ভীষণ মত চিন্তা করিতেও ভয় হয়। স্বাধীনতা (৪) ও ব্যক্তিত্বের (৫) মূল্য বিষয়ে নষ্টদর্শন হইলে যে মনুষ্যদ্বারা কি ভীষণ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, যাঁহারা রাজনীতি ও সমাজতত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, কমটের পুস্তক তাঁহাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিতেছে।

গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থকার হইবার উদ্দেশে যে চিন্তা, তদ্বিষয়ে মিল্ যে কিছু সময় অর্পণ করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার পত্রিকার সম্পাদনেই পর্য্যবসিত হইত। যে প্রবন্ধগুলি লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ হইতে উদ্ধৃত হইয়া ডেসারটেসন্স নামক তদীয় পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, তিনি উক্ত পত্রিকায় সমুচয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, সে গুলি তাহার চতুর্থাংশও নহে। উক্ত রিভিউএর সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার দুইটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। দার্শনিক র্যাডিক্যালিজমকে (৬) সাম্প্রদায়িক

(1) Systeme de politique positive.
(2) Ignatius Loyla.
(3) Religion of Humanity.
(4) Liberty.
(5) Individuality.
(6) Philosophic Radicalism.

বেন্থামিজম্ (১) অপবাদ হইতে মুক্ত করা তাহার অন্যতর। র‍্যাডিকাল মতকে প্রশস্ততর ভিত্তিতে সংন্যস্ত করা, ইহাকে স্বাধীনতর আকার প্রদান করা, মিলের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার এই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সংসিদ্ধও হইয়াছিল। সুশিক্ষিত র‍্যাডিকালদিগকে পার্লিয়ামেণ্ট বা অন্যত্র কার্য্যে উত্তেজিত করা এবং যাহাতে তাঁহারা হুইগদিগের সহিত সমানরূপে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন এই জন্য তাঁহাদিগকে দলবদ্ধ করা তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার এই লক্ষ্য প্রথম হইতেই বিফল হয়। সময়ের অননুকূলতা, সংস্কারোৎসাহের হ্রাসপ্রবণতা এবং টোরিদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা—ইহার আংশিক কারণ বটে, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অসদ্ভাবই ইহার প্রধান কারণ। এই সময় পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে অনেকগুলি সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ র‍্যাডিকাল-মতাবলম্বী লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন লোক এক জনও ছিলেন না। মিলের গভীর উত্তেজনাও তাঁহাদিগকে সঞ্চালিত করিতে পারিল না। কিন্তু এই সময় সৌভাগ্যক্রমে একটী ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহাতে মিল্ অসমসাহসিকতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত র‍্যাডিকাল মতের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন। মন্ত্রিদল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লিবারেল্ না হওয়ায় এই সময় লর্ড ডর্হাম মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু তিনি অচিরকাল মধ্যেই ক্যানাডীয় বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় ও অপনয়ন করার ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম হইতেই র‍্যাডিকাল উপদেশকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রথম কার্য্যই—উদ্দেশ্য ও ফলে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য সন্দেহ নাই—হোম গবর্ণমেণ্ট নামঞ্জুর করেন ও উল্টাইয়া দেন। সুতরাং তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রিদলের সহিত প্রকাশ্য বৈরভাবে অবস্থিত হন। এক দিকে টোরিগণ (২) দ্বারা ঘৃণিত, অন্য দিকে হুইগগণ (৩) দ্বারা অবমানিত,—অথচ অর্থ ও গৌরবে কাহা অপেক্ষাও ন্যূন নহেন—এরূপ অবস্থায় লর্ড ডর্হামেরই র‍্যাডিকাল দলের অধিনায়ক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তিনি সকল দিক্ হইতেই নিষ্ঠুররূপে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন; শত্রুরা তাঁহার কার্য্যের দোষোদ্ঘোষণ করিতে লাগিল, বন্ধুবর্গ কিরূপে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে তাহা জানে না। এইরূপ অবস্থায় ভগ্নমনা ও পর্য্যুদস্ত হইয়া তিনি কানাডা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। মিল্ প্রারম্ভ হইতেই কানেডীয় ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন; তিনি ডর্হামের উপদেশক দিগের উপদেশক ছিলেন; ডর্হাম্ কানেডীয়

(1) Sectarian Benthamism.

(2) Tories. (3) Whigs.

ঘটনাবলীর যেরূপে পরিচালন করিয়াছিলেন তিনিও ওরূপ অবস্থায় ঠিক সেইরূপ করিতেন, সুতরাং তিনিই ডর্হামের পক্ষ সমর্থন করণে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্রিকায় ডর্হামের পক্ষ সমর্থক একটী প্রবন্ধ রচনা করেন; তাহাতে তিনি যে ডর্হামকে শুদ্ধ অভিযোগ হইতে মুক্ত করেন এরূপ নহে; স্বদেশবাসিদিগের নিকট তাঁহার জন্য প্রশংসা ও গৌরব প্রার্থনা করেন। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য কতিপয় সম্পাদক মিলের মতের অনুসরণ করিলেন। লর্ড ডর্হাম ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইবামাত্র যে অতি সমারোহে গৃহীত হন, তাহার প্রধান কারণ মিলের এই প্রবন্ধ। এরূপ মুমূর্ষু সময়ে মিলের প্রবন্ধ বাহির না হইলে, ডর্হামের অদৃষ্টে যে কি ঘটিত কে বলিতে পারে? যাহা হউক ডর্হামের ক্যানেডীয় রাজনীতি যদিও জয় লাভ করিল; তথাপি গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার আদর জন্মের মত তিরোহিত হইল। কিন্তু ডর্হামের আদেশানুসারে চার্ল্স বুলার কর্ত্তৃক লিখিত লর্ড ডর্হামের ক্যানেডীয় কার্য্যবিবরণ—রাজনৈতিক জগতে একটী নূতন যুগের অবতারণা করে। লর্ড ডর্হাম উক্ত কার্য্যবিবরণে সম্পূর্ণরূপ আভ্যন্তরীণ আত্মশাসনপ্রণালীর সংস্থাপনের অনুরোধ করেন। তাঁহার এই অনুরোধে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই কানাডায় আত্মশাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ঐ প্রণালী ইউরোপীয় সভ্যজাতিমাত্রেরই উপনিবেশ সকলে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। মিল্ যথাসময়ে ডর্হাম ও তদীয় মন্ত্রিবর্গের কার্য্যপ্রণালীর পোষকতা না করিলে এরূপ শুভকর অনুষ্ঠান শীঘ্র সংঘটিত হইত কি না সন্দেহ। উক্ত পত্রিকার সম্পাদনকালে আর একটী ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহাতে মিলের দ্রুত হস্তক্ষেপ ঘটনাসাগরের প্রবাহ পরিবর্ত্তন করে। কার্লাইলের ফরাশিবিপ্লব যে অতিশয় গৌরব ও কৃতকার্য্যতা লাভ করে, তাহার প্রধান কারণ মিলের সমালোচনা। এই গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহির্গত হইবামাত্র স্থূলদর্শী সমালোচকেরা—যাঁহাদিগের বিবেকপ্রণালীকে কার্লাইল পদদলিত করিয়াছিলেন—স্ব স্ব কূটযুক্তি দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণকে ইহার বিরুদ্ধে দূষিত করিতে না করিতেই, মিল্ নিজের পত্রিকায় ইহার সমালোচনা বাহির করেন। তিনি এই সমালোচনায় এই গ্রন্থের এই বলিয়া প্রশংসা করেন যে, ইহা স্বাভাবিকী প্রতিভার ফল. সুতরাং ইহা সামান্য নিয়ম বা বিধির অধীন নহে বরং ইহা নিয়ম বা বিধির প্রবর্ত্তক। মিলের এই সমালোচনায় কার্লাইলের এই গ্রন্থ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হয়। মিলের সমালোচনার কোন অদ্ভুত শক্তি ছিল বলিয়া মিলের সংস্কার ছিল না। তাঁহার মতে সাময়িক হস্তক্ষেপই এরূপ কৃতকার্য্যতার মূল। তিনি বলিতেন ঠিক সেই সময়ে যে কোন ব্যক্তি কথঞ্চিৎ হৃদয়গ্রাহিরূপে

ঐরূপ মত প্রকাশ করিলে, সমান ফল উৎপাদন করিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যদিও তিনি তাঁহার পত্রিকা দ্বারা র‍্যাডিকাল রাজনীতিতে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি যখনই এই দুই ঘটনার বিষয় মনে করিতেন তখনই তাঁহার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইত।

র‍্যাডিকালদলের সংস্থাপন-বিষয়িণী আশালতা উন্মূলিত হইলে, মিল্ পত্রিকার সম্পাদনজনিত অর্থ ও সময়ের বৃথা ব্যয় হইতে বিরত হইলেন। এই পত্রিকা তাঁহার নিজের মত প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ ছিল। এই পত্রিকায় তিনি সম্পূর্ণরূপে তদীয় পরিবর্তিত মত সকল ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাথমিক রচনাবলীর সঙ্কীর্ণ বেন্থামিজম্ হইতে আপনাকে স্পষ্টরূপে পৃথক্কৃত করিতে পারিয়াছিলেন। তদ্রচিত বিবিধ সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ, দুইটী প্রবন্ধে তৎকর্তৃক বেন্থাম ও কোলারীজের দর্শনের তুলনা, এবং তদীয় রচনা সকলের সাধারণ ভাব—পাঠকমাত্রকেই প্রতিপন্ন করিয়াছিল যে তদীয় মতসকলে অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের প্রথমটীতে তিনি বেন্থামের গুণ বর্ণনপূর্ব্বক, তাঁহার দর্শনের ভ্রম ও অভাব সকল প্রদর্শন করেন। এরূপ সমালোচন ন্যায়সঙ্গত হইলেও, বেন্থামের দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে না করিতেই, তাহার গৌরব নষ্ট করা মিলের সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। ইহাতে উন্নতির পথ রুদ্ধ বই পরিষ্কৃত হয় নাই। কোলেরীজবিষয়ক প্রবন্ধে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অভাবাত্মক দর্শন বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান হয় তাহারই স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। তিনি ইহাতে সেই অভাবাত্মক দর্শনের প্রকৃতিগত দোষ সকল স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দেন।

উক্ত পত্রিকার যে সংখ্যায় কোলেরীজবিষয়ক প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়, মিলের অধ্যক্ষতাকালে উক্ত পত্রিকার ঐ শেষ সংখ্যা। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে মিল্ উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষতা হিক্‌সন্, (১) সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। হিক্‌সন্ তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে উক্ত পত্রিকার একজন অবৈতনিক নিয়মিত ও যোগ্য লেখক ছিলেন। হিক্‌সনের সহিত মিলের এই মাত্র বন্দোবস্ত হইল, যে উক্ত পত্রিকা এখন হইতে "ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ" এই পুরাতন নামে আখ্যাত হইবে। সেই নামে উক্ত পত্রিকা হিক্‌সনের অধ্যক্ষতায় দশ বৎসরকাল প্রচলিত থাকে। হিক্‌সন্ উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক দুইই হইলেন। তিনি তাঁহার পরিশ্রমের জন্য কিছুই লইতেন না, এবং খরচ পত্র বাদে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত নিয়মিত লেখকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। কিন্তু এরূপ র‍্যাডিকাল-

(1) Mr. Hickson.

মতাবলম্বিনী পত্রিকার ব্যয় বাদে আয় অতি অল্পই হইত। সুতরাং এত অল্প টাকায় তিনি যে সম্মানের সহিত এতদিন এই পত্রিকা চালাইতে পারিয়াছিলেন ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইহা তাঁহার হস্তে যত দিন ছিল, ততদিনই ইহা উন্নতি ও র‍্যাডি-কালিজম্ মত প্রচার বিষয়ে সতত ব্রতী থাকিত। মিল্ ইহাতে লিখিতে একেবারে ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু এডিন্‌বরা রিভিউএর অধিকতর প্রচারহেতু এখন হইতে তাহাতেই তিনি অধিক পরিমাণে লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে "ডিমক্রেসি ইন্ অ্যামেরিকা" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। মিল্ এই গ্রন্থের সমালোচনা এডিন্‌বরা রিভিউতে প্রদান করিয়া ইহার লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ।)

# চিত্তবিনোদিনী

আজ কাল বঙ্গভাষায় ভূরি ভূরি নাটক ও উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে। প্রকাশ্য রঙ্গভূমির পরিস্থাপনাবধি নাট্য-সাহিত্য যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্রূপ সুফলপ্রসবিনী হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, আজি পর্য্যন্ত যে শত সহস্র নাটক প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই চারি খানি সদ্ভাবসম্পন্ন প্রকৃত নাটক নামের উপযোগী দৃশ্যকাব্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। কিন্তু উপন্যাস সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে না। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীগণের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজী ঔপন্যাসিক সাহিত্য-পাঠে বিলক্ষণ অভিনিবিষ্ট দেখা যায়। উচ্চ সাহিত্যের সম্যক্ সমালোচনা করা, হয় আজিও তাঁহাদিগের শক্তির বহির্ভূত, না হয় প্রবৃত্তিবিরোধী। সেদিকে পদার্পণ করিবার এখনও বিলম্ব আছে। কিন্তু তা বলিয়া, যাহা স্বতঃ ও সহজে সমদ্ভূত হইতেছে, তাহা নিবারণ করা কখন বিবেচনাসিদ্ধ নহে। তদ্দ্বারা যদি বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন হয় ক্ষতি কি? বিশেষতঃ আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে অর্দ্ধশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক। তাহারা সহজ ও সুখপাঠ্য উপন্যাস পাঠে যেমন প্রীত হয়, এমত আর কিছুতেই নহে। আমাদিগের শিক্ষিতা মহিলাগণও উপন্যাসপ্রিয়। অতএব ঔপন্যাসিক স্রোতকে এখন পরিবর্দ্ধিত করা নিতান্ত অবিহিত নহে। তদ্দ্বারা যদি জনসাধারণের প্রবৃত্তি, রুচি, ও শিক্ষা কথঞ্চিৎ উন্নত হয়, দেশের মঙ্গল বই অমঙ্গল

* সিপাহী বিদ্রোহসম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম, এ; বি, এল; প্রণীত। প্রাচীনভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। ১৭৯৬ শক। মূল্য ১০ সিকা মাত্র।

নহে। ইংরাজী সাহিত্য ইতিবৃত্তের পর্য্যালোচনা করিলেও প্রতীতি হইবে যে, ইংলণ্ডেও সময়ে সময়ে এক একবিধ সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের বিশেষ প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। প্রথম চার্লস এবং সাধারণতন্ত্রের সময়ে দিন দিন কত সহস্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা জনসমাজে প্রকাশিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেক্টেটর, ট্যাটলার প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় দেশীয় বিদ্যা বিভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জনসমাজকে শিক্ষা দিতে লাগিল। বর্ত্তমান শতাব্দীকে ইংরাজী সাহিত্যের ঔপন্যাসিক কাল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে যে সময়ে যে সাহিত্যের স্রোত স্বাভাবিক ও সহজে প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে জনসমাজ সেই সাহিত্যের স্রোতে আপনাদিগের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। শুধু তৃষ্ণামোচন করে নাই, তাহাতে সন্তরণ করিয়াছে, ও যথেচ্ছা ক্রীড়া করিয়া সম্পূর্ণ সুখলাভ করিয়াছে। এই সমস্ত অনায়াসলব্ধ প্রবাহে প্রবর্দ্ধমান হইয়া আজি ইংরাজসাহিত্যের বৃহৎনদ নৃত্য করিতে করিতে শতধা কেমন জ্ঞানসমুদ্রের অনন্তদেশে প্রবাহিত হইতেছে। ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির সাহিত্য-ইতিবৃত্তেও এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত করিয়া দেয়।

বঙ্গসাহিত্যের প্রবাহ যে কিরূপে প্রবর্দ্ধমান হইবে, এবং কোথায় বিচালিত হইবে, তাহা কখনই অনুমান করা যায় না। কিন্তু যে যে স্রোত আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইতেছে, আমরা সহর্ষচিত্তে তাহার বারিরাশিতে সন্তরণ ও ক্রীড়া করিয়া অবশ্য পরিতোষ লাভ করিব। ঔপন্যাসিক স্রোতে যদি আমাদিগকে একদা ক্রীড়া করিতে ও নিমগ্ন হইতে হয়, আমাদিগের দেখা উচিত, এই স্রোতে কি কি অমূল্য নিধি লাভ করা যাইতে পারে। অতএব যাঁহারা এই প্রবাহ প্রবর্দ্ধমান করিতে সযত্ন ও কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকারী, ও আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন। সমালোচ্য গ্রন্থের জন্মদাতা যে এই প্রবাহের বারিরাশি প্রবর্দ্ধমান করিতে অনেক সহায়তা করিতে পারিবেন, আমাদিগের এরূপ বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছে। তিনি প্রথম উদ্যমেই দেখাইয়াছেন, যে তাঁহার এ বিষয়ে বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে। সেই সামর্থ্য যথাবিধি নিয়োজিত করিতে পারিলেই অবশ্য কৃতার্থ হইবেন।

বাঙ্গালীর স্থির ও জড় জীবনে ঔপন্যাসিক প্রভাব পতিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা যে প্রকার আলস্য-সুখপ্রিয়, বিলাসী, নির্জ্জীব, নিস্তেজ, ও জড়বৎ স্বদেশ এবং গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভাল বাসি, এমত আর কোন জাতি নহে। এজন্য আমাদিগের জীবনে কিছুই বৈচিত্র্য এবং রমণীয়তা উপলব্ধি হয় না। এ জীবন নিতান্ত কবিত্বশূন্য! আমরা একভাবেই অনুদিন অতিযাপিত

করিতে ভালবাসি। আমরা কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী নাহি। কোন অবদান ও সাহসিকতা আমাদিগের কুষ্ঠিতে উল্লেখিত নাই। "ভীত বাঙ্গালী" আমাদিগের অপযশ ও জাতীয় কলঙ্ক। আমরা চিরকাল বধূর মুখ দেখিয়া সকল ভুলিয়া থাকি। স্ত্রৈণতা আমাদিগের জাতীয়ভাব। গৌরব ও মহত্ত্ব, উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। সাহসে নির্ভর করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতে হইলেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটে। বিঘ্ন ও বিপত্তির নাম শুনিলেই আমরা শত হাত দূরে যাই। নীতিশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা ঘোটকেরও নিকটবর্ত্তী হইতে পারি না। বাঙ্গালীর জীবন এইরূপ স্থির, জড়বৎ ও অসার। তাঁহার হৃদয়ে যত ঔপন্যাসিক প্রভাব প্রবিষ্ট হইবে ততই তিনি জীবিত হইতে থাকিবেন। ঔপন্যাসিক বীরত্ব ও কার্য্য নিচয় আতিশয্য দোষে কলঙ্কিত হইলেও, বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা আপাততঃ অনুকরণীয় বটে। যদি ঔপন্যাসিক নায়ক এবং নায়িকার ন্যায় প্রমত্ত হইবার জন্য আমাদিগের ইচ্ছা বলবতী হয় এবং আমরা যদি সেই ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হই, তাহাতে আমাদিগের পরিণামে অমঙ্গল ঘটিবে না। যেরূপে হউক আমাদিগের বর্ত্তমান জড়তা ও ভীতি অপনীত হইলে আমরা একদিন জীবিত হই। জীবিত হইয়া দেখি, একদিন প্রকৃত জীবনে কত সুখ। জীবনের কার্য্যশীলতায় মানবপ্রকৃতির কিরূপ স্ফূর্ত্তি হয় তাহা অনুভব করি। প্রসারিত জীবনক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে প্রমত্ত বারণের মত কার্য্য করায় কি সুখ, তাহা একদা সম্ভোগ করি। একদা ডনকুইক্‌সটের জীবন বাস্তবিকতায় পরিণত করি। একদা সেরভিণ্টিসের ঘটনাময় জীবন স্বকীয় জীবনে অনুকরণ করি। একদা স্কট্‌ অথবা বাইরণের মত জীবনকে রমণীয় কবিত্বভাবে পরিপূর্ণ করি। নির্ভীক হৃদয়ে বিপদে ঝম্প প্রদান করি, এবং শুভোদ্দেশে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করি। সাগরমন্থনে ভীত হই না, কান্তারে প্রবেশ করিতে পরাঙ্মুখ হই না, এবং প্রকৃতির ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে সংকল্পসাধনে বিরত হই না। বহুল উপন্যাস পাঠের ফল যদি এরূপ শুভকর হয়, তবে উপন্যাস আমাদিগের পরম মিত্র, এবং ঔপন্যাসিক সাহিত্য এক্ষণে আমাদিগের উৎসাহ লাভের পরম উপযোগী বলিতে হইবে।

গোবিন্দবাবু এই উৎসাহ লাভের একজন সুযোগ্য পাত্র। তিনি উপন্যাস-লেখকের অনেক গুণের পরিচয় দিয়াছেন। চিত্তবিনোদিনী গোবিন্দবাবুর প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তদীয় গুণাবলির আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের সম্পূর্ণ বিস্ফূরণ এখনও দেখিতে পাই নাই। তাহা সময়ে ঘটিতে পারে। গোবিন্দবাবুর সে সমস্ত গুণের প্রথম অরুণরশ্মি প্রভাসিত হইয়াছে—সে সমস্ত গুণ উপন্যাস-লেখকের সামান্য গুণ

নহে। তাহাদিগের ঈষৎ বিভাতেই তাঁহার প্রথম রচনাকে আলোকিত করিয়াছে। তাঁহার রচনার যে স্থান পাঠ কর দেখিতে পাইবে, তাঁহার গুণাবলির সুন্দর নিদর্শন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে।

কবি, স্বীয় কল্পনাকোষ হইতে শত সহস্র রত্ন আহরণ করেন; পণ্ডিত, গ্রন্থাবলি হইতে নানাবিধ মহার্ঘ উপদেশ সংগ্রহ করেন; কিন্তু আধুনিক উপন্যাস-লেখক, দেশ, কাল, ও প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহাদিগের সুন্দর চিত্র সকল প্রদান করেন। দেশের আচার ব্যবহার, কালের অবস্থা ও গতি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং মানবের রীতি নীতি, ব্যবহার চরিত্র, ও প্রকৃতির বিশেষ ভাব সমূহের প্রকটন করা উপন্যাসের কার্য্য। এজন্য উপন্যাস-লেখককে, সেরভ্যাণ্টিসের মত নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং নানা অবস্থায় নিপতিত হইয়া, মানব প্রকৃতিকে বিশেষ-রূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হয়। তিনি স্কটের ন্যায় কৃষকের কুটীরে বসিয়া কখন বৃদ্ধা পিতামহীর উপকথা আকর্ষণ করিতেছেন। কখন ফিল্ডিঙের সহিত বিচারস্থানে উপবিষ্ট আছেন, অথবা স্কোয়ার-ওয়েষ্টরণের সহিত মৃগয়ার অত্যয়ে পদার্পণ করিতেছেন। তিনি কখন স্মলেট এবং কুপারের মত সমুদ্রের রহস্য উদ্ভেদ করিতেছেন, আবার স্থিরচিত্তে স্থিরবাসে বন্ধুবান্ধবের সহিত গৃহ মধ্যে সামাজিক সুখ, প্রেম, ও দয়াধর্ম্মের রসাস্বাদন সম্ভোগ করিতেছেন। তাঁহার এই সমস্ত বহুদর্শিতার সুন্দর চিত্র সকল যখন আমরা পরিদর্শন করি, যখন মানব-প্রকৃতির সুন্দর ছবি এবং দেশ কালের প্রকৃতি পরিদর্শন করি, তখন কি আমরা জিনো, ক্রিসিপাস, এপিকটেটস প্রভৃতিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, র্যাসীন, ভল্টেয়ার, রিচার্ডসন, স্কট, বোক্যাসিও, মেরিভো, এবং রিকোভিনিকে সহর্ষচিত্তে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হই না? বাস্তবিক উপন্যাস যদি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিরচিত হয়, তাহা দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষাও উপাদেয় হইতে পারে। তত্ত্ববিৎ এড্যাম স্মিথ উপন্যাস রচনার এই প্রকার সাধুবাদ করিয়াছেন। কথিত আছে, প্রণয় এবং উপকথার সংযোগে উপন্যাসের উৎপত্তি। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসে, প্রকৃতি ও সম্ভাবনার সহিত এই উপকথার এ প্রকার সঙ্গতি রক্ষা হয়, যে তাহা প্রায় প্রকৃত ঘটনার আকার ধারণ করে। এই জন্য ফিল্ডিং কহিয়া গিয়াছেন,—যে ইতিহাসে ব্যক্তিগণের নাম এবং ঘটনার সন তারিখ ভিন্ন আর কিছুই সত্য বোধ হয় না, কিন্তু উপন্যাসে নাম এবং তারিখ ভিন্ন আর সকলই সত্য।

আধুনিক এই উপন্যাস দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। এক শ্রেণী ঘটনাপ্রধান, অপর শ্রেণী রসপ্রধান। রস-প্রধান উপন্যাসে ঘটনাযোজনার

তাদৃশ বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় না। ইহাতে সামান্য সামান্য ঘটনা দ্বারা পাত্র ও পাত্রীগণকে এরূপ অবস্থায় স্থাপিত করা হয়, যে তাহাতে তাহাদিগের চিত্তভাব ও স্বভাব বিশেষরূপে প্রকটিত হয়। রসপ্রধান উপন্যাসে ঘটনা গৌণ, রস মুখ্য। অন্য শ্রেণীর ধর্ম্ম এই যে তাহাতে ঘটনাপরম্পরা আমাদিগের চিত্ত ও কৌতূহলকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। ব্যক্তিগণের চরিত্র এবং রসবোধ আনুষঙ্গিক মাত্র। কিন্তু ইহাতে দেশ, কালের বিবরণ, এবং আচার ব্যবহার সুন্দররূপে বর্ণিত থাকে। নানাবিধ বর্ণনাও ইহার অন্যতম ধর্ম্ম। এই শ্রেণীর উপন্যাসে কল্পনাশক্তির অধিকতর পরিচয় হয়। রস প্রধান উপন্যাসে যতদূর কবিত্বের আবশ্যক করে, ইহাতে ততদূর নহে। রসপ্রধান উপন্যাসে কল্পনা, সুন্দর সুন্দর সংস্থানের রচনা করিয়া, উপন্যাসকে চমৎকার কবিত্বে পূর্ণ করে। ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে কল্পনা, নানাবিধ বিস্ময়কর ও অভাবনীয় ঘটনার সৃষ্টি ও সংযোজন করিয়া আমাদিগের কৌতূহলস্পৃহা শনৈঃ শনৈঃ উত্তেজিত করিতে থাকে। এই সমস্ত ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে উপন্যাস-সন্নিবিষ্ট পাত্র এবং পাত্রীগণের চরিত্র ও কার্য্য, হৃদয়ভাব ও ব্যবহার কথঞ্চিৎ উন্মেষিত হয়। বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, রস-প্রধান উপন্যাসের সুস্পষ্ট উদাহরণ। চিত্তবিনোদিনী ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের দৃষ্টান্তস্থল।

গোবিন্দ বাবুর কল্পনাশক্তি যে অতি বলবতী, তাহা সমালোচ্য গ্রন্থে বিশেষরূপে প্রকাশিত আছে। তিনি মনে করিলে ঘটনার উপর ঘটনা রচনা করিতে পারেন এবং প্রতিমুহূর্ত্তে সহস্র তুমুলকাণ্ড বাঁধাইয়া দিতে পারেন। আবার কৌশলপূর্ব্বক প্রতিঘটনার সংযোজন দ্বারা সেই সমস্ত তুমুল ব্যাপারের সমাধান করিতে পারেন। তাঁহার গ্রন্থে দেখা যায়, কোথা হইতে মেঘমালা গগণদেশ আচ্ছন্ন করিতেছে, আবার অনতিবিলম্বে কোথা হইতে ব্যাত্যা উত্থিত হইয়া সেই কাদম্বিনীজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। গগণ পরিষ্কার; আবার মেঘাচ্ছন্ন, আবার পরিষ্কার। তবু ঘটনাজাল নিবারিত হয় না। সহজে অনর্গলভাবে সমুত্থিত হয়। যেন লেখকের কল্পনাশক্তির উর্ব্বরতারই পরিচয় দিতেছে। উর্ব্বরা ভূমিতে যদি দুই একটি কণ্টক জন্মিতে দেখা যায় তাঁহা ধর্ত্তব্য নহে।

সমালোচ্য উপন্যাস ঘটনাপ্রধান হইলেও ইহাতে মানবচিত্র এবং হৃদয়ভাব অনেক স্থলে সুন্দরভাবে প্রকটিত আছে। তবে রচয়িতার ত্রুটি এই, তিনি যতদূর অভিনিবেশ সহকারে ঘটনাকদম্বের সম্বন্ধ রক্ষা এবং সূত্র প্রবর্দ্ধমান করিয়াছেন, সেরূপ অভিনিবেশের সহিত চরিত্র এবং হৃদয়ভাব প্রকটনে যত্নশীল হয়েন নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও মানচরিত্র এবং হৃদয়ভাব বর্ণনে তাঁহার যে বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে তাহা স্পষ্টই

প্রতীত হয়। আমরা চিত্তবিনোদিনীতে এই ক্ষমতার আভাসমাত্র দেখিতে পাই। কারণ ইহাতে ব্যক্তিগণের চরিত্র এবং হৃদয়ভাব অর্দ্ধ-অঙ্কিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার চিত্রাবলী সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। চিত্রাবলী সম্পূর্ণ না হউক, কতিপয় অঙ্করেখাতেই তাহাদিগের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁড়েজী এবং নানা সাহেব—এই দুই ব্যক্তি গ্রন্থের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাঁহাদিগের চরিত্র-কল্পনা কি ভয়ানক, কি মহৎ! পাঁড়েজীর নির্ভীকতা এবং বিশ্বস্ততার জন্য তিনি ষড়যন্ত্র ও অবদানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাঁহার দয়াধর্ম্ম ও হৃদয়ভাব, মহচ্চরিত্রের নিদর্শন। তদ্দ্বারা তিনি সকলেরই মন আকর্ষণ করিতে পারেন এবং সকলকেই মন্ত্রণায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। তাঁহার কল্পনাতে অনুভব হয়, তাঁহার হস্তে প্রভূত শক্তি ন্যস্ত আছে। তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে ভয় হয়; কিন্তু তাঁহার সহিত পরিচয় জন্মিলে তাঁহার প্রভাবে আকৃষ্ট হইতে হইবেই হইবে। তিনি যেন কোন প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অভিসন্ধি অতি গূঢ়। তাঁহার সঙ্কল্প সকল গভীর,গোপনীয়, দুর্গম অথচ অটল। তিনি যেন কি প্রলয় ঘটাইবার জন্য বসিয়া আছেন। আমরা বড় দুঃখিত হইলাম গ্রন্থকার এই পাঁড়েজীর চরিত্রের বাহ্য-রেখা অঙ্কিত করিয়াই চিত্রখানি পরিত্যাগ করিয়াছেন। নানা সাহেব মুখে মধু, হৃদয়ে বিষ। তাঁহার নির্দ্দয় কার্য্যাবলী-তেও তাঁহার কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। তাঁহার নির্দ্দয় ব্যবসায় কল্পনাতেও কিছু নবীনত্ব আছে। বাস্তবিক গ্রন্থকারের পাঁড়েজী এবং নানা সাহেবের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে আমরা তাঁহার প্রিয় চারুচন্দ্র ও বিজয়, এমি ও হেলেনাকে একদা বিস্মৃত হই। ইহাদিগকে আর দেখিতে চাহি না। কারণ ইহাদিগের চরিত্র অতি সামান্য। সে প্রকার চরিত্রাবলী পরিব্যক্ত করাতে বিশেষ গুণপনার আবশ্যক করে না। কিন্তু তা বলিয়া এমি ও হেলেনা, চারু ও বিজয়ের চরিত্রে যে গ্রন্থকারের মানবপ্রকৃতি-বোধ এবং চরিত্র-বিরচনের ক্ষমতা প্রকাশ হয় নাই, এ কথা আমরা বলি না। আমরা বরং বলি ইহাদিগের চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতারই পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের কাহারই চরিত্র সম্যক্ উন্মেষ প্রাপ্ত হয় নাই।

চিত্তবিনোদিনীতে আমরা যত গুলি ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাদিগের কাহারই চরিত্র সম্পূর্ণ নহে। গ্রন্থকার সকল চিত্রেরই কতিপয় অঙ্কপাত মাত্র করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রভেদ এই, কতিপয় চিত্রে অধিক রেখাপাত দেখা যায়, এবং অন্যান্য চিত্রে তদপেক্ষা ন্যূন। কে যেন লিখিতে লিখিতে তুলিকা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে কতিপয় রেখার সম্পাত দেখা যায়, তাহা যে কোন সুনিপুণ

চিত্রকর-হস্ত-নিঃসৃত তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। তাঁহার তুলিকা যেমন নির্ভীত, তেমনি সুকুমার। সে তুলিকায় সরলতা ও কমনীয়তার সৌকুমার্য্য যেমন বিকশিত হইতে পারে, মহত্বের গৌরব এবং প্রকাণ্ডতা তেমনি বিভাসিত হইতে পারে। তাহাতে কুসুমের সৌন্দর্য্য এবং সিংহের পরাক্রম উভয়ই প্রকটিত হইতে পারে। সে তুলিকার রেখা সকল কখন সুকুমারভাবে সঙ্কুচিত হয়, কখন সাহসভরে প্রসারিত হয়। সে রেখার অঙ্কপাত কখন সূক্ষ্ম কখন স্থূল। এমির রেখা কত সূক্ষ্ম, হেলেনার কেমন উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত স্থূল! বিজয়ের রেখা কেমন জটিল, চারুর কেমন সাহসী! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পাঁড়েজীর রেখা কেমন স্থূল ও প্রসারিত! এমির চিত্রে মাধুর্য্য আছে, হেলেনার চিত্রে ঔজ্জ্বল্য আছে। বিজয়ের চিত্রে পাপের মলিনতা আছে, এবং চারুর চিত্রে মহত্বের গৌবব আছে। কিন্তু পাঁড়েজীর চিত্রে গাম্ভীর্য্য কেমন নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন বিবাহার্থ এমি, প্রণয়ার্থ হেলেনা। আমরা আবার বলি, মন্ত্রণার জন্য বিজয়, কার্য্যের জন্য চারু এবং দলপতি হইবার জন্য পাঁড়েজী।

আমারা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থকার চরিত্রসকল সম্যক্ বিস্ফারিত করিতে পারেন নাই। ইহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার উপন্যাসে ঘটনার যেমন প্রাচুর্য্য, কার্য্যের তেমনি অভাব। গ্রন্থকার কত দিন হইতে কত ঘটনা সমূহের যোজনা করেন, কিন্তু কি জন্য যোজনা করেন অনেক স্থলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ঘটনার অবলম্বনে ব্যক্তিগণের চরিত্র ও হৃদয়ের ভাববেগ বিকাশ করা উপন্যাসকারের প্রধান কার্য্য। ঘটনার স্রোত সকল এরূপ সঙ্গমে মিলিত হওয়া চাই, যেন তথায় স্রোতপ্রতাড়িত ব্যক্তিগণের লীলা ও কার্য্য, চেষ্টা ও বিক্রম বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। আধুনিক উপন্যাসের এইটি প্রধান ধর্ম্ম। মানব ঘটনায় নীয়মান হইবার জন্য নহে, কিন্তু নীয়মান হইয়া কিরূপ ব্যবহার ও কার্য্য করে তাহাই প্রকটন করা উপন্যাসের প্রয়োজন। চিত্তবিনোদিনীতে ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্যক্ষেত্র দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহার অনেক ক্ষেত্রই কর্ষিত হয় নাই। কর্ষিত হইলে বিস্তর শস্য উৎপাদিত হইত, দেশের এবং নদীরও শোভা বৃদ্ধি হইত। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই কবি এ সমস্ত অবসর উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

মানবের মুখে সাদৃশ্য বিস্তর, প্রভেদও বিস্তর। দুজনের মুখ কখন সম্পূর্ণ সমান নয়, কিন্তু দুজনের মুখে এত সৌসাদৃশ্য আছে, যেন সেই মুখদ্বয় কোন সাধারণ আদর্শ দর্শনে সংগঠিত হইয়াছে। কলিকাতা নগরীতে অসংখ্য লোকের বাস, কিন্তু কাহাকেও অপর লোক বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। দূর

হইতে ভ্রান্তি জন্মিলে, সন্নিকর্ষে সে ভ্রান্তির রহস্যভেদ হয়। মুখে মুখে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু প্রভেদও আছে। এরূপ দুজনের মুখ দেখা যায়, যে সে মুখদ্বয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একের গঠন যে ভঙ্গিতে, অপরের গঠন ঠিক তাহার বিপরীত। আবার এরূপ মুখেরও অভাব নাই যে, গঠনভঙ্গি ঠিক একবিধ, কিন্তু সামান্য বৈলক্ষণ্য জন্য কথঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়াছে। চিত্রকরও দ্বিবিধ। এরূপ চিত্রকর আছেন যিনি সম্পূর্ণ বিসদৃশ ভাব অঙ্কিত করিতে নিপুণ। আবার এরূপ চিত্রকর দেখা যায়, যাহার সুকুমার তুলিকায় সাদৃশ্যের বৈলক্ষণ্য অতি বিশদ-বর্ণে অঙ্কিত হয়। একজন দীর্ঘাকার এবং গোলাকার মুখের বিসদৃশ সৌন্দর্য্য-ভঙ্গি প্রকাশিত করেন, অন্যজন দুই দীর্ঘাকার অথবা দুই গোলাকার মুখের সৌন্দর্য্য বৈলক্ষণ্য অনুরঞ্জিত করেন। এই চিত্রকরেরা যদি উপন্যাসলেখক হয়েন, তাঁহারা মুখভঙ্গি যেমন চিত্রিত করিবেন, মানবহৃদয়ের ভাবসম্বন্ধেও ঠিক তাহাই করিবেন। আমাদিগের গ্রন্থকার ইহা-দিগের অন্যতর। তিনি সদৃশ পদার্থের বিভিন্নতার প্রদর্শন করিতে বিলক্ষণ নিপুণ। তাঁহার লেখনীর সুকু-মার স্পর্শে এই বৈলক্ষণ্যের সৌন্দর্য্য অতি রমণীয় ভাবে বিকশিত হয়। দৃষ্টান্তের স্বরূপ আমরা দুই একস্থান উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারি না।

"অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় এমি চারু চন্দ্রকে ভালবাসিতেন। তাঁহাকে দেখিতে বা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে আনন্দবোধ করিতেন। চারু ও এমির স্নিগ্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। কর্ম্মোপলক্ষে এমির সহিত সাক্ষাৎ বা কথোপকথন করিতে পাইলে বড়ই প্রীত হইতেন। বস্তুতঃ উভয়েরই মনে অল্প অল্প অনুরাগের সঞ্চার হইয়া-ছিল। কিন্তু সে অনুরাগ ভ্রাতৃস্নেহও নহে, সৌহার্দ্দও নহে, প্রণয়ও নহে। একভাবাপন্ন আত্মাদ্বয়ের পরস্পর স্বাভা-বিক আকর্ষণে যে ঐক্য, যে অনুরাগ জন্মে উহা তাহাই। এ অনুরাগ অতি সাধা-রণ, অতি মৃদু। উভয়ের বংশমর্য্যাদার ঐক্য থাকিলে ভ্রাতৃস্নেহ বলা যাইতে পারিত, অবস্থার ঐক্য থাকিলে ইহা সৌহার্দ্দে পরিণত হইত, এবং সম্মিলনের সম্ভাবনা থাকিলে ইহা হইতে প্রণয়ও উৎপন্ন পারিত। কিন্তু এমি ধনী মানী, ইংরাজী বিবি ও প্রভুকন্যা—চারু দরিদ্র বাঙ্গালী ও সামান্য কর্ম্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, সৌহার্দ্দ বা প্রণয় কিছুই সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহাদের সে অনুরাগ সামান্য অনুরাগ মাত্র রহিল।"

এস্থলে অনুরাগের ভাবটি কেমন সূক্ষ্ম ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। স্থলান্তরে দেখুন কেমন চমৎকার দুইটি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছেঃ—

"হেলেনা তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, তাঁহার জ্যোতিতে যেন গৃহ আলোকিত

রহিয়াছে—এমির বর্ণ অপেক্ষাকৃত তেজোহীন, কিন্তু অধিকতর শ্বেতমিশ্রিত। হেলেনার সূক্ষ্ম সুবিন্যস্ত কেশপাশ এমনি পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত যে কেহ যেন এক এক গাছি সাজাইয়াছে। ঈষদারক্তবর্ণ সিঁথি নিবিড় মেঘাভ্যন্তরস্থ বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে; সাভরণ সুঠাম বেণী মস্তককে উজ্জ্বল করিয়াছে; এবং বিক্ষিপ্ত অলকাগুচ্ছ গৌরবর্ণ মুখপদ্মকে অধিকতর প্রিয়দর্শন করিয়াছে। এমির কেশরাশি তাদৃশ বিন্যস্ত নহে, সামান্য ভাবে একটি শ্বেতবর্ণ পুঁতিগ্রহিত জালে আবদ্ধ; তথাপি তাঁহার মস্তক খদ্যোত-পরিশোভিত বৃক্ষের ন্যায়, অথবা অমা নিশার নক্ষত্রময়গগণের ন্যায় এবং শ্বেত সিঁথি মন্দাকিনীর ন্যায় শোভনীয় হইয়া অল্প মনোহর হয় নাই! কুন্তলবিহীন হইয়া এমির সরল চন্দ্রাননের কমনীয় কান্তি যেন অধিকতর স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। হেলেনার লোচনদ্বয় বিশাল, চঞ্চল, ও গতিপূর্ণ; সর্ব্বদাই হাস্যযুক্ত যাহার উপর সে দৃষ্টি পড়ে, তৎক্ষণাৎ মনের চাঞ্চল্য জন্মায়; সে কটাক্ষে মুনির মন টলে। এমির চক্ষু সুদীর্ঘ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, স্থির ও অর্দ্ধমুকুলিত স্নিগ্ধ ও শান্তভাবপূর্ণ, দেখিলে স্নেহের উদয় হয়। হেলেনার চক্ষুর প্রতি অন্যে দৃষ্টি করিতে ভয় পায়; এমির নয়নদ্বয় কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইতে ভীত; লজ্জাবতী লতার পত্র যেরূপ স্পর্শমাত্রে মুদিত হয়, দৃষ্টিমাত্রে এমির সলজ্জ নেত্রদ্বয় সেইরূপ মুকুলিত হইয়া যায়। হেলেনার লোচন অপর চক্ষুকে আকর্ষণ করে, এমির নয়ন উপযাচক চক্ষুকে স্থির ও আবদ্ধ করিয়া রাখে। উভয়েরই নাসিকা সুগঠিত, অথচ বিভিন্নপ্রকার; নিজ নিজ আননের উপযুক্ত। এমির নাসারন্ধ্র নিশ্চল, হেলেনার কখন কখন স্ফীত হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করে। হেলেনার ললাট নিটোল; মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং উভয় পার্শ্ব ক্রমে নিম্ন হইয়াছে; এমির অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও শ্বেতবর্ণ। গণ্ডস্থলাপেক্ষা হেলেনার কপোলপ্রদেশ কিঞ্চিৎ উচ্চ এমির প্রায় সমতল। হেলেনার কপোলের বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কখন লজ্জা ও অভিমানে আরক্তবর্ণ, কখন বা দুঃখে ও ভয়ে পাংশুবর্ণ। এমির লজ্জা, ভয়, অভিমান সকলই পক্ষ্মদ্বয় নিমীলনেই প্রকাশ পায়। এমির ওষ্ঠাধর অর্দ্ধপক্ক তরমুজের মধ্যভাগের ন্যায়, শ্বেতবর্ণের ভিতর হইতে গাঢ় গোলাপী আভাস প্রকাশ পায়; হেলেনার অধিকতর লালবর্ণ। হেলেনার ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম এবং এমির অধর কিঞ্চিৎ স্থূল, নচেৎ উভয়ের বদন সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর। বিশেষতঃ হেলেনার সূক্ষ্ম সচঞ্চল হাস্যবিস্ফারিত বিম্বোষ্ঠপরিশোভিত মুক্তামালাসদৃশ দশনপংক্তি দেখিলে, সহৃদয় ব্যক্তিরা বুঝিবেন, সৃষ্টির কোন বস্তুরই সহিত তাহার তুলনা হয় না। সে হাস্যে অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হয়; ক্ষণেকের জন্যও

মনের অন্ধকার মুক্ত হয়, দুঃখ দূর হয়। এমির অধরের কোমল ভাগ কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ বলিয়া অপেক্ষাকৃত স্থূলতর দেখায়, তাহাতে সৌন্দর্য্যের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। ঈষদ্ধাস্যকালীন যিনি একবার এমির কমনীয় ওষ্ঠাধরের ঈষৎ সঞ্চালন, ঈষৎ বিকম্পন দেখিয়াছেন, সরোবরের বাতকম্পিত তরঙ্গোপরি প্রতিবিম্বিত শরচ্চন্দ্রের নৃত্য আর তাঁহার নিকট শোভা পায় না। হেলেনার আনন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও সুসজ্জিত, এমির—চন্দ্রের ন্যায় বিশদ।"

"হেলেনার বয়স ষোড়শ বৎসর, নবযৌবনা। যৌবনের লালিত্য, শ্রী, স্বর ও গতিতে প্রকাশ পাইতেছে। প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় চতুর্দ্দিকে সৌরভ ছুটিতেছে। এমি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া, যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন। এখন বালিকা বা তরুণী উভয়ই বলা যায়। বালস্বভাবসুলভ চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে যৌবনের গাম্ভীর্য্য জন্মিয়াছে। প্রণয় কাহাকে কহে জানেন না, কিন্তু হৃদয় মুকুলিত, অনুরাগ-হিল্লোল-স্পর্শে অল্প দিনেই বিকশিত হইতে পারে। যৌবনোচিত লালিত্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। হেলেনার সৌন্দর্য্য যুবজনেরই আকর্ষক—এমির মাধুর্য্য বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই মনোহারী। একের নিশ্চিন্ত তরলভাব, অন্যের চিন্তাশীল গম্ভীর ভাব। উভয়েই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—কুটিলতা ও কপটতা কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় না। হেলেনা স্পষ্টবাদিনী সরলা, এমি বিশ্বস্তহৃদয়া সরলা। হেলেনা মনের ভাব গোপন করিতে পারেন না, স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এজন্য তিনি প্রগল্‌ভা বলিয়া খ্যাত। অভিমান, ভয় ইত্যাদি ভাবোদয় হইলেই হেলেনা বাক্যেতে প্রকাশ করিয়া ফেলেন। এমি মৌনস্বভাব; ভাবোদয়ে মুকুলিতাক্ষী হইয়া অধোবদনে নিরুত্তর থাকেন। হেলেনা তর্কে পরাজিত হইয়াও পরাজয় করেন, এমি বিজয়িনী হইয়াও পরাজিত হয়েন। হেলেনা প্রস্ফুটিত মল্লিকা ফুল, দূর হইতে সৌরভে ও সরল শ্বেতবর্ণে বিলাসীগণকে আকর্ষণ করে। এমি গোলাপ মুকুলের ন্যায়। তাঁহার অনতিপরিস্ফুট রূপ, অনতিপরিস্ফুট সৌরভ অল্প লোককে আকর্ষণ করে, কিন্তু কেহ যদি যত্নে গ্রহণ করেন, মধুর গন্ধে তৃপ্ত হইতে থাকিবেন, কদাপি বিরক্ত হইবেন না; বরং ক্রমে অধিকতর সৌরভ ভোগ করিবেন।—"

সমালোচ্য গ্রন্থের অন্যতম গুণ ইহার বর্ণনা। আধুনিক উপন্যাসের বর্ণনা একটী অসাধারণ গুণ। বর্ণনার গুণাগুণে চিত্রকে উজ্জ্বল অথবা বিবর্ণ, পূর্ণ অথবা অপূর্ণ, সুন্দর অথবা কুৎসিত দেখায়। গোবিন্দবাবুর বর্ণনাগুলি উজ্জ্বল, পূর্ণ এবং সুন্দর। তাঁহার বর্ণনার আবার বৈচিত্র্য থাকাতে তদীয় বর্ণনাশক্তির অধিকতর গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে। নগরের ধূমধাম, কোলাহল, ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য,

পল্লীগ্রামের প্রাকৃত ভাব, স্থৈর্য্য, ও স্বাভাবিক শোভা এ উভয়ই তাঁহার বর্ণনায় যেন জীবিত, নবীন এবং প্রকৃত দেখায়। নীরস এবং শোণিতাক্ত সিপাহীবিদ্রোহ-ব্যাপার ও গোবিন্দবাবুর লিপিনৈপুণ্য-গুণে, অধ্যয়ন করিতে বিলক্ষণ মনোনিবেশ হয়। এই বিদ্রোহের বর্ণনা অতি সরল অথচ ওজস্বী, প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ অথচ সরস, এজন্য অধ্যয়নকালে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। গোবিন্দবাবু প্রণয় এবং উপকথা অতি কৌশলপূর্ব্বক বিদ্রোহঘটনাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। পাছে ক্রমাগত বিদ্রোহের ভয়ানক ব্যাপার পাঠে বীতরাগ জন্মায়, এজন্য, গোবিন্দ বাবু অপর একটি শান্ত-বিষয়-পূর্ণ উপকথাকে প্রধান উপন্যাসের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছেন। বিদ্রোহ ব্যাপারের ভীষণ কাণ্ড অধ্যয়ন করিয়া চিত্তের অপরাগ জন্মিলে, এই উপকথার শান্ত বিবরণ পাঠে মন কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে। বিদ্রোহ-ব্যাপারের গণ্ডগোল এবং তাহার ঘটনাব্যূহের ত্বরিত সংঘটন গোবিন্দবাবু অতি চমৎকার নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। আবার অন্য দিকে স্থির সমাজের আনন্দ ও প্রমোদ, এবং যুবক যুবতীর প্রণয়সংঘটনা কেমন প্রশান্তভাবে সুবর্ণিত হইয়াছে। এক বিষয়ে মন উত্তপ্ত হইলে, বিষয়ান্তরে শীতল শান্তি লাভ করে। আমরা কীর্ত্তিপুর নামক একটি পল্লিগ্রামের বর্ণনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সুন্দরবনের পার্শ্বে কীর্ত্তিপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামের চতুঃপার্শ্বে যত দূর দৃষ্টি যায়, প্রায়ই হরিৎ ধান্য ভূমি মাত্র। বায়ুবেগে ধান্যশিখা হিল্লোলিত হওয়াতে দূর হইতে গ্রামটিকে নীলাম্বু-সমুদ্র-গর্ভস্থ দ্বীপমাত্র প্রতীয়মান হয়। মাঠের অপর পারে, সুদূরে,—যথায় সুনীল গগনরূপ চন্দ্রাতপ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়—সুন্দরবনের নিবিড় কানন দৃষ্ট হয়। অলস অনবধানকারী ভূম্যধিকারীর দোষে কোন কোন স্থলে নিকটে জঙ্গল দেখা যায়, বিশেষতঃ যে ক্ষুদ্র লবণাক্ত খালের কূলে গ্রামটি নিবেশিত, তাহার অপর পার্শ্বে অনতিদূরে সুন্দর বনের অরণ্য রাজ্যের শ্যাম সীমা প্রকাশ পায়।"

"গ্রামটিতে প্রবেশ করিলে আরও সন্তোষ জন্মে। সুনির্ম্মিত পরিচ্ছন্ন কুটীর নগরের প্রাসাদ অপেক্ষাও সুখের আলয় বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন বাটীতে পূজোপকরণ পুষ্পবনে সম্মুখাঙ্গন সুসজ্জিত আছে। গ্রামে ইষ্টকের মূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না, কেবল মধ্যস্থলে একটি পুরাতন ভগ্ন প্রাসাদ দৃষ্ট হয়, ও তাহার সম্মুখে একটী প্রশস্ত দীর্ঘিকার উভয় পার্শ্বে সুনির্ম্মিত ঘট্ট ও ঘট্টের উভয় পার্শ্বে এক একটী করিয়া, মন্দিরচতুষ্টয় সংস্থাপিত আছে। খালের উপকূলেও একটী পুরাণ বটবৃক্ষের তল ইষ্টকে আবদ্ধ এবং তদুপরি ষষ্ঠীমার্কণ্ড ও বাবাঠাকুরাদি গ্রাম্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত

আছে। নিকটস্থ শ্মশানের অপর পার্শ্বে এক ঘর শবদাহকারী ব্রাহ্মণ আছেন। দীর্ঘিকাকূলে এক কোণে একটী আমুদে গোঁসাই আছেন। বাবাজী শিষ্যগণ লইয়া করতাল করে "জয় যদুনন্দন জগত-জীবন" বলিয়া দ্বারে দ্বারে প্রাতঃকালে হরিসংকীর্ত্তন করেন। আর মধ্যে মধ্যে যুবগণেরও মনস্তুষ্টি করেন, কেন না গ্রামের মধ্যে কালোঁয়াৎ (গায়ক) তিনিই। তাঁহার শত্রু রেজো ঢুলি। সে প্রতি সন্ধ্যাকালে অন্নপূর্ণার আরতি বাজায় এবং পূজাদি বা বিবাহ কালে মস্তক ঘুরাইয়া নৃত্য করতঃ কর্ণভেদী বাদ্যে গ্রামবাসী-দিগের আনন্দ সম্পাদন করে। রেজো ঢুলিকে দেখিলেই বাবাজি রাগভরে অদৃশ্য হন! রেজোও আরতির পর তাঁর আক-ড়ার কাছে গিয়া আপন ঢোলে কাটী মারে, অমনি যেন গোঁসাইয়ের মাথায় বজ্র পড়ে।"

"গ্রামের অধিকাংশ লোকেই কৃষি-উপজীবী। ভদ্রলোক মাত্রেই অল্প বা অধিক কিঞ্চিৎ ভূমি আছে। কৃষাণ হইতে তদুৎপন্ন কৃষিফলাংশ লাভেই সামান্য ভাবে অথচ স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের দিনপাত হয়। প্রতি অপরাহ্ণে বালকেরা পাঠশালায়, বৃদ্ধেরা ক্রীড়ালয়ে এবং যুবারা গোঁসাইয়ের আকড়ায় অথবা দোকা-নীর নিকট মিলিত হয়। গ্রামে এক মাত্র দোকান, কিন্তু তাবৎ প্রয়োজনীয় বস্তুই পাওয়া যায়। যুবারা সায়ংকালে বিদেশদর্শী দোকানীকে অপূর্ব্ব গল্পের ভাণ্ড বোধে প্রদক্ষিণ করিয়া বসেন এবং অপরাহ্ণে কাশীদাসের মহাভারত বা কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করেন।"

গোবিন্দ বাবুর প্রকৃতি বর্ণনায়ও বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। নিম্নে দেখুন প্রকৃতির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কেমন যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

"নির্ব্বাত, নিস্তব্ধ; একটি পল্লবও কম্পিত হইতেছে না। চারুচন্দ্র সহসা দেখিলেন আকাশমণ্ডলের নিম্নভাগে একখানি ঘনশ্যাম মেঘ যেন ভ্রূকুটী করিতেছে—আবার তাহার ক্রোড় হইতে প্রগল্‌ভা সৌদামিনী পথিকের নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া যেন অল্প অল্প হাসিতেছে। তাহার উপেক্ষা দেখিয়া উপেক্ষা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে উক্ত মেঘকণা বিশাল হইয়া ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল। নির্ব্বাত ও বিদ্যুল্লতাল-ঙ্কৃত ঘনাবলী দৃষ্টে উপস্থিত ঝটিকাশঙ্কায় চারু দ্রুতপদ হইলেন। মাঠ পার হইতে না হইতে ঘনাবলীতে গগণ আচ্ছাদিত হইল, মনোহর চন্দ্রমা বিলুপ্ত হইল; চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, দুই হস্ত দূরেও দেখা ভার। জলধর ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে বজ্রনিনাদে অম্বর পূর্ণ করিল। মধ্যে মধ্যে পথিকের ভয়-চকিত নেত্রের সম্মুখে প্রাণসংহারক প্রদীপ্ত অশনি নিপতিত হইয়া তাহাকে চিত্রা-র্পিতের ন্যায় করিতেছে। স্বাভাবিক শঙ্কার প্রভাবে ভাবী উৎপাত আশঙ্কায় বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া উঠিল।

পবনদেব বায়ুগণের কারাদ্বার যেন মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা ধূলিকঙ্করে শূন্য পূর্ণ করিয়া তরুশাখাদি চূর্ণ করিয়া ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার রবে যেন রণস্থলে উপস্থিত হইল। শূন্য পথে ইন্দ্রচর ও পবনচরে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। এক দিকে রোষ কষায়িত অসিত মেঘাসুরের বিকট ভ্রূকুটী—একদিকে প্রলয়-প্রতিম ঘনধূলি-জাল ঘন ঘনাবলীকে পরাজয় করিল! একদিকে গভীর মেঘগর্জ্জন,—একদিকে প্রবল ঝটিকার কর্ণবধিরকারী কঙ্করবৃষ্টির কিনুকিনী, দ্বার জানালার ঝনঝনী, বৃক্ষাদির ভঙ্গের হুড়মাড় ও বায়ুর অনবরত ভোঁ ভোঁ শব্দ বজ্রনিনাদকে ঢাকিয়া ফেলিল। পথিকের কর্ণ বধির, চক্ষু অন্ধ।—'

স্থলান্তরে দেখুন স্বভাবের শান্তমূর্ত্তি কেমন স্থিরতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

"ক্রমে দিবাবসান উপস্থিত। যে রমণীয় অপরাহ্নকালকে প্রতীক্ষা করিয়া, ধনী দরিদ্র, বিলাসী পরিশ্রমী, প্রভু ভৃত্য, সুখী দুঃখী সকলেই গ্রীষ্মকালের মাধ্যাহ্নিক প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ সহ্য করিয়াছে—যাহার জন্যই গ্রীষ্ম ঋতু কথঞ্চিৎ আদরণীয় হইয়াছে—যাহার শোভা বর্ণন করিতে গিয়া কবিরা অসংখ্য ভাবপূর্ণ উৎপেক্ষা-রাশি প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সুন্দর সুখের সায়ংকাল, সুরঞ্জিত বেশে মীরট নগরে সমুপস্থিত। পশ্চিমাকাশ এখনও আরক্তবর্ণ এবং তন্নিবন্ধন তত্রস্থ ইতস্ততঃ পবিভ্রাম্যমাণ মেঘমালা চিত্র বিচিত্র হইয়া সুদৃশ্য দৃশ্যে নয়নকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। নভঃস্থল সুরম্য, সুনীল, মধ্যে বায়ুতাড়িত খণ্ড খণ্ড ক্ষীণ নীরদনিচয়ের শ্বেতবর্ণে আকাশের নীলিমাবর্ণ যেন অধিকতর শোভনীয় হইয়াছে। বায়ু এখনও কদোষ্ণ, কিন্তু মন্দ মন্দ হিল্লোলে সঞ্চালিত হওয়াতে মলয়-মারুতের মাধুর্য্য ও ঈষৎ শৈত্যও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে।" ইত্যাদি।

ইহার পর চিত্তবিনোদিনীর আর অধিক পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসভাণ্ডারে চিত্তবিনোদিনীর একটি মহার্ঘ রত্ন বলিয়া পরিস্থাপিত হইবে। সেই রত্নপূর্ণ ভাণ্ডারের কতিপয় মহামূল্য মণির সহিত ইহা সমপ্রভ না হউক, অনেক নিম্নশ্রেণীর মণিকে নিষ্প্রভ করিয়া ইহা যে গৃহ আলোকিত করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। উচ্চশ্রেণীস্থ মহামূল্য মণিনিচয়ের বিভা যেরূপ হউক, চিত্তবিনোদিনীর বিভা স্বতন্ত্র। ইহার স্বতন্ত্র বর্ণের বিভা, অন্যান্য বিভার বৈচিত্র্য সাধন করিবে। এক্ষণে আমাদিগের ইচ্ছা এই, গোবিন্দ বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া দরিদ্র বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডার নানা মহামূল্য রত্নে পূর্ণ করিতে থাকেন, আর বঙ্গীয় সমাজ যেন তাঁহাকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করেন।

# মলিন কুসুম।

(১)
অস্তমিত দিনমণি ; নীরব অবনী ;
কুসুম-ললাম-জালে ভূষিতা যামিনী ;
জগত তিমিরময়,
সমীর চঞ্চল বয়,
অদূরে গাইছে গঙ্গা, সাগরসঙ্গিনী।

(২)
সপ্তমীর চারু শশী, রজত-বরণ ;
হাঁসিতেছে যামিনীর ধূষর অঞ্চলে ;
ফুটাইছে ধীরে ধীরে,
বিমুদিত মালতীরে,
জ্বলিছে নীহারবিন্দু গোলাপের দলে।

(৩)
হাসিছে ভুবন মরি ! কাননকুন্তল ;
শ্যামল তরল হাসি মাখি বিম্বাধরে !
নীল শান্ত সরোবরে,
চারু রশ্মি খেলা করে,
অমল মালতী খেলে কুসুমের থরে।

(৪)
এ হেন নিশীথে বনে বসি একাকিনী ;
বসন্তপ্রসূনময়ী, কে তুমি রমণী ?
লাবণ্যলহরী হায়,
বর অঙ্গে বহে যায়,
পার্থিব মরতভূমে সমুজ্জল মণি।

(৫)
সজল বদনশশী, মলিন নীরব !
সজল জলদ কেশ বিষাদে লুটায় !
হিমাংশু আনন পরে,
কাদম্বিনী থরে থরে
খেলাইছে, সৌদামিনী নয়নে ঘুমায়।

(৬)
তুমি যে আমার সখি! শৈশব-সঙ্গিনী !
স্বকণ্ঠ কুসুমমালা, জীবনের ধন,
সরল শৈশব কালে,
সরল প্রমোদ জালে,
খেলিয়াছি দুই জনে, তবে কি কারণ

(৭)
হেন বিষাদিনী বেশ করি দরশন,
ম্লান বরাঙ্গের দ্যুতি সজল নয়ন ?
কোথা হাঁসি সুধাসার,
বরষিয়া অনিবার,
শীতল প্রণয় বারি, যুড়াত জীবন ?

(৮)
কোথা সে কৌমারশোভা, সরল সুন্দর ?
নন্দন-অমৃতে মাখা, কোমল অন্তর ?
হেরি যাহা অনুক্ষণ,
মোহিত জীবন মন,
কেন আজি সেইরূপ বিষের আকর ?

(৯)
সুখের কৈশোর সেই, আছে কি স্মরণ ;
প্রণয়-পূরিত প্রাণে, কাননে কাননে,
কত খেলা প্রিয়তমে,
খেলিয়াছি তব সনে,
জনম-ভূমির কোলে, সুখের ভবনে ?

(১০)
সেই শান্ত "বিদ্যাধরী" বিমলসলিলা!
জনমভূমির গলে রজতের হার!
বসিতাম তার তীরে,
ভাসিতাম সুখনীরে,
সেই সুখ, সেই দিন, ফিরিবে কি আর?

(১১)
গগনে ফুটিত শশী, হাসিত ধরণী!
অমনি হাসিতে মম বাল পাগলিনী,
যতনে সুগোল করে,
তুলিত আঁচল ভরে,
সুরভি প্রসূনরাজি,—বনবিনোদিনী।

(১২)
আবার গাঁথিতে মালা, বসি নিরাসনে,
দেখিতাম, সেই শোভা, নীরব নয়নে,
নাচিত অঙ্গুলিচয়,
নবীনসৌন্দার্য্যময়,
চম্পকের কলি যথা, প্রভাতী পবনে।

(১৩)
পোহাইত বিভাবরী, মঞ্জু কুঞ্জবনে,
জাগিত কোকিলবালা, সুমধুর স্বনে
করি সুধা বরিষণ,
ফুটিত কুসুমগণ,
শিশিরে নবীন রুচি উষার মিলনে।

(১৪)
উঠিতেন ধীরে ধীরে শান্ত দিনমণি
উজলি উদয়গিরি সোণার বরণ!
হাঁসিত ভুবন মরি!
জলে কুলকুলেশ্বরী,
সোণার কিরণজালে শোভিত ভুবন।

(১৫)
উঠিতাম সেই সঙ্গে দেখিতাম হায়!
প্রকৃতির নব শোভা নয়নরঞ্জিনী!
দেখিতাম প্রেয়সীরে,
নীল সরসীর নীরে,
নীল কাদম্বিনী কোলে স্থির সৌদামিনী!

(১৬)
আবার প্রদোষে ম্লান বিশুষ্ক আননে,
খুলিত দিবস মরি! ললাটের মণি;
শোভিত গগন ভালে,
অলক্ত-জলদ-জালে,
অস্ফুট-তিমির-বাস পরিত ধরণী।

(১৭)
বহিত মলয়ানিল, মেদুর শীতল,
ললিত লবঙ্গলতা নাচিত কাননে!
বন-নব-মালিকার,
নিয়ে গন্ধ অনিবার,
কাঁপাইত নবদল তরুর সদনে।

(১৮)
কোথা আজি সেই দিন প্রেমের পুতলী?
কোথা আজি সেই হাঁসি অধর-ভাণ্ডারে?
প্রজ্বলিত হুতাসন,
দহিতেছে অনুক্ষণ,
কোমল জীবন এবে দুঃখের সংসারে।

(১৯)
সেই দিন, সেই সুখ, গিয়াছে চলিয়া,
অনন্ত কালের তরে, শৈশবের সনে;
এখন নয়ন-জল,
ভাসাইছে বক্ষঃস্থল,
ভাসাইবে যত দিন থাকিব ভুবনে।

(২০)
এই নয়নের জল শুকাবে আবার,

যৌবন ললামময়, দুঃখের জীবনে,
যে দিন ধরণীতলে,
বিশ্রামিব কুতূহলে,
অনন্ত নিদ্রার কোলে অনন্ত শয়নে।
শ্রীহঃ—

# ধর্ম্মনীতি।

ভারতে ধর্ম্মনীতি কখন স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্ত্তিত হয় নাই; ভারত চিরকালই ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিদেশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। ভারতে যুক্তি যখনই স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই অকৃতকার্য্য হইয়াছে, হয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কেবল প্রতিধ্বনিরূপে পরিণত হইয়াছে, না হয় চার্ব্বাকতা ও নাস্তিকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পারলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ের গবেষণাই ভারত-দর্শনের প্রকৃত কার্য্য; প্রত্যক্ষ ও ঐহিক তত্ত্বের নিরূপণ তাহার চরম লক্ষ্য নহে। দার্শনিকেরা সমাজতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় কখন প্রবৃত্ত হন নাই; তাঁহারা মানবের নিয়তি বিষয়ে চিন্তা করিতে গিয়া, মানব যে সমাজভুক্ত প্রাণী, তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। তন্নিবন্ধন মুক্তি ও নির্ব্বাণ তাঁহাদের গবেষণার চরম ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও সমাজের উন্নতি তাহার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এইপ্রকার পরলোক-পরায়ণতা ও মুক্তিপ্রবণতাই ভারতীয় চিন্তার ওড়ন ও পাড়ন, এবং ভারতের জাতীয় চরিত্রের প্রধান উপকরণ। জাতীয় চরিত্র তত্ত্বনির্ণয়ে যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। আমরা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ধর্ম্মনীতিবিষয়ক গবেষণার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিব।

ফ্রান্স প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কৃষিজীবিগণ অল্পে সন্তুষ্ট এবং তাহাদের মনে প্রকৃতিপ্রেম সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। পরন্তু কৃষিজীবিগণের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা তত খরতর না হওয়াতে, তাহারা পরস্পরের প্রতি যেরূপ সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করে, আর কাহারও মধ্যে তেমন দেখা যায় না। তদনুসারে দৃষ্ট হয় যে প্রকৃতিপ্রেম, প্রফুল্লতা, ও পরস্পরানুরাগ ফ্রান্সের জাতীয় চরিত্রের প্রধান ভিত্তি। সময়ে সময়ে ফ্রান্সের দুরাকাঙ্ক্ষা হইতে অনেক অত্যাচার ও পরধর্ষণ হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার ফল চিরস্থায়ী নহে। প্রত্যুত মানবজাতির দুঃখপরিহারার্থ ইয়ুরোপে যে সকল উদ্যম হইয়াছে, ফ্রান্স তাহাতে সকলের অগ্রগণ্য হইয়া কার্য্য করিয়াছেন এবং নিজের গুরুতর ক্ষতি সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আরবদিগের অত্যা-

চার হইতে খ্রিষ্টানদিগকে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য মধ্যযুগের যে সকল ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে ফ্রান্স অপরিমিত অর্থ ও সৈন্যের সারভাগ উৎসর্গ করেন। মধ্য ইয়ুরোপে প্রবলের অত্যাচার অতি ভয়ানক ছিল। তন্নিবন্ধন ক্ষীণবল প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ ও অবলাজাতির সতীত্ব নিয়তই সঙ্কটাপন্ন হইত। তাহার প্রতিবিধানার্থ "সিবল্‌রি" নামক সুপ্রসিদ্ধ পদ্ধতির সৃষ্টি হয় এবং অনেক মহামনা সম্ভ্রান্ত লোক দুর্ব্বলের রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করেন। ইতিহাসের নিকট অপরিচিত নাই যে এই মহৎ ব্রতে ফ্রান্সই সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন। মার্কিনদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে ফরাসিদিগেরই প্রসাদে তাঁহারা ইংলণ্ডের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বাধীনতাভোগে অধিকারী হইয়াছেন। তৎপরে সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে প্রজাসাধারণের পরিত্রাণার্থ যে মহৎ উদ্যম হইয়াছিল, ফ্রান্সেই তাহার প্রথম সূত্রপাত হয়। এবং ফ্রান্সেরই দৃষ্টান্তগুণে ও সাহায্যবলে সেই প্রকাণ্ড কার্য্য অনেক অংশে সমাহিত হইয়াছে। সেদিন হইল, অধুনাতন ইয়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা ফান্সের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। ইহা কেনা জানে, যে ইতালির জাতীয় অস্তিত্ব বহুকালের নিষ্ফল প্রয়াসের পর কেবল ফ্রান্সের অনুগ্রহেই সুসিদ্ধ হইয়াছে। ফরাসিজাতির এই সকল কার্য্যপরম্পরা হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মনীতিবিষয়ক মত কি, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। মহাত্মা কোম্‌ত সেই মত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন পরোপকারই প্রধান ধর্ম্ম; যাহাতে লোকের উপকার তাহাই সৎ ও কর্ত্তব্য এবং যাহাতে লোকের অনুপকার তাহাই অসৎ ও পরিবর্জ্জনীয়। আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি যে সকল পশুসাধারণ বৃত্তি আছে এবং ধনলিপ্সা, আধিপত্যলিপ্সা, যশোলিপ্সাদি যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ বৃত্তি আছে; সেই উভয়প্রকার বৃত্তি উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি দ্বারা নিযন্ত্রিত হইলে কোন গোল থাকে না, সকল দিগেই সামঞ্জস্য হইতে পারে। কিন্তু উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ আর স্বার্থপরতা স্বভাবতঃ প্রবল। অতএব যাহাতে উপচিকীর্ষাবৃত্তি প্রবল হইয়া স্বার্থপরতাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে, তাহাই প্রধান শিক্ষা। সেরূপ শিক্ষার বহুল প্রচার না হইলে, মানবজাতির ও সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। অতএব ফ্রান্সের ধর্ম্মনীতি বিষয়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত—"পরোপকরণং কায়াদসারাৎসারমাহরেৎ"।

এ দিকে ইংলণ্ড প্রধানতঃ পণ্যজীবী। বাণিজ্যে পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা নিতান্ত তীব্রতর হয়, সুতরাং বণিক্‌দিগের মধ্যে সমদুঃখসুখতা জন্মে না। বণিক্‌দিগের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি যত তীক্ষ্ণ, পরার্থের প্রতি তত হয় না। পরন্তু বণিকেরা স্বদেশে

সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, নিরন্তর নানা দেশ পর্য্যটন করে; তাহাতে তাহাদিগের মনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা জন্মে। বিশেষতঃ বিদেশ ভ্রমণে ও সমুদ্রযাত্রায় প্রায়ই নানা কষ্ট ও সঙ্কট উপস্থিত হয়; তাহাতে বণিকেরা যত অভ্যস্ত হইতে থাকে, ততই তাহাদের মন অবিচলিতভাব ও অনাকূলিতত্ব ধারণ করে। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে স্বার্থপরতা, স্বাধীনতা ও ধৈর্য্য ইংলণ্ডের জাতীয় চরিত্রের প্রধান উপকরণ।

ইংলণ্ড স্বার্থপর কিন্তু অন্যশুভদ্বেষী নহেন; ইংলণ্ড স্বাধীন কিন্তু অন্যকে স্বাধীন দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হন না; ইংলণ্ড ধৈর্য্যসম্পন্ন কিন্তু অন্যের দুঃখ মোচনার্থ ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন না। এইরূপ সামঞ্জস্য থাকাতেই ইংলণ্ডের এত ঐশ্বর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংলণ্ড স্বার্থপর বটেন, কিন্তু আর কোন্ জাতি, দাসত্বপ্রথা ও দাসব্যবসায় রহিত করিবার জন্য, এত অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন? আর কোন্ জাতি দুর্ভাগ্য রাজগণের প্রতি এত আতিথেয়তা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন? ইয়ুরোপে অপমানের ক্ষালণার্থ দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রথা বরাবর প্রচলিত ছিল। উহা অধুনা সভ্য সমাজ হইতে এক প্রকার রহিত হইয়াছে। কিন্তু যদি কোন জাতি অন্য জাতির অবমাননা করে, যুদ্ধ ব্যতীত তাহার প্রতিকার নাই। শোণিত বর্ষণ ব্যতীত জাতীয় অবমাননার ক্ষালণ হয় না এই মত যেমন অসভ্য বেণ্ডাল, গথ, ফ্রাঙ্ক, নর্থমান প্রভৃতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, অধুনাতন সভ্য-সমাজেও তদ্রূপ রহিয়াছে। কিন্তু দুই বৎসর গত হইল ইংলণ্ড মধ্যস্থ মানিয়া মার্কিনদিগের সহিত বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই এবং তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের ধৈর্য্যগুণের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। ইংলণ্ডের উক্তপ্রকার জাতীয় চরিত্র তাঁহার ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত আছে। মহাত্মা বেন্থাম্ ইংলণ্ডের ধর্ম্মনীতিকে বাইবলের ক্ষমতা হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন। তিনি "হিতবাদ" নামক মতের আদি গুরু পরে মিল্ প্রভৃতি মনীষিগণ ইহার প্রসাধন ও পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এই মত অনুসারে যাহাতে নিজের ও সমাজের স্বার্থ ও হিতসাধন হয়, তাহাই সৎ ও কর্ত্তব্য; তদ্বিপরীত কার্য্য অসৎ ও পরিহর্ত্তব্য। সদসদ্‌জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ নহে; তাহা ক্রমে ভূয়োদর্শন হইতে উৎপন্ন হয়। ভূয়োদর্শনে যে কার্য্য অধিকাংশ লোকের হিতকর বলিয়া বোধহয়, তাহাই বৈধ, আর যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টজনকরূপে প্রতীত হয়, তাহা অবৈধ। সুতরাং সমাজের ইষ্টসাধন ব্যতীত ধর্ম্ম ও পুণ্য নাই; এবং সমাজের অনিষ্ট সংঘটন ভিন্ন পাপ ও অধর্ম্ম নাই। কোম্‌ত ও বেন্থাম্ উভয়েরই মতে সমাজ প্রধান লক্ষ্য। তবে কোম্‌ত স্বার্থের প্রতি

না রাখিয়া পরার্থ সাধনে উপদেশ দিতেছেন; কিন্তু বেন্থাম্ বলিতেছেন যে "স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই সাধন কর কিন্তু দেখিও যেন স্বার্থসাধন করিতে গিয়া পরার্থের ব্যাঘাত না জন্মে"। বিশেষতঃ কোম্ত বলেন সদসদ্জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ, কারণ যে উপচিকীর্ষাবৃত্তি হইতে উহার উৎপত্তি, তাহা মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু বেন্থাম্ বলেন সদসদ্জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ নহে ও উপচিকীর্ষা বা দয়া নামক প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয় না। উহা ভূয়োদর্শন হইতে ক্রমে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্স প্রফুল্লচিত্ত প্রকৃতিপ্রিয় ও পরস্পরানুরাগপরায়ণ, সুতরাং তৎকৃত ধর্ম্মনীতির ছবিটী যে মনোহর ও প্রকৃতির অনুগত হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইংলণ্ড স্বার্থপ্রিয় ও স্থিরচিত্ত। অতএব তাঁহার দ্বারা ধর্ম্মনীতির যে ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মনোরঞ্জন না হউক, নৈপুণ্য সূচক ও যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

পরন্তু ইংলণ্ড যেমন স্বার্থপ্রিয় তেমনি স্বাধীনতাসক্তও বটেন। তদনুসারে তিনি ধর্ম্মনীতির আর একটি ছবি রচনা করিয়াছেন; তাহা তদীয় স্বাধীনতানুরাগের অনুযায়ী এবং আশ্চর্য্য স্পেনসরের হস্তে প্রস্তুত হইয়াছে। স্পেনসর বলেন সদসদ্জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বটে ভূয়োদর্শনজাত নহে। কোন্ কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে সমাজের হিতকর, কোন্টি অহিতকর, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ অনেক স্থলে অসম্ভব। কেবল ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করিতে গেলে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অবধারণ হওয়া প্রায়ই ঘটিয়া উঠেনা। সদসদ্জ্ঞান মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। সমাজবন্ধন মানব জাতির স্বভাবসিদ্ধ। সমাজভুক্ত প্রাণী অন্যের সুখ দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারেনা। যে অবস্থাতে নিজের দুঃখ উপস্থিত হয়, স্বজাতীয় কোন ব্যক্তিকে তদবস্থাপন্ন দেখিলে, মনে কিছু না কিছু দুঃখ হইবে। তদ্রূপ যে অবস্থাতে নিজে সুখী হওয়া যায়, অন্যকে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিলে, নিজের কিছু না কিছু সুখোদয় হইবে। স্বকীয় পূর্ব্বতন সংস্কারই (association.) এরূপ ঘটনার কারণ। সেই পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবে আমরা নিজের দৃষ্টান্তে অন্যদীয় মনের ভাব অনুমান না করিয়া থাকিতে পারিনা এই প্রকার স্বজাতীয় ব্যক্তির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়াকে "সমবেদিতা" বলে। এই সমবেদিতাই (Sympathy) সর্ব্বপ্রকার সদসদ্জ্ঞানের নিদান। সমুদয় প্রাণিগণের মধ্যেই কিছু সমবেদিতা দৃষ্ট হয়। অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা ও বীবর অধিক পরিমাণে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে সমবেদনার বন্ধন দৃঢ়তর দেখা যায়। কিন্তু কোন জন্তু মানবজাতি অপেক্ষা সুশৃঙ্খলও সুদৃঢ়ভাবে সমাজবদ্ধ নহে। সুতরাং মানবমণ্ডলীর মধ্যে সমবেদনার প্রবৃত্তি যেমন প্রবল,

অন্যত্র সেরূপ সম্ভবে না। মানবজাতি বুদ্ধি ও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তৎপ্রযুক্ত মানব-সমাজের সমবেদনার প্রবৃত্তির কার্য্য-পরম্পরা অতীব সুশৃঙ্খল ও নিয়মবদ্ধ হইয়া অসংখ্য পথে ধাবিত হইতেছে এবং কালে সভ্যতার প্রভাবে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেক। অতএব স্পষ্টই প্রতি-পন্ন হইতেছে যে সদসদ্‌জ্ঞান সমবেদনার ফল ও মানবজাতির একটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অবস্থাভেদে, পূর্ব্বসংস্কারভেদে ও ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সদসদ্‌জ্ঞানের নানা বৈলক্ষণ্য ও বৈপরীত্যভাব দৃষ্ট হয়। খৃষ্টান, মুষলমাণ, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মনীতি প্রচলিত। আবার এক-ধর্ম্মা-ক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্পদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম-নীতির প্রভেদ দেখা যায়। কিন্তু এই বিষম অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের বীজ রোপিত রহিয়াছে, তাহা সূক্ষ্মদৃষ্টির অগো-চর নহে। সত্য, ন্যায়পরতা, সরলতা, মৈত্রী প্রভৃতিকে সকলেই ধর্ম্ম বলেন এবং চৌর্য্য, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, নিন্দা প্রভৃতি যে অধর্ম্ম তাহাতে মতভেদ নাই। যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম তাহা নিত্য ও অপরবর্ত্তনীয়,দেশ কাল পাত্রভেদ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে না। যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নয়, তাহা অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তিত হয়। তাহা দেশবিশেষের, যুগবিশেষের ও সম্প্রদায়বিশেষের উপ-যোগী মাত্র; তাহা কখন চিরস্থায়ী ও সর্ব্বাবাদিসম্মত হইতে পারেনা। যদিও সকলেই সত্য সরলতা দয়া প্রভৃতিকে সনাতন ধর্ম্ম এবং চৌর্য্য, পরনিন্দা প্রবঞ্চনা প্রভৃতিকে অধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন; তথাপি কার্য্যতঃ বিশেষ বিশেষ স্থল লইয়া বিবাদ ঘটিয়া থাকে। একজন হিন্দু বলিবেন ব্রহ্মহত্যার স্থলে সত্যবলা অকর্ত্তব্য। একজন যেস্যুরিট খৃষ্টান বলিবেন, উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তবে মনে এক খানা ও পেটে আর এক খানা করা দূষ্য নহে। এক জন মুষলমাণ বলি-বেন, যে অধর্ম্মাক্রান্ত, সে বধার্হ, কোন-রূপে দয়ার্হ নহে। অনেক বিজ্ঞম্মন্য লোকে তর্ক করেন, যে প্রাণসঙ্কট স্থলে ধনীর কিঞ্চিৎ অহরণ করা অনুচিত নহে ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে বিশেষ বিশেষ স্থলে যে এইরূপ মতভেদ হইবে, তাহার মীমাংসার্থ কোন উপায় আছে কিনা। এমন কোন নিয়ম আছে কিনা যদ্দ্বারা উক্তপ্রকার মতবিরোধের সামঞ্জস্য হইতে পারে? বেন্থাম্-শিষ্যেরা বলেন, হিতবাদের নিয়ম অনুসারে চলিলে, সকল বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে। হত্যা-কারী ব্রাহ্মণকে মিথ্যা বলিয়া রক্ষা-করাতে সমাজের হিত নাই। জেষুয়িটের আদেশ মত মিথ্যা বলিয়া সৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে, সকলে সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারে। এইরূপে মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হইলে সমাজের অধো-গতি হইবেক, তাঁহারা ধর্ম্মান্ধ যবনকে বলিবেন, যে ভূমণ্ডলে নানা ধর্ম্ম প্রচ-লিত'; সকলে যদি বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে

বধ করে, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজের সর্ব্বোচ্ছেদ ঘটিবে। তখন ধর্ম্ম কাহাকে লইয়া থাকিবেন? বিজ্ঞতাভিমানী তার্কিককে তাঁহারা এই কথা বলিবেন। সংসারে দরিদ্রের সংখ্যা অধিক; ধনীর সংখ্যা অনেক কম। যদি দরিদ্রকে ধনীর শ্রমলব্ধ বস্তুর অংশ বিনা পরিশ্রমে লইতে দেও তাহা হইলে পৃথিবীতে ধনী থাকিবেক না। কিন্তু ধনসংগ্রহ সমাজস্থিতির প্রধান প্রতিভূত! যদি ধনসংগ্রহ করিলে দরিদ্র উদাসীনকে অংশ দিতে হইবে এরূপ নিয়ম থাকে, তবে কোন্ ব্যক্তি ধনার্জ্জনের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবে?

ক্রমশঃ।

# বল্লালসেন।

(রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রের শ্রেণীবিভাগ। কৌলিন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপনের সময়।)

অনেকেরই সংস্কার আছে বল্লালসেন মহারাজ আদিশূররে দৌহিত্র। বাস্তবিক সে সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল। ঐ ভ্রান্তি নিরাস মানসে আমরা কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশাবলীর বিবরণের এক দেশমাত্র অবতারণা করিতেছি পাঠকগণ তদ্দৃষ্টে বল্লালের সময়, আদিশূরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, কৌলীন্যাদি সংস্থাপনের কাল ও ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমনের সময়াদি ও আমাদিগের সমাজের অনেক সম্বাদ পাইবেন।

বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে যে আদিশূরের দৌহিত্রবংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ মহারাজ বল্লালসেনের সময় কাণ্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের অধস্তন বংশাবলীর কতকগুলি রাঢ়ীয় সংজ্ঞা ও কতকগুলি বারেন্দ্র সংজ্ঞায় পৃথক্ দুই শ্রেণীরূপে বিভক্ত হয়েন।

বল্লাল নিজের শেষাবস্থায় ব্রাহ্মণাদির কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে ইহাও কথিত আছে যে যৎকালে বল্লালসেন রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ করেন তৎকালে সমস্ত বাঙ্গালার কাণ্যকুব্জদিগের ১১০০ শত ঘর বসতি হইয়াছিল। এই এগার শত ঘরের মধ্যে রাঢ়ে ৬৫০ এবং বরেন্দ্রভূমে ৪৫০ নির্দ্দিষ্ট হয়। রাঢ়দেশবাসিগণ রাঢ়ী ও বরেন্দ্রভূমনিবাসীরা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন।

বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রের মতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সময় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিভাগ হয়।

| গোত্র | পুরুষ সংখ্যা | রাঢ়ী | বারেন্দ্র |
|---|---|---|---|
| কাশ্যপ | কাণ্যকুব্জীয় ৮ম | ভবদেবভট্ট | সন্নিবিকর |
| শাণ্ডিল্য | ঐ ১০ম | বিদ্যাসাগর | জয়সাগর |
| বাৎস্য | ঐ ৪র্থ | দামোদর | চতুর্ব্বেবান্ত |
| সাবর্ণি | ঐ ৮ম | গুণার্ণব | অনিরুদ্ধ |
| ভরদ্বাজ | ঐ ১১শ | পরাশর | বৈদান্তিক |

এখানে একটী সংশয় উপস্থিত হয় যে, যদি কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের কাহারও চতুর্থ, কাহারও সপ্তম, কাহারও বা অষ্টম কাহারও বা দশম, কাহারও বা একাদশ পুরুষের সময় দুই দুই ব্যক্তি বিভিন্নরূপ দুই শ্রেণী বলিয়া গণ্য হন। তবে ইঁহাদিগের উর্দ্ধতন পুরুষপরম্পরার সন্তুতিবর্গ (অর্থাৎ ১১০০ এগারশত ঘর কাণ্যকুব্জ সন্তান) কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইবেন? এই প্রশ্নের মীমাংসায় তৎকুলের কুলাচার্য্যগণ নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা ব্যবস্থাপন করেন।

তাঁহারা কহেন সর্ব্বসমেত পঞ্চ গোত্র, প্রত্যেক গোত্রের এক এক ব্যক্তিকে অগ্রগণ্য করিয়া তত্তদ্দেশবাসী তৎসংস্পৃষ্ট তৎ গোত্রীয় ব্যক্তিবর্গকেই গৃহীত হইয়াছিল। ইঁহারা কহেন বরেন্দ্রভূমির এক এক গোত্রে এক এক জন অগ্রণীস্বরূপ হইয়া তদ্দেশবাসী স্বগোত্রদিগকে সেই গোত্রীয় বারেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত করাইয়া লয়েন। রাঢ়ীশ্রেণীদিগের পক্ষেও সেইরূপ হইয়াছিল, ইহাও বলিয়া থাকেন। ইঁহারা যাহা কহিতেছেন তাহার সঙ্গে ঠিক ঐক্য হৌক বা নাহৌক, কিন্তু ফলাংশে একপ্রকার স্থির হইতেছে, যে ঐ সময়েই রাঢ়ী বারেন্দ্রের সংজ্ঞা পৃথক্ হয়, এবং ইহার কিয়ৎকাল পরে বল্লালসেন কৌলিন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। এই কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য রাঢ়ীশ্রেণীর কুলাচার্য্যের গ্রন্থের কথা লিখিত হইল।—কোন্ কোন্ গোত্রের অধস্তন কোন্ কোন্ পুরুষে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান হয় তাহা দেখ; বারেন্দ্রদিগের কুলজ্ঞের কথিত সময়ের প্রতি বিশ্বাস হইবে। যথা—

কাশ্যপগোত্রে—চট্টবংশের বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন।

বাৎস্য গোত্রে—পূতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনাচার্য্য; ঘোষাল বংশের শির; কাঞ্জীলাল বংশের কানু ও কুতুহল এই চারি জন।

সাবর্ণি গোত্রে—গাঙ্গুলী বংশের শিশু; কুন্দগ্রামীবংশের রোষাকরপ্রভৃতি তিনজন।

শাণ্ডিল্য গোত্রে—বন্দ্যো বংশের মহেশ্বর, জাহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন।

ভরদ্বাজ গোত্রে—মুখটি বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুই ব্যক্তি।

সর্ব্বসমেত এই উনিশ জন কুলীন হয়েন।' এক্ষণে দেখ—কাণ্যকুব্জাগত ব্রা-

ন্দনপঞ্চক হইতে এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে কে কত পুরুষ অন্তর। ধারাবাহিক পুরুষ গণনানুসারে বহুরূপকে দক্ষের ৮ম, গোবর্দ্ধনকে ছান্দড়ের নবম; কুতুহলকে ৫ম; শিরকে ৪র্থ; শিশুগাঙ্গুলীকে বেদগর্ভের ৮ম; মহেশ্বরকে ভট্টনারায়ণের ১০ম; উৎসাহকে শ্রীহর্ষের ১৪ শ পুরুষ নিম্নে দেখিতে পাই। সুতরাং আমাদিগকে বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রের প্রমাণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বল্লালের কালের বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই আদিশূরের অনেক পরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ—বারেন্দ্রগণ তাঁহাদিগের কুলশাস্ত্রের শাসন অনুসারে যে সময়ে (অর্থাৎ যতসংখ্যক অধস্তন পুরুষে) রাঢ়ী বারেন্দ্রের পার্থক্য দেখাইতেছেন, রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রের শাসনেও ঠিক সেই কয় পুরুষে রাঢ়ীদিগের কৌলিন্য প্রাপ্তি দেখা যাইতেছে। তবে উভয় সম্প্রদায়ের লিখিত নামের সহিত পরস্পরের সাদৃশ্য নাই। যথা;—

বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাঢ়ীর নাম—

কাশ্যপ—ভবদেব ভট্ট ৮ম।
শাণ্ডিল্য—বিদ্যাসাগর ১০ ম।
বাৎস্য—দামোদর ৪ র্থ।
সাবর্ণি—গুণার্ণব ৮ ম।
ভরদ্বাজ—পরাশর ১১ শ।

রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রানুসারে কৌলিন্যপ্রাপ্তি কালে রাঢ়ীর নাম—

কাশ্যপ—বহুরূপ ৮ ম।
শাণ্ডিল্য—মহেশ্বর ১০ম।
বাৎস্য—কানু ৪ র্থ।
সাবর্ণি—শিশু ৮ ম।
ভরদ্বাজ—গরুড় ১১শ।
উৎসাহ ১৪ শ।

এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে আমরা রাঢ়দেশে একঘর বারেন্দ্রের বসতি দেখিতে পাই না কিন্তু বরেন্দ্রভূমে অনেক রাঢ়ীর বসতি দৃষ্টিগোচর হয়। বোধ হয় তৎকালে বরেন্দ্রভূমের ঐ কয়েক ব্যক্তি রাঢ়ীদিগের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক এক্ষণে ইহা একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে, বল্লাল যে সময়ে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ পূর্ব্বক কৌলিন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন তৎকালে কাণ্যকুব্জদিগের এদেশে ধারাবাহিক চতুর্দ্দশ পুরুষের জন্ম হইয়াছে।

সুতরাং বল্লালকে আমরা আদিশূরের দৌহিত্র কহিতে পারি না। আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বলিতে বিশেষ শঙ্কিত হইনা। তবে বিরুদ্ধমতালম্বীরা একটী আপত্তি করিতে পারেন যে যখন আদিশূরের সমকালীন ছান্দড়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ, ঘোষালবংশে শিরকে বল্লাল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৌলীন্য প্রদান করিতেছেন, তিনি তখনও সম্ভবতঃ আদিশূর হইতে ৪র্থ বা পঞ্চম পুরুষের অধিক নিম্নস্থ হইবেন না। এই বিতণ্ডা খণ্ডন

জন্য আমরা একটী কথা বলিব, যে সময়ে ছান্দড়ের বংশে চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ দেখা যাইতেছে সেই সময়েই তাঁহারই অধস্তন নবম পুরুষ পূতিতুণ্ডবংশের গোবর্দ্ধনাচার্য্য বল্লালের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বল্লালকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে কুলীনদিগের ধারাবাহিক বংশ লেখা আছে, শ্রোত্রিয়দিগের বংশাবলী লেখা নাই। তৎকালে যাঁহারা কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যান্য বংশে ৭ম হইতে ১৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছিল তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা কৌলীন্য পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীহর্ষের অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ উৎসাহ মুখোপাধ্যায় একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে সমকালীন সমাগত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে অধস্তন ধারাবাহিক সন্ততির পুরুষগণনায় এতাদৃশ ইতর বিশেষ হইবে কেন? সে বিষয়েও একটী মীমাংসা দেখ, সন্দেহ নিরাস হইতে পারিবে। শ্রীহর্ষ যৎকালে এখানে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার প্রাচীন অবস্থা। তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া একখানিও গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার যাবদীয় গ্রন্থে দেখা যায় তৎসমস্তই এদেশে আগমনের পূর্ব্বে লিখিত হয়। অনেকে অনুমান করেন তিনি অন্যূন নবতিবর্ষের সময় এদেশে আগমন করেন। তাঁহার সহযোগী ভট্টনারায়ণের বয়ঃক্রম ন্যূনকল্পে সপ্ততিবর্ষ। দক্ষ মহোদয় ইঁহা হইতেও বয়ঃকনিষ্ঠ। বোধ হয় ষষ্ঠি বর্ষের অধিক অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বেদগর্ভ মহাশয়েরও বয়স তৎকালে পঞ্চাশের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয় না। ছান্দড় মহোদয় তৎকালে প্রকৃত যুবা পুরুষ। বোধ হয় কেবল ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র অতিক্রম করিয়াছিলেন।

যখন এই পঞ্চ মহামুনি আদিশূরের পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞে আগমন করেন তখন ৯৯৯ সংবৎ * (৯৪২ খৃষ্টাব্দ)। এই সময়ে শ্রীহর্ষের প্রপৌত্র আরব প্রভৃতির পুত্রমুখসন্দর্শনের সময়; ভট্টনারায়ণের পৌত্র বৈনতেয় প্রভৃতির পুত্রজননের কাল; দক্ষের পৌত্র মহাদেবাদির কেবল কৌমার কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে বলাযায়; বেদগর্ভের পুত্র কুলপতি প্রভৃতির পুত্রদ্বারা পৌত্রমুখ সন্দর্শনের সম্ভাবনা স্থল; ছান্দড়ের পুত্র সুরভি প্রভৃতির কেবল শৈশবাবস্থা।

আইন আকবরী গ্রন্থে বল্লালকে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজা বলিয়া স্বীকার করে। সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের সময় (৯৪২ খৃঃ অব্দ) হইতে ১০৬৬খৃ অব্দ ১২৪ বৎসর। বল্লালসেন ১০৬৬ হইতে ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকার কালের শেষ দশায় তিনি কৌলীন্য মর্য্যাদার

* শ্রীমদাদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানায়য়ামাস।

ক্ষিতীবংশাবলীচরিতম্।

ব্যবস্থাপন করেন। এখন বল্লালের রাজত্ব-কাল ৪২ বিয়াল্লিশ বৎসর ও আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের সময় হইতে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির কালের মধ্যবর্ত্তী সময় ১২৪ সপাদ শতাধিক বৎসর একত্রিত করিলে ১৬৬ একশত ছেষট্টি বৎসর হয়। এই কাল মধ্যে এদেশে ব্যক্তিবিশেষের বংশে ধারাবাহিক অধস্তন ৭।৮।৯ পুরুষ পর্য্যন্তের জন্মের সম্ভাবনা, এবং ব্যক্তিবিশেষের বংশে ৩।৪ পুরুষের অধিক দেখা যায় না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

এখন শ্রীহর্ষের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ত্রিবিক্রমের সহিত পাদোন দ্বিশতবর্ষের নয় পুরুষ যোগ কর, বল্লালের সময় শ্রীহর্ষের অধস্তন ১৪শ পুরুষ উৎসাহকে দেখিতে পাইবে। দ্বিতীয় কল্প ভট্টনারায়ণের প্রপৌত্র সু-বুদ্ধির সহিত ছয় পুরুষের যোগ কর, দশম পুরুষে মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বল্লাল দেখিতে পাইবেন। তৃতীয় কল্প (১৬৬ বৎসরে ৫ পুরুষ) দক্ষের পৌত্র মহাদেবের সহিত পাঁচ পুরুষের যোগ কর, দক্ষের অষ্টম পুরুষে বহুরূপ ও হলাযুধ চট্টো-পাধ্যায় প্রভৃতির সহিত বল্লালের সাক্ষাৎকার ঘটিবে। এইরূপে বেদগর্ভের পৌত্র কুলপতির সঙ্গে ছয়পুরুষের যোগ কর, বেদগর্ভ হইতে ৯ম পুরুষে শিশু গাঙ্গুলী বল্লালের নিকট মর্য্যাদা পাইবেন। ৪র্থ কল্প (১৬৬ বৎসরে তিনপুরুষ) এই কল্পে ছান্দড়ের পুত্রগণের সহিত তিন পুরুষ যোগ কর, ৪র্থে শিরোঘোষাল, চারি পুরুষ যোগকর, ৫মে কানু ও কুতুহল এবং প্রথম কল্পে (১৬৬ বৎসরে ৮ পুরুষ) আট পুরুষ যোগ কর, ছান্দড়ের নবম পুরুষে পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রভৃতির সহিত একাশনে এক বংশের উর্দ্ধাধ কয়েক পুরুষের সমাবেশ সহকারে বল্লালের নিকট কৌলীন্যবিষয়ক মর্য্যাদা সংক্রান্ত অনেক কথাবার্ত্তা শ্রবণ করা যাইবে।

এক বংশের মধ্যে যে এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তাহার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। পাঠকগণ তাহা দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে সর্ব্বত্র সমান পর্য্যায় থাকে না। মহারাজা-ধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র জয়হরিচন্দ্র এবং তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষ ক্ষিতীশচন্দ্র অদ্য একসময়ে বিরাজ করিতেছেন।

১ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী

২ শিবচন্দ্র ২ মহেশচন্দ্র ২ ভৈরবচন্দ্র ২ ঈশানচন্দ্র

২ শম্ভুচন্দ্র

৩ ঈশ্বরচন্দ্র (শিবচন্দ্রের পুত্র) ৩ জয়হরিচন্দ্র (শম্ভুচন্দ্রের পুত্র)

৪ গিরিশচন্দ্র

৫ শ্রীশচন্দ্র

৬ সতীশচন্দ্র

৭ ক্ষিতীশচন্দ্র

৩ ইনি আনন্দধামে বাস করেন।
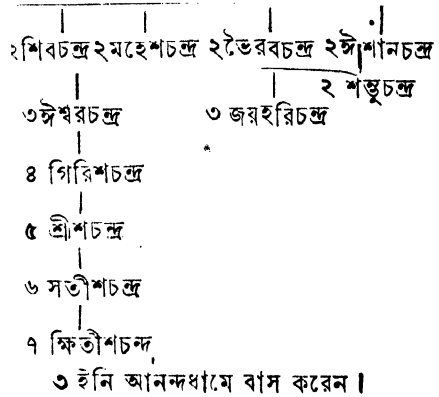
৭ ক্ষিতীশচন্দ্র এক্ষণকার রাজা। কৃষ্ণনগরের রাজসিংহাসন ইহাঁরই অধীন। শিবচন্দ্রের বংশে যথাকালে সকলের স-ন্তান জন্মিলে আরও দুই এক পুরুষ অ-ধিক হইতে পারিত।

মুষলমাণদিগের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজউদ্দীন তদীয় তবকাৎনাসরী নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেন অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ১২০৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যচ্যুত হয়েন। এবং তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াই ১১২৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যেশ্বর পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি ১২৬০ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। মিন্হাজউদ্দীন এদেশে আগমন পূর্ব্বক এদেশের বিষয় নিজে অবগত হইয়া ইতিহাস লেখেন। বল্লালসেন ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খৃ অব্দে) অর্থাৎ ১১৫৩এগারশ তিপ্পান্ন সম্বতে,পুত্রেষ্টিযাগের একশত চুয়ান্ন বৎসর পরে দান সাগর নামক গ্রন্থ রচনা করেন।* উহাতে তাঁহার নামও গ্রন্থলিখনের সময় নির্দ্ধারিত আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার সময় স্থির করা যাইতে পারে।

পুত্রেষ্টিযাগের পরেই আদি শূরের পুত্র কন্যা জন্মে। কিছুকাল পরে আদিশূর অপুত্রক হয়েন। তৎকালে তিনি তাঁহার কন্যাকে পুত্রিকা করেন।ঐ পুত্রিকার পুত্র জন্মে। তাহার নাম ক্ষিতীশূর—ক্ষিতীশূর এক পক্ষে আদিশূরের দৌহিত্র অপর পক্ষে পৌত্রস্থানীয়। সুতরাং লোকে ই হাঁকে আদিশূরের দৌহিত্র বলিয়া থাকেন। ক্ষিতিশূরের সপ্তম পুরুষে বল্লালসেন অতি প্রসিদ্ধ। ইনি বিম্বক্সেনের ক্ষেত্রজপুত্র ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। যথা—

আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিম্বক্সেনের ক্ষেত্রজপুত্র,বল্লালসেন রাজা।

আইন আকবরী গ্রন্থে লেখা আছে যে ১১২৩ খৃঃ অব্দে ২য় লক্ষ্মণসেন রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং১২০৩খৃঃঅব্দে বক্তিয়ার খিলীজী কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। ইনি বল্লানসেনের প্রপৌত্র। বল্লালসেন ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং ইহাঁকে অল্পায়ু কহা যায় না। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন ২০ বৎসরমাত্র রাজত্ব করেন। বিংশতিবর্ষ মধ্যে বল্লালদত্ত মর্য্যাদার বিশৃ-ঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

দশ বিশ বৎসরে সামাজিক বিপ্লব ঘটন কদাচ কোনকালে কোন দেশে ঘটে নাই। এসকল কাজ অতি মৃদুভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ হইতে থাকে। ন্যূন কল্পে তিন চারি পুরুষের কাল গত করিতে না পারিলে ঘটে নাই, ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তিন পুরুষের জননের সামান্য কাল ৭০।৮০ বৎসর। এখন যদি বল্লালের কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদানের সময় হইতে ৭০।৮০ বৎসর পশ্চাদ্বর্ত্তী হই, তাহা হইলে আমরা বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণকে কৌলীন্য সমীকরণ করিতে দেখিতে পাই না। কারণ তিনি বল্লালের পরে বিংশতি বর্ষ মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ (১৬৪ পৃং শ্লোক দেখ) হলায়ুধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন যে মহারাজ লক্ষ্মণ হলায়ুধের যৌবনকালে তাঁহাকে তদীয় সভাপণ্ডিতপদে, মধ্য বয়সে মন্ত্রীর

* নিখিলনৃপচক্রতিলক শ্রীবল্লালসেন দেবেন। পূর্ণে শশি নবদশমিতশকাব্দে দানসাগরোরচিতঃ।।

কার্য্যে, বার্দ্ধক্যে প্রাড়্‌বিবাকের আসনে বরণ করেন। প্রথম লক্ষ্মণের দীর্ঘজীবিত্বের প্রমাণ নাই। বরং তাঁহাকে অল্পায়ু বলা যায়। কারণ তিনি ২০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। শেষ লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই ৮০ বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

হলায়ুধ প্রভৃতি বল্লালের নিকট তরুণ বয়সেই কৌলিন্যমর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। হলায়ুধ তাঁহার যৌবনে অর্থাৎ কৌলিন্য প্রাপ্তির ২৩ বৎসর পরেই লক্ষ্মণের সভাপণ্ডিত হন। হলায়ুধ প্রভৃতির শেষাবস্থায় কৌলিন্য সমীকরণকালে হলায়ুধ প্রভৃতি লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের সভার যে সকল পণ্ডিত বিরাজ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও হলায়ুধ কুলীনের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত আছেন।

লক্ষ্মণের সভায় যে সকল পণ্ডিতগণ বিরাজিত ছিলেন তন্মধ্যে জয়দেব গোস্বামী লক্ষ্মণের সভার রত্নসমূহ মধ্যে একটী রত্ন বলিয়া পরিচিত আছেন। * জয়দেব নিজেও আপনাকে গোবর্দ্ধনাদির সমসাময়িক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় লক্ষ্মণের সভাসদ্ বহুরূপ হলায়ুধ প্রভৃতিকে আদিশূর হইতে এক দুই পুরুষে দেখিতে কদাচ পাইব না। অগত্যা আমাদিগকে বল্লালকে আদিশূরের দৌহিত্র বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বলিতে হয়।

আরও দেখ ৯৪২ খৃঃ অব্দ (৯৯৯ সম্বৎ) পুত্রেষ্টিযাগের কাল হইতে ১২০৩ খৃঃ অব্দ (লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির সময় ১২৬০সংবৎ) প্রায় আড়াইশত বৎসর। এই সময়ে শ্রীহর্ষের চতুর্দ্দশ পুরুষ উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র আহিত বিদ্যমান ছিলেন। ১২০৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৭২ বৎসর। এই কালমধ্যে গড়পড়তায় ন্যূনকল্পে শতাধিক বর্ষে তিন পুরুষের জন্ম গণনা করিলেও ২২।২৩ পুরুষের জন্মের সম্ভাবনা। এখন এই ৬৭২ বৎসরের ২২।২৩ পুরুষের সঙ্গে উৎসাহ মুখো. হলায়ুধ চট্টো, মহেশ্বর বন্দ্যো প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষদিগকে যোগ কর, কাহারও ৩২ কাহারও ৩৩ কাহারও ৩৪ কাহারও বা ৩৫ কাহারও বা ৩৬ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলেন আদিশূর বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না। আমরা তাঁহাদিগের সেই ভ্রান্তি নিরাস বাসনায় ঘটকবিশারদ দেবীবরকৃত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে তিনি অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত ছিলেন। যথা—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ॥ ১
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমাশ্বরো যথা।
অমাত্যৈর্বহুভিশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ॥২
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টো দ্বিজান্ প্রষ্টুং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ॥৩
কেন যজ্ঞেন ভগবৎপ্রীতির্ভবতি নিশ্চিতং।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধ্বং
দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪

শ্রীলা—

---

* "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

# সাংখ্যদর্শন

মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা। কপিলের জন্ম প্রভৃতি বিষয়ে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়পাদপ্রণীত সাংখ্যভাষ্যে মহর্ষি কপিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের‡ অন্যতম বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সপ্তর্ষিগণ প্রত্যেকেই ব্রহ্মার পুত্র সুতরাং গৌড়পাদের মতানুসারে কপিল ঋষি ও ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র। কপিলের আসুরি ও পঞ্চশিখ নামে দুই জন শিষ্য ছিলেন। ইহাঁরাও উক্ত ভাষ্যে ব্রহ্মার অপত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মহর্ষি কপিল বিষ্ণুর অবতার ছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন যে কপিল অ-অগ্নির অবতার, বিষ্ণুব অবতার নহেন। অগ্নির বর্ণ কপিল অর্থাৎ রক্তপীতের সমবায়ে উৎপন্ন অগ্নির বর্ণ। বোধ হয় অগ্নির সহিত ঈদৃশ বর্ণগত সাদৃশ্যদর্শনেই টীকাকারেরা কপিল ঋষিকে অগ্নির মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। সাংখ্যদিগের মধ্যে দুইটী মত প্রচলিত আছে। এক প্রকার মতানুযায়ীরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে মহর্ষি কপিল ধর্ম্মজ্ঞানে বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে জ্ঞানশিক্ষার্থ গুরূপদেশ গ্রহণ করিতে হয় নাই। কপিলপ্রণীত সাংখ্যসূত্রসমূহ সমুদয়ে ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের সার মর্ম্ম সকল সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রসিদ্ধ নানাবিধ আখ্যায়িকার উল্লেখপূর্ব্বক বিবেকজ্ঞানসাধনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বিচার ও বিতণ্ডাদ্বারা বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের মত খণ্ডিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পরপক্ষনিরাকরণপূর্ব্বক ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে নির্ণীত সমস্ত শাস্ত্রার্থ একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। এই ষড়ধ্যায়াত্মক সাংখ্যসূত্র সমূহ কপিলপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই ষড়ধ্যায়ীর নাম সাংখ্যপ্রবচন। সাংখ্যপ্রবচন অতি প্রাচীন গ্রন্থ। সাংখ্যদর্শনের উদ্ভাবয়িতা ও সাংখ্যসূত্র সমূহের রচয়িতা মহর্ষি কপিল কত কালপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহারপ্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিবার এক্ষণে কিছু মাত্র উপায় নাই। পক্ষান্তরে অনেকে এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিলনামধেয় কোন মহর্ষিই প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যমান ছিলেন না, তবে প্রাচীন কালের কোন অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত সূত্র সমূহ রচনা করিয়া নিজ গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধনার্থ উহা কপিলরচিত বলিয়া

‡ এই সপ্তর্ষিমণ্ডল বলিতে পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রদিগকে বুঝাইতে পারে না। পরন্তু সনক, সনন্দ, সনাতন, আসুরি, কপিল, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ ই হারাই উল্লিখিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের অভিধেয়।

নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক যিনিই উল্লিখিত সূত্রসমূহের প্রকৃত রচয়িতা হউন না কেন, সাংখ্যদর্শন যে নিরতিশয় প্রাচীন পদার্থ তাহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কপিলপ্রণীত সূত্র যেরূপ প্রাচীন, ইহার টীকা ভাষ্য প্রভৃতিও তদনুরূপ পুরাতন। এক্ষণে সাংখ্যদর্শনের যাবতীয় টীকা দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নামোল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানভিক্ষু নামক যতী এই ভাষ্যের রচয়িতা। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসার নামে এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনখানি যে সাংখ্যদর্শনবিষয়ক সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ কি না তাহার কিছুমাত্র স্থির নিশ্চয় নাই। বরং সাংখ্যসূত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে এই খানি মহর্ষি প্রণীত আদিগ্রন্থ নহে, ইহা রচিত হইবার পূর্ব্বে তত্ত্বসার প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। সাংখ্যপ্রবচনের মধ্যে পঞ্চশিখের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু পঞ্চশিখ মহর্ষি কপিলের শিষ্য ছিলেন, অতএব সাংখ্যপ্রবচন মহর্ষিপ্রণীত মূলগ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। এতদ্ভিন্ন সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য এই সংজ্ঞাটীও পতঞ্জলিপ্রণীত যোগশাস্ত্রেরই প্রকৃত নাম; কপিল সূত্রের এই নামে অভিধান কেবল অনুকরণমাত্র বলিতে হইবে। সুতরাং প্রবচন যে কপিলসূত্রের অধস্তন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে বিজ্ঞানভিক্ষুর মতই সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে তত্ত্বসার নামক গ্রন্থই সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ। সাংখ্যপ্রবচন কেবল কপিলসূত্রের নাম নহে, পতঞ্জলিপ্রণীত যোগশাস্ত্রেরও অন্যতম নাম সাংখ্যপ্রবচন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে তত্ত্বসারই এই দর্শনের মূলগ্রন্থ। এই মূলগ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় প্রকার প্রবচনই লিখিত হইয়াছে। কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর, উহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে; আর পতঞ্জলিপ্রণীত সাংখ্যদর্শন বা যোগশাস্ত্র সেশ্বর। পতঞ্জলির মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কপিলপ্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, মহর্ষি কপিল কেবল বিচারমুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন এই মাত্র। পতঞ্জলির শিষ্যেরা বলিয়া থাকেন যে যোগশাস্ত্র সাংখ্যের পরিশিষ্টস্বরূপ। পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপনপূর্ব্বক কেবল কপিলপ্রণীত শাস্ত্রের অভাব ও অঙ্গহীনতা নিরসন করিয়াছেন।

সূত্রের পর প্রধান গ্রন্থ সাংখ্যকারিকা। কারিকার রচয়িতা ঈশ্বরকৃষ্ণ। ঈশ্বরকৃষ্ণ নিজনির্ম্মিত কারিকাবলীর অন্তঃস্থ কয়েকটী শ্লোকে লিখিয়াছেন, যে তিনি মহর্ষি কপিলের অনুশিষ্য আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ ও তাঁহার কতিপয় শিষ্যের নিকট শিক্ষা করিয়া সমস্ত সাংখ্যদর্শনের উদ্ধারসাধন

করিয়াছেন। সাংখ্যকারিকা সর্ব্বসমেত ৭২টি আর্য্যা শ্লোকে নিবদ্ধ। এই ৭২ টি আর্য্যাতে ঈশ্বরকৃষ্ণ সমুদয় সাংখ্যদর্শনের সার সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সাংখ্যকারিকার উপর সমুদয়ে চারিটি টীকা লিখিত হইয়াছে। প্রথম টীকা গৌড়পাদবিরচিত। এই গৌড়পাদ সমুদয় উপনিষদের টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য ইঁহার অনুশিষ্য ছিলেন। গৌড়পাদপ্রণীত টীকার নাম সাংখ্যভাষ্য। দ্বিতীয় টীকার নাম সাংখ্যচন্দ্রিকা। ইহা নারায়ণতীর্থবিরচিত। তৃতীয় টীকার নাম সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। ইহা মিথিলার (ত্রিহুত) অধিবাসী বাচস্পতি মিশ্র কর্ত্তৃক বিরচিত। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী কারিকার যাবতীয় টীকার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চতুর্থ টীকার নাম সাংখ্যকৌমুদী। ইহা বঙ্গবাসী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। রামকৃষ্ণ নিজ গ্রন্থে বাহুল্যরূপে নারায়ণতীর্থের মত নিবদ্ধ করিয়াছেন। সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাস এই দুই খানি সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ হইলেও ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা ও তদুপরি বাচস্পতিমিশ্র ও গৌড়পাদের টীকা এই কয়খানি গ্রন্থ এক্ষণে এতদূর লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, যে মূলসূত্র অধ্যয়ন করা সাংখ্যজিজ্ঞাসুরা অধুনা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। উপরিভাগে যে কয়খানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, অধুনা সাংখ্যদর্শন বিষয়ে সেই কয়খানি ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ প্রচলিত নাই। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইতস্ততঃ রাজবার্ত্তিক প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার একখানিও দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি কপিল কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থসমূহের মধ্যে কুত্রাপি সাংখ্যসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূত্রসমূহ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অধস্তন। ইঁহাদিগের মতে কোন ধূর্ত্ত পণ্ডিত সূত্রগুলি স্বয়ং রচনা করিয়া প্রাচীনত্ব সংস্থাপন করিবার ইচ্ছায় উহা মহর্ষি কপিলের রচনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কপিল ও পতঞ্জলি মহর্ষিদ্বয়ের প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয়ের জন্য আমরা বারান্তরে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। সাংখ্যদর্শনের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

কপিলপ্রণীত সাংখ্য ব্যতীত পতঞ্জলিপ্রণীত যোগশাস্ত্রের সাধারণ নামও সাংখ্যদর্শন। পতঞ্জলি মহাভাষ্য নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণটীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। পতঞ্জলিপ্রণীত যোগসূত্রসমুদায় চারি ভাগে বিভক্ত। এই চারিটীর এক একটীর নাম পাদ। প্রথম পাদে সমাধি অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সমাধিলাভের উপায় নির্ণীত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে কি প্রকারে বিভূতি অর্থাৎ অলোক-

সাধারণ ক্ষমতা লাভ করিতে পারা যায় তাহা সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থে কৈবল্য অর্থাৎ ঈশ্বরভাবনার বিষয় লিখিত হইয়াছে। পতঞ্জলিপ্রণীত যোগশাস্ত্রের উপরও অনেকগুলি টীকা রচিত হইয়াছিল। এই টীকার নাম পাতঞ্জলভাষ্য। ইহা মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বাচস্পতিমিশ্র পাতঞ্জলসূত্র ও পাতঞ্জলভাষ্য এই উভয়ের উপরেই টীকা রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু অপর এক খানি টীকার রচয়িতা। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজ টীকায় পতঞ্জলিপ্রণীত মূলগ্রন্থকে যোগবার্ত্তিক এইনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রনিবাসী নাগোজী ভট্ট উপাধ্যায় অপর একখানি রচনা করিয়াছেন। এই টীকাখানি পাতঞ্জলসূত্র নামে অভিহিত।

কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, এই জন্য উহার নাম নিরীশ্বরদর্শন। আর পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম সেশ্বরসাংখ্য। এই বিষয়টী ভিন্ন কপিল ও পতঞ্জলি উভয়প্রণীতদর্শনের অন্যান্য সকল বিষয়েই প্রায় সম্পূর্ণ ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। কপিলদর্শনের ন্যায় জিন ও বুদ্ধ প্রণীত দর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। এই তিন প্রকার দর্শনেই ঐশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষদিগকে ঈশ্বরোচিত ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য পার্থিব পদার্থের ন্যায় এই সকল দেবতারাও উৎপত্তি ও বিনাশের অধীন।

কপিল ও পতঞ্জলি এই উভয় কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সাংখ্য ব্যতীত আর একপ্রকার দর্শনের নামও সাংখ্যদর্শন। ইহাকে পৌরাণিক সাংখ্য কহে। পৌরাণিক সাংখ্যদিগের মতে সমুদয় প্রকৃতিই মায়াময় এবং ভ্রমমাত্র। পৌরাণিক সাংখ্যেরা কপিল ও পতঞ্জলি উভয়প্রণীত দর্শনের প্রায় সকল মতই অনুসরণ করিয়া থাকেন। মৎস্য কূর্ম্ম বিষ্ণু প্রভৃতি কয়েকটী পুরাণে এই মতের পরিপুষ্টি আছে।

প্রকৃতি ও অন্য চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব (মূল পদার্থ) প্রভৃতির সংখ্যা বিশেষরূপে নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এই দর্শনের সাংখ্যদর্শন এই যোগরূঢ় নাম হইয়াছে। এই অংশে গ্রীসদেশীয় পাইথাগোরসের উদ্ভাবিত দর্শনের সহিত সাংখ্য দর্শনের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। টীকাকারেরা সাংখ্যসংজ্ঞার উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। * বিচারমার্গপ্রহিতমনে আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করা সংখ্যা শব্দের তাৎপর্য্যার্থ, বিজ্ঞানভিক্ষু নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কি সাংখ্য, কি যোগ, কি ন্যায়, কি বেদান্ত যাবতীয় প্রকার দর্শনেরই চরম উদ্দেশ্য—কি উপায়ে দেহ বিসর্জ্জনের পর নিশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তিলাভ হইতে পারে—

* সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সাংখ্যসূত্র বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য।

তাহা নির্দ্ধারণ করা। সাংখ্যদর্শনের প্রথম সূত্রে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই দুঃখনিবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুর পূর্ব্বে হইতে পারে, পরেও হইতে পারে। বেদের অন্যতম স্থানে লিখিত আছে, যে আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর পৃথক্ত্ব জ্ঞান জন্মিলেই তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই প্রেত্যভাব জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে অনন্তকালের নিমিত্ত পরিত্রাণ পাইতে পারা যায়। বেদের এই উক্তিকে মূলমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বৈদান্তিক নৈয়ায়িক প্রভৃতি যাবতীয় দার্শনিকেরা নিজ নিজ মতানুসারে নির্ব্বাণমুক্তির উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। ফলতঃ দুঃখনিবৃত্তিই মনুষ্যমাত্রেরই চরম উদ্দেশ্য, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ভারতবর্ষীয় চার্ব্বাক ও গ্রীকদেশীয় এপিকিউরিয়স ইহাঁরাও দুঃখনিবৃত্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তবে তাঁহারা দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অন্যান্য দার্শনিকদিগের মতে ভ্রান্ত ও নিষ্ফল। কিন্তু জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য যে দুঃখনিবৃত্তি তাহাতে আর মতভেদ নাই। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীসদেশীয় দার্শনিক পাইথাগোরস ও প্লেটো স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে আত্মাকে কাম, ক্রোধ, শোক, লোভ, মদ, মাৎসর্য্যাদি সংসারের বন্ধনসমূহ হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়। অন্যান্য সকল প্রকার দর্শনের ন্যায় দুঃখনিবৃত্তিই সাংখ্যদর্শনেরও মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। * সাংখ্যদর্শনের মতে দুঃখ ত্রিবিধ,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক। যে দুঃখের কারণ আত্মা তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। ইহা দুই প্রকার শারীর ও মানস। পীড়াদিসমুত্থ দুঃখের নাম শারীরিক দুঃখ। উন্মাদ. শোক প্রভৃতি মানসিক দুঃখ। যে ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করে, তদ্ভিন্ন অপর জীব জন্তু যে দুঃখের কারণ, তাহার নাম আধিভৌতিক দুঃখ। ব্যাঘ্রাদিদংশন বা চোরের উপদ্রব এই সমুদয় আধিভৌতিক দুঃখ। দৈব যে দুঃখের কারণ তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ। দাহশীতাদ্যুত্থ দুঃখের নাম আধিদৈবিক দুঃখ। যদ্যপি সর্ব্বপ্রকার দুঃখই প্রকৃতপ্রস্তাবে মানস অর্থাৎ মনের দ্বারা অনুভূত, তথাপি সাংখ্যেরা কারণভেদে দুঃখের বিভিন্নতা বর্ণন করিয়াছেন। অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখ যখন উৎপন্ন হইয়াছে তখন অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে। অতএব সাংখ্যদর্শনের মতে বর্ত্তমান ও অতীত দুঃখের নিবারণার্থ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল ভবিষ্যৎ দুঃখই সাংখ্যদিগের বিবেচনার বিষয়। কি প্রকারে ভবিষ্যতে কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে না হয় তাহার উপায় নির্ণয় করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে কি উপায়

---

* অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১।

অবলম্বন করিলে উল্লিখিতপ্রকার ভাবী দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে। চার্ব্বাকেরা ভিন্নপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের সহিত অন্যান্য দর্শনের এতদূর মতভেদ হইয়াছে। ফলতঃ চার্ব্বাক প্রভৃতি কতিপয় প্রকারের দার্শনিকেরা বর্ত্তমান দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ধনসম্পত্তি প্রভৃতি লৌকিক উপায় দ্বারা উক্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ধনাদি লৌকিক উপায় দ্বারা আপাততঃ দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু ধনাদি অবিনশ্বর পদার্থ নহে; ধনাদির ক্ষয় হইলেই পুনর্ব্বার অনিবার্য্যরূপে দুঃখের উদ্ভব হইয়া থাকে। যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারাও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ যাগযজ্ঞাদিকার্য্যে জীবহত্যাদির বিধান আছে বলিয়া উহা কোনপ্রকারেই দোষসংস্পর্শশূন্য বলিতে পারা যায় না। আবার এতাদৃশ পুণ্যাচরণ দ্বারা যে স্বর্গভোগ প্রভৃতি সুখের অধিকারী হইতে পারা যায় তাহাও বিনশ্বর; সুতরাং এইপ্রকার ক্ষণপ্রভাচকিতবৎ সুখ ভোগ কখনই পরমপুরুষার্থ হইতেপারে না কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের জন্য চেষ্টা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ ভাবী দুঃখ অনাগত, সকলকেই যে উহা ভোগ করিতে হইবে এরূপ কিছুই স্থিরনিশ্চয় নাই। অনাগত দুঃখ একবারে না আসিলও না আসিতে পারে, আর আসিবার সম্ভাবনা থাকিলেও দেহত্যাগ প্রভৃতি কারণ বশতঃ উহা ভোগ করিতে হয় না এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু সাংখ্যেরা এই বলিয়া আপত্তির খণ্ডন করিয়া থাকেন যে, যদিও অনাগত দুঃখ একবারে না আসিতেও পারে বটে, কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণে উহার আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তেই সমভাবে জাগরূক থাকে। অতএব ঐ ভবিষ্যৎ দুঃখের আশঙ্কাকে একবারে অন্তরিত করিতে না পারিলে কোন রূপেই দুঃখনিবৃত্তি ও প্রকৃত সুখের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি পূর্ব্বক মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির একমাত্র কারণ। জ্ঞান ও বুদ্ধির আধার আত্মা এবং জড় জগৎ এই উভয়ের পৃথক্ত্ব জ্ঞান হইলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

প্রকৃতি পুরুষ অপরাপর তত্ত্বের প্রকৃতি জ্ঞান জন্মিলে বিবেকজ্ঞান উপস্থিত হয়। এই বিবেক জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়। ইহা দ্বারাই আত্মার বন্ধন মোক্ষ হইয়া থাকে। বিবেক জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপায় প্রমাণ। যদ্দ্বারা প্রকৃত ভ্রান্তিবিরহিত জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রমাণ। প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সাধারণ নাম প্রত্যক্ষ। সুতরাং ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগীদিগের অবাহ্য পদার্থেরও অলৌকিক প্রকারে প্রত্যক্ষ

হইয়া থাকে। হেতুর প্রত্যক্ষ দ্বারা হেতুবিশিষ্টের যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অনুমান। আপ্তবাক্য অর্থাৎ বেদাদির দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম শব্দ। সাংখ্যদিগের মতে উপমান ঐতিহ্য প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় প্রকার প্রমাণই উল্লিখিত তিন প্রকারের অন্তর্ভূত হইতে পারে। সুতরাং সাংখ্যেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ এই তিন প্রকার ব্যতীত প্রমাণান্তর স্বীকার করেন না। সাংখ্যদিগের মতে এই প্রমাণত্রয় দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই জীবের মুক্তি অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি জন্মে। পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটী সাংখ্যদিগের মতে মূল পদার্থ। পুরুষ নলিনীদলগত জলের ন্যায় নির্লেপ, ক্রিয়াশূন্য, সাক্ষীস্বরূপ। পুরুষ জ্ঞানের আধার। প্রকৃতির জ্ঞান নাই, প্রকৃতি অন্ধ, কিন্তু প্রকৃতি ক্রিয়াবতী। পঙ্গু যেরূপ অন্ধের স্কন্ধে উপবেশনপূর্ব্বক অন্ধকে পথ প্রদর্শন করে, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতিকে কার্য্যতৎপর করিয়া স্বয়ং সাক্ষীস্বরূপ থাকে এই মাত্র। তবে স্বচ্ছস্ফটিকে যেরূপ লোহিতবর্ণ কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে ঐ স্বচ্ছ স্ফটিক রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ পুরুষ ভ্রমক্রমে প্রকৃতির মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যাবৎ পুরুষের এইরূপ ভ্রম থাকে তাবৎ সংসার, আর এই ভ্রম নিরাকৃত হইলেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সংসারনিবৃত্তি হইয়া থাকে। পুরুষের বিবেক জ্ঞান জন্মিবামাত্র প্রকৃতি যেন লজ্জাবিধুর হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে পলায়ন করে। পুরুষের পরিণাম বা বিকার নাই। প্রকৃতির পরিণাম দ্বারা চতুর্বিংশতিপ্রকার তত্ত্ব অর্থাৎ পদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রকৃতি মূলপ্রকৃতি, বা প্রধান, অন্যান্য সমুদায় পদার্থের মূলাধার। সাংখ্যদিগের মতে মূল প্রকৃতিই বিশ্বসংসারের যাবতীয় পদার্থের অদ্বিতীয় কারণ। পৌরাণিক সাংখ্যের মতে এই মূল প্রকৃতির নাম মায়া। পৌত্তলিকেরা ইহাকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রহ্মার শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মূলপ্রকৃতি সমুদয় পদার্থের মূলীভূত জড়পদার্থ। ইহা নিত্য, ইহার উৎপত্তিও নাই ধ্বংসও নাই। ইহার অংশ নাই, ইহা অপরিচ্ছেদ্য। মূল প্রকৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, গুণ দ্বারা ইহার অনুমান করিতে হয়, ইহা হইতেই অন্যান্য তাবৎ জড়পদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। ইউরোপীয় দার্শনিকেরাও জড়পদার্থের অবিকল এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূলপ্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্বই সৃষ্টির কারণ। পৌরাণিক সাংখ্যেরা বুদ্ধিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর ত্রিবিধ দেবতাস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই মহত্তত্ত্ব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণের আশ্রয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধনার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া

থাকে। মহৎ তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। ইহা হইতে অভিমানের উদ্ভব হয়। অভিমান জন্মিলে পুরুষ মনে করিয়া থাকেন যে আমি অমুক কার্য্য করিতেছি, সুতরাং আমি কর্ত্তা, এই অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষ সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে।

অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ তত্তৎ পদার্থের পরমাণুর উৎপত্তি হয়। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের মূলসূত্রের সাধারণ নাম পঞ্চ তন্মাত্র, এই পাঁচ প্রকার তন্মাত্র হইতে উল্লিখিত পদার্থ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যোগিপুরুষেরা এই পঞ্চ তন্মাত্রের প্রত্যক্ষ কবিতে পারেন। কিন্তু ইহারা স্থূল বুদ্ধির অগোচর ও সাধারণ লোকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি। এই একাদশের মধ্যে দশটী বাহ্যেন্দ্রিয়। এই দশটীর মধ্যে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। একাদশ ইন্দ্রিয়টী অন্তরিন্দ্রিয়। ইহার নাম মন। ইহা যুগপৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, অপান, লিঙ্গ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ত্রয়োদশটী জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন এই তিনটী আভ্যন্তর পদার্থ আর অবশিষ্ট দশটা বাহ্য। সাংখ্যশাস্ত্রকারেরা দশটী বাহ্যেন্দ্রিয়কে দ্বার ও তিনটী আভ্যন্তরিক জ্ঞানোপায়কে দ্বারবান্ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূতের উদ্ভব হয়। আকাশ অনন্তদেশব্যাপী, শব্দের সমবায়ি কারণ। আকাশ আশ্রয় করিয়াই সমুদয় শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ু, ঃ—ত্বক্ ও শ্রবণ দ্বারা এই পদার্থের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তেজঃ—অগ্নি প্রভৃতি, ইহা ত্বক্, শ্রবণ ও চক্ষু এই তিনটী ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য। জল ঃ—শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ এবং রস জলের এই কয়টি গুণ আছে; ইহা শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু ও রসনা এই কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের গোচর। পৃথিবী ঃ—গন্ধ, স্পর্শ, রূপ রস ও শব্দ এই কয়টি পৃথিবীর গুণ। ইহা শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও নাসিকা এই কয়টি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।

আত্মা—অর্থাৎ পুরুষ। পুরুষ নিজেও সৃষ্ট পদার্থ নহে আর ইহা হইতে অন্য পদার্থের সৃষ্টিও হয় না। সাংখ্যদিগের মতে শরীরভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। আত্মার ক্ষয় নাই, ইহা অবিনাশী; ইহার পরিবর্ত্ত নাই। আত্মা জড়পদার্থ নহে, ইহা জ্ঞানের আধারস্বরূপ। মহর্ষি কপিলের মতে উল্লিখিত পদার্থসমূহ ব্যতীত পদার্থান্তর নাই। ঈশ্বরসিদ্ধি করিবার প্রমাণ নাই বলিয়া মহর্ষি ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা তাঁহার প্রথম অধ্যায়ের ৯২ * সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি সূত্রে নিবদ্ধ আছে। তিনি বলেন যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে

হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই হয় ক্লেশাদিবদ্ধ নতুবা ক্লেশাদিবিমুক্ত এই উভয়ের অন্যতররূপে ভাবনা করিতে হয়। যদি ঈশ্বরকে ক্লেশাদিবিমুক্ত বলিয়া ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি গুণের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। কারণ অভিমানাদিগুণবিরহে সৃষ্টি কার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরকে নিগু'ণ বলিয়া স্বীকার্ করিয়াছি, সুতরাং কি প্রকারে আর তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন? আর যদি তাঁহাকে ক্লেশাদিবদ্ধ বলিয়া ভাবনা করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। কারণ যে জীব নিজে মূঢ় ও ক্লেশাদিবদ্ধ তিনি কি প্রকারে অন্য জীবাদির সৃষ্টি করিবেন। মহর্ষি পতঞ্জলি অন্যান্য তাবৎ বিষয়েই কপিলের সহিত সম্পূর্ণ ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছেন, কেবল পরুষ বলিতে পতঞ্জলি দেহীর আত্মা ও ঈশ্বর এই উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে আত্মা প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিবার উদ্দেশে প্রকৃতির সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অহঙ্কারাদির বশীভূত হইয়া প্রকৃতির কার্য্য সমূহকে ভ্রমক্রমে নিজকার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায়। পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় উভয়ে উভয়কে সাহায্য করাতে সংসার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে পুরুষের বন্ধনমোক্ষ হইয়া থাকে এবং প্রকৃতিও পুরুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিরত হয়।

ক্রমশঃ।

* ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। ৯২। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ৯৩। উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্। ৯৪। মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধস্য। ৯৫।

# প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসমালোচনা।

**সরোজিনী**—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। কলিকাতা সারস্বত যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵১০ আনা। এই পত্রিকা খানি দেখিতে যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি রচনার গাঢ়তা ও গবেষণার গভীরতা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর কোন পত্রিকা অপেক্ষা ন্যূন বোধ হয় না। ইহার "সংস্কৃতভাষা" ও "নাটক" নামক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিয়া আমরা পরম পুলকিত হইলাম। আশা করি ইহার সম্পাদক ও লেখকগণ দীর্ঘজীবী হইয়া দিন দিন ইহার উন্নতি সাধন করিবেন।

**বাঙ্গালী**—মাসিক পত্র ও সমালোচন। ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। এখানিও তৃতীয় শ্রেণীর এক খানি উৎকৃষ্ট মাসিক

পত্র ও সমালোচন। ইহার লেখকগণের বহুদশন ও পর্য্যবেক্ষণের ভূরি ভূরি প্রমাণ ইহাতে পাওয়া যায়। ইহার রচনাও গাঢ় ও প্রাঞ্জল। ইহার "প্রাচীন ভারত" ও "আধুনিক ইউরোপে সভ্যতার ভিন্ন মূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ দুইটী—অতি সুন্দর হইয়াছে। এরূপ পত্রের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই ভাল।

**তমোলুক পত্রিকা**— সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য।৴০ আনা। এখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা। কিছু দিন ইহার নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া আমরা হৃদয়ে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ইহা রীতিমত বাহির হইতেছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। আষাঢ়ের সংখ্যায় অনেক-গুলি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে "পুরাবৃত্ত পাঠে কি কি উপকার" ও "আর্য্যজাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রের আদি-মত্ব" এই—দুইটা প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার রচনা—পাণ্ডিত্যে ও গবেষণায় পরি-পূর্ণ। ইহার দীর্ঘজীবন সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

**বঙ্গমহিলা**— মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা হইতে বর্ত্তমান শালের বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত। নারীদিগকে শিক্ষা দেওয়া ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। লেখক-গণ অধিকাংশই কৃতী। দুই তিন জন লেখিকা আছেন, তাঁহারাও বিদুষী বলিয়া বিখ্যাত। প্রস্তাবগুলি পরিপাটী। রচ-নাও প্রাঞ্জল। পত্রিকা খানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে কেবল একটী জিনিসের অভাব আছে। একজন স্ত্রীলোক সম্পা-দিকা চাই। আমরা ইচ্ছা করি যে শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী কিম্বা শ্রীমতী বামা-সুন্দরী দেবী ইহার সম্পাদন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া সেই অভাব দূর করেন।

**সংস্কৃত পদ্যপাঠ**।—বহুবিধ গ্রন্থ হইতে নীতিসার শ্লোক সকল আহরণ করিয়া শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মুর্শিদাবাদান্তর্গত আজিমগঞ্জস্থ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা। গ্রন্থকার সংস্কৃত ভাষারূপ রমণীয় কুসুম-কাননে প্রবেশপুরঃসর সুকবিরোপিত কাব্যতরুসকল হইতে নীতিগন্ধামোদিত কবিতাকুসুমচয় চয়ন করিয়া যে গুচ্ছটী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা যে ঐ উদ্যান-ভ্রমণাভিলাষি-জনগণের সুখজনক ও আ-দরাস্পদ হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে গুচ্ছ প্রস্তুত করিতে গিয়া, তিনি শোভাবর্দ্ধনাভিলাষে গন্ধাদিবিহীন অপক্ক স্বরচিত যে কতিপয় প্রবন্ধপত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, সুকবি-কবিতা-কুসুম সকলকে কোন চিহ্ন দ্বারা সেই স্বরচিত প্রবন্ধপত্র সকল হইতে পৃথক্কৃত করিলে আরও ভাল হইত। যাহা হউক এরূপ উদ্যম সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

# রামপ্রসাদ সেন।*

পৃথিবীর সাহিত্যসংসারে পারমার্থিক কবিতায় রামপ্রসাদের পদাবলী এক অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া গণনীয় করিতে হইবে। কোন জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারে সেরূপ রত্নরাজি বিরাজিত নাই। ডেবিডের ধর্ম্মগীতের সহিত তাহাদিগের তুলনা হয় না, কারণ ডেবিডের ধর্ম্মগীত সরল অন্তর হইতে সরলস্রোতে উৎসারিত হইয়াছে। হাফিজের পদাবলী এনাক্রিয়নের পদাবলীর ন্যায় বাহ্যবিলাসিতায় পরিপূর্ণ দেখায়। তাহাদিগের দ্বিভাব উদ্ভেদ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ম্যারট, হোরেসের পদাবলী অনুকরণ করিয়া যে গীতমালা বিরচন করিয়াছেন তাহা তত গম্ভীর বোধ হয় না। তাহাতে যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকার; কারণ খৃষ্টধর্ম্মীয় গীতাবলীমাত্রেই ডেবিডের ভাব বিদ্যমান্ দেখা যায়। আমাদিগের বৈদিক গীতসমূহ অতি গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, ও পৃথিবীর আদিকালীন সরলতার নিদর্শনস্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার পারমার্থিক সঙ্গীত প্রসাদী পদাবলীর সহিত তুলনীয় নহে। প্রসাদী পদাবলীর প্রকৃতি ও বিশেষ ধর্ম্ম আর কোন প্রকার সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। রামপ্রসাদ সেন এক স্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন; কারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই আপনাপন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লয়েন। তাঁহাদিগের হৃদয়ভাব ও চিন্তা এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। সুতরাং সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এক নূতন ভাবে বিকসিত হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের কল্পনা নব নব ভাবকুসুম বিরচিত করে, নব নব অলঙ্কাররাশি পরিধান করে, এবং নব ভাবে বিচরণ ও ক্রীড়া করিয়া সাহিত্য-সংসারের শোভা সম্পাদন করে। রামপ্রসাদের কল্পনা এক অপূর্ব্ব পথে বিচরণ করিয়াছে, নূতন পথে অপূর্ব্ব অলঙ্কাররাশি পরিধান করিয়াছে, এবং অপূর্ব্ব ভাবকুসুমে বিরাজিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবে সাহিত্যসংসারে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। সে কল্পনার অপূর্ব্বতায় যে কেবল নবীনত্ব আছে এমত নহে, সেই নবীনত্বের সহিত এক অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যও পরিদৃষ্ট হয়। নবীন অথচ মনোহর।

রামপ্রসাদ সেনের কল্পনা অতি তেজ-

* প্রসাদপ্রসঙ্গ। অর্থাৎ সাধকবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সাধকত্ব ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শনীভূত প্রসাদী সঙ্গীত, ভজন, ও বন্দনাদি, এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ। ঢাকার পূর্ব্ব বঙ্গ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। ১৭৯৭ শকঃ ২৫ বৈশাখ। প্রথম সংস্করণ।

স্বিনী ছিল। তাঁহার কল্পনা এত তেজস্বিনী, যে সে কল্পনার বিভায়, তদীয় পারমার্থিক ভাব ও বিদ্যা, হীনপ্রভ হইয়াছে। তাঁহার পদাবলী সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু সেইভাব এত কল্পনার অলঙ্কারে পরিভূষিত, যে পরমার্থের সুন্দর রূপ ও লাবণ্য অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। তাঁহার পদাবলী অনেক স্থলে শাস্ত্রীয় বিদ্যায় পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু কল্পনা সে বিদ্যাকে এত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, যে বিদ্যার গম্ভীর জ্যোতি কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। রামপ্রসাদের কল্পনা সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার কল্পনা পার্থিব সুন্দর পদার্থের অন্বেষণে ব্যস্ত হয় নাই; দেখে নাই কোথায় কুসুমিত কুঞ্জবন, স্বচ্ছ সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা ও মনোহর শস্যক্ষেত্র। সে কল্পনা সম্মুখে যাহাই দেখিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া একটী মনোহর সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাঁহার কল্পনাকে অমনি আকৃষ্ট করিয়াছে। রামপ্রসাদের কল্পনা যেন নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে। জাগরিত থাকিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছে, অমনি তাহাকে সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে; পৃথিবীর সামান্য ধূলিরাশিকেও সুবর্ণে মিশ্রিত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যে দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতে যে কেবল আপন হৃদয়ের সাত্ত্বিকভাব আরোপিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহাকে প্রধানতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এতদূর কবিত্বে পরিপূর্ণ, যে বরং তাঁহার আরোপিত সাত্ত্বিকভাব কথঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিকে যথাযথ বর্ণন অথবা চিত্রিত করা কবির কার্য্য নহে। প্রকৃতি কবির চক্ষে কিরূপ দেখায়, তাহাই যদি বিকাশিত করা কবিত্বের ধর্ম্ম হয়, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অভাব নাই। রামপ্রসাদের হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, তাঁহার মন কল্পনায় পরিপূর্ণ ছিল। রামপ্রসাদ যাহা দেখিতেন, প্রথমে তাঁহার হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হইত; হৃদয়ের আকর্ষণে তাহাতে ধর্ম্মভাব প্রতিফলিত হইত; তৎপরে কল্পনার উজ্জ্বল অলঙ্কারে তাহা বিভূষিত হইত। যে ক্ষুদ্র জগতে রামপ্রসাদ বাস করিতেন, তাহার চারিদিকস্থ যাবতীয় পদার্থকে তিনি সাত্ত্বিকভাবের কল্পনা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটী নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রজতময়ী পার্থিব প্রকৃতিকে তিনি কণকভূষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। দুঃখময়ী পার্থিব জগতীকে তিনি সুখময় অমৃত নিকেতনরূপে প্রতীয়মান করিয়াছিলেন! কঠিনমৃত্তিকাময় জগৎকে তিনি ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির কর্ণকুহরে এক নূতন সঙ্গীতধ্বনির অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিও তাঁহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ

হইয়াছিল; বিমুগ্ধ হইয়া সেই গান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় সামান্য পদার্থকে ধর্ম্মগীত সঙ্গীত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজিও আমরা সেই সমস্ত যৎসামান্য পদার্থের সমীপে উপনীত হইয়া রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেন উদ্বোধিত হইতে থাকি; উদ্বোধিত হইয়া গাহিয়া উঠি :—

"মা আমায় ঘুরাবি কত?
কলুর চোকঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়,
ছ'টা কলুর অনুগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দেমা চখের ঠুলী,
দেখি শ্রীপদ মনের মত।
কুপুত্র অনেকেই হয় মা,
কুমাতা নয় কখনো ত।
রামপ্রসাদের এই আশা মা,
অন্তে থাকি পদানত।"

"মন তুই কৃষি কাজ জানিস্ না।
এমন মানব জমিন্ রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।
কালীর নামে দেওরে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা,
বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে, যতন করে,
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ,
ভক্তি বারি তায় সেঁচ না।
ওরে, একা যদি না পারিস্ তুই,
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।"

রামপ্রসাদের যে বাস্তবিক অসাধারণ প্রতিভা ছিল, তাহা তাঁহার জীবনের একটি ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়। তিনি যখন মুহুরীগিরিতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার কল্পনা ও প্রতিভা অল্পে অল্পে বিস্ফুরিত হইতেছিল। কোন সুধীবর সম্বন্ধে যে কথা উল্লিখিত আছে, যে তাঁহাকে যদি স্যালীস্‌বরীর প্রসারিত ক্ষেত্রে পরিবর্জ্জন করা হইত, তথায়ও তিনি যশের পথ খুঁজিয়া লইতেন; রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সেই গাথাটি প্রযুক্ত করা যাইতে পারে। রামপ্রসাদ ঘোর বিষয়ীর জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীগিরিতে নিযুক্ত হইলেও তিনি মুক্তি এবং নৈসর্গিক কল্পনাশক্তির নির্গমের সরণি প্রকৃষ্টরূপে উদ্ভাবন করিতে ছিলেন। সেখানেও তবিলদারের নিকট প্রভূত ধনরাশি সঞ্চিত দেখিয়া পার্থিব ধনের অসারতা, ও তবিলদারদিগের বিশ্বাসঘাতকতা কেমন চমৎকার একটি গীতে প্রকটিত করিয়াছেন :—

"আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।"

আবার যখন তিনি গাইলেন :—

"পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে,

ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারী।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা,
তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধঅঙ্গ জায়গির,
তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনায় চাকর,
কেবল চরণধূলার অধিকারী।"

তখন তাঁহার পরমার্থ ধনের লালসা যে কত বলবতী তাহা বিলক্ষণ প্রতিপাদিত হয়। এই সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার মহত্ত্বে তাঁহার স্বামী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রসাদকে তিরস্কার করা দূরে থাক, তেমন সাধুজনকে কিরূপ পুরস্কার দিবেন তিনি তাহারই কল্পনা করিলেন। যে জায়গিরের জন্য প্রসাদ লালায়িত ও শিবের প্রতি ঈর্ষান্বিত, সে জায়গির প্রদান করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না বটে, কিন্তু যাহাতে প্রসাদ স্বয়ং সেই জায়গির লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন, তাহার উপায়স্বরূপ প্রসাদকে একটি স্বাধীনবৃত্তি প্রদান করিলেন। প্রসাদের সঙ্গীতে যেমন তাঁহার পরমার্থলালসার মহত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছিল, তাঁহার স্বামীর এই গুণগ্রাহিতার নিদর্শনে ততোধিক ঔদার্য্য প্রকাশিত হইল।

প্রসাদপ্রসঙ্গকার যথার্থই বলিয়াছেন, যে রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাঁহার সাধকত্ব ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শন। ইহাতে তাঁহার সাধকত্ব প্রতিপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব উজ্জ্বলতর বর্ণে প্রতিভাসিত দেখা যায়। এই সকল পদাবলী সঙ্গীত হইলে, আমরা প্রসাদের সাধকত্বে যত না বিমুগ্ধ হই, তাঁহার সুসঙ্গত উপমাচ্ছটায়, বাক্যরচনার ভঙ্গি ও সরলতায়, রূপকরচনার চমৎকার ভাবে, আমরা ততোধিক বিমুগ্ধ হইয়া যাই। এক এক সময়ে ভাবের প্রগাঢ়তা, প্রসাদ হৃদয়ের সমাধান, ধর্ম্মতৃষ্ণা, ধর্ম্মসাহস, বৈরাগ্য ও মৃত্যুনির্ভীতি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হই বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ভাবি কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সেই সমস্ত ভাব প্রকটিত হইয়াছে। কত অল্পকথায় কত সুমহৎ ভাব, কেমন সরল ভাষায় তাহা প্রকাশিত, কেমন রূপক ও উপমালঙ্কারে তাহা সুসজ্জিত! তখন তাঁহার কবিত্বই আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয়। আমরা তাঁহার কবিত্বের অধিকতর প্রশংসা করিতে থাকি। ধর্ম্মসঙ্গীতের ইহা একটি ত্রুটি বটে, কিন্তু কবিত্বের ইহা প্রশংসা। আমাদিগের নিকট এই সমস্ত গীতে, কবির বিশেষ পরিচয় দেয়। কবি আমাদিগের মনে নূতন নূতন কল্পনার উদয় করিয়া দেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্মমত ভুলিয়া গিয়া এই কল্পনার সঙ্গতি ও সামান্যতার মহত্ত্ব ভাবিতে থাকি। তাঁহার কল্পনার ঔজ্জ্বল্য নাই বটে, কিন্তু সে কল্পনার কৌশল ও সৃষ্টি বিলক্ষণ প্রতীত হয়। তাঁহার উপমাচ্ছটায় আমরা যত না আনন্দ লাভ করি, তদপেক্ষা অধিকতর চমকিত হইয়া যাই। চমকিত হইলে যে আনন্দ,

তাহাতে সেই আনন্দ। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের কৌশল যতদূর ভাবি, চিত্রের সৌন্দর্য্য ততদূর উপলব্ধি করি না। রামপ্রসাদ আমাদিগের মনকে যতদূর আকৃষ্ট করেন, হৃদয়কে ততদূর উদ্বোধিত করিতে পারেন না।

রামপ্রসাদের রূপকময় অনেকগুলি গীতই দুর্ব্বোধ। প্রসাদের পাণ্ডিত্য ইহার অন্যতর কারণ। এক্ষণকার সাধারণলোকসমাজে শাস্ত্রবিদ্যার তত প্রাদুর্ভাব নাই। পূর্ব্বে পৌরাণিক ও দর্শনশাস্ত্রীয় মতামত সাধারণসমাজে একপ্রকার সুপ্রচারিত ছিল। সকলেই যে শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিল এমত নহে, কিন্তু তখনকার কালে হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য বিদ্যার আলোচনা না থাকাতে শাস্ত্রীয় মতামত সর্ব্বদা লোকসমাজে আন্দোলিত হওয়াতে তাহার সাধারণ মর্ম্ম অনেকেরই পরিচিত ছিল। যাহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিত তাহাদিগেরও মধ্যে শাস্ত্রীয় মতামতের অভিজ্ঞতা ছিল। ফারসী বিদ্যার চর্চ্চা থাকিলেও তাহার মতামত সম্বন্ধে অল্পই আন্দোলন ছিল। কারণ ফার্সী বিদ্যার লোকপ্রচলিত গ্রন্থ সকল অধিকাংশই উপন্যাসপূর্ণ। হিন্দুর সাধারণ সমাজে ফার্সীর কাব্য ও উপন্যাসই অধিক অধীত হইত। সুতরাং তাহার মতামত ও দার্শনিক তত্ত্ব সমুদায় লোকসমাজে তত আন্দোলিত ও পরিচিত ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রীয় মতামত ও দার্শনিক তত্ত্ব নিচয় অগত্যা সাধারণজনগণের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। বিশেষতঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কতদূর শাস্ত্রাদির আলোচনার সম্ভাবনা তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। অতএব রামপ্রসাদী পদাবলী এক্ষণে সাধারণবোধগম্য না হইলেও তৎকালে তত দুর্ব্বোধ বলিয়া গণনীয় হইত না। শাস্ত্রবিদ্যার অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন আমাদিগের নিকট সেই পদাবলী অধিকতর দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। যে কারণেই হউক, যখন সেই পদাবলী দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাদিগের টীকার ও ব্যাখ্যার আবশ্যক। প্রসাদপ্রসঙ্গকার কতিপয় গীতের টিপ্‌পনী দিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। সে বিষয়ে তিনি আর অধিক কষ্ট স্বীকার করিলে আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেন। আমরা আশা করি, সংগ্রহকার দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া গানের রূপকগুলি অধিকতর বিশদ করিয়া দেন।

পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন "বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ক প্রস্তাবে রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরকে অধিকতর আদরণীয় জ্ঞান করিয়াছেন। আমরা পণ্ডিতবরের মতের পোষকতা করিতে পারি না। আমরা জ্ঞান করি রামপ্রসাদের সঙ্গীতের নিকট তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কিছুই নহে। তিনি সে গ্রন্থ রচনা না করিলেই ভাল করিতেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলিই তাঁহার যশের নিদান। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে ততদিন প্রসাদী সঙ্গীতও

প্রচলিত থাকিবে। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের আর কেহই তত্ত্ব করে না, কেহই তাহা অধ্যয়ন করে না। আমরা প্রসাদী সঙ্গীত অন্বেষণে যত ব্যস্ত, তাঁহার বিদ্যাসুন্দর দেখিবার জন্য তত ব্যস্ত নই। এই গানগুলিতে রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের মত কাব্য লিখিবার শক্তি যাঁহার উৎকৃষ্টতর ছিল, তিনি তাহা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র সহস্রবার চেষ্টা করিলেও একটী প্রসাদী সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন না। আবার রামপ্রসাদ সহস্র বার চেষ্টা করিলেও ভারতচন্দ্রের মত কাব্য লিখিতে পারিতেন না। ইহাদিগের প্রতিভা ঠিক প্রতীপগামিনী ছিল। আজি যদি রামপ্রসাদী একটি নূতন অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত পাই, অমনি যেমন আনন্দে পুলকিত হই, ভারতচন্দ্রের একটি নূতন কবিতা পাইলে তদ্রূপ হর্ষোৎফুল্ল হই। প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর খুলিলে তাহার গুণপনার মধ্যে কেবল অনুপ্রাসেরই বিশেষ ধূমধাম দেখা যায়। যে অনুপ্রাসপ্রিয়তা নিবন্ধন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সমুদায় কবিত্ব বিনষ্ট করিয়াছেন, রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরে সেই অনুপ্রাসের আদর্শ দেখান। আবার এই অনুপ্রাসের জন্য প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর অধিকতর বিরক্তিকর হইয়াছে। যে অনুপ্রাসের জন্য ঈশ্বরগুপ্তের মত একজন উৎকৃষ্ট কবি একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছেন, সেই অনুপ্রাসের প্রতি আমাদিগের স্বাভাবিকই কেমন বীতরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে হয় তো আমরা অনুপ্রাসের জন্য প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরকে তত আদরণীয় জ্ঞান করিতাম না। রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের অন্যান্য দোষ আমরা ভারতচন্দ্রের প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি। প্রসাদের অনুপ্রাসপ্রিয়তা তাঁহার সঙ্গীতমধ্যেও লক্ষিত হয়, কিন্তু এস্থলে আমরা ভাবে এত বিমোহিত হই, যে, সেদিকে আমাদিগের আর দৃষ্টি যায় না। এস্থলে অনুপ্রাস অলঙ্কাররূপেই প্রতীয়মান হয়।

বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্য আদিরসে পরিপূর্ণ। এই আদিরসপ্লাবিত বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে প্রসাদীসঙ্গীতনিচয় একটি সুশোভিত দ্বীপরূপে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব সেই দ্বীপের ভূমি, কালীরূপ সেই ভূমির বাহ্যদেশ। ধর্ম্মের সহস্রবিধ তৃণ ও তরুরাজি এই দ্বীপকে সুশোভিত করিয়াছে। ভক্তিরস সেই তৃণ ও তরুরাজিকে পরিপোষণ করিতেছে। আর রামপ্রসাদের আত্মা কবির মত যেন এই দ্বীপের চারিদিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বৈরাগ্য, শান্তি ও সুখের বিহঙ্গগণ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া কালীনামের সংগীতে দ্বীপকে পরিপূর্ণ করিতেছে। আহা কি মধুময় স্থান! কি অমৃতময় নিকেতন! আমরা আদিরসে সন্তরণ দিয়া যখন এই দ্বীপে উপনীত হই, তখন আমাদিগের লোচনদ্বয় একদা সন্তৃপ্ত হয়, মন একদা প্রমত্ত হইয়া উঠে, মন প্রমত্ত হইলে আমরা স্বতঃই রামপ্রসাদের সঙ্গে গান গাইয়া একদা

হৃদয় পরিতৃপ্ত করি। চক্ষুঃশূল আদিরস তখন আর ভাল লাগে না। বিলাসী বাঙ্গালীর আদিরস তাহার অস্থির মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চালিত হইতেছে। যে দিন বাঙ্গালী এ রসের আস্বাদন পরিত্যাগ করিবে, সেদিন হইতে তাহার অভ্যুদয় হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালীর কখন কি এ রসে বিতৃষ্ণা জন্মিবে না? ইহাতে তাহার সর্ব্বনাশ হইল, স্বদেশ উৎসন্ন হইয়া গেল, তাহার প্রকৃতি কামিনী-সুকুমার দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তবু কি তাহার এ রসে বিতৃষ্ণা জন্মিবে না? বীররসের সাহস ও প্রমত্ততা, রৌদ্ররসের প্রচণ্ডতা ও ভীষণতা তাহাকে কি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে? তবে আর মনুষ্যত্ব কোথায়?

যে অবধি হিন্দুসমাজ অধঃপাতে গিয়াছে, সেই অবধি হিন্দুসমাজে দ্বিবিধ লোক পরিদৃষ্ট হয়। একবিধ লোক বিলাসী ইন্দ্রিয়সুখপর, ঘোর বিষয়ী; অন্যবিধ কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্মী, সংসারবিরাগী। বাঙ্গালীর জীবননাটকে এই দ্বিবিধ চরিত্রের লোক ভিন্ন অন্যজাতীয় লোক অত্যন্ত দুর্ল্লভ। বাঙ্গালীর উপন্যাসেও একদিকে সন্ন্যাসী, অন্যদিকে নাগর ও নাগরী। বাঙ্গালী আর কোন সাজে সাজিতে জানে না। নাটুয়ার সাজ বাঙ্গালীকে যেমন সাজে, প্রেমিক নাগরের কার্য্যে বাঙ্গালী যেমন সুনিপুণ, এমন আর কেহই নহে। বাঙ্গালী যদি হিন্দুধর্ম্মী হন, তবে বিলাসিতা ও বিষয়সম্ভোগিতার জন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মের সকল নিয়মই ভঙ্গ করিতে পারেন। তাঁহার হৃদয় অহর্নিশ বিষয় ও ভোগবাসনায় পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় বাহ্যিক অনুষ্ঠান তিনি প্রতিপালন করেন। কিন্তু তাহার সারতত্ত্ব ও উপদেশ তাঁহার গ্রহণীয় নহে। সে সমুদায় উপদেশ তাঁহার চরিত্রের বিরোধী। এজন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া আছেন। তিনি বাহিরে দেখাইতেছেন আমি অত্যন্ত সাত্ত্বিক ও সাধু, কিন্তু তাঁহার অন্তরে সকল পাপই প্রবল রহিয়াছে। তিনি পূজায় বসিয়া হয়তো নব নব পাপকল্পনার ভাবনা করিতেছেন, এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ সময়ে সেই সংকল্পের সুসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দু বলিলে সাধারণতঃ আমরা এই বুঝিব, যে তিনি মদ্যপান ও কতিপয় অখাদ্য ভোজন ব্যতীত আর সকল পাপই করিতে পারেন। যে সমস্ত পাপ অতি ঘৃণাকর, লজ্জাকর, বাঙ্গালী হিন্দু—অম্লানবদনে তাহা সম্পাদন করেন। এই সমস্ত পাপকার্য্যে যাঁহার বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা জন্মায়, সেই হিন্দুই সন্ন্যাসী হন। আতিশয্যের ফলই এই। বিষয়ী বাঙ্গালী এক পাপময় জীবন হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্যরূপ পাপময় কঠোর অস্বাভাবিক জীবনধর্ম্মে প্রবেশ করেন। কারণ লোকসমাজের ঘোর পাপময় পঙ্কে নিমজ্জিত থাকা যেরূপ অধর্ম্ম, সেই লোকসমাজ একেবারে পরিবর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রতি-

পালন করাও তদ্রূপ অধর্ম্ম। সংসারে ঈশ্বর ভুলিয়া আত্মপূজা, সন্ন্যাসে আত্ম ও সংসার ভুলিয়া ঈশ্বরপূজা। যিনি এতদুভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সৎপথ অবলম্বন করেন। যিনি সংসারে থাকিয়া তাহার পাপে পরিলিপ্ত নন, যিনি উদাসীন হইয়াও সংসারী, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক। রামপ্রসাদের জীবনে এই দৃষ্টান্ত। তাঁহার সঙ্গীতমধ্যেও এই ধর্ম্মের উপদেশ। তাঁহার গানে বিষয়ীর সমুদয় ভাব; কিন্তু বিষয়ীর ভাবমধ্যেও বৈরাগ্য। ঘোর বিষয়ীর হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগ সঞ্জাত হয়, তিনি যে ভাবে গান গাহিবেন রামপ্রসাদও সেইভাবে গান গাহিয়া গিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার গীত কি বিরাগী, কি বিষয়ী, সকলেরই মনোজ্ঞ। বিষয়ী যখন বৈরাগ্য ও ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়েন তখন তিনি রামপ্রসাদের গীত গাহিয়া বসেন, আবার বিরাগী যখন বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি প্রসাদী পদাবলী গাহিয়া উঠেন। এই জন্য রামপ্রসাদ সর্ব্বজনমনোরঞ্জন। ভিখারী তাঁহার বৈরাগ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তদীয় সঙ্গীতসুধা পান করেন, বৃদ্ধজনগণ তাঁহার ভক্তিভাবে গদ্গদ হইয়া তদীয় সঙ্গীতামৃতের রসাস্বাদী হইতে চাহেন; এদিকে তরুণবয়স্কেরা তাঁহার কবিত্বে বিমুগ্ধ, তাঁহার শান্তিরসে বিগলিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীতরসে নিমগ্ন হয়েন। এই জন্য যেমন রামপ্রসাদের গীত বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত এমত আর কাহারও নহে। জয়দেব, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী কেবল বৈষ্ণবেরা কখন কখন সঙ্গীত করেন। নিধুবাবু, রামবাবু ও হরুঠাকুরকে তরুণবয়স্কেরা কখন কখন স্মরণ করেন। কিন্তু কাহার গৃহে না রামপ্রসাদের গীত সঙ্গীত হইতেছে? বসিয়া আছি হঠাৎ ভিখারীর মুখ হইতে প্রসাদী গীত বিনিঃসৃত হইয়া আমাদিগের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিল। অমনি একদা আমাদিগের মন অন্যদিকে প্রত্যাবৃত্ত হইল, একদা তাহার কল্পনায় ও ভাবে গদ্গদ হইয়া গেলাম, অমনি সেই সুরে সুর দিয়া আমরাও মনে মনে গাহিয়া উঠিলাম। একবার রামপ্রসাদকে ধন্য ধন্য বলিলাম।

রামসাদের সংগীতে যেমন, এমন আর কোন জাতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়ভাব—সুন্দর, সরল অথচ সংসাহসপূর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। রামপ্রসাদের গীতে কেমন এক সাহসিকতা, ও নির্ভীকতা আছে, যাহা কোন কবির ভাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি নিতান্ত সরল। সেই সকল পদমধ্য হইতে যেন রামপ্রসাদের অন্তর্ব্বল প্রকাশিত হইতেছে। রামপ্রসাদের তেজ, ধর্ম্মের এবং সাধুজীবনের বলদর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলি পড়িলে বোধ হয় যেন রামপ্রসাদ ত্রিসংসার পরাজয় করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল, এমত

সামান্য ভাষায় কেমন প্রকাশিত হইয়াছে! বাস্তবিক রামপ্রসাদের বাক্‌ভঙ্গি অতি চমৎকার; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ ভঙ্গি দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান কেন, দেবতাকেও তিনি, সাধন বলে এবং সাধুজীবনের সৎসাহসে পূর্ণ হইয়া, সন্তান যেমন জনক জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বলগর্ব্বিত বাক্যে উক্তি করে, তেমনি বলদর্পে সম্বোধন করিয়াছেন। যে গীতগুলি এই প্রকার ধর্ম্মসাহসে পরিপূর্ণ, সেই গীতগুলি গাহিবার সময় আমরা যেন তদ্রূপ সাহসে পূর্ণ হই, দেবগণকে একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে হেয়জ্ঞান হয়, এবং দেবভাব অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া পশুভাবকে প্রতাড়িত করিয়া দেয়। তখন মনে হয়, আমরা দেবতার সন্তান, স্বর্গধাম আমাদিগের স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? দেব-অসি করে ধারণ করিয়া, মাতৃসদৃশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া আমাদিগকে স্থান দান করিবেন। তখন মনে মনে আর একবার আমরা শ্যামাপূজা করি, ধর্ম্ম অথবা শক্তির উপাসক হই। রামপ্রসাদের হৃদয়ভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়। তাঁহার হৃদয় অমনি আমাদের হৃদয়ে মিলিয়া যায়। তখন আমরা শিবশঙ্করীকে দেবভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। তাঁহাতে ঐশ্বরিক শক্তি দেখি। তাঁহাতে মানবীয় দেবভাব দেখি। তাঁহাতে ধর্ম্মের জয় দেখি, তাঁহাতে স্ত্রীজাতির ভক্তিভাবের প্রাবল্য দেখি। শান্তশীল শিবের হৃদয় হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভূত দেখি। দেবশক্তি কেমন প্রবল, তাহা ধর্ম্মের অসি ও পাপবৈরগণের মুণ্ডমালায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ভবের ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মের শান্তিভাব, শক্তিরই পদতলে। যাহার ধর্ম্মশক্তি আছে,—সম্পদ, শান্তি ও সুখ তাহার পদতলে। একবার এই ভাবে প্রমত্ত হই, রামপ্রসাদের মত আমরাও ত্রিভুবন জয় করি। ইহা কি দেবপূজা, না ভক্তি ও ধর্ম্মশক্তিতে পরিপূর্ণ হওয়া?

যে প্রসাদী গীতে এতদূর শক্তি, সে প্রসাদী গীত কি বঙ্গবাসী সকলেরই আদরণীয় নহে? সকলেরই গৃহে সেই প্রসাদী গীতের এক একখানি গ্রন্থ রাখা কি উচিত নহে? বঙ্গভাষা সে গীত কি কখন ভুলিবে? যে গীতের তুল্যগীত কোন ভাষায় নাই, বঙ্গভাষা কি সে গীতসংগ্রহের জন্য যত্নশীলা হইবে না, সেই মহার্ঘ রত্ন পরিধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে না? তবে আর বঙ্গভাষা কি ভূষণে ভূষিতা হইবে? তাহার শ্রেষ্ঠ কবিগণ তাহাকে যে ভূষণদাম কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছেন, সন্তানের ভক্তিমাল্য বলিয়া সে হার যদি না পরিধান করেন, তবে বঙ্গভাষাকে কে আর শোভিত করিতে চাহিবে? বঙ্গভাষার এখন উচিত এই হার সযত্নে

ধারণ করেন, ইহাকে আপনার রত্নভাণ্ডারে স্থান দান করেন, এবং ইহাকে সুবর্ণ-কোষে পরিস্থাপন করেন। কিন্তু বঙ্গভাষা এমত দুঃখিনী যে তিনি এই হার ঢাকার পূর্ব্ববঙ্গ-মুদ্রাযন্ত্রে রক্ষিত করিতে গিয়াছেন। আহা! বঙ্গভাষা কি দুর্ভাগিণী!

সঙ্গীতসংগ্রহকার যথার্থই বলিয়াছেন, যে রামপ্রসাদ সেন যদি ইউরোপীয় কোন দেশের কবি হইতেন আজি তাঁহার গীত গুলি সুবর্ণ অক্ষরে ও সুবর্ণ পত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। আজি তাহার কত ব্যাখ্যা ও কত যশোঘোষণ হইত। আমরা কি মূঢ়, আমাদিগের কি কিছুই গুণ-গ্রাহিতা নাই। আমরা রামপ্রসাদ সেনকে তুচ্ছ করিয়া ইংরাজী রাশি রাশি কবিতার তুষ সংগ্রহ করিতে যাই। যখন ইংরাজী তুষরাশির রসাস্বাদনে কালাতিপাত করি, তখন যদি রামপ্রসাদের গানগুলি লইয়া ক্ষণেক চিন্তা ও বিতর্ক করি. আমরা দেখিতে পাইব, তন্মধ্য হইতে আমরা অধিকতর মূল্যের রত্ন লাভ করিব। ইংরাজি একটী সামান্য কবিতার ভাব দেখিয়া আমরা তাহার যতদূর সমাদর করিয়া থাকি আমাদিগের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই, রামপ্রসাদ সেন তাঁহার শতগুণ সমাদর লাভের উপযুক্ত পাত্র। ইংরাজী ভাষার অসংখ্য কবিগণ মধ্যে আমরা দশজন প্রকৃত সৎকবি দেখিতে পাই না। কারণ ইংরাজগণ, যে দুইছত্র মিলাইতে পারিয়াছেন তাহাকেই তাঁহারা একজন কবি করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাটককারগণেরও ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদিগের ঔপন্যাসিক সাহিত্যও এত বিশাল যে আমরা আর তুষরাশি গ্রাস করিবার সময় পাই না! কত তুষ গ্রাস করিয়া তবে কোন স্থানে একটু রসাস্বাদন পাই। কিন্তু তজ্জন্য আমরা বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকি। আমরা অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, বঙ্কিম বাবুর শতপত্র-সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস পাঠে আমরা যত প্রীত হই, ইংরাজীর অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের উপন্যাস পাঠে ততদূর হই না। তাহার মধ্যে এত তুষ, যে বিরক্তি ধরে। অথচ জ্যেষ্ঠ ডিস্‌রেলী রিচার্ডসন্‌কে, সেক্‌স্পিয়ারের সমতুল করিয়া গিয়াছেন। হ্যাসলিট্, ফিল্ডিংকে আকাশে তুলিয়াছেন। আমাদিগের অনেক বাঙ্গালী পাঠকও তাহাতে সায় দেন। যাঁহারা এরূপ সায় দেন, আমরা তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করি। তাঁহারা অনেক তুষরাশির মধ্য হইতে কবিত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহারাই প্রকৃত পাঠক, রসজ্ঞ ও সুযোগ্য। আমরা তাঁহাদিগের নিকট পরাস্ত হইলাম। আমাদিগের ততদূর ধৈর্য্য নাই। যাঁহাদিগের এতদূর অধ্যবসায় আছে, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের সুবিশাল মহাভারত গ্রন্থ পড়িতে বলি। তাঁহারা যদি সে কার্য্যে ব্যাপৃত হন, তাহা হইলে আমাদিগের মহাভারতের অনেক সমাদর বৃদ্ধি হয়, এবং দেশীয় সাহিত্যের অনেক গৌরব বৃদ্ধি হয়। দেশের মুখোজ্জল

হয় এবং তাঁহাদিগেরও রসজ্ঞতা প্রতিপন্ন হয়। মূল বিষয়ের পরিহার করিয়া আমরা যে এই অবান্তর কথার উল্লেখ করিলাম তজ্জন্য পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। আমাদিগের অভি-প্রায় মন্দ নহে। ইংরাজী সাহিত্যকে নিন্দা করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। তবে যাহাতে স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি জনসমাজের অধিকতর অনুরাগ আকৃষ্ট হয় তজ্জন্যই এত বাক্যব্যয় করিলাম।

আমাদিগের সঙ্গীতসংগ্রহকার রাম-প্রসাদ সেনের বিশেষ অনুরাগী। তিনি সেই সঙ্গীতের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাঁহাদিগের রসাস্বাদনে মোহিত হইয়া তিনি তিন বৎসর কাল বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া রামপ্রসাদ সেনের অনেক গুলি গীত সমুদ্ধার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বঙ্গসমাজের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন। তাঁহার প্রসাদপ্রসঙ্গের ভূমিকাটি অতি চমৎকার পদার্থ। সেই ভূমিকায় তিনি রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীতের রসজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেনকে যাঁহাদিগের তত ভাল না লাগে, তাঁহারা একবার এই ভূমিকাটি পাঠ করি-বেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যে সকল তর্কের জল্পনা হওয়া আবশ্যক, এই ভূমিকার মধ্যে এরূপ অনেক তর্কের বিষয় আছে; এই সমস্ত তর্কের বিষয় হইতে আমাদিগের অনেক আশাও আছে। ভূমিকালেখক রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীত গুলির ভাব ও কবিত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অতি সুসঙ্গত ও চিন্তাপূর্ণ। বাস্তবিক তাঁহার ভূমিকাটি গ্রন্থের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এবং জনসাধারণ তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থ খানির সমাদর করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা ও একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীপূ—

# বিসর্জ্জন।

( ১ )

এত দিন ধরাতলে
যেই মূর্ত্তি সুকুমার, রাখিলাম অনিবার,
মানস-মন্দিরে মম, পাষাণ অন্তরে
কেমনে ফেলিব তারে অনন্ত সাগরে?

( ২ )

যেই শরদের শশী
হৃদয়-আকাশে মম, শোভিল রে নিরুপম,
মনোহর নিরমল অমৃতের খনি
কেমনে খুলিব সেই নয়নের মণি?

( ৩ )

জ্বলিছে হৃদয় আজি
শোকের তরঙ্গ বয়, উচ্ছাসে হতেছে লয়,
সেই দুর্ন্নিবার স্রোত হবে কি বারণ
অশ্রুবারি নিবায় কি ভীম হুতাশন?

( ৪ )

পঞ্চম বৎসর এই
প্রণয়ের সিংহাসনে, রাখিলাম যতনে,
শোভিলে হৃদয়-রাজ্যে রাজরাজেশ্বরী
হলে আজি কাঙ্গালিনী ভুবনসুন্দরী।

( ৫ )

পঞ্চম বৎসর এই
এক প্রাণে এক মনে, এক অঙ্গ সম্মিলনে,
সুবিমল স্নেহভরে ছিলাম ভুবনে
সেই স্নেহ আজি কিলো যাবে সুবদনে?

( ৬ )

পঞ্চম বৎসরে হায়
প্রণয় অমূল্য ধনে, চিনিলে না বরাননে,
উছলিল কতবার হৃদয়ে নিয়ত
অমৃতের রাশি হল বিষে পরিণত।

( ৭ )

একে একে প্রাণসখি!
দিয়েছিনু প্রাণ মম, দিয়েছিনু সিংহাসন,
দিয়েছিনু রত্নপূর্ণ হৃদয়-ভাণ্ডার
তথাপিও প্রেয়সি রে হলে না আমার।

( ৮ )

যা কিছু আমার ছিল
সকলি সরল মনে, অরপিণু প্রিয়তমে,
পরাইনু ফুলমালা সুকোমল গলে
সেই মালা ছিন্ন হয়ে পড়িল ভূতলে।

( ৯ )

হবে না আমার তুমি
স্মরণ হইলে মনে, ফাটে প্রাণ প্রিয়তমে,
জ্বলে উঠে হুহু করে সহস্র শিখায়
অজস্র নয়ন-জলে হৃদয় ভাষায়।

( ১০ )

কত ভাল বাসিতাম
বল সোহাগিনী প্রাণ, এই কিরে পরিণাম,
হল তার প্রেয়সি রে হা পোড়া কপাল
এই খেদ এই মনে রবে চিরকাল।

( ১১ )

পূত পরিণয়ে যদি
হত প্রেম সংঘটন, তাহলে কি এ ভুবন,
হত প্রাণ আদরিণী দুঃখের সদন?
পার্থিব জগত হত নন্দনকানন?

( ১২ )

প্রণয় দুর্ল্লভ রত্ন
মুখচন্দ্র রূপসীর, কলকণ্ঠ রমণীর,
করে কি জীবন মম প্রণয়ে মগন
হৃদয়সম্ভব সুখ প্রণয় মিলন।

( ১৩ )

হেন রত্ন অলঙ্কারে
তোমার অন্তর হায়, ভূষিল না বিধাতায়,
কেন পূর্ণ শশধর নীরদ আড়ালে
ফুটিল কি সরোজিনী কণ্টকী-মৃণালে?

( ১৪ )

আর কাজ নাই প্রিয়ে!
সব সুখ অভাগার, শেষ হল এইবার,
গাহিলে দুঃখের গীত ঝরিলে নয়ন
ব্যথিবে কোমল হিয়া বিদায় এখন!

শ্রীহঃ——

# জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

## (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

### তদীয় জীবনের পরিশিষ্ট।

এখন হইতে মিলের জীবনবিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। এখন হইতে তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন বিষয়ে আমাদিগের আর অধিক বক্তব্য নাই। কারণ তাঁহার মনের এখন পরিবর্ত্তনের অবস্থা নহে, ক্রমিক উন্নতির অবস্থা। এই ক্রমিক উন্নতি তাঁহার পরিণামরচনায় সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাই তাহা সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই গুরুভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া আমরা তাঁহার জীবননাটকের শেষ অঙ্ক অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মিল্ তাঁহার পত্রিকার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথম অবসরেই তদীয় ন্যায়দর্শন সমাপ্ত করেন। ১৮৩৮ খৃঃ জুলাই এবং আগষ্ট মাসে তিনি যে অবসর প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার ন্যায়দর্শনের তৃতীয় খণ্ডের যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমাপ্ত করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সময় তৃতীয় খণ্ডের পুনর্লেখনে পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার সমস্ত পুস্তকই এইরূপে অন্ততঃ দুই বার করিয়া লিখিত হইত। প্রথমে তিনি পুস্তক খানির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত লিখিতেন। পুস্তকখানির লেখা সমাপ্ত হইলে, তিনি আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহা আবার নূতন করিয়া লিখিতেন। এই দ্বিতীয় লেখনের সময় পুস্তকের যেখানে যে অসম্পূর্ণতা থাকিত, তাহা তিনি পূরণ করিয়া দিতেন। এরূপ পুনর্লেখনে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ইহা তাঁহার প্রথম কল্পনার নবীনতা ও তেজস্বিতার সহিত প্রতত চিন্তা জনিত সূক্ষ্মতা ও পরিপূর্ণতা মিশ্রিত করিয়া দিত। প্রথম কল্পনার সময় তিনি কেবল শ্রেণাবিভাগের দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। যদি সেই শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিসঙ্কুল হয়, তাহা হইলে যে সূত্রপরম্পরা দ্বারা ভাব সকল পরস্পরগ্রথিত, তাহা অবশ্যই ছিন্ন বা সঙ্কুচিত হইবে। প্রথম লেখনকালে শ্রেণীবিভাগ সুন্দর ও ভাবসকল সুসম্বদ্ধ হইলে, দ্বিতীয় লেখন সময়ে রচনার দোষ সকল দূরীকৃত করা কঠিন ব্যাপার নহে।

মিলের ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় লেখনকালে, হোয়েওয়েলের দর্শনের ইন্‌ডকটিব

বিজ্ঞান খণ্ড প্রকাশিত হয়। মিল্ এই ঘটনাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিপরীতমতাবলম্বী ব্যক্তি দ্বারা সেই বিষয়ের পূর্ণ আলোচনার অভাব, মিল্ অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। প্রতিপক্ষোত্থাপিত আপত্তিসকলের খণ্ডন এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপক্ষ প্রচারিত মতের বিপরীত মত সংস্থাপন করিতে গিয়া তাঁহার ভাব সকল অধিকতর বিশদতা অধিকতর ওজস্বিতা ও অধিকতর পরিপূর্ণতার সহিত পরিব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায়দর্শনের পুনর্লেখন কালেই মিল্ হোয়েওয়েলের সহিত তর্কবিতর্ক ও কম্‌টের পুস্তক হইতে গৃহীত আলোক ইহার অন্তর্নিবেশিত করেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার ন্যায়দর্শন মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের উপযোগী হইল। তিনি প্রকাশের জন্য সর্ব্ব প্রথমে ইহা মরের (১) হস্তে সমর্পণ করেন। মরে অনেক দিনের পর কোন অজ্ঞাত কারণে পুস্তক খানি অপ্রকাশিত অবস্থায় মিলের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। তদনন্তর মিল্ ইহা পার্কারের (২) হস্তে প্রদান করেন। পার্কার ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে পুস্তকখানি প্রকাশিত করেন। মিল্ ইহার কৃতকার্য্যতার বিষয়ে বিশেষ আশা করেন নাই। আর্চবিশপ্ হোয়েট্‌লী ও ডাক্তার হোয়েওয়েল প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই দুরূহ শাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ে লোকের ঔৎসুক্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, তথাপি এরূপ দুরূহ বিষয় সাধারণের প্রীতিকর বা পাঠোপযোগী হইবে মিল্ ইহা কখনই আশা করেন নাই। যে সকল ছাত্র ন্যায়দর্শন তাঁহাদিগের বিশেষ পাঠনার বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন, ইহা কেবল তাঁহাদিগেরই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ছাত্রের সংখ্যা তৎকালে ইংলণ্ডে বড় অধিক ছিলনা। যে কয়েকজন ছিলেন, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ বিপরীতন্যায়দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং মিলের ন্যায়দর্শন পড়ে বা তাহার মত সকলের অনুমোদন করে, এরূপ লোকের সংখ্যা তৎকালে ইংলণ্ডে অতিশয় অল্প ছিল।

মিল্ ভাবিয়াছিলেন যে ডাক্তার হোয়েওয়েলের তর্কপ্রিয়তা অতি ত্বরায় তাঁহাকে তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত করিবে এবং এই প্রতিবাদে তাঁহার পুস্তক শীঘ্রই সাধারণ জনগণের ঔৎসুক্য উদ্দীপিত করিবে। কিন্তু মিলের সে আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। হোয়েওয়েল্ তাঁহার পুস্তকের প্রতিবাদ করেন বটে, কিন্তু তাহা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে। এই সময় মিলের ন্যায়দর্শন তৃতীয় সংস্করণ অতিক্রম করে। এই তৃতীয় সংস্করণকালে মিল্ হোয়েওয়েলের প্রতিবাদের খণ্ডন করেন।

(1) Murray. (2) Mr. Parkar.

পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন (১) মিলের ন্যায়দর্শনের মূলসূত্র। তাঁহার মতে জ্ঞানমাত্রই পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের ফল, বুদ্ধি ও বিবেক সংস্কারের (২) ফল, এবং সংস্কার শিক্ষার ফল। জার্ম্মান্ দার্শনিকেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতমতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন মনুষ্যের কতকগুলি জ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনজাত বটে, কিন্তু অনেক গুলি আজন্মসিদ্ধ (৩)। তাঁহাদিগের মতে মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেক সংস্কার ও শিক্ষাদ্বারা পরিমার্জ্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা সংস্কার ও শিক্ষার ফল নহে। বহির্জগৎসম্বন্ধীয় সত্যসকল পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন ব্যতিরেকে শুদ্ধ স্বভাবজ্ঞান (৪) ও বিবেক দ্বারা কিরূপে উপলব্ধ হইতে পারে, মিল্ তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে এরূপ ভ্রান্ত ও দুর্ব্বোধ মতই যত দার্শনিক কুসংস্কারের মূল।

সাময়িক রাজনীতির সহিত কার্য্যলিপ্ততা, এবং সাময়িক পত্রিকার সম্পাদন জন্য লেখকগণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের আবশ্যকতা, হইতে মুক্ত হইয়া মিল্ সহচরবৃন্দের সংখ্যা অতিশয় নিয়মিত করিয়া ফেলিলেন। ইংলণ্ডের সাধারণ-সমাজের অবস্থা এত শোচনীয় এবং তাহাদিগের সংসর্গ এত অপ্রীতিকর যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার অনুসরণে কখনই প্রবৃত্ত হইবেননা। যে সকল বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে সে সকল বিষয়ে কোন গভীর তর্ক উত্থাপন করা ইংলণ্ডের সাধারণ সমাজে কুশিক্ষার ফল বলিয়া পরিগণিত হইবে। এদিকে ফরাশিদিগের ন্যায় ইংরাজ জাতির সজীবতা ও সামাজিকতার সহিত প্রীতিজনকরূপে সামান্য বিষয়ে গল্প করিবারও শক্তি নাই। সুতরাং একজন ইংরাজ শুদ্ধ সুখপ্রাপ্তির আশায় কখন অন্যতরের সংসর্গ কামনা করিবেন না। যাঁহারা সমাজতরুর উচ্চতম শাখায় এখনও উঠিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অন্যের সাহায্যে উঠিবেন বলিয়া, তাঁহাদিগেরই সংসর্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা উচ্চশাখায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বপদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্তই এরূপ করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে উদ্দীপিত, যাঁহাদিগের হৃদয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিশোধিত, কোন গূঢ় অভিসন্ধি ব্যতিরেকে, এরূপ সমাজের সহিত সংসর্গ তাঁহাদিগেরও প্রীতিকর বোধ হইবেনা। যাঁহারা প্রকৃত উচ্চশ্রেণীস্থ বুদ্ধির লোক, তাঁহারা এরূপ সমাজের সহিত এত অল্প সংশ্রব রাখেন, যে তাঁহারা ইহা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদিগের প্রকৃত মানসিক উৎকর্ষ আছে, তাঁহারা

---

(1) Experience. (2) Association. (3) Innate. (4) Intuition.

এরূপ সমাজের সহিত সর্ব্বদা মিশ্রিত হইলে অনতিবিলম্বেই অধঃপতিত হয়েন সন্দেহ নাই। শুদ্ধ যে ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের সময় অপব্যয়িত হয় এরূপ নহে, তাঁহাদিগের হৃদয়ভাবও ক্রমে অবনত হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের যে সকল চিররূঢ় মত সাধারণ মতের প্রতিকূলে, সমাজের প্রীতি বিধান করিতে গিয়া সেই সকল মত বিষয়ে অগত্যা তাঁহাদিগকে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে হয়। তাঁহাদিগের হৃদয় ও মনের উচ্চ আদর্শসকলকে তাঁহারা ক্রমে কার্য্যে পরিণত করার অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতে থাকেন। সে সকলকে তাঁহারা ক্রমে স্বপ্নবিজৃম্ভিত বা মতমাত্র বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। যদি কোন মহাপুরুষ সৌভাগ্যক্রমে এরূপ সংসর্গেও তাঁহার উচ্চতম মত সকল অক্ষত ও অবিচলিত রাখিতে সক্ষম হন, তথাপি তিনি অতর্কিতভাবে সংশ্রুত ব্যক্তিবর্গের হৃদয় ভাব ও মতের অনুবর্ত্তন করিবেন। এই জন্য উচ্চধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির অশিক্ষিত সমাজে উপদেষ্টৃভাব ভিন্ন অন্য ভাবে প্রবেশ করা হিতকর নহে। যে ব্যক্তির এরূপ উচ্চ ও বিশুদ্ধ অভিপ্রায়, তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই নিরাপদে এরূপ অশিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাঁহাদিগের বড় হইবার ইচ্ছা আছে,—বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ও মহদাশয়তায় যাঁহারা তাঁহাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা শ্রেষ্ঠ না হউন অন্ততঃ তাঁহাদিগের সমান,—তাঁহাদিগেরই সংসর্গ তাঁহাদিগের বিশেষ ইষ্টজনক। আরও যখন স্বভাব ও মন গঠিত হইয়াছে,—তখন মত, প্রতীতি ও হৃদয়ভাব প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ একতা সংঘটিত হয়—তাঁহাদিগের সহিতই প্রকৃত বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। এই সকল কারণে মিল্ যাঁহাদিগের সংসর্গ অনুসরণ করিতেন এরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমেই অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

এই নব বন্ধুবর্গের মধ্যে টেলরপত্নী সর্ব্ব প্রথম ছিলেন। এই সময়ে প্রায় অধিক সময় তিনি তাঁহার বালিকাদুহিতামাত্র অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের কোন নির্জ্জনপ্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার স্বামী কর্ম্মোপলক্ষে লণ্ডনে বাস করিতেন। এই জন্য তিনি সময়ে সময়ে লণ্ডনে আসিয়াও অবস্থিতি করিতেন। মিল্ এই দুই স্থানেই তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। টেলরপত্নী স্বামিবিরহিত হইয়া বৎসরের অধিক সময়ই যখন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন, তখনও মিল্ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং দুইজনে সময়ে সময়ে একত্র ভ্রমণে নির্গত হইতেন— এই ঘটনায় স্বভাবতঃ অপযশ ঘোষণা হইতে পারে, জানিয়াও টেলরপত্নী নিজ চরিত্রবলে সে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিতেন। এই জন্য মিল্ তাঁহার নিকট চিরঋণে বদ্ধ ছিলেন। টেলরের অনুপস্থিতিকালে একত্র অবস্থিতি ও একত্র পরিভ্রমণ ভিন্ন এই সময়ে তাঁহাদিগের

পরস্পরের ব্যবহারে লোকে এমন কিছুই পাইত না, যাহাতে তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গভীর স্নেহ ও পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর সখিত্ব ভাব ভিন্ন, লোকের মনে অন্য কোন ভাবের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহারা দুই জনে যে সমাজের ভয়ে ভীত হইতেন এরূপ নহে। কারণ তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে ব্যক্তিবিশেষের আত্মগত (১) কার্য্যের উপর সমাজের কোন অধিকার নাই। সুতরাং আত্মগত কার্য্যে তাঁহারা সমাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু যে কার্য্যে টেলরের অন্তরে বেদনা লাগিবার সম্ভাবনা, যে কার্য্যে সমাজের নিকট টেলরকে লজ্জিত হইতে হইবে, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের উভয়েরই—বিশেষতঃ টেলরপত্নীর—অকর্ত্তব্য। তাঁহার মানসিক উন্নতির এই তৃতীয় অবস্থায়,—অর্থাৎ যে সময়ে তাঁহার ও টেলরপত্নীর মানসিক উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল,—তাঁহার মত সকল অধিকতর প্রশস্ত ও অধিকতর গভীর হইতে লাগিল; যে সকল বিষয় পূর্ব্বে তিনি বুঝিতে পারিতেন না, এখন হইতে সে সকল বিষয় তাঁহার বুদ্ধির অধিগম্য হইতে লাগিল; এবং যে সকল বিষয় তিনি পূর্ব্বে অস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে স্পষ্টরূপে তাঁহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইতে লাগিল। দিন কতক মিল্ অনেক বিষয়ে বেন্থামের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বেন্থামিক হইয়া দাঁড়াইলেন। যে সময়ে তিনি বেন্থামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, সে সময়ে তিনি সমাজ ও পৃথিবীর সাধারণ মতবিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করিতেও শিখিয়াছিলেন, এবং সেই সকল সাধারণ মতের বাহ্য উৎকর্ষেই কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; তথাপি এত অধিক বিষয়ে সাধারণ মতের সহিত মূলতঃ অনৈক্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন তিনি তদীয় মতসকলের সাধারণমত বিসম্বাদিতার আতিশয্য পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে দেখিলেন, যে যে বিষয়ে সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই তাঁহার মতের উৎকর্ষ। সেই সেই স্থলেই সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতির সংস্কারের আবশ্যকতা। এক্ষণে টেলর-পত্নীর সাহচর্য্যে তাঁহার মতসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিল। বেন্থামিক মতে যখন তিনি নবদীক্ষিত হন, যখন তিনি বেন্থামিক সাম্প্রদায়িকতার নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠেন, তখনও তাঁহার মত সকল এতদূর সমাজদ্রোহী হয় নাই। তদানীন্তন বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্দিগের ন্যায় তখন তিনি এইমাত্র বিশ্বাস

(1) Individual.

করিতেন যে সামাজিক শৃঙ্খলায় অনেক গুলি মৌলিক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ও সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদিগের ও মিলের মতে ব্যক্তিগত স্বত্ব (১) ও উত্তরাধিকার (২) ব্যবস্থাপক সমাজের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁহাদিগের ও মিলের বিশ্বাস ছিল যে ব্যক্তিগত স্বত্ব ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যত প্রকার অবিচার প্রচলিত আছে, সে সমস্তই জ্যেষ্ঠাধিকার (৩) ও এন্‌টেইল প্রথা উঠাইয়া দিলেই নিবারিত হইতে পারে। ধনের অসম বিতরণে জগতে যে দরিদ্র-সংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহাদিগের ও মিলের মতে সন্তানোৎপাদন বিষয়ে আত্মসংযম করিলে তাহা কথঞ্চিৎ নিবারিত হইতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে মিল্ তৎকালে কেবলমাত্র এক জন ডিমোক্রাট্ (৪) ছিলেন, বিন্দুমাত্রও সোসিয়ালিষ্ট (৫) ছিলেন না। এক্ষণে টেলর-পত্নীর সাহচর্য্যে মতবিষয়ে মিল্ সম্পূর্ণরূপে সোসিয়ালিষ্ট হইয়া উঠেন। কিন্তু মিল্ ও টেলরপত্নী বলিতেন যে এই মত কার্য্যে পরিণত করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যত দিন সাধারণ লোকের শিক্ষার অবস্থা এরূপ শোচনীয় থাকিবে, যতদিন সাধারণ লোক উদার শিক্ষাবিরহে এরূপ স্বার্থপর ও হিংস্রপ্রকৃতি থাকিবে, ততদিন এরূপ মত—কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টায় জগতের ভীষণ অমঙ্গল বই মঙ্গল সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যদিও 'ব্যক্তিবিশেষের উপর সমাজের যথেচ্ছাচার' রূপ সোসিয়ালিজ্‌ম্ মতের ভীষণ অঙ্গ তাঁহারা উভয়েই সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে সমাজের এমন অবস্থা অসম্ভাবিত নহে, যখন ইহা অলস ও পরিশ্রমী এই দুই দলে বিভক্ত হইবে না; যখন এই সাধারণ নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে যে, যাহারা পরিশ্রম করিবে না, তাহারা আহারও পাইবে না—শুদ্ধ দীনদুঃখীর উপর এই নিয়ম প্রচারিত হইবে এরূপ নহে, ধনীদিগকেও এই নিয়মের অধীনে আসিতে হইবে—; যখন শ্রমোপার্জ্জিত ফলের বিভাগ জন্মের দৈবঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া অপক্ষপাতী ন্যায়ের তুলাদণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; এবং যখন, যে সকল উপকারপরম্পরা সাধারণ্যে ভোগ করিতে হইবে, তাহার জন্য প্রাণপণে যত্ন করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্যসাধন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিরূপে জগতে ব্যক্তিগত কার্য্যস্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রবর্ত্তিত হইবে, কিরূপে জগতের অযত্নলব্ধ দ্রব্যজাতের উপর সাধারণ স্বত্ব সংস্থাপিত হইবে, এবং কিরূপে সাধারণ পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ফলে সকলের সমান অধিকার সংস্থাপিত হইতে পারে—তাঁহাদিগের উভয়েরই মতে এই গুরুতর বিষয়-

(1) Private property.
(2) Inheritance.
(3) Primogeniture.
(4) Democrat. (5) Socialist.

ত্রয়ের মীমাংসা করাই সমাজসংস্কারকদিগের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঠিক কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল গরুতর বিষয় সংসাধিত হইতে পারে.আর কত দিন পরেই বা এই সকল মতের কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা তাঁহারা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারিতেন না। তবে এই মাত্র বলিতেন যে অসংখ্য অশিক্ষিত কৃষক ও তাহাদিগের প্রভুদিগের চরিত্রে যতদিন না সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হই-তেছে, ততদিন এরূপ গুরুতর সমাজ-সংস্কারের কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ শুভঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগকেই অভ্যাস দ্বারা সাধারণের হিতার্থ পরিশ্রম ও সন্তুয়সমু-থান করিতে শিখিতে হইবে। সাধারণের হিতার্থে কার্য্য করার প্রবৃত্তি মনুষ্যের প্রকৃতিবিরোধিনী নহে। যখন এক জন অশিক্ষিত সামান্য সৈনিক পুরুষ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অকা-তরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, তখন শিক্ষা অভ্যাস ও হৃদয়ভাবের পরিমার্জ্জন বলে, একজন প্রাকৃত লোক যে জনসাধার-ণের উপকারার্থ ভূমিকর্ষণ ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এরূপ অবস্থা যে কতদিনে ঘটিবে তাহা তাঁহারা বলিতে পারিতেন না; কিন্তু পুরুষপরম্পরা-ব্যাপী অবিশ্রান্ত শিক্ষা বলে মনুষ্য যে এরূপ অবস্থায় আনীত হইতে পারে ইহা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। সাধারণ মঙ্গল যে অধুনা জনসাধারণের কার্য্যের প্রবৃত্তিনিয়ামক নহে, তাহার কারণ কেবল প্রতিকূল শিক্ষা ও অভ্যাস। সমাজশৃঙ্খলার বর্ত্তমান অব-স্থার মানুষ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল নিজের ও নিজ পরিবারের উদরা-ন্নের নিমিত্ত লালায়িত; সাধারণের হিতার্থে অতি অল্প সময়ই ব্যয়িত করিতে শিখে। স্বার্থপরতা দ্বারা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া, লজ্জাভয় ও যশোলিপ্সা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, মনুষ্য প্রতিদিন কত অদ্ভুত অব-দানপরম্পরা ও কত অদ্ভুত আত্ম-ত্যাগ প্রদর্শন করিতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না! আধুনিক সমাজশৃঙ্খলার প্রায় সমস্ত নিয়মাবলীই এরূপ স্বার্থপরতার উৎসাহ দিয়া থাকে। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থপরতা মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আপাততঃ যেন বোধ হয় ইহার উত্তেজনা ব্যতীত মনুষ্যসাধারণ কখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ পুরাকালীন সাধারণতন্ত্র সকলে,—যৎকালে প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিক অসংখ্য সাধা-রণ কার্য্যে সর্ব্বদা আহূত হইতেন,—অস্বার্থপরতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক তথাপি মিল্ ও টেলরপত্নী ইচ্ছা করিতেন না, যে স্বার্থ-পরতার পরিবর্ত্তে কোন উৎকৃষ্টতর প্রবৃত্তি-নিয়ামক উদ্দেশ্য (১) সংস্থাপিত হওয়ার

(1) Motive.

পূর্ব্বে, সামাজিক কার্য্যপ্রণালী হইতে স্বার্থ-পরতার প্রলোভন একেবারে উঠিয়া যায়। তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজশৃঙ্খলাকে শুদ্ধ সাময়িক বন্দোবস্ত মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সুতরাং যে যে উপায়ে নূতন ও উৎকৃষ্টতর সমাজশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইতে পারে, উপযুক্ত লোক দ্বারা সেই সেই উপায়ের পরীক্ষা করণ—তাঁহাদিগের নিকট অতিশয় আদর ও উৎসাহের বিষয় হইত। এরূপ উদ্যম সফল হউক বা নিষ্ফলই হউক, উদ্যোগকর্ত্তাদিগের যে ইহাতে সবিশেষ শিক্ষা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ উপকাররূপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, বর্ত্তমান সমাজশৃঙ্খলায় কি কি দোষ বর্ত্তমান থাকায় লোকে সেই সাধারণ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না—এ গুলি তাঁহারা বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন।

মিল্ "প্রিন্সিপল্স অব্ পলিটিকাল্ ইকনমি" নামক তদীয় গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। ইহার প্রথম সংস্করণে এই মতসকল তত পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হয় নাই; দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে এবং তৃতীয় সংস্করণে অসন্দিগ্ধরূপে এই সকল মত পরিব্যক্ত হয়। এই ক্রমিক পরিব্যক্তির অর্থ এই যে, এই সকল মত সাধারণের মতের বিরোধী; সুতরাং হঠাৎ অসন্দিগ্ধরূপে সেগুলি পরিব্যক্ত হইলে, লোকে ভীত ও চকিত হইয়া তদনুসরণে একবারে বিরত হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে পরিব্যক্ত হইলে সেইগুলি ততদূর ভয় ও বিস্ময়ের কারণ না হইতে পারে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসিবিপ্লবের পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয়। সুতরাং প্রথম সংস্করণকালে লোকের মন ততদূর উন্নতিপ্রবণ না হওয়াতে মিল্ এরূপ সমাজদ্রোহী মতসকল অতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই। এই জন্যই তিনি ইহার প্রথম সংস্করণ কালে সোসিয়ালিষ্ট মত সম্বন্ধে যতগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, ইহাতে তাহার অধিকাংশ এত প্রবলরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, যে আপাততঃ যেন তাঁহার গ্রন্থখানি উক্তমতবিরোধী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহার পর ফরাসি বিপ্লবের উন্মাদকরী উত্তেজনায় লোকের মন অধিকতর উন্নতিপ্রবণ হওয়ায়, ইউরোপীয় সোসিয়ালিষ্টিক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থরাশি আলোড়িত হওয়ায়, এবং এবিষয়ে লোকের চিন্তা উদ্দীপিত ও ঘোরতর বিতর্ক উত্থাপিত হওয়ায়, মিল্ ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণকালে ইহাতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুটরূপে এই মত সকল প্রকাশ করেন।

মিলের সকল গ্রন্থ অপেক্ষা তাঁহার "পলিটিকাল ইকনমি" দ্রুততর সম্পাদিত হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ইহার

রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষ না হইতেই, ইহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের উপযোগী হয়। এই অল্লাধিক দ্বিবৎসর কালের মধ্যে আবার ছয় মাস কালের জন্য গ্রন্থখানি সময়াভাবে পড়িয়া থাকে। এই সময়ে মিল্ "মর্ণিং ক্রনিক্ল্" নামক সংবাদ পত্রে আয়র্লণ্ডের পতিত ভূমিসকলে কৃষক ভূম্যধিকারী সংস্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিতেছিলেন। ১৮৪৬-১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শীতকালে আয়র্লণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আয়র্লণ্ডের দীনদরিদ্র কৃষকদিগকে ইহার পতিত ভূমি সকলের অধিকারী করিয়া দিলে আয়র্লণ্ডবাসীরা যে শুদ্ধ উপস্থিত বিপদের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে এরূপ নহে, তাহাদিগের ভাবী সামাজিক ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় অবস্থাও চিরকালের জন্য উন্নত হইবে—মিলের মনে এই ভাব উদিত হয়। কিন্তু এ ভাবটী সম্পূর্ণ নূতন সুতরাং সাধারণের অপ্রীতিকর; ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরূপ রোগে এরূপ ঔষধি প্রয়োগের কোন নজির নাই; যে সকল সামাজিক প্রণালী ইংলণ্ডে প্রচলিত নাই, অন্যান্য অসংখ্য দেশে প্রচলিত থাকিলেও, ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞেরা ও ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এই সকল কারণে মিলের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইল। পতিতভূমি সকলের উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিকার্য্যের আরম্ভ না করিয়া, এবং কুটীরবাসী কৃষকদিগকে সেই সকল পতিতভূমির ভূম্যধিকারীরূপে পরিস্থাপিত না করিয়া, ব্রিটিস্ পার্লিয়ামেণ্ট দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আয়র্লণ্ডবাসীদিগের আপাত উপকারার্থে এক "দীন-আইন" (১) জারি করিলেন। দুর্ভিক্ষ ও অন্যত্র উপনিবেশ সংস্থাপন দ্বারা আয়র্লণ্ডের লোকসংখ্যা যদি কমিয়া না যাইত, তাহা হইলে এরূপ গোচিকিৎসায় আয়র্লণ্ডের যে কি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইত কে বলিতে পারে?

মিলের "পলিটিকাল্ ইকনমির" দ্রুত কৃতকার্য্যতা দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছে, প্রথমতঃ ইংলণ্ডের জনসাধারণ এরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিল, দ্বিতীয়তঃ এরূপ এক খানি গ্রন্থ বাহির হইলে তাহারা তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে প্রস্তুত ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার এক সহস্র খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সেগুলি সেই বৎসরেই নিঃশেষিত হয়। আর এক সহস্র খণ্ড ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে প্রকাশিত হয়। সেগুলিও দুই তিন বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। আবার ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তৃতীয় সংস্করণকালে ১২৫০ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রচারাবধিই ইহা প্রামাণ্যসংস্থাপক বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার কারণ এই যে অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতে সমাজবিজ্ঞানের শুদ্ধ মত মাত্র প্রচারিত হইয়াছিল এরূপ নহে, সেই

(1) Poor law.

মত সকল কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে সে উপায় গুলিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা অন্যান্য অর্থনীতিগ্রন্থের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রচারিত হয় নাই; সমাজবিজ্ঞানরূপ প্রকাণ্ডতরুর একটী শাখামাত্র রূপে প্রচারিত হইয়াছে। বাস্তবিক অর্থনীতি কখন একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে সুতরাং ইহা স্বাধীনভাবে মনুষ্যকে কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে পারে না।

অর্থনীতির প্রকাশের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত মিল্ কোন বৃহৎগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই বটে; কিন্তু এই সময়ে তিনি নানা সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে যাহা যাহা লিখিতেন, এবং পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সহিত সাধারণ হিতকর বিষয়ে তাঁহার যে সকল পত্রাদি লেখালিখি চলিয়াছিল, সেই সমস্ত একত্র করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। এই কয় বৎসরে তিনি জীবনের শেষ ভাগে প্রকাশের জন্য, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া যান। তিনি সাধারণ ঘটনাস্রোত অতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু ইহার গতি ও উন্নতি তাঁহার আশা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাশীবিপ্লবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া (১) উপস্থিত হয় তাহা এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এক জন দুষ্টমনা যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকর্ত্তৃক ফরাশী সিংহাসনের অধিকার, এই ঘটনাদ্বয় কিছু দিনের মত ফ্রান্সের ও ইউরোপের স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নতির আশা একবারে সমূলে উচ্ছেদ করে।

মিল্ আশৈশব যে সকল মত উপাস্য দেবতার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, এবং যে সকল সংস্কার সংসাধনের জন্য অসংখ্য বাধা বিপত্তির সহিত সতত সমরে অবগাহন করিতেন, এই সময়ে সেই চিররূঢ় মত সকল ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ক্রমে আদৃত হইতে লাগিল এবং সেই চিরাভিলষিত সংস্কার সকল ক্রমেই প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনে মানবজাতির যতদূর শুভ সংঘটিত হইবে বলিয়া মিল্ আশা করিয়াছিলেন ততদূর ঘটে নাই। বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিপ্রবৃত্তির পরিমার্জ্জন ও উৎকর্ষ সাধনেই মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল। এই সকল পরিবর্ত্তনে সেই প্রকৃত মঙ্গল সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হয় নাই। বোধ হয় কোন অজ্ঞাত ও অদৃশ্য কারণ তদীয় উৎকৃষ্ট মত সকলের ও তৎপ্রস্তাবিত সংস্কার সকলের শুভকরী শক্তি নষ্ট করে। তাহা না হইলে কারণসত্বে কার্য্যের অসদ্ভাব কেনই সংঘটিত হইবে? বহুদর্শনে মিলের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে ভ্রান্তমতের পরিবর্ত্তে অভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ মত সংস্থাপিত হইতে পারে, তথাপিও যে মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে সেই ভ্রান্তমত সকল উৎপন্ন

(1) Reaction.

হইয়াছে, সে মানসিক দুর্ব্বলতা নিরাকৃত না হইতে পারে। স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইংরাজজাতি অর্থনীতিশাস্ত্রে যেরূপ অপরিপক্ক ও অদূরদর্শী ছিলেন এখনও সেইরূপ আছেন। এখনও তাঁহারা গুরুতর বিষয়সকলে ভ্রমের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। গভীরতর চিন্তা ও বিশুদ্ধতর হৃদয়ভাব তাঁহাদিগের অন্তর হইতে এখনও দূরসমাকৃষ্ট। তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিপ্রবৃত্তি এখনও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। মিলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল, যে যত দিন না মানব-চিন্তাপ্রণালীতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তত দিন মানবসমাজের বিশেষ উন্নতির আশা নাই। এখন আর পূর্ব্বের মত ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পুরাতন মত সকল সুশিক্ষিত দলের নিকট আদৃত হয় না; সুতরাং সুশিক্ষিত মনের উপর সেই সকল মতের কার্য্যকারিতাশক্তি অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু জনসাধারণের নিকট সেই সকল মতের এখনও এতদূর তেজস্বিতা আছে যে তাহাদিগের পরিবর্ত্তে নূতন ও উৎকৃষ্টতর মত পরিস্থাপিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যখন পৃথিবীর দার্শনিকেরা ইহার প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ হন, তখন এক প্রকার সামাজিক বিপ্লবকাল উপস্থিত হয়। এই কালে লোকের প্রতীতি ক্ষীণ, বুদ্ধিবৃত্তি কার্য্যাক্ষম ও বিবেকশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। যত দিন না আবার মানবমনে একটী নূতন (মানবই হউক বা ঐশ্বরিকই হউক) ধর্ম্মে বিশ্বাস সংস্থাপিত হয়, তত দিন এই বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে যত কেন লেখ না, যত কেন ভাব না, তাহাতে মানবজাতির সাময়িক বই চিরস্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা নাই। মানবমনের বাহ্য অবস্থায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়া, মিল্ মানবজাতির ভাবী উন্নতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল স্বাধীন চিন্তার স্রোত কিঞ্চিৎ প্রবল হওয়াতে, ইংলণ্ডের ভাবী মানসিক উন্নতিবিষয়ে মিলের মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আশার সঞ্চার হইল।

এই সময়ে মিলের পারিবারিক জীবনে কয়েকটী মহতী ঘটনা সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিধবা টেলরপত্নীর সহিত তাঁহার পরিণয় সর্ব্বপ্রধান। মিল্ যদিও এই অপূর্ব্ব রমণীর সহিত জীবনের কোন সময়ে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাঁহারা উভয়েই টেলরের অকালমৃত্যুরূপ মূল্যে এ সুখ ক্রয় করিতে কখন প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ টেলরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও তদীয় পত্নীর গভীর অনুরাগ ছিল। যাহা হউক ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উক্ত শোচনীয় ঘটনা সংঘ-

টিত হইলে, সেই অশুভ হইতে মিল্ নিজ জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভ নিষ্কর্ষণ করিতে অনুমত হন। এতদিন চিন্তা, হৃদয়ভাব ও রচনা বিষয়ে যাঁহার সহিত সহভাগিতা ছিল, এখন হইতে জীবনের সমস্ত ঘটনাতেই তাঁহার সহিত সহভাগিতা সংস্থাপিত হইল। কিন্তু সার্দ্ধসপ্ত বৎসরকাল মাত্র তিনি এই স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছিলেন! শুদ্ধ সার্দ্ধসপ্ত বৎসরকাল! এই রমণীরত্নের অকালমৃত্যুতে মিল্ যে কি ক্ষতি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা অনুভবকরা যায় কিন্তু ব্যক্ত করা যায়না। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে এই রমণীকুলশিরোমণি দ্বারা মিল্ যে তাঁহার রচনা বিষয়ে কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সাহচর্য্যে তিনি যে কত অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিতে অক্ষম ছিলেন। তথাপি আমরা আগামী বারে যতদূর সাধ্য তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিয়া পাঠকগণের তৃপ্তিবিধানের চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

## হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার!

হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার!
বনবাসী হয়ে রব, সুধালে না কথা কব,
মানবের মুখ আমি দেখিব না আর।
মনেতে বড়ই ঘৃণা হয়েছে আমার।
হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার!

এ ছার জীবনে আর কি সাধ তাহার?
পতি যার আসে বাসে,
নাহি কথা নাহি হাসে,
সে যে পরে ভাল বাসে, পরপরিবার।
সে সুধু পরেরি তরে কাঁদে অনিবার।
হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার!

আমার দুখের কথা নহে কহিবার!
কত তাঁরে সাধিলাম,
কত তাঁরে বাঁধিলাম,
কত পায়ে কাঁদিলাম, ভেবে আপনার।
তবু সে দিনের তরে হলো না আমার!
হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার!

কেন সে করিল আগে যতন আমার!
তাই সে তাঁহারি তরে,
আজিও কাঁদি অন্তরে,
সে সুখ স্বপন মনে, জাগে অনিবার।
দর দর দুনয়নে বহে অশ্রুধার!
হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার!

পুরাব কান্তার আমি কেঁদে একবার।
প্রাণভরে তাঁরে ডাকি,
কাঁদাব বনের পাখী,
দেখি পাখী কাঁদে নাকি, দুখেতে আমার।
কেবল পাষাণ মন মানব সবার।
হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার।

মনেতে বড়ই ঘৃণা হয়েছে আমার।
বনের বাসিনী হব,
বাঘিনীর সঙ্গে রব,
গলা ধরে কেঁদে কব, পতির ব্যাভার।
বাঘিনীরো মনে আছে, দয়ার সঞ্চার।
হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার!

# ডারউয়িনের মত।

## ( দ্বিতীয় প্রবন্ধ। )

মহাত্মা ডারউয়িন সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ইতিবৃত্ত অতীব কৌতুকাবহ। চিরন্তন সংস্কারের বিপরীত মত কত কষ্টসৃষ্টে অগ্রসর হয় তাহা সেই ইতিবৃত্ত পাঠে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। বিশেষতঃ যাহা স্থূলদৃষ্টিতে স্বতঃসিদ্ধ বোধ হয় এবং যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, সে মতের অনুকূলে যত কেন তর্ক থাকুক না, তাহার প্রতিষ্ঠা বহুকালের প্রয়াস ও পরীক্ষা সাপেক্ষ। ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে যে ১৭৯৪-৯৫ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান তিনটি দেশে যুগপৎ এই মহৎ মতের প্রথম আভাস প্রকাশ পাইবে। ডারউয়িনের পিতামহ ইংলণ্ডে, সুপ্রসিদ্ধ কবি গেটি জর্ম্মণিতে এবং সেণ্ট হেলেয়ার ফ্রান্সে এই কথা উত্থাপন করেন যে উদ্ভিদ্ ও জীবগণ সৃষ্টির সময় হইতে একভাবে রহিয়াছে এমন নহে, কিন্তু নানা পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ফরাসিস পণ্ডিত সেণ্ট হেলেয়ার বলেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নিবন্ধন এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তথাপি তাঁহার বিশ্বাস এই যে বর্ত্তমানে জাতিপরম্পরায় আর কোন পরিবর্ত্তনও রূপান্তর হইতেছে না। তৎপরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ ফরাশিস্ প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ লামার্ক কয়েক খানি গ্রন্থে উক্ত মত সমর্থন করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দেশ করেন, যে কি জড় প্রকৃতিতে কি জীবপ্রকৃতিতে যত প্রক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্ত চিরস্থায়ী নিয়মের অধীন, সময়ে সময়ে ঐশী শক্তির পরিচালনে সংঘটিত হয় এমন নহে। অতএব তৃণ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমুদয় জাতি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে। লামার্ক বলেন, যদি জাতি সকল পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহাদের আকার প্রকার, অবস্থা কার্য্য প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বিসদৃশ ও বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু প্রকৃতিতত্ত্ববিদেরা অবগত আছেন, যে যখন কোনপ্রকার জীব (যেমন "স্তন্যপায়ী") নানা জাতিতে বিভক্ত হয় এবং তদন্তর্গত জাতিগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; তখন কোন্ বিভাগটিকে জাতি কোন্‌টিকে বা শ্রেণী বলা উচিত, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। প্রত্যেক জাতি পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইলে এরূপ সন্দেহ ঘটিবার বিষয় কি? পরন্তু যদি আমরা গৃহপালিত জন্তুদিগের রূপান্তর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে প্রকৃতিতে এরূপ পরিবর্ত্তন কোন মতে অসম্ভব বোধ হয় না।

প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন নানা কারণে

সংঘটিত হয়। কতক আবহাওয়া, খাদ্য-প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে, কতক বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংসর্গে, কতক বা অভ্যাসের গুণে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু লামার্ক পরিশেষে একটী নিতান্ত অযৌক্তিক মতের পোষকতা করেন। তিনি বলেন যখন সকল জাতিই অধম হইতে ক্রমশঃ উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তখন এরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য যে, যে সকল নিতান্ত হীন জাতীয় জীব ভূমণ্ডলে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, তৎসমস্ত অধুনা আপনা হইতেই উদ্ভূত হইতেছে; তত্তৎ স্থলে ক্রমপ্রাদুর্ভাবপ্রণালী আর খাটিতেছে না।

অনন্তর ১৮৩১ অব্দে প্যাট্রিক ম্যাথিউ উক্ত মতের সমর্থন করেন। তাঁহার সঙ্গে ডারউয়িনের বড় মতভেদ নাই। তবে তিনি জাতিপরিবর্ত্তনের বর্ণনস্থলে জীবের বাহ্যিক অবস্থাকে অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তিনি "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" প্রক্রিয়ার কতদূর ক্ষমতা তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অতএব ম্যাথিউ সাহেবকে ডারউয়িনের এক প্রকার গুরু বলিলেও চলে। কিন্তু ডারউয়িন তাঁহার নিকট আপনাকে ঋণী বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিলে, তিনি এই প্রত্যুত্তর দেন;—"যে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে এক জাতি হইতে অন্য জাতির উৎপত্তি হয়, তাহা আমার নিকট এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ; প্রগাঢ় গবেষণার ফল নহে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে ডারউয়িন মদপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডারউয়িন অল্পে অল্পে অতি সাবধানে যুক্তি ও ব্যাপ্তিজ্ঞানকে আশ্রয় পূর্ব্বক নানা বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া ক্রমশঃ এই মহৎ আবিষ্ক্রিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু আমার নিকট আবিষ্ক্রিয়া বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। আমি প্রকৃতির সাধারণ কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই স্থির করিয়াছি যে জাতিসকল হইতে উৎকৃষ্টতর জাতিপরম্পরার সৃষ্টি হইতেছে। আমার নিকট এই ঘটনাটি স্বতঃসিদ্ধ। আমার বিশ্বাস এই যে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটী একবার স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দিষ্ট হইলে, কোন কুসংস্কারহীন ব্যক্তি ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা করিবেন না।"

তৎপরে ১৮৪৪ অব্দে "সৃষ্টির চিহ্নাবলী" নামক একখানি পুস্তক প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে জাতির অনিত্যতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার ইহাও বলেন ঈশ্বর প্রত্যেক জাতীয় জীবকে এমন একটী শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তন্নিবন্ধন তাহার আকার প্রকার জীবনাদির পরিবর্ত্তনসংঘটিত হইয়া ক্রমে সম্পূর্ণ রূপান্তর সংঘটিত হয়। এই ঈশ্বরদত্ত পরিবর্ত্তপ্রবণতা শক্তি না থাকিলে, কেবল বাহ্যিক অবস্থার প্রভেদ প্রযুক্ত এক জাতি হইতে জাত্যন্তরের প্রাদুর্ভাব সম্ভবপর বোধ হয় না। এই গ্রন্থে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না; প্রত্যুত অনেক স্থলে ভ্রমপ্রমা-

দের সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হয়। তথাপি এই পুস্তক তীব্র ও উজ্জ্বল রচনার গুণে অবিলম্বে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইল এবং অপেক্ষাকৃত অধিক বিশুদ্ধ ও উন্নতমতের প্রচারার্থ সোপান করিয়া দিল।

অনন্তর ১৮৫২ খৃ অব্দে মার্চ্চ মাসে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার "সৃষ্টি ও প্রাদুর্ভাব" নামক প্রবন্ধ প্রচার করিলেন। তিনি বলেন, অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে জাতি সকল পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। যখন অবস্থাভেদনিবন্ধন গৃহপালিত জন্তুর এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপন্ন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদনিবন্ধন শোণিতশুক্রের পরিণামে আশ্চর্য্য মানবদেহ উদ্ভূত হইতেছে, তখন ভূমণ্ডলে নূতন জাতিপরম্পরার উৎপত্তির জন্য কেবল ভৌতিক প্রক্রিয়া পর্য্যাপ্ত হইবে না, ঐশিক সৃষ্টি নামক একটি নূতন প্রক্রিয়ার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবেক, এরূপ তর্ক নিতান্ত অমূলক। স্পেন্সার সাহেব আরও আপত্তি করেন যে, জাতি সকল পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইলে, কোন্‌গুলি জাতি, কোন্‌গুলি বা এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, তাহা লইয়া এত বিসম্বাদ ঘটিত না। আরও দেখ, যদিও অনেক জাতি ভূমণ্ডল হইতে কালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান জাতিপরম্পরার নিম্ন হইতে নিম্নতর ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্খলা যেরূপ সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে ক্রমিক প্রাদুর্ভাবেরই পক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নতুবা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথম যুগে সরীসৃপের উৎপাদন করিলেন, তৎপরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া মৎস্যজাতির সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর তির্য্যক্ জাতি সৃজন করিলেন, এরূপ অনুমান অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রকার সৃষ্টিকল্পনা গৌরবমাত্র এবং যুক্তি ও দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ।

১৮৫৮ অব্দে ওয়ালেস ও ডারউয়িন লিনীয়সীয় সভার পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিয়া "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" প্রক্রিয়া প্রতিপাদন করেন। তৎপর বৎসর অধ্যাপক হক্‌সলি ও ডাক্তার হুকার উক্তমতের অনুমোদন করেন। ১৮৫৯ অব্দের নবেম্বর মাসে ডারউয়িন সাহেব "জাতির নিদান" নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহাতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও ক্রমপ্রাদুর্ভাবপ্রক্রিয়া সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। কি প্রকার যুক্তি দ্বারা উহা সমর্থিত হইয়াছে, গত সংখ্যায় তাহার আভাস দেওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কিরূপ প্রমাণ পরীক্ষা দ্বারা বানর হইতে নরের প্রাদুর্ভাব প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

মানবদেহের আন্তরিক গঠন ও ধাতু সকল পর্য্যালোচনা করিলে নিকৃষ্টজাতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য বোধ হয়। মাংসপেশী, শিরা শোণিত প্রভৃতি নরদেহে যেরূপ, অন্যান্য জাতির দেহেও সেই প্রকার। অধিক কি মস্তিষ্কেরও অবস্থা

সর্ব্বত্র সমান দেখা যায়; প্রভেদের মধ্যে মানবদেহে পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক, তির্য্যকদেহে অল্প; পরন্তু নিকৃষ্টজাতি মানবের ন্যায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় ও উভয়েরই ক্ষতসংরোধ এক প্রকার ঔষধে সমাহিত হয়। মনুষ্য স্তন্যপায়ী জাতির অন্তর্ভুক্ত। অপরাপর স্তন্যপায়ী জন্তুর সন্তানোৎপাদন ক্রিয়া মনুষ্যের বংশবিস্তারকার্য্য অপেক্ষা পৃথক্ নহে। খাদ্যের গ্রহণ ও পরিপাক এবং তন্নিবন্ধন শোণিতাদির উৎপত্তি মনুষ্যে ও অন্যান্য জন্তুতে অভিন্ন। গর্ভাশয়ে শোণিতশুক্র প্রথমে যে অবস্থায় থাকে, তাহা মনুষ্যের ও নিকৃষ্টজাতির পক্ষে একরূপ। কুক্কুর, বিড়াল, অশ্ব, বানর প্রভৃতির প্রাথমিক ভ্রূণ এবং মানুষের প্রাথমিক ভ্রূণ এ উভয়ে কোন ইতরবিশেষ নাই, সম্পূর্ণ একাকার। ভ্রূণ সকল যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মধ্যে তত প্রভেদ লক্ষিত। তথাপি কেবল বৃদ্ধির চরম কালেই মানুষের ভ্রূণ ও বানরের ভ্রূণ সুস্পষ্ট বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়; কিন্তু বৃদ্ধির প্রথম ও মধ্যম অবস্থাতে একটা কুক্কুরের ভ্রূণ হইতে মানুষের ভ্রূণ যত বিভিন্ন, বানরেরও ভ্রূণ তত বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। ইহাতে অনুমিত হইতে পারে, যে অন্যান্যজাতি অপেক্ষা বানরের সহিত নরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও অব্যবহিত। কেবল দেহের আভ্যন্তরিক গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেন, অন্যান্য বিষয়েও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। মানবের ন্যায় নিকৃষ্ট জাতিরও পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। সুখদুঃখবোধ, ভয় সন্দেহ, অপত্যস্নেহ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল সর্ব্বসাধারণ। বিশেষতঃ তির্য্যক্‌জাতির মধ্যে উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণ মনুষ্যের ন্যায় স্মৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা, স্বপ্নপ্রবণতা, ব্যগ্রতা, ঈর্ষ্যা, বিস্ময়, কৌতুহল প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা ব্যাপৃত হইয়া থাকে। কুক্কুর, হস্তী, বীবর, বানর প্রভৃতি জন্তুর দৃষ্টান্ত মনে করিলে. পাঠক এই বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পরীক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। সমুদয় মানসিক বৃত্তির মধ্যে বিবেচনাশক্তি প্রধান। কিন্তু প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্গণ অবগত আছেন, যে উচ্চ শ্রেণীস্থ তির্য্যকদিগের অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বিবেচনাশক্তি আছে। তাহারাও কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে অবস্থাভেদে পৃথক্ পৃথক্ মতলব অবলম্বন করিয়া থাকে। তৎসমস্তই সংস্কারের (Instinct) ফল বলিলে চলে না। কারণ সংস্কার গুণে অবস্থাভেদে কার্য্যভেদ নির্ব্বাচন করা সম্ভব নহে।

তথাপি এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে এই সকল সাদৃশ্য থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইল না; মনুষ্যে ও নিকৃষ্ট জাতিতে এত গুরুতর প্রভেদ আছে, যে একের উদ্ভব অন্য হইতে কোন মতে সম্ভব নহে। ক্রমিক উন্নতি, যন্ত্র-ব্যবহার, অগ্নি দ্বারা কার্য্য সাধন, অন্য জন্তুর বশীকরণ, অর্থ সংগ্রহ ও ধনাধিকার, ভাষাসৃষ্টি, আত্মজ্ঞান, নির্দ্ধারণশক্তি, ব্যাপ্তিজ্ঞান, শোভানুভাবকতা, কৃতজ্ঞতা, রহস্যজ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান, সদসদ্‌জ্ঞান,

প্রভৃতি কেবল মনুষ্যেরই আছে; এবং তন্নিমিত্ত মনুষ্য তির্য্যক্ জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

উক্ত আপত্তির খণ্ডনার্থ আমরা বহু আড়ম্বর করিব না। মনুষ্য ও নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে যে মহৎ অন্তর আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যেমন মনুষ্যে ও ইতর জন্তুতে প্রভেদ আছে, তেমনি মনুষ্যের মধ্যে ও ইতর জন্তুর মধ্যে পরস্পর প্রভেদ আছে। বানরে ও নরে বিস্তর প্রভেদ সন্দেহ নাই। কিন্তু এক দিকে বানর ও অসভ্য বুসমানকে রাখ আর এক দিকে গর্দ্দভ ও বানরকে রাখ, এবং অপর দিকে বুসমান ও ইংরাজকে রাখিয়া দেও। দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, বানরে ও বুসমানে যে প্রভেদ, বুসমানে ও ইংরাজে কি তদপেক্ষা অল্প? না গর্দ্দভে ও বানরে তদপেক্ষা অল্প? বুসমানের ন্যায় বর্ব্বর জাতি হইতে যদি ইংরাজের মত সুসভ্য জাতির উদ্ভব সম্ভবপর বোধ হয়, তাহা হইলে সিম্পানজি নামক সুবুদ্ধি বানর হইতে বুসমানের উৎপত্তি কেন অসম্ভব হইবেক, বুঝিতে পারা যায় না। বানর অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু যুদ্ধার্থ ও নারিকেলাদি ভক্ষণার্থ উপলখণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকে। গণিতশাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দান তাহার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিলে, একটি সুরক্ষিত উদ্যান হইতে সুস্বাদু ফল অপহরণ করিতে পারা যায়, তাহা স্থির করিতে সে অক্ষম নহে। বানর বিশ্বরচনার মনোহর কৌশল অবগত নহে, কিন্তু বানরীর রঙ্গিন ত্বক্ ও কোমল লোমাবলীর সৌন্দর্য্য নির্ব্বাচনে কোন মতে অপটু নহে। সে সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা কথা বার্ত্তা কহিতে পারে না বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি করিয়া স্বজাতীয়ের নিকট নিজের মনোগত ভাব ও অভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। বানর মনুষ্যের ন্যায় নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা অবগত নহে, কিন্তু স্বদলের রক্ষার্থ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হয় এবং বিপন্ন অনুচরের শাবকগুলির ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ বিষয়ে পরাঙ্মুখ হয় না। এই রূপ উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের সঙ্গে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীস্থ বর্ব্বরেরও বিস্তর প্রভেদ আছে। নিম্নতম বর্ব্বর উলঙ্গদেহ, মৃগজীবী ও গুহাশায়ী হইলেও অগ্নি ও অস্ত্রের ব্যবহার জানে এবং অন্য জন্তুর বশীকরণে সক্ষম। ঈশ্বরতত্ত্ব তাহার মনে স্থান প্রাপ্ত না হউক, সে অদৃশ্য ভূত, প্রেতও দৈত্য দানবের ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু ঈদৃশ বর্ব্বরের সঙ্গে সভ্যতার চূড়ামণি-স্বরূপ ইংরাজের তুলনা করিয়া দেখ এতদুভয়ে কত প্রভেদ বুঝিতে পারিবে; এবং সেই প্রভেদ বানর ও বর্ব্বরের মধ্যে যে প্রভেদ আছে. তদপেক্ষা অধিক, কি অল্প. কি সমান, তাহারও মীমাংসা করিতে সক্ষম হইবে।

আমরা নিকৃষ্ট জাতির মধ্য হইতে

একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাহা অনুধাবন করিলে, বানর ও নরের প্রভেদ দর্শনে বিস্মিত হইবার তত কারণ থাকিবে না। প্রকৃতিতত্ত্ববিদেরা পিপীলিকা ও ককস নামক কীটকে এক জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। স্ত্রীককস শৈশবাবস্থায় শুণ্ড দ্বারা একটা ক্ষুদ্র বৃক্ষে সম্মিলিত হয় ও তাহার রস নিঃসারণপূর্ব্বক পান করিতে থাকে। তার পর ডিম্ব প্রসব করে; কিন্তু সে স্থান হইতে নড়িয়া কখন অন্যত্র যাইতে পারে না। ককস জাতির জীবন এইরূপে অতিবাহিত হয়। এখন পিলীকার জীবনচরিত বর্ণন করা যাউক। পিপীলিকারা পরস্পকে খপরাখপর জানাইয়া থাকে, কোন একটি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অথবা কোন প্রকার ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত অনেকে একত্র সমবেত হয়। তাহারা আবাসের জন্য প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করে, গৃহ মার্জ্জন করে, এবং রাত্রিতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখে। তাহারা রাস্তা প্রস্তুত করে, এবং সময়ে সময়ে নদীর নিম্নে সুড়ঙ্গ (Tunnel.) নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। তাহারা স্বদলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং যখন এমন কোন বৃহদাকার খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করে, যে তাহা দ্বার দিয়া প্রবেশিত হইতে পারে না, তখন দ্বার ভগ্ন করিয়া উহা আবার নির্ম্মাণ করিয়া লয়। পিপীলিকারা রীতিমত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয় এবং সমাজের হিতার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হয়। তাহারা বন্দীগণ ধরিয়া আনে। তাহারা নিয়মপূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করে এবং আপনাদের ডিম্বগুলি গৃহের মধ্যে শুষ্ক ও গরমস্থানে রাখিয়া দেয়, কারণ তাহা হইলে ডিম্বগুলি শীঘ্র স্ফুটিত হইবেক। ইত্যাদি কার্য্যপরম্পরাতে পিপীলিকার জীবন অতিবাহিত হয়। এখন দেখ ককস ও পিপীলিকায় কত প্রভেদ। এই প্রভেদ, কি বানর ও নরের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তদপেক্ষা অল্প না অধিক? অতএব এখন কুসংস্কারবর্জ্জিতচিত্ত মাত্রেই এরূপ প্রতীতি হইবেক যে, প্রভেদ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, উহা কেবল জাতীয় উৎকর্ষ ও নিকর্ষের নিয়ামক হইতে পারে; উৎপত্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রণালীর প্রতিপোষক হইতে পারে না। পৃথক সৃষ্টিবাদীরা একথা বলিতে পারেন যে, "ডারউয়িন স্বমতের সমর্থনার্থ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। তিনি যদি অতীতের ইতিহাস বা বর্ত্তমানের পরীক্ষা দ্বারা এরূপ দেখাইতে পারিতেন যে এক জাতি অন্য জাতি হইতে উদ্ভূত হইতেছে কিম্বা হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতাম, নতুবা শুদ্ধ সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া একটী চিরন্তন মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি" এই আপত্তিকারীদিগকে ডারউয়িন সাহেব বলিতে পারেন "আপনারা যে বলেন যে জাতি সকল পৃথক্ পৃথক্

সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইতে পারেন। আপনারা অন্যকে প্রমাণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন কিন্তু নিজের বেলা কোন প্রমাণের আবশ্যকতা বিবেচনা করেন না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা। আপনাদের মত চিরন্তন বলিয়া গ্রাহ্য; আর আমাদের মত আধুনিক বলিয়া অগ্রাহ্য, এরূপ তর্ক চলিতে পারে না। জ্যোতিঃশাস্ত্রে টলেমির মত পুরাতন, আর কোপার্নিকসের মত নূতন। তবে কেন টলেমির মত পরিত্যক্ত ও কোপার্নিকসের মত সর্ব্বত্র সমাদৃত হইল? পরন্তু সুধীবর হম্‌বোল্ট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভূমণ্ডলে ৩২০,০০০ জাতীয় জীব ও ২,০০০, ০০০ জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে। এই সকল বর্ত্তমান জাতিতে যদি বিলুপ্ত জাতি সমূহ যোগ করা যায়, তাহা হইলে উদ্ভিদেও জীবে সর্ব্ব শুদ্ধ অনূ্যন এক কোটী জাতি হইয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, দুই পক্ষের কোন্ পক্ষ অধিক সম্ভবপর। সৃষ্টিকর্ত্তা এক কোটী বার পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, না জাতিপরম্পরা নিকৃষ্টতর জাতি হইতে পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে? দৃষ্টান্ত কি বলিয়া দিতেছেনা যে বর্ত্তমানেও এক জাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী উৎপন্ন হইতেছে?

এই সকল শ্রেণী যে কালে পৃথক্ পৃথক্ জাতিরূপে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে? পরন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্বত্র সম্ভব নহে, সর্ব্বত্র অভ্রান্তও নহে। জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ লব্ধ হয় না, বরং অনেক স্থলে প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ ও আপাততঃ অসম্ভব বিষয় সকল নিঃসংশয় রূপে সমর্থিত ও পরিণামে সর্ব্বত্র পরিগৃহিত হইতে দেখা যায়। যাহা যুক্তি ও অনুমানে পাওয়া যায় এবং যাহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ নহে, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য ও অবলম্বনীয়। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ক্রমপ্রাদুর্ভাববাদের অনুকূল যুক্তি আছে কি না এবং তাহা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ কি না? কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সপ্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, এই মতের অনুকূলে অনেক যুক্তি আছে এবং ইহা অদ্যাপি পরিজ্ঞাত তাবৎ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী। তবে ইহার গ্রহণ বিষয়ে এত সঙ্কোচ ও সংশয় কেন? এখন প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, তিনি যে জাতির পৃথক্ সৃষ্টি মানেন তাহা কিরূপ এবং প্রথমসৃষ্ট জীবগণের পৃথিবীতে আবির্ভাবই বা কি প্রকারে হইল? তাহারা কি আশ্‌মান হইতে পতিত হইল, না ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইল? অথবা বাইবলের মতানুসারে বিধাতা পৃথিবী হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক কুম্ভকারের ন্যায় এক একটী জীব গড়িলেন? যদি এই সকল প্রকারে সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব হয়, তবে কোন্ প্রণালীতে সম্ভব, তাহা পৃথক্‌সৃষ্টিবাদীকে বলিয়া দিতে হইবেক। কিন্তু আমরা অনুমান করি, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁহার নিজেরই

কোনরূপ নিশ্চয় জ্ঞান নাই; থাকাও অসম্ভব।”

আমরা এই প্রস্তাবের আয়তন আর বৃদ্ধি করিব না। কিন্তু উপসংহারে সাধারণের একটী কুসংস্কার দূর করা উচিত বোধ হইতেছে। ডারউয়িন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন না, যে বানর হইতেই নরের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে জাতিপম্পরার মধ্যে বানরের সহিত নরের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। হয়ত বানর হইতে অন্য কোন উৎকৃষ্টতর জন্তু উদ্ভূত হইয়া মানবের উৎপাদন পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অসম্ভব না হইলেও ইহার কোন নিদর্শন অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক আর পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক বানর হইতে নরের যে উদ্ভব, তাহা ডারউয়িনের ধ্রুবজ্ঞান। বানরের সঙ্গে যে নরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা প্রাচীন ভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল না। নর শব্দ হইতে বানর শব্দের উৎপত্তি এবং বানর শব্দের অর্থ যে নরসদৃশ, তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বানরকে হেয় জ্ঞান করিতেন না। তাহা হইলে রামায়ণকবি ইন্দ্রাদিদেবের বানরাবতার, বানরজাতির তত বলবিক্রম এবং রামচন্দ্রসভায় তাহাদের তত সমাদর বর্ণন করিয়া ভারতবাসীর নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিতেন না। মনুষ্যের জাত্যভিমান বড়ই প্রবল; তন্নিমিত্ত তিনি প্রাচীন কালে আপনাকে দেব-অংশে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণন করিতেন এবং অধুনাও নিকৃষ্ট জাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হন। সাধারণ লোকে এরূপ করে করুক, কিন্তু ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে যে প্রকৃতিতত্ত্ববিদেরা মানব ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর আকার প্রকার স্বভাবাদি অবগত হইয়াও এরূপ অভিমানের ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইবেন। যাহা হউক যেদিন তাঁহাদের মন হইতে এরূপঅভিমান ও কুসংস্কার তিরোহিত হইবেক, সে দিন বড় দূরবর্ত্তী নহে।

# জৈনধর্ম্ম

ভারতবর্ষবিষয়ক অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের ন্যায় জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি, প্রাচুর্ভাব ও বিস্তৃতি প্রভৃতিও গাঢ়তমসাচ্ছন্ন। অন্যান্য নানাবিধ দর্শন ও ধর্ম্মপ্রণালীর ন্যায় জৈনধর্ম্মবিষয়েও বহুসংখ্যক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থসমূহের কোন অংশেই জৈনধর্ম্মের পুরাবৃত্তাদির বিষয় লিপিবদ্ধ হয় নাই, আর রচনাগুলির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও কোন ঐতিহাসিক রহস্যের আনুমানিক উন্মেষ হইতে পারে না। তবে কেবল এইমাত্র বুঝিতে পারা যায়, যে আর্য্যদিগের দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত যাবতীয়প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী অধুনা প্রচলিত আছে, জৈনদিগের ধর্ম্মপ্রণালী তৎসমুদয় অপেক্ষাই অধস্তন। জৈনগ্রন্থসমূহে যে সকল ধর্ম্ম ও দর্শনের বিষয় উল্লিখিত আছে, এবং মূলসূত্রাদির প্রতিবাদ করা হইয়াছে, আর জৈনমহাপুরুষদিগের নাম ও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশে উপাসকেরা যে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ, মন্দির, স্তূপ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে উপরিউল্লিখিত সিদ্ধান্তের নিঃসন্দেহরূপ প্রতীতি হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন জৈনদিগের গ্রন্থাদিপাঠে উঁহাদের উৎপত্তিকাল ও প্রাচীনত্বাদির বিষয়ে আর কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় না। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ব পণ্ডিত এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, পার্শ্বনাথই জৈনধর্ম্মের প্রকৃত উদ্ভাবয়িতা, কারণ পার্শ্বনাথের জীবনবৃত্তবিষয়ে যে সকল উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয়ে রচিত ইতিহাসাদি অপেক্ষা অনেকাংশে সম্ভবপর। এই মত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে খৃষ্টের অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্ব্বে জৈনধর্ম্মের প্রথম সমুদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু অধুনাতন কাল হইতে প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে এই ধর্ম্মের প্রথম সমুদ্ভব হইয়াছিল ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য কিছুমাত্র অনুকূল তর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না, পক্ষান্তরে এই বিষয় উপলক্ষে যাহা কিছু ব্যতিরেকী ও পারম্পরিক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দর্শনে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করাই প্রশস্যতর বলিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হৃদয়ে নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকে।

কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, যৎকালে মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার দিগ্‌বিজয়প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, অথবা যৎকালে গ্রীসদেশীয় মেগাস্থিনিব চন্দ্র-

গুপ্তের সভায় দূতস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেও জৈনধর্ম্মের প্রথম সম্ভুব হইয়াছিল, কারণ আলেক্‌জাণ্ডার ও তাঁহার অব্যবহিত অধস্তন, পুরুষদিগের সমসাময়িক ইতিহাস-রচয়িতৃগণ নিজ নিজ গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গবেষণা করিলে অবশ্যই প্রতীতি হইবে,যে তদানীন্তন কালের গ্রন্থকর্ত্তারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর একপ্রকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই জৈন বলিয়া একটী স্বতন্ত্র উপাসকসম্পদায়ের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মণব্যতীত অপর যে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা বৌদ্ধ, জৈন, কি অন্য কোন প্রকার সম্পদায় অভিপ্রেত, ইহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত কিছুমাত্র বিনিগমনা দেখিতে পাওয়া যায় না। তদানীন্তন গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতেরা যে ব্রাহ্মণভিন্ন অপর এক প্রকার ধর্ম্মাবলম্বীর উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে, যে সেটী তাঁহাদের ভ্রান্তিবিলসিত মাত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের বেদবিহিত আচারাদির বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। বেদের শাসন অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষা, যথাক্রমে এই চারি প্রকার আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হয়। আলেক্‌জাণ্ডারের সমসাময়িক ও তাঁহার অব্যবহিত অধস্তন পূর্ব্বপুরুষেরা এই বিষয়টী অবগত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহারা বনবাসী অথবা সংসারবিরাগী ভিক্ষু ব্রাহ্মণদিগকে অবলোকন করিয়া স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব তাঁহাদের উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত সম্প্রদায় বলিতে প্রকৃত-প্রস্তাবে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কোনক্রমেই শ্রেয়ঃকল্প হইতে পারে না। আর যদিই বা ব্রাহ্মণ-ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় তৎকালে বিদ্যমান ছিল ইহাই যথার্থ হয়, তাহা হইলেও সেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের উপাসকদিগকে বৌদ্ধ বা জৈন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। কারণ তৎকালে শ্রমণ নামে যে একপ্রকার সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, সেই সম্প্রদায়ের উপাসকেরা যে জৈনভিন্ন আর কোন প্রকার ধর্ম্মের উপাসক ছিল না ইহা কিছুতেই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। ফলতঃ সংস্কৃতভাষায় শ্রমণ শব্দের যেরূপ অর্থ, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, শ্রমণ শব্দে বৌদ্ধ, জৈন, বা ব্রাহ্মণ কোন প্রকার বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাসকদিগকে বুঝাইতে পারে না, ফলতঃ কতিপয় বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত বনবাসী বা ভিক্ষুকমাত্রকেই শ্রমণশব্দে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আবার কোন কোন পণ্ডিতদিগের মতে শ্রমণশব্দের অর্থে শূদ্রজাতীয় সন্ন্যাসীদিগকে বুঝায়। অতএব যে কোন পক্ষ অবলম্বন করা যা-

উক না কেন, শ্রমণ শব্দে যে জৈনদিগকেই বুঝাইতেছে, এরূপ কখনই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, উল্লিখিত সময়ে প্রমাণী নামে যে এক প্রকার সম্প্রদায়ের কথা লিখিত আছে, জৈনধর্ম্মাবলম্বীরাই উক্ত শব্দের প্রকৃত প্রতিপাদ্য। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে এই শব্দে কেবল জৈনদিগকে বুঝাইতেছে এরূপ নির্দ্দেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রমাণী অর্থাৎ প্রমাণবাদীরা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের ন্যায় বেদের প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রকার সম্প্রদায়ের লোকেরাও বেদ বিষয়ে ইহাঁদের অনুকরণ করিয়াছেন। আবার "প্রমাণী" এই শব্দের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও প্রতীতি হইবে যে, বৌদ্ধ বা জৈনেরা এই শব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না, কারণ প্রমাণবাদীরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত প্রমাণান্তর স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের উপাসকেরা নানাবিধ আখ্যায়িকোক্ত সিদ্ধপুরুষাদির অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, সুতরাং জৈনদিগকে কি প্রকারে প্রমাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে?

যাবতীয় জৈনগ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্ম্মই এক মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের গৌতম বা বুদ্ধ, জৈনদিগের বর্দ্ধমানের শিষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বৌদ্ধ গৌতম ও জৈন মহাবীর উভয়েই এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, খৃষ্টের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ গৌতম দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, আবার এই সময়েই জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা মহাবীরও মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এতাবতা এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে, গৌতম ও মহাবীর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, তবে এইমাত্র বোধ হয় যে জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা মহাবীর বৌদ্ধগ্রন্থাদি হইতেই নিজ প্রস্তাবিত ধর্ম্মের মূলসূত্র সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ভাগবতপুরাণোক্ত ঋষভ নামক মহাপুরুষের আখ্যায়িকা হইতেও জৈনধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভাগবতোল্লিখিত ঋষভ কখনই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু জৈনদিগের মহাপুরুষ ঋষভ স্বধর্ম্মপরিত্যাগী ছিলেন বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে। আর যদিও ভাগবতোক্ত ঋষভকে জৈনঋষভের সহিত অভিন্নব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জৈনধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সংস্থাপন পক্ষে কিছুমাত্র সুবিধা হইতে পারে না, কারণ কি ইউরোপীয়, কি এতদ্দেশীয়, অনেক পণ্ডিতই ভাগবতের ঈদৃশ প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অনেকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যে ভাগবতপুরাণ অধুনাতন কাল হইতে দ্বাদশ শতাব্দ অপেক্ষা অধিক ঊর্দ্ধতন পদার্থ নহে। শঙ্করাচার্য্যের রচিত

বেদান্তভাষ্য প্রভৃতি পাঠ করিলেও ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, যে জৈন ধর্ম্ম দশ কি দ্বাদশ শতাব্দ অপেক্ষা অধিক দিনের পদার্থ হইবে না।

উপরি উক্ত যুক্তিপরম্পারার উপর নির্ভর করিয়া এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, যে জৈনধর্ম্ম অধুনাতন কালের দশ বা দ্বাদশ শতাব্দ পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, আর জৈনদিগের ধর্ম্ম যে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন নহে, তাহাও নানা কারণে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। সেকেন্দ্রা নগরীর অধিবাসী ক্লেমেন্স স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসকেরা ভারতবর্ষে বাস করিতেন, কিন্তু তিনি কুত্রাপি জৈনধর্ম্মাবলম্বীদিগের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তৎকালরচিত অনেকানেক হিন্দুধর্ম্মঘটিত গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল গ্রন্থে জৈনদিগের নামগন্ধ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার ইহার অধস্তন সময়ে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির কঠোর প্রতিবাদে উদ্বেজিত হইয়া যখন বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহল, পূর্ব্বউপদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, যখন বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্নমাত্র ভারতের কুত্রাপি বিদ্যমান ছিলনা, তৎকালে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী গ্রন্থকারেরা বৌদ্ধশব্দের অর্থে জৈনধর্ম্মের উপাসকদিগকেই গ্রহণ করিতেন, কিন্তু প্রাচীনতর কালের হিন্দু গ্রন্থকারগণ কখনই এতাদৃশ ভ্রম বা প্রমাদে পতিত হয়েন নাই, তাঁহাদিগের প্রযুক্ত বৌদ্ধ শব্দে প্রকৃত বৌদ্ধদিগকেই বুঝিতে হইবে। ফলে তাঁহাদের সময়ে যদি জৈনধর্ম্মের প্রচার থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই জৈনদিগের নামোল্লেখ করিতেন সন্দেহ নাই।

জৈনদিগের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলেও উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন হইবে। অধুনাতন কাল হইতে গণনা করিয়া দ্বাদশ শতাব্দের অপেক্ষা উর্দ্ধতন একখানিও জৈনগ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয় না, পক্ষান্তরে জৈনধর্ম্মের যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ এখন হইতে দ্বাদশ শতাব্দ পূর্ব্বেই বিরচিত হইয়াছিল। মেদিনীকোষের রচয়িতা হেমচন্দ্র জৈনদিগের মধ্যে এক জন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার, ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যপ্রচলিত জৈনপুরাণসমূহের সংগ্রহকার, নবম শতাব্দে উক্ত সংগ্রহ ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কল্পসূত্রনামক গ্রন্থ মহাবীরের মৃত্যুর নয়শত অশীতি বৎসর পরে অর্থাৎ এখন হইতে পঞ্চদশশতবৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্তর্বীণ প্রমাণসমূহের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে, যে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, ফলতঃ অধুনাতন প্রত্নগবেষণার উপর নির্ভর করিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কল্পসূত্র খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দ অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন পদার্থ হইতে পারে না। আবার অনেকানেক জৈন-

ধর্ম্মাবলম্বী প্রধান প্রধান গ্রন্থকার ধারানগরীর অধীশ্বর মুঞ্জ ও ভোজ নৃপতিদ্বয়ের সমসাময়িক ছিলেন, আর ইহাঁরা যথাক্রমে খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আবার আকবর বাদসাহের সময়েও বহুসংখ্যক জৈনগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, ইহারও বহুল প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোন্ সময়ে এই ধর্ম্ম উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঙ্গার উভয় তীরে লব্ধপ্রসর হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। বাঙ্গালা অঞ্চলে কোন কালে ইহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল কিনা বিলক্ষণ সন্দেহ স্থল। বিহার ও বারাণসী এই উভয় প্রদেশেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সম্ভব ও সমধিক প্রচার হইয়াছিল, জৈনদিগের গ্রন্থ ও স্তূপাদিদর্শনে ইহাই সম্যক্ প্রতীতি জন্মে। বর্দ্ধমান, বিহারের অন্তর্গত কোন স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, আর বারাণসী পার্শ্বনাথের জন্মভূমি। কিন্তু যাবতীয় জৈন মন্দির ও স্তূপ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালের নির্ম্মিত, সুতরাং ইহাদের সাহায্যে শেষ তীর্থঙ্করের সময় ও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কালের বিবরণ কিছুমাত্র অনুমান করিতে পারা যায় না, বারাণসীর রাজগণ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন, কিন্তু এই সময়ে কান্যকুব্জ ও দিল্লী উভয় প্রদেশের রাজারাই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের উপাসক ছিলেন, ইহা চন্দ্রকবি প্রভৃতির গ্রন্থাদি দর্শনে সপ্রমাণ করিতে পারা যায়। এই সকল প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে অবাধে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে জৈনেরা ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচারবিষয়ে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্য এই উভয় প্রদেশেই জৈন ধর্ম্মের প্রবল প্রচার হইয়াছিল ইহাই শ্রদ্ধেয় কথা।

মারওয়ারের পশ্চিমাংশ ও সমগ্র চালুক্য প্রদেশের রাজগণ জৈন ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। কিন্তু এখন হইতে অধিক প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল কিনা তাহা নির্ণয় করিবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব উপরিলিখিত রাজগণ যে জৈনধর্ম্মের উপাসক হইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েরই ঘটনা বলিতে হইবে। মুসলমান ইতিহাসরচয়িতাদিগের মতে গুজরাটরাজ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আর মেদিনীকার হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে তিনি যৎকালে জৈনধর্ম্ম প্রচারার্থ গুজরাটে বাস করেন, সেই সময়ে তাঁহারই চেষ্টায় গুজরাট রাজকুমারপাল স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। এবং এই ঘটনার ফলস্বরূপ অদ্যাপি মারওয়ার, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে জৈনধর্ম্মের অশেষবিধ চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কথিত আছে জৈনেরা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে, বৌদ্ধদিগের উচ্ছেদের অব্যবহিত পরেই করমণ্ডল উপকূলে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিল। এই সময়ে অমোঘবর্ষ নামক নৃপতি তুণ্ড-মণ্ডলনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। করমণ্ডল উপকূলের আরও দক্ষিণে মধুরা নগরীতে কোন্ সময়ে জৈনধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়, তাহার নির্ণয় নাই, কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে তথায় জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব প্রবল হইয়াছিল ইহার সমূহ প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দের পরে উক্ত প্রদেশে জৈনধর্ম্মের বিলোপ হইতে আরম্ভ হয়, এবং মহীশূর ও অন্যান্য স্থানের রাজগণ জৈনধর্ম্মের পতাকা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেহ বা জৈন, কেহ বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন করেন। ইহার পর কেবল বিজয়নগর ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় দক্ষিণাত্য রাজধানীতে জৈনধর্ম্মের লোপাপত্তি হইয়া উঠে।

উপরে ঐতিহাসিক ও কিম্বদন্তীমূলক যুক্তিপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইল, তৎসমুদয় অধুনা বিদ্যমান মন্দির স্তূপ প্রভৃতির উপরি খোদিত লিপিদ্বারাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে এইরূপ বহুসংখ্যক কীর্ত্তিস্তম্ভাদি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, এই গুলির মধ্যে একটীও নবম শতাব্দ অপেক্ষা অধিক দিনের গঠিত নহে। কেবল একটীমাত্র স্থানে উপরিউল্লিখিত সাধারণ সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণাবর্ত্তের অন্তঃপাতী বেলিগোলা নগরে একখানি প্রস্তরখোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ অনেকে কহিয়া থাকেন। উক্ত লিপির বিষয় যতদূর শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় যে, কলিযুগের ঠিক ৬০০ বৎসর অতীত হইলে, অর্থাৎ বর্দ্ধমানের মৃত্যুর তিন শত বৎসরের পরে চামুণ্ডরায় নামে এক জন জৈন রাজা গোমতীশ্বরকে কিঞ্চিৎ ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই প্রস্তরলিপিখানি চামুণ্ডরায় প্রদত্ত দানপত্রের প্রতিকৃতি স্বরূপ। যদি এইরূপ একখানি প্রস্তর যথার্থই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহাতে উল্লিখিত ঘটনা খৃষ্টের প্রায় ৫০ অথবা ৬০ বৎসরের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ওরূপ এক খানি লিপি বিদ্যমান আছে কিনা বিলক্ষণ সন্দেহস্থল। যদি উল্লিখিত প্রকার কোন এক খানি লিপি যথার্থই বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে উহা অবশ্যই কোন না কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া সাধারণের নিকট আবিষ্কৃত হইত, অতএব প্রস্তাবিত লিপির বিষয়ে যাহা কিছু জানা আছে, তাহা তত্রত্য প্রধান পুরোহিতদিগের সুবুদ্ধিবিলসিত ও কল্পনাসম্ভূত বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে। আর লিপিখানি যদিই অন্বর্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উহার সহিত সমানার্থক আর দুই একখানি লিপি উহার

সহিত একত্র বিদ্যমান থাকা সম্ভব, ইত্যাকার সন্দেহের কোন প্রকারেই নিরাকরণ হইতে পারে না।

মেকিঞ্জিসাহেব জৈনধর্ম্মঘটিত বহু-সংখ্যক খোদিত লিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মেকেঞ্জিকৃত সংগ্রহের মধ্যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের শেষ ভাগ অপেক্ষা অধিক পূর্ব্বের একখানিও লিপি দেখিতে পাওয়া যায় না। মহীশূরের অন্তর্গত হোমচী নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাণী কর্ত্তৃক প্রদত্ত লিপিই এই সমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই লিপিও উল্লিখিত সময় অপেক্ষা অধিক পূর্ব্বের নহে। বল্লালবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত কয়েকখানি লিপি ও মেকিঞ্জিসাহেব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একখানিও একাদশ শতাব্দের ঊর্দ্ধতন নহে। সকলগুলিই একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রদত্ত। উক্ত সংগ্রহের মধ্যে এতদ্ব্যতীত আর যতগুলি খোদিত অনুশাসনলিপি বা দানপত্র প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমুদয়ই সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ও ঊনবিংশ শতাব্দের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন না কোন সময়ের পদার্থ, উহা অপেক্ষা ঊর্দ্ধতন নহে।

উপরি উল্লিখিত প্রমাণাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অপরিহার্য্যরূপে প্রতীতি হইবে যে, জৈনধর্ম্ম বিষয়ে যাবতীয় শ্রদ্ধেয় প্রমাণ পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের সাহায্যে কেবল এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধাদি ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক পদার্থ। জৈনেরা খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দে সর্ব্বপ্রথম ভারতের নানাস্থানে লব্ধপ্রসর হইয়া উঠে। যৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল প্রতাপ ছিল, তখন জৈনদিগের সম্প্রদায়, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটী শাখাস্বরূপ ছিল, পরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধন হইলে জৈনেরা ক্রমশঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ বিষয়ে শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দুসম্প্রদায় যেরূপ অবিরত চেষ্টা করে, জৈনসম্প্রদায় ও তদনুরূপ অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এই বিষয় প্রসঙ্গে যে সকল কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও আমাদিগের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন হইবে। কাঞ্চীনগরীতে যে সকল বৌদ্ধ বাস করিত, অকলঙ্কনামক এক জন জৈন-পুরোহিত তাহাদিগের সহিত এরূপ বাদবিতণ্ডা করিয়াছিল, যে বৌদ্ধেরা অবিলম্বেই কাঞ্চী হইতে নির্ব্বাসিত হয়। মধুরারাজ বরপাণ্ড্য জৈনধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বৌদ্ধদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, যে বৌদ্ধেরা প্রাণভয়ে তথা হইতে পলায়ন করে। গুজরাটের রাজগণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জৈনধর্ম্মাবলম্বন করিয়া বৌদ্ধদিগের প্রতি নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করিতেন। ফলতঃ ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশের অধিবাসীরা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে তত্রত্য য়িহুদীদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, ভারতবর্ষবাসী

হিন্দু ও জৈনেরাও বৌদ্ধদিগের প্রতি সেইরূপ অত্যাচার করিয়াছিল! আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই উভয় কাণ্ডই প্রায় এক সময়েই সংঘটিত হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের মূলসূত্র এবং উহাদের শাস্ত্রবিহিত আচারাদির বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাই প্রতীতি হইবে, যে জৈনেরা বৌদ্ধধর্ম্মের সারোদ্ধার পূর্ব্বক উহাতে দুই চারিটী নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া একটী অভিনব ধর্ম্মের উদ্ভাবন করিয়াছে এবং এই জন্যই বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যে চিরবৈর দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হওয়াও মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এক গুরুর উভয় শিষ্যের মধ্যে পরস্পর মতভেদ হইলে কালক্রমে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ বুদ্ধি উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ ইহা এত-দূর প্রবল ও দুর্নিবার হইয়া উঠে যে উহাদের প্রত্যেকেই কোন বিধর্ম্মী শ-ক্রর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে। প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের বিষয়েও অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈনেরা এক ও অভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির উপাসনা করে, উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ থাকাতে ক্রমশঃ বি-দ্বেষবুদ্ধি, পরে শক্রতা উপস্থিত হয়, এবং হিন্দুরা বিধর্ম্মী বৌদ্ধদিগকে দমন করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া জৈনেরাও আপ-নাদিগের অভীষ্টসাধনোদ্দেশে হিন্দুদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, ও হিন্দুধর্ম্মের অনেকা-নেক আচার ব্যবহার আপনাদিগের ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট করে। জৈনেরা হিন্দু-দেবদেবীদিগকে ভক্তি করিয়া থাকে, বেদবিহিত আচারাদির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, জাতিভেদ স্বীকার করে, এবং ব্রাহ্মণদিগকেই পুরোহিত নিযুক্ত করা উচিত বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহারা কখনই ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য কোন জাতীয় লোকদিগকে পৌরো-হিত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে না, এতদ্ভিন্ন অ-নেক স্থলে জৈনেরা হিন্দুদেবদেবীদিগকে স্পষ্টাক্ষরে পূজা ও আরাধনা করিয়া থাকে। আবু নামক স্থানে যে কয়েক খানি জৈন প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে শিবকে স্তব ও আরাধনা করা হইয়াছে. আবার বিজয়নগরের রাজা বুক্ক-সিংহ কর্ত্তৃক প্রচারিত একখানি অনুশাসন পত্রে স্ফুটাক্ষরে লিখিত আছে. যে বৈষ্ণব ও জৈনদিগের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা কিছুমাত্র নাই। কোন কোন স্থানে জৈন ও রামানুজ বৈষ্ণবেরা সমবেত হইয়া এক মন্দিরে, একই দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে। আবার জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হ-ইলে তাহারা অবাধে পুনর্ব্বার হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এবং তাহাদিগের জাতি অনুসারে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রভৃতি জাতির মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের বিষয়ে কখনই এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। যাহারা এক বার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা শত শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারেনা। ফলতঃ বৌদ্ধদিগের সমাজে জাতিভেদের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু জৈনেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতীয় বলিয়া সাধারণ্যে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার পরই জৈনেরা জাতিভেদ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, নতুবা পূর্ব্বে জৈনধর্ম্মে প্রবেশ করিলে পর আর জাতিবিচার করিবার নিয়ম ছিল না, বৌদ্ধদিগের প্রভাবদলনার্থ হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইবার সময়েই জৈনেরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত দৃঢ়বদ্ধ মৈত্রী সংস্থাপনের উদ্দেশে জাতিভেদ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উপরে যাহা লিখিত হইল তদ্দ্বারা জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি বিস্তৃতি প্রভৃতির বিষয় যথাসম্ভব বুঝিতে পারা যাইবে, অতঃপর আমরা জৈনধর্ম্মের মূলসূত্র এবং জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা মহাবীর প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদিগের বিষয় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা কতিপয় নির্দ্দিষ্ট-গুণবিশিষ্ট সিদ্ধপুরুষদিগকে দেবতাবোধে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। নরপূজা জৈনধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। নরপূজাবিধি জৈনধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মেরও অঙ্গস্বরূপ বটে, কিন্তু এবিষয়ে জৈনেরা বৌদ্ধদিগের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। বৌদ্ধেরা শত সহস্র বুদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষের নামোল্লেখ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহারা সাত জন মাত্র এইরূপ পুরুষের আরাধনা করিয়া থাকে। কিন্তু জৈনেরা সর্ব্ব সমেত চব্বিশ জন সিদ্ধপুরুষকে দেবতাবোধে আরাধনা করে। ইহারা অনাদি অনন্ত কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান, তিন যুগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক যুগে চব্বিশটী করিয়া সর্ব্বসমেত ৭২টী সিদ্ধপুরুষের কল্পনা করিয়া থাকে। যাবতীয় জৈনমন্দিরে এই সকল সিদ্ধপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। সমুদয় সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে বর্ত্তমান যুগের ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ পুরুষই জৈনধর্ম্মাবলম্বীদিগের সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন। পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশ ও মহাবীর চতুর্ব্বিংশ সিদ্ধপুরুষ। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশের যাবতীয় জৈনমন্দিরে এই পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং জৈনেরা মহাসমারোহে উহাদিগকে পূজা করিয়া থাকে। যে সকল অলোকসাধারণ গুণের অধিকারী হইলে জৈনেরা কোন বিশেষ মনুষ্যকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে, তৎসমুদয় জৈনদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে সবিস্তরে বর্ণিত আছে। মহাপুরুষ জগৎপ্রভু, অর্থাৎ জগৎসংসারের অধীশ্বর; ক্ষীণকর্ম্মা অর্থাৎ ইহাঁর পক্ষে যাগহোমাদি বেদবিহিত কার্য্য অনাবশ্যক; মহাপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান

ত্রিকালের কোন পাদার্থই ইঁহার অবিদিত নাই। ইনি অধীশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্; দেবাদিদেব, অর্থাৎ সমুদয় দেবতা অপেক্ষা চিরজাত ও অধিকতর-পুণ্যশালী; এই সকল শব্দের প্রতিপাদ্য-গুণোপেত মহাপুরুষই সিদ্ধপুরুষ, জৈনেরা এইরূপ সিদ্ধপুরুষেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে। উপরি-উল্লিখিত কয়েক প্রকার ব্যতীত সিদ্ধপুরুষের আরও চারি প্রকার গুণ থাকা আবশ্যক। তিনি তীর্থঙ্কর, অর্থাৎ সংসারপারাবারের তরণিস্বরূপ; তিনি কেবলী, অর্থাৎ ভ্রমবিরহিত ও চিন্ময়; তিনি অর্হৎ, অর্থাৎ দেবতা ও মনুষ্যাদির পুজার্হ; তিনি জিন, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিবিরহিত আত্মেশ্বর ও সর্ব্বজয়ী। উল্লিখিত গুণ কয়েকটী সিদ্ধপুরুষ মাত্রেরই সাধারণ গুণ। এতদ্ভিন্ন জিন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সিদ্ধপুরুষের বহুসংখ্যক অনন্যসাধারণ গুণের উল্লেখ আছে। এই সকল বিশেষ গুণের নাম অতিশায় অর্থাৎ অলোকসাধারণ ও সর্ব্বলোকাতিগ গুণ, এই সকল অতিশায়ের মধ্যে কতকগুলি জিনের শরীরবিষয়ক। জিনের শরীর অসামান্য রূপলাবণ্যের আধার; শরীরের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর মনোহর সৌরভ বিকীর্ণ হইতেছে; তাঁহার রক্ত শ্বেতবর্ণ, সুতরাং তাঁহার শরীরের বর্ণও শুভ্র; তাঁহার কেশপাশ আকুঞ্চিত; কেশপাশ, শ্মশ্রু, নখ প্রভৃতির বৃদ্ধি নাই; তাঁহার শরীরে ক্ষুৎ পিপাসা, রোগশোক, পরিতাপ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি কোন প্রকার মানুষিক পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয় না। তিনি ইচ্ছা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যেই শতসহস্র মনুষ্য, দেবতা, ও অন্যান্য জীবজন্তু একত্র করিয়া অল্পমাত্র স্থানের মধ্যে উহাদিগকে সমাবেশ করিতে পারেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর বহুদূর হইতে শ্রবণ করিতে পারা যায়; তাঁহার অর্দ্ধমাগধী ভাষা সমুদয় জীবজন্তুর বুদ্ধিগোচর, প্রাণিমাত্রই তাঁহার কথাবার্ত্তার ভাবগ্রহ করিতে পারে। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় একপ্রকার সমুজ্জ্বল আলোক চিরপ্রদীপ্ত করিয়া দিগ্দিগন্ত আলোকপূর্ণ করে। তিনি যে স্থান দিয়া বিচরণ করেন; তাহার চতুর্দ্দিকে শতসহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত রোগ শোক যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি চির কালের জন্য তিরোহিত হয়। জৈনদিগের প্রথম জিনের নাম ঋষভদেব, ও শেষের নাম মহাবীর। ঋষভদেব, পার্শ্বনাথ, মহাবীর প্রভৃতি উপরিউক্ত গুণসমূহের অধিকারী ছিলেন মনে করিয়া জৈনেরা ইহাঁদিগকে মহাপুরুষ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই মহাপুরুষদিগের মধ্যে কয় জন প্রকৃতপ্রস্তাবে বিদ্যমান ছিলেন, আর কয় জন জৈনগ্রন্থকার ও পুরোহিতদিগের কপোলকল্পিত আকাশকুসুমমাত্র তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কোন প্রকার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পার্শ্বনাথ ও মহাবীর এই দুই জন ব্যতীত অন্যান্য মহাপুরুষদিগের বিষয়ে যেরূপ অসম্বদ্ধ অলীক উপন্যাস সকল লিপিবদ্ধ আছে, তদ্দর্শনে সহজেই প্রতীতি হয়, যে

পার্শ্বনাথ ও মহাবীর এই দুই জনই কেবল প্রকৃতপ্রস্তাবে বিদ্যমান ছিলেন। অন্যান্য সকলগুলিই কোন না কোন জৈনসন্ন্যাসীর কল্পনালতার ফলস্বরূপ। কথিত আছে আদি জিন ঋষভদেব আট কোটি চারি লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং ইহাঁর দেহ ন্যূনাধিক এক ক্রোশ দীর্ঘ ছিল। প্রথম জিন সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁর পরে কালক্রমে সকলই অল্প হইতে আরম্ভ হয়, পরিশেষে শেষজিনেরা সামান্য মনুষ্যের আকারে পরিণত হয়েন, এবং ইহাঁদের জীবনকালও ৪০।৫০ বৎসরে পরিণত হয়। এই সকল উপাখ্যান হইতে সারোদ্ধার করিতে হইলে ইহাই প্রতীতি হয়, যে, পার্শ্বনাথ ও মহাবীর ইহাঁরাই দুই জন কেবল প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, অন্যান্য সকলগুলিই কবিকপোলকল্পিত। জৈনদিগের ন্যায় বৌদ্ধেরাও কহিয়া থাকেন যে, আদিমকালের বুদ্ধেরা সকল বিষয়েই সর্ব্বলোকাতিগ ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে শেষের বুদ্ধেরা ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া পড়েন। উভয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্যদর্শনে বোধ হইতেছে যে, জৈনেরা অন্যান্য নানা বিষয়ের ন্যায় এটীও বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। সিদ্ধপুরুষদিগের আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে তাঁহারা উপর্য্যুপরি অনেকবার জন্মপরিগ্রহ করিবার পর পরিশেষে কঠোর তপস্যা প্রভৃতির প্রভাবে তীর্থঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জৈনদিগের মতে পার্শ্বনাথ ও মহাবীর ইহাঁরা উভয়েই উল্লিখিতপ্রকারে তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন।

মহাবীর জৈনধর্ম্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তয়িতা। জৈনদিগের মতে ইনি অনেকবার জন্ম পরিগ্রহ করিবার পর অবশেষে সিদ্ধ হইয়া তীর্থঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মহাবীরচরিত নামক জৈনগ্রন্থে মহাবীরের বহু জন্মগ্রহণ প্রভৃতি জীবনবৃত্ত সবিস্তরে বর্ণিত আছে। জৈনমতে বিজয়দেশাধিপতি শত্রুদমন নামক রাজার রাজ্যের অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে মহাবীর সর্ব্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে তিনি ন্যায়সার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং নানাবিধ পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পর সৌধর্ম্ম স্বর্গরাজ্যে সংস্থাপিত হয়েন। উক্ত স্থানে সুখস্বচ্ছন্দে বহুকাল যাপন করিবার পর তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয়বারে তিনি প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পৌত্রস্বরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন, এবং মরীচি নামে অভিহিত হন। ইহার পর তিনি সংসারসুখতৎপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্রাহ্মণস্বরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। ইহার পর উপর্য্যুপরি কয়েক বার ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। এই সকল বারে কিংনামধেয় হইয়া কোন্ স্থানে তাঁহার উদ্ভব হয়, জৈনগ্রন্থে তাহার সবিশেষ উল্লেখ নাই। পরে রাজগৃহ নামক স্থানের রাজস্বরূপে মহাবীরের জন্ম হয়, এই জন্মে তিনি বিশ্বভূত নামে প্রথিত হয়েন। ইহার পর তিনি বসু

দেব ত্রিপিষ্টপরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই জন্মে তিনি হয়গ্রীব নামক তাঁহার একজন শত্রুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন এবং নরহত্যারূপ কঠিন পাপের প্রতিফল ভোগ করিবার নিমিত্ত ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েন। বহুকাল পরে নরক হইতে উদ্ধার পাইবার পর তিনি সিংহ-স্বরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন। এইরূপে নানা দেহ ধারণ করিবার পর তিনি পুনর্ব্বার মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হন। এইবারে মহাবিদেহ নামক প্রদেশে প্রিয়মিত্র চক্রবর্ত্তিরূপে তাঁহার জন্ম হয়। এই জন্মে তিনি পূর্ব্বের ক্লেশ স্মরণপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় রত হইয়া উহার ফলস্বরূপ স্বর্গবাস লাভ করেন। ইহার পর তিনি ভারতপ্রদেশের অধিরাজ জিত-শত্রুর আত্মজস্বরূপে পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া নন্দন নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। এই জন্মে তিনি ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং উহার ফলস্বরূপ এইবারে তিনি প্রেত্যভাবদুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সিদ্ধ হয়েন, এবং মহাবীর বা বর্দ্ধমান নামে জগতে অবতীর্ণ হইয়া তীর্থঙ্করত্ব লাভ করেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় সিদ্ধার্থ রাজার ঔরসে ও তাঁহার মহিষী ত্রিশালা দেবীর গর্ভে মহাবীরের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থ ভারত-ক্ষেত্রের অন্তর্গত পাবন নামক স্থানের অধীশ্বর ছিলেন। কথিত আছে, চৈত্র মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে মহাবীর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। মহাবীরের পিতা প্রথমে তাঁহার বর্দ্ধমান এই নাম রাখিয়াছিলেন, পরে পুত্র সর্ব্বশক্তির আধার বলিয়া তাঁহার মহাবীর এই নাম রাখেন। বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে মহাবীর জনক জননীর ইচ্ছানুসারে সমবীর নগরের অধিপতির দুহিতা যশোদার পাণিগ্রহণ করেন। যশোদার গর্ভে মহাবীরের প্রিয়দর্শনা নামে একটী কন্যা জন্মে। মহাবীরের অন্যতম শিষ্য কুমার জামলির সহিত প্রিয়দর্শনার বিবাহ হয়। মহাবীরের অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহারাজ সিদ্ধার্থ ও রাজমহিষী ত্রিশালা লোকান্তর গত হন। পিতা মাতার মৃত্যু হইলে মহাবীর সংসারের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নন্দবর্দ্ধন পিতার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পর মহাবীর দুই বৎসর কাল এক স্থানে থাকিয়াই কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন। দুই বৎসর এইরূপে অতীত হইলে পর তিনি নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশে দেশ ভ্রমণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং যে উপায়ে সর্ব্বজয় হইয়া চিরকাঙ্ক্ষিত জিন উপাধি লাভ করিতে পারেন অনবরত তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত মহাবীর নিয়তই দীর্ঘ উপবাসব্রত রক্ষা করিতেন এবং অন্যান্য অশেষবিধ কঠোর নিয়ম প্রতিপালনতৎপর হইয়া

কালাতিপাত করিতেন। কথিত আছে, তিনি উপবাসের সময় নয়নযুগল নাসাগ্রে নিহিত করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেন। পাছে এইরূপ তুষ্ণীম্ভাবের অবস্থায় কোন পার্থিব বা দৈব কারণে তাঁহার শারীরিক স্বচ্ছন্দের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায় দেবরাজ ইন্দ্র ইহাঁর শরীররক্ষা করিবার নিমিত্ত সিদ্ধার্থ নামক একজন যক্ষকে আদেশ করিয়াছিলেন। যক্ষও ইন্দ্রের আদেশানুসারে নিজের সহচরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিরন্তর অদৃশ্যভাবে তাঁহার আসনের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিত, এবং প্রয়োজন হইলে কাহারও সহিত কথা কহিতেও কুণ্ঠিত হইত না। রাজগৃহনামক প্রদেশের অন্তর্গত কোন গ্রামের গোশাল নামক একজন অধিবাসী সর্ব্বপ্রথম নিজধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবীরের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইল। এই ব্যক্তি মহাবীরের নিয়তসহচর ছিল, কিন্তু স্বভাব বিদূষকের ন্যায় চঞ্চল ছিল বলিয়া সে নিরন্তর সকলের সহিত বিবাদ ও কলহে প্রবৃত্ত হইত। এইরূপে বিদূষক গোশাল কোন সময়ে পার্শ্বনাথের শিষ্যদিগের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। পার্শ্বনাথের শিষ্যেরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত, কিন্তু মহাবীরের শিষ্যগণ দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গ থাকিত, এই জন্যই উভয় দলের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই ছয় বৎসর কাল মহাবীর বিহারের অন্তর্গত নানা স্থানে, এবং রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী প্রভৃতি অন্যান্য নানা প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বজ্রভূমি, শুদ্ধিভূমি, ও লাট এই কয়েকটী স্থানে উপস্থিত হয়েন, তত্রত্য ম্লেচ্ছজাতীয়েরা (ইহারা অধুনাতন গোন্দোয়ানা প্রদেশের অসভ্য অধিবাসী) তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নানাবিধ কটু কথাপ্রয়োগ ও তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করে। কিন্তু মহাবীর এই সকল অসভ্যজাতির নিষ্ঠুর অত্যাচারসমূহ অবাধে সহ্য করেন। কথিত আছে, তিনি অত্যাচারকারী অসভ্যদিগের প্রতি অণুমাত্র রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার মতে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করা শরীরীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু স্বহস্তে নিজ দেহের প্রতি প্রহারাদি অত্যাচার করা কোন মতেই বিধেয় নহে, কারণ "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বাক্যের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে হইলে অপরের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করা উচিত, নিজের শরীরের প্রতিও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য।' ইহার বিপরীতাচরণ করিলে প্রত্যবায় জন্মে। তবে উপবাস মৌনব্রত প্রভৃতি কঠোরাচার অবলম্বন করিলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। সংসার পরিত্যাগ করিবার নয় বৎসর পরে মহাবীর মৌনব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্য গোশালের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

গোশাল এই সুযোগে গুরুর নিকট কতক গুলি অলোকসাধারণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। ইহার পর উল্লিখিত অসভ্যদিগের বাসভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবীর শতানীক রাজার রাজধানী কৌশাম্বী নগরীতে উপনীত হইলেন। এই স্থানের অধিবাসীরা তাঁহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং অনেকে তৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মপথের অনুগামী হইল। এই স্থলে তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন এবং কঠোর তপস্যার বলে পরিশেষে সাংসারিক কর্ম্মসূত্র ছেদন করিয়া কেবলী অর্থাৎ চিন্ময় হইয়া উঠিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে, বৈশাখ মাসের শুক্লদশমীর দিবস মহাবীর ঋজুপালিকা নদীর উত্তরতীরস্থ কোন শালবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় হঠাৎ তাঁহার অন্তঃকরণে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার ও সমুদ্ভব হইল। দিব্যজ্ঞান লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক বিহারের অন্তর্গত অপাপপুরী নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইবার পর দেবনির্ম্মিত কোন উচ্চ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বহুসংখ্যক শিষ্য সংগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিবার প্রারম্ভে মহাবীর যেরূপে সংক্ষেপে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। "সংসার অপার সাগরের ন্যায় অসীম। বীজ যেরূপ বৃক্ষের আদি কারণ, সেইরূপ জীবকৃত পাপপুণ্যাদি কর্ম্মই সংসারের মূলীভূত কারণস্বরূপ। যে শরীরী জীবের বিবেকশক্তি নাই, সে কূপপতিত গুরুপদার্থের ন্যায় নিরন্তর অধোগামী হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহার বিবেকশক্তি আছে, যিনি কর্ম্মসমূহের ফলাফল বুঝিতে পারেন, তিনি গৃহনির্ম্মাতার ন্যায় ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইতে থাকেন। 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' অতএব কাহারও জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। নিজ জীবনের ন্যায় সর্ব্বভূতের জীবনের প্রতিও সদয়ব্যবহার করা শরীরী মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। সদা সত্য কথা কহিবে, মিথ্যাকথার তুল্য গুরুতর পাপ দ্বিতীয় নাই। পরের দ্রব্য অপহরণ করাতে জীবহত্যার ন্যায় পাপ জন্মে, কারণ সম্পত্তি মনুষ্যের বাহ্যজীবনস্বরূপ। স্ত্রীসহবাস করাতেও পাপ আছে, ইহা দ্বারা শরীর ও জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সংসারক্ষেত্রে আবদ্ধ হওয়া বিবেকী জীবের পক্ষে নিষিদ্ধ, কারণ তাহা হইলে মনুষ্য গুরুভারগ্রস্ত বলীবর্দ্দের ন্যায় পতিত হয়। তবে যাহারা সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিতে অসমর্থ, তাহাদের সর্ব্বদা সাবধান হইয়া কার্য্য করা উচিত, অন্যথা পাপস্পর্শ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"

মহাবীর উপরিউক্ত প্রকার শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হইয়া নিজ মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই

তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্ত পর্য্যন্ত ধাবিত হইল। এই সংবাদে মগধদেশীয় অনেকানেক বেদবিশারদ ব্রাহ্মণ তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিবার জন্য তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সকলেই তাঁহার নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া তৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে যে সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মণ জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন তাঁহারা সকলেই গণধর নামে বিখ্যাত হইয়া প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে জৈনধর্ম্ম প্রচারে দৃঢ়ব্রত হইলেন।

মহাবীরের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে কয়েক জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য ও প্রথিতযশা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে দুই চারি জনের বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে। মহাবীরের শিষ্যবর্গের মধ্যে ইন্দ্রভূতি বা গৌতম সর্ব্বপ্রধান। জৈনেরা এই ইন্দ্রভূতিকে বৌদ্ধ গৌতমের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু জৈনগৌতম ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া খ্যাত, আর বৌদ্ধ গৌতম ক্ষত্রিয় শুদ্ধোদন রাজার ঔরসে ও তাঁহার মহিষী মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ ও জৈনগৌতম এই উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদন করা কোন প্রকারে সম্ভবপর নহে। কথিত আছে ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি, ও বায়ুভূতি, ইহাঁরা তিন জনেই গৌতমগোত্রজ মগধনিবাসী বসুভূতি নামক ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা সকলেই "গৌতম" এই সাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। মহাবীরের আর দুই জন শিষ্যের নাম, ব্যক্ত ও সুধর্ম্ম, ইঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর দুই জনের নাম মণ্ডিত ও মৌর্য্যপুত্র। ইঁহারাও ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন, এক মাতার গর্ভে ও ভিন্ন ভিন্ন জনকের ঔরসে এই দুই ভ্রাতার জন্ম হয়। আর এক জন শিষ্যের নাম অকম্পিত, ইনি এক জন গৌতমগোত্রজ মৈথিল ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। মহাবীরের আর কয়েক জন শিষ্যের নাম অচলব্রত, মৈত্রেয়, ও প্রভাস, ইঁহারাও প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। এই একাদশ জন ব্রাহ্মণ মহাবীরের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গণাধার বা গনাধিপ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে ইহাদের প্রত্যেকেই বেদবিহিত আর্য্য ধর্ম্মের উপদেষ্টা ছিলেন। উপরি উল্লিখিত শিষ্যগণের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রথমতঃ মহাবীরের সহিত বিচার ও বিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরে বিচারে পরাজিত হইয়া নিজধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেন ইন্দ্রভূতির মনে সন্দেহ হইয়াছিল, যে জীবস্বরূপ পদার্থ স্বতন্ত্ররূপে জগতে বিদ্যমান আছে কি না? মহাবীর তাঁহাকে সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে পাপপুণ্যাদি কর্ম্মের আধারস্বরূপে জীবরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ অবশ্যই বিদ্যমান আছে,

নতুবা পাপপুণ্যাদি কর্ম্মের ফলভোগও সম্ভবে না। অগ্নিভূতিপ্রশ্ন করিলেন যে কর্ম্ম শব্দের অর্থ কি? কর্ম্মের বিদ্যমানতা অস্বীকার করিলে ক্ষতি কি? মহাবীর উত্তর করিলেন কর্ম্মের ফলস্বরূপ পাপ-পুণ্য পুনর্জন্ম প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, অতএব কর্ম্মের বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বায়ুভূতি পূর্ব্বপক্ষ করিলেন, জীব পদার্থকে দেহ হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি,? ইন্দ্রিয়াদিই ত জ্ঞানের আধার হইতে পারে। মহাবীর উত্তর করিলেন যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আধার হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের বিনাশ হইলেও কি প্রকারে ইন্দ্রিয়জন্য পদার্থের স্মরণ হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ভিন্ন স্বতন্ত্র জ্ঞানাধার অবশ্য স্বীকার্য্য। মণ্ডিত বন্ধ ও মোক্ষ এই উভয়ের স্বরূপ নির্ণয় বিষয়ে সন্দিহান হইয়া মহাবীরের নিকট ঐ বিষয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করেন, মহাবীর প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরপ্রদানপূর্ব্বক উহাঁর সন্দেহ নিরসন করেন। মৈত্রেয় পরলোকের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে মহাবীর পরিষ্কৃতরূপে পরলোকের অস্তিত্বের বিষয় উহাঁর হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। প্রভাস নির্ব্বাণের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করাতে মহাবীর তাঁহার সন্দেহভঞ্জন করিলেন। এইরূপে প্রত্যেকে একটী একটী বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া তাহার সদুত্তর পাওয়াতে ক্রমশঃ নিজধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক জৈন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং গুরুর নিকট অধিকতর জ্ঞানশিক্ষা করিবার পর প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে অভিনব ধর্ম্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

## প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অণুবীক্ষণ -স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা দ্বারা সম্পাদিত। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩।৵০। ইহার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে অবতরনিকা, চিকিৎসা, ভারতের অবনতি প্রভৃতি কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অবতরণিকায় ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী বাণিজ্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে, আমাদিগের সে সকলের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি নাই। ইংরাজী শিক্ষায় ও ইংরাজী বাণিজ্য প্রভৃতিতে আমাদিগের কিছু অনিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা যে আমাদিগের অধিকতর ইষ্ট সংসাধিত হয় নাই এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। যাহা হউক এরূপ একখানি পত্রিকা যে দীর্ঘজীবিনী হয়, ইহা আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

# কৌলীন্যমর্য্যাদা

আচার্য্য, ত্রিবেদী, ত্রিপাঠী, দশাশ্বমেধী, ভট্ট, উপাধ্যায়, মিশ্র প্রভৃতি উপাধিগুলি কৌলীন্যব্যঞ্জক।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ-সন্ততিগণ মধ্যে ঐ সকল উপাধির কয়েকটী দৃষ্ট হয়। যথা

ভট্টনারায়ণসন্তান বরাহ ও নীপে বাজপেয়ী উপাধি ছিল বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাজপেয়ী উপাধি গ্রহণ করেন।

এক্ষণেও ঐ বংশের যে ব্যক্তি রাজসিংহাসনে আসীন হন তিনি বাজপেয়ী রূপ পৈত্রিক সম্মান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সাবর্ণি গোত্রে শিশু গাঙ্গুলীর পিতার নাম কুলপতি (১)। আমরা বিবেচনা করি উহা তাঁহার উপাধি।

কাশ্যপ গোত্রে বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের পিতার উপাধি অধ্বর্য্য ছিল, তদনুসারে তাঁহাকে অধ্বর্য্য শীকর চট্টোপাধ্যায় কহা যায়।

বাৎস্য গোত্রে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের পিতার নাম নীলাম্বর আচার্য্য। উৎসাহো মুখোপাধ্যায়ের পিতার নাম কোলাহল বা কোলাই সন্ন্যাসী। ইহাঁর-উপাধি উপাধ্যায়।

বারেন্দ্রকুলেও এরূপ উপাধি দেখা যায়। যথা বারেন্দ্রকুলের সাবর্ণ গোত্রের আদি পুরুষ পরাশরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নারায়ণের উপাধি অগ্নিহোত্রী।

শাণ্ডিল্য গোত্রের নারায়ণ ভট্টের পুত্র আদি গাঁই নামক পুত্রের উপাধি ওঝা। ওঝা শব্দটী উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র।

কাশ্যপ গোত্রের আদিপুরুষ সুসেন হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ স্বর্ণরেখ ও ভবদেবের উপাধি ভট্ট। ইনি রাঢ়ী।

ভরদ্বাজ গোত্রের আদি পুরুষ গৌতম হইতে ৮ম পুরুষ পশুপতির উপাধি অগ্নিহোত্রী দেখা যায়।

বাৎস্য গোত্রের আদি পুরুষ ধরাধরের প্রপৌত্রের উপাধি চতুর্ব্বেদান্ত ও দামোদরের উপাধি ওঝা।

উপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র এই চারিটী উপাধি বল্লালদত্ত মর্য্যাদার মধ্যে এখনও দেখা যায়।

অধুনা মুখটী, বাড়ুরী ও গাঙ্গুলী উপাধ্যায় সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যথা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘোষাল, কুন্দ, পূতিতুণ্ড ও কাঞ্জিলাল ইহাদিগের মধ্যে ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র উপাধি শ্রবণ করা যায়।

বারেন্দ্রদিগের মধ্যে ভট্টাচার্য্য আচার্য্য ও মিশ্র (২) উপাধি আছে।

(১) মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ। অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ সবৈ কুলপতিঃস্মৃতঃ॥

(২) * পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে জানন্ মিশ্র উদাহৃতঃ। মিশ্রী।

উপাধ্যায় সংজ্ঞা দেখা যায়।

য়ম্ভুব মনুর সময় হইতেই উৎকৃষ্ট-জাতীয় সদ্গুণসম্পন্ন বরে অথবা সমান-জাতীয় গুণসম্পন্ন বরে কন্যাসম্প্রাদানের ব্যবস্থা দেখা যায়।

তৎকালে উৎকৃষ্টজাতীয় সদ্গুণশালী বর পাইলেই কন্যা সম্প্রদান করা হইত; কন্যার বয়ঃক্রমের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। সদ্গুণশালী বরের অপ্রাপ্তি স্থলে নির্গুণ বরে কদাচ কন্যাদানের ব্যবস্থা দেখা যায় না। * (৩)

এক্ষণে এ সকল ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য হয় না। কুলীনপুত্রই কুলীন। মেল ব-ন্ধনের পূর্ব্বে এইরূপ এক একটী নিদ্দিষ্ট উপাধি কুলগত ছিল না। তৎকালের উপাধিগুলি একব্যক্তিনিষ্ঠ ছিল। যথা

মুখটীবংশে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য। কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুন মিশ্র।—ঐ কুলে গঙ্গানন্দ-ভ্রাতৃপুত্র শিবের উপাধি আচার্য্য। ঐ কুলে যোগেশ্বরাদি পণ্ডিত, তৎপিতা হরিমিশ্র। বন্দ্যোকুলে ধ্রুবানন্দ মিশ্র, রামেশ্বর প্রভৃতি চক্রবর্ত্তী।

মুখ কুলের প্রথম কুলীন উৎসাহ পৈত্রিক উপাধি উপাধ্যায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন তাঁহাকেই আদি কারণ ধরিয়া সকল কু-লের আদান প্রদানের ব্যবস্থা নির্দ্ধার হয়।

দেবীবর যে সময়ে মেলবন্ধন করিয়া-ছিলেন, তৎকালেও গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যকে কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে মুখটীরা প্রকৃতি; অন্য বংশগুলি পাল্টী. সুতরাং গঙ্গানন্দাদির পূর্ব্বপুরুষের উপাধি উপাধ্যায়রূপ প্রকৃতিতে বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গুলী প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁদিগের সকলেরই উপাধি উপাধ্যায় হয়। সেই হেতু বশতঃ মুখটী, বন্দ্য, গাঙ্গুলী ও চাটুতি এই চারি বংশ উপাধ্যায় সংজ্ঞা যোগ পূর্ব্বক নিজ নিজ কুলমর্য্যাদার কী-র্ত্তন করেন। যথা

মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপা-ধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়।

অধুনা এই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া নবদ্বীপাধিপতিগণ আপনাদিগের বংশা-বলীর রায় (৪) উপাধি নিজ দৌহিত্রকুলেও সংক্রান্ত করেন। তদবধি নবদ্বীপাধিপতির বংশের দৌহিত্রগণ আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে বা পরে রায় সংজ্ঞা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত উপাধিগুলি নির্গুণ ব্যক্তিদিগের পক্ষেই বিশেষ শোভা পা-ইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন,

(৩) * উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায়চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্
যথাবিধি॥ দক্ষ

সদৃশায় সমানজাতীয়ায় কালাৎ প্রাগপি।
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায়
কর্হিচিৎ॥ মনু ৮৮। অ৯

(৪) * রৈ শব্দ স্থানে রায় আদেশ হয়। রৈ শব্দে ঐশ্বর্য্য বুঝায়। ঋক্‌বেদ ও মুগ্ধবোধ দেখ।

তাঁহারা সার্ব্বভৌম, তর্কালঙ্কার, চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আপনাদিগের পরিচয় দিতেন। যথা সুসেন, দুর্গাবর. যোগেশ্বর, কামদেব প্রভৃতি পণ্ডিত নামে খ্যাত। মধুসূদন তর্কালঙ্কার নামে খ্যাত। বিষ্ণু প্রভৃতি ঠাকুর নামে খ্যাত। চট্টোবংশে উদয় কুলবর, চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপাধিতে খ্যাত। অন্যান্য বংশেও এইরূপ।

—০:*:০—

## ফুলিয়ামেল।

মুখবংশই বন্দ্যাদির প্রকৃতি সুতরাং তাহাই অগ্রে লেখা গেল। মনোহর শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২৩শ পুরুষ (১৬৬ পৃঃ দেখ)। মনোহরের বংশাবলী যথা—মনোহরের পিতার নাম লক্ষ্মীধর।

মনোহর (২৩শ)

( সুসেনো জগদানন্দো গঙ্গানন্দো কুলে কৃতী। মিশ্রীগ্রন্থ।)

(২৪শ) সুসেন জগদানন্দ গঙ্গানন্দ। †

(২৫শ) শিবাচার্য্য ভবানী কানাই

(২৬শ) রামেশ্বর গোপীশ্বর রত্নেশ্বর

(২৭শ) হরিবংশ রঘুবংশ যজ্ঞেশ্বর রামদেব

(২৮শ) রমণ রাজবল্লভ। [উলায় নিবাস, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুদেব ও রামদেবের সহিত পাল্টী।

(২৫শ) কানাই ইহাঁকে ছোট্‌ঠাকুরও বলে। ইনি ঐ নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। * অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইহাঁর পাল্টী প্রকৃতি ভাব। হুগলীজিলার হরিপালে ইহাঁর বংশ আছে। রজনীকরী থাক।

(২৬শ) গোপেশ্বর ও রত্নেশ্বরের বংশাবলী রাঢ়দেশে বিরাজ করিতেছেন।

ফুলের মুখটী ভট্ট ২ ইনি মনোহ ত্র

রামাচার্য ইহার ছয়পুত্র

৬শ রাঘবেন্দ্র কাশীশ্বর শ্বর গোপাল গোপীনাথ পার্ব্বতী

যাদবেন্দ্র নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নীলকণ্ঠের তপুত্র

(২৮শ) রঘু গঙ্গাধর শ্রী র বিষ্ণু রতি র মন্মথ রাধাকান্ত

ইহারা সকলেই সমানরূ ও ঠাকুর নামে খ্যা ত।

*(২৫শ) কানাই ছোটঠাকুর নাম সবে বলে।
অবসতি গঙ্গানন্দ যার চরণতলে। মেলমালা

† [২৪শ] গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফলিয়ার সার
যাহা হইতে মেলকুল হইল উদ্ধার॥

মহেশ পঞ্চানন (২৭শ) ; গোপালের অন্য পুত্র মুরহর তর্কবাগীশ ( ২৮শ ) ; উভয়েই রতি বিষ্ণুর সমান পর্য্যায়ের লোক।

রামাচার্য্যের পুত্র বিশ্বেশ্বর (২৬শ) তৎপুত্র লক্ষ্মীনাথ (২৭শ) তৎপুত্র রামগোবিন্দ (২৮শ) তদীয় পুত্র বলরাম ঠাকুর। বিষ্ণুর ভ্রাতৃপুত্র পরিচয়ের লোক।

---

* ( ২৬শ ) গোপীনাথের চর দোষ। পার্ব্বতীনাথের বীরভদ্রী দোষ।

† ( ২৭শ ) রাঘবেন্দ্রের পুত্র যাদবেন্দ্র-সন্তানগণ কেশরকুনীভাব প্রাপ্ত, পরে ভঙ্গ। নদীয়াজিলায়, উলায় ও মুর্শিদাবাদ জিলার গোঘাটা পাটিকা বাড়ীতে নিবাস।

(২৫শ) রামাচার্য্য, তৎপুত্র কাশীশ্বর (২৬শ), তৎপুত্র রমানাথ ( ২৭শ ), তৎপুত্র মধুসূদন তর্কালঙ্কার * (২৮শ), ইনি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র রতি বিষ্ণুদিগের সহিত সমান পর্য্যায়ের লোক।

রামাচার্য্যের চতুর্থ পুত্র গোপাল সুত

লভ্যোবন্দ্যাবতংশঃ কুশলমতিরভূৎ
ভ্রাতৃযোগে ভিরণ্যঃ
তুল্যোঽহয়ং পূর্ব্বদৃষ্ট্যা উদয়কুলবরোঽ
প্যার্ত্তিগাঃ নীলকণ্ঠঃ।
গঙ্গাদাসঃ সুচট্টো পিতৃকুলসদৃশো যস্য
ভয়োচিতশ্রীঃ
গঙ্গানন্দঃ সুধীরো মুখকুল-জলধেঃ পূর্ণ
চন্দ্রস্য ভাতিঃ॥ মিশ্রী

* [২৬শ] গোপীনাথে লাগে ধন্ধ শোঁধা
ঠাকুর পাকে।
গোপীনাথ করণে ধন্ধ শ্রীনাথেতে ডাকে॥
এই সে কারণে ধন্ধ গঙ্গানন্দে পায়।
আদ্যরসে আর্ত্তিরসে নীলকণ্ঠে যায়॥

‡ [২৬শ] রাঘবেন্দ্র কাশীবিশুকুলে কল্পতরু।
চরে গেল গোপীনাথ বীরে গেল পারু॥
মেলমালা।

২৮শ কুলের রাজা মধুসূদন গঙ্গাধর পাছ
রতি বিষ্ণু নন ভাব আর সব কাছ॥
বিষ্ণুরয় বলরাম উলায় রমণ।
বাপা খুড়ার রঘুবিশু সম ছয় জন॥
দোষর শোষর নাই মুরহর একা।
কি জানি কাহার সঙ্গে কবে হয় দেখা॥
অষ্টদলে অষ্টজন মধ্যে বলরাম।
গোপীনাথ সহ নৃত্য করে অবিরাম॥
মেলমালা।

(২৭শ) কি কব নাতুর কথা, ভিতে কল্লে আধাগুল,
শ্রীধর সমান ডাক।
যদি কুলে ছিল রাম, নেলে কেন জয়রাম,
এখন এক থাক॥
তিলতুলসীকুশমোড়া থয়ে রামেশ্বরের হুড়া,
কুলের কুণ্ডুড়ী ভেঙ্গে গেল।
পঞ্চানন ভালো কয়, তেভীরাম ন দোষয়,
উধোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে গেল॥

[২৮শ] নীলের তনয় সাত পুরোজাত রঘু।
শ্রীধর রামেশ্বর বিষ্ণু নয় লঘু॥
রতিকান্ত রাধাকান্ত আর রামেশ্বর।
যাহা নিয়ে কুল গাঁই ফুলের ভিতর॥
মেলমালা।

## খড়দহ মেল।

আদৌ খড়দঃ, ফুলিয়া শেষঃ,
খড়দঃ ফুলিয়া নাস্তি বিশেষঃ॥

যোগেশ্বর পণ্ডিত হইতে খড়দহ মেল ধরা যায়। ইনি আহিত-সহোদর মহাদেবের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র। মহাদেব শ্রীহর্ষ হইতে ১৫শ পুরুষ অন্তর। মহাদেবের দুই পুত্র; ঈশ্বর ও বিশ্বেশ্বর। (১৬শ)

বিশ্বেশ্বরের বংশাবলী।

(১৭শ) গোপী ভব

(১৮শ) ধৃত কৃষ্ণ মহেশ্বর

(১৯শ) বস্থ বল হরি

(২০শ) দিগম্বর যোগেশ্বর কামদেব

(২১শ) শঙ্কর শত্রুঘ্ন মুকুন্দ ত্রিবিক্রম জানকী রুক্মিণী কমলাকর

(২২শ) কুমুদ রাঘব সুরানন্দ নবানন্দ পূর্ণানন্দ

(২৩শ) রামভদ্র শিবরাম

(২৪শ) রামভদ্র

(২৫শ) রামনারায়ণ

রামনারায়ণের সহিত রামাচার্য্য ও শিবাচার্য্যের সমান সম্বন্ধ অর্থাৎ ইঁহারা তিন জনেই শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন (২৫শ) পুরুষ।

যোগেশ্বর পণ্ডিত, রামনারায়ণের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ।† যোগেশ্বর ও কামদেব পণ্ডিত খড়দহ মেল প্রাপ্ত। রামনারায়ণ কাশ্যপ কাঞ্জিড়ী দোষ দুষ্ট।

---

## বল্লভীমেল।

"রঙ্গুপিত্তাদিদোষৈরিদানীং যা চ কুলশ্রীঃ
সা বল্লভী।"

"তপ মল্ল দুটী ভাই যা নিয়ে কুল গাই
ফুলের ভিতর।।"

শ্রীহর্ষের অধস্তন (২১শ) পুরুষ লক্ষ্মীধর। ইহার দুই পুত্র। একের নাম দুর্গাবর অপরের নাম মনোহর। দুর্গাবর পণ্ডিত হইতেই বল্লভী মেল [illegible] করে।

† (২৫শ) আদৌবন্দ্যাচ দ্বয়ং ধনযুগং ধন্যাঞ্চ বন্দ্যাদ্বয়ম্। সপ্তানামপি চৈতলী ত্রয়োমুখা এতেচ অষ্টাদশ॥ মেলমালা।

সত্যবানে দুই সুত নবাই শুভাই।
মুকুন্দ শুভাই সুত বিবাহ ডিংসাই॥
রায়ের দোষে বিসম্বাদে পড়ে সত্যবান্।
সেইকালে যোগেশ্বর মধুচট্টপান।।
মধুচট্টো শিরে ধরি ভরদ্বাজ মুনি।
যোগেশ্বর অবতার শিব শিব গণি॥
আর গাঙ্গ চিন্তামণি চাঁদেরে চিয়ায়।
ত্রিদোষে পড়িয়া মলেন চট্টো মাধাই॥
কামদেবসুতাঃ সপ্ত দামোদরসুতাবুভৌ।
যোগেশ্বরসুতাঃ সর্ব্বে মধুদোষেণ দূর্ষিতাঃ॥
মেলমালা।

[ ২৩শ ] দুর্গাবরের বংশাবলী দেখ।

(২৪শ) শ্রীনিবাস

(২৫শ) অমর রামচন্দ্র যাদব

(২৬শ) গোপাল মজুমদার রামনাথ

(২৭শ)

(২৮শ) জানকীনাথ গোপীরায় মুকুট রায়

(২৯শ) বলরাম বাণেশ্বর কানু নিধি [ ২৮শ ] রঘু জানকী

৩০শ মনোরথ দয়ারাম [ ২৯শ ] প্রাণনাথ নরদেব রামগোবিন্দ নন্দরাম

বল্লভী মেলের প্রধান স্থান শান্তিপুর।

[ ৩১শ ] ভরত সদাশিব হরিহর রামচন্দ্র

ভট্টনারায়ণ বংশ।

ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্র। যথা—আদিবরাহ ১, রাম ২, নীপ ৩, নানো ৪, বিকো ৫, সাহ বা সাঢ়ু ৬, শুভ ৭, নিল্লো ৮, গুই ৯, মধু ১০, গুণ ১১, বটুক ১২, গুহ্ম ১৩, বিভু (দেব) ১৪, কাম বা শুভ ১৫, মহীপতি ১৬। ইহাদিগের মধ্যে আদিবরাহ, বন্দ্য বংশের মূল পুরুষ।

আদি বরাহ বংশ যথা—পুত্র বৈনতেয়, পৌত্র সুবুদ্ধি, প্রপৌত্র গুঁই, অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র গঙ্গাধর, সুহাস বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইহার পুত্রের নাম শকুনি। ইনি ভট্টনারায়ণ হইতে ৯ম। ইহাঁর পুত্র মহেশ্বর ১০ম। ইনিই কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সহিত বন্দ্যবংশের আরও চারিজন কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের নাম যথা—জাহ্লাল, দেবল, বামন ও ঈশান।

মহেশ্বরের পুত্রের নাম মহাদেব (১১শ) ইহাঁর তিন পুত্র যথা পুতি, তিকু, ও দুর্ব্বলী। ইহাঁরা ভট্ট হইতে [১২শ]।

দুর্ব্বলীর পাঁচ পুত্র, যথা অনন্ত, হরি, ভাস্কর, নারায়ণ, ও সঙ্কেত। [ ১৩শ ]

[১৩শ] হরি, তৎপুত্র বিষ্ণুমিশ্র (১৪শ), তৎপুত্র পৃথ্বীধর ও ধ্রুবানন্দ (১৫শ), পৃথ্বীধর পুত্র গঙ্গাধর (১৬শ), তৎপুত্র ভগীরথ (১৭শ), ভগীরথের পাঁচপুত্র, যথা—মনোহর, জিতামিত্র, দেবানন্দ, শ্রীমন্ত, ও শ্রীপতি [১৮শ]।*

* (১৮শ) মনোহর জিতামিত্রৌ
দেবানন্দস্ততঃপরঃ।
শ্রীমন্তঃ শ্রীপতিশ্চৈব ভগীরথসুতাইমে॥

(১৮শ) শ্রীপতির পুত্র দুর্গাদাস [১৯শ], দুর্গাদাসের চারিপুত্র, যথা—রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, রাঘব ও রমাকান্ত [২০শ], ইহাঁরাই চারি চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ ও বন্দ্যবংশে সাগর দিয়া নামে বিশেষ খ্যাত। সাগরের এই চারি অংশ যে কুল পবিত্র করিয়াছেন তাহার নাম চতুঃসাগরী। যথা—

সাগর পূর্ব্বেতে ছিল মীনের আলয়।
অদ্ভুত তদ্ভাব এতে আছয়ে প্রত্যয়॥
মেলবন্ধ কালে যাতে সাগরের অংশ।
পড়িল তাহারা কুলে হইল প্রশংস॥
সেকালে সাগর ছিল গঙ্গাবংশে যোগ।
তথা হইতে গঙ্গানন্দ পাইল সংযোগ॥
সমবায়ি ভাবে তাহা সুচট্টেতে যায়।
গাঙ্গুলী সম্বন্ধ যবে খড়দহে পায়॥
চট্টবংশে মিশ্রিত হয় গাঙ্গুলীর কুল।
পরম্পরা সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বানন্দে মূল॥
বল্লভীতে এই মতে আছে তার অংশ।
চতুঃসাগরী বলে যে হইল প্রশংস।
স্বাধিকার নিষ্ঠাভাব চারি মেলে পায়।
অন্যথা সিদ্ধভাব ঘটক না লয়॥
এই চারি মেল যেই শ্রোত্রিয়ের ঘরে।
শুদ্ধক শ্রোত্রিয় বলি তাহারে বিচারে।
কুলচন্দ্রিকা।

ফুলেমেল।

নাধা ধাঁধা বারু হাটী আর মুলুক জুড়ী।
কুলের প্রধান যাতে পড়ে হুড়ো হুড়ী॥
মনোহর বিয়ে করে নাঁধার বাঁড়ুরী।
পরে কুলে ভেঙ্গে পার শোঁধার আঁকুড়ী।
এই সব দোষ যদি যথার্থ হইত।
চাবি মেলে কুল আর কোথায় রহিত॥
অপভ্রংশ লোকে মাত্র অপবাদ দেয়।
রামেশ্বরের কুলে যথা পিণ্ড দোষ পায়॥
ঘ্রাণমাত্র পীরআলি দেখে সর্ব্ব জন।
সাক্ষাৎ যবনস্পর্শে কি হয় আচরণ॥
নিমাইচট্টের কন্যা হাঁসাই থানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্যগঙ্গাধরে।
হাঁসাইথানদারের কথা সত্য সত্য নয়।
চট্টসুতা ঝড় দেখি লইল আশ্রয়॥
ব্যাজ দেখি যত সখী কার্য্য কথা কয়।
আইলা আইসো বসো বসো বুঝিলাম ঐ।
ছল করি থানদারি ভেটা আইলা সৈ।
তাহা শুনি কাণাকাণি বিপক্ষেতে করে।
এদেশ ওদেশ অন্য দেশেতে সঞ্চরে॥
সেই হইতে বিপক্ষেতে বাঁধা ধাঁধা কয়।
কিন্তু জানি মিশ্রমানি পরমার্থ নয়॥
মিথ্যা বলি যদি গালি মহতের হয়।
মহিমার হানি তায় জানিহ নিশ্চয়॥
দত্তপুলের ঠাকুরদাস চট্ট বলি তায়।
রামেশ্বরপুরের শ্যাম কুটুম্বিতা দায়॥
উলোর মধ্যে শিবশঙ্কর সপ্তশতী পায়।
বুড়োনর বিষ্ণু বামে ভাগ্য বলি ধায়॥

## কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশবিস্তার।

| মেল বা বংশ | নিবাস গ্রাম | জিলা | উপাধি |
|---|---|---|---|
| শুভরাজথানি * | শতখালি | যশোহর | রায় |

* গুড়েরপান্টী। বংশজ গোষ্ঠীপতি।

| মেল বা বংশ। | নিবাস গ্রাম | জেলা | উপাধি। |
|---|---|---|---|
| সদানন্দখাসি * | তৈলকুপী | যশোহর | রায়। |
| ঐ | বোধখানা | ঐ | ভট্টাচার্য্য |
| পণ্ডিতরত্নী | উত্তরপাড়া, | হুগলি | বন্দ্য মুখাদি। |
| বাঙ্গালপাশ | তেহট্টী, | নবদ্বীপ, | ভট্টাচার্য্য। |
| ফুলিয়া বিষ্ণু বং | ফুলিয়া | ঐ | বন্দ্য মুখাদি। |
| ঐ | লক্ষ্মী পাশা, | যশোহর, | বন্দ্যমুখাদি। |
| খড়দা রামনারায়ণ বং | খাসবাড়ী | ২৪ পরগণা | ঐ। |
| বল্লভী দুর্গাবর বং | শান্তিপুর | নবদ্বীপ | ঐ। |
| সর্ব্বানন্দী | ঐ | ঐ | ভট্টাচার্য্য। |
| ঐ | বিল্লপুষ্করণী | নদিয়া | ভট্টাচার্য্য |
| আথড়েল | শুঁতি | যশোহর | রায়। |
| ঐ | শিলডাঙ্গা | ঐ | দেবরায়। |
| শোভাকর বংশ | ঝাঁপা | ঐ | ঘটক। |
| ঐ | গুপ্তিপাড়া | হুগলি | ভট্টাচার্য্য। |
| সর্ব্বানন্দী | ধর্ম্মদহ | নদীয়া | বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| কুমুংরমন রাজবল্লভ | উলা | ঐ | মুখোপাধ্যায়। |
| চৈতল | শান্তিপুর | ঐ | চট্টোপাধ্যায়। |
| বেগের গাঙ্গুলী | বেগে | ঢাকা | গাঙ্গুলী। |
| সুরাই | মহেশপুর | নদীয়া | চক্রবর্ত্তী। |
| ঐ | জয়দিয়া | যশোহর | মুখোপাধ্যায়। |
| ঐ | খানাকুল কৃষ্ণনগর | হুগলী | রায়। |
| ঐ | মহেশপুর | নদীয়া | মুখোপাধ্যায়। |
| গুড় | মহেশপুর | নদিয়া | রায়চৌধুরী। |
| হড় | গদখালি | ঐ | রায়। |
| কেশরকুনী কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ। | কৃষ্ণনগর<br>শিবনিবাস<br>আনন্দ ধাম<br>হরধাম। | | নদিয়া জিলার প্রায় সর্ব্বত্র কেশর কুনীর বংশ ও কেশর কুনীর কুলীন আছেন। |

* নপাড়ার সহিত পরিবর্ত্ত।

| মেল বা বংশ | নিবাসগ্রাম | জিলা | উপাধি। |
|---|---|---|---|
| ভবানন্দের বংশ | দিগম্বরপুর<br>ফতেপুর<br>কুড়ুলগাছী<br>গোটপাড়া<br>শ্রীকৃষ্ণপুর<br>জয়রামপুর | নদীয়া। | |
| কেঁজিরী | ধর্ম্মদহ<br>বহিরগাছী<br>বাঘআঁচাড়া<br>শিমলা | নদীয়া | গুরু ভট্টাচার্য্য বলিয়া খ্যাত। |
| ঐ | সারল | যশোহর | ভট্টাচার্য্য। |
| শিমলাল | মহেশপুর | নদীয়া | ভট্টাচার্য্য। |
| নপাড়ী | শান্তিপুর | নদীয়া | নপাড়ী। |
| পূতিতুণ্ড | মহেশপুর | ঐ | ঐ |
| কাঞ্জিলাল | পুরন্দরপুর | ঐ | কাঞ্জিলাল। |
| ঐ | মৃজাপুর | ঐ | ঐ |
| পীরালী | টেউটি | যশোহর | চক্রবর্ত্তী। |
| ঐ | কলিকাতা | ২৪ পরগণা | ঠাকুর। |
| ঘোষাল | আঁড়িয়াদহ | ঐ | ঘোষাল। |
| ঐ | খিদিরপুর | ঐ | ঐ |
| সাবর্ণি * | বড়িশা | ঐ | রায়চৌধুরী। |
| অদ্বৈতবংশ | শান্তিপুর | নদীয়া | গোস্বামী। |
| নিত্যানন্দবংশ | খড়দহ | ২৪পং | ঐ |
| ঐ | সয়দাবাদ | মুর্শিদাবাদ | ঐ |
| গঙ্গাবংশ | জিরেট | হুগলী | ঐ |
| পাশ্চাত্যবৈদিক | নবদ্বীপ | নদীয়া | ভট্টাচার্য্যাদি। |
| ঐ | ভাটপাড়া | ২৪পং | ঐ |
| ঐ | পূর্ব্বস্থলী | বর্দ্ধমান | ঐ |

* গোষ্ঠীপতি। ইহাঁরা কুলভঙ্গ করেন।

| মেল বা বংশ | নিবাসগ্রাম | জিলা | উপাধি। |
|---|---|---|---|
| পাশ্চাত্য বৈদিক | বালুচর | মুর্শিদাবাদ | ভট্টাচার্য্য। |
| দাক্ষিণাত্য | রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি | ঐ | চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য / |
| মহিন্তা | আঁধারকোটা | নদীয়া | রায়। |
| সিদ্ধান্তী | ইচ্ছাপুর অঞ্চল | নদীয়া | মুখো, চট্টাদি |
| হড় | ঐ | ঐ | চৌধুরী |
| পাকৃড়াশী | মাটিয়ারী | নদীয়া | চক্রবর্ত্তী |
| পাক্ড়াশী | কোলা বলরামপুর | যশোহর | রায় |
| বটব্যাল | সাধুহাটী | ঐ | ভট্টাচার্য্য |
| ঐ | কৃষ্ণনগর | নদীয়া | সরকার |
| শিমলায়ী | ঐ | ঐ | ঐ |
| পাকৃড়াশী | বহুবাজার | কলিকাতা | পাক্ড়াশী |
| মাষচটক | তালতলা | ঐ | মাষচটক |
| কুশারি | হুদা | নদীয়া | কুশারি |
| কাঞ্জিলাল | মহেশপুর | ঐ | চক্রবর্ত্তী |
| ঐ | ঘোড়াগাচা | ২৪পরগণা | ভট্টাচার্য্য পুঁড়ো |
| ঐ | ধলচিতা | ঐ | ঐ |
| সুরাই | জলদিয়া | যশোহর | মুখোপাধ্যায়াদি |
| ঐ | মহেশপুর | নদীয়া | ঐ |

বাৎস্য ছান্দড় ১। শ্রীধর কাঞ্জিলাল ২। বেদগর্ভ ৩। বেদগর্ভের দুই পুত্র, বীর ও বসুন্ধর ৪। বীর উত্তরদেশবাসী। বসুন্ধরের পুত্র হিঙ্গু ৫। ইহার দুই পুত্র, কানু ও কুতূহল ৬। ইহাঁরা উভয়েই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। কানুর পুত্র, চাঁদ ৭। চাঁদের চারি পুত্র, তেঁই, রুদ্র, হিঙ্গন, ও গণ ৮। তেঁইপুত্র গোপী, তপন, ভীম ও গঙ্গাধর ৯। গোপীর দুই পুত্র কুশল ও কৌতুক ১০। এবং তপনের দুই পুত্র বসুমিত্র ও মাধব ১০। কুশলের দুই পুত্র, একের নাম কাঞ্জিনর অপরের নাম নরপতি ১১। নরপতির দুই পুত্র, প্রথমের নাম আচার্য্য কৃষ্ণ; দ্বিতীয়ের নাম মধুসূদন ১২। ইহাঁদিগের সময়েই মেল বদ্ধ হয়। আচার্য্য কৃষ্ণের বংশাবলী; ইহাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম প্রজাপতি ও বিষ্ণু ১৩। প্রজাপতির পুত্রচতুষ্টয়ের নাম রামচন্দ্র, রামভদ্র, পুরুষোত্তম ও গঙ্গাধর ১৪। রামচন্দ্রের দুই পুত্র, শ্রীগর্ভ ও রত্নগর্ভ ১৫। রত্নগর্ভের পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ ১৬। তৎপুত্র হরি ১৭। ইহাঁর

পুত্রত্রয়ের নাম, ধীর, মার্কণ্ডেয় ও গঙ্গারাম ১৮। মার্কণ্ডেয়ের পুত্র, গুণজ্ঞ ও হৃদয়ানন্দ ১৯। হৃদয়ানন্দের পুত্র, শম্ভু ও গঙ্গারাম ২০। শম্ভুর পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর প্রভৃতি।

পুরন্দরপুর মৃজাপুর ও কোঁচমালীতে কাঞ্জিলালগণের বংশ আছে। প্রথম দুইটী স্থান নদীয়া জিলার অন্তর্গত। ছান্দড় বংশের কানু ও কুতূহল ছান্দড় হইতে ষট্‌পুরুষ অন্তর। শ্রীহর্ষ বংশের উৎসাহ, শ্রীহর্ষ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অন্তর। বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান সময়ে কানু হইতে উৎসাহ আট পুরুষ অধস্তন ছিলেন। এখনও শ্রীহর্ষের অধস্তন ৩৫ পঞ্চত্রিংশ পুরুষ রায় শ্যামাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত ছান্দড় গোষ্ঠীর শিমলালবংশসম্ভূত ২৮ অষ্টাবিংশ পুরুষ পাঁচু (তারাপদ) ভট্টাচার্য্যের ঐক্য কর ৭ সাত পুরুষ অন্তর দেখা যাইবে।

ছান্দড়ের শিমলালগোষ্ঠীর এক দেশ মাত্র এখানে দেখান গেল। যথা—

ছান্দড় ১। কবি শিমলাল ২। ভয়াপহ ৩। কিরণ ৪। গৌতম ৫। কর্ণবান্ ৬। গঙ্গাধর ৭। ভগীরথ ৮। রাম ৯। রুদাই বা (রুদ্র) ১০। বিষ্ণু ১১। শ্রীমান্ ১২। মধুসূদন হাজরা ১৩। সুবুদ্ধি ১৪। উমাপতি ১৫। গঙ্গাদাস ১৬। অভয় ১৭। রামগোপাল ১৮। রমাবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ ১৯। ইহাঁরা নদীয়া জেলার অন্তর্গত মহেশপুরে আবাস গ্রহণ করেন। এই খানে ভট্টাচার্য্য বলিয়া বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হন।

নিম্নে রমাবল্লভের বংশাবলীর একদেশ মাত্র লেখা গেল। যথা

১৯ রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ।

- ২০ রঘুনন্দন
  - ২১ ঘনশ্যাম
    - ২২ রামকেশব
      - ২৩ জগন্নাথ
        - ২৪ রামধন
          - ২৫ ভুবন
          - বিধু
- রাজেন্দ্র
  - রামচন্দ্র *
    - রামশরণ *
      - বলরাম *
        - রামশঙ্কর *
          - কালী
            - ২৬ অম্বিকা *
              - ২৭ পাঁচু (তারাদাস)
- মহাদেব
  - নারায়ণ ‡
- মধুসূদন
  - বামরাম বা মাণিক
    - কালীশঙ্কর
      - রামকিঙ্কর *
        - ভোলানাথ *
          - হরিদাস *
    - রামলোচন
      - রমেশ *
        - পূর্ণ *
          - ভূধর *
    - কমলাকান্ত
      - রাধামোহন *
        - শ্রীধর
          - বিধু *
    - পদ্মলোচন
      - ব্রজ *
        - হরি *
          - ভব *

* ইহাঁদিগের ভ্রাতৃগণের বংশাবলীর উল্লেখ করা হয় নাই।

‡ নারায়ণ নিঃসন্তান।

শ্রোত্রীয়গণ প্রায়ই দীর্ঘজীবী; এমন কি এই বংশের অনেকেই দীর্ঘজীবন পাইয়াছেন। কেহ শতাধিক বর্ষ বাঁচিয়াছিলেন।

সেদিন রামলোচনের প্রথম পুত্র পরম পণ্ডিত ৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ৯৭ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে লোকান্তরিত হইয়াছেন, ইহা অনেকে অবগত আছেন। রামধন ও ভোলানাথ অদ্যাপি স্বচ্ছন্দশরীরে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা অনেক দিন হইল অশীতির প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছেন। ভরসা করি ইহাঁরা শতাধিক বর্ষ বয়ঃক্রম পাইবেন।

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে;—

মহিন্তা গৌণ বটে নহে সর্ব্বানন্দে।
মহিন্তায় যায় তারা পরম আনন্দে॥
পোড়ারীর ভাব অন্য কুলে নাহি হেরি।
কেশব রঘুর ভাই রুদ্রক পোড়ারী॥
দীর্ঘাঙ্গী নাম শুনি সে নহে দীর্ঘাঙ্গ।
বড় খাট ভাবে তাহা কুলেতে আনঙ্গ॥
চতুর্দ্দশ গৌণকুল ভাব লেখা গেল।
কেশর মলঙ্গা এরা সকলি অচল॥
কুন্দগ্রামী ছাড়ি কুল হৈল সাতগাঁই।
তার মধ্যে তিন গাঁই সগোত্রেতে পাই॥
কাঞ্জি পূতি ঘোষাল ছান্দড়ের তিনঅংশ।
পূর্ব্বাপর হইল যে কুলীনের বংশ॥

কুলচন্দ্রিকা।

দেবীবরের মেলবন্ধনের সময় হইতে যাঁহারা কুলীন, তাঁহারা এক্ষণে কুলীন দেবীবরের পূর্ব্বের কুলীন, অর্থাৎ যাঁহারা উৎসাহ গুড় বা বহুরূপাদির নামে পরিচয় দেন, তাঁহারা কুলীন নহেন। দেবীবরছাটা বংশজ।

# দুর্গোৎসব।

শরতের রৌদ্র ফুটিলেই বঙ্গবাসীর মন প্রস্ফুটিত হয়। কোথা হইতে এক আনন্দমারুত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে ঈষৎ বিকম্পিত করিতে থাকে। দুর্গোৎসবে যে কি আনন্দ, উন্নত ও পরিণতবয়স্ক বঙ্গবাসী তাহা ঠিক জানেন না; অথচ তাঁহার হৃদয় সেই আনন্দে বিচলিত হয়। তরুণ বয়সে যে আনন্দে তাঁহার হৃদয় প্রমত্ত হইত, এখন কি তাহারই স্মৃতি মাত্র তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয়, না প্রকৃত কোন আনন্দভাবে তাঁহার হৃদয় বিমোহিত হয়? কাহারও মনে স্মৃতির আনন্দ, কাহারও মনে উৎসবের বাস্তবিক আনন্দ, কাহারও মনে সাধারণ আনন্দের সহানুভূতিসম্ভূত এক আশ্চর্য্যপ্রকার আনন্দ ভাব সঞ্চারিত হয়। মানবহৃদয়ে যেন একপ্রকার ভাবের দর্পণ আছে। স্মৃতি আসিয়া সেই মুকুরে কখন সহাস্য আস্য সন্দর্শন করিতেছেন, দর্পণে স্মৃতির প্রফুল্ল মুখকমল অমনি বিকশিত হইতেছে; জনসমাজের আনন্দবিস্ফারিত

মুখচন্দ্রমা যখন সেই ভাবমুকুরে প্রতিফলিত হয়, তাহার প্রতিবিম্ব অমনি হাসিতে থাকে; আবার কখন কখন সেই মুকুরের পশ্চাদ্দেশ হইতে আত্মা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আপন সহাস্য মুখছাতি প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিতে আসেন, তখন ভাবমুকুর সে প্রতিবিম্ব আত্ম-অভ্যন্তরে সম্পূর্ণভাবে ধারণে অসমর্থ হইয়া বাহ্য মুখাবয়বে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত করে। দুর্গোৎসবকালে বঙ্গবাসীর হৃদয় এই ত্রিবিধ, না হয় ইহাঁদিগের অন্যতমের আনন্দভাবে সঞ্চালিত হয়। এ আনন্দ অনিবার্য্য। যিনি আপনাপনি না আনন্দিত হন, বাহ্য জগৎ তাঁহাকে আনন্দিত করে। তাঁহার সন্তান সন্ততির উল্লম্ফন ও নৃত্য, ভ্রাতা ভগিনীর আনন্দ, প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনের আনন্দস্রোত তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইবে। যিনি এই সাধারণ আনন্দোৎসবে অবিচলিত থাকিতে পারেন, তাঁহার হৃদয় নিতান্ত কঠোর এবং পাষাণবৎ কঠিন। মানবহৃদয় ভগ্ন ও সন্তাপিত হইলেও তাহা ঈষৎ বিচলিত হইবে। যে হৃদয় পরসুখে নিরানন্দ থাকিতে পারে, সময়ে সময়ে তাহা আত্ম-আনন্দে প্রমত্ত হউক, আত্ম-সুখ ও উৎসাহে পূর্ণ হউক, কিন্তু সে হৃদয় নিশ্চয় সেই সামাজিক সুখে বঞ্চিত হইবে, যে সুখ দুর্গোৎসবের প্রাণ, যাহা সকল সামাজিক উৎসবেরই সঞ্জীবণীশক্তি, এবং মানব-সমাজের সুখের নিদানস্বরূপ।

প্রতিবৎসর যেমন দুর্গোৎসব আসিতে থাকে, অমনি আমাদিগের শৈশব কাল মনে পড়ে। বাল্যকালের সমুদয় লীলা, আনন্দ, নিশ্চিন্তভাব, সকলই স্মৃতিপটে উদিত হয়। স্মৃতিবলে আর একবার যেন আমরা বাল্যকাল প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভোগ করি। স্মৃতির অবলম্বনে কালের পশ্চাদ্দেশে আর একবার বিচরণ করিয়া আসি। যে কালের নির্ভাবনায় সকলই সুখময় বোধ হইত, যে কালের সরলতা ও অনভিজ্ঞতানিবন্ধন কিছুতেই কুভাব উপলব্ধি হইত না, সকলই উৎকৃষ্ট ও সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইত, যে কালে ভক্তি ও অন্যান্য হৃদয়ভাব প্রবল ছিল, যখন বিবেচনার শক্তি কিছুই উন্মেষিত হয় নাই, যখন দেবতা ও গুরুজনের ভক্তি এবং সম্মান স্বতঃই হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হইত, তখন দুর্গোৎসব আমাদিগের নিকট এক চমৎকার ভাবে সমুদিত হইত। পূজার পূর্ব্বে বিদেশ হইতে গৃহে যাইবার সময় কতই উৎসাহ হইত। দুর্গোৎসবের ধূমধামে কেমন প্রমত্ত হইতাম; পূজার সময় ভক্তিরসে হৃদয় কেমন আর্দ্র হইত। নব নব বসনভূষণে শোভিত হইয়া হৃদয় নৃত্য করিত। আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বজন প্রভৃতি সকল পরিচিত ও আপনার লোকের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কতই পুলকিত হইতাম। নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, আদর, সম্ভাষণ, দান, ধ্যান, সকলই সুখকর ছিল। তখন পৃথিবী কবির পৃথিবী ছিল। কবির চিত্রানুযায়ী পৃথিবীকে সরল ও সুখময়

বোধ হইত। গ্রন্থে যাহা পড়িতাম, সকলই সত্য জ্ঞান হইত। সেই জীবনের প্রভাতকালে সকলই নববিভায় অনুরঞ্জিত হইয়া সুবর্ণপ্রায় জ্ঞান হইত। তখন জ্ঞান হইত, পৃথিবী এখনকার অপেক্ষা অধিকতর আনন্দপূর্ণ, সামাজিক সুখে অধিকতর সুখী এবং গার্হস্থ্যসুখ প্রতি গৃহধামকে প্রফুল্লিত করিয়াছে। সে চিত্র এখন আর দেখিতে পাই না। সে ইন্দ্রজাল তিরোহিত হইয়াছে। এখন পৃথিবী পুরাতন হইয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের তরুণ বয়সের কাল্পনিক চিত্রখানি বিমলিন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর কিছুতেই ততোধিক আনন্দানুভব হয় না। পুরাতন তরুণকালের পৃথিবী, বাল্যকালের আমোদ প্রমোদ এবং ক্রীড়াকলাপ,—পুরাতন দুর্গোৎসব তথাপি কবিত্ববিহীন হয় নাই। কবিত্বলতা এখন এই পুরাতন চিত্রশালিকার চারি পার্শ্বে পরিবেষ্টন করিয়াছে। চিত্রশালিকা মলিন ও ভগ্নপ্রায়; কিন্তু কবিত্বলতা ইহাকে রক্ষা ও ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। লতিকার হরিৎ শোভা পরম রমণীয় প্রাসাদকে অধিকতর শোভনীয় করিয়াছে। এই পুরাতন, ভগ্নপ্রায়, বিমলিন মন্দিরকে এক নূতন সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত করিয়াছে।

অতি সুন্দর সময়ে দুর্গোৎসব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরৎকাল বসন্ত অপেক্ষাও অধিকতর রমণীয়। এখানে শীতঋতু যেমন সুখকর, গ্রীষ্মঋতু ততোধিক নহে। গ্রীষ্মের দারুণ তাপ সহ্য করিয়া যখন মানবকুল ঈষৎ শৈত্যজ্ঞান সম্ভোগ করিতে থাকে, তখন ঋতুপ্রভাব যে কেমন প্রীতিকর বোধ হইবে নাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। তাপপ্রপীড়িত শরীর শীতল হইতে থাকে, এবং সে সুখের সঙ্গে সঙ্গে মনও উৎফুল্ল হয়। শরৎকালে এই নদীমাতৃক ও শস্যপ্রধান বঙ্গদেশ যে প্রকার ধনধান্যে এবং নানাবিধ আহারীয় উদ্ভিদ্ পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভনীয় এবং লোভনীয় মূর্ত্তিতে দূর হইতে সকলেরই মন হরণ করিতে থাকে, তাহাতে কাহার না চিত্তে প্রসাদ জন্মে, কাহার না মন ভাবীসুখের লোভে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, এবং কাহার না হৃদয় প্রকৃতির নবজীবন সঞ্চারে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে? যে শরৎকালে সমস্ত বঙ্গদেশে দূরপ্রসর ক্ষেত্র সকল ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া হরিৎ শোভায় মনকে বিমুগ্ধ করিতেছে, যে কালে সমস্ত বঙ্গবাসীর পরিশ্রমের ফল এমন সুদৃশ্য বেশে পরিদৃশ্যমান হইয়া তাহাদিগের চিত্তপ্রসাদ উৎপাদন করিতেছে; যে কালে একটি সমগ্র মানবমণ্ডলীর জীবিত-আশা অসংখ্য বিস্তারিত ক্ষেত্রনিচয়ে বাহ্যবেশে ধনশোভায় প্রতীয়মান হইতেছে, সে কালে কাহার হৃদয়ে সুখের উৎস না উৎসারিত হইবে? কৃষকমণ্ডলী দেখিতেছে তাহাদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার সম্মুখে সুবর্ণ বর্ণে প্রলো-

ভমীয় মূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়াছে, ক্ষেত্রস্বামী সেই ধনধান্যের উপর আপনার সমস্ত বর্ষের আয় ব্যয়ের গণনা করিয়া মনে মনে কত আশাই প্রতিপোষণ করিতেছেন, এবং ভূম্যধিকারীগণ প্রজাগণের আশার উপর মহতী প্রত্যাশার সেতুবন্ধন করিতেছেন। এখন কাহার না হৃদয় আনন্দ ও আশায় পরিপূর্ণ হইয়া সম্মুখস্থ নদীর ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ উছলিয়া উঠিতেছে এবং আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আকাঙ্ক্ষার সাগরাভিমুখে তর তর বেগে প্রধাবিত হইতেছে? এখন কৃষি ও ক্ষেত্রের সমুদায় কার্য্য পরিশেষ হইয়াছে, এখন পরিশ্রম হইতে ক্ষণকালের জন্য সকলেই অবকাশ পাইয়াছে। এখন একবার কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া আবার নব বলে বলীয়ান্ হইয়া প্রভূত শস্যরাশি আহরণ করিতে হইবে। এখনকার আনন্দ কি হৃদয়ে ধারণা হয়? এখন কৃষিজীবী সমগ্র বঙ্গদেশ বসিয়া কি করিবে, আনন্দ কিসে প্রকাশ করিবে? ধনধান্য পূর্ণ, শ্রমের এমন সুবর্ণময় পুরস্কারের জন্য কি একদা দেবতাগণকে মনের আনন্দে অর্চ্চনা করিবে না, কৃতজ্ঞতার পূজোপহার প্রদান করিবে না? এই তো তার উপযুক্ত সময়। এই সময়ে সমগ্র জনসমাজ আশার গোপনীয় আনন্দে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে, জনসমাজের বিভাগ সকল পরস্পরের প্রতি আশা ও আনন্দের সহিত অবলোকন করিতেছে। সকলেরই মনে মৈত্রীভাব। প্রতি মানবের হৃদয়, অন্য হৃদয়ের সহিত প্রণয় করিতে চাহে। ভূম্যধিকারী প্রজার সহিত, প্রজা ভূম্যধিকারীর সহিত, আর একবার মিলিতে চাহে। বিষয়ী সংসারী এবং সেবক, কৃষক ও ভূম্যধিকারীর সহিত সদালাপ ও ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি করিতে চাহে। একের হৃদয় অন্যের হৃদয়কে আহ্বান করিতেছে। গৃহস্থ শস্যশালা পরিপূর্ণ করিবে বলিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছে। একবার স্বজন ও আত্মীয় সকলের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছে। যখন হৃদয়ের প্রেম আপনি উছলিয়া উঠে, যখন স্নেহ ও সামাজিক ভ্রাতৃভাব এবং প্রণয় আপনা আপনি হৃদয় হইতে সমদ্ভূত হইতে থাকে, তখন কি একবার সকলে একত্রে কোন মহৎ উৎসবে সম্মিলিত হইবে না? একবার সকলে মিলিয়া দেবগণকে আহ্বান করিয়া আপনাদিগের আনন্দ, প্রেম, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে না? এসময়ে দুর্গোৎসবের ন্যায় একটি মহৎ উৎসব না হইলে বঙ্গদেশ কখন সন্তৃপ্ত থাকিতে পারে না। বহির্জগতে সমস্ত প্রকৃতি যখন নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া হাস্যবিস্ফারিত আস্যে, হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিতেছে, হৃদয় সে আনন্দে উদ্বোধিত না হইয়া কি থাকিতে পারে? নদীমাতৃক বঙ্গদেশের নদীগণের আনন্দ দেখিয়া হৃদয় আপনা আপনি পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং

তন্মধ্যে সেইরূপ আনন্দস্রোত বহিতে থাকে। শীত ঋতুর ঈষৎ শীতল বায়ু বহিয়া সেই স্রোতকে হিল্লোলিত করিতে থাকে।

দুর্গোৎসবের আনন্দ পল্লীগ্রামে। গ্রাম্য বঙ্গধাম এখন একছত্র হয়। ধনী, মধ্যবিত্ত ও কৃষক; যুবক বৃদ্ধ ও বালক; শত্রু মিত্র ও অপরিচিত; স্বজন, আত্মীয় ও কুটুম্ব সকলেই দেখ, গ্রামে গ্রামে নববেশে ও নবভাবে, আনন্দে এবং উৎসবে প্রমত্ত হইয়াছে। সকলেই আসিয়া একত্রিত হইয়াছে, এবং সকলেই পরস্পরের সহিত সদালাপ ও সম্ভাষণ করিতেছে। নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, আহ্বান, ভোজন ও পরিবেশনে সকলেই সুখী হইতেছে। পল্লীগ্রামবাসিগণ যেরূপ সরলহৃদয় ও সদ্ভাবসম্পন্ন, নগরবাসিগণ সেরূপ নহে। নাগরিকগণের অহঙ্কার পল্লীসমাজকে আজিও তত স্ফোটকবৎ স্ফীত করে নাই। সেখানে গৃহস্থ, ধনী, নির্ধনী, কৃষক ও ক্ষেত্রস্বামী সকলেই সকলকে সরলতার সহিত আহ্বান করে, সদ্ভাবে সম্বোধন করে এবং নিকটে ডাকিয়া সম্ভাষণ করে। এজন্য পূজার সময় পল্লীগ্রামে বড় সুখ। সেখানে গৃহের বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করে, সকলের সহিত মিশিতে ইচ্ছা করে এবং সকলের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করে। পল্লীগ্রামে এক গৃহে পূজা হইলে তাহাতে সমস্ত পল্লীগ্রামবাসিগণের পূজা বোধ হয়। নগরে এরূপ ঘটে না। পল্লীগ্রামে দুই দশ ঘরে পূজা আসিলে, আর আনন্দের সীমা থাকে না। যাহাদিগের বাটীতে পূজা, তাহারা একেবারে উৎসবে মত্ত হয়। পরস্পরের পূজা ও আয়োজন, সম্ভাষণ ও শিষ্টাচারের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টি থাকে। একের আনন্দে অন্যে আসিয়া যোগ দেয় এবং পরস্পরকে সুখী করে। নগরে সে ভাব কোথায়!

দুর্গোৎসবের আনন্দ—গৃহধামে। এই উপলক্ষে যে আত্মীয় স্বজনগণ এক গৃহে একত্রিত হন, এইটি বড় সুন্দর ব্যবস্থা। কার্য্যগতিকে এক পরিবারের কত জন কত স্থানে সংসারের জটিল পথে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন, পারিবারিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, এবং দূরস্থ থাকাতে অনেকের স্নেহ, মমতা ক্রমশঃ হয় তো হ্রাস হইয়া যাইতেছে। বৎসরান্তে পৈতৃক ভূমিতে একবার একত্রিত হইলে আবার স্নেহ মমতার উদ্রেক হয়, শিথিল বন্ধন ঘনীভূত হয়, আবার এক পরিবার বলিয়া সকলের আত্মীয়তার বৃদ্ধি হইতে থাকে। পারিবারিক প্রণয়ে আবার সকলেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। আর এক বার পূর্ব্বকালের গৃহসুখ মনে পড়ে। আর এক বার আত্মীয় স্বজনগণ একাত্মা হইয়া যান। সহোদর ও সহোদরাগণ আর একবার জনক জননীকে দেখিয়া এক প্রণয় ও আত্মীয়তা সূত্রে সম্বদ্ধ হন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয়গণ আর একবার জ্ঞাতীয়ত্বের একতা অনুভব করেন; আর একবার এক বংশীয় ভাবিয়া সকলে পরস্পরকে আপ-

নার ভাবে। গৃহধামে দুর্গোৎসবে এই আত্মীয় স্বজনের মিলন; অনুরূপ আত্মা ও সদৃশ হৃদয়ের মিলন। সমাজে বিরূপ ও বিসদৃশ আত্মা এবং হৃদয়ের মিলন; গৃহে অনুরূপ এবং সদৃশ হৃদয়ের সম্মিলন। সমাজে বিভিন্নপ্রকৃতিক ব্যক্তি, গৃহে একবিধ ব্যক্তিগণের মিলন। যে দুর্গোৎসব উপলক্ষে সকলে এইরূপ এক মানবজাতীয় ভাবে সম্মিলিত হয়, সে দুর্গোৎসব কি আমরা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি? আমরা পরিত্যাগ করিলে কি হইবে, আমাদিগের হৃদয় সে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। মানবজাতীয় ভ্রাতৃভাব যে তাহাকে রক্ষা করিতে চাহে।

দুর্গোৎসবের আনন্দ—দান ধর্ম্মে ও পান ভোজনে। মনের আনন্দ এখন মুক্ত হস্তে ও উদারতায় প্রকাশিত হয়। সহস্র দীন দুঃখী লোক পরিতোষের সহিত যেখানে দাতব্য লাভ অথবা পানভোজন করিয়া দাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছে, সে দৃশ্য কি মনোহর, কি হৃদয়-তৃপ্তিকর। আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবেশী সকলে একত্রে এক দিন মনের আনন্দে আহার ও পানভোজন করিলে কি হৃদয় পুলকিত হয় না, মানবসমাজের সুখবৃদ্ধি হয় না, এবং মানবজাতীয় একতার ভাব কি হৃদয়ে উদ্বোধিত হয় না? দয়া ধর্ম্মে যে আনন্দ এবং স্বজাতির সহিত প্রণয় বন্ধনে যে আনন্দ, দুর্গোৎসবে সেই আনন্দের স্রোত নগর ও গ্রামের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া সকলকেই সুখী করে।

কিন্তু হায় ইদানীন্তন নূতন সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত দুর্গোৎসবের আনন্দ ক্রমশঃ ন্যূনকল্প হইয়া আসিতেছে। লোকসমাজ এখন কিছু স্বার্থপর, বিষয়ী এবং অর্থপ্রিয় হইয়া ক্রমশঃ সামাজিক আমোদ প্রমোদ ভুলিতে চাহে। বঙ্গদেশ যখন অধিকতর কৃষিব্যবসায়ী ছিল তখনকার কালে সামাজিক উৎসবের আনন্দ অধিকতর প্রতীয়মান হইত। তখনকার লোক তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিত, গৃহধাম ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিতে পারিলেই সুখী হইত, লোকেরও আশা ও অভাব অল্প ছিল, তখন সকলেই নির্ভাবনায় অধিকতর উচ্চরবে হাসিতে পারিত এবং জীবনস্রোত অনায়াসে বহিয়া যাইত। এখন সেকাল দিন দিন পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, লোক সমাজের আচার ব্যবহার অধিকতর স্বার্থপর হইয়া আসিতেছে লোকসমাজ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নানারূপ গণনা করিয়া চলিতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতা কেবল আত্মসুখে ব্যস্ত। সেই সভ্যতা উদার হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জনসমাজকে নিতান্ত আত্মসুখতৎপর ও অর্থলোলুপ করিয়াছে। সুখসেব্য সামাজিক সুখের পরিবর্ত্তে এখন পাপময় পঙ্কিল আমোদের স্রোত সমাজমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লোকের এখন ধনগর্ব্ব জন্মিয়াছে। তখনকার আমোদ চণ্ডীমণ্ডপের আমোদ ছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে বৈটকখানা ও বিভবশালী অট্টালিকার ধুম ধাম,

সুসজ্জা, ধনগৌরব এবং মুখপ্রিয় শিষ্টাচার পরিদৃষ্ট হয়। তখনকার আমোদ গৃহস্থের আমোদ ছিল, সকলেই তাহার সম্ভোগে সন্তোষ লাভ করিত। এখনকার আমোদ ধনাঢ্যের আমোদ, তাহাতে হৃদয় নাই, কেবল বাহ্যিক সৌষ্ঠব, শিষ্টাচার ও ধূমধাম। নগরে যেমন এই প্রকার আমোদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, পল্লীগ্রামে ততদূর নহে। নগরের সংস্রবে পল্লীগ্রামস্থ লোকসমাজে ক্রমশঃ নাগরিক ধনীগণের হৃদয়শূন্য, আড়ম্বরগর্ভ, শুষ্ক আমোদ যদি প্রবিষ্ট হয়, তবে জানিব দুর্গোৎসবের আনন্দের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে।

পৌত্তলিকতার সংস্রবে মিশিতে হইবে বলিয়া অনেকে এখন দুর্গোৎসবের আনন্দে যোগ দিতে অগ্রসর নহেন। যাঁহারা এরূপ ভাবেন তাঁহারা পৌত্তলিকতার প্রকৃত তত্ত্ব সার মর্ম্ম, অবগত নহেন। যাঁহারা পৌত্তলিকতার সার মর্ম্ম, অর্থ, ও প্রয়োজনের বিষয় স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে যদি মানবকল্পিত কোন ঈশ্বরের পূজা বিহিত হয়, তবে পৌত্তলিক পূজা তাহার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। মানসিক, নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা, নিরর্থক কল্পনা মাত্র। যাঁহারা আবার তাঁহাতে অসীম দয়া, প্রেম, শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি মানুষী গুণপরম্পরা আরোপ করিয়া বসেন তাঁহারা কেবল একটি অলীক ঈশ্বরের কল্পনা করেন মাত্র। কারণ মানব যদি অনন্ত ঈশ্বরের কল্পনা করেন তাঁহাকে অবশ্য একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব সৃষ্টি করিবেন। সিংহের যদি ঈশ্বর কল্পনা ও সৃজন করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ঈশ্বর আবার সিংহ হইয়া যাইতেন। আমরা যাহাকে জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম বলি, তাহা মানবীয় ভাব, তাহা যে বাস্তবিক কোন নিত্যভাব কিনা তাহা কে বলিতে পারে? অনন্ত ঈশ্বরকে যাঁহারা কল্পনা করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা জগৎ-কারণে মানবীয় শ্রেষ্ঠগুণসকল আরোপ করিয়া একটি অসীম ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন ও ভাবিতেছেন তিনি তাঁহাদিগের অনন্ত ঈশ্বর, এবং সেই ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্ব ভাবে (১) পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে উদ্যত, তখন তাঁহারা পৌত্তলিকাতর আর কি বাকি রাখিয়াছেন? তাঁহারা সীমাবিহীন (১) এবং অনন্ত পদার্থে (২) কি প্রভেদ তাহা উদ্ভেদ করিতে না পারিয়া বিষম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। পৌত্তলিক হিন্দুগণও যে সাকার মূর্ত্তির পূজা করেন, তাহাতেও তাঁহারা অসীম মানবীয় গুণসকল আরোপ করিয়া থাকেন। তবে সাকার দেবতা এবং নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা মধ্যে কেবল ব্যক্তিত্ব ভাবের প্রভেদ দেখা যায়। যাঁহারা পৌত্তলিক হইতে চাহেন না, তাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার এবং

(১) ব্যক্তিত্ব ভাব = Personality.
(১) সীমাবিহীন-অসীম = Indefinite.
(২) অনন্ত = Infinite-

কতিপয়গুণসমষ্টি মাত্র বলিয়াকল্পনা করেন অথচ তাহাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন। এরূপ মানসিক ব্যক্তিত্ব ভাব অপেক্ষা সাকার দেবতা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ; বাস্তবিক যাঁহারা সাকার দেবতা পূজা করিতেছেন, তাঁহারা যে সেই দেবতা নিরাকার বলেন না এমত নহে। তবে তাঁহারা এই মাত্র বলেন, যে পূজার পক্ষে সাকার দেবতার কল্পনা করাই শ্রেয়ঃ কল্প। তাহাতে তাঁহাদিগের দেবভাবের কিছুই বিপর্য্যয় ঘটে না। মানসিক এবং নিরাকার ঈশ্বর কল্পনাকারিদিগের যে দেবভাব, পৌত্তলিকদিগেরও সেই দেবভাব। তবে এ দুই দলের মধ্যে প্রভেদ এই, পৌত্তলিকেরা হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে পারেন, অন্য দলের লোকেরা তাহা পারেন না। তাঁহাদিগের ঈশ্বর কেবল মানসিক ভাব মাত্র, তাহাতে হৃদয় প্রধাবিত হয় না। সে ঈশ্বর কেবল শুষ্ক কল্পনা মাত্র। তিনি মস্তিষ্কের ও মনের ঈশ্বর; তিনি পণ্ডিতের ঈশ্বর; হৃদয়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই। বাস্তবিক, পৌত্তলিকতায় যেমন মানব হৃদয়ের দেবভাব ও ঐশ্বরিক ভক্তি উদ্রিক্ত হয় এমত আর কিছুতেই হয় না। আমাদিগের সংস্কার এই, মানবের যদি কোন ঈশ্বরকল্পনা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অবধারিত হয়, মানব যদি স্বকীয় ঐশ্বরিক সৃষ্টির ভাব হৃদয়ে জাগরিত রাখিতে চাহেন, এবং সেই ভাবে সর্ব্বদা জীবনপথে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত হইতে চাহেন, এই যদি পৃথিবীর উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রণালী হয়, তবে পৌত্তলিকতাই সেই ধর্ম্মপ্রণালীকে সর্ব্বদা জীবিত রাখিবার প্রধান সাধন। সাধারণ লোকসমাজে ধর্ম্মভাব জীবিত রাখিবার পক্ষে পৌত্তলিকতাই প্রকৃষ্ট উপায়। পৃথিবী হইতে পৌত্তলিকতা যেমন অবসৃত হইতেছে, ততই ঐশ্বরিক ভক্তিভাব এবং ধর্ম্মের জীবিত ভাব হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ততই লোকের সাংসারিকতা ও বিষয়বাসনা প্রবৃদ্ধ হইতেছে। ইউরোপীয় সমাজ ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। ইউরোপে যখন ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন বরং লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলে ইউরোপে তাহার কিছু ভাব বিদ্যমান ছিল। এখন ইউরোপের সাধারণ লোকসমাজে ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত হীনাবস্থা। সাংসারিকতাই অত্যন্ত প্রবল। এদেশেও দিন দিন যেমন পৌত্তলিকতার হ্রাস হইতেছে ততই ধর্ম্মভাব নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। তৎপরিবর্ত্তে যে হৃদয়বিহীন ও শুষ্ক মানসিক ঈশ্বরপূজা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আমরা বলি তদ্দ্বারা পৃথিবীতে যাহাকে ধর্ম্মবলে সে ধর্ম্ম বরং ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইবে। দুর্গোৎসবাদি পৌত্তলিক অর্চ্চনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকিলে, ঐশ্বরিক ভক্তিভাব পৃথিবীতে জাগরিত থাকিবে, এবং লোকের অধিকতর ধর্ম্মভয় থাকিবে। এই ধর্ম্মভয় ও ভক্তি সুরক্ষিত করা যদি আবশ্যক হয়, তবে পৌত্তলিকতা প্রবর্ত্তিত রাখা সর্ব্বতো-

ভাবে কর্ত্তব্য। আমরা একথা বলিলে যাঁহাদিগের অপ্রিয় হইব, তাঁহারা যেন উগ্রস্বভাব খৃষ্টানপাদ্রী এবং রুক্ষ ব্রাহ্মগণের মত কেবল রুষ্ট ও ঘৃণাতৎপর না হইয়া স্থিরচিত্তে আমাদিগের কথা গুলির সারমর্ম্ম ও কতদূর অর্থ একবার আলোচনা করিয়া দেখেন এই আমাদিগের ভিক্ষা ও প্রার্থনা।

আজিও দুর্গোৎসবের প্রমোদ ও আনন্দধ্বনি বঙ্গদেশ হইতে কিছুই তিরোহিত হয় নাই। বঙ্গসমাজের যে অংশ ইহার প্রতি উদাসীন তাহা অতি যৎসামান্য; আজিও প্রতিবৎসর যখন দুর্গোৎসব উপস্থিত হয়, অমনি চারিদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের ধুমধাম, এবং জনসমাজের সজীবতা ও উৎসাহ উপলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশের অগণ্য লোক আজিও ইহার আনন্দে উন্মত্ত হইতেছে। চারিদিকে দেখ বাণিজ্যাগার সুশোভিত ও দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ। বিপণিবৃন্দ মহার্ঘ্য বসনদামে পরিভূষিত। লোকে কত উৎসাহের সহিত ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। আজিও উপঢৌকনের বিনিময়ে সকলেই স্নেহ মমতার নিদর্শন দেখাইতেছেন, এবং আর এক বৎসরের জন্য সদ্ভাব পরিস্থাপন করিতেছেন। হিন্দুর এমত গৃহ নাই, যে গৃহে দুর্গোৎসবের জন্য কিছু না কিছু আয়োজন ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। এ সময়ে গৃহ ও লোকসমাজ সুশোভিত এবং অলঙ্কৃত দেখিলে মন কি হর্ষোৎফুল্ল হয়না? যখন দুর্গোৎসবের বাজনা বাজে, যখন আমাদিগের স্বদেশীয় জগঝম্প, ও ঢোলের রোল বাজিয়া উঠে, তখন কি শরীরে লোমাঞ্চ হয় না? সে রোল কি কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করে না? দ্বিপ্রহর রজনীতে নিদ্রিত আছি, অমনি যখন এই বাদ্যের প্রবল রোল কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং জাগরিত হইয়া উঠি, অমনি সেই অর্দ্ধনিদ্রাবস্থায় ইহার আনন্দরব নীরবে আকর্ণন করিতে থাকি এবং তাহাতে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে। তখন মোহিনী কল্পনা আসিয়া আমাদিগের মনে কতই না স্বপ্ন উদিত করিয়া দেয়।

বঙ্গদেশে চারিদিক্ হইতে যখন দুর্গোৎসবের আনন্দরোল উত্থিত হয়, যখন দেশ শুদ্ধ লোক আমোদ প্রমোদ করিতে সকলকে আহ্বান করে, তখন কোন্ পাষাণ হৃদয় তাহাতে স্থির থাকিতে পারে? এ তো দুর্গোৎসব নয় ইহা প্রতি বৎসর নব জীবনের সময়। যাহাতে জন সমাজ প্রতি বৎসর নব জীবনে বলীয়ান্ ও সজীব হয় তজ্জন্য এই সাম্বৎসরিক উৎসবের সৃষ্টি। এ উৎসবকে অবজ্ঞা করিলে জীবনকে অবজ্ঞা করা হয়। এ তো দুর্গোৎসব নয়——ইহা প্রেম, ভ্রাতৃভাব, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সদ্ভাবনিচয় এবং জনসমাজের যত সুখময়ী সম্বন্ধ-বন্ধনী আছে তাহা পুনঃস্থাপন এবং সুদৃঢ় করণের উপযুক্ত অবসর। এ অবসর যিনি উপেক্ষা করেন, তিনি জনসমাজকেও

আত্মপরিজনবর্গকে উপেক্ষা করেন। তিনি হৃদয়ের সদ্ভাব উন্মেষণের অবসর উপেক্ষা করেন। তিনি আত্মোৎকর্ষ চাহেন না। এ তো দুর্গোৎসব নয়—ইহা হৃদয়ের দয়া ধর্ম্মের বাহ্য প্রবাহস্বরূপ।

আবার সেই তরুণ কাল স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, যে কালে দুর্গোৎসবের সকল আনন্দ প্রকৃত পক্ষে সম্ভোগ করিয়াছি। আবার কল্পনা আসিয়া কত নবীন সাজে সেই তরুণ কালের দৃশ্য সমূহকে সুসজ্জিত করিতেছে। কালের এই দূর দেশ হইতে সেই দৃশ্য সমূহকে আজিও নবীন ও সজীব দেখিতেছি। পরিণত বয়সের এই মরু ভূমিতে দাঁড়াইয়া, আরব পথিকের ন্যায় সুদূরবাহি গন্ধবহের সৌরভে আমোদিত হইতেছি।

আবার কবে গগণ পরিষ্কার হইবে, কবে চন্দ্রমা সুবিমল হইবে, কবে প্রভাকরের রৌদ্র ফুটিবে, কবে নদ নদী পূর্ণ গর্ভে প্রবাহিত হইবে, কবে প্রকৃতি নব জীবনে তেজস্বিনী, ও হরিৎ শোভায় মন পুলকিত করিবে, কবে ক্ষেত্র সমূহ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবে, কবে সেফালিকা, জবা, গন্ধরাজ, দোপাটী, অপরাজিতা, রজনীগন্ধ, কামিনী প্রভৃতি শরৎকুসুমচয় বনে বনে গন্ধে আমোদিত এবং সুকুমার শোভায় মনোহরণ করিবে, কবে প্রতি বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গমগণ সুখে আগমনীর সুস্বর গানে বঙ্গকানন প্রতিধ্বনিত করিবে, তবে আবার বঙ্গবাসীর মনে দুর্গোৎসবের আনন্দ-মারুত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। আবার এই সুখময় পৃথিবীতে এবং মানব জন্মে আর এক বৎসর কাল আমরা প্রকৃত জীবনের সুখ সম্ভোগ করিয়া সার্থকতা লাভ করিব।

শ্রীপূ——

## জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালি।*

অদ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই এক্ষণে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্যের মন উন্নতির দিকে প্রবলবেগে ধাবমান। কোন বাধা বিপত্তি এই বেগ সংরুদ্ধ করিতে অক্ষম। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপকরণ সকল মানবসমাজকে একত্র আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য যেন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। সমুদায় পৃথিবী যেন ক্রমে এক সাধারণতন্ত্ররূপে পরিণত হইতেছে। মানব মাত্রই যেন এক্ষণে পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও

* Joseph Mazzini and *La Giovina Italia* or Young Italiy.

ভ্রান্ত ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছেন। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। মানব মাত্রই এক্ষণে নিজের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রত্যেকের জীবনের(১) প্রত্যেক জাতির জীবনের(২) মানব সাধারণের জীবনের(৩)স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা মানব মাত্রই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। কি ধর্ম্ম নীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজবিজ্ঞান, কোন বিষয়েই ব্যক্তিবিশেষের, জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের অধীনতা স্বীকার করায়,— মানবপ্রকৃতির অবমাননা, মানবী উন্নতির গতি রোধ করা হয়, ইহা মানব মাত্রই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের, সম্প্রদায়বিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রভুত্বে যে জগতের মানব সাধারণের উন্নতি সম্ভাবিত নহে, তাহা এক্ষণে মানব মাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন। এতদিন তাঁহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। প্রথম ফরাশিবিপ্লবের উন্মাদিনী উত্তেজনায় মানবসমাজ যেন এখন সেই চিরনিদ্রা হইতে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। সেই ভীষণ বিপ্লবকালে হত অসংখ্য মানবের রুধির, হতাবশিষ্ট মানবজাতির মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার করিয়াছে। প্রোটেষ্টাণ্টিজ্‌ম (৪)যেমন পোপ-প্রচারিত ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে, মানব ধর্ম্ম (৫) যেমন প্রোটেষ্টাণ্টিজ্‌মকে অধঃকৃত করিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বব্যাপি সাধারণতন্ত্রের ভাব রাজ্যতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ আর এক্ষণে মানবজাতির উপাস্য দেবতা নাই। মানব সাধারণ(৬) এক্ষণে মানব মাত্রেরই উপাস্য দেবতা। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতা (৭), সমতা,(৮) একতা(৯) ও মানবপ্রেম এক্ষণে মানবমাত্রেরই উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাব ফরাশিবিপ্লবের পূর্ব্বে ভল্‌টেয়ার (১০) প্রভৃতি কতিপয় বৈজ্ঞানিকের মনে প্রথম সমুদিতহয় এবংতাঁহাদিগের নিকট হইতেই সমস্ত ফরাশি দেশে ব্যাপ্ত হইয়া ফরাশিবিপ্লবরূপ সেই ভীষণ প্রলয় উপস্থাপিত করে। সেই প্রলয়ের বেগ ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশকেই ক্রমে উপপ্লাবিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে এই গভীর ও উন্নত ভাব কোন দেশেই সর্ব্বপ্রথমে প্রজাসাধারণের মনে সমুদিত হয় না। ইহা সর্ব্বপ্রথমে কতিপয় মনীষীরই মনকে আন্দোলিত করে। তাঁহাদিগেরই জ্ঞানরশ্মির বিকীরণে ক্রমে প্রজা-

(1) Individual life.
(2) National life.
(3) Cosmopolitan life.
(4) Protestantism.
(5) Religion of Humanity.
(6) Humanity.
(7) Individual Liberty and National Independence.
(8) Fquality.
(9) Unity.
(10) Voltaire.

সাধারণেরও চিরনিমীলিত জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়।

যৎকালে ইতালী অষ্ট্রীয়সাম্রাজ্যের ভীষণ নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তৎকালে ইতালীর প্রজাসাধারণের মনে কোন গভীর যাতনা উপস্থিত হয় নাই। দাসত্বের ভীষণ মুর্ত্তি তাহাদিগের নিকট প্রশান্ত ও রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। অভ্যাসবশতঃ তাহারা আপন আপন অদৃষ্টে আপনারা সুখী হইয়া আসিতেছিল। তাহাদিগের হৃদয় মন ও শরীর ভীষণ দাসত্বভরে যে ক্রমে জীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছিল, তাহা তাহারা প্রথমে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যখন তাহারা প্রায় কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে, যখন তাহাদিগের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা নাই তখনও তাহারা নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু এই গভীর নিদ্রার সময়েও স্থানে স্থানে কতিপয় বীরপুরুষ কর্ত্তৃক শৃঙ্খলভেদের চেষ্টা [illegible]ত হইত। কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান বিরহে এরূপ আংশিক চেষ্টা প্রায় উক্ত বীরপুরুষদিগের নির্ব্বাসনে বা শিরশ্ছেদনে পর্য্যবসিত হইত।

এই সময় একদিন কতিপয় পলাতক বিদ্রোহীকে দেখিয়া ম্যাট্‌সিনি নামক একজন ইতালীয় যুবকের মনে এই গভীর চিন্তা সমুদিত হয়—"ইতালী আর কতদিন এরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? ইতালীর দাসত্ব কি কখনই উন্মোচিত হইবে না? আমরা—ইতালীর অধিবাসীরা—যদি সকলেই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও কি ইতালীর স্বাধীনতা পুনঃসংস্থাপিত করিতে পারিবনা?" যেন কোন দৈববাণী এই প্রশ্নের উত্তরে বলিল "ইতালী আর অধিকদিন এরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকিবেনা। ইতালী অষ্ট্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে অচিরাৎ উন্মুক্ত হইবে। ইতালীর অধিবাসীরা যদি সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করে তাহা হইলে একদিনেই ইতালীর দুর্গোপরি জাতীয় জয়পতাকা উড্ডীন হইতে পারে।" এই বাক্যগুলি সুমধুর বীণাধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণকুহরে যেন মধুধারা বর্ষণ করিল

ম্যাট্‌সিনি আশৈশব পিতামাতাকর্ত্তৃক সমতা ও সাধারণতন্ত্রপ্রণালীর উপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কি ধনী কি দরিদ্র সকলের প্রতিই তাঁহার পিতামাতার সমান ব্যবহার ছিল। অবস্থাভেদে তাঁহাদিগের নিকট ব্যবহারভেদ ছিলনা। সকল অবস্থাতেই একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাদিগের আদরের পাত্র ছিলেন। ম্যাট্‌সিনির নিজেরও স্বাভাবিকী প্রবণতা, সমতা ও স্বাধীনতার দিকেই ছিল। সেই স্বাভাবিকী প্রবণতা ফরাশি সাধারণতন্ত্রী লেখকগণের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে এবং লিভি (১) ও ট্যাসিটস্ (২) প্রভৃতি লাটিন গ্রন্থকার দিগের গ্রন্থাবলীর আলোড়নে অধিকতর পরিবর্দ্ধিত ও পরিণত হইল।

(1) Livy. (2) Tacitus.

এই পরিণত ও পরিবর্দ্ধিত স্বাভাবিকী স্বাধীনতাপ্রবণতা হইতেই ইতালীকে অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করার ইচ্ছা ম্যাট্‌সিনির অন্তরে অতিশয় বলবতী হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে জেনোয়া নগরে জননীর সহিত পরিভ্রমণ করিতে করিতে পলায়মান অকৃতকার্য্য পীড্‌মণ্টিস্‌ বিদ্রোহীদিগের সহিত যে দিন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতেই স্বদেশের উদ্ধার সাধন তাঁহার জীবনের এক মাত্র ব্রত হইয়া উঠিল। ইতালীয় অধিবাসিমাত্রেরই স্বদেশের অত্যাচার নিবারণে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত; তিনিও ইতালীর অধিবাসী সুতরাং তাঁহারও এই গুরুতর উদ্যমের অংশভাগী হওয়া উচিত—এই চিন্তা এই দিন হইতে এক দিনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। দিবসে যখন জাগরিত থাকিতেন, রজনীতে যখন নিদ্রায় অভিভূত হইতেন, সকল সময়েই সেই পলায়মান বিদ্রোহী-দিগের মূর্ত্তি তাঁহার স্মরণপথে আবির্ভূত হইয়া যেন তাঁহার আত্মাকে কর্ত্তব্যের অকরণ জন্য তিরস্কার করিত। এই সকল উন্মাদিনী উত্তেজনায় তাঁহার অন্তর নাচিয়া উঠিল। তিনি এই কিশোরবয়সেই সেই বিদ্রোহের অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং সেই বিদ্রোহকালে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল ও যে যে লোক তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সকলের তালিকা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে সকলেই যদি প্রাণপণে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এ বিদ্রোহ কখনই অকৃত-কার্য্য হইত না। যদি সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিলে ইতালীর উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হয়, তবে সে চেষ্টার পুনরারম্ভ করা না যায় কেন?

এই ভাব সেই বাল্যবয়স হইতেই তাঁ-হার হৃদয় অধিকৃত করিল। এক্ষণে কি উপায়ে তাঁহার অভীষ্ট সাধন করিবেন এই ভাবনায় তাঁহার শরীর ও মন জর্জ্জ-রিত হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাষ্ঠমঞ্চকে (১) উপবিষ্ট, অন্যান্য সমপাঠী বালকবৃন্দ তাঁহার চতু-র্দ্দিকে প্রফুল্লমনে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইতেছে, কিন্তু তিনি বিষণ্ণ ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বোধ হইত যেন অকালে জরা আসিয়া তাঁহার শরীর ও মন আচ্ছন্ন করিয়াছে। লোকে আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করে, তিনি স্বদেশের শোকচিহ্নস্বরূপ আপনাকে সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সতত আচ্ছাদিত রাখিতেন। ক্রমে এই শোকের ভাব এত গভীরতর হইয়া আসিল, যে তাঁহার দুঃখিনী জননীর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল পাছে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র আত্মহত্যা করেন।

ক্রমে শোকের নবীনতাজনিত উদ্বেলতা তিরোহিত হইয়া হৃদয়ে শান্তি পুনঃ-

(1) Benches.

সংস্থাপিত হইল। এই সময় রফিনি (১) নামক ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। এতদিন তাঁহার নিকট জীবন কেবল দুঃখময় বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। কিন্তু এই বন্ধুত্ব ঘটনায় তাঁহার বিশুষ্ক জীবন যেন সজীব হইয়া উঠিল। যে আভ্যন্তরীণ বহ্নি তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইল। তাঁহাদিগের সহিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও দার্শনিক ধর্ম্মশাস্ত্র (২) প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায়; এবং কিরূপে ইতালীর পুনরুদ্ধার সাধন হইবে, তজ্জন্য কিরূপে নানা স্থানে সভা সংস্থাপন করিতে হইবে তাহার উপায় চিন্তনে; তাঁহার জীবন এক্ষণে কথঞ্চিৎ সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। কার্য্যের প্রসর পাওয়ায় তাঁহার হৃদয় প্রশান্ততর হইল। ক্রমে ক্রমে ইতালীর পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প কতিপয় যুবক তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ইহাঁদিগের সাহায্যে তাঁহার হৃদয়ের গভীর যাতনা কথঞ্চিৎ অপনীত হইল। জগৎ তাঁহার নিকট আর শূন্য ও জীর্ণারণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল না।

এই সময় পন্থিনীয়ার (৩) নামে এক ব্যক্তি জেনোয়ায় ইণ্ডিকেটর (৪) নামে এক খানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু ম্যাট্সিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এই পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, গবর্ণমেণ্টের আদেশে অচিরকালমধ্যেই ইহার প্রচার রহিত হইল। যাহাহউক যেরূপ তেজে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখা হয়, তাহাতেই ম্যাট্সিনির যশ জেনোয়ার সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইল।

এই সময় গোয়েরাট্সি (৫) নামক এক জন সুবিখ্যাত নাটককারের সহিত ম্যাট্সিনির বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিল। সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জেনোয়ার ইণ্ডিকেটরের প্রচার রহিত হইলে; ম্যাট্সিনি, গোয়ারাট্সি ও তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ স্থির করিলেন যে লেগহরণে ইণ্ডিকেটরের পুনঃ প্রচার আরম্ভ করিবেন। এই দ্বিতীয় পত্রিকায় তাঁহাদিগের রাজর্ষিরোধী ভাব অভ্রান্তরূপে পরিব্যক্ত হইল। ফস্কোলো (৬) পীট্রো জিয়ানন (৭) জিয়োভনি বার্চেট (৮) প্রভৃতি যে সকল লেখকগণ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখার জন্য নির্ব্বাসন প্রভৃতি নানা দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, ইঁহারা এই নূতন পত্রিকায় তাঁহাদিগেরই স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদিগের সাহস এতদূর বাড়িয়া উঠিল, যে নিদ্রাভিভূত টস্কান্

(1) Ruffinis.
(2) Philosophical religion.
(3) Ponthinier.
(4) Indicator.
(5) Guerrazzji.
(6) Foscolo.
(7) Pietro Giannone.
(8) Giovanni Berchet.

গবর্ণমেণ্টেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল; এবং ইহার আদেশে তাঁহাদিগের পত্রিকার প্রচার রহিত হইল। এরূপ বলপূর্ব্বক পত্রিকার প্রচার রহিত করায় ইতালীর ভাবি মঙ্গলের সূত্রপাত করা হইল। ইহাতে দেশের লোকের মনে, ইতালীর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টসকল যে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির শত্রু, এই ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইল; সুতরাং সকলেরই মনে এই প্রতীতি জন্মিল যে ইহাদিগের উন্মূলন ব্যতীত ইতালীর আর মঙ্গল নাই। যে সকল হৃদয়-তন্ত্রী এতদিন নীরব ছিল, তাহা এক্ষণে এক রবে বাজিয়া উঠিল।

এই সময় কার্বোন্যারিজম্ (১) নামে একটী গুপ্ত সম্প্রদায় ইতালীতে পুনঃ সংস্থাপিত হয়। এই সম্প্রদায়ের সহিত অনেক বিষয়ে ম্যাট্‌সিনির সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু ইহাদিগের যে বিষয়েব তিনি উপাসক ছিলেন তাহা এই—যে কথা সেই কায! যে চিন্তা সেই কায! যে বিশ্বাস সেই কায! নির্ব্বাসন ও প্রাণদণ্ডের ভয় ইহাঁদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে রেখামাত্রও বিচলিত করিতে পারিত না। অধ্যবসায় ইহাঁদিগের জীবন ছিল। ইহাদিগের আর একটী বিশেষ ক্ষমতা এই ছিল যে—যতবার পুরাতন জাল ছিন্ন করিবে, ততবারই ইহাঁরা নূতন জাল প্রস্তুত করিতে পারেন। এই সকল কারণে ম্যাট্‌সিনি এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলেন।

যে গুরুদ্বারা তিনি এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন, তাঁহার নাম রায়মন্‌ডো ডোরিয়া (২)। তিনি অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'আদেশমাত্র কার্য্য করিতে পারিবে কি না? প্রয়োজন হইলে এই সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে পারিবে কি না?' ম্যাট্‌সিনি বলিলেন পারিব। তাহার পর তাঁহাকে জানুপরি বসিতে বলিয়া, অসি নিষ্কোশিত করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র স্বরূপ কতিপয় নিয়ম পালন করিবার জন্য শপথ করাইলেন। পরে সেই সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃগণকে চিনিতে পারা যায় এমন দুই তিনটী সঙ্কেত প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিলেন। ম্যাট্‌সিনি আজ হইতে কার্ব্বোন্যারো হইলেন।

"আদেশমাত্র কার্য্য করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এই সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও করিতে হইবে।"—কাহার আদেশ? কি কার্য্য? এই সম্প্রদায়ভুক্ত কতগুলি লোক আছেন এবং তাঁহাদিগের নামই বা কি? কোন্ মঙ্গলই বা তাঁহাদিগের অভীষ্ট? ম্যাট্‌সিনি এই সকল বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি কেবল এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে তাঁহাকে নিস্তব্ধভাবে আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে এবং আদেশ ও মন্ত্রণা গোপন রাখিতে হইবে। তাঁহার দীক্ষাগুরু মূলমন্ত্রোচ্চারণকালে

(1) Carbonarism.

(2) Raimondo Doria.

আদেশ প্রতিপালন ভিন্ন আর কোন ক-থারই উল্লেখ করেন নাই। কি উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে হইবে তাহার তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই দীক্ষাগুরুপ্রদত্ত মূলমন্ত্রের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কিরূপে উন্মূলিত করিতে হইবে এবং ইহা উন্মূলিত করিয়া ইতালীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে এক শাসনের অধীন ক-রিতে হইবে কি স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে, ইতালীতে সাধারণতন্ত্র কি রাজ্যতন্ত্র সংস্থাপিত হইবে, তিনি তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ দেন নাই।

দীক্ষাকালে প্রত্যেক সভ্যকে কুড়ি ফ্রাঙ্ক এবং মাসিক পাঁচ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইত। যদিও ইহা ম্যাট্সিনির ন্যায় ছাত্রের পক্ষে অতিশয় গুরুভার, তথাপি তিনি ইহা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রদান করিতেন। মন্দ উদ্দেশ্যে পরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা পাপ বটে, কিন্তু যে কার্য্যে একটী মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ কার্য্যে অর্থ প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হওয়া তাহা অপেক্ষা অধিকতর পাপ সন্দেহ নাই।

এই সময়কার বিশ্বব্যাপিনী-বদ্ধমূল-স্বার্থপরতা-জনিত লোকের এই একটী বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সৎকার্য্যে একটী টাকা ব্যয় করিতে হইলে সহস্র তর্ক—সহস্র বিতণ্ডা উপস্থাপিত করিবেন, কিন্তু আমোদ প্রমোদে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে একটী বাক্যব্যয়ও করিবেন না। শরীরের রক্তের বিনিময়ে যাঁহাদিগের দেশের উদ্ধার সাধন করা উচিত, স্বদেশের স্বাধীনতা ক্রয় করা উ-চিত, তাঁহারাই বারম্বার আত্মস্বার্থত্যাগের অসম্ভবনীয়তা খ্যাপন করিতে লজ্জিত হই-বেন না। বরং তাঁহারা আপনাদিগের মান, সম্ভ্রম, জীবন পর্য্যন্তও বিপদরাশিতে নিমগ্ন করিবেন, স্বদেশবাসিগণের—ভ্রাতৃগণের—আত্মাকে দাসত্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত ক-রিবেন, তথাপি আপনাদিগের কোষভাণ্ডা-রের দ্বার কখনই উদ্ঘাটন করিবেন না।

প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদিগের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া দরিদ্র ভ্রাতৃগণের উপকারার্থ তাঁহাদিগের সমস্ত ধনসম্পত্তি ধর্ম্মগুরুর চরণে নিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে ইতালীর দুই কোটী পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে এমন এক লক্ষ লোক পা-ওয়া যায় না, যাঁহারা ইতালী উদ্ধারের জন্য প্রত্যেকে একটী করিয়া মুদ্রা দিতে পারেন; অথচ ইতালীতে এমন লোক নাই যিনি ইতালীর স্বাধীনতা চান না।

দীক্ষিত হওয়ার অল্প দিন পরেই ম্যাট্সিনি কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেন। এখন হইতে তিনি স্বয়ং অন্যকে দীক্ষিত করিবার অ-ধিকার পাইলেন। তথাপি এই সম্প্রদায় কি প্রণালীতে কার্য্য করিতেছে ও কি প্রণা-লীতে কার্য্য করিবে, তদ্বিষয়ে তিনি এখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিলেন। ক্রমে তাঁহার এইপ্রতীতি জন্মিল যে অদ্যাপি ইহাঁরা কোন কার্য্যই করেন নাই। ইহাঁরা সতত বলি-

তেন যে ইতালীর কার্য্যকরী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আপনাদিগকে বিশ্বস্বাধীনতাবাদী (১) বলিয়া পরিচয় দিতেন। যাঁহারা জগতের অধিবাসীমাত্রেরই স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারাই উক্ত পদের অভিবাচ্য। কিন্তু ইহাঁরা জানিতেন না যে যাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে জগতের অধিবাসীমাত্রেরই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র?

যাহা হউক ম্যাট্‌সিনি এই সম্প্রদায়ের সহিত এক্ষণে কোন প্রকাশ্য বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া নবাধিগত অধিকার অনুসারে এই সম্প্রদায়ে নব নব শিষ্য দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে এমন এক দিন আসিতে পারে, যখন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা এত বেশী হইতে পারে, যে তিনি তাহাদিগের সাহায্যে একটী নূতন সমাজ স্থাপন করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের মৃতদেহে নব জীবন সঞ্চারিত করিতে পারিবেন।

এই সময় ফ্রান্সে দশম চার্লস ও সাধারণতন্ত্রিদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। (২)গিজো, (৩)বার্থ, (৪)লাফেট প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সাধারণতন্ত্রি দলের অধিনায়ক ছিলেন। ইহাঁদিগের সহিত কার্বোন্যারো দলের অধিনায়কদিগের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। আবশ্যক হইলে ইহাঁদিগের সাহায্য করিতে হইবে, এই ভাবিয়া কার্বোন্যারো দলের অধিনায়কেরা আপনাদিগের কার্য্যচেতনা উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। ম্যাট্‌সিনির উপর আদেশ হইল তিনি টস্‌কানীতে গিয়া কার্বোনারিজম্‌ সম্প্রদায়ের শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করেন। টস্‌কানী যাত্রার পূর্ব্ব দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তৎকর্ত্তৃক দীক্ষিত সমস্ত শিষ্য সেই স্থানে তদাগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের সমস্ত কার্য্য এত নিভৃতভাবে সংসাধিত হইত যে ম্যাট্‌সিনির শিষ্যেরা কেহই জানিত না যে তাহাদিগকে কোথায় যাইতে হইবে। যাহা হউক এই শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ম্যাট্‌সিনি অবশেষে লেগ্‌হরণে উপস্থিত হইয়া টস্‌কানী ও অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিদিগকে এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে কার্লো বিনি(৪)নামে একজন কার্ব্বোন্যারো ম্যাট্‌সিনির বিশেষ সহায়তা করেন। এই যুবকের হৃদয় অতি উদার ও পবিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি অতি তেজস্বিনী ছিল। বাণিজ্যের অনুসরণে সতত ব্যস্ত থাকায় ও তাৎকালিক মনুষ্য ও ঘটনাবলীর কৃতকার্য্যতার উপর বিশ্বাস না থাকায়, এমন উদার হৃদয় ও এতা

(1) Cosmopolitan.
(2) Guizot.
(3) Berthe.
(4) Lafayette.

(4) Carlo Bini.

তেজস্বিনী বুদ্ধির বিস্ফুরণ সতত হইতে পারিত না। পারলৌকিক পুরস্কারের আশা ও বিশ্বাস বিনা অসাধারণ ধর্ম্ম-নৈতিক দৃঢ়তা ও অসীম আত্মত্যাগ সম্ভাবিত নয়—যাঁহাদিগের এরূপ বিশ্বাস, কার্লো বিনির চরিত্র তাঁহাদিগের বিশ্বাসের অমূলকতা সম্প্রমাণ করিতেছে।

কার্লোবিনিও ম্যাট্সিনির ন্যায় কার্ব্বোন্যারিজমের সঙ্কেতাদির উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। তথাপি তিনি যে কোন প্রকার সভা স্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন। ইহাঁরা দুইজনে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন মান্টপল্সিয়ানো (১)নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে এই সময়ে, কসিমো ডেল্ফ্যান্টি(২)নামক সাহসিক সৈনিক পুরুষের প্রশংসাসূচক গীতি গাওয়ারূপ অপরাধে গোয়েরাট্সি কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টসকলের এতদূর আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা সংঘটিত হইয়াছিল, যে অধীন জাতি কোন বীরপুরুষের যশোগান করিয়া আপনাদিগের নিমজ্জনোন্মুখ আত্মাকে কথঞ্চিৎ উত্তোলিত করিতে গেলেও, তাহারা ভয়ে কম্পিত হইত। তাহাদিগের সাধ্য থাকিলে তাহারা ইতিহাসকে জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিত সন্দেহ নাই। অবশেষে গোয়েরাট্সির সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা দেখিলেন গোয়েরাট্সি সেই ভীষণ কারাগারে বসিয়াও তাঁহার "অ্যাসিডিও ডি ফিরেঞ্জ" (৩) নামক গ্রন্থের রচনায় নিমগ্ন আছেন। তিনি উপক্রমণিকাটী তাঁহাদিগের নিকট পাঠ করিয়া স্বয়ং এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন, যে মস্তকে জল বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশের অতীত অবদানপরম্পরার উপর তাঁহার গভীর ভক্তি, ও ভাবি মহত্বের উপর তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ইতালী ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে, তাঁহার অতীব তেজস্বিনী কল্পনা তাঁহার মনোদর্পণে তাহাদিগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিত। কিন্তু কি উপায়ে সেই মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদিত হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি কোন স্থিরতা অবলম্বন করিতে পারিত না। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা গিজো (৪) ও কুজিন (৫) দত্ত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক উপদেশ সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। গিজো ও কুজিনের মত সকল উন্নতিপক্ষপাতি ছিল; এই জন্য তাঁহাদিগের উপদেশ সকলের আগমন কাল তাঁহারা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। ম্যাট্সিনি ড্যান্টের "ডেলা.মনার্কিয়া" (৬) নামক পুস্তক পাঠ করা অবধি এই মতের পক্ষপাতী হন। তিনি সেই অবধি এই মতটী অধিষ্ঠাত্রী

(1) Montepulciano.
(2) Cosimo Delfante.
(3) Assedio di Firenze.
(4) Guizot.
(5) Cousin
(6) Dante's *Della Monarchia.*

দেবতাস্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। এইজন্য তিনি গোয়েরাট্সির নিকট গিজো ও কুজিনের উপদেশ সকলের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। 'উন্নতি—' তিনি বলিলেন 'উন্নতি প্রাণিদিগের প্রাণ, ঈশ্বরদত্ত প্রধান প্রসাদ, ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধি; এই বিধির জ্ঞানে ও অনুসরণে মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ অচিরাৎ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইবে।'

গোয়েরাট্সি ঈষৎ হাঁসিলেন, তাঁহার হাস্যে যেন ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধির প্রতি অবিশ্বাস মাখা ছিল। ম্যাট্সিনির ঈশ্বরপরায়ণ হৃদয় ইহাতে ব্যথিত হইল। তিনি এতদূর বিরক্ত ও কাতর হইলেন যে বিনির হস্তে তাঁহাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য ন্যস্ত করিয়া গোয়েরাট্সির কারামন্দির পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইলেন।

জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের অধিনায়কদিগের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার উপর আদেশ হইল তিনি যেন তদীয় দীক্ষাগুরু ডোরিয়ার নিকট তাঁহার কার্য্যের কোন বিবরণ না দেন। এবং ডোরিয়ার উপর আদেশ হইল তিনি তৎকৃত কোন অজ্ঞাত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ যেন কিছুকালের জন্য জেনোয়া নগর পরিত্যাগ করেন। একদিন প্রত্যূষে ম্যাট্সিনি ব্যাভেরী গ্রামস্থ তদীয় জননীর বাসস্থান হইতে আসিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে ডোরিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ডোরিয়া কোথা হইতে আসিতেছিলেন তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে ডোরিয়া এই সম্প্রদায়ের উপর ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, এবং এই সম্প্রদায়ের প্রতি, ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি, ও ইহার নবদীক্ষিত সভ্যদিগের প্রতি প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।

এই সময় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফরাশি বিপ্লব উপস্থিত হয়। উক্ত সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা যেন সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ম্যাট্সিনির ন্যায় যুবা সভ্যেরা গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণসামগ্রী সকল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তেজস্বিনী কল্পনাবলে তাঁহারা যেন যুদ্ধক্ষেত্র সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় ম্যাট্সিনি হঠাৎ একদিন আদেশ পাইলেন, যে তাঁহাকে লায়ন্ রুগ্ (১) নামক হোটেলে যাইতে হইবে, তথায় মেজর কটিন্(২) নামক একজন সেভয়বাসী সৈনিক পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, সে পূর্ব্বেই এই সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণীতে দীক্ষিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিতে হইবে। এই সম্প্রদায়ের যুবা সভ্য সকল প্রাচীন সভ্যদিগের দ্বারা যেন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইতেন। এই জন্য ম্যাট্-

(1) Lion Rouge.
(2) Major Cottin.

সিনি মনে করিলেন—এ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত না করিয়া উক্ত সৈনিক পুরুষের সহিত পরিচিত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল না কেন?—এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক। সুতরাং তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তথায় যাইবার পূর্ব্বে ম্যাট্‌সিনির মনে যেন দৈবীশক্তি বলে কোন ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তাঁহার মনে বোধ হইল যেন তিনি কারারুদ্ধ হইবেন। এই জন্য তিনি জননীর পত্রের অভ্যন্তরে রফিনিদিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন এবং অনুরোধ করেন, যে যদি তিনি যথার্থই কারারুদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন জননীর শোকাপনোদন করিতে চেষ্টার ত্রুটি না করেন।

তাঁহার আশঙ্কা ফলবতী হইল। তিনি নির্দ্দিষ্ট দিবসে উক্ত হোটেলে উপস্থিত হইলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার সময় একটী ঘরে প্যাসানো (৩) নামক উক্ত সম্প্রদায়ের এক জন সভ্যকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু প্যাসানো এরূপ ভঙ্গি করিল যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

তিনি কটিনের বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, এক জন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, কটিন্‌কে দেখাইয়া দিল। কটিন্ দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, তাহার চক্ষুদ্বয় সংপ্লবমান। তাহার আকৃতি দেখিয়াই যেন ম্যাট্‌সিনির মনে কোন অসুখের ভাব উদিত হইল। কটিন্ সৈনিক পরিচ্ছদে আবৃত ছিল না। সে ফরাশি ভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

ম্যাট্‌সিনি নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত দ্বারা কটিন্‌কে জানাইলেন যে তিনি একজন সাম্প্রদায়িক ভ্রাতা এবং বলিলেন যে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বোধ হয় তাহার অবিদিত নাই। কটিন্ কোন উত্তর না করিয়া তাঁহাকে নিজ শয্যাগৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহার সম্মুখে জানুপরি বসিল। তদনন্তর ম্যাট্‌সিনি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যষ্টি হইতে অসি নিষ্কোশিত করিয়া যেমন তাহাকে শপথ উচ্চারণ করাইতে যাইবেন, অমনি শয্যাপার্শ্বস্থ-প্রাচীর-সংলগ্ন একটী গবাক্ষদ্বার দিয়া একটী অপরিচিত মুখ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সেই অপরিচিত মুখ ক্ষণকালের জন্য ম্যাট্‌সিনির প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া গবাক্ষদ্বার পাতন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল। কটিন্ যেন ইহাতে লজ্জিত হইল এবং ম্যাট্‌সিনিকে এবিষয়ে উদ্বিগ্ন হইতে বারণ করিল; এবং বলিল যে ঐ ব্যক্তি তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য বই আর কেহই নহে; আর গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া যাওয়ার জন্য যে অপরাধ হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অবশেষে দীক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইলে, কটিন্ বলিল যে সে অচিরাৎ কিছুদিনের জন্য নাইছ (১) গমন করিবে, তথায় সেনামধ্যে সে অনেক কার্য্য করিতে পারিবে। কিন্তু নিজ স্মরণ শক্তির উপর তাহার কোন বিশ্বাস নাই; এই জন্য তাহার প্রার্থনা তিনি যেন

(3) Passano.

(1) Nice.

স্বহস্তে দীক্ষামন্ত্রগুলি তাহাকে লিখিয়া দেন। ম্যাট্‌সিনি ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে এরূপ কার্য্য তাঁহার অভ্যাসের বিপরীত; তবে তিনি মন্ত্রগুলি মুখে বলিয়া যাইতে পারেন, ইচ্ছা থাকিলে সে স্বয়ং সে গুলি লিখিয়া লইতে পারে। কটিন্ স্বীকৃত হইল, এবং স্বহস্তে মন্ত্রগুলি লিখিয়া লইল। ম্যাট্‌সিনি তাহার পর তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন; কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি অতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন।

ম্যাট্‌সিনি অবশেষে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি একজন ছদ্মবেশী পুলিশকর্ম্মচারী। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ম্যাট্‌সিনি পুলিশের হস্তে পতিত হইলেন। যৎকালে তিনি পুলিশকর্ত্তৃক ধৃত হন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের অনেক গুলি অভিযোগ ছিল—প্রথমতঃ গুলি প্রস্তুতকরণ; দ্বিতীয়তঃ বিনির নিকট হইতে সাঙ্কেতিক পত্র প্রাপ্তি, তৃতীয়তঃ ত্রিবর্ণ (২) কাগজে জুলাইমাসের তিন দিবসের ইতিহাস লেখন; চতুর্থতঃ কটিন্‌কে কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করণ কালে মন্ত্রোচ্চারণ, এবং শেষতঃ অসিগর্ব্ভ যষ্টি ব্যবহার করণ। ম্যাট্‌সিনি এক এক করিয়া সমস্ত অভিযোগ হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রজাপীড়ন করিবার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী ছিল, কিন্তু কিরূপে প্রজাপীড়ন করিতে হয় গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিত না। ম্যাট্‌সিনির গৃহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোড়ন করিয়াও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কাগজপত্র পাইল না।

প্রেটোলঙ্গো(৩)নামে যে কমিশনর ম্যাট্‌সিনির বিচারার্থ নিযুক্ত হন। তিনি প্রমাণাভাবে ম্যাট্‌সিনিকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তথাপি তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেননা। ম্যাট্‌সিনি পিয়াট্‌সা সার্জ্জেনোর (৪) শিবিরে অবরুদ্ধ থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। এখানে এক জন প্রাচীন কমিশনর কর্ত্তৃক তিনি পুনর্ব্বার পরীক্ষিত হইলেন। তিনি ম্যাট্‌সিনির প্রতি নানাপ্রকার প্রশ্ন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, নানাপ্রকারে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহার নিকট হইতে কিছুই বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্লান্ত ও ক্রোধান্ধ হইয়া, ম্যাট্‌সিনিকে হতবুদ্ধি করিবার নিমিত্ত বলিলেন— "তুমি এখনও স্বীকার কর, তোমার সমুদায় বিষয় প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, এখন গোপন করা বৃথা। তুমি অমুক দিন, অমুক সময় মেজর কটিন্ নামক কোন ব্যক্তিকে কার্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিয়াছিলে।"

ভয়ে ম্যাট্‌সিনির সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি কথঞ্চিৎ ভয় সম্বরণ

(2) Tri-coloured.

(3) Pratolongo.

(4) Piazza Sarzano.

করিয়া বলিলেন—"স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাপবাদের অসত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র! আচ্ছা যদি ইহা সত্য হয় তবে আপনি কেন উক্ত মেজর কটিন্‌কে আমার সম্মুখীন করুন্ না।"

কিন্তু কমিসনর মেজর কটিন্‌কে ম্যাট্‌সিনির সম্মুখীন করিতে পারিলেন না। কারণ ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে গোয়েন্দার কার্য্য গ্রহণ করার সময় কটিন্ গবর্ণমেণ্টকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করে, যে তাহাকে যেন কোন মতেই বিচার স্থলে আনয়ন করা না হয়।

ম্যাট্‌সিনি কিছুদিন সেই শিবিরেই অবরুদ্ধ রহিলেন। যে কয়েক দিন তিনি তথায় ছিলেন, সৈনিকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার রহস্য কৌতুক করিত। তিনি যেন তাহাদিগের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠিলেন। যত দিন তিনি শিবিরে আবদ্ধ ছিলেন প্রতিদিনই গৃহ হইতে তাঁহার জন্য আহারীয় দ্রব্যাদি আসিত। এক দিন তাঁহার জননী সেই আহারীয় দ্রব্যাদির অভ্যন্তরে একটী পেন্‌সিল্ পাঠাইয়া দেন। ম্যাট্‌সিনি ধৌত করিবার নিমিত্ত বাটীতে যখন তাঁহার লিনেন্ জামা পাঠাইয়া দিতেন, সেই সময় সেই পেন্‌সিল্ দিয়া আপনার মন্তব্য কথা সেই জামায় লিখিয়া পাঠাইতেন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগকে গৃহস্থিত কতকগুলি কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবার উপদেশ দেন। সেই কাগজপত্রগুলি ধরা পড়িলে টস্কানীর অনেক গুলি কার্ব্বোন্যারোর প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন বা কারাবরোধ হইত সন্দেহ নাই।

যৎকালে ম্যাট্‌সিনি কারারুদ্ধ হন, তৎকালে মরেলি (১) নামক একজন ব্যবহারাজীব, ডোরিয়া নামক একজন পুস্তকবিক্রেতা এবং প্যাসানো ও টোরি (২) প্রভৃতি আরোও অনেকগুলি কার্ব্বোনারো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

একদিন ম্যাট্‌সিনির পিতা জেনোয়ার গবর্ণর ভেনান্‌সন্‌কে (৩) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার পুত্র কি অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তদুত্তরে গবর্ণর বাহাদুর বলিলেন "এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তথাপি যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে তোমার পুত্রের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং তাহার প্রকৃতি অতি চিন্তাশীল; কিন্তু তাহার চিন্তার বিষয় যে কি, তাহা সে জিজ্ঞাসা করিলেও কোনমতে প্রকাশ করেনা। আর সে রজনীতে নির্জ্জন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে অতিশয় ভাল বাসে। এরূপ তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন যুবকবৃন্দ—যাহাদিগের গভীর চিন্তার বিষয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অবিদিত—কখন গবর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজন হইতে পারেনা"।

একদিন রজনীতে ম্যাট্‌সিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমন সময় দুইজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া তাঁহার

(1) Morelli.
(2) Torre.
(3) Venanson.

নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুবর্ত্তন করিতে বলিল। ম্যাট্‌সিনি মনে করিলেন তাঁহাকে বুঝি আবার পরীক্ষা করিবে বলিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন তাহারা তাঁহাকে বস্ত্রাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহাকে এ শিবির পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে কোথায় যাইতে হইবে। তদুত্তরে তাহারা বলিল যে তাঁহার নিকট তাহা ব্যক্ত করার নিষেধ আছে। তখন হঠাৎ স্নেহময়ী জননীর কথা ম্যাটসিনির মনে উদিত হইল। জননী যদি পরদিন জানিতে পারেন যে তাঁহার পুত্রকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে পুত্রের জীবন বিষয়ে হতাশ হইয়া হয়ত তিনি আত্মহত্যা করিবেন। এই জন্য ম্যাট্‌সিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বলচালিত না হইলে জননীকে পত্র না লিখিয়া তিনি এক পাদও বিচলিত হইবেন না। সৈনিকদ্বয় অনেক চিন্তার পর আপনাদিগের দলপতির সহিত পরামর্শ করিয়া ম্যাট্‌সিনিকে পত্রলিখিতে অনুমতি প্রদান করিল। ম্যাট্‌সিনি জননীকে এই মর্ম্মে কতিপয় পংক্তি লিখিলেন যে তিনি শিবির পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই। পত্র সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই সৈনিক পুরুষদিগের অনুগমন করিলেন। শিবিরদ্বারে তাঁহার জন্য এক খানি সিডান চেয়ার (৪) প্রস্তুত ছিল। ম্যাট্‌সিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র সৈনিকেরা ইহা অবরুদ্ধ করিয়া দিল। এই সময় হঠাৎ দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। বোধ হইল যেন কোন অশ্বারোহী বহুদূর হইতে অতিবেগে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অশ্ব সমীপবর্ত্তী হইল এবং "ভয় নাই! ভয় নাই! প্রফুল্ল হও! প্রফুল্ল হও"! পিতৃদেবের এই চিরপরিচিত স্বর ম্যাট্‌সিনির কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিল।

ম্যাট্‌সিনির পিতা পুত্রের স্থানান্তরীকরণ বৃত্তান্ত কোথা হইতে শুনিয়াছিলেন, ম্যাট্‌সিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। ম্যাট্‌সিনির পিতা সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সৈনিকেরা যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে তথা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল,—ম্যাট্‌সিনি পিতার করস্পর্শজনিত সুখেও যাহাতে বঞ্চিত হন সেই অভিপ্রায়ে যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে সিডান্ চেয়ার হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বন্দীশকটে আরোপিত করিল,—যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাহারা ম্যাট্‌সিনির দুঃখে কাতর সমীপবর্ত্তী কোন যুবকের প্রতি যেন গ্রাস করিবার মানসে ধাবমান হইল,—ওরূপ নিষ্ঠুরতার নিদর্শন ম্যাট্‌সিনি পূর্ব্বে আর কখন দেখেন নাই। যে যুবক অদূরে দাঁড়াইয়া ম্যাট্‌সিনির দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন,

(4) Sedan chair.

তাঁহার নাম অগষ্টিনো রফিনি (১)। এই পরিবারের সহিত ম্যাট্সিনির ভ্রাতৃভাব ছিল। ইহার অনতিকাল পরেই এই অনুপম যুবক নির্ব্বাসিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্কট্লণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে মানবলীলা সম্বরণ করেন। হৃদয়ের কোমলতা, বুদ্ধিবৃত্তির গভীরতা, এবং আত্মার অপাপবিদ্ধতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার নাম শুদ্ধ ইতালীর কেন, স্কট্লণ্ডেরও অধিবাসিদিগের চিত্তপটে চিরঅঙ্কিত হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে বন্দীশকট সেণ্ট অ্যাণ্ড্রিয়া (২) কারাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই কারাগার হইতে একজন বন্দী আনীত ও শকটমধ্যে প্রবেশিত হইল। এই বন্দীর পাদ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত সমস্তশরীর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল; তথাপি ম্যাট্সিনি তাহাকে প্যাসানো বলিয়া চিনিতে পারিলেন। প্যাসানোর সহিত বন্দুকধারী দুই জন সৈনিক পুরুষ ছিল। তন্মধ্যে একজন লায়ন্ রুগ্ হোটেলের সেই গুপ্তচর।

বন্দীশকট পুনরায় প্রবাহিত হইল এবং অনতিবিলম্বে সেভোনার দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই বন্দীই দুর্গের অভ্যন্তরে নীত ও তৎক্ষণাৎ পৃথকৃকৃত হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের আসার কোন সংবাদ ছিলনা, এইজন্য তাঁহাদিগের জন্য কোন গৃহ (৩) প্রস্তুত করিয়া রাখা হয় নাই। এই জন্য ম্যাট্সিনিকে প্রথমে এক অন্ধকারময় স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তথায় সেভোনার গবর্ণর ডি মেরি (৪) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পুরুষ বক্রোক্তি পূর্ব্বক ম্যাট্সিনিকে বলিলেন—'তুমি অনেক রজনী বিদ্রোহী সভায় জাগরণে অহিবাহিত করিয়াছ, অনিদ্রায় ও চিন্তায় তোমার শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; আশা করি এক্ষণে এই নির্জ্জন ও নিভৃত প্রদেশে বিশ্রাম লাভ করায় অনিদ্রা ও চিন্তাজনিত ক্লম অপনীত হইবে।' ম্যাটসিনি তাঁহার নিকট একটি চুরট প্রার্থনা করায় আবার বক্রোক্তি পূর্ব্বক বলিলেন—'আমি জেনোয়ার গবর্ণরের নিকট এ বিষয়ে লিখিয়া পাঠাইব। তিনি যদি অনুমতি করিয়া পাঠান তাহা হইলে আমার দিবার কোন আপত্তি থাকিবে না।' এই বলিয়া গবর্ণর প্রস্থান করিলেন। ম্যাট্সিনি কারারুদ্ধ হওয়া অবধি অনেক বার অবমানিত হইয়াছেন, অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছেন, তথাপি ম্যাট্সিনির চক্ষু দিয়া এক বিন্দুও জল কখন পতিত হয় নাই। কিন্তু আজ—গবর্ণর চলিয়া গেলে—তাঁহার গর্ব্বিত নয়ন ভেদ করিয়া গুটিকত অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। কিন্তু এ অশ্রু দুঃখের অশ্রু নহে—কাতরতার অশ্রু

(1) Agostino Ruffini.
(2) St. Andrea.
(3) Cell.
(4) De Mari.

নহে—ক্রোধের অশ্রু; পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের ক্রোধাশ্রু; ক্রোধের কারণ এই যে তিনি এরূপ ঘৃণিত ও পাষণ্ডদিগের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন।

গবর্ণরের সহিত কথোপকথনের এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেন। এই নবগৃহ সেই দুর্গের শিখরোপরি অবস্থিত ছিল। সুতরাং সেখান হইতে অনন্ত সাগরের লহরীলীলা ভিন্ন আর কিছুই অবলোকন করা যাইত না। ইহাও ম্যাট্‌সিনির পক্ষে তখন সামান্য সুখের বিষয় হইল না। যখনই তিনি তদীয় গৃহপিঞ্জরের লৌহজালবদ্ধ গবাক্ষ দিয়া নয়ন প্রসারণ করিতেন, তখনই অনন্ত সাগর ও অনন্ত আকাশ—প্রকৃতির দুই প্রকাণ্ডতম পদার্থ—তাঁহার নয়নপথে পতিত হইত। সেই গৃহটী এত উচ্চে অবস্থিত ছিল, যে তথা হইতে মৃত্তিকা দেখা যাইত না। অনিলদেব যখন সেই গবাক্ষের দিকে প্রবাহিত হইতেন, তখনই সুদূর হইতে জালোপজীবিদিগের আনন্দগীতি শুনিতে পাওয়া যাইত। প্রথম মাসে ম্যাট্‌সিনির হস্তে কোন পুস্তক প্রদত্ত হয় নাই; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ডি মেরির পরিবর্ত্তে, ক্যাভালীয়ার ফন্টানা (১) নামক একজন সদাশয় ব্যক্তি সেভোনার গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হন। ইনি দয়া করিয়া একখানি বাইবল, একখানি ট্যাসিটস্‌ ও একখানি বাইরন্‌ ম্যাট্‌সিনির হস্তে প্রদান করেন। এখানে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী তাঁহার একমাত্র কারাসহচর ছিল। ইহা সুমিষ্ট রব ও বিবিধ গতি দ্বারা অনেক সময় তাঁহার মানসিক ক্লেশ অপনীত করিত।

সার্জেণ্ট অ্যাণ্টোনীটি (২) তাঁহার সদয় কারাধ্যক্ষ; দৈনন্দিন কারাপ্রহরী; ক্যাটেরিনা (৩) নামক পীড্‌মণ্টিস্‌ রমণী যিনি প্রত্যহ তাঁহার আহারসামগ্রী আনয়ন করিতেন—; এবং গবর্ণর ফণ্টানা—মানবজাতির এই কয়েকজন মাত্র সেই কারাগারে তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতেন। অ্যাণ্টোনীটি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ম্যাট্‌সিনিকে বলিতেন—'যদি আমি কোন বিষয়ে আদেশ প্রদান করি? তদুত্তরে ম্যাট্‌সিনি প্রায়ই বলিতেন—'হঁা, কিসের আদেশ তাহা আমি বুঝিয়াছি; আমায় জেনোয়ায় লইয়া যাইবার জন্য একখানি শকটের'।

ফণ্টানা একজন বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ। ইতালীতেই তাঁহার জন্ম; মাতৃভূমির দুঃখে তিনি কাতর ছিলেন না এরূপ নহে। কিন্তু তাঁহার মনে এই গভীর প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য কেবল লুণ্ঠন, ধর্ম্মের নির্ব্বাসন, এবং প্রকাশ্য স্থানে নরবলি প্রদান ইত্যাদি। ম্যাট্‌সিনির ন্যায় এমন যুবকের মনে এরূপ ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার জন্য তিনি অতিশয় দুঃখ

(1) Cavalier Fontana.

(2) Serjeant Antonietti.

(3) Caterina.

প্রকাশ করিতেন, এবং সদয় ব্যবহারে তাঁহাকে সৎপথে আনিবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেন। অধিক কি তিনি কর্ত্তৃপক্ষের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াও প্রতিদিন সায়ংকালে তাঁহার ও তদীয় পত্নীর সহিত কাফি পান করিবার নিমিত্ত ম্যাট্সিনিকে নিমন্ত্রণ করিতেন।

ইত্যবসরে ম্যাট্সিনি জেনোয়াস্থিত বন্ধুদিগের সাহায্যে নির্ব্বাণোন্মুখ কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায়ে প্রকৃত জীবনের স্ফুলিঙ্গ উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতি দশম দিবসে তিনি জননীর নিকট হইতে একখানি করিয়া হস্তলিপি প্রাপ্ত হইতেন। এই হস্তলিপি খোলা অবস্থায় আসিত এবং তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী দ্বারা পরীক্ষিত হইত। তিনি জননীর পত্রের উত্তর দিতে পারিতেন বটে; কিন্তু অ্যাণ্টোনীটার সাক্ষাতে তাঁহাকে ইহার উত্তর লিখিতে হইত এবং তাঁহারই হস্তে খোলা অবস্থায় ইহা দিতে হইত। গবর্ণমেণ্টের এতদূর সতর্কতাতেও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র নির্ব্বিবাদে চলিতেছিল, তাঁহাদিগের সহিত ম্যাট্সিনির এরূপ সঙ্কেত ছিল যে তিনি জননীকে যে চিটী লিখিবেন তাহার একটী অন্তর প্রত্যেক পদের প্রথম অক্ষরগুলি একত্র করিলে যে লাটিন্ পদগুলি প্রস্তুত হইবে, সেই গুলিই তাঁহাদিগের মনোযোগের বিষয়। এইরূপ সাঙ্কেতিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও তাঁহার জননীর পত্রে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইতেন।

এইরূপে তিনি বন্ধুদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহারা যেন তাঁহার পরিচিত কার্ব্বোন্যারোগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রস্তাব সকল ব্যক্ত করেন। কিন্তু তৎকালে কার্ব্বোন্যারোগণ্ এতদূর ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন, যে ম্যাট্সিনির বন্ধুবর্গের প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না।

এই সময় পোলণ্ডে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ম্যাট্সিনি বন্ধুদিগের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া যৌবনসুলভ অসাবধানতাবশতঃ ফণ্টানাকে ইহা বলিয়া ফেলিলেন। ফণ্টানা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন যে এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ম্যাট্সিনি কেমন করিয়া এই সংবাদ পাইলেন ভাবিয়া গবর্ণর বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ম্যাট্সিনির সহিত কোন ভূতযোনির কথোপকথন হইত। এই ঘটনায় এই বিশ্বাস এখন হইতে আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া গেল।

যাহা হউক কার্য্যকালে ভীতি, কোন অবিচলিত বিশ্বাস বা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব, এবং অন্যান্য নানা কারণে ম্যাট্সিনির মনে প্রতীতি জন্মিল যে কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায় এখন আর জীবদ্দশায় নাই। সুতরাং মৃতদেহে জীবনসঞ্চার করার বৃথা চেষ্টায় সময় ও শক্তি পর্য্যবসিত না করিয়া, জীবিত ব্যক্তি-

দিগকে উত্তেজিত করিলে এবং নব ভিত্তির উপর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিলে, অধিকতর মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

এই কারাবাসের সময়েই ম্যাট্সিনির মনে 'নব্য ইতালী' নামক সমাজ সংস্থাপনের কল্পনা উদিত হয়। কি কি মূল মতের উপর এই সমাজমন্দির সংস্থাপিত হইবে, ইহার সভ্যদিগের পরিশ্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বা কি হইবে, ইহার ঘটনাপ্রণালীই বা কিরূপ হইবে, ইহার সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিরূপ লোকই বা মনোনীত করিতে হইবে, এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের বর্ত্তমান বিদ্রোহিদলের কার্য্যপ্রণালীর সহিত ইহার কার্য্যপ্রণালী কি সূত্রেই বা সম্বন্ধ করা যাইতে পারে, ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের গভীর চিন্তায় তাঁহার দিবারজনী অতিবাহিত হইত।

তিনি এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ সংখ্যায় অল্প, বয়সে কনিষ্ঠ এবং ধন ও প্রভাবে দরিদ্র ছিলেন। তথাপি তাঁহার প্রতীতি জন্মিল, যে ইতালীবাসীর হৃদয় একদিন স্বাধীনতার নামে মাতিয়া উঠিত, যে ইতালীবাসীর হৃদয় আজ উত্তাপ অভাবে শীতল হইয়া পড়িয়াছে, সেই ইতালীবাসীর হৃদয়কে উত্তাপিত ও উত্তেজিত করিতে পারিলে, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হইবে—ইতালীর পুনরুদ্ধার অবশ্যই সংসাধিত হইবে।

সাধারণ লোক সমূহ (১) হইতেই জাতীয় সমস্ত সুমহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। আপনার কার্য্যকারী শক্তির উপর অটল বিশ্বাস এবং অবিচলিত ইচ্ছা—সাধারণ লোক সমূহের এক মাত্র বল। সময়ের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ও নানা প্রকার বাধাবিপত্তিও এ বলের প্রতিরোধ করিতে পারে না। কার্য্যের সূত্রপাত হইলে, তখন সম্ভ্রান্ত লোকে সাধারণ লোক সমূহের অনুগমন করেন এবং ধনসম্পত্তি ও মান সম্ভ্রম দ্বারা আরব্ধ কার্য্যের সমর্থন ও বাহন করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এরূপও ঘটে যে সম্ভ্রান্ত লোকের সংস্রবে আরব্ধ কার্য্যের লক্ষ্যেরও পরিবর্ত্ত হইয়া যায়।

ইতালীর অতীত ইতিহাস ও সামাজিক গঠনপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া, ম্যাট্সিনি একতা ও সাধারণতন্ত্র—এই প্রস্তাবিত সমাজের লক্ষ্য নির্দ্ধারিত করিলেন। তিনি যে শুদ্ধ ছিন্ন ভিন্ন, উৎপীড়িত ও অবনত ইতালীর প্রদেশ সকলেই একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন এরূপ নহে; ইতালীতে একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, ইতালীর সাহায্যে সমস্ত ইউরোপেই একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন করা তাঁহার চরম লক্ষ্য রহিল।

ইতালী যে এক দিন স্বাধীন হইবে, ইতালীতে যে এক দিন একতা ও সাধারণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং ইতালীর সাহায্যে যে এক দিন সমস্ত ইউরোপে একতা ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা যেন তিনি নখদর্পণে দেখিতে

(1) The People.

লাগিলেন, তাহা তাঁহার জীবন বিশ্বাসে পরিণত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—ইতালী যখন স্বাধীন হইবে, ইতালীতে যখন একতা ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সেই এক, স্বাধীন ও স্বাধারণতন্ত্রী ইতালীর কোন নিভৃত স্থানে যদি তিনি তাঁহার কষ্ট-যন্ত্রণাপূর্ণ জীবনের একবৎসরও অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহা হইলেও আপনার জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিবেন।

এতদিন তাঁহার হৃদয়াকাশ চিন্তা-মেঘে আচ্ছন্ন ছিল; আজ সেই হৃদয়াকাশ এই ভাবের বিদ্যুৎবিকাশে সহসা উজ্জ্বলিত হইল। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন চিরনিদ্রোত্থিত ইতালী জগতে—উন্নতি ও ভ্রাতৃভাব—এই নবীন ও অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্ম উদ্ঘোষিত করিতেছে। পূর্ব্বে ইতালী জগতে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল এই নব ধর্ম্মের সহিত তাহার তুলনা নাই।

রোম—যে রোম এক দিন জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল—যে রোম এক দিন জগতের একতার মধ্যবিন্দু(১) ছিল—যে রোম একদিন জগতের একমাত্র জীবন ছিল—সেই রোমই এখন ম্যাট্সিনির জীবনের উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিল। রোম ব্যতীত জগতের শাসনভার দুইবার গ্রহণ করা আর কোন রাজ্যেরই ভাগ্যে ঘটে নাই। তথায় জীবন একদিন অনন্ত ও মৃত্যু অজ্ঞাত ছিল। গ্রীসীয় সভ্যতার পরে যে রোম জগতের সভ্যতার নেতা ছিল—সেই সাধারণতন্ত্রী রোম—সেই রোম, সীজরদিগের হস্তে যে রোমের জীবিত-পর্য্যবসান হয়—তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন—যেন সেই রোম এক্ষণে নব-জীবন প্রাপ্ত হইয়া অতীত জগৎকে স্মরণপথের অতীত করিয়াছে, যেন তাহার নবীন জয়পতাকা সমস্ত জগতে উড্ডীন করিয়াছে, যেন স্বত্ব ও স্বাধীনতার স্রোত সমস্ত জগতে প্রবাহিত করিতেছে।

ইহার প্রথম পতনের পর লোকে যখন ইহার জন্য শোকে অভিভূত ছিল, তখনই ইহা আবার উঠিল, আবার বৃহত্তর আকার ধারণ করিল, আবার জগতের অন্যপ্রকার একতার মধ্যবিন্দু হইল। এক সময়ে ইহা পার্থিব বিধির অধিনায়ক ছিল, এক্ষণে ইহা স্বর্গীয় বিধির অধিনায়ক হইল, এবং জগতের হৃদয়ে স্বত্বের (১) পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্যের (২) ভাব অঙ্কিত করিল।

রোম যদি একবার পড়িয়া আবার উঠিয়াছিল, তবে কেন তৃতীয়বার উঠিবে না? তবে কেন নূতন রোম—ইতালীর সাধারণ লোকের রোম—তৃতীয় যুগের সৃষ্টি করিবে না? কেন ইতালীতে বিস্তৃততর একতার ভিত্তি সংস্থাপিত করিবে না? কেন স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে একসূত্রে সম্বদ্ধ করিবে না? কেন—শুদ্ধ ব্যক্তিমাত্রের

(1) Centre.

(1) Right.
(2) Duty.

নিকট নয়—জাতিমাত্রেরই নিকট "সমাজ" (১) এই শব্দটী উদ্ঘোষিত করিবে না? এবং কেনই বা স্বাধীন ও সম ব্যক্তিমাত্রকেই তাহাদিগের ইহলোকের কর্ত্তব্যের উপদেশ দিবে না?

কারাধ্যক্ষ অ্যান্টোনীটী ও গবর্ণর ফণ্টানার সহিত তাঁহার মত বিষয়ে দৈনন্দিন বিবিধ তর্ক বিতর্কের পর যাহা কিছু সময় পাইতেন, তাহাতে তিনি তাঁহার গৃহপিঞ্জরে বসিয়া এইরূপ চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। ইহার পর নির্ব্বাসিত অবস্থায় ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া যখন তিনি আত্মজীবনবৃত্তান্ত লিখেন, তখনও এ গভীর চিন্তাসকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় এই সকল কারণে তাঁহাকে কেহ অসত্ত্বানুসারী (২) কেহ বা উন্মত্ত বলিয়া পরিহাস করিত। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহার এই চিন্তা সকল কখনই উন্মাদবিজৃম্ভিত নহে। এমন দিন অবশ্যই আসিবে যখন সেগুলি প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইবে।

যাহা হউক তিনি দেখিলেন যে সকল উপায়ে ইতালীর পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইবে, সেগুলি শুদ্ধ রাজনৈতিক নহে, বরং অধিকতর নৈতিক। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টসকলের উচ্ছেদসাধন করিলেই যে ইতালীর উদ্ধার সাধিত হইবে তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি জানিতেন যে ইতালীর অধিবাসীদিগের নৈতিক উন্নতি ব্যতীত কখন চিরস্থায়ী মঙ্গল সংসাধিত হইবে না।

এদিকে ম্যাট্সিনির বিচারের ভার টিউরিণের সিনেটারদিগের কমিটীর হস্তে অর্পিত হইল। গবর্ণমেণ্ট কটিনের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষী লায়ন রুগ হোটেলের সেই ছদ্মবেশী পুলিশকর্ম্মচারী। কিন্তু ম্যাট্সিনির নিজের অস্বীকার এই একমাত্র সাক্ষ্যের সমতুল, সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে সিনেটারেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তিনি নবীন উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। বস্তুতঃও সিনেটারেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু জেনোয়ার গবর্ণর ভেনান্সন্ ইহাতে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া কার্লো ফেলিসের (৩) চরণে গিয়া শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন তিনি স্বয়ং যে প্রমাণের বিষয় অবগত আছেন, তাহাতে তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে ম্যাট্সিনি অপরাধী এবং গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কারণ। কার্লো ফেলিস্ গবর্ণরের কাতরতায় মুগ্ধ হইয়া ম্যাট্সিনির আত্মগত স্বত্ব, তাহার বিচারকদিগের আদেশ, তাঁহার জনকজননীর নিস্তব্ধ ক্রন্দন, সকলই পদদলিত করিলেন। তিনি ম্যাট্সিনিকে এই মর্ম্মে সংবাদ দিয়া পাঠান যে তিনি জেনোয়া টিউরিন্ এবং তৎসদৃশ অন্যান্য বড় বড়

(1) Association.
(2) Utopist.

(3) Carlo Felice.

নগরে অথবা লিগিউরিয়ান্ উপকূলের কোন স্থানে অবস্থিতি করার আশা যেন পরিত্যাগ করেন। অ্যাষ্টি(১), অ্যাকুই(২), ক্যাসেইল্‌স্ [৩] প্রভৃতি ইতালীর অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষুদ্র নগরে তাঁহাকে বাসস্থান মনোনীত করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে কোন অনিশ্চিত কালের জন্য নির্ব্বাসনে যাইতে হইবে। এই নির্ব্বাসনের অবসান তাঁহার চরিত্র ও রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে।

কার্লো ফেলিসের আদেশানুসারে সৈনিকপুরুষ দ্বারা তাঁহাকে জেনোয়ায় লইয়া যাওয়া হইত। এবং তথায় শুদ্ধ অতি নিকটসম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠান হইত। ম্যাট্‌সিনির পিতা পুত্রকে এই যাতনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কার্লো ফেলিসের আদেশের মর্ম্ম সেভোনায় আসিয়া স্বয়ং তাঁহাকে অবগত করান।

যৎকালে ম্যাট্‌সিনির উপর এই কঠোর আদেশ প্রদত্ত হয়, তখন প্যাসানো কর্শিকার অধিবাসী বলিয়া এবং অ্যাঙ্কোনা(৪) নগরে কিছুদিন ফ্রেঞ্চ কন্‌সলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন বলিয়া কারামুক্ত হন। তৎকালে সকল রাজতন্ত্র গবর্ণমেণ্টই ফ্রান্সকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিত, অথচ তাহার তোষামোদ, তাহার আদেশ প্রতিপালন এবং যে কোন প্রকারে তাহার তুষ্টিবিধান করিতে ত্রুটি করিত না।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যাট্‌সিনি কারামুক্ত হন। ইহার অনতিপূর্ব্বে ইতালীর অভ্যন্তরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ম্যাট্‌সিনি শুনিলেন যে নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ ইতালীর সীমাভিমুখে ধাবমান হইতেছেন এবং তথায় ফ্রান্সের নূতন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য ও আশাদান দ্বারা প্রোৎসাহিত করিতেছেন। সুতরাং ম্যাট্‌সিনি নির্ব্বাসনই স্বীকার করিলেন। তিনি দেখিলেন যদি তিনি পীড্‌মণ্টের কোন ক্ষুদ্র নগরে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে পুলিসের সতত নির্যাতনে তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন, এবং সামান্য সন্দেহে পুনরায় কারারুদ্ধ হইতে পারেন। এ জন্যও তিনি নির্ব্বাসনই শ্রেয়ঃকল্প মনে করিলেন। তিনি দেখিলেন যে নির্ব্বাসন তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বাধীনতায় পুনঃসংস্থাপিত করিবে। কিন্তু তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন যে এ নির্ব্বাসন অতি অল্পদিনস্থায়ী হইবে। তিনি এই আশ্বাসবাক্যেই বিদায়কালে পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিলেন। যাইবার সময় পিতাকে বলিলেন—'পিতঃ আপনি কাতর হইবেন না, আমি অচিরকাল মধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।' কিন্তু তখন তিনি জানিতে পারিলেন না যে, তিনি এ জীবনের মত আর পিতৃমুখ দেখিতে পাইবেন না।

ক্রমশঃ।

(1) Asti.
(2) Acqui.
(3) Casales.
(4) Ancona.

# কালের আহ্বান।

সংসারের পারে অকূল পাথারে,
ডাকিছে গম্ভীরে কে যেন কাহারে,
জীবজন্তু আর মানব সবারে,
স্বপন ন্যায়।
শুনি সম্বোধন প্রাণী অগণন,
ত্যজিয়া আপন প্রিয় পরিজন,
সে দিকে সঘন করিছে গমন,
মোহিত প্রায়।

---

আয় শিশু কোলে ওরে বাছাধন!
লয়ে যাব তোরে মায়ের মতন,
দুখের সংসারে করোনা গমন,
যাতনা পাবে।
পাপ তাপ সেথা ভ্রমে নিরন্তর,
ধরিলে পাইবে যাতনা বিস্তর,
এই বেলা এসো পবিত্র অন্তর.
সুখেতে রবে।

---

কেন কুলাঙ্গনা এতই যাতনা,
পতির পীড়নে সদাই ভাবনা
সংসারের তরে নাহিক সান্ত্বনা,
হৃদয়ে লেশ।
আহা মরি মরি পিঞ্জরের পাখী,
দুখের তোমার কিবা আছে বাকি,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া এসো আমি ডাকি,
নাশিব ক্লেশ।

---

কেন কান্দ সতী পতির লাগিয়া,
শোক তাপে সদা জর জর হিয়া,
এসো মম সাথে নয়ন মুছিয়া,
যথায় স্বামী।
এসো বিমলিন কুসুম রতন,
লয়ে যাব তোমা করিয়া যতন,
এ বিরহে পারি করিতে মিলন,
একাকী আমি।

---

এ পাপ ধরায় কেন হে পামর,
সহিছ যাতনা বেদনা বিস্তর,
পাপ পরশনে দেখিলে তো নর,
কেমন দুখ?
এসো আমি তোমা পাপ করি দূর,
আনি শান্তি সুখ মানসের পুর,
লয়ে যাই তথা যথা যত সুর,
ভোগিছে সুখ।

---

কেন দীন হীন দুঃখী চিরদিন,
ভাবনায় মুখ হোয়েছে মলিন,
ক্ষুধায় কাতর দেহ অতি ক্ষীণ,
দারুণ দুখে।
ধনির দুয়ারে যেওনাকো আর,
এসো এসো ত্যজি দুখের সংসার,
লয়ে যাই তোমা সংসারের পার,
অতুল সুখে।

---

কেন হে বিরাগী ত্যজিলে সংসার?
পেলে নাকি সুখ শান্তি সেথাকার?
বনের ভিতরে কর তত্ত্ব কার?
বৃথায় সব!

পাবে না সন্ন্যাসী হেথায় সে ধন,
কেন কর তবে শরীর ধারণ?
আমি দিব তোমা পরম রতন,
বিভু বিভব।

———

আহা ভোগী তুমি সংসারের তরে।
কেন এত শ্রম কর দুই করে?
সুখের বাসনা থাকে হে অন্তরে,
যদি তোমার।
বিষয় ভোগেতে সুখ নাহি হয়,
এ সিন্ধু মথিলে হবে বিষোদয়,
এসো সুখ দিব আমি হে নিশ্চয়,
ভবের পার।

———

শীর্ণ কলেবর দেহ জ্বর জ্বর,
ভাঙ্গ ভাঙ্গ রোগী যাতনা পিঞ্জর,
শান্তি নাহি পেলে ঔষধি বিস্তর,
খুঁজিয়া ভবে।
রোগেতে কাতর যাতনা শয্যায়,
দেখিলে তোমায় বুক ফেটে যায়!
শান্তির বাসনা যদি মন চায়,
আইস তবে।

———

বয়সে প্রবীণ শকতিবিহীন,
দেহ অতি ক্ষীণ কেন হে প্রাচীন,
হোয়ে দৃষ্টিহীন বহ অনুদিন,
দেহের ভার?
দিব আমি তোমা প্রাচীন প্রবর,
সবল সজীব নব কলেবর,
ছাড় যষ্টি, এসো, ধর মম কর,
পৃথিবী পার।

———

ওই শুন ভীম রণ-ভেরী বাজে,
আসে বৈর দল সমরের সাজে,
উঠ বীরবর স্বদেশের কাজে,
কিসের ভয়?
স্বাধীনতা ধন অমূল্য রতন,
স্বাধীনতা ধন বীরের রক্ষণ,
স্বাধীনতা ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন,
কিছুই নয়।

———

ওই সিন্ধুপারে সুবর্ণের খান,
সেথায় বিরাজে অগণিত মণি,
চল চল পারে পাইবে এখনি,
অশেষ ধন।
কি ছার এ প্রাণ বিহনে সম্পদ,
কেন তবে তুমি গণিছ বিপদ,
এসো লোভী মম সঙ্গে ফেল পদ,
হবে রাজন।

———

ওই দেখ রাজ-স্বর্ণ-সিংহাসন,
চারিদিকে তার বিরাজে রতন,
সম্পদ শকতি গৌরব কারণ,
সকলি তায়।
এসো সিংহাসনে বসাইব আমি,
করিব তোমারে এ রাজ্যের স্বামী
এ সুখের তরে সকল হারামী,
করাও যায়।

———

এ ভবের পারে যে যশোমন্দির,
সেই যশ রহে চিরদিন স্থির,
সে যশোমন্দিরে এসো যশোবীর,
লইয়া যাই।

ধনের গৌরব কিছু কিছু নয়,
জনের গৌরব কয় দিন রয়?
যাহাতে গৌরব দশ জনে কয়,
তাহাতে নাই।

———

যশের কারণ সব করা যায়,
যশের কারণ কিছু নহে দায়,
এ জীবন গেলে অমরত্ব পায়,
কি ক্ষতি তবে।
চিরদিন নাম রহিলে ধরায়,
এক প্রাণে শত প্রাণ আসে তায়,
আমার সঙ্গেতে এসো পায় পায়,
যশস্বী হবে।

———

উঠ হে স্বদেশ-হিতৈষী জন,
স্বদেশের পানে কর বিলোকন,
এ অবস্থা তার রবে কি এখন,
থাকিতে তুমি?
জীবন বৃথায় দেশ যদি যায়,
কর প্রাণপণ দেশের ব্যথায়,
সার্থক কহিবে ধরিয়া তোমায়,
জনমভূমি।

———

ধরম করমে যদি প্রাণ যায়,
কি লাভ হইবে সে প্রাণ রাখায়,
দেহ বলিদান দেখিবে ত্বরায়,
বিভুরে সুখে।
পৃথিবীর দুখ সব হবে দূর,
পুলকে পূরিবে মানসের পুর,
ধর্ম্মের বিজয় গাবে যত সুর,
শতেক মুখে।

———

কে যাবিরে তোরা অমৃত সদনে,
সদানন্দ ধাম অমর-ভবনে,
কতই যাতনা পেয়েছ জীবনে,
হে সাধু নর।
ধর্ম্মসাধনের পাবে পুরস্কার,
আনন্দে খুলিবে হৃদয়ের দ্বার,
বিভুযশ মুখে গাবে অনিবার,
সাধকবর।

# জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

## পরিশিষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যখন দুই ব্যক্তির চিন্তা ও হৃদয়ভাব একীভূত হয়; যখন তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মনীতিবিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উভয়ে একত্র তর্কসাগরের গভীরতম প্রদেশে প্রতিদিন অবগাহন করেন; যখন তাঁহারা উভয়ে একত্র এক পূর্ব্বপক্ষ হইতে একই প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক একই মীমাংসায় উপনীত হন; তখন উভয়ের যিনিই কেন লেখনী ধারণ করুন না, বিষয়টী যে উভয়ের মস্তিষ্কের ফল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রচনা বিষয়ে যাঁহার অংশ অল্প, চিন্তা বিষয়ে তাঁহার

অংশ অধিকতর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যে রচনা ও চিন্তা উভয় বুদ্ধির ফল; তাহার কোন্ অংশ একের কোন্ অংশ বা অন্যতরের, তদ্বিষয়ে নির্ণয় হওয়া দুর্ঘট। সেইরূপ কি বৈবাহিক জীবনে, কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধুত্বকালে, মিলের নামে যে সকল পুস্তক প্রচারিত হয়, তাহা তাঁহার ও তদীয় পত্নীর বুদ্ধির ফল। তাঁহাদিগের প্রণয়ের পরিণতির সহিত তৎপ্রকাশিত পুস্তকসকলে তাঁহার পত্নীর অংশ ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হয়। কোন কোন স্থলে তদীয় পত্নীর অংশ নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে; তাঁহাদিগের উভয়রচিত পুস্তকসকলে যত কিছু বহুমূল্য ভাব, যত কিছু সুন্দর অবয়ব—যাহা দ্বারাই সেই পুস্তক সকলের এত গৌরব ও এত কৃতকার্য্যতা,—যাহাদ্বারাই সেই পুস্তক সকল হইতে জগতের এত অসংখ্য শুভ সংঘটনা—সমস্তই তদীয় পত্নীর বুদ্ধিমূলক। অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার-বিষয়ক তদীয় পুস্তকেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পত্নীর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পরিচালিত হয়। ন্যায়দর্শন গ্রন্থে রচনার সূক্ষ্মতাবিষয় ব্যতীত অন্যকোন বিষয়ে তাঁহার পত্নীর সাহায্য গৃহীত হয় নাই। সুবিখ্যাত দার্শনিক বেইনই (১) একমাত্র ব্যক্তি যাঁহার নিকট হইতে মিল্ ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুস্তক খানির হস্তলিপি মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হওয়ার পূর্ব্বে উপরিউক্ত দার্শনিকের হস্তে প্রদত্ত হয়। তিনি বিজ্ঞান হইতে অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ আহরণ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করেন এবং ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে মিলের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। ন্যায়দর্শন বিষয়ে মিল্ কম্‌টের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথম ভাগ সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি কম্‌টের পুস্তক দেখেনও নাই। এই সময়ে কম্‌টের "সিষ্টেম্ ডি ফিলসফি পজিটিবের" প্রথমভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। মিল্, তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথমভাগ সমাপ্ত হওয়ার পর, এই পুস্তক খানি প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায়দর্শনের পরিশিষ্ট লিখনকালে এই পুস্তক হইতে তিনি অনেকউপকার প্রাপ্ত হন।

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক গ্রন্থের "শ্রমজীবী শ্রেণীর সম্ভাবিত ভাবী অবস্থা" (২) নামক অধ্যায়টী সম্পূর্ণরূপে তদীয় পত্নীর রচিত। প্রথম হস্তলিখন কালে এই অধ্যায়টী একবারেই ছিল না। কিন্তু তাঁহার পত্নী এরূপ অধ্যায়ের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করায় এবং এরূপ একটী অধ্যায় ব্যতীত এ গ্রন্থ খানি অসম্পূর্ণ থাকিবে এরূপ বলায়, মিল্ তাঁহার পুস্তকে এই অধ্যায়টী সংযোজিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই তদীয় পত্নীর উদ্ভাবনা। অধিক কি ভাবাপর্য্য-

(1) Bain.

(2) The Probable Future of the Labouring Classes.

স্তও অনেক সময় তাঁহারই। অর্থের উৎপাদন (১) ও বিতরণে (২) যে কি প্রভেদ তাহা পূর্ব্বে কোন অর্থনীতিজ্ঞই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁহাদিগের মতে সে সমস্তই প্রাকৃতিক; মানবী ইচ্ছা তাহাদিগকে নিয়মিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। তদীয় পত্নীই সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন মত আবিষ্কৃত করেন যে, যে সকল নিয়মদ্বারা অর্থের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা প্রাকৃতিক বটে; কিন্তু যেসকল নিয়মদ্বারা অর্থের বিতরণ নিয়ন্ত্রিত, সে সকল প্রায়ই মানবী সৃষ্টি। এই শোষাক্ত নিয়ম গুলি মানবী ইচ্ছাও সমাজের আবশ্যকতানুসারে নিয়মিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই ভাব মিল্ সর্ব্বপ্রথমে সেণ্ট সাইমোনিয়োদিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাঁহার পত্নীর উত্তেজনাতেই ইহা তাঁহার মনে সজীবতা ধারণ করে। সংক্ষেপতঃ তাঁহার পুস্তকের যে অংশের সহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, সেই টুকুই তাঁহার নিজের অবশিষ্ট সমস্তই তদীয় পত্নীর। এই সকল কারণে মিলের ইচ্ছা ছিল যে পুস্তকখানি তদীয় পত্নীর নামে উৎসর্গীকৃত করেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী এরূপ ইচ্ছা করিতেন না যে তাঁহার বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই জন্য তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে দিবার নিমিত্ত কয়েক খণ্ড বাদে অন্য পুস্তকগুলি আপনার নামে উৎসর্গীকৃত করিতে দেন নাই।

মিলের বৈবাহিক জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ কালের মধ্যবর্ত্তি জীবনে দুইটী প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়—একটী তাঁহার পীড়াবিষয়ক অপরটী ইণ্ডিয়া হাউসে তাঁহার কর্ম্ম বিষয়ক। প্রথমতঃ তিনি এই সময়ের মধ্যে একবার পিত্রাগত(১) পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য প্রায় ছয় মাস কাল ইতালী, সিসিলী এবং গ্রীস প্রভৃতি নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ১৮৫৬খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউসের করেসপণ্ডেন্স্ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত হন। এই বিভাগে তিনি অন্যূন ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর কর্ম্ম করেন। তিনি এক্ষণে যে পদে অভিষিক্ত হইলেন তাহার নাম ইণ্ডিয়া করেস্পণ্ডেন্সের পরীক্ষক (২)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সেক্রেটরীর পদ ভিন্ন ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর পদ ছিল না। যতদিন এইপদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিনই মিল্ ইহাতে অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন এই পদে অভিষিক্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার এই পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এই পদের তিরোধান হয়।

(1) Production.
(2) Distribution.

(1) Hereditary.
(2) The Examiner of India Correspondence.

সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় সিপাহী মিউটিনির পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামার্ষ্টনের(৩) পরামর্শে রাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়া স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। মিল্ ভিন্ন আর সকল রাজনীতিজ্ঞেরাই তৎকালে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে রাজ্ঞীর হস্তে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য অধিকতর সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইবে। মিলের বিশ্বাস স্বতন্ত্র ছিল। তিনি জানিতেন যে রাজ্ঞী, তদীয় মন্ত্রিসভা (৪) এবং পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্যানী যতদূর সতর্কতার সহিত ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, রাজ্ঞীর কর্ম্মচারীরা সে সতর্কতার সহিত কখনই ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। তাঁহাদিগকেও রাজ্ঞী, তদীয় মন্ত্রিসভা এবংপার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কোন অত্যাচারনিবন্ধনপার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা পরীক্ষা স্থলে আনীত হইলে, রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে সমুচিত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে নানা চেষ্টা করিবেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হেষ্টিংসের পরীক্ষা(৫) কালে ব্রিটানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাত প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাকে উচিত দণ্ড হইতে রক্ষা করণেও গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ ছিল না। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্টও তাঁহাকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু এক্ষণকার ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরাল রাজ্ঞীর প্রতিনিধি। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট কোন অপরাধে তাঁহাকে পরীক্ষা স্থলে সহজে আনয়ন করিতে সাহসী হইবেন না। এই সকল কারণে মিল্ স্থির করিলেন যে এখন হইতে ভারতবর্ষে অরাজকতা অতিশয় প্রবল হইবে। এই সকল কারণেই তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার "রেপ্রেজেণ্টেটিব্ গবর্ণমেণ্ট" (১) নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বাপক্ষ্যে তল্লিখিত আবেদন পত্রাদিতে তাঁহার চেষ্টা বিশেষরূপে পরিব্যক্ত আছে।

যাহাহউক এই ঘটনায় তাঁহার নিজের বরং উপকারই হইল। বিদায় দানের সময় গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। লর্ড ষ্টান্‌লে (২) রাজ্ঞীর অধীনে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের সেক্রেটারি অব্ ষ্টেটের (৩) পদে অভিষিক্ত হইলেন। লর্ড ষ্টান্‌লে ভারতবর্ষীয় সভায় আসন গ্রহণ করিবার জন্য মিল্‌কে অনুরোধ করেন। কিছুদিন পরে সভার সভ্যগণও পুনর্ব্বার ঐ প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুইবারই মিল্ অস্বীকৃত

(3) Lord Palmerston.
(4) Privy council.
(5) The Trial of Hastings.

(1) Representative Government.
(2) Lord Stanley.
(3) Secretary of State for India.

হন। রাজ্ঞীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে যে সকল নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়, মিল্ দেখিলেন তাহা হইতে কোন শুভফলের আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং রাজ্ঞীর অধীনে কার্য্য স্বীকার করিয়া তিনি ভারতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন এরূপ আশা নাই; অথচ তাঁহার অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত হইবে। তাঁহার অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। রাজ্ঞীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া এই অস্বীকার জন্য তাঁহাকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় নাই।

তাঁহার এই কার্য্যলিপ্ত (১) জীবনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুইবৎসর কাল ধরিয়া তিনি ও তদীয় পত্নী তাঁহার "লিবার্টি" (২) নামক স্বাধীনতা বিষয়ক গ্রন্থের রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। মিল্ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র রচনা করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রোমনগরীর ক্যাপিটলের (৩) সোপানমার্গে আরোহণ কালে, এই প্রবন্ধকে একখানি গ্রন্থরূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা তদীয় মনে সর্ব্বপ্রথমে সমুদিত হয়। মিলের আর কোন গ্রন্থই এই খানির ন্যায় এত সতর্কতার সহিত রচিত ও পরিশোধিত হয় নাই। তদীয় অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এখানিরও হস্তলিপি দুইবার লিখিত হয়। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় দুইবার লিখনের পরই ইহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয় নাই। ইহার পরও এই গ্রন্থের হস্তলিপি খানি অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট ছিল। তাঁহারা দুইজনে বারবার ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন এবং প্রতিবার ইহার প্রত্যেক পদের ও প্রত্যেক বাক্যের দোষ গুণ বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের এরূপ সঙ্কল্প ছিল যে ১৮৫৮—৯ খৃষ্টাব্দের শীত কালে,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্য হইতে মিলের অবসৃত হওয়ার অব্যবহিত পর বৎসরে,—তাঁহারা দুইজনে ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিবেন এবং সেই সময় এই গ্রন্থের চরম পুনঃপর্য্যবেক্ষণ (৪) সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু মানবজীবনের ন্যায় মানবী আশাও অনিত্য। তাঁহারা দুইজনে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে মণ্টপিলিয়ার (৫) নগরে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে অ্যাভিগ্নন্ (৬) নগরে পল্‌মোনরী কন্‌জেস্‌চন্ রোগের (৭) আকস্মিক আক্রমণে তদীয় পত্নীর মৃত্যু হইল, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার এজীবনের সমস্ত আশা তিরোহিত হইল।

ক্রমশঃ।

(1) Official.
(2) Liberty.
(3) Capitol.
(4) Revision.
(5) Montpellier.
(6) Avignon.
(7) Pulmonary Congestion.

# নাটকাভিনয়।

ইতিহাসবেত্তা ডো সাহেব তাঁহার ভারত-বর্ষীয় ইতিবৃত্তে বলেন:—"নগর মধ্যে যখন এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতে-ছিল তখন দিল্লীর দ্বারনিচয় অবরুদ্ধ ছিল। সুতরাং কিয়দ্দিবস মধ্যে দিল্লীতে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, দিন দিন ক্রমে সহস্র লোক দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইতে লাগিল। নাদির-সা নগরবাসিগণের আর্ত্তনাদে বধির হইলেন। কিন্তু মানবসমাজের সকল দুঃখেরই সীমা আছে; দারুণ দুর্ঘটনা মধ্য হইতেও অচিরাৎ এমত একটি বিষয়ের অভ্যুদয় হয়, যাহাতে সকল কষ্ট নিবারিত হয়। সেই বিষম দুর্ভিক্ষ সময়ে "টুকী" নামক তাৎকালিক কোন সুপ্রসিদ্ধ কুশীলবের সদাশয়তা ও অনুকম্পা না হইলে দিল্লী-বাসিগণ একে একে সকলেই কালগ্রাসে নিপতিত হইত। টুকী, নাদির সার সমক্ষে আদেশ ক্রমে কোন নাটকের সুন্দর অভিনয় দেখাইলেন। নাদির-সা সেই অভিনয় দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অভিনেতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন তুমি অভিরুচি মত আত্মপুরস্কার প্রার্থনা কর। টুকীর হৃদয় তখন জনসমাজের দুঃখে ক্রন্দন করিতেছিল। তিনি প্রণি-পাত পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, অনুমতি করুন দিল্লীর সিংহদ্বার বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে শত সহস্র লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। তদীয় প্রার্থনানুসারে অনতিবিলম্বে দিল্লীর দ্বার-নিচয় বিমুক্ত হইল। অমনি জনস্রোত তদ্দিকে প্রবাহিত হইয়া নিকটস্থ জনপদ মধ্যে প্রবেশ করিল। অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে নগরের অন্নকষ্ট বিদূরিত হইল।" শত সহস্র লোকের একদা প্রাণ রক্ষা করা সকল অভিনেতার ভাগ্যে না ঘটুক অভি-নেতৃগণ মনে করিলে যে দুর্ভিক্ষ অপেক্ষাও সামাজিক গুরুতর অনিষ্টের প্রতীকার করিতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আজি কালি যাত্রার পরিবর্ত্তে নাটকা-ভিনয়ের প্রমোদে উন্নত বঙ্গীয় সমাজকে অধিকতর আকৃষ্ট দেখা যায়। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে সেই সমাজের রুচি কিয়ৎ পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছে। বাঙ্গালী, ইন্দ্রিয়সুখের স্থানে মানসিক সুখের রসাস্বাদন করিতে শিখিতেছেন। এজন্য বঙ্গসমাজে একটি নূতন ব্যবসায়ের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে। যাত্রাওয়ালা-দিগের পরিবর্ত্তে অভিনেতৃদলের উদয় হইতেছে। এই অভিনেতৃগণ ব্যবসায়ী হউন, যাত্রাওয়ালাদিগের অপেক্ষা ইহাঁদিগের কার্য্য অতি গুরুতর। জন-সমাজের হৃদয় ও মনের সহিত ইহাঁ-দিগের সম্বন্ধ; তখন সেই সমাজের কেবল

প্রমোদ উৎপাদন করাই ইহাঁদিগের কার্য্য নহে। যে অভিনেতৃদল কেবল জনসমাজের প্রমোদ উৎপাদনের দিকেই লক্ষ্য রাখেন, তাঁহারা স্বকীয় ব্যবসায়ের গুরুত্ব বুঝেন না, এজন্য এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যখন অভিনেতৃদল ব্যবসায়ী হইয়া পড়েন এবং কেবল অর্থলোভী হয়েন তখন তাঁহাদিগের হস্তে এই গুরুতর কার্য্যের ভার সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। অভিনেতৃদল সুশিক্ষিত, এবং মার্জ্জিতরুচি এবং নিতান্ত সাবধান না হইলে তাঁহাদিগের ব্যবসায় বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কখনই চলিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে এ বিষয় অধিকতর প্রতিপন্ন হইবে।

সাহিত্যসংসারে নাটকীয় সাহিত্যের যে একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, অন্য কোন সাহিত্যের সে ধর্ম্ম নাই। নাটকীয় সাহিত্য, সমাজ মধ্যে যেমন আলোচিত হয়, এমত আর কোন সাহিত্য হয় না। অন্যান্য সাহিত্যে গ্রন্থকারের সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। অন্যান্য সাহিত্যে যে পরিমাণে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে তাহার আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। সে স্থলে, গ্রন্থকার সুস্থিরভাবে ধীরে ধীরে পাঠকের সহিত সম্ভাষণ করেন। তদ্দ্বারা যতদূর কার্য্য হয় সেই পর্য্যন্তই শেষ। কিন্তু নাটকীয় সাহিত্যে কেবল অধ্যয়নে শেষ হয় না। সেই অধীত বিষয়ের অভিনয় করিতে পারিলে জনসমাজকে কিরূপ বিচলিত, উৎসাহিত, এবং প্রমোদিত করা যায় তাহা দেখিবার ইচ্ছা জন্মে। এই জন্য অভিনেতৃগণের সৃষ্টি। এই জন্য নাটকীয় সাহিত্যে গ্রন্থকার এবং সাধারণ সমাজের মধ্যবর্ত্তী আর একটী লোকশ্রেণীর আবশ্যক হয়। ইহাঁরা গ্রন্থকারের ভাব ও কবিত্ব সম্যক্রূপে প্রকটন করেন এবং প্রকৃত অভিনয় দ্বারা গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের যতদূর ফলাফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তদুৎপাদনে সচেষ্টিত হয়েন। নাটকীয় সাহিত্য যখন সমাজমধ্যে এতদূর আলোচিত হয়; যখন তদ্দ্বারা সমগ্র জনসমাজ বিচলিত, উৎসাহিত, আকৃষ্ট এবং প্রমোদিত হয়; তখন সেই সাহিত্য কেবল জনসমাজের সাহিত্যমধ্যে গণনীয় এমত নহে, তাহা জনসমাজকে পরিচালন এবং প্রণোদন করিবার পক্ষে মহাস্ত্র এবং প্রধান সাধন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব সেই সাহিত্যের গুরুত্বাভিমান যে অধিকতর তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সাহিত্য জনসমাজের মহাস্ত্র বলিয়া প্রতীত হওয়াতে অভিনেতৃগণের ব্যবসায়কেও অতি উচ্চ এবং গুরুতর বলিয়া অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে। অভিনেতৃগণ এই সন্ধিস্থলে সংস্থাপিত হইয়া সকল সময় কি আপনাদিগের অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন? অনেক দল জানেন না, তাঁহাদিগের প্রকৃত অবস্থা ও কর্ত্তব্য কি? যাঁহারা এই কর্ত্তব্য এবং অবস্থার গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধ করিতে পারেন,

তাঁহারাই উদ্দেশ্যলাভে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। অভিনেতৃগণ এই সন্ধিস্থলে পরিস্থাপিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের উপর সাধারণ সর্ব্বজনেরই দৃষ্টি রহিয়াছে। নাটককার স্বকীয় কল্পনা ও কবিত্বের সম্যক্ পরিচয় এবং বিস্ফারণের জন্য অভিনেতৃসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। সাধারণ জনগণ অভিনেতৃ সমাজের রুচি ও তাঁহাদিগেরআশা ও প্রবৃত্তি যাহাতে সন্মার্গে পরিচালিত ও নিয়মিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা অভিনেতৃগণের উপর স্বর্ণবর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু অভিনেতৃসমাজ হইতে যাহা ফিরিয়া চান, তাহা রাশি রাশি স্বর্ণে প্রদান করিতে পারে না। সাধারণের রুচি যদি কোন পক্ষে দূষিত হইয়া থাকে, সামাজিক নীতির যদি অবনতি হইয়া থাকে, প্রবৃত্তি যদি কলুষিত হইয়া থাকে, আশা যদি নীচগামিনী হইয়া থাকে, দেশের আচার ব্যবহারের যদি সংস্কারের আবশ্যক হইয়া থাকে, আমোদ সহকারে, অলক্ষ্যভাবে এবং ধীরে ধীরে সেই রুচি, নীতি, প্রবৃত্তি এবং আচার ব্যবহারের উন্নতি সাধন করা অভিনেতৃসমাজের কর্ত্তব্য। শুধু ইহাই নহে, তাঁহারা সমুদয় জনসাধারণকে মানবীয় দুঃখে দুঃখী করেন; সমস্ত জনসমাজকে মানবজাতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ করেন; মানবপ্রকৃতির উচ্চতর শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে মানবজাতির অভ্যন্তরে দেবশক্তি নিহিত আছে; তাঁহারা পৃথিবী হইতে মানবের চক্ষু স্বর্গের দিকে লইয়া যান; তখন মানব আপন দেবভাব উপলব্ধি করেন; তখন মানব একদা জীবনের উচ্চ অধিকার ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করেন; একবার অনন্তের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে; ভাবেন জীবনের সার্থকতা লাভের জন্য এবং মানবনামের গৌরব স্থাপন জন্য, ঐহিক সকল যন্ত্রণা এবং দুঃখভোগও শ্রেয়স্কর। যখন অভিনেতৃগণ দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের নয়ন হইতে অশ্রুধারা আকর্ষণ করিতে থাকেন, তখন কি আর একবার সেই দর্শকমণ্ডলী মিত্রতা এবং ভ্রাতৃসম্বন্ধীয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েন না? অভিনেতৃগণ যখন মানবহৃদয়কে নানা ভাবাবেগে সঞ্চালিত করিতে পারেন, তখন তাঁহাদিগের হস্তে কি প্রভূত শক্তি ন্যস্ত নাই? এই শক্তির সদ্ব্যবহার এবং কুব্যবহারের উপর অভিনেতৃসমাজের দায়িত্ব ও প্রয়োজনসিদ্ধি কি নির্ভর করিতেছে না? সময়ে সময়ে এই শক্তির কুব্যবহারজনিত কুফল নিবারণ জন্য রাজশাসনেরও আবশ্যক হইয়াছিল। গ্রীস এবং ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত তাহা প্রতিপাদিত করিয়া দেয়।

জনসমাজের উপর যখন অভিনেতৃমণ্ডলীর এতদূর প্রভাব, জনসমাজের সহিত তাঁহাদিগের যখন এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন সেই সমাজরূপ গ্রন্থ বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া তাহার দোষ গুণ, রুচি, প্রবৃত্তি ও অবস্থা সম্যক্‌রূপে

আলোচনা করিয়া দেখা তাঁহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এত গুরুতর বিষয় যে অভিনেতৃদলের সকলেই সুসম্পন্ন করিয়া উঠেন এমত কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। এই গুরুতর ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত আছে, তাঁহারা যদি সকলেই নিতান্ত অর্ব্বাচীন ও কর্ত্তব্যজ্ঞানবিরহিত হন, তাহা হইলে নাটকাভিনয় হইতে জনসমাজে যে কিরূপ গরলময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। যাঁহারা অভিনেতৃবর্গের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবেন, অন্যূন তাঁহারা সুবিজ্ঞ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন না হইলে সে অভিনেতৃমণ্ডলী দ্বারা যে রঙ্গভূমি পরিস্থাপিত হইবে, সে রঙ্গভূমির কলুষিত আমোদ ও অভিনয়াদি কেবল অমঙ্গলই প্রসব করিতে থাকিবে। জনসমাজমধ্যে যাহাতে এরূপ রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহাকরাই কর্ত্তব্য। কারণ তদ্দ্বারা সমাজের ইষ্ট সাধন হওয়া দূরে থাক, বরং তরুণবয়স্ক গণকে কেবল দূষিত আমোদ প্রমোদে এবং ক্রমশঃ পাপপথে প্রবৃত্ত করিতে থাকিবে। সে রঙ্গভূমি যাহাতে ত্বরায় উৎসন্ন হইয়া যায় তাহার চেষ্টা করা জনসমাজের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু যে চারণবর্গের নেতৃগণ কর্ত্তব্যবিমূঢ় নহেন, যাঁহারা স্বকীয় কার্য্যভারের গৌরব বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা যে রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে রঙ্গভূমি কেবল পরম পরিশুদ্ধ আমোদের স্থান নহে, তাহা সর্ব্বজনেরই শিক্ষা ও উপদেশের স্থান। রঙ্গভূমির নেতৃবর্গ সমাজের প্রবৃত্তি ও অভিরুচি পর্য্যালোচনা করিয়া যে প্রকার নাটকের অভিনয় করেন, তাঁহাদিগের প্রকৃতি ও ধাতু বুঝিয়া নাটকারগণ নাটক প্রণয়ন করিতে উদ্যত হইবেন, রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া সমাজের রুচি শিক্ষা করিয়া যাইবেন, এবং সেই শিক্ষাভূমির উপর নাটকের কবিত্ব ও কল্পনা সংস্থাপিত করিবেন। কি গ্রন্থকার, কি সাধারণ জনগণ, উভয় শ্রেণীর লোকমণ্ডলীকে পরিচালিত, প্রমোদিত এবং নিয়মিত করা রঙ্গভূমির কার্য্য। যে উভয়সঙ্কট সন্ধিস্থলে রঙ্গভূমির নেতৃগণ অবস্থিত, তাহা তাঁহাদিগের অগ্রে হৃদয়ঙ্গম হওয়া অত্যাবশ্যক। তৎপরে সেই হৃদ্বোধের সহিত আপনাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লওয়া উচিত।

অভিনেতৃগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইলে, দেখা উচিত অভিনয় কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? নাটক রচনার যে উদ্দেশ্য, নাটকীয় অভিনয়েরও সেই উদ্দেশ্য। মানব মনে ভাবোদ্দীবন করাই ইহাঁদিগের উদ্দেশ্য। যে নাটক অধ্যয়ন করিলে মানবমনে কোন একটি সংস্কার অথবা ভাব চিরমুদ্রিত হইয়া না যায়, সে নাটক বৃথায় রচিত হইয়াছে। সে নাটকের কিছুই কবিত্ব নাই। অভিজ্ঞান শকুন্তলা পাঠে কাহার হৃদয়ে না শকুন্তার চরিত্র ও সেই ললনারত্নের সরলতা এবং সৌকুমার্য্য চির-অঙ্কিত

হইয়া যায়? উত্তর রামচরিতের সীতা ও রামচন্দ্রের চিত্র কাহার না হৃদয়ে চিরকালের জন্য সেই নাটক অধ্যয়নের ফল-স্বরূপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে? এইরূপ একমাত্র বা ততোধিক ভাবের উদ্দীপন যখন নাটক অধ্যয়নের ফল-স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই উদ্দীপনাকে অধিকতর প্রবল করা অবশ্য অভিনয়ের প্রয়োজন বলিয়া গণনা করিতে হইবে। যদ্দ্বারা দর্শকগণের মনে কোন একটি ভাব উদ্দীপিত হয়, কোন সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং কোন চিত্র উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহাকেই বাস্তবিক নাটকাভিনয় বলে। যে নাটকাভিনয়ের পরিণামে হৃদয়ে কোন সংস্কার উদিত না হয়, সে স্থলে হয় নাটকের, না হয় অভিনয়ের ত্রুটি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, যে অভিনেতৃগণ প্রয়োজনসিদ্ধ হইল না বলিয়া গ্রন্থকারকে অপরাধী করিতেছেন, অথবা অভিনয়ের ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার অভিনেতৃগণের উপর সমস্ত দোষারোপ করিতেছেন। কোন স্থানে অন্যতর পক্ষের কোন স্থানে বা উভয় পক্ষেরই ত্রুটি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব গ্রন্থের দোষে যেমন অভিনয় বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অভিনয়ের দোষে সুগ্রন্থও কলঙ্কিত হইতে পারে। এজন্য অভিনয়ের ফলাফল, কি গ্রন্থ কি অভিনয় উভয়েরই উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সুগ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া অভিনয় করা অভিনেতৃগণের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।

সুগ্রন্থ নির্ব্বাচন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে অভিনেতৃগণের বিলক্ষণ বিচারশক্তির আবশ্যক করে। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া গ্রন্থের নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। নহিলে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইলেও তাহার অভিনয়ে কোন ফলোদয় হয়না। অনেক নাটক আবার এরূপ আছে, যাহার আদ্যোপান্ত সকল স্থানই নির্দ্দোষ, অথচ অভিনয়ের শেষে কোন ফলোদয় হয়না অথবা অশুভ ফলের উদয় হয়। কোন কোন গ্রন্থের দুই এক স্থল পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং দুই এক স্থান পরিবর্দ্ধিতও করিতে হয়। এই কার্য্যে অভিনেতৃগণের যে প্রকার বিচক্ষণতার আবশ্যক করে তাহা অনায়াসেই অনুমান করাযাইতে পারে। যাঁহাদিগের নিজে নাটক রচনা করিবার শক্তি আছে, যাঁহারা সুবিজ্ঞতার সহিত নাটকের গুণাগুণ বিচার করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অভিনয়যোগ্য গ্রন্থ অন্য কেহ নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে পারেন না। অতএব সুপাত্র বিবেচনা করিয়া তবে, অভিনয়ের অধ্যক্ষতার ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা বিধেয়। পূর্ব্বকালে গ্রীস এবং ইংলণ্ডে নাটকাভিনয়ের সুখ্যাতি ছিল কেন? তখন নিজে গ্রন্থকারগণ অভিনয় শিক্ষা-দিবার ভার গ্রহণ করিতেন। তখন নাটক-কারগণও অভিনয়ের আবশ্যকীয় নানা বিদ্যায় ভূষিত থাকাতে সেই কার্য্যভারের

উপযোগী হইতেন। এক্ষণে গ্রন্থকারগণকে তদ্রূপ নানা বিদ্যায় পারদর্শী দেখা যায় না, সুতরাং অভিনয়ের অধ্যক্ষতার উপযোগী হইতে পারেন না। যাহা হউক এই অধ্যক্ষতার গুরুতর কার্য্যভার যে এক জন সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

সুগ্রন্থ নির্ব্বাচিত হইলে, অভিনয়ের গুণাগুণের উপর তাহার ফলাফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। নাটকের যথাযথ অভিনয় করা অভিনেতৃগণের সুপ্রধান কর্ত্তব্য। কারণ যথাযথ অভিনয় না হইলে অভিনয়ের প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে অভিনয়ের গুণাগুণ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলে তবে প্রকৃত অভিনয় কি পদার্থ তাহার স্থির করা যাইতে পারে।

অপ্রকৃত বিষয়কে প্রকৃত ও প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করাকে অভিনয় কহে। অভিনয় দ্বারা দর্শকমণ্ডলীর মনে এ প্রকার ভ্রান্তি উৎপাদন করা চাই, যেন প্রত্যক্ষীভূত সমস্ত বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘটিত হইয়া যাইতেছে। উৎকৃষ্টতম কৃত্রিম কার্য্যের গুণাগুণ এই যে, তাহার কৃত্রিমতার অনুভব হয় না। কৃত্রিমতার অনুভব হইলেই আর ভ্রান্তি থাকে না। ভ্রান্তি বিনষ্ট হইলেই সমস্ত ইন্দ্রজাল বিনষ্ট হয়। দর্শকমণ্ডলীকে এই ইন্দ্রজালে বিমুগ্ধ করাকে নাট্যবিভ্রম কহে। যে পরিমাণে এই নাট্যবিভ্রম উৎপাদিত হইবে, সেই পরিমাণে সেই অভিনয়ের গুণাগুণ প্রতিপাদিত হইবে। যেখানে নাট্যবিভ্রম সম্পূর্ণ, সেখানে অভিনয়ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যেখানে নাট্যবিভ্রম অসম্পূর্ণ সেখানে অভিনয়ের সকল অঙ্গ উৎকৃষ্ট হয় নাই। অতএব নাট্যবিভ্রমই নাটকাভিনয় পরীক্ষা করিবার প্রধান সাধন। কিন্তু এই নাট্যবিভ্রম কিরূপে উৎসাদিত হয় তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

অভিনেতৃগণ অভিনয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিলে, দর্শকবর্গের মনে নাট্যবিভ্রম উৎপাদিত হয়। এক দিকে অভিনয় অন্যদিকে দর্শকগণের চিত্তভাব ও প্রবৃত্তি, এই উভয় পদার্থের উপরেই নাট্যবিভ্রম নির্ভর করিতেছে। অপ্রকৃত বিষয় প্রকৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত হইতে পারেনা; তাহাতে এমত ত্রুটিসকল অবলক্ষিত হইবে, যাহাতে অপ্রকৃত পদার্থকে প্রকৃত পদার্থ হইতে প্রভেদ করিয়া দিবে। অতএব দর্শকগণকে অনেক স্থলে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন করিতে হইবে। দর্শকমণ্ডলীর কল্পনাশক্তি যে পরিমাণে কার্য্য করিবে, সেই পরিমাণে কৃত্রিম পদার্থকে প্রকৃত বলিয়া উপলব্ধি হইতে থাকিবে। যে পরিমাণে অনুমানের ত্রুটি হইবে, সেই পরিমাণে কৃত্রিমতা প্রতীত হইবে।

আবার প্রকৃতিবিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট এবং অভিনয়োপযোগী নাটক নির্ব্বাচিত না হইলে, যথাযথ অভিনয় হইলেও সকল

সমস্ত নাট্যবিভ্রম ঘটে না। এমত স্থলে দর্শকমণ্ডলী যে পরিমাণে প্রকৃতির সহিত পরিচিত আছেন, সেই পরিমাণে ভ্রান্তি উৎপাদিত হইবে। প্রকৃতি যাঁহারা ভাল বুঝেন, তাঁহাদিগের নিকট অপ্রাকৃতিক বিষয়ের যথাযথ অভিনয় হইলেও নাট্য-বিভ্রম জন্মেনা।. এজন্য দর্শকমণ্ডলী অপেক্ষা অভিনেতৃগণের অধিকতর প্রকৃতির সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক। অভিনয়রূপ পরীক্ষায় নাটক প্রক্ষিপ্ত হইলে, তবে নাটকের গুণাগুণ উজ্জলরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকাশ্য অভিনয়ের পূর্ব্বে, অভিনীত নাটকের দোষ সমূহ পরিত্যক্ত না হইলে অভিনয় কালে বড় বিরক্তি ধরে। যে যে স্থলে প্রকৃতি-ভঙ্গ হইয়াছে, অভিনেতৃগণের সে সকল স্থল প্রাকৃতিক করিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু তা বলিয়া বাস্তবিক প্রকৃতি-বিশুদ্ধ স্থানকে বিকৃত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অনেক অভিনেতৃগণকে সেরূপ করিতেও দেখা যায়। অনেকে নাটককে এরূপ বিকৃত আকারে অভিনয় করেন, যে তাহাতে গ্রন্থকে নিতান্ত অপমানিত করা হয় এবং সুতরাং অভিনয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়। সুবিখ্যাত গ্যারিক ইংলণ্ডীয় নাট্যসমাজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, সেক্‌সপিয়ারের নাটক সমূহ বিকৃত আকারে অভিনীত হইত। গ্যারিকের সময়াবধি সেক্‌সপিয়ার কৃত নাটকবৃন্দের সমগ্র রচনার অভিনয় আরব্ধ হইয়াছে। গ্যারিক, সেই জগদ্বিখ্যাত নাটককারকে এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, যে তিনি তাঁহার নাটকের বিকৃতি সাধনে ভীত হইতেন। সেক্‌সপিয়ারের গুণগ্রাহিতাই গ্যারিকের প্রধান গুণ ছিল। গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া এবং মানব-প্রকৃতির ভাব বিলক্ষণ বুঝিতেন বলিয়াই গ্যারিক সেক্‌সপিয়ার কৃত নাটকের যথাযথ অভিনয় কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অতএব যে অভিনেতৃগণ, বাহ্য এবং মানব প্রকৃতির ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাবের সহিত অভিনয় করিতে পারেন। অন্যথা অভিনয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

নাট্যবিভ্রম উৎপাদিত করিতে হইলে যথাযথ অভিনয়ের আবশ্যক। অভিনয়ের দুইটী প্রধান অঙ্গ দৃষ্ট হয়। কোন নাটকাভিনয় সন্দর্শন করিতে হইলে একদা এই দুই দিকেই দর্শকগণের দৃষ্টি পড়ে। দৃশ্য এবং কার্য্যাভিনয়। দৃশ্যপট, দূর হইতে রঙ্গভূমির বাহ্য দৃশ্য, অভিনেতৃগণের বেশভূষা, বয়স এবং জাতি, প্রভৃতি কেবল চাক্ষুষ বিষয় সমুদায় দৃশ্যাভিনয়ের বিচার্য। ভাবব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গি এবং কথাবার্ত্তা প্রভৃতি কার্য্যাভিনয়ের বিষয়। এই দুই বিষয় এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতের সহিত অপ্রকৃতের সাদৃশ্য যত ঘনিষ্ট হইবে দৃশ্যাভিনয় সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ হইবে। দর্শকগণের মনে নাটক-সন্নিবেশিত ব্যক্তিবর্গের ভাব ও সংস্কার যে প্রকার, অভিনেতৃগণ জাতিতে,

বয়সে, আকারে, বেশভূষায় এবং কণ্ঠধ্বনিতে যতদূর সেই সংস্কারের নিকটবর্ত্তী হয়, ততদূর নাট্যবিভ্রম সঞ্জাত হয়। যে স্থান পরিদৃশ্যমান করিতে হইবে পরিপ্রেক্ষিত চিত্র দ্বারা সেই স্থানকে দূর হইতে যেন তদ্রূপ দেখায়, তজ্জন্য ত্রুটি হইলে নাট্যবিভ্রম বিনষ্ট হয়। অভিনেতৃগণেরও নিষ্ক্রমণ যথাদেশে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যথাদেশ হইতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করা এবং তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া দৃশ্যাভিনয়ের বিষয়, যে ভঙ্গিতে প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণ করা যায় তাহা কার্য্যাভিনয়ের বিষয়। প্রত্যুত, কেবল দর্শনশক্তির যাবতীয় বিচার্য্য বিষয় দৃশ্যাভিনয় সম্বন্ধীয়। নাটক যখন অধ্যয়ন করা যায়, তখন দৃশ্যাভিনয়ের সমস্ত বিষয় কল্পনাস্থানীয় থাকে, কিন্তু সেই কল্পনাকে যখন বাহ্যাবয়বে পরিদৃশ্যমান করিতে হইবে তখন তাহাকে যথাসাধ্য সেই কল্পনার অনুরূপ করিতে না পারিলে দৃশ্যাভিনয় তৃপ্তিকর হয়না, সুতরাং দৃশ্যাভিনয়জনিত আনন্দও অনুভূত হয় না।

দৃশ্যাভিনয় অপেক্ষা কার্য্যাভিনয় অতি গুরুতর ব্যাপার। নাটকীয় ব্যক্তিগণের চরিত্র এবং হৃদয়ভাব কথাবার্ত্তা, অঙ্গবিলাস এবং ভাব ভঙ্গিতে যথাযথ প্রকটন করা কার্য্যাভিনয়ের বিষয়। দৃশ্যাভিনয়ের ত্রুটি লোকে বরং কল্পনা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পূর্ণ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু কার্য্যাভিনয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া অভিনয় দর্শন করিতে আসেন। মানব আত্ম-বিষয়ে যেমন অনভিজ্ঞ এমত আর কিছুতেই নহে। আত্মব্যতীত অপর যাবতীয় পদার্থ বিষয়ে মানবকে বিশেষ জ্ঞানী ও পরিচিত বোধ হয়। কিন্তু তিনি যখন আত্মপ্রকৃতি সম্বন্ধে কোন কল্পনা অথবা অনুমান করেন সেই স্থানেই তাঁহার যত গোলযোগ ও প্রমাদ উপস্থিত হয়। মানব, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থেরই প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কেবল আত্মপ্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার ভাব তাঁহার জ্ঞান ও প্রতীতির তত আয়ত্তে আইসে নাই। বিভিন্ন অবস্থায় মানবপ্রকৃতি কিরূপ কার্য্য করে, মানবহৃদয় কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা সাধারণ জনগণের নিকট প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হয়। মানব, অপর সকলই অনুকরণ করিতে পারেন, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় আপনার ভাব যথাযথ অনুকরণ করিতে হইলেই তাঁহার বিপদ্ ঘটে। সকলে তাহা বুঝিয়া সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন না। আবার অভিনয় যথাযথ হইলেও অনেক সময়ে দর্শকমণ্ডলী তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বাস্তবিক মানবের নিকট মানব নিজে একটি বিষম প্রহেলিকা। মানবপ্রকৃতির জটিল গ্রন্থি সকল খণ্ডন ও আলুলায়িত করিতে জানেন না। এই জন্য কার্য্যাভিনয় দর্শনে সকলের প্রগাঢ় অভিনিবেশ জন্মে। কার্য্যাভিনয় যত স্বাভাবিক ও প্রকৃতিসঙ্গত বলিয়া

অনুভূত হইতে থাকে, লোকের মনে তত আনন্দের উদয় হয়। কার্য্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণ নিজ অন্তরেই যেন সকলই অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। কারণ মানবের জন্য মানবের সহানুভূতি অতি প্রগাঢ়তর। এই সহানুভূতিসম্ভূত হইলে দর্শকগণ কল্পনাবলে নাটকের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আত্মভাগ্য বলিয়া অনুমান করিয়া লয়েন। তখন আত্ম-আভ্যন্তরিক সেই কাল্পনিক অভিনয়ের সহিত রঙ্গভূমির প্রত্যক্ষীভূত অভিনয়ের তুলনা করিতে থাকেন। যে খানে সাদৃশ্য উপলব্ধি হয় সেই খানে আনন্দ। অন্যথা, বিরক্তির উদয় হয়। অতএব কার্য্যাভিনয়ের প্রশংসা ও গৌরব দর্শকগণের সহানুভূতি ও মানব-প্রকৃতি-বোধের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

নাটকীয় ব্যক্তির চরিত্র এবং হৃদয়ভাবের অভিনয় ভেদে কার্য্যাভিনয়ের এই দ্বিবিধ অঙ্গ। এই দুই অঙ্গের অভিনয় স্বতন্ত্র নহে, একত্রই প্রদর্শিত হয়। অতএব ইহাদিগের ভেদ কেবল কাল্পনিক এবং বিচারের জন্য।

যে ব্যক্তির চরিত্র যাঁহাকে অভিনয় করিতে হইবে, তদ্বিষয় তাঁহার বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। নাটকের মধ্যে গ্রন্থকার সেই ব্যক্তিকে কি ভাবে সাজাইয়াছেন, সে ব্যক্তিকে কি প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তিনি কি ধাতুর লোক, তাঁহার চরিত্রে একদা কি কি গুণের সমাবেশ আছে এবং কি কি দোষই বা বিমিশ্রিত আছে, এই সমস্ত বিষয় মনে মনে সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া নাটকীয় ব্যক্তির চরিত্রের অনুরূপ অনুমান ও কল্পনা করিয়া লওয়া অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য-সাধন জন্য তাঁহার নাটক খানি আদ্যোপান্ত ভালরূপে অধ্যয়ন করা উচিত। অধ্যয়ন করিলে তিনি আরও দেখিতে পাইবেন, তাঁহার পাত্রের সহিত নাটকীয় অন্যান্য পাত্র ও পাত্রীর কি প্রকার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ জানা না থাকিলে, কোন্ পাত্রের সমক্ষে কি ভাব ধারণ করিতে হইবে অভিনয়কালে তাহার ঠিক অভিনয় ঘটিয়া উঠে না।

কোন্ ব্যক্তি কিরূপ চরিত্রের, তাহা নির্ণীত হইলেই যথেষ্ট হইলনা, অভিনয়ের আদি অবধি শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তির চরিত্র ঠিক রাখিয়া অভিনয় করা উচিত। অভিনয় কালীন একই চরিত্রের যদি নানা স্থানে অসঙ্গতি ঘটে তবে আর পাত্রকে বরাবর ঠিক রাখা হইল না, একের চরিত্র অভিনয় করিতে করিতে অন্যের চরিত্র অভিনয় করা হইল। এপ্রকার চরিত্রভঙ্গ দোষ কার্য্যাভিনয়ে নিতান্ত নিন্দনীয়। এজন্য, নাটকীয় ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ তাহা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা সাবধানে অভিনয় করা উচিত।

এই চরিত্র-ভঙ্গ-দোষ হয় অভিনেতার অনভিজ্ঞতা না হয় তাঁহার আত্মবিস্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন হয়। যিনি নাটকীয়

পাত্রের চরিত্র ভাল বুঝিতে পারেন না, তাঁহার সে চরিত্র অভিনয় করা উচিত নহে। অনেকে মনে করেন তাঁহারা একজনের চরিত্র ভাল বুঝিয়াছেন বলিয়া, নাটকীয় অন্যান্য ব্যক্তির চরিত্রও তদ্রূপ বুঝিতে পারেন। এজন্য না জানিয়া শুনিয়া, চরিত্রের কল্পনা ভালরূপে ঠিক না করিয়া সাহসপূর্ব্বক অজ্ঞাতকুলশীল জনের চরিত্র অভিনয় করিতে যান। সুতরাং অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সর্ব্বস্থানে চরিত্র সুরক্ষিত করিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ এক নাটকের মধ্যগত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির চরিত্র অভিনয় করিতে যান, সুতরাং অনেক সময়ে এরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটে যে কাহার কি প্রকার চরিত্র তাহা ঠিক রাখিয়া বরাবর অভিনয় করিয়া যাইতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত চরিত্রভঙ্গদোষ অন্যপ্রকার আত্মবিস্মৃতি হইতেও সমুদ্ভূত হইতে দেখা যায়। বাস্তবিক অভিনেতার আত্মবিস্মৃতি দুই কারণে জন্মিয়া থাকে। অভিনেতা কখন কখন আপনাকে এতদূর ভুলিয়া থাকেন যে, আমি শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে অভিনয় করিতেছি, এবং অপরকে আমার অভিনয় প্রদর্শন করিতে আসিয়াছি এরূপ জ্ঞান হয়, সেই এক প্রকার আত্মবিস্মৃতি। দর্শকমণ্ডলীকে অভিনয় দেখাইতে আসি নাই, কেবল স্বকার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছি, এরূপ সংস্কার ও প্রতীতির সহিত অভিনয় না করিলে সকল সময় অভিনয়ের কার্য্যগুলি প্রকৃত, স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে প্রকটিত হয় না। অনেক সময়ে আপনাকে সলজ্জ জ্ঞান হয়, সুতরাং হস্তপদ সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। কে যেন আমার কার্য্য দেখিতেছে, কি মনে করিতেছে; এই ভাবনায় অভিনয়কার্য্য যথেচ্ছা নির্ব্বাহিত হয় না। ভল্‌টেয়ার কোন নটীকে অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন, এমত সময় নটী বলিল, "এরূপ করিলে লোকে আমাকে যে ভূতে পেয়েছে বলিবে। ভল্‌টেয়ার উত্তর করিলেন--"যাহাতে তোমাকে লোকে যথার্থই ভূতে পেয়েছে বলে তাহাই আমি চাই।" এই কথার মর্ম্ম স্মরণ রাখিয়া অভিনেতৃগণের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করা উচিত। আমরা অনেক অভিনেতাকে নাটকীয় স্বগত বাক্যাবলি এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিতে দেখিয়াছি, যেন তাঁহারা শ্রোতৃবর্গকেই সম্বোধন করিয়া অভ্যস্ত পাঠ আবৃত্তি করিতেছেন।

অভিনেতা যে চরিত্র অভিনয় করিতে আসিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া থাকা অন্যবিধ আত্মবিস্মৃতির কার্য্য। নাটকের দুই তিন ব্যক্তির চরিত্র অভিনয় করিতে গেলে যে এই প্রকার আত্মবিস্মৃতি ঘটিবার কি প্রকার সম্ভাবনা তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যে সময় এক জন অভিনয় করিতেছেন, দর্শকমণ্ডলীর ন্যায় অন্যান্য উপস্থিত অভিনেতৃগণ তখন যদি অভিনয়কারীরই কার্য্য দেখিতে থাকেন, অবিচলিতভাবে তাঁহারই কথা শুনিতে থাকেন, যেন তাঁহাদিগের নিজের কিছুই

অভিনয় করিবার নাই, এইরূপে আত্ম-বিস্মৃত হইলে তাহাদিগের নিজ নিজ চরিত্র রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যাহা হউক যাহাতে অভিনেতৃগণের এই দ্বিবিধ আত্মবিস্মৃতি না ঘটে এরূপ সাবধান হওয়া উচিত।

ক্রমশঃ।

শ্রীপূ——

# ধর্ম্মনীতি

## দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি জাতীয় চরিত্র তিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। তন্নিবন্ধন পরলোকপরায়ণ ও মুক্তিমার্গা-নুসারী ভারতে বৈরাগ্যই চরম লক্ষ্য; প্রফুল্ল-চিত্ত ও পরস্পরানুরক্ত ফ্রান্সে পরোপকারই প্রধান উদ্দেশ্য এবং বাণিজ্যাশ্রয় ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ইংলণ্ডে সমাজের হিতানুষ্ঠানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আমরা আভাস দিয়াছি যে সদসদ্জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। বেন্থাম্ মিল্ প্রভৃতির মতে হিতাহিত-জ্ঞান হইতে ভূয়োদর্শনবলে সদসদ্জ্ঞানের উদ্ভব হয়। কোমতের মতে উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তিই ইহার নিদান। এডাম্ স্মিথ্, হার্বার্ট স্পেন্সর, ডারউয়িন প্রভৃতির মতে সমবেদনা বৃত্তি হইতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উৎপত্তি হয়। এতদ্ভিন্ন আর একটি মত আছে, তাহার উল্লেখ করা উচিত। এই মত পূর্ব্বে ইউরোপের সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিল; অধুনাও সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে প্রচলিত আছে। এতন্মতে সদসদ্জ্ঞান লোকের স্বাভাবিক, মনোবৃত্তিবিশেষের পরিণাম বা ভূয়োদর্শনের ফল নহে। যেমন ক্ষুৎপি-পাসা প্রভৃতি নিকৃষ্টবৃত্তি মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ; তদ্রূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও স্বতঃসিদ্ধ। তবে যে সংসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে এত মতান্তর দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল শিক্ষা ও সংস্কারের ফল। এই প্রবৃত্তিটিকে ইং-রাজি ভাষাতে Conscience অথবা Moral sense বলে; বাঙ্গালা ভাষাতে "সুমতি" বা "কর্ত্তব্যজ্ঞান" বলিয়া ইহার নামকরণ হইতে পারে। সদসদ্জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু তৎসমস্ত লোকের নিকট সমাদৃত হয় নাই; সুতরাং এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

আমরা প্রথম প্রবন্ধে স্থলবিশেষে কর্ত্ত-ব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ বিষয়ে অনৈক্যের উল্লেখ করিয়াছি এবং বেন্থাম্-শিষ্যেরা তাহার কিরূপ সামঞ্জস্য করেন, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছি। যাঁহারা কর্ত্তব্যজ্ঞানকে প্রকৃতিসিদ্ধ বলেন, তাঁহারা শিক্ষা ও সং-

স্কারকে সেই অনৈক্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, কিন্তু কিরূপে সেই অনৈক্যের পরিহার হইতে পারে, তাহার কোন সমাধান করিবেন না। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কাটাইতে পারেন। কিন্তু কথা এই হইতেছে, দেশকাল পাত্রভেদে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা পৃথকপৃথক্ হইয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন অনিত্য, তাহা হইতে কোন চিরস্থায়ীসর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। যে বাইবেল পূর্ব্বে পৃথিবীর গতির প্রতিষেধ করিয়া মহাত্মা গালিলিয়োকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বাইবেল এখন বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বিষয়ে উৎসাহদান করিতেছেন। বিশেষতঃ ভূমণ্ডলে নানা ধর্ম্ম প্রচলিত; তন্নিবন্ধন ধর্ম্মপুস্তক দ্বারা ধর্ম্মনীতিবিষয়ক অনৈক্যের পরিহার না হইয়া, প্রত্যুত নিরন্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ইংলণ্ড বাণিজ্যপ্রিয়। সেই বাণিজ্যপ্রিয়তা হইতে হিতবাদদর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। পরন্তু ইংলণ্ড স্বাধীনতানুরক্ত। সেই স্বাধীনতানুরাগ দ্বারা মিল্ ও স্পেন্সর উভয়েরই গ্রন্থসমূহ উদ্ভাসিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল স্পেন্সরই স্বাধীনতাকে দর্শনাকারে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার মতকে "স্বাতন্ত্র্য" বাদ বলা যাইতে পারে। আচার্য্য স্পেন্সর এডামস্মিথ প্রভৃতির ন্যায় সমবেদনাবৃত্তি হইতে সদসদ্‌জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মনীতিবিষয়ক অনৈক্যের মীমাংসার্থ তিনি এই নূতন মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

স্পেন্সর বলেন "কোন একটি কার্য্য উচিত কি অনুচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত হিতবাদীরা যে যুক্তি ও তর্ক অবলম্বন করেন, তাহা কার্য্যোপধায়ক বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, যাহা সমাজের হিতকর, তাহা উচিত, তদ্বিপরীত অনুচিত। এখন কথা হইতেছে, যে কিসে সমাজের হিত ও কিসে অহিত, তাহা নিরূপণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; তাহা ভূয়োদর্শন ও বিস্তর গবেষণার কার্য্য। বিশেষতঃ ভূয়োদর্শন ও বহু গবেষণার পরও তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সমাজের হিতাহিত নিরূপণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অবধারণ করা কেবল দার্শনিকদিগেরই সম্ভবে, অপর সাধারণ লোকের পক্ষে সুসাধ্য নহে। পরন্তু দার্শনিকেরাও উক্ত নিয়ম অনুসারে কোন স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। অতএব হিতবাদিগণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের যে প্রমাণ পরীক্ষা স্থির করিয়াছেন, তাহা কার্য্যকর বলিয়া বোধ হয় না।"

স্পেন্সর এই মীমাংসা করেন, "যেমন মনুষ্যজাতি সমাজবদ্ধ থাকাতে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সমবেদনা প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় এবং তাহা হইতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ সামাজিক কুশলের প্রধান

প্রতিভূ হইতেই কোন্ কার্য্য প্রকৃত কর্ত্তব্য, কোন্‌টি তদ্বিপরীত, তাহা নির্দ্ধারণ হইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতেছে সামাজিক কুশলের প্রধান প্রতিভূ কি? সূক্ষ্মবিচার করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবেক যে "সমান স্বাতন্ত্র্য" ( Equal freedom ) সামাজিক কুশলের মুখ্য প্রতিভূ। যে সমাজে সকলে তুল্যরূপ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেনা, স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ সম্পত্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারেনা, তথায়ই গোলযোগ ও বিদ্রোহ ঘটে। "যাহা আমার নিজস্ব, তাহা বিনা বাধায় ভোগদখল করিব; আমার স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতার কেহ ব্যাঘাত করিতে পারিবেনা। এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য যদি সমাজভুক্ত সমস্ত লোকেরই তুল্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, তবেই সমাজের মঙ্গল বজায় থাকিবে, নতুবা নহে। এখন স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, যে সমাজে এক ব্যক্তি অন্যের হানি করিতে সমর্থ হয়, তথায় সমান স্বাতন্ত্র্য নাই, সুতরাং সামাজিক কুশলও সম্ভবেনা। সামাজিক কুশল না থাকিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ হয়না। প্রাচীন রোমরাজ্যে পেট্রিসিয়ান্‌দিগের অত্যাচারে প্লিবিয়ন্ সম্প্রদায় রাজ্যের সমুদয় ক্ষমতা হইতে অপসারিত হইয়াছিল। মধ্য ইউরোপের সম্ভ্রান্তগণের স্বেচ্ছাচার নিবন্ধন প্রজাসাধারণ নিজস্বভোগে অধিকারী হয় নাই। দাসব্যবসায়ীদিগের দৌরাত্ম্যে অসংখ্য মানব পশুবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইত্যাদিস্থলে তুল্য স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিলনা, সুতরাং সমাজ শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারে নাই। সমাজের প্রথম অবস্থায় স্বার্থপরতা ও বর্ব্বরতা যেমন প্রবল, কর্ত্তব্যবোধ ও সমবেদনাও তেমনি নিস্তেজ থাকে। সুতরাং নিরন্তর পরধর্ষণ ও পরের অনিষ্ট সাধন সংঘটিত হয়; তন্নিবারণার্থ খরতর রাজদণ্ডের আবশ্যকতা হয়। ক্রমে লোকের অন্তঃকরণে কর্ত্তব্যজ্ঞান যত উন্মিষিত হইতেছে এবং স্বার্থের ন্যায় পরার্থের প্রতি যত আস্থা জন্মিতেছে, তত দণ্ডপারুষ্যের লাঘব দেখা যাইতেছে। এবং সামাজিক শান্তি সমধিক পরিমাণে বিরাজমান হইতেছে। কিন্তু সেই শান্তির প্রধান কারণ সমস্বাতন্ত্র্য। যদি সমাজে প্রবলের উৎপীড়ন থাকে; কোন ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে নিজস্ব ভোগ দখল করিতে নাপারে, তবে সামাজিক শান্তির প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে "সমস্বাতন্ত্র্যপ্রণালীর" কতদূর উপযোগিতা তাহা দর্শিত হইতেছে। আমরা প্রথম প্রবন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছি, এখন তাহারই উল্লেখ করিব। ব্রহ্মহত্যা স্থলে মিথ্যা বলা উচিত কি না এই প্রশ্ন হইল। এখন বিবেচনা করা উচিত, যদি সমাজের ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতির সমান স্বাধীনতা থাকে, তবে ব্রাহ্মণ একটা খুন করিয়া রক্ষা পাইবেন কেন? বিশেষতঃ মিথ্যাতে পরের হানি হয়; পরের হানি আর পরের

স্বাতন্ত্র্যবোধ একই পদার্থ। অতএব "সমস্বাতন্ত্র্যের" মতে মিথ্যাকথন সর্ব্বদাই অধর্ম্ম; কখন উহার অন্যথাভাব হইতে পারে না।

বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর দণ্ড হইতে পারে কি না এই দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল। তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, ভাবিয়া দেখা উচিত—"আমি তোমার বিরুদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলাম; তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? যদিও মদবলম্বিত ধর্ম্ম সাধারণের বিপরীত হয়, তাহাতেই কি আমি দোষী হইব? সকলের যেমন ইচ্ছানুসারে ধর্ম্ম আশ্রয় করিবার অধিকার আছে, আমারও তেমনি আছে? আমার এই স্বত্বনাশ করিলে, সমস্বাতন্ত্র্যের বিপরীত কার্য্য হইবেক" এইরূপ যুক্তি দ্বারা বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর দণ্ড অবিধেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেক।

একজন দরিদ্র ধনীর কিঞ্চিৎ অপহরণপূর্ব্বক আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে পারে কি না এরূপ সংশয় উপস্থিত হইল। তাহার নিরাসার্থ এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে যদি দরিদ্রেরা ইচ্ছামত মদুপার্জ্জিত ধন গ্রহণ করিতে পারিল; তবে আমার নিজস্ব ভোগ বিষয়ে স্বাধীনতা কোথায়?

উক্ত প্রকারে প্রতীয়মান হইবেক যে সমস্বাতন্ত্র্যবাদের নিয়ম অনুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ক ভ্রম ও সংশয় সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। এখন উক্ত মতের কতদূর দৌড়, তাহার পর্য্যালোচনা করা যাউক। যেমন ধনী ও দরিদ্র, ভদ্র ও ইতর, বিদ্বান্ ও মূর্খ, রাজা ও প্রজা সকলেই সমান স্বাধীনভাবে নিজস্ব ভোগ দখল করিতে অধিকারী; তেমনি পতি ও পত্নী, পিতা ও পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বাংশে তুল্যরূপে স্বাধীন। পতি, পত্নীর প্রতি বলপ্রয়োগ বা তদীয় স্বোপার্জ্জিত ধন অধিকার করিতে পারেন না। অথবা পিতা পুত্রকে জোর করিয়া কোন কার্য্য করাইতে অধিকারী নহেন। কারণ বলপ্রয়োগ সমস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধ।

সমস্বাতন্ত্র্য মত অনুসারে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা, কর্ত্তব্যতা ও উপযোগিতা কতদূর; তাহাও নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট আমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ, অথবা কোন বিষয়ে মদীয় স্বাতন্ত্র্যরোধ করিতে অধিকারী নহেন। তবে যদি আমি পরের অনিষ্ট সংঘটন করি, পরের ধন, মান ও প্রাণের হানি করি, গবর্ণমেণ্ট অবশ্য আমাকে নিবারণ করিবেন। ক্ষতি পূরণ করাইয়া লইবেন, এবং ভবিষ্যতে আর ওরূপ না করি, তন্নিমিত্ত আমার নিকট হইতে প্রতিভূ লইবেন; এতদ্ভিন্ন আর কোন দণ্ড দিতে পারেন না; কারণ তাহা কেবল বৈরনির্য্যাতন মাত্র। কেবল লোকের রক্ষণ গবর্ণমেণ্টের একমাত্র কর্ত্তব্য। যখন কোন বহিঃশত্রু রাজ্য আক্রমণ করে, তখন তাহাকে পরাহত করা গবর্ণমেণ্টের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর একটী কর্ত্তব্য কার্য্য এই যে যখন

অন্তঃশত্রুগণ অর্থাৎ সমাজভুক্ত বদমায়েসগণ পরের ধন, মান, ও প্রাণের প্রতি আক্রমণ করে, তখন তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করা। রাজ্যরক্ষণ, শান্তিরক্ষণ এবং বিচার এই তিনটী গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত কার্য্য, এতদ্ভিন্ন আর সমুদয় অকর্ত্তব্য। প্রজাদিগের ধর্ম্ম, ব্যবসায়বাণিজ্য, বিদ্যাচর্চ্চা, পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন; তাহাতেই লোকের স্বচ্ছন্দবৃত্তিতা ব্যাহত হইবেক এবং পরিণামে বিষম ফল উৎপন্ন হইবেক। গবর্ণমেণ্ট যত অল্প পরিমাণে এরূপ অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইবেন, ততই প্রজাপুঞ্জের সৌভাগ্য সঞ্চার হইবেক। স্পেন প্রজাবর্গের ধর্ম্মের উপর যৎপরোনাস্তি হস্তক্ষেপ করিয়া ইয়রোপের সর্ব্বপ্রধান রাজ্য হইতে, নিতান্ত হীন অবস্থায় নিপতিত হইয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া ঘোরতর ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লুইনেপোলিয়ন ফ্রান্সের স্বাতন্ত্র্যরোধ করিতে গিয়া এই মহাদেশকে অভূতপূর্ব্ব সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আইনজালে আমাদিগকে এরূপ জড়িত করিয়া তুলিয়াছেন, যে আমরা স্বাধীনভাবে হস্তপদ সঞ্চালন পর্য্যন্ত করিতে সক্ষম নহি। ইহার পরিণাম কেবল আর্য্যজাতির প্রাচীনকালের একটি সভ্যতম শাখার সম্পূর্ণ অধোগতি। ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎসমস্তই গবর্ণমেণ্টের অনধিকার চর্চ্চার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এখন প্রতীত হইতেছে যে "সমস্বাতন্ত্র্যপ্রণালী" শুদ্ধ ধর্ম্মনীতির কেন, রাজনীতিরও চরম মীমাংসা করিয়া দিতেছে। বস্তুতঃ রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। তবে যতদিন শাসনকর্ত্তায় ও শাসনার্হ জনসাধারণের পার্থক্য থাকিবেক; যতদিন সমাজে ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ ক্ষমতা ও স্বত্বাধিকার রক্ষিত হইবেক; ততদিন এ উভয়েও প্রভেদ লক্ষিত হইবেক। যতদিন পর্য্যন্ত না সমাজ সভ্যতার চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়; যতদিন পর্য্যন্ত না লোকে কার্য্যতঃ আত্মবৎ সর্ব্বভূতে দৃষ্টি ও স্বার্থের ন্যায় পরার্থের প্রতি আস্থা করিতে শিখিবে, ততদিন রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি একীভূত হইবেক না এবং ততদিন "সমস্বাতন্ত্র্যবাদের" মতসকল সর্ব্বোতোভাবে কার্য্যে পরিণত হইবেক না।

# ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ।*

সঙ্কলনকার এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন:—"আমি এই সংসারে চব্বিশ বৎসর দেওয়ানী ও দশবৎসর অন্যান্যকার্য্য করিয়াছি। আমার রাজানুগত পরিবারে জন্মগ্রহণ, দীর্ঘকাল রাজসংসারে স্বীয় সংশ্রব, এবং রাজবাটীর কাগজপত্র পাঠ প্রভৃতি উপায়ে এই বংশের বহুতর বর্ণনীয় বৃত্তান্ত সুতরাং সহজেই সংগৃহীত হইয়াছিল।"

যে যে উপকরণে এই পুরাবৃত্তমূলক গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে তাহারও বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"ইতিহাস, পুরাতন কাগজ, ফরমান ইত্যাদি হইতে প্রায়ই এই ইতিহাস সঙ্কলিত হইল। কেবল সে সকল ঘটনা এই রাজবাটীতে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ, এবং পুরুষপরম্পরায় অবগত, তাহা লিখিত প্রমাণ অভাবে বর্ণন করা গেল। যে সকল ফরমান ও পুরাতন কাগজপত্র হইতে এই ইতিহাসের অধিকাংশ সঙ্কলিত হইল, তৎসমুদয় অদ্যাপি রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বসংগৃহীত পুস্তকের মধ্যে "ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিতম" নামা গ্রন্থ হইতে অনেকাংশ গ্রহণ করা গিয়াছে। ঐ পুস্তক অতি সরল সংস্কৃতভাষায় রচিত। ইহাতে কান্যকুব্জীয় ভট্টনারায়ণের বঙ্গদেশে উপনিবেশ হইতে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত, এই রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তর বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ প্রুসিয়া রাজ্যের বর্লিন্ রাজধানীর রাজপুস্তকাগারে ছিল। ১৮৫২ খৃঃঅব্দে, ডবলিউ পর্শ (W Pertsh) নামক জনৈক জর্ম্মাণ জাতীয় পণ্ডিত ইহা ইংরেজী অনুবাদের সহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।"

গ্রন্থকারের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহের যেরূপ সুবিধা, এবং যে প্রকার উপকরণ হইতে বৃত্তান্তনিচয় সংকলিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতে হইলে সমালোচ্য গ্রন্থকে একখানি মূলগ্রন্থ বলিতে হইবে। বাঙ্গালাভাষায় অন্যান্য পুরাবৃত্তমূলক যে সমস্ত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যদি কোন গ্রন্থে মূল বিবরণ প্রচারিত হইয়া থাকে, সেই গ্রন্থের মৌলিকতার সহিত সমালোচ্য গ্রন্থের মৌলিকতার কিছু প্রভেদ আছে। বাস্তবিক ইতিহাসমূলক যাবতীয় মূল গ্রন্থের আদি উপকরণের বিচার করিতে গেলে দৃষ্ট হইবে যে মৌলিকতা দ্বিবিধ। মিল্, অরমি, ফার্গুসন, কনিংহাম প্রভৃতি মহোদয়গণ কতকষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় যে সমুদায় মূল বিবরণ নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহার সহিত, জোন্স, উইল্সন, কোল্‌ব্রুক্ প্রভৃতির মূল বিবরণের তুলনা করিয়া দেখিলে এই দ্বিবিধ বিবরণের মৌলিকতার প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে। এক-

* শ্রীকার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র সংবৎ ১৯৩২।

জাতীয় মৌলিকতার উপকরণ—পুরাতন রাজ্যসম্বন্ধীয় কাগজপত্র, নবাবিষ্কৃত লিপিসমূহের তত্ত্বনির্ণয়, মুদ্রা, প্রাচীন স্তূপাদির লেখন এবং কিম্বদন্তী প্রভৃতি; অন্যজাতীয় মৌলিকতার উপকরণ—প্রচারিত গ্রন্থ নিচয়। প্রত্নকত্রগণ উভয় পক্ষেই কষ্ট স্বীকার করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু একজন গৃহে বসিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, অন্যজন তত্ত্বনির্ণয়ার্থ দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন। একজন দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া যে সমস্ত বিবরণ সঙ্কলন ও যাথার্থ্য নির্ণয় করিবেন; অন্যজন গৃহে বসিয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত তাহা পাঠ করিবেন, বিচার করিবেন, এবং সদৃশ উপায়োদ্ভাবিত বিবরণের সহিত তুলনা করিয়া সত্যাসত্যের তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিবেন। একজন যে ভিত্তিমূল দিলেন, অন্যজন তাহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। দুই জনেই প্রাচীন তত্ত্বের অভিলাষী একজন খনি হইতে মণি আহরণ করেন; অন্যজন সেই মণির আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় করিয়া দেন। এই দুই জন মণিকারের যে প্রভেদ, উক্ত দ্বিবিধ প্রাচীন তত্ত্ববিতের সেই প্রভেদ। এই দুই জনমণিকারের গৌরবের যে তারতম্য, উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎদ্বয়ের গৌরবেরও সেই তারতম্য। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথমোক্ত প্রাচীনতত্ত্বাভিলাষী হওয়া আপাততঃ সুদুর্লভ। আমাদিগের রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, নৃসিংহচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ। আজিও প্রথম শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ হইতে হইলে যে উৎসাহ ও উদ্যোগ, সাহিত্যবিষয়ক রুচি ও ঐকান্তিকতা, অর্থ ও পরিশ্রম, সদ্বিবেচনা ও ভাষাজ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন কোন বাঙ্গালীর একাধারে তাহার কিছুই নাই। সে যাহা হউক সমালোচ্য গ্রন্থের কিয়দংশে প্রথম শ্রেণীর মৌলিকতা এবং কিয়দংশে দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার সৌভাগ্যক্রমে যে অবস্থায় ও পদে পরিস্থাপিত আছেন, তন্নিবন্ধন গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহের পক্ষে অনেক সুবিধা হওয়াতে, তিনি সেই উপকরণ নিচয়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এবং সেই সদ্ব্যবহার জন্য বঙ্গসাহিত্য একখানি অমূল্য মূলগ্রন্থ লাভ করিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য মধ্যে এরূপ একখানি মূলগ্রন্থ অদ্যাপি প্রকটিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্য মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত প্রাচীন তত্ত্বমূলক প্রস্তাব প্রকটিত আছে, তাহা হয় ইংরাজীর আংশিক অনুবাদ না হয় অধ্যয়নের ফল। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক প্রকৃত আদি উপকরণ মূলীয় গবেষণার ফল কিছুই নাই। সমালোচ্য গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভাবে না থাকুক, পুরাতন কাগজপত্র ও ফরম্যান আদি দেখিয়া এবং শ্রদ্ধেয় কিয়দন্তীর উপর নির্ভর করিয়া যতদুর প্রকৃততত্ত্ব অবধারণ করা যাইতে পারে, তাহার অনেক সিদ্ধান্ত ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। বাস্তবিক গ্রন্থকার যথাসাধ্য মূল উপক

রণ সংগ্রহে কিছু ত্রুটি করেন নাই। এজন্য তাঁহার গ্রন্থখানি একখানি অপূর্ব্ব মূল গ্রন্থ হইয়াছে। আমরা এতদূর পরিশ্রম স্বীকার জন্য রায় মহাশয়কে সম্যক্ সাধুবাদ করিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহার মত যদি বাঙ্গালার অন্যান্য-রাজপরিবারস্থ সমপদস্থিত মহোদয়গণ এক একখানি রাজপারিবারিক বিবরণ ও ইতিবৃত্ত প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে আমাদিগের বাঙ্গালা ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ পক্ষে আর কিছুই ভাবনা থাকে না।

বাস্তবিক ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত কেবল নবদ্বীপস্থ রাজবংশের বিবরণ মাত্র নহে। ইহা সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্যের ইতিবৃত্ত। গ্রন্থকার যে রূপে প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা অতি সন্তোষকর। পাছে গ্রন্থখানি নীরস হয় এজন্য তিনি ইহাতে নবদ্বীপ প্রদেশের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা, বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান ঘটনা এবং অন্যান্য নানাবিধ বিবরণ দ্বারা গ্রন্থকে পূর্ণ করিয়াছেন। তজ্জন্য গ্রন্থপাঠে অত্যন্ত অভিনিবেশ জন্মে। একে মূল বিষয়ের নবীনত্ব, তাহাতে অপরাপর বিবরণ মধ্যেও অনেক নূতন কথা থাকাতে পাঠকের জ্ঞানস্পৃহা বিলক্ষণ সন্তৃপ্তিলাভ করে। গ্রন্থের প্রথম সাত অধ্যায়ে মূলবিষয়ের কোন কথা নাই; কিন্তু তাহাতে যে প্রকার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, সমগ্র গ্রন্থখানি যদি তদ্রূপ বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ হইত, তাহা হইলে গ্রন্থখানি অধিকতর আদরণীয় হইত। ইহাতে বাঙ্গালার পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থা ও বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহার সুন্দর প্রতিকৃতি এই বিবরণ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে যে জমিদারী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, ক্ষিতীশবংশাবলি পড়িলে তাহার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত লাভ করা যায়। বঙ্গদেশে যে সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে গ্রন্থকার তদ্বিবরণ সমুহ উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী ও অপরাপর মহোদয়গণের বিবরণ অতি সরস বর্ণনায় স্থানে স্থানে সংযোজিত হইয়াছে।

বর্ণনীয় বিষয় যেরূপ হউক, বর্ণনা করিবার গুণপনা থাকিলে, সকল বিষয়ই ভাল লাগে। যাহাতে পাঠকের মন আকৃষ্ট করা যায়, এরূপ বর্ণনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বর্ণনীয় বিষয় নিতান্ত নীরস হইলেও এক এক জনের কেমন ক্ষমতা থাকে, যদ্দ্বারা সেই নীরস বিষয়কে সরস করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন। আখ্যায়িকার কোন ভাগকে প্রবর্ধমান করিতে হয়, কোন ভাগকে খর্ব্ব করিয়া লইতে হয়; কোন কোন প্রধান ঘটনাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়, কোন কোন সামান্য ঘটনাকে আবার বৃহদায়তন করিয়া বিবিধ বাক্যবিন্যাস স্থলে বর্ণনা করিতে হয়।

আবার একপ্রকার আখ্যায়িকায় পাছে বিরক্তি ধরে এজন্য আনুষঙ্গিক নানা সরস কথার রসায়ন মিশ্রিত করিয়া আখ্যায়িকাকে মনোজ্ঞ করিতে হয়। আমাদিগের গ্রন্থকারের এরূপ বর্ণনা করিবার গুণপনা বিলক্ষণ আছে। তাঁহার রাজবংশের বিবরণ আদ্যোপান্ত অতি সরস ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোনখানে পড়িতে বিরক্তি ধরে না। প্রত্যুত: সর্ব্বস্থানেই অনুরাগ জন্মে। এই রাজবংশের বিবরণ পড়িতে আমাদিগের বিস্তর জ্ঞানলাভও হয়। তৎসঙ্গে আমরা নানা নদ নদী, গ্রাম ও নগরের উৎপত্তি এবং আদি বিবরণ জানিতে পারি।

আখ্যায়িকার মধ্যে মধ্যে নানাস্থানে বহুবিধ নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় বিক্ষিপ্ত থাকাতে তল্লাভে জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধন হয়। এখানে একটি ক্ষুদ্র বিষয় জানিতে পারিলাম, সেখানে আর একটি পরিচিত বিষয়ের পৌরাণিক তত্ত্ব অবগত হইয়া সে বিষয়কে অধিকতর পরিচিত করিয়া দিল। বোধ হয় অগ্রসর হইতে পারিলে আরও অনেক বিষয় জানিতে পারিব। যে আখ্যায়িকা এইরূপ ঔৎসুক্য উৎপাদন করিয়া দেয়, সে আখ্যায়িকা পাঠে যে সকলেই সন্তোষ লাভ করেন তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষত: কোন্ কোন্ বিষয়গুলি বর্ণনা করিলে পাঠকের মনোরঞ্জন হইতে পারে গ্রন্থকার তাহা বিলক্ষণ জানেন। সেই বিষয়গুলিকে আবার কিরূপে সরস করিতে হয় তাহাও অবগত থাকাতে তদীয় বর্ণনীয় বংশাবলীচরিত অতি উপাদেয় পদার্থ হইয়াছে।

এ গ্রন্থের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এরূপ একটি গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, যাহা সকল বাঙ্গালী এবং সমস্ত ইংরাজজাতির জানা আবশ্যক। তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাঙ্গালীজাতিই এতদ্দেশে ইংরাজাধিপত্য স্থাপনের মূল কারণ। এ কথাটি পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিতে প্রথম প্রচারিত করেন। যেরূপ সুবিচার এবং তর্কের সহিত গ্রন্থকার এক্ষণে এই বিষয়টি সমর্থন করিয়াছেন তাহা অতি প্রশংসনীয়; গ্রন্থকার এই স্থানেই তাঁহার বিচারশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। এ কথাটি ইংরাজি কোন ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ইংরাজজাতিবর্ণিত ইতিবৃত্ত সমুদায় কিরূপ শ্রদ্ধেয় তাহা অপর সকল জাতিই বিলক্ষণ জানেন। এতদ্দেশীয়গণও তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। ওয়াসিংটন্ আর্ভিং তদীয় স্কেচ্‌বুক নামক গ্রন্থে আমেরিকা সম্বন্ধে ইংরাজীলেখকগণের উক্তিবিষয়ক প্রস্তাবে * দেখাইয়াছেন, যেখানে ইংরাজজাতির কোন স্বার্থ আছে, যেখানে ইংরাজজাতির গৌরব এবং মানসম্ভ্রমের বিষয় বিতর্কিত হইতে পারে, যেখানে

* The Sketch book—English writers on America.

উপকার লাভের জন্য অন্য জাতির নিকট ইংরাজজাতি ঋণবদ্ধ আছেন, সেখানে ইংরাজজাতির ইতিবৃত্ত কেমন অবিশ্বাস-মূলক, কেমন অশ্রদ্ধেয়। ইংরাজলিখিত ইতিবৃত্তে আমেরিকাবাসিগণের এইপ্রকার অবস্থা।

যে সময়ে ইংরাজ জাতির সহিত ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালীন ইতিবৃত্ত ইংরাজি-গ্রন্থে অধ্যয়ন করিয়া, সংস্পৃষ্টজাতির ইতিবৃত্ত পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, বর্ণিত বিষয়ের বিবরণে কত প্রভেদ। সেদিন যে আবিসিনিয়ারাজের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আবিসিনিয়ারাজ যদি তদ্বিবরণ-ঘটিত একখানি ইতিবৃত্ত রাখিয়া যাইতে পারিতেন, আমরা দেখিতে পাইতাম, তাহার সহিত ইংরাজবর্ণিত বিবরণের কত অন্তর! এতদ্দেশীয় আধুনিক ইতিবৃত্ত আমরা ইংরাজজাতির নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই সে ইতিবৃত্তের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ পরিসমাপ্ত হয়। ইংরাজজাতি আমাদিগকে যাহা শিখাইতে চাহেন, আমরা তাহাই শিখিয়া পরীক্ষার পত্রে বলিয়া আসি। কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের বিলক্ষণ জ্ঞান আছে যে ইতিবৃত্তের বিশেষ বৃত্তান্তের সর্ব্বৈব মিথ্যা। যে ছাত্রের এরূপ জ্ঞান নাই সে অতি নির্ব্বোধ। আমরা যদি স্বাধীন গবেষণায় প্রকৃত ইতিবৃত্ত কখন অজ্ঞানতার ঘনান্ধকার হইতে সমুদ্ধার করিতে পারি, তখন আমরা শ্রদ্ধার সহিত ভারতের কাহিনী আর একবার আকর্ণন করিব। নহিলে ভারতের ইতিবৃত্ত আর আমরা শুনিতে চাহি না। ইংরাজবর্ণিত ভারতের ইতিবৃত্ত ইংরাজগণ স্বদেশে লইয়া যান, তথায় গৃহে বসিয়া অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে তাহা পাঠ করুন, হাস্য করুন, আমোদ করুন, অহঙ্কার এবং গৌরবে পূর্ণ হউন, আমাদিগের তাহাতে ক্ষতি নাই। আর কোন জাতি তাঁহাদিগের ইতিবৃত্তে বিশ্বাস করে না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা মানবজাতির প্রকৃতি এবং বিশেষতঃ ইংরাজজাতির চরিত্র কিছুই অবগত নহেন।

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, যতদিন ইংরাজজাতির সহিত বাঙ্গালীর কোন সম্পর্ক ছিল না, ততদিন নবদ্বীপের রাজবংশীয় জমিদারীর উন্নতি ব্যতীত অবনতি ঘটে নাই। রাজা শিবচন্দ্রের সময়াবধি এই জমিদারীর ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তে জমিদারী নিলাম করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। ইংরাজী আদালত স্থাপনাবধি সকল বিষয়-কার্য্য এবং মকদ্দমা,—দলিল, কাগজপত্র, ও সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতে লাগিল; সুতরাং রাজকীয় অমাত্যগণ ক্রমশঃ ধূর্ত্তপনা এবং বিলাতী জুয়াচুরী শিক্ষা করিল। বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জ ক্রমশঃ ইংরাজী আদালতের সংস্পর্শে সর্ব্বপ্রকার কাগজপত্রীয় এবং সাক্ষ্যের খেলা খেলিতে শিখিলেন। রাজবংশধরেরা ক্রমশঃ মদ্যপায়ী হইয়া

উঠিলেন। ইহাতে কি আর জমিদারী রক্ষা হয়? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত আমরা কোন রাজবংশধরকে মদ্যপানে অর্দ্ধ বয়সে পরলোক গমন করিতে দেখি নাই। ইংরাজী আমল হইতে কেহ আর চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করেন নাই। আদালতের কুচক্র, জাল, ফিরিবী, কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে? ধূর্ত্তগুরু ক্লাইব বাঙ্গালীকে কি প্রথম একটী প্রধান জালের আদর্শ দেখান নাই? ইংরাজী আদালত স্থাপনাবধি যখন বঙ্গীয় সমাজের উপজীবিকাস্বরূপ নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি সমুদায় গবর্ণমেণ্ট গ্রাস করিতে লাগিলেন এবং করের যোগ্য স্থির করিতে লাগিলেন, সেই অবধিই লোকে আদালতের ফিরিবী ও কুচক্রিতা শিখিতে লাগিল। নদীয়া রাজবংশের দেওয়ান রামলোচন ষড়যন্ত্র করিয়া যেরূপে রাজকীয় জমিদারী মহল সকল পরহস্তগত করিতে লাগিলেন তাহার প্রধান সাধন কি ইংরাজী আদালত নহে? রাজা শ্রীশচন্দ্রের পূর্ব্বে আমরা এরূপ কুচক্র কি আর কখন দেখিয়াছি? বাস্তবিক ইংরাজগণ এতদ্দেশে আগমন করাতে যে কত প্রকার পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া দেয়।

সমালোচ্য গ্রন্থের কতিপয় প্রধান গুণ আমরা উল্লেখ করিলাম। তাহার সমস্ত গুণের পরিচয় দিতে হইলে আমাদিগের প্রস্তাব অত্যন্ত বৃহদায়তন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার সর্ব্বপ্রধান গুণ এখনও উল্লিখিত হয় নাই। ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত একটী নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছে। বাবু কার্ত্তিকেয়চন্দ্র যেমন নবদ্বীপরাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য রাজবংশীয় দেওয়ানগণ যদি স্বসম্বন্ধীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত রাজবাটীস্থ মূল কাগজ পত্র দেখিয়া লিপিবদ্ধ করেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস তাহা হইলে নিশ্চয় এক নূতন আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষে অদ্যাপি যে সমস্ত প্রধান এবং অপ্রধান রাজবংশ বর্ত্তমান আছেন, তদ্বংশনিবদ্ধ যাবতীয় মূল কাগজ পত্রের অনুসন্ধান করিলে ইতিবৃত্তমূলক, নানাবিষয়ক সত্য কি আবিষ্কৃত হয় না? ইংরাজবিবৃত ইতিবৃত্ত হইতে সে প্রকার গবেষণার ফলস্বরূপ নূতন বিবরণের কি অনেক প্রভেদ ঘটে না? ভরতপুরের যুদ্ধ আমরা ইংরাজীগ্রন্থে যেরূপ পড়ি, যাঁহারা সেই যুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদিগের মুখে তাহার বিবরণ শুনিলে অন্যপ্রকার ঘটনা সকল শ্রবণ করিতে হয়। এ সমস্ত বিবরণ কিম্বদন্তীমূলক। এক্ষণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ না হইলে আর কিছুদিন পরে ইহার কিছুই শুনা যাইবেনা। তখন আমরা মিথ্যা জল্পনাপূর্ণ, রসায়ন মিশ্রিত, ইংরাজ-বর্ণিত ভারত-বৃত্তান্ত ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হইব না। অতএব কার্ত্তিকেয় বাবু যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন, এই বেলা অন্যান্য রাজবংশীয় কর্ম্মচারীগণ যদি সেই পথে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস জনসমাজে সুপ্রচারিত হইবার অনেক সম্ভাবনা। এই সমস্ত গ্রন্থ কেবল দেশীয় ভাষায় নিবদ্ধ থাকিলে তত উপকার দর্শিবে না; ইহাদিগের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করাও আবশ্যক।

ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতের ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিন্তু নিতান্ত নিরলঙ্কৃত ও সরল। রচনার কোন স্থানে উচ্চনীচতা দৃষ্ট হয় না, সকল স্থানই সমান। লেখক আপনাপনি সরলভাবে লিখিলে আবার যেরূপ হয়, ইহার রচনা সেরূপ বোধ হয় না, যেন সকল স্থানই মার্জ্জিত সংস্কৃত ও সংশুদ্ধ বোধ হয়। রচনার ইহা এক টি দোষ।

গ্রন্থের আর একটি প্রধান দোষ এই. ইহার কোন স্থানে চিন্তাশীলতার পরিচয় নাই। গ্রন্থমধ্যে যে সমস্ত উপকরণ প্রদত্ত হইয়াছে. কোন চিন্তাশীল লেখকের হস্তে সেই উপকরণ পতিত হইলে গ্রন্থখানি নিশ্চয় দ্বিগুণিত হইত, এবং তাহাতে বিস্তর উপদেশ সংগৃহীত ও সারগর্ভ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইতে পারিত। চিন্তাশীল লেখক সহস্র সহস্র বিচ্ছিন্ন বিষয়কেও এক চিন্তাসূত্রে আবদ্ধ করেন। কারণ পৃথিবীর কোন ঘটনাই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। একথা যদি সত্য হয়, তবে বংশপরম্পরা কিরূপ নীতি ও শিক্ষা প্রভাবে অথবা অবস্থা গতিকে বিসদৃশ এবং বিভিন্নপ্রকৃতি হইয়াছিল সেই চিন্তাসূত্র অবলম্বন করিলে গ্রন্থকার কি নানা নূতন বিষয় অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার করিতে পারিতেন না! এই চিন্তাসূত্র অবলম্বিত হওয়াতে আধুনিক ইতিবৃত্ত লিখিবার প্রণালী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং পূর্ব্বে যে সকল বিবরণ বিশৃঙ্খল বোধ হইত এখন তাহা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাময় নিরূপিত হওয়াতে ঐতিহাসিক ইংরাজী সাহিত্য বিলক্ষণ উপদেশপ্রদ হইয়াছে। এরূপ চিন্তাসূত্রে সকল বিষয়কেই কার্য্যকারণসম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাওয়াতেও উপকার আছে। কারণ সেই দিকে মন আকৃষ্ট হইলে অনেক নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হয়। যাহা হউক, ভবিষ্যতে গ্রন্থকার যদি ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত চিন্তামিশ্রিত করিতে পারেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ খানি বঙ্গভাষায় যে একখানি অপূর্ব্ব এবং পরম উপাদেয় গ্রন্থ বলিয়া গণনীয় হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই, ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতের আমরা যে প্রকার প্রশংসা করিলাম, জনসমাজে এই গ্রন্থের যথোপযোগী সমাদর হইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব। বঙ্গদেশের ইতিহাসলেখকের হস্তে ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত যে একখানি মূলগ্রন্থ বলিয়া গণনীয় এবং ইতিহাসের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই

# জৈনধর্ম্ম।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নিজ ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে লব্ধমনোরথ হইয়া মহাবীর তাঁহার শিষ্য-দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া নানা স্থানে পর্য্যটনপূর্ব্বক অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী প্রদেশেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। বিহার, প্রয়াগ, কৌশাম্বী রাজগৃহ প্রভৃতি কতিপয় দেশই তাঁহার প্রচারকার্য্যের প্রধান ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। এই সময়ে শতানীক প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজগণ মহাবীরের উপদেশ লাভ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। এই প্রকারে তাঁহার ঐহিক কার্য্য সমুদয় শেষ করিবার পর মহাবীর অসংখ্য শিষ্যসমূহ সমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ব্বার অপাপ-পুরীতে উপনীত হইলেন। এইবারে তাঁহার মানবলীলার শেষ সময় উপস্থিত হইল। তিনি যথাকালে মানবদেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষধামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া শবদেহ দাহ করি-লেন, এবং অস্থি দন্ত প্রভৃতি অদগ্ধ অংশ গুলি অতিমাত্র যত্নের সহিত স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। ভস্মরাশি অন্যান্য সহকারীদিগের মধ্যে বিভক্ত হইল। এই মহৎ কার্য্য শেষ হইলে পর দেবগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যাতে ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহাবীরের মৃত্যু হয়। পার্শ্বনাথের মৃত্যুর পর ২৫০ বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু হইয়াছিল, মহাবীরচরিতে ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত গ্রন্থে পরেও লিখিত আছে যে মহাবীরের মৃত্যুর ১৬৬৯ বৎসর পরে কুমার পাল নামক রাজা অভিধানকার হেমচন্দ্রের উপদেশে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। খৃষ্টীয় ১১৭৪ অব্দে কুমারপাল জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হইতেছে যে খৃষ্টের মৃত্যুর প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীরের পরলোক হইয়াছিল।

মহাবীরের অধিকাংশ শিষ্য তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মানবলীলা সম্বরণ করেন, কেবল সুধর্ম্ম ও গৌতম ইহাঁরা উভয়েই গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারাদি কার্য্যের উত্তরাধিকারী হয়েন। কিন্তু মহাবীরের মৃত্যুর এক মাস পরেই গৌত-মের মৃত্যু হয়, সুতরাং মহাবীরের মৃত্যুর পর তৎপ্রচারিত ধর্ম্মবিষয়ে প্রকৃতরূপ উপদেশ দানে সক্ষম কেবল সুধর্ম্মই বর্ত্ত-মান রহিলেন। সুধর্ম্মের প্রধান শিষ্য "জম্বুস্বামী" এই নামে বিখ্যাত ছিলেন। মহাবীরের যে সকল শিষ্য কেবল উপাধি

লাভ করিয়াছিলেন, জম্বুস্বামী তাঁহাদের সকলের অধস্তন। জম্বুস্বামীর পর তাঁহার ছয় জন শিষ্য যথাক্রমে জৈনধর্ম্মের উপদেশ দান কার্য্যে ব্রতী হয়েন। ইহাঁরা কেবল গুরুর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুতকেবলী নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। ইহার পর সাত জন দশপূর্ব্ব নামক গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া দশপূর্ব্ব নামে প্রখ্যাত হন।

মহাবীরের পর হইতে ক্রমান্বয়ে তাঁহার ৭১ জন শিষ্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে জিনচন্দ্র নামক একষষ্টিতম ব্যক্তি সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। আর শেষ ব্যক্তি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, ইহাও অনেক জৈনগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে।

জৈনেরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভুক্ত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিগম্বরেরা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রধান। দিগম্বরেরা উলঙ্গ, আর শ্বেতাম্বরেরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে। কিন্তু অধুনা দিগম্বরেরাও আহার করিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে রক্ত বসন পরিধান করিয়া থাকে। বস্ত্র পরিধান ব্যতীত অন্যান্য নানা বিষয়েও উভয় দলের ভিন্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দিগম্বরেরা আপনাদিগকে মহাবীরের শিষ্য বলিয়া প্রচার করে, আর শ্বেতাম্বরেরা আপনাদিগকে পার্শ্বনাথের শিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শ্বেতাম্বর জৈনেরা তাঁহাদের তীর্থঙ্করদিগের বিগ্রহ সমূহ নানাবিধ বসন ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া রাখে, কিন্তু দিগম্বরেরা উক্ত বিগ্রহ গুলিকে বসনাদিশূন্য রাখাই উচিত বলিয়া মনে করে। শ্বেতাম্বরেরা সর্ব্বসমেত দ্বাদশটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বর্গের ও চতুঃষষ্টি ইন্দ্রের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে, কিন্তু দিগম্বরেরা ষোড়শপ্রকার স্বর্গ ও শত প্রকার স্বর্গবাসী রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। শ্বেতাম্বরেরা বলিয়া থাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার সময় হস্তে সম্মার্জ্জনী ও জলপাত্র গ্রহণ করা উচিত। নতুবা জীবজন্তুদিগের প্রতি অজ্ঞাতসারেও অত্যাচার করা হইতে পারে। এই জন্য শ্বেতাম্বর সন্ন্যাসীরা যে স্থানে উপবেশন করিবে, পূর্ব্বে তাহা সম্মার্জ্জনীদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া তত্রত্য জীব জন্তুদিগকে স্থানান্তরে অপসারিত করে। দিগম্বরেরা এরূপ করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেনা। এই সকল বিষয়ে পরস্পর মতভেদ থাকাতে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দিগের মধ্যে সর্ব্বদাই ঘোরতর বিবাদ হইয়া থাকে। উল্লিখিত দুই প্রধান সম্প্রদায় ব্যতীত জৈনদিগের মধ্যে আরও নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবীরের সময় হইতেই এইরূপ সম্প্রদায় বন্ধনের সূত্রপাত হয়। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া এক একটী দল বন্ধন করেন। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকে গুরু ও ব্রাহ্মণের

প্রতি ভক্তিও শ্রদ্ধা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। উল্লিখিত নানাবিধ সম্প্রদায়ব্যতীত জৈনেরা সাধারণ্যে অপর দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক দল উদাসীন ও যোগী, আর এক দল সংসারী। প্রথম সম্প্রদায়ের লোকেরা জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কোন প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করেনা, কেবল ভিক্ষাব্যবস্যায়ের উপর নির্ভর করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে। ইহারা স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করে, এবং লোকালয়ের বহির্ভাগে মঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বাস কয়িয়া থাকে। ইহাদের অন্তরে ভক্তি যতদূর থাকুক আর নাই থাকুক, বাহ্য আড়ম্বর অত্যন্ত। জীব হিংসার ভয়ে আপনাদিগকে অনুক্ষণ ব্যতিব্যস্ত দেখায়। এমন কি উপবেশনস্থান হইতে প্রথমে সংমার্জ্জনীদ্বারা অদৃশ্য জীবজন্তু অপসারিত করিয়া তবে উপবেশন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রতারক চৌর প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কখনই মন্দিরের পৌরোহিত্য স্বীকার করেনা, পৌরোহিত্য কার্য্য প্রায়ই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সংসারীরা শ্রাবক নামেও প্রসিদ্ধ। শ্রাবকেরা আচার ব্যবহারাদি অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহারা সাধারণ্যে প্রায় কোন প্রকার হিন্দু দেবদেবীর আরাধনা করেনা। ইহারা যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসী জৈনদিগকে সর্ব্বদাই ভিক্ষাদান করিয়া থাকে, এবং পার্শ্বনাথ ও মহাবীর এই দুই জন তীর্থঙ্করের সবিশেষ অর্চ্চনা করিয়া থাকে। বাঙ্গালা ও বিহারের নানাস্থানে বহুসংখ্যক জৈন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের মন্দির অপেক্ষা ইহাদিগের মন্দির গুলির গঠনপ্রণালীভৃতি অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। বিহার প্রদেশে পার্শ্বনাথের পাদুকা আছে। নানাদিগ্‌দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী প্রতিবৎসর পার্শ্বনাথের মন্দির দর্শনার্থ উপস্থিত হয়। বারাণসী পার্শ্বনাথের জন্মস্থান বলিয়া খ্যাত। এই-মহানগরীতে অনেক গুলি মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। বাঙ্গালাদেশেও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক জৈনের বাস। মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠীরা জৈনধর্ম্মালম্বী, এই জন্য মুর্শিদাবাদেও কতিপয় জৈনমন্দির দেখা যায়। কিন্তু জয়পুর ও মারওয়ার প্রভৃতি প্রদেশে যত মন্দির আছে, অন্য কুত্রাপি তত নাই। মারওয়ারের প্রায় সমুদয় অধিবাসীই জৈনধর্ম্মাবলম্বী। দাক্ষিণাতের অন্তর্গত অনেক স্থানে জৈনদিগের বাস আছে। ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করিয়া থাকে। ফলতঃ এক্ষণে বাণিজ্যাদি নানাসূত্রে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জৈনদিগের বসতি হইয়া পড়িয়াছে। জৈনদিগের পুরাবৃত্তাদি বিষয়ে অধুনাতন গবেষণাদ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ হইল। অতঃপর ইহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর মূলসূত্র সকল অর্থাৎ জৈন

দর্শনের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

পূর্ব্বে জৈনধর্ম্মের পুরাবৃত্ত ঘটিত তথ্য সকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, এক্ষণে উহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে। জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা জগৎসৃষ্টির আদিকারণস্বরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। উহাঁদের মতে সমুদয় সৎ অর্থাৎ ভাব পদার্থ জীব ও অজীব এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। সজীবপদার্থসমূহের জীবনের মূলীভূত কারণকে জীব ও যাবতীয় জড়পদার্থ সমূহকে অজীব পদার্থ কহে। উভয় প্রকার পদার্থই নিত্য, অর্থাৎ ইহাদের সৃষ্টি ও প্রলয় নাই। জীবপদার্থ অর্থাৎ আত্মা যেরূপ অসৃষ্ট ও অবিনশ্বর, জড়পদার্থও অবিকল তদ্রূপ। ইহাদের অবস্থা ও আকারের পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহাদের বিনাশ নাই। কোন কোন কর্ম্মফলে কোন কোন মহাপুরুষের আত্মা মুক্ত হইয়া প্রেত্যভাব প্রভৃতি জীবধর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন যাবতীয় জীব ও অজীব পদার্থ আবহমানকাল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকে, অতএব নির্দ্দিষ্ট যুগে যুগে সমান আকার, সমান চরিত্র, এবং সমান ঘটনাবলি সংঘটিত হইয়া থাকে।

জৈনদিগের মতে জগতে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় তত্ত্ব নামে অভিহিত। তত্ত্ব সমুদয়ে নয় প্রকার।

(১) জীবতত্ত্ব অর্থাৎ জীবপদার্থ, ইহাই জ্ঞানের আধার অথবা জ্ঞানস্বরূপ। জীব আবার দুই প্রকার। যাহাদের গতিশক্তি আছে, তাহাদিগকে গতিমান্ জীব কহে; আর যাহাদের গতিশক্তি নাই, তাহাদের নাম জড়জীব। পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা, ও অপদেবতা ইহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; আর ক্ষিতি, জল, তেজ, ও বায়ু এই চারি ভূতের সমবায়ে উৎপন্ন আকরিক ধাতু, উষ্মা, বাত্যা, উদ্ভিজ্জ, প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। সমুদয় জীব পদার্থ আবার এক, দুই, তিন, চারি, বা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অধিকার অনুসারে পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। আকরিক ধাতু প্রভৃতি যদিও সামান্য চক্ষুতে দেখিলে নির্জীব পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানশালী মহাপুরুষেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, উহাদেরও একপ্রকার জীবন ও অনুভবশক্তি আছে। ইহাদের আকারমাত্র আছে। মৎকুন প্রভৃতির আকার, মুখ, ও নাসিকাও আছে। মধুমক্ষিকা, মশক প্রভৃতির আকার, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু আছে; আর মনুষ্য প্রভৃতি জীবের পঞ্চেন্দ্রিয়ই বিদ্যমান আছে। এই পাঁচপ্রকার শ্রেণী ব্যতীত আর দুই প্রকার শ্রেণী আছে; জীবগণের জন্মের প্রক্রিয়া অনুসারে এই দুই প্রকার শ্রেণী পরিগণিত

হইয়া থাকে। কতকগুলি জীব ঔরসজাত অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর-সংসর্গ দ্বারা উৎপন্ন; আর কতকগুলি জীব যদৃচ্ছাসম্ভূত। এই সাত প্রকার জীব আবার সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ এই দুই প্রকারে বিভক্ত। অতএব নীচ পদার্থ সমুদায় চতুর্দ্দশ প্রকার। কর্ম্ম-ফলে জীবগণ নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; জীবনের আদি বা অন্ত নাই, ইহা কর্ম্মফলানুসারে অনুক্ষণ নানাবিধ শরীরে সংক্রমণ করিয়া থাকে। পাপকর্ম্ম দ্বারা জীবকে নীচ জন্তুদিগের দেহে সংক্রমণ করিতে হয়, অথবা নরকে গমন করিতে হয়; জীবের কর্ম্ম পাপ ও পুণ্য, উভয় সমবেত হইলে জীব মনুস্য প্রভৃতি ভূদেব প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হয়। নিরবচ্ছিন্ন পুণ্য দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, আর পাপ ও পুণ্য উভয় প্রকার কর্ম্মের বিনাশে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

২। অজীব পদার্থ সমূহের জীবন ও চৈতন্য নাই। অজীব জড়পদার্থ নানাবিধ, তন্মধ্যে জৈন গ্রন্থকারেরা সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশপ্রকার গণনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ ধর্ম্মাস্তিক্য, দ্বিতীয় অধর্ম্মাস্তিক্য, তৃতীয় আকাশাস্তিক্য। এই তিনটী আবার প্রত্যেকে তিন তিন করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রকার। কাল দশম বলিয়া পরিগণিত, এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও মরুৎ এই চারিটী ভৌতিক পদার্থ পুদ্গলন বলিয়া অভিহিত। এই সকল পারিভাষিক শব্দের মৌলিক অর্থ অনুসারে বিচার করিয়া ইহাদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারা যায়না। আস্তিক্য শব্দে অস্তিত্ব মাত্র বুঝাইতে পারে, আর কিছুই বুঝায়না। আবার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম শব্দে পাপ ও পুণ্য মাত্র বুঝাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মশব্দে কোন বিশেষ গুণ বা কার্য্যও বুঝাইতে পারে। শব্দগুলিকে পৃথক্ করিয়া উহাদের মৌলিক অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে উপরে যাহা নির্ণীত হইল তদ্ভিন্ন আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না; কিন্তু উহাদের পরস্পর সমবায়ে উৎপন্ন ধর্ম্মাস্তিক্যশব্দে, সজীব ও জড় পদার্থের গতির অনুকূলতা মাত্রকে বুঝায়, যথা জল মৎস্যের গতির পক্ষে অনুকূল পদার্থ। আবার অধর্ম্মাস্তিক্য শব্দে গতির প্রতিরোধক পদার্থ বুঝায়। আকাশাস্তিক্য শব্দে অভিঘাত ও প্রতিঘাতের মূল কারণ বুঝায়। ইহা শক্তিবিশেষ, ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের মধ্যে অবকাশ রক্ষিত হয়। কাল শব্দের কোন বিশেষ অর্থ নাই। ঘটনাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য জ্ঞানকেই কালের সংস্কার বলা যাইতে পারে। জৈনেরা কালের নানাবিধ সূক্ষ্মবিভাগ গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তৎসমুদয়ের কোন প্রকার কার্য্যকারিতা নাই বলিয়া এস্থলে উহাদের নামোল্লেখ করা গেল না। পুদ্গল শব্দে পরমাণু বুঝায়, জৈনদিগের মতে পরমাণু জড়পদার্থের চরম মূলস্বরূপ, ইহা সূক্ষ্মতম, অন্ত্য অবয়বী, ও বিভাগানর্হ।

৩। তৃতীয় তত্ত্ব পুণ্য, অর্থাৎ ধর্ম্মজন্য

ফলস্বরূপ। পুণ্য দ্বারা মনুষ্য সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। পুণ্য সর্ব্বসমেত বিয়াল্লিশ প্রকার। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী মাত্রের নামোল্লেখ করা যাইতেছে। (১) উচ্চৈর্গোত্র অর্থাৎ সমাজের কোন মর্য্যাদাপন্ন সংসারে জন্ম গ্রহণ। ইহাদ্বারা সমাজে সম্মান ও খ্যাতিলাভ করিতে পারা যায়। (২) মনুষ্যগতি অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরে মনুষ্যের শরীর গ্রহণ। (৩) সুরগতি, অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্তি। (৪) পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাপ্তি—সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হওয়াও পুণ্যের কার্য্য বলিতে হইবে। (৫)পাঁচ প্রকার নির্দ্দিষ্ট দেহের মধ্যে অন্যতমের অধিকারী হওয়া। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার আছে যথাঃ—উষ্ণত্ব, শীতলত্ব, ইত্যাদি।

৪। পাপ—অর্থাৎ, যদ্দ্বারা প্রাণীকে কষ্টভোগ করিতে হয় তাহার নাম পাপ। পাপ সর্ব্বশুদ্ধ ৮২-প্রকার। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার আবরণ, অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভের ব্যাঘাত। পাঁচ প্রকার অন্তরায় অর্থাৎ করতলস্থ সুখভোগের প্রতিকূল কারণ। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানোপার্জ্জনের চারি প্রকার বাধা। নিদ্রা। নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ। নরক। অপদেবতার প্রতি বিশ্বাস। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই গুলি প্রধান।

৫। পঞ্চম তত্ত্বের নাম আশ্রব। যাহা হইতে প্রাণীর পাপকর্ম্মের সমুদ্ভব হয়, তাহার নাম আশ্রব। আশ্রব নানাবিধ। তন্মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চকাষায় অর্থাৎ ক্রোধ গর্ব্ব লোভ প্রভৃতি মানসিক রিপু। তিন প্রকার যোগ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কোন ক্রিয়ার প্রতি অযুক্ত অনুরাগ। মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ চৌর্য্য ইত্যাদি দোষ। এবং ষড়বিংশতি প্রকার ক্রিয়া প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান।

৬। ষষ্ঠ তত্ত্বের নাম সম্বর। ইহা দ্বারা কোন কার্য্যের প্রতি প্রাণীর প্রবৃত্তি বা উহা হইতে নিবৃত্তি জন্মে। সম্বর সর্ব্বসমেত ৫৭ প্রকার। এই ৫৭ প্রকার সমুদয়ে ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা (১) সমিতি অর্থাৎ মনঃসংযোগ, পথের মধ্যে কোথাও কীটাদি জীব অলক্ষিত ভাবে পতিত আছে কিনা তাহা নির্ণয় করা, অযৌক্তিক বাক্যাদি উচ্চারণ হইতে সতর্ক থাকা। খাদ্যাখাদ্যের বিচার করা প্রভৃতি প্রধান। (২) গুপ্তি অর্থাৎ কায়মনোবাক্যঘটিত ত্রিবিধ আত্মৈশ্বর্য্য। [৩] পরিষাদ অর্থাৎ সহিষ্ণুতা। যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহা হইলে শীত, উষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি সহ্য করিয়াও তাহার সেই কার্য্য উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি যাচ্ঞা করিয়া হতাশ হন তাহা হইলে তাঁহার ক্লেশবোধ করা অকর্ত্তব্য। এই সকল এবং ঈদৃশ অন্যান্য নানাবিষয়ে মনুষ্যের সহিষ্ণুতা আবশ্যক। (৪) যতিধর্ম্ম অর্থাৎ বনচারী সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কার্য্য। ইহা সর্ব্বসমেত দশপ্রকার, যথাঃ—সহিষ্ণুতা নম্রতা, সরলতা, স্বার্থশূন্যতা, ধ্যান, তপঃক্লেশ, সত্যপরতা, বিশুদ্ধ চরিত্র, দারিদ্র্য,

ও জিতেন্দ্রিয়তা। (৫) ভাবনা অর্থাৎ সংস্কার, পার্থিব পদার্থসকল নিত্য নহে। মৃত্যুর পর আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ দেহে অবিরত সংক্রামণ করিয়া থাকে। ইত্যাদিকে সংস্কার কহে।

৭। নির্জর অর্থাৎ যোগ, ইহাদ্বারা মনুষ্যের অপবিত্র কার্য্যাদির ফল বিনষ্ট হয়। ইহা দুই প্রকার বাহ্য ও আন্তরিক। উপবাস, ইন্দ্রিয়নিরোধ, তূষ্ণী ও শারীরিক ক্লেশভোগ এই কয়েকটী বাহ্য; ও অনুতাপ, ধ্যান, ধারণা, অধ্যয়ন ইত্যাদি আন্তরিক।

৮। অষ্টম তত্ত্বের নাম বন্ধ অর্থাৎ কর্ম্মসূত্র। ইহাদ্বারা জীব পার্থিব পদার্থের সহিত আবদ্ধ হইয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আবার ইহাদ্বারাই জড় পদার্থ সকলও পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, যথা অগ্নি লৌহ-গোলকের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধ চারিপ্রকার প্রকৃতি, অর্থাৎ পদার্থমাত্রের স্বভাব; স্থিতি অর্থাৎ অবস্থিতিকাল; অনুভব অর্থাৎ বুদ্ধিশক্তি; এবং প্রাদেশ অর্থাৎ অন্ত্যাবয়বী অনুপরিমাণ।

৯। নাম অর্থাৎ শেষ তত্ত্বের নাম মোক্ষ। কর্ম্মসূত্র হইতে আত্মার বন্ধনমোচনের নাম মোক্ষ বা মুক্তি। মোক্ষ সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

জৈনদিগের মতে মোক্ষ শব্দের অর্থ সাংসারিক কর্ম্মসূত্র হইতে আত্মার মুক্তি। কিন্তু কর্ম্মসূত্র হইতে মুক্তির পর আত্মা কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত থাকে, জৈনদিগের শাস্ত্র হইতে তাহা নির্ণয় করিতে পরা যায় না।

জীব জীবন্মুক্ত হইলে জীবের দেহও অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু দেহত্যাগের পর মুক্তিলাভ হইলে আত্মার কিরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়না। কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তির তাৎপর্য্য, পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয়, যে নির্ব্বাণ-মুক্তির পর আত্মা একপ্রকার স্বর্গীয় অতীন্দ্রিয় শরীরে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক অনন্ত জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মোক্ত মুক্তিও এই প্রকার ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

উপরে পদার্থাদির বিষয় যাহা উল্লিখিত হইল, জৈনেরা সর্ব্বশাদি-সম্মতরূপে তৎসমুদয়ের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যতি ও শ্রাবক নামক যে দুই প্রধান বিভাগ আছে, এই উভয়ের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপাসকদিগের মধ্যে আচার বিষয়ে নানাবিধ মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যতিরা সন্ন্যাসী, ইঁহারা জৈনমন্দিরের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। শ্রাবকেরা গৃহী। উভয় সম্প্রদায়ই তীর্থঙ্করদিগের উপদেশ ও কার্য্যকলাপের প্রতি অসীম ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগের উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে যতিরা সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যল্পমাত্র আহার,

অনাবৃত স্থানে বাস, প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। আর শ্রাবকেরা সংসার-নিবিষ্ট থাকিয়া তীর্থঙ্করদিগকে প্রকৃত-প্রস্তাবে পূজা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। জৈনদিগের নীতিশাস্ত্রে পাঁচটী অনুশাসন আছে, যথাঃ—জীবহত্যা করিবে না; সদা সত্য কথা কহিবে; সরল ও সৎস্বভাব হইবে; পতি ও পত্নী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইয়া অন্যনিষ্ঠ হইবে না; এবং সর্ব্বদাই পার্থিব বাসনা সমূহ দমন করিবার চেষ্টা করিবে। ইহার পর চারি প্রকার ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, যথাঃ—দান, নম্রতা, ভক্তি ও প্রায়শ্চিত্ত। পরে তিন প্রকার সংযম, যথাঃ—মনঃসংযম, বাক্‌সংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম। এতদ্ভিন্ন অনেক গুলি সামান্য বিধি ও নিষেধ আছে, এই সমুদয়ের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত অনাবশ্যক, আর কতকগুলি হাস্যকর। এস্থলে দুই একটী মাত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে যথাঃ—বৎসরের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সময়ে লবণ, পুষ্প, অম্ল, ফল, মূল, মধু, দ্রাক্ষা, তামাক প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করিবেনা; তিন চারি বার ছাঁকিবার পর জলপান করিবে; কোন প্রকার তরল পদার্থ অনাবৃত রাখিবেনা, কারণ তাহা হইলে কীট প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব উহাতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে। কোন সময়েই অনাচ্ছন্ন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক আহারাদি করিবেনা; কারণ তাহা হইলে অনবধানবশতঃ ক্ষুদ্র কীটাদি উর্দ্ধস্থ হইতে পারে ইত্যাদি। জৈনদিগের যতি অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকেরা সর্ব্বদা পাছে ক্ষুদ্র কীটাদি মুখের মধ্যে প্রবেশ করে এই আশঙ্কায় এক খণ্ড বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখে; তাহারা সর্ব্বদাই একটা সম্মার্জ্জনী সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করে, এবং যে কোন স্থানে উপবেশন করে, তথায় উপবেশনের পূর্ব্বে উক্ত সম্মার্জ্জনী দ্বারা জীবজন্তু সমূহ অপসারিত করিয়া দেয়। এই সকল বিধি ও নিষেধের মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে যে, জৈনদিগের ধর্ম্মে অহিংসাই পরম পদার্থ, সমগ্র উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্য কোন প্রকার জীবের প্রতি অত্যাচার করিবেনা, এবং পার্থিব পদার্থের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত না হইয়া সর্ব্বদা কুশলে কালাতিপাত করিবে।

নীতিশাস্ত্রের ন্যায় জৈনদিগের পূজাদি পদ্ধতিও অল্পমাত্র। যাহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতিধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহাদিগকে দেবতাপূজাদি করিতে হয়না, গৃহস্থ জৈনেরাই মন্দিরাদিপ্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্করাদি দেবমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। জৈন মন্দিরে যে পুরোহিত জৈনদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী যতি, কিন্তু যে ব্যক্তি পূজা প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ জৈনধর্ম্মাবলম্বী নহেন। ফলতঃ জৈনধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে দেবপূজাদির আবশ্যকতা নাই, সুতরাং ইহাদের ধর্ম্মের

মধ্যে পুরোহিতের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়না। তবে অধুনা জৈনেরা ব্রাহ্মণদ্বারা যে নিজ নিজ দেবতাদিগের পূজা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সে কেবল লোকাচার-জনিত পদ্ধতি মাত্র বলিতে হইবে। জৈনেরা কেবল তীর্থঙ্কর-দিগেরই পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে হিন্দু দেব দেবীর আরাধনা হইতেও দেখা যায়। ইহার কারণ এই জৈন তীর্থঙ্করদিগের জীবনবৃত্তে কোন কোন হিন্দু দেব দেবীর উল্লেখ আছে, উপাসকেরা এই জন্যই উক্ত দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার জাতিভেদও প্রচলিত আছে। আর ইহারা নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অবাধে হিন্দু-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

জৈনেরা সর্ব্বশুদ্ধ চারিপ্রকার দেবতার অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়া থাকে, যথাঃ—ভুবন-পতি, ব্যন্তর, জ্যোতিষ্ক ও বৈমানিক। প্রথমপ্রকার আবার দশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা, অসুর, সর্প, গরুড়, দিক্-পাল, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, বজ্র, বিদ্যুৎ; এই গুলি পৃথিবীর অধঃস্থ ভিন্ন ভিন্ন নরকের অধিপতি বলিয়া পরিগণিত। দ্বিতীয়টী আট প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা পিশাচ, ভূত, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, এবং অন্যান্য বন্য ও পার্ব্বতীয় দেবতাদি। তৃতীয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথাঃ—সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক পদার্থ। বর্ত্তমান ও অতীত কল্পের দেবতাগণ চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত; ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এই শ্রেণীস্থ দেবতা। এতদ্ভিন্ন আরও চতুরশীতি সহস্র দেবতার উল্লেখ আছে, ইহাঁরা সকলেই প্রধান প্রধান দেবতাদিগের সহচরস্বরূপ। যাহা হউক জৈনেরা উহাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক তীর্থঙ্কর প্রভৃতি মহাপুরুষ দিগকে দেবতাগণের অপেক্ষা অনেক অধিক ভক্তির সহিত আরাধনা করিয়া থাকে। তীর্থঙ্করদিগের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৭২ প্রকার। তন্মধ্যে ২৪ প্রকারই সর্ব্বপ্রধান। মেদিনীকার হেমচন্দ্র চারিজন উৎপত্তি-বিনাশ-বিহীন নিত্য চিরজীবী তীর্থঙ্করের নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ—ঋষভানন, চন্দ্রানন, বারিষেণ এবং বর্দ্ধমান। এই চারিটীর মধ্যে প্রত্যেকের মূলগত অর্থ কিরূপ তাহা সবিশেষ নির্ণয় করিতে পারা যায়না। আর এই চারিজনের অস্তিত্ব জৈনদিগের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মতও নহে। হিন্দুধর্ম্মের প্রবলতর প্রতাপবশতঃ জৈন-ধর্ম্মের মধ্যে অনেক স্থলে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ হিন্দুধর্ম্মের সহিত নানাবিষয় মিশ্রিত হইয়া এক্ষণে আর জৈনধর্ম্মের বিশুদ্ধভাব নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেক স্থানে জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিক দেব দেবীর আরাধনা করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও শৈব ও শাক্ত ভৈরব ও ভৈরবীদিগের প্রতিমা জৈন মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

সময়ে সময়ে জৈনেরা হিন্দু উপাসকদিগের সহিত একত্র সমবেত হইয়া সরস্বতীও দুর্গার অর্চ্চনা করিয়া থাকে; এবং "ওং" "হ্রং" প্রভৃতি তান্ত্রিক ও বৈদিকমন্ত্রেরও উচ্চারণ করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যবাসী জৈনেরা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কারের বিধানানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী জৈনেরা সূতিকা পূজা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি দুই একটী ব্যতীত শ্রাদ্ধাদি অন্য কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেনা।

জৈনদিগের অনেক গুলি অনন্যসাধারণ উৎসব আছে। কোন না কোন তীর্থঙ্করের জন্ম বা মৃত্যুর তিথিতে উক্ত উৎসব সকল সংঘটিত হইয়া থাকে। পার্শ্বনাথ ও বর্দ্ধমান এই দুই মহাপুরুষের জন্ম ও মৃত্যুর তিথিতে মহোৎসব হইয়া থাকে। যে যে স্থানে এই সকল ঘটনা হইয়াছিল সেই সেই স্থান জৈনদিগের মহা তীর্থ। তথায় নানাদিগ্‌দেশ হইতে প্রতিবৎসর অসংখ্য যাত্রী সমবেত হইয়া থাকে। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পার্শ্বনাথের পর্ব্বত পার্শ্বনাথের মুক্তিস্থান বলিয়া উহা মহা তীর্থ স্বরূপে পরিগণিত। পার্শ্বনাথের ন্যায় বর্দ্ধমানের মৃত্যুস্থান অপাপপুরী নগরীও একটী প্রধান তীর্থ। মাঘ ও কার্ত্তিক মাসে এই দুই স্থানে এক একটী মেলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে আবু ও গিরিসর নামে দুইটী পাহাড় ঋষভদেব ও নেমিনাথের স্থান বলিয়া অতিশয় ভক্তির সহিত পূজিত হইয়া থকে।

এতদ্ভিন্ন বসন্তোৎসব ও শ্রীপঞ্চমী এই দুই হিন্দু উৎসবে জৈনেরা হিন্দুদিগের সহিত সমবেত হইয়া থাকে। জৈনেরা হিন্দুধর্ম্মানুসারে যাত্রিক তিথি প্রভৃতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।

# জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ।
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্‌॥"

যদি কখন কোন রমণী কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের এই প্রশংসা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসার যোগ্য হইয়া থাকেন, তাহা মিলের সহধর্ম্মিণীই।

কালিদাস গৃহিণীত্ব, সচিবত্ব, সখীত্ব ও শিষ্যাত্ব এই কয়েকটী বই রমণীর অন্য কোন গুণের অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু মিলের পত্নীতে এ সমস্ত অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে অধিকতর ও উচ্চতর গুণের সমাবেশ ছিল। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না ও পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে মিলের ন্যায় মনীষীরও মন যে বিচলিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পত্নীবিয়োগের পর মিল্ সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তদীয় সমাধি-সন্নিধানে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পত্নীর অনন্যপূর্ব্বাবস্থাজাত একমাত্র দুহিতা সেই নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিলেন। ইনিই সেই বিয়োগিনী অবস্থায় তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র কুটীরে পত্নীবিয়োগেও তিনি কল্পনাবলে তৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে লাগিলেন। যে সকল মহৎ কার্য্য তাঁহার পত্নীর জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই সকল কার্য্য তাঁহার জীবনেরও একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। যে সকল কার্য্য তাঁহার পত্নী অনুমোদন করিতেন, যে সকল কার্য্যে তাঁহার পত্নীর সহানুভূতি ছিল, এবং যে সকল কার্য্যের সহিত তদীয় পত্নী অনিবার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্যেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবেন—মিল্ ইহা স্থির সঙ্কল্প করিলেন। নীতির যে আদর্শ (১) তদীয় পত্নীর অনুমোদিত ছিল, সেই নৈতিক আদর্শ দ্বারাই জীবন নিয়মিত করিবেন, ইহা তাঁহার স্থির সঙ্কল্প হইল। ইত্যাদি নানা উপায়ে পত্নীর স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখা মিলের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল।

[illegible] বিষয়ক গ্রন্থ [illegible] শেষরূপে [illegible] মস্তিষ্কে [illegible], সেই [illegible] প্রকা[illegible] এবং [illegible] স্বাবে [illegible] পর [illegible] প্রথম কার্য্য হইল। তিনি ইহার কোন স্থান পরিবর্ত্তিত, বা ইহার কোন দেশে কোন নূতন বিষয়ের সংযোজনা, করেন নাই। যদিও ইহা তদীয় পত্নীর হস্তে শেষ সংস্করণ পাইলে উৎকৃষ্টতর হইত সন্দেহ নাই, তথাপি মিল্ নিজ হস্তে সেই অভাবের পূরণ করিতে কখন ইচ্ছা করেন নাই।

এই গ্রন্থের এমন একটী বাক্য নাই, যাহা তাঁহারা দুইজনে একত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন নাই; ইহার এমন একটী স্থান নাই যাহা তাঁহারা দুই জনে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই; ইহাতে এমন একটী চিন্তা বা ভাব নাই, যাহা তাঁহারা দোষ-স্পর্শ-শূন্য করিতে চেষ্টা করেন নাই। এই সকল কারণে এই গ্রন্থখানি যদিও তদীয় পত্নীর শেষ পুনঃপর্য্যবেক্ষণ প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি ইহা রচনা বিষয়ে মিলের যাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট-

(1) Standard

তর হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে যে সকল চিন্তা সন্নিবেশিত আছে, তাহার কোন্ গুলি তাঁহার এবং কোন্ গুলি তদীয় পত্নীর, তদ্বিষয়ে নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। তবে ইহার চিন্তাস্রোতের গতি যে তদীয় পত্নী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহাদিগের দুইজনেরই মনে এই বিষয়ে একইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইত। এই বিষয়ে তাঁহার মনে যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইত, মিল্ তাহা পত্রে অঙ্কিত করিতেন। তদীয় পত্নী সেই পত্রাঙ্কিত চিন্তাস্রোতের গতির অনুসরণ করিতেন এবং গতিভ্রংশ দেখিলে তাহার সংশোধন করিয়া দিতেন। কখন কখন মিলের মনের গতি এরূপ হইত, যে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক অতিশাসনের (১) অনুমোদন করিতেন; কখন বা তাঁহার রাডিকালত্ব ও সাধারণতন্ত্রিত্ব প্রবণতা কমিয়া যাইত। এই সকল মতিভ্রংশের সময় তদীয় পত্নীই তাঁহাকে প্রকৃত পথে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। আত্মাভিমান মিলের এত অল্প ছিল, যে তিনি সকলের নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং সকলেরই মতের যথোচিত সম্মান করিতেন। এইজন্য সময়ে সময়ে এরূপ ঘটিত, যে তিনি অপরের মতের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া নিজের মতকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিতেন। এই বিপদ্ হইতে তদীয় পত্নীই তাঁহাকে সতত রক্ষা করিতেন। কোন্ মতের কতদূর সম্মাননা করা উচিত, এবং পরের মতের সম্মাননা রক্ষা করিবার জন্য নিজের মত কত পরিমাণে সঙ্কুচিত করা উচিত, তদীয় পত্নীই তাহার মীমাংসা করিতেন।

(1) Over Government

মিল্ "ন্যায়দর্শন" ব্যতীত অন্যান্য যত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে তদীয় স্বাধীনতাবিষয়ক গ্রন্থখানিরই দীর্ঘজীবী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। তাহার কারণ এই যে প্রথমতঃ—ইহার প্রণয়নে তাঁহার নিজের এবং তদীয় পত্নীর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ শুদ্ধ এইরূপ একটী মাত্র সত্য লইয়া এরূপ দার্শনিক গ্রন্থ পূর্ব্বে আর কথনই প্রচারিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ অধুনাতন সমাজে উন্নতির অনুকূলে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যের বেগ ক্রমশঃই প্রবলতররূপে অনুভূত হইতেছে; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাধীনতার প্রভেদ ও স্বতন্ত্র মূল্য অনেকেই ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন; সংখ্যাতীত মানবের সংখ্যাতীত বিভিন্নপ্রকার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি থাকিবে, অথচ সেই অসংখ্য প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ হইবে না, এরূপ অবস্থা যে মানবজগতের বৈচিত্র্যসাধন ও স্থিতিস্থাপনের একমাত্র উপায়, তাহা এক্ষণে অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। এই জন্যই মিলের স্বাধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধের

এই শ্রদ্ধাই ক্রমে প্রণয়রূপে পরিণত হয়। এত আদর! এই জন্যই ইহার চিরস্থায়ী হইবার এত সম্ভাবনা!

ইহার মৌলিকতা সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতারূপ সত্য জগতে এই নূতন আবিষ্কৃত হইল এরূপ নহে। ব্যক্তিগত ও জাতি বা সমাজগত স্বাধীনতার প্রভেদ কি, তাহা পূর্ব্বে অনেকেই জানিতেন। প্রাচীনকালে—সভ্যতালোক জগৎ আলোকিত করার পূর্ব্বেও—এই সত্য কতিপয় মনীষীমাত্রের নিভৃত চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল। জগতে সভ্যতাসূর্য্য সমুদিত হওয়ার পর অবধি মানবজাতি কখনই এই সত্যের আলোকশূন্য হয় নাই। বিশেষতঃ অধুনাতন ইউরোপে পেস্‌টালোজি (১) উইল্‌হেম্ ভন্ হম্বোল্ট (২) ও গেটি (৩) প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের যত্নে ব্যক্তিত্ববাদ (৪) মতের বিপুল প্রচার হইয়া গিয়াছে। মিলের পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উইলিয়ম্ ম্যাকাল (৫) এবং আমেরিকায় ওয়ারেন্—এই মত সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। সুতরাং মিলের পুস্তকে কোন নবাবিষ্কৃত মত প্রচারিত হইয়াছে একথা আমরা বলিনা। তবে আমরা এইমাত্র বলিব যে এই বিষয় এত অসন্দিগ্ধরূপে ও নূতনভাবে জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা পূর্ব্বে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

(1) Pestalozzi.
(2) Wilhem Von Humboldt.
(3) Goethe.
(4) Doctrine of Individualism.
(5) William Maccall.

মিলের আর একখানি গ্রন্থের সহিত তাঁহার পত্নীর স্মৃতি চিরগ্রথিত হইয়া আছে। এই গ্রন্থখানির নাম "সব্‌জেক্‌সন্ অব্ উইমেন্" (১) বা স্ত্রীজাতির অধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধ। ইহার অন্তর্নিবেশিত মতসকল তিনি পত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন একথা আমরা বলিতেছি না। যাঁহাদিগের এরূপ সংস্কার আছে তাঁহারা যেন তাহা ভুলিয়া যান। আমাদিগের বক্তব্য এই যে ইহাতে স্ত্রীজাতির অনুকূলে যে নূতন মতগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই মতগুলিই সর্ব্বপ্রথমে টেলরপত্নীর চিত্ত আকর্ষণ করে; সেই মতগুলিই তাহাদিগের উদ্ভাবয়িতার প্রতি টেলরপত্নীর মনকে প্রণয়প্রবণ করিয়া দেয়; সেইমত গুলিই তাহাদিগের উদ্ভাবয়িতার সহিত টেলরপত্নীর প্রথমে প্রণয় ও পরিশেষে পরিণয়ের সংঘটন করে। 'বৈধিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক সকল বিষয়েই পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির সমান অধিকার'— এই নবীন মত তিনি টেলরপত্নীর নিকট শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু টেলরপত্নীই এই মত সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মুখে শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করা অবধি মিলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়।

(1) Subjection Wumen.

যদিও মিল্ এই মত টেলরপত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই, তথাপি সেই মত কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে তাহা তিনি তাঁহারই নিকট শিখিয়াছিলেন। "স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির ন্যায় সম্পূর্ণ বৈধিক স্বাধীনতার অধিকারিণী; পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষণীয়; যে সকল বিধিপরম্পরা দ্বারা সমাজ ও রাজ্য শাসিত হইয়া থাকে, তাহার গঠনকার্য্যে পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতির সমান অধিকার" এসকল মত তিনি তদীয় পত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই বটে; কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিপরম্পরার গঠনবিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায়, সমাজের যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, মানবজাতির উন্নতিমার্গে যেসকল কণ্টক রোপিত হইতেছে, এবং কি কি উপায়েই বা সেই সকল অনিষ্টপাতের নিবারণ হইতে পারে, সে সমস্ত তিনি তদীয় পত্নীর নিকটই শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিলের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে—তদীয় পত্নীর এতদ্বিষয়ক সমস্ত চিন্তা তিনি এই গ্রন্থে উদ্ভাসিত করিতে পারেন নাই; এবং এই গ্রন্থ তদীয় পত্নীদ্বারা সংরচিত হইলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইত।

"লিবার্টি'র" মুদ্রাঙ্কনের কিছুদিন পরেই, মিল্ "থট্স অন্ পার্লিয়ামেণ্টারী রিফরম্"(১) নামক একখানি রাজনীতিবিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকার কিয়দংশ তদীয় পত্নীর দ্বারা অনুমোদিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। মিল্ ও তদীয় পত্নী—ইহাঁরা দুইজনেই পূর্ব্বে "ব্যালট্" (২) প্রণালীর স্বপক্ষ ছিলেন; কিন্তু পত্নীবিয়োগের কিছুদিন পূর্ব্বে মিলের ও তদীয় পত্নীর এই বিষয়ে মত-পরিবর্ত্তন হয়। মতপরিবর্ত্তন বিষয়ে মিলের পত্নী বরং তাঁহার অগ্রগামিনী হন। এই পুস্তিকায় "ব্যালট" প্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের যে সকল যুক্তি ছিল সেই সকল যুক্তি মাত্রই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে মিলের আরও একটী নূতন মত সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে ভোটের অসমতা অবশ্য রক্ষণীয়; কিন্তু তাঁহার মতে ইহা পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই মত বিষয়ে মিল্ কখনই পত্নীর সহিত তর্ক বিতর্ক করেন নাই; সুতরাং এ মত তদীয় পত্নীর অনুমোদিত ছিল, একথা বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ কেহই তাঁহার এ মতের অনুমোদন করেন নাই। যাঁহারা ভোটের অসমতার পক্ষপাতী, তাঁহারা সম্পত্তিরূপ ভিত্তির উপরই এই অসমতা সংস্থাপিত করিতে চাহেন; বুদ্ধি বা বিদ্যার উৎকর্ষের উপর নহে।

মিলের পার্লিয়ামেণ্টারী-সংস্কার-বিষয়ক প্রবন্ধের প্রকাশনের অব্যবহিত পরেই

(1) Thoughts on Parliamentary Reforms.

(2) Ballot.

মিষ্টার হেয়ারের (৩) প্রতিনিধিপ্রণালী (৪) বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হেয়ারের প্রণালীর উৎকর্ষ বিষয়ে মিল্ অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে হেয়ারের পুস্তকের এবং এই বিষয়ে অষ্টিন্ ও লরিমার(৫) লিখিত পুস্তক দ্বয়ের একটী বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করেন। এই সমালোচনা এক্ষণে মিলের বিবিধরচনাবলী নামক গ্রন্থের অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে।

এই বৎসরে তিনি আর দুই একটী গুরুতর কার্য্যের সম্পাদন করেন। প্রথমতঃ এডিন্‌বরা রিভিউতে সুবিখ্যাত দার্শনিক বেইনের মনোবিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া ইহার যশঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলিকে "ডেসার্টেসন্‌স আ্যাণ্ড্ ডিস্‌কসন্‌স" নামে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত করেন। তদীয় পত্নীর জীবদ্দশাতেই ইহার অন্তর্নিবেশনীয় বিষয় গুলি নির্ব্বাচিত হয়; কিন্তু পুনঃপ্রকাশন লক্ষ্য করিয়া সেগুলি তদীয় পত্নীদ্বারা কথনই সংশোধিত হয় নাই। পত্নী-সাহায্যবিরহে হতাশ হইয়া মিল্ প্রস্তাবগুলিকে তদবস্থাতেই মুদ্রিত করিলেন। কেবল যে যে স্থান তাঁহার বর্ত্তমান মতের বিরোধী ছিল সেই সকল স্থান উঠাইয়া দিলেন। "এ ফিউ ওয়ার্ডস অন নন-ইণ্টার ভেনসন্" (১) —ফ্রেজার্স ম্যাগজিনে এতৎ-শিরস্ক প্রবন্ধ ভিন্ন মিল্ এবৎসর আর কিছুই লিখেন নাই। এই প্রবন্ধটী তদীয় "ডেজার্টেসন্‌স আ্যাণ্ড ডিস্‌কসন্‌স" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ড বিদেশীয় রাজনীতিবিষয়ে কিঞ্চিৎ উদাসীন; যে বিষয়ে ইংলণ্ডের কোন স্বার্থ নাই তাহাতে ইংলণ্ড হস্তক্ষেপ করেন না;—ইত্যাদি অপবাদ হইতে ইংলণ্ডের গৌরব রক্ষা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় লর্ড-পামার্ষ্টন কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল কাটার প্রতিবাদই—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অপযশঃ উদ্ঘোষিত হওয়ার উত্তেজক কারণ। এই প্রস্তাব উপলক্ষে মিল্—যে নীতি ও রাজনীতি দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির পরস্পর-সম্বন্ধ হওয়া উচিত—সেই নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বিতর্ক উত্থাপিত করেন। এই জাতিগত নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে তদীয় মত সকল, তিনি লর্ড ব্রুহাম্ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাশি সাময়িক গবর্ণমেণ্টের সমর্থন বিষয়ক প্রস্তাবে, কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত করেন। এই প্রবন্ধটী প্রথমে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার রিভিউএ প্রকাশিত হয়; এবং

(3) Mr. Hair.

(4) Representative System.

(5) Lorimer.

(6) Dessertations and Discussions.

1 A few words on non-intervention.

পরে তদীয় "ডেজার্টেসন্‌স" নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়।

মিল্‌ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এইরূপে শুদ্ধ রাজনৈতিক সাহিত্যের অনুশীলনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি রাজনীতির প্রধান আন্দোলনস্থান লণ্ডন-নগরী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে অসুবিধা না হইয়া বরং সুবিধাই ঘটিয়াছিল। আজ কাল যাঁহাদের কিছু সঙ্গিত আছে; বাষ্পীয়পোত, বাষ্পীয় শকট, তড়িৎ বার্ত্তা-বহ প্রভৃতি গত্যনুকূল উপকরণ সকলের জন্য দূরত্বজনিত কোন অসুবিধাই তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। গত দিবস যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, পরদিন প্রত্যূষে সেই সকল ঘটনা সংবাদপত্র-যোগে এক সময়েই লণ্ডনে ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকে। লণ্ডনের অধিবাসিরা যে সময়ে দৈনন্দিন সংবাদপত্র সকল তাঁহাদিগের টেবিলের উপর দেখিতে পান, বাষ্পীয় শকটের অদ্ভুত মহিমায় অন্যান্য নগরের ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীরাও সেই সময়েই সেইসকল সংবাদপত্রদ্বারা তাঁহাদিগের টেবিল্‌ সুশোভিত দেখিতে পান। সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক সাময়িক পত্র সকল যথাসময়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়া পল্লীগ্রামের অধিবাসী-দিগকেও সাময়িক তর্কের বিষয় অবগত করিয়া দেয়। অনেকসময় এরূপ ঘটে যে নগরের অধিবাসীরা বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়সকল লোকের মুখেই শুনিয়া পরিতৃপ্ত হন; তাঁহারা সম্বাদ পত্র বা সাময়িক পত্রাদিতে এই সকল বিষয়ে যে সকল তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত বা প্রবন্ধ লিখিত হয় তাহা পাঠ করা তত আবশ্যক মনে করেন না; কিন্তু পল্লীগ্রামের অবি-বাসী—যাঁহার লোকমুখে সে সকল বৃত্তান্ত শুনিবার তত সম্ভাবনা নাই—হয়ত যত্নপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় সম্বাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদিতে পাঠ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় যে নগরের গল্পীরা প্রায়ই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত—চিন্তাবিহীন ও হুজুগপ্রিয়; কিন্তু সম্পা-দকেরা অপেক্ষাকৃত অধিকতর চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত। এইজন্যই সম্পাদকেরা, সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত। এইজন্যই সম্বাদ বা সাময়িক পত্রাদিতে লিখিত বর্ত্তমান-ঘটনা-বিষয়ক প্রস্তাব বা প্রবন্ধ প্রায়ই সারবান্‌ ও চিন্তাবহুল হয়। এইজন্যই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া-যায় যে সম্বাদ পত্র বা সাময়িক পত্রাদির পল্লীগ্রামস্থ পাঠক অধিকতর চিন্তাশীল, এবং বর্ত্তমান-ঘটনা-বিষয়ে তাঁহার মতসকল অধিকতর সারগর্ভ। যাঁহারা লৌকি-কতা ও সামাজিকতা লইয়া সতত ব্যস্ত, তাঁহারা মানবী ঘটনাবলীর গভীর তত্ত্বের উন্মেষণে অক্ষম। একজন বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান্‌ লোকও যদি অধিকদিন লৌকি-কতা ও সামাজিকতা লইয়া ব্যস্ত থাকেন; তাহা হইলে তাঁহারও জ্ঞাননেত্র অচির-

কালমধ্যে নিমীলিত ও বুদ্ধিবৃত্তি নিস্প্রভ হইয়া যাইবে। যাহাদিগের সহিত তিনি সতত মিশ্রিত হন, তাহাদিগের সমতলে তাঁহাকে অচিরকালমধ্যেই নামিতে হয়। এরূপ লোকের সম্বাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং চতুর্দ্দিকে কি ঘটিতেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ের আন্দোলনে তদীয় দেশ আন্দোলিত হইতেছে, সে সকল বিষয় জানিবার তাঁহার অবসর নাই। বর্ত্তমান ঘটনাস্রোতের কি বা পরিণাম হইবে, বর্ত্তমান তর্কের বিষয়ীভূত প্রশ্নসকলের কি বা মীমাংসা হইতে পারে, তাহাও ভাবিবার তাঁহার সময় নাই। মিল্ এরূপ অবস্থার শোচনীয় পরিণাম জানিতেন, এই জন্যই তিনি সামাজিকতা ও লৌকিকতা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। নগরের অনতিদূরস্থিত ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থিত হইয়াও সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির দ্বারা তিনি জগতের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিতেন; বর্ত্তমান ঘটনাবলীর স্রোত কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে, বর্ত্তমান অমীমাংসিত প্রশ্নসকলেরই বা কি মীমাংসা হইতে পারে, তাহা তিনি সেই ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া ভাবিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে সেই সকল বিষয়ে নব নব প্রবন্ধ লিখিয়া জগতে নূতন আলোক বিস্তার করিতেন। শিল্পবাণিজ্যাগত দ্রব্যজাত ও মানবস্রোত প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া জ্ঞানভাণ্ডার অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে নগরে আসিতেন।

এই নির্জ্জন প্রদেশের এই ক্ষুদ্র কুটীরের একমাত্র আলোক—তদীয় পত্নীর গর্ভজাত দুহিতা—মিলের আত্মোৎকর্ষসাধনের সাহায্যব্রতে ব্রতী ছিলেন। মিলের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শুশ্রূষা ব্যতীত তাঁহার জীবনের অন্য কোন কার্য্য ছিল না। জীবননাট্যশালায় এরূপ বিচ্ছেদের পর এরূপ সঙ্গিনী প্রাপ্ত হওয়া অতি অল্প পুরুষের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। এখন হইতে যাঁহারা মিলের নামে প্রকাশিত পুস্তক সকল পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের মনে যেন ইহা উদিত হয়, যে সেই পুস্তকগুলি দুইজন অদ্ভুত রমণী ও একজন অদ্ভুত পুরুষের মস্তিষ্কের ফল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মিল্ "কন্সিডারেসন্স অন্ রেপ্রেজেন্টেটিবগবর্ণমেণ্ট" (১) নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। দীর্ঘকালব্যাপিনী চিন্তার পর প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী বিষয়ে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই সকলই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে বহুজনাকীর্ণ প্রতিনিধিসভা বিধির ব্যবস্থাপনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এরূপ সভার প্রকৃত কার্য্য—নির্দ্দিষ্ট কতিপয় সুযোগ্য রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা যে সকল বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে—সেই সকল বিধির অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করা মাত্র—বিধির ব্যবস্থাপন নহে। এই জন্য প্রতিনিধি সভা দ্বারা বিধির ব্যবস্থাপন

(1) The Considerations on Representative Government.

নিমিত্ত একটী ব্যবস্থাপক সমাজ মনোনীত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিনিধি সভা যখন দেখিবেন যে কোন নূতন বিধির ব্যবস্থাপন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা এই গুরুতর কার্য্যের ভার ব্যবস্থাপক সমাজের উপর অর্পণ করিবেন। ব্যবস্থাপক সমাজ বিধির ব্যবস্থাপন করিলে, প্রতিনিধি সভা ইচ্ছামত তাহা মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতিনিধি সভা স্বয়ং করিতে পারিবেন না। ব্যবস্থাপক সমাজের উপরই সেই সকল পরিবর্ত্তনের ভার অর্পণ করিতে হইবে। বিধির ব্যবস্থাপনরূপ এই গুরুতর প্রশ্নের এরূপ পূর্ণ মীমাংসা বেন্থামের পূর্ব্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বেন্থাম্-শিষ্য মিল্ গুরুক্ষুণ্ন এই নূতন পথের পরিষ্করণ ও বিস্তৃতিসাধন দ্বারা যে জগতের অসীম উপকার সংসাধিত করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ কার্য্যে সাধারণী সভার সম্পূর্ণ অধিকারের সহিত কতিপয় সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা বিধিব্যবস্থাপনকার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানের প্রস্তাব পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। মিলের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই প্রস্তাব অবশ্যই এক দিন কার্য্যে পরিণত হইবে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মিল্ যে পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন, তাহার নাম “দি সজেক্‌সন অব্ উইমেন” (২) বা স্ত্রীজাতির অধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধ। ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থখানি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতদিন অপ্রকাশিত রাখার কারণ এই যে মিলের ইচ্ছা ছিল যে তিনি অবসরমত মধ্যে মধ্যে ইহার পরিপুষ্টিসাধন ও উৎকর্ষ বিধান করিবেন এবং এই মতের কৃতকার্য্যতা লাভের সময়েই ইহার প্রচার করিবেন। মিলের এই ইচ্ছা ফলবতী হইয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আর এক খানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ খানির নাম “ইউটিলিটেরিয়ানিজম্” (৩) বা হিতবাদ। এই প্রবন্ধটী তাঁহার পত্নীর জীবদ্দশাতেই তিনি ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে উপর্য্যুপরি তিনবারে প্রকাশিত করেন। তিনি সেই প্রবন্ধটী সংশোধিত করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সংযোজিত করিয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার অনতিপূর্ব্বে জগতের ঘটনাস্রোতে এক নব বিবর্ত্ত উত্থাপিত হয়। দাসব্যবসায় লইয়া অ্যামেরিকায় ঘরে ঘরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই সমরের সহিত মিলের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি জানিতেন এই ভীষণ সংগ্রামের পরিণাম অনন্তকালের জন্য মানবঘটনাস্রোতের দিক্ নির্ণয় করিবে। এই জ্বলনোন্মুখ বহ্নি অনেকদিন হইতেই ধূমায়মান হইতেছিল। মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পূর্ব্বেই

(2) The Subjection of Women.

(3) Utilitarianism.

জানিতে পারিয়াছিল যে এই প্রধূমিত বহ্নি অচিরকালমধ্যেই প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইবে। তাঁহার সহানুভূতি দাসব্যবসায়বিরোধিদিগেরই সহিত ছিল। দাসব্যবসায়ীদিগের দ্বারা দাসত্বের অধিকারবিস্তার চেষ্টা যে অন্যায় ও অসঙ্গত তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন। ধনলিপ্সা, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা, এবং বহুকালোপভুক্ত অধিকার পরিত্যাগের অনিচ্ছা—প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি সকল যে দাসত্বপ্রথার দূরীকরণের প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক কেয়ার্নেস (১) তদীয় "শ্লেভ পাউয়ার" নামক দাসত্ববিষয়ক গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন। মিল্ জানিতেন যে এই ভীষণসংগ্রামে যদি দাসব্যবসায়পক্ষপাতীরা জয়লাভ করে, তাহা হইলে জগতে বহুদিনের মত উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইবে, অধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন হইবে, উন্নতিদ্রোহিদিগের হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠিবে, এবং উন্নতি-পক্ষপাতিদিগের হৃদয় ভগ্ন হইবে। কতকগুলি মনুষ্যের স্বাধীনতার উপর কতকগুলি মনুষ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সমাজতরুর মূলোৎপাটক। যাহারা এই প্রভুতার আকাঙ্ক্ষী তাহারা নরাকার রাক্ষস। মিল্ জানিতেন যে এই রাক্ষসদিগের জয়লাভ হইলে, ইহাদিগের দুর্দ্দমনীয় সেনা বহুদিন জগতের শুভকার্য্যের ব্যাঘাত সম্পাদন করিবে; অ্যামেরিকার সাধারণ তন্ত্রের বিপুল যশ বহুকালের জন্য নিমীলিত হইবে; ইউরোপের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অন্তরে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইবে যে তাঁহারা এখন হইতে নির্ব্বিবাদে তাঁহাদিগের নীচপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারেন; তাঁহাদিগের এই অন্ধবিশ্বাস নররুধিরে ধৌত না হইলে আর অপনীত হইবে না।

(1) Cairnes.

এদিকে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে উদীচ্য অ্যামেরিকানেরা যদি সমরে জয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহাঁদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান দাসত্বপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে এখনও প্রস্তুত হয় নাই; যে সকল ষ্টেট্‌সে দাসত্বব্যবসায় অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে সকল ষ্টেট্‌স হইতেও দাসত্ব উঠাইয়া দেওয়া এখনও ইহাঁদিগের উদ্দেশ্য হয় নাই; অন্যান্য ষ্টেট্‌সে দাসত্বপ্রথা যাহাতে বিস্তৃত না হয় তাহার প্রতিবিধান করাই তাঁহাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। মিল্ দেখিলেন যে এই মনোমালিন্য যদি সহজে নিবারিত না হয়, তাহা হইলে উদীচ্যেরা দাসত্বপ্রথা একেবারেই উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। ইহা মানবপ্রকৃতির একটী সাধারণ নিয়ম, সামাজিক বিপ্লবের একটী অব্যভিচারী অঙ্গ, যে সামান্য প্রার্থনার প্রতিবাদ করিলে গভীরতর প্রার্থনা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে উদীচ্যেরা এক্ষণে অন্যান্য ষ্টেট্‌সে যাহাতে দাসত্ব প্রচলিত না হয়, শুদ্ধ তাহারই প্রতিবিধানে

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, দাক্ষিণাত্য ষ্টেট্‌স সকলে যে সকল দাস পূর্ব্বে ক্রীত হইয়াছে তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে উন্মোচিত করিতে এবং ভবিষ্যতে সে সকল ষ্টেট্‌সে যাহাতে আর দাস ক্রীত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করিতে যে উদীচ্যদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান এখনও উদ্বোধিত হয় নাই, বাধা পাইলে সেই উদীচ্যদিগেরই কর্ত্তব্যজ্ঞান দাসত্ব প্রথার সমূলোৎপাটনে নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর হইবে।

মিলের এই শেষোক্ত আশাই—ফলবতী হইল। দাক্ষিণাত্য ষ্টেট্‌সসকলের অধিবাসীরা—উদীচ্য অ্যামেরিকান্‌দিগের পরিমিত প্রার্থনাতেও স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং সমরানল ভীষণবেগে প্রজ্বলিত হইল। গ্যারিসন্ (১) (২) ওয়েণ্ডেল পিলিপ্‌স এবং জন্ ব্রাউন্ (৩) প্রভৃতি মনীষীগণ দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। সমগ্র উদীচ্য অধিবাসী তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইলেন। সশস্ত্রসৈনিক পুরুষদ্বারা ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের কনিষ্টিউসনের মূলভিত্তি উৎপাটিত হইল। যুদ্ধে উদীচ্যদিগেরই জয়লাভ হইল। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের কন্‌ষ্টিটিউসন্ আবার নূতন করিয়া গঠিত হইল। ইহাতে যাহা কিছু ন্যায়বিগর্হিত ছিল, সমস্ত পরিত্যক্ত হইল।

এই ভীষণ সময়ে ইংলণ্ডের সমগ্র উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোক,—অধিক কি যাঁহারা লিবারেল্ (৪) বলিয়া খ্যাত তাঁহারাও, দাক্ষিণাত্যের ষ্টেট্‌সের অধিবাসিদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রমজীবী শ্রেণী—এবং কতিপয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান ব্যবসায়ী ব্যক্তি ভিন্ন, ইংলণ্ডের যাবতীয় অধিবাসীই উদীচ্য অধিবাসিদিগের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই ঘটনার পূর্ব্বে মিল্ জানিতে পারেন নাই যে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, এবং লিবারেল্ মতাভিমানীরা চিরস্থায়ী উন্নতির দিকে এত অল্প অগ্রসর হইয়াছেন। ইউরোপের লিবারেলেরাও ইংলণ্ডের ভ্রাতৃগণের ন্যায় ঘোরতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের যে যে পুরুষ (৫) প্রতীচ্য ইণ্ডিয়ায় (৬) ইউরোপীয় প্লাণ্টারদিগের হস্ত হইতে নিগ্রোদাসদিগকে উন্মুক্ত করিবার জন্য অমানুষী চেষ্টা ও অসংখ্য মুদ্রা বর্ষণ করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে সেই পুরুষ এক্ষণে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পবিত্র আসন এক্ষণে আর এক পুরুষ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষ বহুদিনের পরীক্ষার পর এবং বহুদিনের বিতর্ক ও তত্ত্বানুসন্ধানের পর দাসত্বের যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাতের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এই নবাগত

(1) Garrison.
(2) Wendels.
(3) John Brown.

(4) Liberals.
(5) Generation.
(6) West India.

পুরুষ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্বেতদ্বীপের বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে ইংরাজজাতির এরূপ স্বভাবসিদ্ধ অপ্রবণতা, যে অ্যামেরিকার এই ভীষণ সমরের অব্যবহিত বা ব্যবহিত কারণ বিষয়ে ইংরাজ সাধারণ অনেকদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অধিক কি এই সমরের প্রথম দুই এক বৎসর অনেকেই অবগত ছিলেন না, যে এই সমর দাসত্বঘটিত। অনেক লিবারেল্-মতাবলম্বী মনীষীরাও, অনেকদিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে এই সমর টারিফ-সংক্রান্ত। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে দাক্ষিণাত্য ষ্টেট্সের অধিবাসীরাই প্রকৃত উৎপীড়িত। এইজন্যই তাহাদিগের সহিত তাঁহাদিগের এত সহানুভূতি!

ইংলণ্ডের যে কতিপয় মনীষী দাসত্ব-বিরোধী উদীচ্যদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিল্ তাঁহাদিগের অন্যতম। মিল্ দাসত্বের প্রতিবাদে সেই মনীষীদিগের অগ্রণী ছিলেন একথা আমরা বলিতে পারিনা। মিষ্টার হুজেস (১) এবং মিষ্টার লড্লো (২) এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদ্বয়ই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগের তেজস্বিনী লেখনী দ্বারা এই জঘন্য প্রথার প্রতিবাদ করেন। বাগ্মিকশ্রেষ্ঠ মিষ্টার ব্রাইট্ (৩) তদীয় অমানুষী বক্তৃতা-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মদ্বয়ের অনুসরণ করেন। মিল্ও তাঁহাদিগের অনুগমন করিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় একটী আকস্মিক ঘটনা তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্পের বিপর্য্যাস করিয়াছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কতিপয় দাক্ষিণাত্য দূত একখানি ব্রিটিস্ জাহাজে আসিতেছিলেন। এমন সময় এক জন উদীচ্য কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে ধৃত করেন। এই সংবাদে সমস্ত ইংলণ্ড ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠেন। ইউনাইটেট্ ষ্টেট্সের সহিত,ইংলণ্ডের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় অ্যামেরিকার স্বাপক্ষ্যে কোন কথা লিখিত বা কথিত হইলে শ্রুত হইবার তত সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মিল্ কিছুদিন নীরব রহিলেন। 'অ্যামেরিকান্দিগের এই কার্য্য গর্হিত হইয়াছে'—মিল্ এই সর্ব্ববাদিসম্মত মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন। অ্যামেরিকার যে ইংলণ্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এ বিষয়েও তিনি সাধারণের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। অ্যামেরিকা অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে ইংলণ্ডে যুদ্ধের উদ্যোগও নিবৃত্ত হইল। এই সুযোগে মিলও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অ্যামেরিকার যুদ্ধবিষয়ে একটী প্রবন্ধ (১) ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত করিলেন

(1) Mr. Hughes.
(2) Mr. Lodlow.
(3) Mr. Bright.

(১) The Contest in America.

যে সকল লিবারেল্ মতাবলম্বীরা প্রতিপক্ষদিগের মতস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা মিলের এই প্রবন্ধরূপ অবলম্বন পাইয়া স্বস্থানে সংস্থিত হইলেন। ইহাঁরা সকলে একত্রীভূত হইয়া এক্ষণে দাসত্বের প্রতিকূলে একটী দল সংস্থাপিত করিলেন। ইত্যবসরে উদীচ্যেরা জয় লাভ করিল। সুতরাং ইংলণ্ডে দাসত্বের প্রতিকূল দল ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। মিল্ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউতে অধ্যাপক কেয়ার্ণেসের পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া এই বিষয়ে আর একটী প্রস্তাব লিখিলেন। যদি মিল্ প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের স্বাপক্ষ্যে লেখনীধারণ ও জিহ্বা সঞ্চালিত না করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড অ্যামেরিকার অধিকতর বিদ্বেষের কারণ হইতেন সংশয় নাই। ইংলণ্ড আমেরিকার প্রতি এই অসদ্ব্যবহারের ফল অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কতিপয় মনীষীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে অ্যামেরিকার ক্রোধানল এতদিন শ্বেতদ্বীপকে ইংরাজরক্তে রঞ্জিত করিত সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

# প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

**সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটক।** কলিকাতা নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসদ্বারা প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক পুস্তকপ্রাপ্তির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন—'একদিন সন্ধ্যার সময়, সালিখা গ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমন কালে এক বটবৃক্ষমূলে এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকাধিকারী কে, তাহা অদ্যাপি নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি, প্রকাশক যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই গ্রন্থকারের নাম বলিয়া দিতে পারিতাম। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার মৃত বন্ধু ৺দুর্গাদাস দাসেরই এই কীর্ত্তি। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'—৺দুর্গাদাসের পরলোকে গিয়াও নিস্তার নাই। তাঁহার লেখনীর সেখানে গিয়াও বিশ্রাম নাই। ৺দুর্গাদাসের প্রতিভার এই দ্বিতীয় বিস্ফুরণ। তাঁহার শরৎ সরোজিনী যে ছাঁচে ঢালা, তাঁহার সুরেন্দ্রবিনোদিনীও সেই ছাঁচে ঢালা। গঠন একই, তবে ধাতুর সম্পূর্ণ প্রভেদ। শরৎসরোজিনীর সমবায় কারণ সুবর্ণ, সুরেন্দ্রবিনোদিনীর সমবায় কারণ রজত। তবে শরৎসরোজিনীর সোণায় কাদামাটি অনেক মিশান আছে, সুরেন্দ্রবিনোদিনীর রূপা নিখাদ। শরৎসরোজিনীর অনেক স্থান বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সুরেন্দ্রবিনোদিনী

ছেদানর্হ। শরৎ সরোজিনী বিশাল বন, সুরেন্দ্রবিনোদিনী কেলি-কানন। শরৎ-সরোজিনীতে রচনার নবীনতা ও ওজস্বীতা দৃষ্ট হয়, সুরেন্দ্রবিনোদিনীতে রচনার প্রবীণতা ও মধুরতা দৃষ্ট হয়।

চরিত্রের অঙ্কনপটুতায় সুরেন্দ্রবিনোদিনী যে শরৎসরোজিনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। সুরেন্দ্র ও বিনোদিনী এবং হরিপ্রিয় ও বিরাজমোহিনী যে শরৎ ও সরোজিনী এবং বিনয় ও সুকুমারীর ছায়ামাত্র তাহা বলা অত্যুক্তিমাত্র। শরতের চরিত্রে যে ঔদার্য্য ও মহদাশয়তা আছে, সুরেন্দ্রের চরিত্রে তাহার কণামাত্র দৃষ্ট হয়। ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ উভয় নায়কেই বিদ্যমান আছে। কিন্তু সুরেন্দ্রের বিদ্বেষ ব্যক্তিগত, শরতের বিদ্বেষ জাতিগত। শরতের লক্ষ্য স্বদেশের দাসত্বমোচন, সুরেন্দ্রের লক্ষ্য প্রতিহিংসা। সুরেন্দ্রের প্রেম চঞ্চল ও ঈর্ষাকষায়িত, শরতের প্রেম গভীর ও ঈর্ষার অধৃষ্য। বিনোদিনী ও সরোজিনী উভয়েই পতি-প্রাণা ও প্রেমময়জীবিতা বটে; কিন্তু সরোজিনী দুঃখিনী ও আশ্রিতা, ও বিনোদিনী ধনিকদুহিতা। দুঃখিনী ও আশ্রিতা সরোজিনী আশ্রয়দাতা গ্রামের জমিদার শরতের প্রেমের ভিকারিণী। দুর্ল্লভজনানুরাগিণী পরবশ ও লজ্জাবতী নায়িকা—পাছে মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে, পাছে আশ্রয়দাতার বিরক্তিভাজন হন,—এইভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করেন এবং অসংখ্য বিপদ্ ও প্রলোভন-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া, অবশেষে যখন জানিতে পারিলেন যে যাঁহাকে তিনি এত দিন অগ্নি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিলেন তিনি স্পর্শক্ষম রত্ন; তখন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বিনোদিনীর চরিত্রে সে বৈচিত্র্য নাই, কেবল মাধুর্য্য আছে। বিরাজেতে সহরে মেয়ের বাচালতা ও অনার্য্য রসিকতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু সুকুমারীর সেই স্বর্গীয় সরলতা ও অমায়িকতা দৃষ্ট হয় না। হরিপ্রিয়ের চরিত্র অদ্ভুত বৈপরীত্য-সংগঠিত। তরলতা ও অকারণ-কলহ-প্রিয়তা ইহার প্রধান রেখা; কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে গাম্ভীর্য্য ও সহৃদয়তার রেখাও দৃষ্ট হয়। বিনয়েরর চরিত্রের কোমলতা ও অপাপবিদ্ধতা ইহাতে দৃষ্ট হয় না। এদিকে মতিলাল, বিন্দুবাসিনী ও ভুবনমোহিনীর ন্যায় লোমহর্ষণ চরিত্র সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে একটীও নাই। রাজচন্দ্র-বসু শরৎকুমারের সরকার ভগবানের নকল। আমরা আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিলাম যে কেবল এই এক স্থলেই নকলটী আসল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। শরৎ-সরোজিনী অপেক্ষা সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর আর এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সুরেন্দ্রবিনোদিনীর গীতগুলি শরৎ-সরোজিনীর গীতগুলি অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

---

অপূর্ব্বসতী নাটক। শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।

নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। পাঠকদিগকে বোধ হয় অবগত করিয়া দিতে হইবে না যে সুকুমারী দত্ত কে। যাঁহারা বঙ্গরঙ্গভূমিতে দুর্গেশনন্দিনীর বিমলার ও গ্রেট্ ন্যাসানেল্ নাট্যশালায় শরৎসরোজিনীর সুকুমারীর অভিনয় কখন দেখিয়াছেন, গোলাপী (সুকুমারী) তাঁহাদিগের সকলেরই আদরের জিনিস। গোলাপী সুকুমারীর অংশ এত সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিল, যে শরৎসরোজিনীর প্রকাশক উপেন্দ্র বাবু আদর করিয়া তাহার নাম সুকুমারী রাখিয়াছেন। সেই নামেই এই নাটকের রচয়িত্রী এক্ষণে জনসমাজে পরিচিত। মুখবন্ধে দেখা গেল এই নাটক দুই জন লেখক দ্বারা রচিত। অন্যতর লেখকের নাম আশুতোষ দাস। এই নাটকের প্রণয়নে ইহাদিগের কাহার কত দূর অংশ তাহা আমরা জানি না; জানিবার আবশ্যকও নাই। এই নাটকের গুণদোষ বিষয়ে আমাদিগের অধিক বলিবার নাই। নাটকের নায়িকা নলিনী বারবিলাসিনীদুহিতা। শৈশবে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করায় জঘন্য বেশ্যাবৃত্তির উপর ইহার বিশেষ ঘৃণা জন্মে। তাহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা অপেক্ষা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হরমণি তদীয় মাতা কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তিতে দীক্ষিত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করে। কিন্তু নলিনী চন্দ্রকেতু নামক সুবর্ণপুরনিবাসী জনৈক জমিদারের পুত্রকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে। নলিনীর মাতাই চন্দ্রকেতুর সহিত তাহার সমাগম করিয়া দেয়। কিন্তু চন্দ্রকেতু বালক, সুতরাং নলিনীকে টাকা কড়ি কিছুই দিতে পারিত না। এইজন্য নলিনীর মাতা চন্দ্রকেতুকে তাহার বাটীতে আসিতে নিষেধ করে এবং নলিনীকে নায়কান্তর অবলম্বন করিতে বলে। কিন্তু নলিনী বেশ্যাদুহিতা বটে,—বেশ্যা নহে। নলিনী স্থির করিল যে হয় চন্দ্রকেতুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইব, নয় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব। নলিনী চন্দ্রকেতুকে আপনার অভিপ্রায় জানাইল। চন্দ্রকেতুও নলিনীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল; কিন্তু নিজে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, সুতরাং ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবশেষে ব্রজেন্দ্র নামক বন্ধুর পরামর্শে নলিনীকে লইয়া কাশী পলায়ন করিল। কিন্তু চন্দ্রকেতুর পিতা আদালতের সাহায্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে বলপূর্ব্বক বাটীতে ফিরাইয়া আনিলেন। ক্ষতসেতুবন্ধন জলসঙ্ঘাত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে নলিনী আর কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে? শূন্যহৃদয়া নলিনী চন্দ্রকেতুবিরহে কাতর হইয়া বক্ষে ছুরিকা প্রহার পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করিল। নলিনী সুশিক্ষিতা বারবিলাসিনীদুহিতাদিগের আদর্শস্থল। নলিনীর চরিত্র সাধারণ সতীদিগের চরিত্র অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রলোভনে পতিত না হইলে সতীত্বের পরীক্ষা হয়না। যে সতীত্ব প্রলোভনপরীক্ষিত

নাহয়, তাহার কোনও মূল্য নাই। আমরা সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্কারকদিগের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন নলিনীর ন্যায় বারবিলাসিনীদুহিতাদিগকে হস্তাবলম্বন প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে এরূপ ভীষণ পরিণাম হইতে রক্ষা করেন।

অপূর্ব্বসতীতে দুইটীমাত্র চরিত্র আছে। নলিনী ও চন্দ্রকেতু। চন্দ্রকেতু সাধারণ নৈতিক আদর্শে বেশ্যাসক্ত নষ্টচরিত্রবালক। কিন্তু নলিনীর প্রতি তাহার অবিচলিত প্রণয় জন্য তাহার প্রতি আমাদের মনের ভাব অন্যপ্রকার। নলিনী ও চন্দ্রকেতু ভিন্ন ইহাতে আর কিছুই নাই। ইহার রচনা কদর্য্য, স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদোষ-দুষ্ট। নলিনীর এরূপ রমণীয় চরিত্রেও স্থানে স্থানে জঘন্য রসিকতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। নলিনী ও চন্দ্রকেতু সুনিপুণ চিত্রকরের হস্তে পতিত হইলে যে অধিকতর রমণীয় আকার ধারণ করিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে ইহার সমালোচনা করিলাম।

**হাসিও আসে কান্নাও পায়**—মেলেরিয়া জ্বর সংক্রান্ত প্রহসন। কোন ভুক্তভোগি প্রণীত। ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশের কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, অশিক্ষিত ডাক্তারদিগের হস্ত ম্যালেরিয়া জ্বরপ্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের জীবন মরণ সমর্পিত হওয়ায় দেশের কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে; এবং নীচমনা দৃপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে রিলীফের ভার পতিত হওয়াতে যে সকল হাস্যাস্পদ ও শোচনীয় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে—ইহাতে সে সকল বিষয়ের ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। চিত্র গুলি যেন কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইয়াছে। রচনা মন্দ নহে।

**মানসরঙ্গিনী**—প্রথমভাগ। মধ্যস্থ যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।/০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার সম্পাদকদিগের মুখ বন্ধ করিবার জন্য ভারতচন্দ্রের মানসিংহ হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন:—

"অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সহ কীট যথা উঠে সুরমাথে॥"

গ্রন্থকারের এই কাতরোক্তিতে আমাদিগের মন বিচলিত হইল। আমরা এই গ্রন্থখানির বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কিন্তু গ্রন্থকারকে আমরা পরামর্শ দিই তিনি যেন ভবিষ্যতে আর এরূপ পায় ধরিয়া মাথায় উঠিতে না চান।

**সিকিমের ইতিহাস**—১ম সংস্করণ। কলিকাতা গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রীউমেশচন্দ্র রায় প্রণীত মূল্য ।৵০ আনা। গ্রন্থকার নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি কোন পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই এবং নানা স্থান পর্য্যটনপূর্ব্বক ইহার উপকরণসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এই ইতিহাসে ইংরাজদিগের সহিত সিকিমরাজের কয়েকটী যুদ্ধ মাত্রের বর্ণনা ভিন্ন আর

কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ইংরাজদিগের প্রশংসাতেই গ্রন্থের অনেক স্থান পরিপূর্ণ। সিকিমের অধিবাসীরা নির্ব্বোধ ও অসভ্য, তাহারা নিজের বল না বুঝিয়া ব্রিটিশ-সিংহের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয়; তাহারা বিনা যুদ্ধে সহজে ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই—এ গুলি অতি গর্হিত কার্য্য হইয়াছে জানাইবার জন্য গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—"হায়! সিংহসদৃশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ করিতে সিকিমপতির কি দুর্ব্বুদ্ধি জন্মিয়াছিল। বোধ হয়, সিকিমপতি ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টকে জানিয়াও জানিতে পারেন নাই। যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ শ্রবণে বজ্রেরও গর্ব্ব চূর্ণ হয়, নগেন্দ্রও ঘন ঘন কম্পমান হইতেছে এবং অন্যান্য প্রবল শত্রুরও ইচ্ছা সুদূরপরাহত হয়, তাঁহাদের সঙ্গে বিবাদ করা কি তৃণসদৃশ সিকিমপতির কার্য্য? ফলতঃ "যেমন কার্য্য তেমনি ফল"—সিকিমপতি স্বীয় ঔদ্ধত্যের বিলক্ষণ ফল ভোগ করিয়াছিলেন। রক্ষা এই, সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হৃদয় দয়াগুণে পূর্ণ বিধায়, এখন পর্য্যন্তও সিকিমপতি কতকটী স্থান লইয়া রাজা নাম জাঁকাইতেছেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি বদান্য ও করুণহৃদয় না হইতেন, তাহা হইলে এতদিন তাঁহাকে সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগপুরঃসর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইত।" সিকিমের রাজা ও অধিবাসীর সহিত যে ব্যক্তির সহানুভূতি নাই, সে ব্যক্তির সিকিমের ইতিহাস লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

এ গ্রন্থে গভীর গবেষণার কোন চিহ্ন নাই; ঘটনার প্রাবল্য নাই; বর্ণনার গাঢ়তা নাই। অধিক কি বর্ণনা স্থানে স্থানে হাস্যাস্পদ হইয়াছে—এরূপ বর্ণনা ইতিহাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। দুই একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতেই পাঠকগণের প্রতীতি জন্মিবে।

(১) এখানে সূর্য্যদেব প্রায়ই অদৃষ্ট থাকেন, কেবল মধ্যে মধ্যে স্বীয় কিরণজাল বিস্তারপুরঃসর জনগণের হৃদয়সরোজ বিকশিত ও পরমানন্দ মকরন্দে দিগ্বলয় স্নিগ্ধ ও পরিপ্লুত করেন; কিন্তু এখানে ঘূর্ণীবায়ুর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

(২) যাহা হউক, অবশেষে যখন কুমুদিনীনায়ক ভগবান্ সুধাংশু সুধাবর্ষণ দ্বারা জগৎকে ধৌত করিতে লাগিলেন, তখন নেটিব ডাক্তার আক্‌বর আলি ও তাহার ভৃত্য জনৈক বেহারার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হইল।

(৩) পদ্মিনীনায়ক ভগবান্ মরীচিমালী পদ্মিনীরে বিরহিণী করিয়া অস্তপর্ব্বতের গুহাশায়ী হইলেন, এবং করাল কালস্বরূপ তামসী সখীরে সঙ্গে করিয়া দুঃখরজনী সমাগতা হইল। তখন তাঁহাদিগের অন্ধজনের যষ্ঠিস্বরূপ সেই পার্ব্বতীয় বন্ধুদ্বয় তমোরূপ কাল-কবলে পতিত হইয়া কোথায় গমন করিল তাহা তত্ত্ব করিতে না পারাতে, তাঁহাদের আশালতা সহসা ছিন্নমূল হইল।

# সন ১২৮২ সালের ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্তের মূল্য প্রাপ্তি।

দং ১২৮১ সাল।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু হরিনাভী ।০
,, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর ৩৲
,, তারাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ঘাটাল ৩।৶০
রাজা কালীপ্রসাদ সিংহ পূর্ব্বধলা ।৶০
বাবু নৃসিংহচন্দ্র হালদার কলিকাতা ১৲
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ৪।।০
,, যদুলাল মল্লিক কলিকাতা ৩৲
,, রমানাথ বড়াল ঐ ৩৲
,, রামধন বড়াল ঐ ৩৲
,, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ঐ ৩৲
,, বিষ্ণুচন্দ্র সিংহ ঐ ১৶০
,, গিরিশচন্দ্র সেন ঐ ১৲
,, পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ঐ ৩৲
,, প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ঢাকা ৩।৶০
,, দীনবন্ধু চৌধুরি কলিকাতা ১৲
,, উমাচরণ সরকার ঐ ২৲
,, দীননাথ দাস ঐ ১৲
,, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা ৩।৶০
,, নীলমণি মিত্র টাকা ৩।৶০
মাষ্টার এফ এইচ্ হার্ডিঞ্জ জঙ্গিপুর ৩।।০
,, মেগরাজ কুঠারী আজিমগঞ্জ ৩।৶০
,, কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ পাইক পাড়া ৩।৶০
,, ভগীরথ দাস তাজহাট ৩।৶০
,, শম্ভুচন্দ্র দে মুন্সেফ সাহাজাদপুর ৶০
,, লালবিহারী লাহিড়ী মালদহ ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ বসু কলিকাতা ৩৲
,, শারদাপ্রসাদ ঘোষ বেশালীগাঁও ৩।৶০
,, হেমেন্দ্রচন্দ্র দেব ডিহি ইটালী ৩।।০
,, রামকুমার সরকার কলিকাতা ১৲
,, কৃষ্ণরমণ গোস্বামী জগদল ২৸১০
,, চন্দননগর পুস্তকালয় ১।।০
,, উমাচরণ মঙ্গল রামজীবনপুর ⁄১০
,, সত্যজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মালীপোতা ৩।।০
,, কৈলাসচন্দ্র মিত্র ভবানিপুর ৩।।০

দং ১২৮২ সাল।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চাচল ৩।৶০
,, দেবেন্দ্রনাথ সাহা চিথলিয়া ৩।৶০
,, শারদানাথ মজুমদার রাধানগর ৩।৶০
,, [illegible] কর গুজলপুর ৩।৶০
,, উমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহিষতলা ৪৲
,, বলগণা পুস্তকালয় ৩৲
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ ডাক্তার কৃষ্ণনগর ২৲
,, আশুতোষ লাহিড়ী ঐ ১৲
,, মণিলাল সেট কলিকাতা ৩৲
,, চন্দ্রবিষ্ণু দে ঐ ২৲
,, সত্যকৃষ্ণ বসু ঐ ৩৲
,, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় মুন্সিগঞ্জ ৩৻৫
,, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর ৩৲
রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ সুসঙ্গ দুর্গাপুর ৩।।০
শ্রীযুক্ত বাবু বিনন্দচন্দ্র অধিকারী
কৃষ্ণলিঙ্গের গোস্বামী রাহাচকী ৩।৶০

শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ঘাটাল ৩।৵০

,, রাজা কালীপ্রসাদ সিংহ পূর্ব্বধলা ৩।৵০

,, নন্দলাল নিয়োগী কলিকাতা ৩৲

,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ঐ ৩৲

,, মদনমোহন ভট্ট ঐ ৩৲

,, ত্রৈলক্যনাথ বসু মজাফরপুর ৩।৵০

,, কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ৩।৵০

,, বিপিনবিহারী আঢ্য কলিকাতা ৩৲

,, চন্দ্রকুমার চৌধুরী কলিকাতা ৩৲

,, বহুবাজার স্কুল সম্পাদক ১৵০

,, ভুবনমোহন গুপ্ত নওবাড়ি ৩।৵০

,, নন্দকৃষ্ণ বসু কলিকাতা ৩৲

,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায় ঐ ৩৲

,, ত্রৈলোক্যনাথ হালদার লক্ষ্ণৌ ৩।৵০

,, তবজেল হুসেন শুন্দরপুর ৩।৵০

,, কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিলং ৩।৵০

,, জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার কলিকাতা ৩৲

,, কালীপ্রসন্ন সেন ঐ ৩৲

,, মহিমচন্দ্র মজুমদার চেঁয়া ৩।৵০

,, রামচরণ ঘোষ কলিকাতা ৩৲

,, রাজবিহারি দাস ঢাকা ৩৲

,, চুন্নুলাল জহরী কলিকাতা ৩৲

,, রামচরণ ঘোষ বড় জাগুলি ৩।৵০

,, রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲

,, রমণীমোহন ঘোষ খিদেরপুর ৩।৵০

,, ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲

,, তারাপদ ঘোষাল কলিকাতা ৩৲

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲

,, এফ এইচ হার্ডিঞ্জ জঙ্গিপুর ৩।৵০

,, রাজমোহন রায়চৌধুরী টাকী ৩।৵০

,, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা ১৸০

,, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ ৩।৵০

,, বেঙ্গালি বুক ক্লব্ বাঁকীপুর ৬৸০

,, পুরুষোত্তম ধর কলিকাতা ৩৲

,, গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া ৩।৵০

রেবারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ষ্টারন্ কলিকাতা ৩৲

,, দিননাথ মিত্র ঐ ৩৲

,, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ ঐ ১৲

,, মোহিনীমোহন দত্ত ঐ ৩৲

,, বিপিনবিহারী রায় ঢাকা ৩।৵০

,, হরিচরণ বসু কলিকাতা ৩৲

,, অম্বিকাচরণ দত্ত কলিকাতা ৩৲

,, উমাচরণ দত্ত গোবরডাঙ্গা ১৸৵০

,, প্রিয়নাথ ঘোষ আনাটি স্কুল ১৷৵০

,, নবীনচন্দ্র দাস গজঘণ্টা ৩।৵০

,, নীলমণি মিত্র টালা ৩৴

,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲

,, মেঘরাজ কুঠারী আজিমগঞ্জ ৩।৵০

,, ত্রিগুণাচরণ সেন কলিকাতা ৩৲

,, কামাখ্যাপ্রসাদ রায় কুড়লগাছি ৩।৵০

,, কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া ৩।৵০

,, নগেন্দ্রনারায়ণ অধিকারী দাবিকুশী ৩৵০

,, প্রসন্নকুমার বসু শিলং ৩।৵০

,, রামনাথ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার চাঁদপুর ২॥৵৫

,, প্রবোধচন্দ্র রায় টাকী ১৲

| | | | |
|---|---|---|---|
| ,, জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী রঙ্গপুর | ৩।৵০ | ,, রাধাকিশোর শীল কলিকাতা | ৩৲ |
| ,, ভগীরথ দাস তাজহাট | ৩৲ | ,, দীননাথ মিত্র ঐ | ৩৲ |
| ,, যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা | ৩।৵০ | ,, কৃষ্ণগোপাল বন্দোপাধ্যায় রাজসাহী | ৩।৵০ |
| ,, অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ঐ | ৩।৵০ | ,, হরচন্দ্র রায় উকিল রামপুর | ৩।৵০ |
| ,, শম্ভুচন্দ্র দে মুন্সেফ সাহাবাদপুর | ৩।৵০ | ,, হেমেন্দ্রচন্দ্র দেব ইটালী | ৩৲ |
| ,, লালবিহারী লাহিড়ি মালদহ | ৩৲ | ,, রাসবিহারী গোস্বামী কলিকাতা | ৩৲ |
| | | ,, চন্দ্রকুমার চৌধুরী ঐ | ৩৲ |
| | | ,, কল্পনাকুমারী দেবী ঐ | ৩৲ |
| | | ,, রাধানাথ বন্দোপাধ্যায় ঐ | ৩৲ |

দ্বারাও আমাদের সেইরূপ, বরং অধিক পরিতোষ জন্মাইলেন।—এডুকেশন গেজেট।

নীলদর্পনের পর আর যত নাটক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের মঙ্গল হয় নাই তাহা আমরা বলি না. কিন্তু "সুরেন্দ্রবিনোদিনীর" গ্রন্থকর্ত্তা নাটক লেখার একটী নূতন আকার দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে এক জন গ্রন্থকর্ত্তা নির্জ্জন গৃহে অবস্থিতি করিয়া গ্রন্থ রচনা দ্বারা দেশের কত মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারেন। যিনি বেঙ্গল থিয়েটরে "সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি দৃঢ়রূপে জানিতে পারিয়াছেন যে এদেশের ম্যাজিষ্টেটেরা কিরূপ অখণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত. ষ্টীফেন সাহেবের নূতন দণ্ডবিধি আইন তাহাদের হস্তে কি ভয়ানক যন্ত্র. কারাগারবাসীরা কত কৃপার পাত্র এবং তাহাদের উপর গবর্ণমেণ্ট কত নিষ্পীড়ন করেন। যাঁহারা এইরূপ গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহারা দেশের [illegible]মী, এবং যাঁহারা দেশহিতৈষী তাঁহাদের সকলের এইরূপ গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত।—অমৃতবাজার পত্রিকা।

উপেন্দ্র বাবু যখন "শরৎসরোজিনী" নাটক প্রকাশ করেন, তখন লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার পরলোকগত কোন বন্ধু সেই নাটক খানির রচনা সমাপ্ত করিয়া তাঁহার প্রতি মুদ্রাঙ্কনের ভার দিয়া যান। "সুরেন্দ্রবিনোদিনীর" বেলায় তিনি লিখিয়াছেন যে সালিকাগ্রামের কোন বট বৃক্ষমূলে এই পুস্তক খানি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে তাঁহার পরলোকগত বন্ধু ভূত হইয়া অভ্যাস গুণে এই নাটক লিখিয়া বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভূতটীর উৎপাত সহ্য করিতে আমরা সর্ব্বথাই সম্মত আছি, এবং সার রিচার্ড টেম্প্লের প্রস্তাবিত গয়ার পথে রেলওয়ে নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইলে যদি কোন নবষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিয়া তাঁহার (নাটকলেখক ভূতটীর) উদ্ধার সাধন করিতে যান, তাহা হইলে কেবল আমরা নহি, নাটকাভিনয় দর্শনামোদী অনেক ভূতও তাঁহার ভূতোদ্ধারসাধনেচ্ছু, ব্যক্তির) প্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইবে। * * রচনার গুণে পাঠকের পদে পদে কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। চিত্তের উত্তেজন সাধনে নাটককারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। দুরাচার ম্যাকেণ্ডেল সাহেবের দুর্ব্ব্যবহার, বিরাজমোহিনীর বিপদ এবং পরাণে কয়েদির বৈরশোধ বৃত্তান্ত গুলি পাঠ করিলে শরীরস্থ শোণিত দ্রুতবেগে বহমান হয়।—সাপ্তাহিক সমাচার।

ইহা এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক। এদেশের বর্ত্তমান বিজ্ঞশ্রেণীস্থ লোকের কতিপয় অভিপ্রেত প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ উৎকৃষ্ট রসের সমাবেশ করিয়া নাটকখানিকে বিলক্ষণ সরসও করা হইয়াছে। ইহার লেখা অতি সারগর্ভ রসাল প্রাঞ্জল ও পরিপক্ক। * * "সুরেন্দ্রবিনোদিনী" নাটকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি এবং দেশ প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধতাদি দোষ ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা ইহার গুণসমষ্টির তুলনায় অতি যৎসামান্য। সুতরাং ইন্দুকিরণ-নিমজ্জিত কলঙ্ক রেখার ন্যায় তাহা বড় চক্ষুগোচর হয় না।—ঢাকা প্রকাশ।

# নাটকাভিনয়।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

হৃদয় ভাবের অভিনয়ই নাটকাভিনয়ের প্রধানতম অঙ্গ। মানবহৃদয়ের বিশাল রঙ্গ ভূমির অভিনয় প্রদর্শন করাই নাটকের সুপ্রধান উদ্দেশ্য। নাটকীয় ঘটনাবলিদ্বারা মানবহৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে যে নানা বিধ ভাবের অভ্যুদয় ও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, নাটকীয় ব্যক্তিগণ ভাবের আবেগ দ্বারা যেরূপ অভিভূত, বিচলিত অথবা প্রণোদিত হইতেছে; কখন শোক তাপ, কখন হর্ষ উৎফুল্লতা, কখন রাগদ্বেষ, কখন দর্প অভিমান প্রভৃতি ভাবের আবেশ দ্বারা মানবহৃদয় হয়ত একেবারে মুহ্যমান হইয়া আছে, না হয় উদ্বোধিত এবং প্রমত্ত হইতেছে; এই সমস্ত ভাবের আবেশ প্রকৃতরূপে প্রকটন করা ভাবাভিনয়ের বিষয়। এক্ষণে এই ভাবাভিনয়ের প্রকৃতি ও অনুষ্ঠানাদির পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

মানব যে প্রকার অবস্থায় পতিত হয়েন তাঁহার হৃদয়ে সেই সমস্ত ভাবের আবির্ভাব হয়। ভাবের প্রাবল্য ও উদ্বেগ অনুসারে হৃদয়ে অধিক বা অল্প কাল স্থায়ী হয়। এই নিয়ম শুধু মানবসাধারণ নয় ইহা প্রাণীমাত্রেই অবলক্ষিত হয়। হর্ষ, বিষাদ, ভয়, সাহস প্রভৃতি ভাববেগ মানবের যেমন, নিকৃষ্ট প্রাণীগণের ও তেমনি। এই সমস্ত ভাব প্রকটনের পদ্ধতি সর্ব্ব জাতিতে সমান। পণ্ডিতবর ডার্ উইন সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে যাবতীয় প্রাণীগণ একরূপেই ভাব প্রকটন করিয়া থাকে। এজন্য তিনি সেদিন একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যে সর্ব্বোচ্চ মানব জাতিতে যে প্রকারে অঙ্গসূচনা ও মুখভঙ্গি দ্বারা হৃদয়স্থ ভাব সমূহ স্বতঃই প্রকটিত হয়, নিকৃষ্ট প্রাণীগণেও তদ্রূপ। হর্ষে, বিষাদে, রাগে, ঘৃণায়, উৎসাহে, হিংসায় মানবের মুখে, চক্ষে, এবং সমগ্র অঙ্গ ভঙ্গিতে যে ভাব প্রকটিত দেখিবে, ইতর প্রাণীতেও সেই ভাব অবলক্ষিত হয়। ইতর প্রাণীগণও ঐ সমস্ত ভাবে উদ্বোধিত ও উত্তেজিত হয় এবং তাহারাও একই প্রকার অঙ্গ সূচনা দ্বারা সে সমস্ত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। হর্ষে মানবমুখের যে প্রকার বিস্ফারণ হয়, শোকে তাহা যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, ত্রাশে তাহার শিরা সকল যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ইতর প্রাণীগণের মুখেও তদবস্থায় সেই সমস্ত ভাবেরই প্রকটন। বাস্তবিক যাবতীয় হৃদ্‌ভাব প্রকটনের পদ্ধতি একই।

হৃদয়ভাব প্রকটন সম্বন্ধে মানব জাতি ইতর প্রাণীগণের সহিত একনিয়মে আবদ্ধ। এতদ্বিষয়ে মানবজাতির কিছুই শ্রেষ্ঠতা নাই। এবিষয়ের সমগ্র প্রাণী মণ্ডলীতে একই ভাষা প্রচলিত দেখা যায়। মানবের ভাষা এবিষয়ে পরাস্ত হয়। কারণ মানব-ভাষা হৃদয়ভাবের অতি অল্পাংশই প্রকাশ করে। তদীয় মুখ মণ্ডলে ও অঙ্গভঙ্গিতে সেই ভাবের সমগ্র প্রচণ্ডতা, বল ও তেজ স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। মানব যে ভাবে কথা কহুন না কেন, হৃদয়ের ভাববেগ দেখিতে হইলে তাঁহার কথা শুনিতে যাই না, তাঁহার অঙ্গেই সমস্ত প্রকটিত দেখি। ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে প্রকৃতি যখন একমাত্র ভাষায় কথা কহেন তখন সেই প্রকৃতির ভাষা কিপ্রকার তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা অভিনেতৃগণের প্রধান কর্ত্তব্য। এই ভাষার নিরূপণার্থ বিৎ ডারউইন সাহেব যে প্রকার অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহা তৎপ্রণীত গ্রন্থে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। আমরা ডারউইন সাহেবের এই গ্রন্থখানি সমগ্র নাট্য সমাজকে পড়িতে বলি। ডি ওরেটোর নামক প্রস্তাবান্তে সিসিরো এই বিষয়ের কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহাও দ্রষ্টব্য। *

কিন্তু কেবল অধ্যয়নে এই ভাব প্রকটনের পারগতা জন্মায় না। অঙ্গ ভঙ্গিতে ভাবের প্রকটন হওয়া প্রকৃতি ও স্বতঃসিদ্ধ। যে ভাবের বাহ্যসূচনা করিতে হইবে হৃদয়ে সেভাব সমুদ্ভূত হইলেই তাহা আপনাপনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রকৃতি-সমদ্ভূত হৃদয়ভাবের বাহ্যবিকাশের প্রাচুর্য্যায় ঘটাইতে হইলে বরং বিশেষ চেষ্টা ও ক্লেশ করিতে হয়. সহজে ঘটিয়া উঠে না। সহস্র চেষ্টা করিলেও স্বাভাবিক ভাব বিকাশের সমস্ত চিহ্ন প্রচ্ছন্ন করা সুকঠিন হয়। হৃদয়ে ভাবের আবেগ হইলে তাহা অব্যবহিত কালে মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষীভূত হয়,একবার প্রত্যক্ষীভূত হইলে তাহার প্রত্যাহার করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। সেই ভাব কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। নাটকীয় ব্যক্তিগণ এই প্রকার অবস্থায় অনেক সময়ে পতিত হয়েন। যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন তিনি ভিন্ন এই প্রকার ভাবের স্বাভাবিক অভিনয় প্রদর্শন করা অন্যের পক্ষে প্রায় অসাধ্য হয়। কারণ ভাব প্রকটন মাত্রই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। চেষ্টাকৃত করিতে গেলে তাহার প্রায় বিপর্য্যয় ঘটে। অঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা ভাবের অভিনয় যদি নিতান্ত বিকৃত ও চেষ্টাকৃত দেখায় তাহা হাস্যজনক হইয়া পড়ে। নাটকীয় ভাবের প্রকৃত অভিনয় করা যে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহার কারণ এই। প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কেহ যাহা সাধন করিতে পারে না, অভিনেতাকে অনেক সময়ে তাহা চেষ্টা দ্বারা সাধন করিতে হইবে। অভিনেতা যদি নিজে প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইতে পারেন, তিনি যদি পরপ্রকৃতিকে অভিনয় কালে

* Vide Spectator paper No. 541.

কিয়ৎক্ষণের জন্য আত্ম-প্রকৃতি রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, তবেই তাহার সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি পরভাগ্যকে কল্পনাতে আত্মভাগ্য বলিয়া অচিরাৎ অনুমান করিয়া লইতে পারেন, যাঁহার হৃদয় ভাববিষয়ে এত ভঙ্গপ্রবণ যে কাল্পনিক বাহ্যবিষয় দ্বারা ও সে হৃদয় অচিরাৎ বিচলিত এবং ব্যথিত হইতে পারে, এবম্বিধ প্রকৃতির ব্যক্তি একদা ভাবাভিনয়ে কিয়ৎপরিমাণে সার্থকতা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদিগের কল্পনা তেজস্বিনী নহে, যাঁহাদিগের প্রকৃতি এত কঠোর যে শীঘ্র বিচলিত হইবার নহে, যাঁহাদিগের হৃদয় এত দৃঢ় যে কাল্পনিক বিষয় দ্বারা ত্বরায় তাহার বিকার জন্মে না তাঁহারা অভিনয় কার্য্যের সম্যক উপযোগী নহেন। যাহাদিগের স্নায়ুশক্তি কথঞ্চিৎ প্রবল, সহজে তাহাদিগের চিত্ত বিকার উৎপাদিত হয়; সুতরাং তাহারাই ভাবাভিনয় পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী।

কিন্তু যাঁহাদিগের স্নায়ুশক্তি নিতান্ত প্রবল, নাটকীয় কল্পনাদ্বারা যাঁহাদিগের এতদূর চিত্তবিকার জন্মিতেপারে যে, সেই কল্পনাসমুৎপাদিত প্রবল ভাবে একেবারে যেন প্রমত্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা অভিনয়ে ব্যাপৃত হইলে অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই প্রকার ধাতুর অনেক লোক অভিনয় কালে প্রবল ভাবে অভিভূত হইয়া প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ততদূর প্রবলভাব তাঁহাদিগের শারীরিক অবস্থার উপযোগী না হওয়াতে অবশেষে তাহাতেই তাঁহাদিগের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। কাল্পনিক বিষয়কে তাঁহারা প্রকৃত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করাতে এই প্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাট্যবিভ্রম নিতান্ত প্রবল হইলেও অভিনয়ে তাঁহার সম্পূর্ণতা হয় না। নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি বশতঃ কল্পনাশক্তি তাহাতে সম্যকরূপে বিমুগ্ধ ও ব্যাপৃত হয় না। এরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ইউরোপীয় সাহিত্যসাধারণ বিয়োগান্ত নাটকের ভীষণ ব্যাপার ও পর্য্যবসান মানবীয় কল্পনার বিষম নিগ্রহ ও যন্ত্রণার বিষয় হইত*। মানবীয় কল্পনাশক্তি সেই পর্ব্বতপ্রমাণ গুরুভারের প্রপীড়ন বহনে অক্ষম। যাহাদিগের কল্পনা নিতান্ত প্রবল, যাহাদিগের শারীরিক প্রকৃতি এপ্রকার যে সামান্য ঘটনার প্রভাবে অনায়াসে চিত্তবিকার উৎপাদিত হয় সেই প্রবল স্নায়ুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি কখন উল্লিখিত বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় কার্য্যে বিনিযুক্ত হন, তাহাদিগের প্রাণ বিয়োগ হইবার অনেক সম্ভাবনা। আইস্যাক ডিস্‌রেলী এবম্বিধ প্রাণবিয়োগের কতিপয় অদ্ভুত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।* ফরাশী অভিনেতা মণ্টফ্লুরী যখন র‍্যাসীন প্রণীত ওরিষ্টিশ নাটকীয় এণ্ড্রো-

* Vide Schlegel's Dramatic Literature Lec. XVII.

* Vide Curiosities of Literature on Tragic Actors.

ম্যাকীর চরিত্র ও হৃদয়ভাব অভিনয় করিতেছিলেন, তখন তাহার সেই অভিনয়-প্রয়োজনীয় অঙ্গচেষ্টায় প্রাণবিয়োগ হয়। মন্তরী, বণ্ড প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ কুশীলবগণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে মানবীয় হৃদয়ভাব' অধিকাংশ অঙ্গ ভঙ্গি ও মুখ স্ফূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। মানবহৃদয়ের গভীরতম ও নিগূঢ়তম ভাব সমূহ বাক্যে প্রকাশিত হইবার নহে। সে সমস্ত বাক্যাতীত। উচ্চতর নাটকশ্রেণীতে এই প্রকার ভাবের অনেক দৃশ্য সংরচিত হয়। এই প্রকার ভাবের অভিনয় নিতান্ত দুঃসাধ্য। তাহা কেবল অঙ্গ বিলাসে প্রকাশ করিতে হয়। তাহার সঙ্গে বাক্যের সংশ্রব নাই। নীরবে ইহার অভিনয় হইয়া যায়। এজন্য ইহাকে নীরব অভিনয় বলিলেও বলাযাইতে পারে। শকুন্তলা অলবালে জলসেচন করিতে করিতে যখন প্রিয়দর্শন দুষ্মন্তকে কটাক্ষপাত করিলেন তখন তাঁহার যাদৃশী ভাবোদয় হইয়াছিল তাহা কি তিনি বাক্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন? লতামণ্ডপ হইতে যাইবার সময় যখন ভ্রমরের ছল করিয়া তিনি দুষ্মন্তকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন তখনকার ভাব কি কথায় প্রকাশিত হয়? সীতাদেবীকে বনবাসে লইয়া গিয়া দেবর লক্ষ্মণ তাঁহাকে যখন সেই নিদারুণ সম্বাদ বিজ্ঞাপন করিলেন তৎক্ষণাৎ সীতাদেবীর যে চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল তাহা বাক্যে প্রকটন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা হউক এই নীরব অভিনয়ের একটী দৃষ্টান্তস্থল আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

পারস্য রাজ্য বিজয়কালে মহোদয় আলেকজাণ্ডার ভূপতি ভয়ানক জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। তৎকালে তাঁহার মনে দিগ্বিজয় বাসনা আত্যন্তিক প্রবল থাকাতে ত্বরায় আরোগ্য লাভের জন্য নিতান্ত অধীর হইলেন। এদিকে পারস্যরাজ ডেরায়স উপযুক্ত অবসর লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া শয্যাগত শত্রুর নিধন চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন। আলেকজাণ্ডারকে বিষ প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি বিপুল অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া তদীয় মিত্রগণকে হস্তগত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। রাজ বৈদ্য ফিলিপ্স দিনত্রয়ের মধ্যে উপযুক্ত ঔষধি প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য বিধান করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া ঔষধি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এমত সময় আলেকজাণ্ডার কোন মিত্রের নিকট হইতে পত্র পাইলেন যে ডেরায়স্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ফিলিপ্স তাঁহাকে ঔষধি বলিয়া বিষদান করিবেন। আলেকজাণ্ডার পত্র পাইবা মাত্র সিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎপরে স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেন যে রাজবৈদ্য কখন অবিশ্বাস-ভাজন নহেন। তিনি মনে করিলেন রাজবৈদ্যকে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়স্কর।

অবধারিত দিনে ঔষধি হস্তে ফিলিপ্স উপস্থিত হইলেন। আশা-বিলসিত প্রসন্ন মুখে রাজবৈদ্য আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে

উপবিষ্ট হইলেন। আলেকজাণ্ডার সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বসিলেন। তাঁহাদিগের চারিচক্ষু একত্রে মিলিত হইল। তখন বীরবর রাজবৈদ্যকে পত্রখানি দিয়া তাঁহার নিকট ঔষধি গ্রহণানন্তর তৎক্ষণাৎ তাহা সেবন করিলেন। ফিলিপ্‌স ঔৎসুক্য সহকারে যেমন পত্র পাঠ করিতে যাইবেন অমনি চমকিত হইয়া গেলেন। পত্রপাঠ সময়ে আলেকজাণ্ডার রাজবৈদ্যের মুখপানে একদা দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন ফিলিপ্‌সের মুখমণ্ডলে একদা ঘৃণা রাগ উভয়ই প্রজ্বলিত হইতেছিল। ফিলিপ্‌স আস্তে আস্তে পত্র রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ও মুখমণ্ডলে সহস্র ভাব উদিত হইতেছিল। তৎপরে তিনি কহিলেন "মহাশয় এবিষয় আমি কিছুমাত্র না জানিয়া ঔষধি প্রস্তত করিয়াছি। তাহা আপনিও সেবন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার যেপ্রকার শঙ্কটসময় এবং আমার হস্তে আপনার প্রাণ যতদূর নির্ভর করিতেছে এমত আর কখন ঘটে নাই। এপ্রকার ঘটনায় আমি তত আশ্চর্য্য হই নাই. কিন্তু আপনার বিশ্বাস এবং ঔদার্য্য দেখিয়া আমি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়াছি।" আলেকজাণ্ডার কহিলেন এপ্রকার ঘটনায় যে আপনার প্রতি আমার বিশ্বাসের পরিচয় হইবে আমার এমত ইচ্ছা ছিল না। আপনাকে যেরূপ অপ্রস্তত দেখিতেছি এক্ষণে ত্বরায় আমি প্রতীকার লাভ করি এই আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

এই দৃশ্যে বাক্যদ্বারা অভিনয় করিবার অতি অল্পভাগই আছে। ইহার অধিকাংশই নীরবে অভিনয় করিতে হইবে। বাস্তবিক মানব হৃদয়ের অধিকাংশ ভাবই অপ্রকাশিত থাকে। হৃদয়ের যন্ত্রণা. আনন্দ. উৎসাহ, আশা, নৈরাশ্য, লজ্জা, ভয়, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কোন ভাবেরই সম্যক বাহ্যবিকাশ হইবার উপায় নাই। ভাষা, মুখ ভঙ্গিমা, এবং অঙ্গচালনা দ্বারা তাহাদিগের যে অংশ বাহিরে প্রকাশিত হয় তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। হৃদয় ভাবের প্রাবল্য ও গভীরতা প্রকাশ করিতে হইলে অপরের নিকট আত্ম-অবস্থার সমুদায় প্রকাশ করিয়া তাহার সহানুভূতি উৎপাদন করিতে হয়। অপরে যখন পরকীয় অবস্থার সমুদায় ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহার সহানুভূতি উদ্রেক এবং যে পরিমাণে সহানুভূতি উৎপাদিত হয় সেই পরিমাণে পরকীয় হৃদয়ভাব বুঝিতে পারে। যে নাটকীয় দৃশ্য এই প্রকার সহানুভূতি উৎপাদন করিবার বিশেষ উপযোগী, তাহার অভিনয়ে দর্শকগণের মনে বিশিষ্টরূপে ভাবোৎপাদন করাও যাইতে পারে। যে নাটক এই প্রকার দৃশ্যনিচয়ে পরিপূর্ণ তাহারই কল্পনা অতি উৎকৃষ্ট এবং সেই নাটকই উত্তমরূপে অভিনীত হইতে পারে। এই প্রকার নাটক নির্ব্বাচন করিয়া অভিনয় করিতে পারিলে অভিনেতৃগণ অল্পায়াসে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন।

মানবের হৃদয়ভাব যে অল্প পরিমাণে

প্রকাশিত হয়, সকল সময়, এবং সকল অবস্থায় তাহাও আবার প্রকাশ করিবার যোগ্য বলিয়া গণনীয় হয় না। মানব হৃদয়ে যে সমস্ত ভাব যখন সমুদিত হয় তাহা যদি সকল প্রকাশ করা যায় তাহা হইলে নিতান্ত অর্ব্বাচীন ও নির্ব্বোধের কার্য্য করা হয়। হৃদয়-ভাবের অধিকাংশ অপ্রকাশিত ও গোপনে রাখিতে হয়। কেবল ক্ষোভের বিষয় এই, যাহা প্রকাশ করিবার উপযোগী. তাহা সম্যক্ রূপে প্রকাশিত হয় না। নহিলে এক সঙ্গে মানব হৃদয়ে যত প্রকার মিশ্রিত ভাব উদিত হয় তাহার কি সকল ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে? আবার হৃদয়ে হয়তো এক প্রকার ভাবের উদয় হইল, বাহিরে প্রকাশ করিবার সময় তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়া অন্যবিধ আকারে প্রকটন করা আবশ্যক বোধ হয়। মানবের ভাষা অনেক সময়ে হৃদয়-ভাব গোপন করিবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। টালিরাণ্ড কহিয়া গিয়াছেন, মানবীয় ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য যত না ব্যবহৃত হয়, তাহা গোপন করিবার জন্যই অধিক তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু ভাষা হৃদয়-ভাব প্রকাশ করিতে যেমন পরাস্ত, গোপন করিতে ও তেমনি অসমর্থ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হৃদয়ভাব গোপন করিতেগেলেও তাহার কিয়দংশ বাহিরে প্রকটিত হইয়া পড়ে। প্রকটিত না হইলে ও অবস্থা, ঘটনা এবং লোক-প্রকৃতি বোধ থাকিলে অপরের হৃদয়ভাব অনেকাংশে অনুমান করিয়া লওয়া ও যাইতে পারে। প্রকাশযোগ্য হৃদয়ভাব প্রকাশ করা যেমন অভিনেতার গুরুতর কার্য্য, অপ্রকাশযোগ্য হৃদয়ভাব যাহাতে পরের নিকট ব্যক্ত না হইয়া পড়ে এরূপে অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করাও তাঁহার তত দূর আবশ্যক। এজন্য আবার অনেক সময়ে অভিনেতার পক্ষে কেবল হৃদয়ভাব গোপন করিলে যথেষ্ট হয় না, ঘটনা, অবস্থা এবং আত্ম প্রকৃতিও গোপন করিতে হয়। কৌশল পূর্ব্বক সাবধানে অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলে, বাহিরে যাহা গোপন করিবার চেষ্টা করা যায় অনেক সময় তাহার হয় তো কিছু কিছু প্রকাশ হইয়া যাইতেছে, দর্শকমণ্ডলীর এমত অনুভব হইতে পারে।

আর এক প্রকার হৃদয় ভাব ও নীরবে অভিনীত হয় এবং তাহা অভিনয় করা ও সুসাধ্য নহে। নাটকে এমত অনেক সংস্থান বিন্যস্ত হয়, যথায় হৃদয়ভাব অবস্থান্তরে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হয়। আনন্দ ও উৎসব সময়ে হয়তো কোন দুঃসম্বাদ উপস্থিত হইয়া হৃদয়ভাব একেবারে বিপরীত দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া দিল, পাপানুষ্ঠান সময়ে কেহ হয়তো হঠাৎ ধৃত হইয়া নিতান্ত অপ্রস্তুত ও লজ্জায় পতিত হইল। এই প্রকার নাটকীয় সংস্থানে অভিনয় করা বড় সহজ নহে, এখানে বাক্যের প্রয়োজন নাই অঙ্গ চালনার প্রয়োজন নাই, কেবল নীরবে এরূপে স্তম্ভিত হওয়া চাই যে দর্শক মণ্ডলী যেন ঠিক হৃদয়ভাবের উন্নয়ন করিতে পারেন।

নাটকের যে অসংখ্য স্থানে নীরব অভিনয়ের প্রয়োজন হয় তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে না। সেক্‌সপিয়রের নাটকাবলির অভিনয় করিতে গেলে সেপ্রকার অনেক স্থল উপনীত হয়। উৎকৃষ্ট নাটক মাত্রই এই প্রকার সংস্থানে পরিপূর্ণ। এজন্য যাঁহারা নীরব অভিনয়ের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নাটকালোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

হৃদয়ভাবের আবেগ, সমস্ত হৃদয়েই নির্লীন হয় না। বহ্নি তেজস্বী হইলে যেমন তাহা প্রজ্বলিত হইয়া শিখা দ্বারা বহির্দ্দেশে সমস্ত তেজ ও উষ্ণতা বিনির্গত করিয়া দেয়, তেমনি হৃদয়ের উষ্ণতা সঞ্জাত হইলে তাহা বাহিরে বিমুক্ত হইতে চাহে। বাক্যই হৃদয়তাপ-বিনির্গমনের দ্বার স্বরূপ। রোদনে শোকের উপশম বোধ হয়। চীৎকার ও তর্জ্জন গর্জ্জনে ক্রোধ রিপুর শমতা বিধান করে। বন্ধু বান্ধবের নিকট হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিলে বিপ্রলম্ভের অনেক লাঘব জ্ঞান হয়। বাস্তবিক ভাষাই ভাব-পূর্ণ হৃদয়ের বাহ্য প্রবাহ। ভাবের প্রকৃতি অনুসারে এই প্রবাহ কখন উচ্চ হইয়া স্ফীত হয়, কখন নীচগামী ও ধীরভাবে বহিতে থাকে। ভাষাও কখন উচ্চ হয় কখন নীচ হয়, কখন মৃদু কখন উগ্র, কখন দ্রুত কখন ধীর, কখন কর্কশ কখন মধুর হইয়া থাকে। কোন্ সময় কি প্রকার হইবে কেবল প্রকৃতি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। কি প্রকার ধ্বনিতে কাহার সহিত কথা কহিতে হইবে কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। হৃদয়ভাব যে প্রকার থাকে, বাক্যের ধ্বনি তদনুযায়ী হইয়া থাকে। বাক্যের ধ্বনিতে হৃদয় ভাবের পরিচয় দেয়। বাগ্মী যখন বক্তৃতা করিতে থাকেন, তাঁহার কোন্ কথা গুলি কেবল মৌখিক ও অভ্যস্ত উপদেশ, এবং কোন্ গুলিই বা বাস্তবিক হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে তাহা কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। তাহা সহজে বাক্যের ধ্বনিতে ও নিঃসরণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কারণ হৃদয়ের কথা হৃদয়ে গিয়া আঘাত করে আর কেবল মুখের কথা বাতাসে উড়িয়া যায়। যাহা হৃদয়ে আঘাত করে সে বাক্যের ধ্বনি ও বেগ যে প্রকার হইবে মৌখিক বাক্য মাত্রে তাহা কখনই বিদ্যমান দেখা যাইবে না। যে অভিনেতা হৃদয় বেদনায় কথা কহিতে পারেন তিনিই পরের হৃদয়ে সমবেদনা উদ্বোধিত করিতে পারিবেন।

অভিনেতার কার্য্যে অনেক গুলি নৈসর্গিক গুণের একাধারে সমাবেশ আবশ্যক। এই সমস্ত স্বাভাবিক গুণে ভূষিত না হইলে অভিনেতার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্বাভাবিক গুণে ভূষিত না থাকিলেও অনেকে তৎ সমুদায় শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা অর্জ্জন করিতে যান। কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হয়েন বলিতে পারি না। প্রকৃতি ব্যতীত যাহা কিছুতেই প্রদান করিতে পারে না, তাহা

শিক্ষা ও অভ্যাসের হস্ত হইতে প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শিক্ষাতে রূপ দিতে পারে না, মধুর কণ্ঠ ধ্বনি দিতে পারে না এবং সুকুমার হৃদয় দিতে পারে না। কিন্তু এই গুণগুলি অভিনেতার ব্যবসায়ের উপকরণ পদার্থ। স্বকীয় পরিশ্রম ও পরকীয় উপদেশে এই প্রকার গুণ নিচয় লাভ করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক স্বভাবতঃ এই সমস্ত গুণে বিভূষিত থাকিলে শিক্ষা, পরিশ্রম, সুরুচি ও বিবেচনা যে তাহাদিগের সদ্ব্যবহারও নিয়োজন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই।

স্বাভাবিক গুণে ভূষিত থাকিলে, সুশিক্ষা ও পরিশ্রম দ্বারা অনেক দূর কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়। যে পুস্তক অভিনয় করিতে হইবে সেই গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহার কবিত্ব, অভিপ্রায়, ও তন্নিবিষ্ট পাত্র এবং পাত্রীগণের বিষয় সম্যক্ রূপে পর্য্যালোলোচনা করিয়া দেখিলে অভিনয় কালে পাত্র ও পাত্রিগণের অবস্থা অনেক দূর স্বকীয় ভাগ্য বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে; তখন অভিনয় কার্য্য স্বাভাবিক ও সুসম্পন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে অভিনেতা স্বীয় কার্য্যে এত দূর অভিনিবিষ্ট হয়েন ক্রমশঃ তাঁহার প্রকৃতি-বোধ জন্মিতে থাকে এবং প্রকৃতি বোধ যত প্রগাঢ় ও তেজস্বী হইতে থাকিবে ততই তিনি কৃত্রিমতার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। তখন তিনি উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া যথাযথ অঙ্গ ভঙ্গি ক্রমে অনায়াসে অভিনয় করিয়া যাইতে পারিবেন। বাস্তবিক গ্রন্থকারের প্রতি যাঁহার লক্ষ্য থাকে, রঙ্গভূমিস্থ বৃহৎ দর্পণের * প্রতি তাঁহার দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হয় না। যিনি অভিনীত পাত্রের হৃদয়ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং সেই সম বেদনায় ব্যথিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই হৃদয়ভাব প্রদর্শন করা সুকঠিন নহে। যে প্রকৃতি তাঁহাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভূষিত করিয়াছে যে প্রকৃতি তাঁহাকে বাক্ শক্তি প্রদান করিয়াছে, সেই প্রকৃতি তাঁহাকে বাক শক্তি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথাযথ কার্য্য ও বিনিয়োগ স্বতঃই প্রদান করিবে। প্রকৃতি কর্ত্তৃক চালিত হইলে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

নাটকীয় যে ব্যক্তির চরিত্র অভিনয় করিতে হইবে যদি তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা বা অপরক্তি জন্মে, তাহা হইলে সে অভিনয়ে ব্রতী হওয়া উচিত নহে। কারণ সেপ্রকার ঘৃণা জন্মিলে অভিনয় কার্য্যে অনুরাগ জন্মে না। সুতরাং অনেক স্থলে তাহাতে প্রকৃতিভঙ্গের দোষাশ্রয় করিবার সম্ভাবনা। যে অভিনেতা অতি সুদক্ষ তাঁহার কোন চরিত্রের অভিনয়ে অপারগতা জন্মে না। কারণ চরিত্র ভালই হউক আর মন্দই হউক তিনি জানেন যে, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই চরিত্রের স্বাভাবিক অভিনয় প্রদর্শন করাতেই অভিনেতার কৌশল ও

* উপস্থিত মত অভিনয় কার্য্য সংশোধন করিবার জন্য অনেক ইংরাজী রঙ্গভূমিতে এক খানি বৃহৎ দর্পণ স্থাপিত হয়।

গুণপনা। যিনি লম্পট, ভণ্ড, শঠ, অথবা খলের চরিত্র অভিনয় করেন তিনি যদি এমত মনে করেন যে সে অভিনয়ে ও পাপ আছে অথবা তদ্রূপ অভিনয় করিলে লোকে তাঁহাকে ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা করিবে, তাঁহার তদ্রূপ চরিত্রের অভিনয় করা বিহিত নহে। কারণ সে অভিনয়ে তাঁহার হৃদয় মিলিত হইবে না। যাহাতে হৃদয় না মিশিতে চাহে, তাহা কখন স্বাভাবিক হয় না। অভিনেতা এরূপ সঙ্কুচিত থাকেন যে তিনি কখন অনায়াসে অঙ্গচেষ্টা করিতে পারেন না। যে দর্শকগণ আবার মনে করেন, কুচরিত্র লোক ব্যতীত কুচরিত্রের উত্তম অভিনয় করিতে পারে না, অ মরা তাঁহাদিগকে কি বলিব জানি না। তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও বিবেচনা-বিরহিত।

এই স্থলে আমার কোন অভিনয়-চতুর উত্তম কথকের কথা মনে হইল। কথক কীচকবধের পালা ধরিয়াছেন। কীচক যখন অভিসার পথে গমন করিতেছে, তাহার তখনকার লম্পটসুলভ অঙ্গবিলাস, দ্রৌপদীর সহিত অঙ্গচেষ্টা ও ইঙ্গিতাদি কথক এপ্রকার স্বাভাবিকভাবে বর্ণন ও প্রদর্শন করিলেন যেন বোধ হইল তিনি একজন নিজেই লম্পটগুরু। দ্রৌপদী আবার যখন কীচকের সহিত ছলনা করিতেছেন, তখন কথকের অভিনয় দেখিয়া এই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল যে তিনি পুরুষ হইয়া স্ত্রীজাতির চরিত্র, অঙ্গবিন্যাস এবং বাক্য বিরচন কিরূপে এমত পরিপাটিরূপে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। যখন কথকবর আবার ভীমের সহিত কীচকের যুদ্ধ বর্ণন ও অঙ্গভঙ্গি ক্রমে কিয়ৎপরিমাণে উভয়ের বীর্য্য ও বাহুবিক্রম দেখাইতে লাগিলেন তৎকালে তাঁহাকেই যেন একজন মহা বীরপুরুষ বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল। কথকের এই প্রকার অসাধারণ অভিনয়-কৌশল দেখিয়া মনে মনে তাহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলাম এবং যতক্ষণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত ছিলাম, ততক্ষণ যাবতীয় বর্ণিত বিষয় কল্পনায় যেন প্রত্যক্ষীভূত দেখিতে লাগিলাম। কথকের অভিনয়দক্ষতাই যে এপ্রকার মানসিক বিভ্রমের কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। যিনি যে প্রকার লোক তিনি যে সেই প্রকার লোকের চরিত্র বিশিষ্টরূপে অভিনয় করিতে পারিবেন একথার যাথার্থ্য সকল সময় প্রতিপাদিত হয় না। যিনি যে প্রকার লোকের চরিত্র উত্তমরূপে অভিনয় করিতে পারেন তাঁহাকে তদ্রূপ জ্ঞান করাও নির্ব্বোধের কার্য্য।

নাটকীয় পাত্র ও পাত্রীগণের স্বভাব বুঝিয়া অনুরূপ অভিনয় করাতে যে প্রকৃতি বোধের আবশ্যক করে, তাহার কিরূপে উৎপত্তি হয়, ইহা একটি বিসম্বাদী বিষয়। প্রকৃতি বোধ কিরূপে জন্মায় তাহা ঠিক নির্ণয় করা দুষ্কর। কেহ কেহ অনুমান করেন ইহা এক একজনের কেমন স্বাভাবিক সংস্কার হইয়া উঠে। এক একজন কেমন সূক্ষ্মদর্শী থাকেন যে তাঁহারা লোক সমা

জের যাবতীয় লোকের প্রকৃতি যেন আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। এপ্রকার সূক্ষ্মদৃষ্টি সকলের অভ্যস্ত হয় না। এক একজনের মানসিক প্রকৃতিই এইরূপ যে তাঁহারা সকল বিষয় অভিনিবেশ সহকারে তন্ন তন্ন করিয়া আপনাপনিই দেখিয়া থাকেন, তাহার জন্য বিভিন্ন শিক্ষার আবশ্যক হয় না। তবে স্বাভাবিক গুণ যে ভূয়োদর্শনে অধিকতর উন্নত ও প্রবৃদ্ধ হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তির যদি এপ্রকার স্বাভাবিক সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকে তাঁহার ক্রমশই তীক্ষ্নতা সম্পাদিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অনেক কুচরিত্র লোকের এই সূক্ষ্মদৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক এতদ্বিষয়ক সম্পূর্ণ জল্পনা ও তর্ক উত্থাপন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে সকল প্রকার লোকের সংসর্গে না বেড়াইলে যে প্রকৃতিবোধ উৎপত্তি হয় না একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

যে কারণেই প্রকৃতিবোধ উৎপন্ন হউক না কেন, প্রকৃতিবোধ থাকিলে মানবপ্রকৃতিগত দোষ গুণ এবং কাহার প্রকৃতিতে কোন্ গুণ ও দোষ গুলি বিশেষ লক্ষ্য স্থল ও দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা যেন সহজজ্ঞানে প্রতীত হইতে থাকে। বাঙ্গালীর সমক্ষে ইংরাজগণ কিরূপে চলেন, কিরূপে কথা বার্ত্তা কহেন, কিরূপ গর্ব্বিতভাবে গুরুত্ব ও প্রভুত্ব ভাব প্রতি পদে প্রকাশিত করেন, উত্তম অভিনেতা যখন ইংরাজচরিত্র অভিনয় করিতে যাইবেন, তখন তিনি সে সমস্ত অনুকরণ না করিয়া কখন ইংরাজ সাজিবেন না। প্রণয়ান্ধ প্রণয়ীর চরিত্র যিনি অভিনয় করিতে যাইবেন, সেই প্রণয়ী মহাবীরপুরুষ হইলেও সুস্নিগ্ধ ও মোহকরী প্রণয়দ্বারা সেই বীর পুরুষ ও কেমন কামিনীমন-বিমুগ্ধকর সুকুমার ভাবে বিনত ও বিচলিত হইয়া থাকেন এবং সেই ভাবে বিচলিত হইয়া তিনি কেমন স্ত্রৈণতার বিশেষ ভাব ভঙ্গি দেখাইতে থাকেন, অভিনেতা তাহা উত্তমরূপে প্রদর্শন করেন। একজন ইংরাজচরিত্র অভিনয় করিল, অন্যজন প্রণয়রূপ হৃদয়ভাবের অভিনয় প্রদর্শন করিল বটে, কিন্তু ইহারা দুই জনেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য গুণ ও দোষ দেখাইয়া ইংরাজ ও প্রণয়ীর ভাব দর্শকগণের মনে উদিত করিয়া দিল।

প্রতি হৃদয়ভাব বাহ্যজগতে যে সমস্ত বিশেষ লক্ষণ, অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠধ্বনিতে পরিব্যক্ত হয় সেই সমুদায় তাহার পরিভাষা। হৃদয়াভ্যন্তরে যে কার্য্যটি হয়, মুখাবয়বে, বাক্যধ্বনিতে এবং সর্ব্বাঙ্গের ভঙ্গি ক্রমে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ললাটের প্রতি রেখার সহিত এবং মনুষ্যের প্রতি কণ্ঠস্বরের সহিত হৃদয়ের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহার পর্য্যালোচনা করা প্রতি অভিনেতার কর্ত্তব্য। হৃদয়বীণার একতন্ত্রে আঘাত কর সমুদায় শরীরে তাহা ধ্বনিত

হইবে। অঙ্গভঙ্গির সমুদায় লক্ষণ বিবৃত্ত করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তবে টলী * কণ্ঠধ্বনির যে কতিপয় সামান্য সূত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা ক্রমশ: প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মানব ক্রোধপরবশ হইলে তাহার কণ্ঠরব অতি উচ্চ, কর্কশ, এবং চড়া হয়, বাক্য সকল দ্রুতগামী হইয়া পড়ে। ভারতচন্দ্র কোটালের শাসন স্থলে রাজার উক্তিতে কহেন :—

"নিমক হারাম বেটা
আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল॥
রাজ্য কৈলি ছার খার,
তল্লাস কে করে তার,
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ।
আপনি ডাকাতি করি,
প্রজার সর্ব্বস্ব হরি,
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ॥
লুটিলি সকল দেশ,
মোর পুরী ছিল শেষ,
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জানবাছা এক থাদে,
গাড়িব হারামজাদে,
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ।
তোর জিম্মা মোর পুরী,
বিদ্যার মন্দিরে চুরি,
কি কহিব কহিতে সরম।
মাতালে কোটালি দিয়া,
পাইনু আপন কিয়া,
দূর গেল ধরম ভরম॥"

শোকের ধ্বনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শোকের বাক্য অতি মৃদু, ধীর, থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত রবে উচ্চারিত হয়। কারডিনাল উল্‌সী রাজ্যের উচ্চতম পদ হইতে নিপতিত হইয়া যে প্রকার শোচনীয় বাক্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, নাটককারচূড়ামণি সেক্‌সপিয়ার তাহা একটি চমৎকার স্বগতবাক্যে বিরচন করিয়াছেন।

"গৌরব! সম্পদ! তোমাদের নিকট আমি বিদায় হইলাম। চিরকালের জন্য বিদায় হইলাম। মানবের এইরূপ অদৃষ্ট! আজি তিনি আশার নবপল্লবে শোভিত হন, কালি তাঁহার আশাবৃক্ষ মুকুলিত হয়, সহস্র সম্পদের ফলভরে অবনত হইয়া পড়ে, পরশ্ব কোথা হইতে দিক্‌ব্যাপী কুজ্‌ঝটিকা সমুদিত হয়,—ভয়ানক সংহারমূর্ত্তি কুজ্‌ঝটিকা! মানব যখন মনে করিতেছে তাহার আশাবৃক্ষের ফল সকল পরিণত-প্রায়, অমনি সেই বৃক্ষ সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়। তখন মানব আমার মত দুরাশার সাগর গর্ভে নিপতিত হয়।"

সীতা রামচন্দ্রকে উল্লেখ করিয়া সরমার নিকট ক্রন্দন করিতেছেন :—

"হায়, সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"

ভয়ের ধ্বনি অতি লঘু এবং ভঙ্গ বাক্য সকল দ্রুত এবং চপল।

"খুড়্ বাবু, পালিয়ে এসগো, পালিয়ে

* Tully.

এস, ঐ দেখ বুড়ী বিড় বিড় করে কি মন্ত্র পড়্‌ছে, কি আপদ! দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! কি হবে গা বড় বাবু? আমার তো বড় ভয় কচ্ছে।"

সাহসের ধ্বনি ইহার ঠিক বিপরীত। কোমলকণ্ঠ সীতাদেবীও এককালে কেমন সাহসপরায়ণা হইয়া উচ্চ ভৎর্সনা রবে দেবর লক্ষণকে কহিতেছেনঃ—

"রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি, দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে দূর বনে?"

সুখসঞ্চারিত হৃদয়ের বাক্যপরম্পরা অতি মৃদু, সুকুমার অথচ উল্লাসিত। যথা।—

"এই যে, প্রাণেশ্বরী নিদ্রিতা, নিদ্রাবস্থায় প্রেয়সীর মুখারবিন্দ কি অনির্ব্বচনীয় মধুরতা ধারণ করিয়াছে। বোধ হয় যেন কোন দেব-দুহিতা বা গন্ধর্ব্ব কন্যা ভূলোকে অবতীর্ণা হইয়াছেন। আহা বিনোদিনীর ওষ্ঠাধর কি সুন্দর, কি লোভনীয়!"—নন্দবংশোচ্ছেদ।

কিন্তু হৃদয় যখন আনন্দে উৎফুল্ল ও উন্মত্ত হইয়া উঠে তখনকার উৎসব বাক্য উচ্চরবে যেন নৃত্য করিতে থাকে। যথাঃ—

"সুধার প্রেমেতে বাজ্‌রে বীণা,
বল্‌ সুধা বই ধন্‌ চাহি না,
অমন মধুর নাই পিপাসা।
সুধা কিবা ধন, সুধা সে কেমন,
সাধক বিনা কি জানিবে চাষা!"

স্থানান্তরেঃ—

"চোর ধরি, হরি হরি, শব্দ করি, কয়।
কে আমারে, আর পারে, আর কারে ভয়॥"

অভিনেতা শ্রবণশক্তি সহকারে স্থল বিশেষে যেমন কণ্ঠ-ধ্বনির উচ্চনীচতা, গাম্ভীর্য্য ও লঘুতা, প্রভৃতি গুণনিচয়ের প্রয়োগকুশলতা প্রদর্শন করিবেন, যে যেখানে যেরূপ স্বরের আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া লইবেন তেমনি আবার কণ্ঠধ্বনির প্রয়োগ অনুসারে অঙ্গাদির অভিনয় কার্য্যে প্রদর্শন করাও আবশ্যক। ভয়ে যখন কণ্ঠধ্বনি নীচ হইয়া পড়িয়াছে, তখন অঙ্গাদির চালনায় সঙ্কোচ, ব্যাকুলতা এবং শশব্যস্ততা প্রদর্শন না করিলে কণ্ঠধ্বনি মাত্রে যথাযথ অভিনয় হইবে না। টলী বলিয়াছেন, হস্তই বাগ্মীর মহাস্ত্রস্বরূপ। বাক্য এবং হস্তের যথাযথ চালনা দ্বারা বাগ্মী শ্রোতৃবর্গকে এক এক সময়ে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারেন। হস্তের চালনা ব্যতীত বীরত্ব প্রভৃতি কতিপয় হৃদয়ভাবের সম্যক্‌ বিস্ফূরণ হয় না। যে ব্যক্তি কহেন, অভিনেতার হস্ত পদের চালনার একেবারে আবশ্যক নাই, তিনি হৃদ্‌গত ভাব প্রকাশের নিয়মাদি সম্যক্‌ অবগত নহেন। যথাসময়ে হস্তপদাদির সঞ্চালনের নিতান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন কালীন যেমন আবশ্যক, অপ্রয়োজনকালে হস্ত পদের চালনা তেমনি হাস্যজনক হয়। আবার যে প্রকার অঙ্গচালনার আবশ্যক, তাহা না করিয়া অন্যবিধ কৃত্রিম অভিনয় কার্য্য দেখাইলে নিতান্ত বিরক্তি ধরে। যাত্রার বৃদ্ধা দূতীর অসাময়িক এবং

কৃত্রিম হস্ত চালনা দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার সেই প্রকার মুদ্রা দোষ আছে। পুনঃপুনঃ সেই একই প্রকার অঙ্গ ভঙ্গিমা ও কর সঞ্চালন দেখিলে সুতরাং বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু কে না হৃদয়ভাব-পূর্ণ, এবং উৎসাহিত বাগ্মীর মুখস্ফূর্ত্তি ও করসঞ্চালন দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া যায়। কারণ তাহা স্বভাবের কার্য্য, তাহা বৃন্দাদূতীর কৃত্রিম ও রচিত কার্য্য নহে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হৃদয়ের ভাব প্রধানতঃ মুখে এবং নয়নভঙ্গিতে প্রকটিত হয়। এই বদন এবং নেত্রভঙ্গির ব্যভিচার ঘটিলে অভিনয়কার্য্য কেবল ভাঁড়ামি হইয়া উঠে। দূতীগিরি ও ভাঁড়ামি এ দুই—প্রকৃত অভিনয়-কার্য্যের ব্যভিচার হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য ভাঁড়ামিও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। অনেকে হাসাইবার জন্য এই প্রকার ভাঁড়ামি করিতে গিয়া যাত্রাওয়ালার সং সাজিয়া বসেন বটে, কিন্তু তাহাতে অভিনয়পটুতা ও গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। বার বার সে প্রকার মুখভঙ্গি দেখিলে অধিকাংশ লোকেরই বিরক্তি ধরে। অভিনেতা যদি মনে করেন আমি কেবল রং করিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিব তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় প্রতারিত হয়েন। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ করাও যদি অস্বাভাবিক হয়, তাহা ভাল লাগে না। কিন্তু যে থানে ব্যঙ্গ করা আবশ্যক সেখানে না করিলে অভিনয় প্রীতিপ্রদ হয় না। অভিনয়-কার্য্যে আতিশয্য দোষ ঘটিলেও ভাঁড়ামি হয়। এই আতিশয্য দোষ অবিমৃশ্যকারিতার ফল। অনেক অভিনেতাকে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইয়া সময়কালে সমুদায় বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। তখন সহস্র দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে বিবেচনা শক্তি ঠিক রাখিতে পারেন না। যেখানে মনে করিতেছেন এই প্রকার অভিনয় করিতে হইবে, সেখানে হয়তো সেই অভিনয়-কার্য্যের কথঞ্চিৎ আতিশয্য ঘটে। পূর্ব্বে প্রস্তুত না থাকিলে অভিনয় কার্য্যাদি যথা সময়ে ঠিক যোগাইয়া উঠে না। উপস্থিত মত অভিনয় করিতে গেলে অভিনয় নিতান্ত কৃত্রিম হইয়াও পড়ে। অনেক অভিনেতা আবার রহস্য উৎপাদন করিবার জন্য জানিয়া শুনিয়া অভিনয় কার্য্যে রং মিশাইতে যান, সুতরাং আতিশয্যদোষে নিপতিত হয়েন।

নাটকাভিনয় যে কিরূপ গুরুতর কার্য্য তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য আমরা এত বাক্যব্যয় করিলাম। জানিনা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। ইহার নিয়মাদি সংরক্ষণ করিয়া যথাযথ অভিনয় করিতে কয় জন অভিনেতা যত্ন করিয়া থাকেন? যথারীতি অভিনয় করিতে হইলে যে অভিজ্ঞতা, বিবেচনা, সুরুচি, ও সহৃদয়তার আবশ্যক, তাহা কয়জন বুঝিয়া অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যান? যত কুচরিত্র আমোদপ্রিয় তরুণবয়স্ক অশিক্ষিত যুবকগণ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া এব্যবসায়কে

বিষম কলঙ্কপূর্ণ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি এই সমস্ত যুবকগণ আমোদাভিলাষী না অর্থপ্রয়াসী. না অভিনয়কার্য্যে প্রতিপত্তিলাভার্থী। তাঁহারা একেবারে এ সমুদায় ইষ্টলাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। যিনি একচিত্তে কেবল অভিনয়কার্য্যের প্রতিপত্তি লাভের জন্য যত্নশীল হয়েন তিনি যদি তৎপ্রয়োজনীয় শিক্ষা ও গুণনিচয়ের অধিকারী হয়েন তবেই তাঁহার কেবল কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা আছে।

সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন জনগণের পক্ষে রঙ্গভূমি যে প্রকার উচ্চতর মানসিক সুখের আকরস্থান, যেরূপ নির্দ্দোষ আমোদের আলয়, তাহা নাটকাভিনয়ের নৈতিকঅংশ পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে। যে রঙ্গভূমিতে সমুদায় শিল্পবিদ্যা একত্রিত হইয়া দৃশ্যাভিনয়ের ঐন্দ্রজালিক নাট্যবিভ্রম উৎপাদন করে, যথায় উৎকৃষ্টতর কবিগণের কল্পনাকৌশল ও সদ্ভাবসম্পন্ন কবিত্ব লোক লোচনের প্রকৃত বিষয় হইয়া বাহ্যদৃশ্যে দেদীপ্যমান হয়, যথায় স্থপতিবিৎ শিল্পকার রঙ্গভূমিকে নানা পরিভূষণে, অলঙ্কৃত করিয়াছেন, চিত্রকর পরিপ্রেক্ষিত চিত্রে সমুদায় রঙ্গভূমি পরিশোভিত করিয়াছেন, সঙ্গীতজ্ঞগণ মধুর সঙ্গীতধ্বনি, গীত বাদ্যে মন মোহিত করিতেছেন, এবং অভিনীত বিষয়ের রসোৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, যথায় কতিপয় প্রহরের অভিনয় কালে দেশের উন্নতি, শিক্ষা, সভ্যতা ও রুচির এককালে সম্যক্ পরিচয় হইয়া থাকে; সেই পরম রমণীয় স্থলে কি শিশু, যুবা, ও বৃদ্ধ, কি পুরুষ ও নারী, কি নির্ধন ও রাজা, কি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—সকলেই কি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া কিয়ৎ ক্ষণের জন্য জীবনের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন না? এখানে নৃপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞগণ ভূত পূর্ব্ব সুপ্রধান কীর্ত্তি ও ঘটনানিচয়ের পুনরভিনয় দর্শন করিতেছেন, তৎ সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের কার্য্য ও অবদান সমূহের তুলনা করিয়া তাঁহাদিগের আপেক্ষিক গৌরবাভিমান অথবা হীনতা উপলব্ধ করিতেছেন। এখানে তত্ত্ববিৎগণ একপ্রহর মধ্যে শত সহস্র চিন্তার বিষয় সংগ্রহ করিতেছেন, লোকমণ্ডলীর ব্যবস্থা এবং রীতি নীতি ও মানব প্রকৃতির অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন। রঙ্গভূমিতে আসিয়া চিত্রকর দেখিতেছেন কোন বিষয়টি তাঁহার বর্ণযোজনায় ভাব পরিপূর্ণ ও উজ্জলতর শোভায় পবিদৃশ্যমান হইবে। তরুণবয়স্কগণের হৃদয় সদ্ভাবে পরিপূর্ণ ও উন্মত্ত হইতেছে। বৃদ্ধগণ আবার কল্পনাবলে উৎসব এবং আনন্দপূর্ণ যৌবনপথে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। সকলেরই মন উৎসাহ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। সকলেই কিয়ৎকালের জন্য পৃথিবীর শোক তাপ ও ভাবনা চিন্তা বিস্মৃত হইয়া পরম সুখী হইতেছেন। রঙ্গ ভূমির উচ্চতর আনন্দে যাহার হৃদয়কন্দর পরিপূরিত না হয়, বৃথায় তাহার

শিক্ষা, বৃথায় তাহার রুচি এবং বৃথায় তাহার হৃদয়ধারণ। সেই হতভাগ্য কলুষিত ইন্দ্রিয়সুখের ভোগ-মদে এরূপ প্রমত্ত হইয়া আছেন, যে তাহার নিকট পবিত্র মানসিক সুখের নির্ম্মল বারি নিতান্ত বিস্বাদ বোধ হয়

শ্রীপূ-

# তড়িৎ ও বিদ্যুৎ।

ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এক এক সময় এক এক বিশেষ ঘটনা লইয়া প্রসিদ্ধ। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়, নেপোলিয়নের বীরত্ব, নিউটনের আবিষ্ক্রিয়া, লুথরের ধর্ম্মসংস্কার, বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা যে এক এক সময় চিহ্নিত হইয়াছে তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন এই উনবিংশ শতাব্দী কিসের জন্য বিখ্যাত? আমরা বলিব বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য। অন্যান্য ঘটনার ন্যায় ইহার কার্য্য ও ফল নির্দ্দিষ্ট সীমা-বদ্ধ নয়। এই উন্নতি-স্রোত ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া সকল সভ্য দেশের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতেছে। কোন ২ দার্শনিকের মতে এই উন্নতিই সভ্যতা। তাঁহাদের মতে যে জাতি যে পরিমাণে ভৌতিক বল (Physical agent) করায়ত্ত করিতে পারিবে, সেই জাতি সেই পরিমাণে সভ্য। আমাদের মতে ইহা সভ্যতার একমাত্র অঙ্গ না হইলেও একটী প্রধান অঙ্গ। আর কতকগুলি অঙ্গ ইহার আনুষঙ্গিক। মানবজ্ঞান দুই প্রকার; মন-সম্বন্ধীয় ও পদার্থ-সম্বন্ধীয়। প্রথম, দ্বিতীয়ের সাহায্য-সাপেক্ষ। প্রথম দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য; দ্বিতীয় বিজ্ঞানের বিষয়। অতএব বিজ্ঞানের উন্নতিতে যে মানসিক উন্নতি সাধিত হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। পুরাবৃত্তে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ গ্রীস্, রোম প্রভৃতি যে সকল দেশ আদিম সভ্যতার জন্য বিখ্যাত, সে সকল দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা এত দূর ছিল, যে এই উনবিংশ শতাব্দীতেও অনেক সভ্য দেশে সেরূপ নাই। ফলতঃ বৈজ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ ও চিহ্ন ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর এত সভ্যতাভিমান, এই উন্নতি সভ্যসমাজ মাত্রেই একটী নব জীবন প্রদান করিয়াছে। সমাজ সকল ঘনিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানের বিষয় বাড়িয়াছে।

মানসিক বৃত্তিসকল পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। কুসংস্কার সকল অপনীত হইয়াছে। ফলতঃ এই উন্নতির ফল অসীম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন আমাদের দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন আমাদের দেশে পৌত্তলিকতার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল, যখন দেবতারা বিমানারোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেন, যখন নিমেষে উদ্দেশ্য স্থানে উপনীত হওয়া কেবল দেব-সুলভ ছিল, যখন বজ্র ইন্দ্রের অস্ত্র বলিয়া পরিচিত ছিল, তখন যদি কেহ বলিত যে আমরাও দেবতাদিগের ন্যায় অন্তরীক্ষে বিচরণ করিব—আমাদের রথ নিমেষে দূরবর্ত্তী স্থানে নীত হইবে—ইন্দ্রের অস্ত্র আমাদের পত্রবাহক দূত হইবে সেই ব্যক্তি যে উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইত তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে এসকল উন্মাদ-বিজৃম্ভিত বলা দূরে থাকুক, অভ্যাস ইহাদের বিস্ময়জননী শক্তি পর্য্যন্ত তিরোহিত করিয়াছে। এইরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন যে শুদ্ধ আমাদেরই হইয়াছে এরূপ নয়। ইয়ুরোপেও এক সময়ে কবি যাহা কল্পনা করিতে সাহসী হন নাই, এক্ষণে তাহা বাস্তব ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেক্সপিয়ারের বিদ্যাধররাজদূত রবিনের পৃথিবী বেষ্টনে করিতে ৪০ মিনিট লাগিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে মানবদূত তড়িতের পৃথিবী বেষ্টন করিতে এক মিনিটও লাগে না। ফলতঃ আরব্য উপন্যাসের গল্প সকলও এখন আর বিস্ময়কর বোধ হয় না। আলাদ্দীনের প্রদীপের দৈত্য সকল রেলওয়ে এঞ্জিনের ভৌতিক বলের নিকট পরাস্ত হইতে পারে। বাস্তবিকও অজ্ঞানাবস্থাই বিস্ময়জননী। এই অজ্ঞান-তিমির যত তিরোহিত হইবে, মানসিক শক্তি সকল যত প্রকৃষ্ট হইবে, বুদ্ধি শক্তি যত বাড়িবে মানব ততই ধারণক্ষম হইবে। পূর্ব্বে যাহা বিস্মিত হইবার জন্য দেখিত, পরে তাহা বুঝিবার জন্য দেখিবে; একটী কারণ দেখিলেই প্রোৎসাহিত হইয়া অপরটীর অন্বেষণ করিবে এবং ক্রমে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিবে। কিন্তু ধারণা-শক্তির সহিত আয়ত্তি-শক্তির সাম্য চিরকালই রহিবে। পূর্ব্বে সংস্কার ছিল যে পৃথিবী সৌর জগতের, কেন্দ্র, সূর্য্য তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু গ্যালিলিও যখন বলিলেন যে সূর্য্য কেন্দ্র, পৃথিবী তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখন জনসাধারণের মানসিক শক্তি এত দূর প্রকৃষ্ট হয় নাই যে এই মত অবধারণ করিতে পারে। অপরন্তু প্রচলিত সংস্কার ও ধর্ম্মমত উঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া ধারণা শক্তির উত্তেজনা রোধ করিল। সেই জন্যই গ্যালিলিও এত উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হন। এবং এই জন্যই বিশেষ প্রতিভাশালী লোক সকল তাঁহাদের জীবদ্দশায় হতাদর এবং কখন কখন অপদস্থও হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণাশক্তি সাধারণ অপেক্ষা অধিক সুতরাং তাঁহা

দের প্রস্তাবিত বিষয় সকল সাধারণে বুঝিতে পারেনা এবং বুঝিতে পারেনা বলিয়া আদরও করেনা; এবং যেখানে প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী হয় সেখানে উৎপীড়ন করিতেও ক্রটি করেনা। কিন্তু এইরূপ মানসিক ভাব বিজ্ঞানচর্চ্চার বিরোধী। যাহা আপাততঃ বুদ্ধির অগম্য, তাহাই আলোচ্য বিষয় ভাবিয়া সতর্ক ভাবে অনুধাবন করিতে চেষ্টা করাই বিজ্ঞানোন্নতির মূল। অন্যথা আবিষ্ক্রিয়া অসম্ভব। সে যাহা হউক আমরা উদ্দেশ্য বিষয়ের সীমা কিয়ৎপরিমাণে অতিক্রম করিতেছি।

যত প্রকার ভৌতিক বল মানবের করায়ত্ত হইয়াছে তড়িৎ,সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়-জনক। তড়িৎ, মানব জীবন সুখময় করিবার একটী প্রধান উপাদান। এই তড়িৎ কি? এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে তাহা পরে বলা যাইবে। কিন্তু তড়িৎ যাহাই হউক বিদ্যুৎও যে তাহাই ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই উভয়ের প্রকৃতি-গত একতা প্রতিপন্ন করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিদ্যুৎ ও তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ যে একই, উভয়ের আকৃতি ও কার্য্য পরিদর্শন করিলে ইহা স্বতঃই মনে উপস্থিত হয়। বিদ্যুৎ অসঞ্চালক ( Nonconductor ) বস্তু-দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করে, এবং দীপ্য বস্তু দিগকে প্রজ্বলিত করে, ধাতু দিগকে উত্তপ্ত, দ্রবীভূত ও বাষ্পীকৃত করিয়া ফেলে। বস্তুতঃ তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গেরও এই সকল গুণ আছে। কেবল পরিমাণের তারতম্য। আকৃতি, ঔজ্জ্বল্য ও আস্ফোটন দ্বারা যে তড়িতে বিদ্যুৎ-বিভ্রম উৎপন্ন হয়, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। এই সকল সাদৃশ্য দেখিয়া পদার্থবিদ্গণ উভয়ের প্রকৃতি-গত একতা নির্দ্ধারণে যত্নশীল হন। অনেক পরীক্ষার পর বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ ও তড়িৎস্ফুলিঙ্গ উভয়ের বেগ নিঃসং-শয়িত রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি সফলপ্রযত্ন হইবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে গেলে তড়িতের বিষয় কিছু জানা উচিত। সুতরাং তড়িতের প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলে আমাদের উদ্দেশ্য বিষয় সকল সহজবোধ্য হয় তাহাই বলা যাউক।

তাপ ও আলোকের ন্যায় তড়িৎও একটী ভৌতিক বল (Physical agent)। আকর্ষণ; প্রতিক্ষেপণ; তাপক, দীপক ও রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা আমরা এই ভৌতিক বলের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া থাকি। ইহা সকল সময় বস্তু সকলের দেহ-নিষ্ঠ থাকে না। পরন্তু ঘর্ষণ, পেষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি অশেষবিধ কারণে উদ্ভূত হয়। একটী কাচদণ্ড বা এক খণ্ড গালা লইয়া তাহাকে রেশমি রুমাল দিয়া ঘর্ষণ করিলে ঐ ঘর্ষিত স্থান কাগজ খণ্ড, কাষ্ঠচূর্ণ, পালক প্রভৃতি লঘু বস্তু সকলকে আকর্ষণ করে; এবং ঐ সকল লঘু বস্তু কিয়ৎক্ষণ ঐ ঘর্ষিত স্থানে

সংলগ্ন থাকিয়া প্রতিক্ষিপ্ত হয়। এই আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণ দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে ঘর্ষিত অংশ তড়িদাক্রান্ত (Electrified) হইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে কাচ ও গালা উভয়ের ঘর্ষিত অংশ হইতে বিভিন্নধর্ম্মি তড়িৎ উদ্ভূত হয়। কাচের ঘর্ষিত অংশ যে বস্তুকে প্রতিক্ষিপ্ত করিবে গালার ঘর্ষিত অংশ তাহাকে আকর্ষণ করিবে। সুবিধার জন্য এই দুই প্রকার তড়িৎ দুই পৃথক্ সংজ্ঞায় অভিহিত। কাচজ তড়িৎকে যৌগিক (Positive) ও অপর প্রকার তড়িৎকে বিয়োগিক (Negative) বলে। ঘর্ষণ দ্বারা সকল বস্তুতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে উভয়ের অন্যতর তড়িৎ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

এই সকল প্রত্যক্ষ (Phenomena) বুঝাইবার জন্য তড়িতের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটী মত কল্পিত হয়। একটী মতের আবিষ্কর্ত্তা ফ্রাঙ্কলিন। তিনি অনুমান করেন ইথরের ন্যায় এক প্রকার সূক্ষ্মতম, অতীন্দ্রিয়, অতোলনীয় তরল পদার্থ সমস্ত জড়জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই তরল পদার্থ বস্তু বিশেষে বিশেষ২ পরিমাণে থাকে। যখন এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ব্যত্যয় না হয়, তখন বস্তু সহজ বা তড়িদনাক্রান্ত (Unelectrified) থাকে। ঘর্ষণ প্রভৃতি কারণে এই পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। পরিমাণ অধিক হইলে বস্তু যৌগিক-তড়িদাক্রান্ত (Positively electrified) ও অল্প হইলে বিয়োগিক-তড়িদাক্রান্ত হয়। এই মত অপেক্ষা দ্বিতীয় মতটী অধিক সমাদৃত ও প্রচলিত। সুতরাং ইহার বিষয় অধিক না বলিয়া দ্বিতীয়টীর বিষয়ই বলা যাউক।

দ্বিতীয় মত। ডুফে (Dufay) প্রথম এই মত আবিষ্কার করেন। কিন্তু সাইমার (Symmer) ইহার সংস্কার করেন বলিয়া ইহা তাঁহার নামের খ্যাত। এই মতানুসারে পূর্ব্বোক্ত দুই বিভিন্নপ্রকার তড়িৎ, দুই বিভিন্নপ্রকার অতীন্দ্রিয় অতোলনীয় তরল পদার্থ বলিয়া অনুমিত হয়। এক প্রকারের তাড়িত তরল সকল (Electric fluid) পরস্পরকে প্রতিক্ষেপণ ও বিভিন্ন প্রকারের তাড়িত তরল সকল পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই দুই প্রকার তাড়িত তরলের সমান পরিমাণে সংযোগে এক প্রকার নিশ্চেষ্ট তাড়িত তরল (Neutral fluid) উৎপন্ন হয়। পদার্থের সহজ অর্থাৎ তড়িদনাক্রান্ত অবস্থায় এই নিশ্চেষ্ট তাড়িত তরল বহুল পরিমাণে থাকে। আর কোন পদার্থ তড়িদাক্রান্ত হইলে উভয় তাড়িত তরলের সমতা নষ্ট হইয়া একের আধিক্য ও ঠিক্ সেই পরিমাণে অপরের হ্রাস হয়। সুতরাং কোন বস্তুতে তাড়িত তরল সকল সময় এক পরিমাণে থাকে। আর এতদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে যখন উভয়ের এক প্রকার তাড়িত তরলের স্রোত এক বস্তুর ভিতর দিয়া কোন দিকে প্রবাহিত হয়, তখন অপর তাড়িত তরলের স্রোত সেই বস্তুর ভিতর দিয়া বিপরীত দিকে সমবেগে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ এক স্রোত

যেমন একবস্তু হইতে একপ্রকার তাড়িত-তরল লইয়া যায় অপর স্রোত আবার সেই বস্তুতে অন্যপ্রকার তাড়িত তরল সেই পরিমাণে আনয়ন করে। সুতরা সমুদায় তাড়িত তরলের পরিমাণ একই থাকে। তড়িৎ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যাহা-কিছু জানা গিয়াছে এই মতানুসারে সকলই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে এ মত কল্পনামাত্র। ইহাতে তড়িৎ এক প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু সম্ভবতঃ তড়িৎ তাপের ন্যায় একপ্রকার গতি হইতে পারে। যেমন ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পদার্থের অণু সকলের দ্রুত পরিদোলনে তাপের উৎপত্তি হয়; সেইরূপ তড়িৎও কোন পদার্থ না হইয়া একপ্রকার গতির ফল। এইরূপ অনুমান করা দর্শনানুসারী। সুতরাং আপাততঃ যাহা কল্পিত হইয়াছে তাহা কেবল সুবিধার জন্য ও প্রত্যক্ষ বুঝাইবার জন্য।

তড়িতের প্রকৃতির বিষয় বলা হইল, এক্ষণে পদার্থ সকলের সহিত তড়িতের সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু বলা যাউক। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে একটী কাচদণ্ডের এক অংশ ঘর্ষণ করিলে সেই অংশই কেবল লঘু বস্তুকে আকর্ষণ করিতে পারে, অন্য কোন অংশের সে ক্ষমতা থাকে না। এইরূপ অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে তড়িৎ কেবল কাচের ঘর্ষিত অংশেই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কোন ধাতুর যে কোন অংশই ঘর্ষিত হউক না, সকল অংশেই তড়িতের সত্ত্বার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কারণে বস্তু সকল দুই ভাগে বিভক্ত, সঞ্চালক (Conductors) ও অসঞ্চালক (Nonconductors)। যে বস্তুতে (যেমন কাচ) তড়িৎ যেখানে উদ্ভূত হয় সেই খানেই থাকে তাহাকে অসঞ্চালক; আর যে বস্তুতে তড়িৎ যেখানেই উদ্ভূত হউক না, সর্ব্বত্র বিসৃত হয় তাহাকে সঞ্চালক বলে। ধাতু সকল, অম্ল, জল, তুষার, উদ্ভিদ, জীব প্রভৃতি ক্রমানুসারে সঞ্চালক শ্রেণী মধ্যে এবং কাচ, রেশম, বায়ু প্রভৃতি অসঞ্চালক শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ইহা জানা উচিত যে অত্যন্ত সঞ্চালক ধাতুও কিয়ৎপরিমাণে তড়িৎবিসরণের বাধা সম্পাদন করে এবং অত্যন্ত অসঞ্চালক কাচেও তড়িৎ কিয়ৎ পরিমাণে বিসৃত হয়। সুতরাং সঞ্চালক ও অসঞ্চালকে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই—কেবল তড়িৎবিসরণে বাধার পরিমাণের ন্যূনাধিক্য আছে মাত্র।

অসঞ্চালক বস্তুদিগকে বিচ্ছেদক (Insulators) কহে। তড়িদাক্রান্ত বস্তু সকলকে তড়িৎধারণক্ষম করিবার জন্য উহাদের উপর স্থাপিত করা হয়। সচরাচর কাচই এই জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যতক্ষণ অসঞ্চালক বস্তু দ্বারা পরিবৃত থাকে ততক্ষণই বস্তু সকল তড়িদাক্রান্ত থাকিতে পারে। সুতরাং পৃথ্বী ও তড়িদাক্রান্ত বস্তু—এই উভয়ের মধ্যে অসঞ্চালক বস্তুরূপ অবচ্ছেদ না থাকিলে, পৃথ্বীর উত্তম সঞ্চালকত্ব হেতু ঐ বস্তুগত তড়িৎ সঞ্চালিত ও

উহার সর্ব্বত্র বিসৃত হয়। এবং পৃথ্বীর পরিমাণ অনুধাবন করিলে উহার এই তড়িৎশোষকতা শক্তি অসীম বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। এই জন্যই পৃথ্বীকে সাধারণ আধার (Common reservoir) বলা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সহজাবস্থায় বস্তু সকলে এক প্রকার নিশ্চেষ্ট তাড়িত তরল (Neutral fluid) থাকে এবং ইহা যৌগিক ও বিয়োগিক উভয় তাড়িত তরলের সমসংযোগে উদ্ভূত। কোন তড়িদাক্রান্ত বস্তুর নিকট একটী সহজাবস্থ বস্তু রাখিলে ঐ তড়িদাক্রান্ত বস্তু শেষোক্ত বস্তুর নিশ্চেষ্ট তাড়িত তরলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমতড়িৎকে প্রতিক্ষেপ ও বিষমকে আকর্ষণ করে। মনে কর একটী ধাতব নল একটী যৌগিক তড়িদাক্রান্ত বর্ত্তুলের নিকট আছে। ইহা বলা বাহুল্য যে উভয়েই কাচ কিম্বা অন্য কোন বিচ্ছেদক (Insulator) পদার্থের উপর আছে। ঐ বর্ত্তুলস্থ তড়িতের প্রভাবে নলস্থ নিশ্চেষ্ট তাড়িত তরল বিশ্লিষ্ট হইবে এবং বর্ত্তুলে যৌগিক তড়িৎ আছে বলিয়া নলের যে ভাগ বর্ত্তুলের নিকট সেই ভাগে বিয়োগিক তড়িৎ ও দূরবর্ত্তী ভাগে যৌগিক তড়িৎ সঞ্চালিত হইবে। ইহাকেই তড়িৎ সংক্রামণ (Induction) কহে। এই ধর্ম্মের কারণ কি এই বিষয়ে মতভেদ আছে। নিষ্প্রয়োজনীয় বোধে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না।

তড়িতের আর একটী ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমরা নিরস্ত হইব। কোন সঞ্চালক বস্তু তড়িদাক্রান্ত হইলে, তড়িৎ বস্তুর বহির্ভাগেই থাকে এবং তথায় অতি সূক্ষ্ম স্তরে সন্নিবেশিত হয়। অভ্যন্তরে তড়িতের সত্বার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বহিস্থ তড়িৎ-স্তরের গাঢ়তার সহিত বস্তুর আকারের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। প্রতিক্ষেপণ-গুণে সূক্ষ্মাগ্রসকলে প্রধাবিত হয় এবং তজ্জন্য সেই সকল স্থানেই তড়িৎ-স্তরের গাঢ়তার আধিক্য হইয়া থাকে। গোলকে এই গাঢ়তা সর্ব্বত্র সমান। অণ্ডাকৃতি বস্তুর সূক্ষ্মদিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অণ্ডাকৃতি যতই দীর্ঘীকৃত হইবে ততই অগ্রভাগস্থ তড়িৎস্তরের গাঢ়তা অধিক হইবে। এবং যে পরিমাণে গাঢ়তা অধিক হইবে সেই পরিমাণে বিততিষা ও (Tension) বাড়িবে অর্থাৎ সেই পরিমাণে বিচ্ছেদক বায়ুর বাধা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র গমন-ক্ষম হইবে। বিততিষার সহিত গাঢ়তার বর্গের সমানুপাত। সুতরাং জ্যামিতি-কল্পিত বিন্দুবৎ সূক্ষ্মাগ্রে যে বিততিষা অসীম হইবে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। বিন্দুনিচয়ের এই ক্ষমতা (Power of points) বিদ্যুদঙ্কুশের (Lightning rod) স্পৃষ্ট মূল সূত্র। এবং অনেক তড়িৎ প্রক্রিয়ায় এই ধর্ম্মের সাহায্য লইতে হয়।

তড়িতের গুণ সকল সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এই সকল গুণের সাহায্যে অনেক তড়িৎ-যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। সে সকলের উল্লেখ এ প্রস্তাবের বহির্ভূত।

এক্ষণে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ কি তাহাই বলা যাউক। মনে কর বিভিন্নতড়িদাক্রান্ত দুইটী সঞ্চালক বস্তু কিয়ৎ ব্যবধানে নিহিত আছে। বিভিন্নধর্ম্মি বলিয়া একের তড়িৎ অপরের তড়িতের সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে. কিন্তু তাহাদের পরস্পর আকর্ষণশক্তি এত অধিক নয় যে বায়ুর বাধা অতিক্রম করিয়া মিলিত হয়। কিন্তু ঐ উভয় বস্তু একটি ধাতব তার দিয়া সংযুক্ত কর, অল্পে অল্পে উভয় তড়িতের সম্মিলন সাধিত হইবে। কিন্তু এ সম্মিলনে স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয় না অথবা উৎপত্তি হইলেও দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে যেন উভয়ের মিলনের জন্য একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল এবং সেই পথ দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইল। কিন্তু তার সংযোগ না করিয়া ঐ উভয় বস্তুর মধ্য ব্যবধান ক্রমে কমাইয়া দেও। উহারা পরস্পর যত নিকটে আসিতে থাকিবে তত্ই উভয় তড়িতের আকর্ষণ বাড়িতে থাকিবে, এবং আকর্ষণের আধিক্য প্রযুক্ত তড়িৎ সম্মুখ ভাগে অত্যন্ত জমিবে এবং তড়িৎ-স্তরের গাঢ়তার বৃদ্ধি হইলেই বিততিষা (Tension) বাড়িবে এবং অবশেষে এক সময় বিততিষা এত বাড়িবে যে বায়ুর বাধা মানিবে না। তখন উভয় তড়িৎ বেগে মিলিত হইবে এবং স্ফুলিঙ্গ ও আস্ফোটন এই মিলনেরই আনুষঙ্গিক। এই মিলনের সময় এত অধিক তাপ উদ্ভূত হয় যে তদ্দ্বারা অনেক প্রকার রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ সাধিত হয়। বিদ্যুৎও যে এইরূপ অতি-বিততিষা বিশিষ্ট দুই বিভিন্ন তড়িতের মিলন-ফল ইহা আমরা শীঘ্রই প্রতিপন্ন করিব।

পরীক্ষা দ্বারা ভূপৃষ্ঠে, ভূবায়ুতে এবং মেঘে তড়িতের সত্ত্বা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন এই সকল প্রমাণের জন্য অশেষ উপায় উদ্ভাবন করেন। তন্মধ্যে একটী বিশেষ কৌতুহলাবহ। তিনি একদিন ফিলেডেল্ফিয়া নগরের নিকটস্থ এক মাঠে বাত্যাদির সময় এক খানি ঘুড়ি উড়াইতেছিলেন। ঘুড়ির অগ্রভাগে একটি সূচ্যগ্র ধাতুদণ্ড ছিল। ঘুড়ি সাধারণ সূতায় আকাশের অতি উচ্চ প্রদেশে উড্ডীন হইলে, তিনি সূতার যে প্রান্ত তাঁহার নিকট ছিল সেই প্রান্তে একটী চাবি বাঁধিলেন; এবং সেই চাবিতে রেশ্মি সূতা বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্ত একটী গাছে বাঁধিয়া রাখিলেন। এইরূপ করিয়া তিনি বারে ২ চাবির নিকট হস্ত লইয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন না। তিনি একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ঘুড়ির সূতা উত্তম সঞ্চালক হইল। এবং সেই সময় ফ্রাঙ্কলিন সেই চাবির নিকট হস্ত লইয়া গেলেন অমনি তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হইল।

ফ্রাঙ্কলিন নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে এই পরীক্ষারসফলতা দেখিয়া তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছিল যে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন

না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষা সফল হইয়াছিল বটে কিন্তু তিনি তাহার কারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন ঘুড়ি ও সূতা যেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া উত্তম সঞ্চালক হইল, অমনি মেঘের তড়িৎ উহাদের ভিতর দিয়া চাবিতে উপনীত হইল; এবং সঞ্চালক রেশম অতিক্রম করিয়া আর সেখান হইতে যাইতে পারিল না। তৎপরে চাবির নিকট হস্ত লইয়া যাওয়াতে ভূপৃষ্ঠস্থ তড়িৎ (যাহা সঞ্চালক মানব দেহের ভিতর দিয়া হস্তে প্রধাবিত হইয়াছে) ও চাবিস্থিত তড়িতের পরস্পর সম্মিলন হইল এবং তাহার ফলস্বরূপ তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হইল। কিন্তু বাস্তবিক মেঘের তড়িৎ চাবিতে আইসে নাই, ঘুড়ি মেঘের নিকট যাওয়াতে ঘুড়ি ও সূতায় তড়িৎ সংক্রামিত হইল অর্থাৎ ঘুড়ি ও সূতার নিশ্চেষ্ট তাড়িত তরল বিশ্লিষ্ট হইয়া মেঘের সম তড়িৎ চাবির দিকে প্রতিক্ষিপ্ত হইল ও বিষম তড়িৎ ঘুড়ির দিকে আকৃষ্ট হইল। সুতরাং ফলে একই হইল। মেঘে ও ভূপৃষ্ঠে প্রায়ই বিষম তড়িৎ থাকে। সচরাচর ভূপৃষ্ঠে বিয়োগিক ও মেঘে যৌগিক তড়িৎ থাকে। সুতরাং, পরস্পর নিকট আসার জন্যই হউক অথবা যে কারণেই হউক, যখন উভয় বিষম তড়িতের বিততিমা এত অধিক হয় যে মধ্যস্থ বায়ুর বাধা মানে না তখনই উভয়ে বেগে সম্মিলিত হয়। এবং বিদ্যুৎ, ও বজ্র সেই মিলনেরই ফল। বিদ্যুৎ বজ্র ও বিদ্যুদ্দণ্ডের (Lightning rod) বিষয় পর প্রস্তাবে সবিস্তারে বলা যাইবে। এবার তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ ও বিদ্যুতের সমতা প্রতিপন্ন করিয়াই নিরস্ত হওয়া গেল।

# কবিত্ব ও কাব্য সমালোচন।

সুখই জীবনের উদ্দেশ্য। সংসারে মনের যাহা কিছু কার্য্য সকলই সেই সুখমূলক; সুখান্বেষণ ভিন্ন মনের আর কোন গতি নাই, সুখক্ষেত্র ভিন্ন মনের আর কোথাও স্থিতি বা ক্রীড়া নাই, কারণ সেই সুখস্থলেই মন মুক্ত ও স্বাধীন। কিন্তু সেই সুখ-স্থল কোথায়? আমরা বলি একমাত্র সৌন্দর্য্য-রাজ্যে। যেখানে মনের গতি নাই, সেখানে মনের অধিকারও নাই; কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রতিপদে মনের গতি, উহার অঙ্গে অঙ্গে মন মিশ্রিত হইয়া উহাকে অধিকার করে, সুতরাং সৌন্দর্য্য-স্থলেই মনের পূর্ণাধিকার মুক্তি ও স্বাধীনতা এবং সৌন্দর্য্য স্থলেই মনের সুখে ক্রীড়া।

কিন্তু এই সৃষ্টিত অনন্ত সৌন্দর্য্যের

রাজ্য, তবে ইহাতে মানবের সুখ সম্পূর্ণ নয় কেন? এই গুরুতর প্রশ্নের দুইটি মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ, সৌন্দর্য্যউপভোগের ক্ষমতার অপরিপক্ক অবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ মানবের চক্ষে এই সৃষ্টি বিস্তৃত হয়, এবং যে সময়ে আমাদের উক্ত ক্ষমতা পরিণত অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন দীর্ঘকাল অনুপযুক্ত উপভোগে উহার প্রতি আমাদের কৌতুহল ও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইয়া আসে, সুতরাং সৃষ্টির অদ্ভুত সৌন্দর্য্য উপভোগে আমরা একরূপ অজ্ঞাত ভাবে বঞ্চিত হইয়া যাই, এবং আমাদের সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী ক্ষমতাও জড়বৎ হইয়া পড়ে, তখন নিত্য দৃশ্য পদার্থের অতিরিক্ত আর কিছু না দেখিলে তাহার প্রতি কৌতুহল আর উত্তেজিত হয় না। কিন্তু যদি আমরা এই যৌবনের পূর্ণ উপভোগ-ক্ষমতায় সহসা সৃষ্টি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতাম, তাহা হইলে হয়ত সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে একেবারে আমাদের হতজ্ঞান হইয়া পড়িতে হইত।

দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধি এবং হৃদবৃত্তি সকলের সঙ্কীর্ণতা হেতু অভাব এবং স্বার্থের উৎপত্তি। এই অভাব এবং স্বার্থ যাবদীয় শারীরিক ও মানসিক দুঃখের মূল। শারীর প্রয়োজন সমূহের সৌকার্য্যার্থে বুদ্ধিবৃত্তির প্রবলতা ও সূক্ষ্মানুভাবকতার আবশ্যক, এবং সংসারে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সকল ঘুচাইয়া শান্তি ও একতা সম্পাদনার্থে হৃদবৃত্তি সকলের প্রসারণের প্রয়োজন। ক্ষুদ্রাশয়তা-জনিত স্বার্থরেখা সংসারকে একেবারে আয়ত্ত করিতে পারে না বটে, কিন্তু খণ্ডে খণ্ডে উহাকে বেষ্টন করিয়া বহুবিধ ক্ষুদ্রাধিকার উৎপন্ন করে, এবং তাহাদিগের পরিচালনেই দ্বন্দ্ব ও শান্তিভঙ্গ। আশয় যদি ব্যাপ্ত হইয়া একেবারে সংসারকে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলে স্বার্থরেখা সংসারের বাহিরে পড়িয়া যায়, মানুষেয় অধিকার মানুষের সহিত মিলিয়া সংসার সাগরে একই অধিকার প্রতীয়মান করায় এবং সেই অধিকারে প্রত্যেক মনুষ্যই স্বাধীন ভাবে সুখের ক্রীড়ায় মত্ত হইতে পারে।

এক্ষণে যে উপায় দ্বারা সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী ক্ষমতা জড়ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরুদ্দীপ্ত হয়, এবং যে উপায় সংসারের সৌন্দর্য্যময় ভাবকে আবার সৌন্দর্য্যময় করিয়া দেয়; যে উপায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রবলতা ও সূক্ষ্মানুভাবকতা সম্পাদন পূর্ব্বক সাংসারিক অভাব সকল বিমোচন করে; যে উপায় হৃদবৃত্তি সকলকে প্রসারিত করিয়া সংসারে শান্তি ও একতা সংস্থাপন পূর্ব্বক, জীবকে স্বাধীন করিয়া সুখের ক্রীড়ায় মুক্ত করিয়া দেয়, সেই উপায় অপেক্ষা মানবের আর উপাদেয় বস্তু কি আছে? কিন্তু এই উপায় কি? আমরা বলি এই উপায় কাব্য। সংসারে শিক্ষা দানের যত কিছু উপায় আছে-কাব্য তাহার সর্ব্ব প্রধান, এবং পূর্ণ-ফল-প্রসবিতা। কিরূপে কাব্যের দ্বারায় এই মহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হয়

আমরা অগ্রে কাব্যের বিষয় বলিয়া পরে তাহার বিষয় বলিব।

সৌন্দর্য্য এবং সত্যই কাব্যের সার। অতএব সৌন্দর্য্য ও সত্য কাহাকে বলে বুঝিতে পারিলে কাব্য বুঝা আর কঠিন নয়। আমরা অগ্রে সৌন্দর্য্য ও সত্য বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

দেখা যায় জগৎস্থ কতক গুলি বস্তু সুন্দর ও কতক গুলি কুৎসিত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সুন্দর ও কুৎসিত বিষয়ক সংস্কারের কারণ কি? আমরা সাধারণতঃ ইহার এই ব্যাখ্যা করিতে পারি, যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত মিলিয়া তন্ময় হইয়া যায়, তাহাই সুন্দর; আর যাহা হইতে অন্তঃকরণ বিতৃষ্ণায় প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাই কুৎসিত।

সৌন্দর্য্য ভাব দুই প্রকার; বস্তুগত ও অবস্থাগত। বস্তুগত সৌন্দর্য্যে বস্তুর বর্ণ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণের সহিত, আমাদের ইন্দ্রিয় সমুহের এমন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, যে উহাদের সংস্পর্শমাত্রেই অন্তঃকরণে এক প্রকার সুখবিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটি গোলাবের গন্ধে আমাদের মন আকৃষ্ট হইয়া সুখানুভব করিতে থাকে, নরকের গন্ধে অঙ্গ শিহরিয়া মন তাহা হইতে প্রতিহত হইয়া পড়িবে। কিন্তু আবার সেই গোলাবের গন্ধে হয়ত একটি নরকস্থ কৃমি সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক নরকের গন্ধে গিয়া সুখে ক্রীড়া করিতে থাকিবে। এখানে গোলাব মানবের পক্ষে সুন্দর। নরক কৃমির পক্ষে সুন্দর। সুতরাং বস্তুর গুণের সহিত জীবের ইন্দ্রিয়গত সম্বন্ধেই বস্তুগত সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি। অবস্থাগত সৌন্দর্য্যের ভাব প্রধানতঃ এই কয়েকটি—সাদৃশ্য, নূতনত্ব, গূঢ়ানুসন্ধান, পূর্ণতা, স্মৃতি-উদ্দীপনা, সমবেদনা-উত্তেজনা, বহু-সমাবেশ ন্যায়-সমাবেশ এবং কল্পনা।

একটি বস্তুর সহিত আর একটির সাদৃশ্য দেখিলে, ঐ বস্তুদ্বয়ের বস্তুগত সৌন্দর্য্য-বিশেষ কিছু না থাকিলেও সাদৃশ্য হেতুক অন্তঃকরণ আকৃষ্ট ও সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সুখোৎপত্তি, বস্তুর সাদৃশ্যমাত্রে, বস্তুর সৌন্দর্য্যে নয়। এই নিমিত্ত আমরা উহাকে বস্তুগত সৌন্দর্য্য না বলিয়া, অবস্থাগত সৌন্দর্য্য বলিলাম। তদ্রূপ যে বস্তুর জ্ঞান আমাদের নাই, তাহা যখন প্রথম আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় তখন বিশেষ সৌন্দর্য্য কিছু না থাকিলেও, নূতনত্ব হেতু আমাদের মনে সুখোৎপত্তি করাইয়া দেয়। এই নূতনত্ব অবস্থাগত সৌন্দর্য্য। গূঢ়ানুসন্ধান এবং পূর্ণতাতেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহার রহস্যোদ্ভেদ সহজে হইয়া যায়, তাহাতে আমোদ কম। যাহার অভ্যন্তরে গূঢ় রহস্য, আকাঙ্ক্ষা অনুসন্ধানের সহিত বহুদূর ধাবিত হইয়া তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অপেক্ষাকৃত আমোদ বেসী। আর যাহার রহস্য এমন গভীর নিহিত, যে বুদ্ধি তাহার মূল খুঁজিয়া পায় না, বহুদূর ধাবিত হইয়া-আপনার আয়ত্তির অতীত দেখে, তখন

চতুর্দ্দিক হইতে গম্ভীর সৌন্দর্য্যের ভাব আসিয়া তাহাকে আপ্লুত করিয়া ফেলে। সেই সৌন্দর্য্য তাহার কাছে চির-নূতন থাকে, ও চির অনুশীলন এবং চির-সুখের বস্তু হইয়া উঠে। সৃষ্টির গূঢ় রহস্য আমরা উদ্ভেদ করিতে পারি না বলিয়াই, সৃষ্টি আমাদের কাছে অক্ষয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ এবং অনন্ত অনুশীলনের বস্তু; সৃষ্টি-কার্য্য আমাদিগের কাছে চির-নূতন এবং চির-সুখের আকর। সেইরূপ সেক্সপিয়রের হ্যাম্‌লেতের প্রকৃতির মূল কোথায় আমরা খুঁজিয়া পাই না, এই নিমিত্ত উহা আমাদের কাছে চির-নূতন, এবং চির-অনুশীলন, ও চির সুখের বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

স্মৃতি-উদ্দীপনাতেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি। একটি বস্তু সামান্যরূপ সুন্দর হইলেও যদি তাহাকে কোন রম্য স্থানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং সেই রম্যস্থান স্মরণে যদি উহাতে কোন প্রিয় সমাগমের কথা মনে আসিয়া পড়ে, এবং সেই প্রিয় সমাগম স্মরণে, যদি তাহাকে সেই প্রিয় জনের প্রেম আলাপন, মধুর সম্ভাষণ, প্রভৃতি ঘটনাবলি পুঞ্জে পুঞ্জে স্মরণে আসিয়া পড়িতে থাকে, তবে যে পরিমাণে সেই বস্তু এইরূপ স্মৃতি উদ্দীপন করিতে থাকে এবং যে পরিমাণে সেই সকল স্মৃতি আমাদের হৃদয়গ্রাহিণী সেই পরিমাণে উহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক দর্শনে রাজা দুষ্মন্তের মনে এইরূপ রমণীয় স্মৃতিপুঞ্জ আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই কণ্মুনির রম্য তপোবন, সেই সখিদল-পরিবৃতা কাননবিহারিণী সরলা শকুন্তলা, সেই প্রেমবিকার, সেই আলাপন, সেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ, সেই লীলা খেলা, অবশেষে সেই প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ কালীন প্রণয় স্মরণার্থ সেই এই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক ইত্যাকার স্মৃতিপুঞ্জ রাজার মনে একেবারে আবির্ভূত। দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত বিস্মৃতির কঠিন অর্গলে তাহার স্বর্গের দ্বার রোধ করিয়া রাখিয়াছিল; অঙ্গুরীয়ক সেই দ্বার খুলিয়া দিল, আবার স্মৃতিপটে সেই সুখধাম। অঙ্গুরীয়ক রাজার পক্ষে কি অমূল্য, কি সুন্দর, কে বলিতে পারে? এই সৌন্দর্য্য ও অমূল্যতা অঙ্গুরীয়কের বস্তুগত সৌন্দর্য্যে নয়, কেবল মাত্র স্মৃতি উদ্দীপনায়।

সমবেদনা উত্তেজনাতেও সৌন্দর্য্যোৎপত্তি হয়। একটি অনাথ শিশু আপনার দুঃখের অবস্থায় বিষণ্ণ বদনে পথপার্শ্বে বসিয়া আছে, তাহার পার্শ্বে একটী সুন্দর ধনীর শিশু প্রফুল্ল চিত্তে নৃত্য করিতেছে। দেখিলে হয়ত আমার মন সেই অনাথ শিশুর বিষণ্ণভাবে আকৃষ্ট হইবে। সে সুন্দর না হইলেও আমি হয়ত তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিব, সে আমার কাছে ধনীর সুন্দর শিশুর অপেক্ষায় যেন সুন্দরতর বোধ হইবে।

বস্তুর বহুসমাবেশেও এক প্রকার লোকাতীত সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক একটী নক্ষত্রের যে সৌন্দর্য্য, অগণ্য-নক্ষত্র-পরিশোভিত আকাশের তদতি-

রিক্ত একটী অতীত সৌন্দর্য্য। এক একটী বৃক্ষের সৌন্দর্য্য হইতে একটী মহারণ্যের সৌন্দর্য্য অধিকতর; এক এক বিন্দু জল হইতে মহাসাগরের সৌন্দর্য্য অধিকতর, এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে বিশাল বিস্তৃত অভ্রভেদী হিমালয়ের সৌন্দর্য্য অধিকতর।

বস্তুর ন্যায্য সমাবেশেও সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা, চিত্রপট, তক্ষণ মূর্ত্তি, আলোকমালা প্রভৃতির যথাযথ সংস্থানে নাট্যশালার শোভা; বৃক্ষাবলি, পল্লব, প্রস্রবণ, আলবাল, পথাবলির সুশ্রেণি সম্বন্ধে ও যথা সংস্থানে বিলাস-উদ্যানের শোভা ইত্যাদি।

আমরা এক্ষণে কল্পনার সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। কল্পনার সৌন্দর্য্য দুই প্রকার; সম্ভব সৌন্দর্য্য এবং অসম্ভব সৌন্দর্য্য। যাহা সৃষ্টি মধ্যে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না, অথচ সৃষ্টির নিয়মানুসারে সম্ভব যাহা আমরা আকাঙ্ক্ষায় মাত্র সাজাইয়া দেখি, তাহাই সম্ভব সৌন্দর্য্য। আর যাহা সৃষ্টি মধ্যে দেখিতে পাই না, সৃষ্টির নিয়মানুসারে সম্ভবও নয়, আকাঙ্ক্ষারও যাহার সহিত সংস্রব নাই, তাহাই অসম্ভব সৌন্দর্য্য। বাল্মীকির সীতা, সেক্‌সপিয়রের ডেসডিমনা ও লিয়র এবং পুরাণের হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি সম্ভব সৌন্দর্য্য। আমরা দুর্দ্দশা, বিচ্ছেদ, প্রলোভন, উৎপীড়ন, অপবাদ, এবং প্রাণনাশেও প্রণয়কে পবিত্র ও অটল দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি; কিন্তু সৃষ্টিমধ্যে যদিও এই সকল বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রণয় সচরাচর দেখিতে পাইনা, তথাপি সৃষ্টি মধ্যে উহা সম্ভবও হইতে পারে। বাল্মিকী সীতায়, এবং সেকস্‌পিয়র ডেসডিমোনায় সেই আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তি রচনা করিলেন। মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগী হওয়া আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু সৃষ্টি মধ্যে তাহার সচরাচর উদাহরণ দেখিতে পাই না, সেক্‌সপিয়র লিয়রে ও পুরাণ হরিশ্চন্দ্রে সেই আকাঙ্ক্ষিত গুণ বিদ্যমান দেখাইয়াছেন।

দেবতা, অপ্‌সরা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, প্রভৃতি ভারতীয় কবিকল্পনা ও হোমরের কালিপ্‌স, সেকসপিয়রের এরিয়েল, প্রভৃতি এসমস্ত অসম্ভব সৌন্দর্য্য—অর্থাৎ ইহারা সৃষ্টির অতীত সৃষ্টি কিন্তু ইহারা সৃষ্টির অতীত সৃষ্টি হইলেও সৃষ্টি ছাড়া কিছুই নয়; যে হেতু সৃষ্টিছাড়া আমাদিগের কিছুরই জ্ঞান নাই; সৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি বা অনুভব করিয়াছি, তাহাতেই আমাদের জ্ঞানের সীমা, এবং সেই জ্ঞানের অতীত কল্পনারও কিছু রচনা করিবার সাধ্য নাই। জন্মান্ধ ব্যক্তি কখন বর্ণের কল্পনা করিতে পারে না, আজন্ম বধিরও কখন স্বরের ভাব অনুভব করিতে পারে না। আমাদিগের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বস্তু লইয়াই কল্পনা ভাঙচুর করিয়া অন্য মূর্ত্তি সকল রচনা করে, কিন্তু তাহার উপাদান সমস্তই সৃষ্টির। যেমন স্থির স্বচ্ছ জলের প্রতিবিম্ব সকল, জলের চাঞ্চল্যে বিচ্ছিন্নাঙ্গ হইয়া, পরস্পরের সহিত মিলিয়া নূতন

অদ্ভুত মূর্ত্তি সকল দেখায় যাহা আর পূর্ব্ব ছায়ার প্রতিরূপ বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু জল স্থির হইলে আপন আপন অঙ্গ আবার যেমন আপন আপন অঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ তদ্রূপ অসম্ভব কল্পনা সকল, সৃষ্টির উপাদান হইতে রচিত হইলেও উহা এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি; কিন্তু বিচ্ছিন্ন করিলে সৃষ্টি-বহির্ভূত কিছুই হইবে না।

যত প্রকার সৌন্দর্য্যের কথা বলা হইল তাহার মধ্যে এই অসম্ভব সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যে হেতু ইহাতে অন্তঃকরণের আকর্ষক ও মুগ্ধকরী ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং উহাতে আমাদিগকে ইহলোক হইতে লইয়া গিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট কোন লোকে বিচরণ করায়। এই অসম্ভব সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদিগের আকাঙ্ক্ষার কোন সংস্রব থাকে না। এই সৌন্দর্য্য রচিত হইলে তবে উহাতে আমাদিগের মন প্রথমতঃ চমকিত, পরে আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট ও তদ্‌পরে আকৃষ্ট হয়।

সত্যের সম্বন্ধে আমরা এই বলি, যাহা বাহ্য জগতে ও মানব অন্তরে নিয়ত ঘটিতেছে, সেই ঘটনাবলিই স্বতঃসিদ্ধ ও সত্য। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর সৌন্দর্য্যের আরোপ হইলে কাব্য রচিত হয়। এই সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে যে পরি-মাণে সত্য বিমিশ্র ভাবে থাকিতে পারে, সেই পরিমাণে কাব্য উপভোগ ও অনু-শীলনের বস্তু হয়, এবং সেই পরিমাণে কাব্যের উৎকৃষ্টতা। যেহেতু যে পরি-মাণে সত্যের মূল কাব্যের গূঢ়-অভ্যন্তরস্থ, সেই পরিমাণে উহা অনুশীলনের বস্তু: আবার যে পরিমাণে সত্য অভ্যন্তরস্থ, সেই পরিমাণে সৌন্দর্য্য বহির্ব্যক্ত; সুতরাং সেই পরিমাণে উহা উপভোগের বস্তু।

এক্ষণে আর একটি কথা;—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কাব্য সাধারণকে অনুকরণ কলা সংজ্ঞা দিয়াছেন; তাঁহারা দেখিতে পান, চিত্র তক্ষণ কবিতা প্রভৃতি সকলি সৃষ্টির অনুকরণেই রচিত হইয়া থাকে; এবং যে পরিমাণে উহা সৃষ্টির যথাযথ অনুকরণ, সেই পরিমাণেই উহার উৎকর্ষ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা কাব্য সাধারণকে অনুকরণ সংজ্ঞা দিতে প্রস্তুত নই, বরং প্রতিকরণ সংজ্ঞা দিতে প্রস্তুত আছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কল্পনা সৃষ্টি উপাদান সমস্ত লইয়া মূর্ত্তি রচনা করিলেও উহা স্বতন্ত্র সৃষ্টি। যে সত্যের ভিত্তি উপর সৃষ্টির সৌন্দর্য্য আরোপিত; সে সত্যের ভিত্তির উপর অপরদিকে কাব্যে সৌন্দর্য্য আরোপিত। সৃষ্টির সৌন্দ মূর্ত্তির সহিত কাব্যের সৌন্দর্য্য মূ সম্যক্ প্রভেদ; এক দিকে সৃষ্টি জ অপর দিকে কাব্য জগৎ। একই স ক্ষেত্রে দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার; কা সহিত কাহারও সাদৃশ্য নাই, অথচ উভ উভয়ের পার্শ্বে সমতুল্য ব্যাপার।

অনেক সময় সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের অ সৌন্দর্য্য রচিত হয় বটে, কিন্তু

অনুকরণের উদ্দেশে নয়, সাদৃশ্য জনিত সৌন্দর্য্য সৃষ্টির নিমিত্ত। অনুকরণ দ্বারা কখন কাব্য হইতে পারে না। সৃষ্টি যেমন এক সৃষ্টি, কাব্য তেমনি স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

এক্ষণে সহজে বুঝা যাইতে পারে কাব্য রচনার সার ও কৌশল কি। এককালে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত বিষয়ের সমাবেশ ভিন্ন উৎকৃষ্ট কাব্য হয় না। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে কাব্যের সার সত্য, এবং সৌন্দর্য্য। বিদ্যমান ঘটনাবলির যে সত্য, তাহাই কাব্যিক; এই নিমিত্ত তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির নিয়মাদি ও মতামতের যে সত্য, তাহা কাব্যিক না হওয়ায়, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। সৌন্দর্য্যের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অপর বহুবিধ প্রকারেও সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারাই বোধ হয় সৌন্দর্য্যের উৎপত্তির ভাব সাধারণতঃ একরূপ বুঝা যাইবে। সৌন্দর্য্যের বিশেষ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারাতেই, ক্ষুদ্র কবিগণ, সংসারের যত কিছু চাক্‌চিক্য উজ্জ্বল গুণবিশিষ্ট, তাহাই একাধারে পূরিতে থাকেন, এবং তাহাদের আবার প্রকৃত সমাবেশ অভাবে, আমাদের মন তাহাতে প্রবেশের পথ পায় না, এবং ঔজ্জ্বল্যের ছটায় চক্ষু প্রতিহত হইয়া পড়ে! প্রকৃত প্রতিভাশালী কবিরাই সৌন্দর্য্যের মূল তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন, এবং তাহাদের প্রকৃত সমাবেশ কিরূপে করিতে হয়, তাহাও তাঁহাদের যেন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হয়; কিন্তু সাধারণ পাঠকবর্গ তাঁহাদের সৌন্দর্য্য রচনার প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে না জানাতেই ক্ষুদ্রকবিদিগের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়া, কাব্য মধ্যে কেবল উজ্জ্বল চাকচিক্য গুণেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। আমরা এক্ষণে কাব্যের সার এবং মৌলিক বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম। কিরূপে, এবং কি কৌশলে, এই সত্য এবং সৌন্দর্য্যের সমাবেশে কাব্য গঠিত হয়, আমরা ক্রমে তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# এই কি ভারত?

(১)

এই কি ভারত? যাহার সমান
রূপে গুণে কেহ ছিলনা সংসারে;
ক্ষেত্র যার সদা স্বর্ণ করে দান,
অর্ণবে যাহার মুকুতা বিচরে।

(২)

যার ধনে ধনী, ভিন্ন জাতিগণ,
অন্নাভাবে কাঁদে তাহারি সন্তান!
ফিরে দ্বারে দ্বারে জীবিকা কারণ
সঁপিছে স্বদেহ অরাতির করে।

(৩)

সপ্তশত বর্ষ থাকিয়া অধীন,
হইয়াছে সবে, বলবীর্য্যহীন,
মহাকষ্টে এবে যপিতেছে দিন,
হায় রে এ দুখে পাষাণ বিদরে!

(৪)

সকলি গিয়াছে কিছু নাই আর,
ভারত-আনন, হয়েছে আঁধার,
জননীর দুঃখ, অকূল, অপার,
ভাসে বক্ষঃস্থল, সদা চক্ষুজলে।

(৫)

এক কালে মাতঃ! পাটরাণী ছিলে,
সভ্যতা-সোপানে আগেই উঠিলে,
জ্ঞানালোকে দীপ্ত, তব পুত্রগণ,
বাড়ালে গৌরব, তোমার যখন,
অসভ্যতা-ক্রোড়ে করিয়া শয়ন
ছিল গ্রীস, রোম, পাশ্চাত্য-রতন,
তব তুল্য মাতঃ! ছিলনা ভূতলে।

(৬)

বাল্মীকি, যখন বীণা লয়ে করে
গেয়ে রামায়ণ মধুমাখা স্বরে
ঢালিল অমিয় শ্রবণ বিবরে;
দেখিনি আলোক অন্ধ কবিবর।

(৭)

রণসজ্জা করি রাঘব যখন,
কাঁপাইয়ে দর্পে ত্রিবিধ ভুবন,
দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে করিতে শাসন,
সসৈন্যে লঙ্ঘিলা দুস্তর সাগর।

(৮)

হেলেনা রূপসী, ছিল কোথা তবে,
ফাটেনি মেদিনী, একিলির রবে,
বিভীষণ-তীক্ষ্ণ মন্ত্রণা কৌশলে,
মরিল রাক্ষস যবে দলে দলে
বিজ্ঞ ইউলিস্ ছিলনা জগতে।

(৯)

দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, ভীষ্ম বীরবর,
অর্জ্জুন, সাত্যকি, সুভদ্রা-কুমার,
লইল জনম, তোমার উদরে,
বীরপ্রসূ, তুমি, বহুদিন ধ'রে;
কোথা ছিল কে মা শ্রেষ্ঠ তোমা হ'তে?

(১০)

ছিন্ন হ'ল যবে একতা বন্ধন,
পরস্পর সবে ক'রে মহারণ,
গেল যমপুরে যত বীরগণ,
নিঃসহায়া করি ছাড়িয়া তোমারে।

(১১)

সে হতে তোমার ঘটেছে যাতনা,
পরিপূর্ণ হ'ল যবন-বাসনা,
বিপুল ঐশ্বর্য্য হেরিয়া তোমার,
পেয়ে অনাথিনী, করিল সংহার,
সব শোভা তব, দস্যু আর চোরে।

(১২)

দৈব প্রতিকূল হইল এখন,
দাসী করি তোমা রাখিল যবন,
ঘোর অত্যাচারে হয়ে ম্রিয়মাণ,
প্রসব করিছ নির্জীব সন্তান,
দাসীপুত্র, বীর কেমনে সম্ভবে?

(১৩)

রতন-প্রসূতি, কেন মা! হইলে?
মুকুতার হার কেন গলে দিলে?
তা না হলে কি মা দস্যু দলে দলে
অবিরত ক্লেশ দেয় আমা সবে!

(১৪)

অথবা যে দিন হলে বীরহীন
কেন না বৈভব হল শূন্যে লীন?
মরুভূমি সম ফল-জলহীন
কেন না হইলে সাহারা মতন।

(১৫)

লোভী যবনেরা আসিত না হেথা;
পাইতে হ'ত না মরমেতে ব্যথা;
করিতে হ'ত না এ ঘোর দাসতা;
হারাতে না কভু স্বাধীনতা ধন।

(১৬)

ভাগ্য ব'লে মান তব অধীশ্বর—
সুসভ্য ইংরাজ হয়েছ এখন;
ঘুচিয়া গিয়াছে প্রায় অত্যাচার
কোনমতে দিন হতেছে যাপন।

(১৭)

ভারত-সন্তান! ঘুমায়োনা আর;
চক্ষু মেলি দেখ দুর্দ্দশা, মাতার,
আর সর্ব্বদেশ, প্রফুল্ল আননে
করিছে গমন আনন্দিত মনে,
মোদের জননী পুত্র ক্রোড়ে করি,
নেত্র জলে ভাসে দিবস সর্ব্বরী।

(১৮)

অমা-অন্ধকার —ম্লেচ্ছ-অত্যাচার,
গিয়াছে চলিয়া; পূর্ণ শশধর—
ইংরাজ-রাজত্ব, হয়েছে উদয়
ভারত-গগনে; দিতেছে অভয়।
এখন ঘুমান উচিত কি হয়?
কর দৃঢ় পন, করিতে উদ্ধার,
আর্য্য-জাতি-যশঃ, অবনীভিতর।

(১৯)

পরস্পরে বাদ দিয়ে বিসর্জ্জন,
দৃঢ় করি বাঁধ একতা বন্ধন,
একতা বিহনে হবে না কখন—
জননীর এই দুর্দ্দশা মোচন।

(২০)

শিখ রে বিজ্ঞান করিয়া যতন;
পাশ্চাত্য উন্নতি, ইহারি কারণ;
বিজ্ঞানের বলে কলে গাড়ী চলে,
অদ্ভুত ঘটায় জীবনে অনলে;
সৈন্য-শিক্ষা, গড়, কামান, বন্দুক,
স্মরিলে এ সব ফেটে যায় বুক,
পশ্চিম, বিজয়ী, এসিয়া উপরে
শুদ্ধ মাত্র এই বিজ্ঞানের তরে;
তাই বলি;—সবে কর উপার্জ্জন
মন দিয়া সেই বিজ্ঞান-রতন।

(২১)

* * * *

আনন্দেতে মেতে কাব্য রসপানে,
যদি কাটাইবে ভেবেছ জীবনে,
কেন যাও তবে ভিন্নজাতি স্থানে,
নাহি কি সুকাব্য ভারত-ভবনে?
কবি কালিদাস, ব্যাস তপোধন,
শ্রীহর্ষ, বাল্মীকি ভারত-ভূষণ,
কোথা বল কবি এদের মতন?

(২২)

* * * *

দাস্যবৃত্তি ছাড়ি, বাণিজ্য কারণ
অর্ণবযানেতে কর রে ভ্রমণ;
হরিপ্রিয়া-প্রিয়, বাণিজ্য-আসন,
নির্ধন ধনাঢ্য কমলার বরে।

(২৩)

দারিদ্র্য যন্ত্রণা, সব দূরে যাবে,
ভিন্ন জাতি লাগি সহিতে না হবে,
চলিতে পারিবে আপন গরবে,
ধনিগণ, মান্য, পৃথিবী-ভিতরে।

(২৪)

প্রসিদ্ধ কার্থেজ অতি পূর্ব্বকালে
লভিল প্রাধান্য, বাণিজ্যের বলে,
মহাপরাক্রম, বীর্য্যবন্ত রোম,
ডরিত যাহারে স্থাবর, জঙ্গম,
বীর অগ্রগণ্য, যুদ্ধে যেন যম,
একেও কার্থেজ (ইটালী সহিত)
করেছিল ভয়ে সঘনে কম্পিত।
থাকিলে একতা আপনার ঘরে
রোম হস্তে কিরে কারথেজ মরে!
পেলে গৃহবল, বীর হানিবল,
সর্ব্বজয়ী রোমে দিত রসাতল।

(২৫)

শুন নি কি কভু ফিনিস বাণিজ্য,
ব্যবসায়ে যার বেড়েছিল বীর্য্য,
আরো পুরাকালে কে তার সমান,
ভূমণ্ডলে ছিল বল ধনবান্?

(২৬)

একে ওকে কেন? দেখ নেত্র মেলি,
সম্মুখে ইংরাজ হয়ে কুতূহলী,
চলিছে আনন্দে প্রবল প্রতাপে,
পদভরে তার বসুন্ধরা কাঁপে,
মহাগর্ব্বে গর্ব্বী উর্দ্ধেতে নয়ন,
ধরা দেখে তারা সরার মতন,
এত অহঙ্কার জান কি কারণ?

(২৭)

বন্য পশুসম বনের ভিতর
আম-মাংসে যারা পূরিত উদর,
শিখিয়া সভ্যতা, রোমানের স্থানে,
বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া যতনে,
হইয়াছে তারা, ধরণী ঈশ্বর,
কে আছে জগতে এদের সোসর?

(২৮)

ইংরাজী নকল করিছ সকলি,
হ্যাট্, প্যাণ্টালুন, ইংরাজের বুলি,
ইংরাজী পাদুকা, কর পরিধান,
ইংরাজী আসব, কর নিত্য পান,
ইংরাজী বাণিজ্য তবে কি কারণ
শিখিতে সকলে করনা যতন!

(২৯)

ধিক্ সে নকলে! যদি সে নকল,
সাধিতে নারিল কিছুই মঙ্গল,
ভারত-মাতার,—হলনা উজ্জল বদন,
উঠরে এখনো দেখরে চাহিয়া,
মাতৃ-অপমানে উঠরে জাগিয়া,
অধীনতা পাশে হেরিয়া বন্ধন।
সব শত্রু মিলি করিছে লুণ্ঠন,
যাহা কিছু ছিল ভারত মাতার;
কাঁদিছে জননী করি হাহাকার!
হলনা চেতন, এত আর্ত্তরবে!

(৩০)

কেন ওরে ভীরু কেন ভয় পাও!
বিঘ্নরাশি হেরি কেনরে ডরাও!
সুস্থির সংকল্প, দৃঢ়তা সহিত,
চলরে সকলে হইয়া মিলিত;
রাজবর্ত্ম সম হবে পরিষ্কার
তোমাদের পথ অপায় সংহার
হইবে সমস্ত; মহোৎসাহ' বলে।
উঠিবে সহজে উন্নতি অচলে।

(৩১)

দৃঢ়তার বলে ভার্গব প্রবীর,
একাকী, শুষিল ক্ষত্রিয়-রুধির;
চাণক্য পণ্ডিত, ইহারই বলে
মহানন্দ বংশ ধ্বংসিল কৌশলে;
বিংশতি কোটি ভারত সন্তান,
হও যদি সবে এক মনঃ প্রাণ,
হইবে দুর্দ্ধর্ষ, অবনি-ভিতর,
মানবে কি কথা দেবতার ডর।

(৩৩)

ঘৃণা, দ্বেষভাব, করি সবে হত,
সর্ব্বজাতি মিলে হও একমত।
পূজা করি যদি যবন-চরণ,
কিছুমাত্র মন নহে উচাটন,
হীনবর্ণে তবে হেরে সমভাবে,
কিবা অপমান তোমাদের হবে।
ম্লেচ্ছ পদধূলি মেখে সর্ব্বগায়,
অত বড় মান ভাল না দেখায়;
একতা-বন্ধনে মিলিয়া সকলে,
জাতিভেদ নিয়ে ফেল গঙ্গাজলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র আর
ভারত-মঙ্গলে হওরে তৎপর।

* * * *

(৩৪)

রে ভারতবাসি! তোদিগে জিজ্ঞাসি,
এই কি তোদের প্রমোদ-সময়?
চৌদিকে বিপদ্ হেরে রাশি রাশি,
তবু অচেতন প্রমাদে নিদ্রায়!

(৩৫)

করনি কি কভু পুরাণে শ্রবণ?
বৃত্রাসুর, যবে পরাজিয়া রণে
অমরেশ বীর্য্য, করিয়া ধ্বংসন
করেছিল বন্দী, সুরপত্নীগণে।

(৩৬)

খুলেনি তাহারা, কবরী-বন্ধন,
বাষ্পবারি, সদা ঝরিত নয়নে,
পরিধানে ছিল মলিন-বসন,
যত দিন ইন্দ্র, দলিয়া চরণে
দানব-নিচয়, পরালে আবার
দিব্যাঙ্গনা-গলে স্বাধীনতা-হার।

(৩৭)

সেরূপে সকলে হয়ে এক মন,
ঢাকিয়া বদন, দুঃখ আবরণে,
আপন দুর্দ্দশা, কর রে চিন্তন,
যতদিন পুনঃ ভারত গগণে———

# বেদাভ্যাস।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি এই চারি যুগেই যে প্রত্যেক গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজাতি বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন পূর্ব্বক তদনুসারী মন্ত্র, অনুষ্ঠান, গান, ও প্রয়োগ করিতে সমর্থ ইহা কদাচ মনে করা যায় না। যুগে যুগে মনুষ্যের পরমায়ুর অল্পতা বশতঃ মহর্ষিগণ প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম চর্চ্চার উপায়, মনুষ্যের শক্তি অনুসারে সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদিগের পাঠকগণকে অদ্য তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অধুনা অনেকেই কহিয়া থাকেন যে বেদচর্চ্চা একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কেন যে বিলুপ্ত হইতেছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ বিষয়ে কেহ কেহ এই প্রবাদ বাক্য অবতারণা করেন, যে বোপদেব গোস্বামী মহোদয় জন্ম পরিগ্রহ করিলেই ব্যাকরণ চর্চ্চার লোপ হয়; জীমূতবাহন প্রভৃতি কলির সেনানীগণের আবির্ভাবেই নিত্য-স্বরূপ স্মৃতিশাস্ত্রের বিনাশ হয়। গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিভটগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে ন্যায় ও মীমাংসাদি দর্শন শাস্ত্রের বিধ্বংস হয়। কুবিন্দ কবির রচিত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইলে পুরাণ সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। যথা—

"জাতে ব্যাকরণং হতং প্রথমতঃ শ্রীবোপদেবে কবৌ।
জীমূতপ্রভৃতৌ কলৌ কলিভটে নষ্টা স্মৃতিঃ শাশ্বতী।
গঙ্গেশপ্রভৃতৌ প্রলুপ্তমপি তন্ন্যায়াদি শাস্ত্রং পরম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে কুবিন্দকবিনা খ্যাতে পুরাণং হতম্॥" * (১)

(১) * বোপদেব—ইনি অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবি-কল্পদ্রুম, কাব্য কামধেনু ও স্মৃতি (যাহা হেমাদ্রি-স্মৃতিসংগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ) এতৎ সমুদায়ই সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া আসিতেছে। বোপদেব গোস্বামী বিদ্বদ্ধনেশ্বর নামক মহামহোপাধ্যায়ের ছাত্র। ইহাঁর পিতার নাম কেশব। বোপদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ, গোস্বামী উপাধি। কেশব গোস্বামী চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ভিষক্ কেশব হয়। তিনি ঐ নামে এরূপ বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে তাঁহার গোস্বামী উপাধি টুকু বোপদেব গোস্বামী মহাশয় সংযোগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন নাই।

জীমূত—জীমূতবাহন। ইনি কামরূপের রাজা। দায়ভাগ নামক স্মৃতিসংগ্রহ গ্রন্থের কর্ত্তা বিশ্বরূপাদির সমকালীন লোক।

গঙ্গেশ—প্রায় পাঁচ শত বৎসর গত

তৎপরে দেবীবরাদির আবির্ভাবেই কুলশীল,ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি নষ্ট হইয়াগিয়াছে। এরূপ প্রবাদও চলিত আছে যথা।——

বাসুদেবের তিন শিষ্য চৈয়ে রঘো কাণা ( ই )।

নিদের লোকে এদের নামে জ্বলে মরে যায় ॥ ( ২ ) *

চৈয়ে বেটা বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটা বুদ্ধি ঘাটে কার ধাম ॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষাধর যারে করে সাথ ।।
তিন বেটা তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত ॥
শচীছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।
পিতা মাতা দ্বারা ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়।
সেই বেটার সঙ্গেতে আরো দুটো যুবো আছে। নিতে দ্বিজদ্বয় বলে শুভো শুভো ।। ( ৩ )

---

হইল ইনি মিথিলা দেশে আবির্ভূত হন। ইহাঁর কৃত তত্ত্বচিন্তামণি প্রকাশিত হইলে গৌতম দর্শন চর্চ্চা একেবারে রহিত হয়। তত্ত্বচিন্তামণি চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যক্ষ খণ্ড,অনুমান খণ্ড, উপমান খণ্ড ও শব্দ খণ্ড। গঙ্গেশকে গঙ্গেশোপাধ্যায় বলা যায়।

কুবিন্দ কবি—কোন ব্যক্তির মতে ভাগবত পুরাণ বোপদেব কবি কৃত। কোন ব্যক্তির মতে জুমর নন্দী ( কুবিন্দ নামক ) কবি কৃত। এই নন্দী উপাধি দেখিয়া কেহ কেহ সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ-কারকে তাঁতি কহেন। তাঁতির মধ্যে যেমন নন্দী উপাধি আছে, তেমনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণে বেদগর্ভ-সন্তানের বার জনের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি নন্দীগ্রামী, তদনুসারে তাঁহার বংশীয়েরা নন্দী উপাধিতে খ্যাত। ইতি পূর্ব্বে কেহ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের কৃত ব্যাকরণাদি পাঠ করেন নাই। বিশেষতঃ তৎকালে শূদ্রের সংস্কৃতে অধিকার ছিল না।

* (২) চৈয়ে—চৈতন্যদেব। যাঁহাকে লোকে গৌরাঙ্গ বা নিমাই বলে।

রঘো—রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য। ইনি বন্দ্যবংশের সাগরের দ্বিতীয় পুত্র হরিহর বন্দ্য ঘটীর পুত্র। ইহাঁর কৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামক স্মৃতিসংগ্রহ বঙ্গদেশে বিশেষ মান্য ও মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতির ন্যায় প্রচলিত।

কাণা—রঘুনাথ শিরোমণি। ইহাঁকে লোকে কাণা ভট্ট শিরোমণিও বলে। ইহাঁর কৃত দীধিতি গ্রন্থ প্রচার হইলে প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের আদর অল্প হইয়াছিল।

(৩) অদে—অদ্বৈত গোস্বামী, নৃসিংহ লাড়ুলীর পুত্র। শান্তিপুরে ইহাঁর বংশ আছে। বৈষ্ণবদিগের নিকট অদ্বৈত গোস্বামী ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি।

নিতে—নিত্যানন্দ—সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরীর পৌত্র, হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র। রাঢ়দেশে

এই কালে রাড়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম।
বড় বড় বংশ সব হইল নির্ধূম॥
কিছু পরে শঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর যারে লোকে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে পড়ে কুল করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥

ছত্রিশের ভাগ যেন ছত্রিশের জাতি।
কেহ কাহারো নিকট নাহি পায় ভাতি॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞানকুলীনপুত্র কুলে হয় সার॥
দেবীবর যাহা বলে লিখে যাই তাই।
মেলমালা বলি লোকে পাবে পরিচয়॥"

দোষমালাগ্রন্থ।

নিত্যানন্দের দুই পুত্র গঙ্গা আর বিরু।
মাধব গঙ্গার পতি সর্ব্বশাস্ত্র-গুরু।
যে কালে বিরুর কন্যা পারুলায় যায়।
সেই বেলা লোকে দেখে দেবীর উদয়॥
বন্দ্যবংশে অংশে তার হৈল আবির্ভাব।
শঙ্কেত বাঁড়ুরী মূল অতিপ্রাদুর্ভাব॥
শঙ্কেত দুর্ব্বলীতনয় লোকে পরিচয়।

---

একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের বাস ছিল। নিত্যানন্দের জননীর নাম পদ্মাবতী। খড়দা গ্রামে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের বংশ আছে। জিরেট গ্রামে নিত্যানন্দ-কন্যা গঙ্গার বংশ দেখা যায়। তাহারা গঙ্গাবংশ বলিয়াই খ্যাত। নিত্যানন্দও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী ব্যক্তিদিগের নিকট ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির একতম। সুতরাং ঈশ্বর হইতে অভিন্ন।

তারি মধ্যে শুন পঞ্চমে দেবী মহাশয়॥"

কুলচন্দ্রিকা।

সামবেদের বাহুল্য চর্চ্চা।

আমরা যে দিগেই যাই সর্ব্বদিগেই সামবেদের বাহুল্য চর্চ্চা দেখিতে পাই। কেন এই বেদের আলোচনার আধিক্য দেখা যায় তাহার পরিস্ফুট কারণ নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে সামগ ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যতদূর সুস্থির হইতে পারি তাহাই প্রদর্শিত হইল। ইহাঁরা কহেন দ্বাপর যুগে ভগবান্ মনুষ্যের আয়ুষ্কালের অল্পতা, বুদ্ধির অল্পতা, মেধাশক্তির হীনতা ও সৎকার্য্য-প্রবৃত্তির হ্রাস দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। পরে তাঁহাদিগের নিস্তারের জন্য ভগবান্ নারায়ণ পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে অংশে অবতীর্ণ হইলেন। তৎকালে ঐ ভগবানের নাম কৃষ্ণ হইল। পরে দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হয়।

তৎপরে তিনি একদিন সরস্বতীর জলস্পর্শ করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্য চক্ষে নরগণের হীনাবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয় হন। তৎপরে বিবেচনা করিলেন শাস্ত্রচর্চ্চার সুশৃঙ্খলা না করিতে পারিলে নরগণের নরক নিস্তার, দুর্মেধার পরিহার ও আস্তিক্য বুদ্ধির সুস্থিতি হইতে পারে না। তদনুসারে তিনি চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পরম মেধাবী চারি শিষ্যকে প্রদান করেন।

তাঁহারা আবার আপন আপন অধীত বেদকে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিয়া শিষ্য প্রশিষ্যগণকে অধ্যাপনা করেন। তদনুসারে বেদচতুষ্টয় শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়।

এই সময়েই সত্যবতীতনয় কৃষ্ণের নাম বেদব্যাস হয়। তদবধি তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্ বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। ইনি বেদ বিভাগ করিয়া যে চারি মহর্ষিকে এক এক ভাগ প্রদান করিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাকে ঋক্‌বেদ অভ্যাস করান তাঁহার নাম মহর্ষি পৈল। দ্বিতীয়ের বিশেষ নাম বৈশম্পায়ন। ইনি যজুর্ব্বেদ অভ্যাস করান। যিনি ছন্দোগ সংহিতা সমেত সামবেদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম জৈমিনি কবি। মহর্ষি সুমন্তই চতুর্থ শিষ্য। তিনি অঙ্গিরা-প্রণীত অথর্ব্ব বেদ ভাগ প্রাপ্ত হন। * (৪)

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে উদীচ্য ও প্রাচ্যগণের মধ্যে সামগ জৈমিনি মহর্ষির শিষ্যই অধিক। ইহাঁরই শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা

(৪) *দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃপরাশরাদ্যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ॥ ১৬

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচি।
বিবিক্ত একআসীন উদিতে রবিমণ্ডলে॥ ১৬

পরাবরজ্ঞঃ সঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্ম্মব্যতিকরম্ প্রাপ্তম্ ভুবি যুগে যুগে॥ ১৭

ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাম্ শক্তিহ্রাসঞ্চ তৎকৃতম্।
অশ্রদ্ধধানান্নিঃসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ হ্রসিতায়ুষান্॥ ১৮

দুর্ভাগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমানাং যৎ দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্॥ ১৯

চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাম্ বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যাদধাৎ যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদ একং চতুর্বিধম্॥ ২০

ঋক্‌যজুঃসামথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে॥ ২১

তত্রর্গ্‌বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত॥ ২২

অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে লোমহর্ষণঃ॥ ২৩

তে এতে ঋষয়ো বেদম্ স্বংস্বং ব্যস্যন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃপ্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈ বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্॥ ২৪

তে এব বেদা দুর্ম্মেধৈ ধার্য্যন্তে পুরুষৈ র্যথা।
এবঞ্চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥২৫

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্ ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয়এব ভবেদিহ॥ ২৬

ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম।
শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ প্রথমস্কন্ধ ৪ র্থ অধ্যায়।

উত্তর ও পূর্ব্ব দেশে সামবেদ চর্চ্চার বাহুল্য হয়।

মহর্ষি মনু মহোদয় নিম্নলিখিত স্থান কয়েটী দ্বিজাতিদিগের বাসস্থল-যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চালাদি দেশ (কান্যকুব্জাদিদেশ), মধ্য দেশ অর্থাৎ উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে প্রয়াগ ও পশ্চিমে সরস্বতী এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম মধ্য দেশ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

---

# চট্টগ্রাম।

## (প্রাকৃতিক বিবরণ।)

বঙ্গদেশীয় রাজকর্ম্মচারীগণের ভীতিস্থল, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বর ও বাঙ্গাল মাঝিদের দুর্গম জঘন্য স্থল বলিয়া অনেকে চট্টগ্রামকে জানেন। কিন্তু যিনি একবার উহার সুদৃশ্য দৃশ্যাদি দর্শন করিয়াছেন, উহার উপকূলে ভ্রমণ করিয়া সমুদ্র ও পর্ব্বতের শোভা দেখিয়াছেন, যিনি পার্ব্বতীয় বনে প্রবেশ করিয়া বনজ বৃক্ষাদি ও বনের পশ্বাদির শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন, যিনি সমতল হরিৎ ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন অথবা দেশীয়গণের সহিত কথঞ্চিৎ মিশ্রিত হইয়াছেন তিনি জানেন ঐ দেশের নানা অপবাদ প্রকৃত হইলেও উহা ধন ধান্য, প্রাকৃতিক শোভা, বুদ্ধি ও মিতব্যয়িতার আধার।

ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমায় চট্টগ্রাম প্রদেশ সংস্থিত। ইহা সমুদ্রকূলস্থ সঙ্কীর্ণ স্থল। জম্বুদ্বীপের ন্যায় ইহাকেও ত্রিকোণ বলা যায়। ভারবর্ষের পূর্ব্বভাগে স্বাভাবিক সীমা যে পার্ব্বতীয় প্রদেশ, যাহা দ্বারা ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের প্রভেদ হইয়াছে, তাহার পশ্চিমে এবং বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে এই প্রদেশ অবস্থিত। উত্তরে ত্রিপুরা এবং মণিপুর। পূর্ব্বদিকে যে পার্ব্বতীয় প্রদেশ আছে তাহা হিমালয়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে আরব্ধ হইয়া আরাকান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিমে যে অতি সঙ্কীর্ণ বোধ হয় তাহা ৭।৮ দিবসের পথ হইবেক। এই পর্ব্বতগুলি অত্যুচ্চ বা সুন্দর প্রস্তরময় নহে; কিন্তু দুর্গম-নিবিড়-অরণ্য-ময় ও বহুবিধ বর্ব্বর জাতির বাস বলিয়া এক প্রকার প্রসিদ্ধ।

উত্তরে হিমালয় হইতে যে টুকু বিচ্ছেদ আছে, তাহারই মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয় বেষ্টন পূর্ব্বক বঙ্গোপসাগরাভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। উক্ত পার্ব্বতীয়

প্রদেশের পূর্ব্ব দিয়া ঐরাবতী নদী ভারত মহাসাগরে সম্মিলিত হইয়াছে। উহার উভয় কূলে ব্রহ্মদেশ বা মগের মুল্লুক। ঐ পার্ব্বতীয় প্রদেশের এক ভাগ বঙ্গোপসাগর সংস্পর্শ করিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাগে বক্রগতি হইয়াছে। যেখানে সাগর পর্ব্বত-সঙ্গম হইয়াছে, সেইখানে চট্টগ্রাম ও ভারতবর্ষ আরাকান হইতে বিযুক্ত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণেও মগের মুল্লুক। অতএব বঙ্গোপসাগর ও পার্ব্বতীয় প্রদেশে যে ত্রিকোণ স্থান হইয়াছে, তাহাই চট্টগ্রাম। উহার উত্তরে ফেণী নামক ক্ষুদ্র নদী ভারতবর্ষ হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। জলপথ ভিন্ন চট্টগ্রামে যাওয়া যায় না। হয় পদ্মা মেঘনা ও সুন্দর বন দিয়া ১০।১৫ দিন নৌ-যাত্রায়, নয় অকূল সাগর দিয়া দুই দিবসে বাষ্পীয় যানে চট্টগ্রামে যাইতে হয়। উভয় পথই বাঙ্গালীর কাছে দুর্গম।

চট্টগ্রামে মনুষ্যের কীর্ত্তি অপেক্ষা প্রকৃতির কীর্ত্তি অধিক। পশ্চিমে সফেন সুনীল সমুদ্র সুশোভিত রহিয়াছে। যে স্থলে দাঁড়াও প্রায় চতুর্দ্দিকে মেঘাকার এবং কোন কোন স্থলে হরিৎ-অরণ্যাচ্ছাদিত পর্ব্বত দেখা যায়। উপরোক্ত বিস্তীর্ণ পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে একটী সামান্য শাখা সমুদ্র-কূল দিয়া উত্তর হইতে চট্টগ্রামের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ চট্টগ্রাম নগর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহার দক্ষিণে বিক্ষিপ্তভাবে দুই একটী অনুচ্চ পাহাড় দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে একটী এমত স্থলে স্থিত যে তাহার চতুঃপার্শ্বে সমুদ্রের জল। এই সকল সংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত থাকায় চট্টগ্রামের যেখানে দাঁড়াও চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত দেখা যায়।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের আকার আয়তন বা গঠনে কোন রমণীয়ত্ব না থাকিলেও প্রকৃতি ও জনরবে উহাদিগকে কৌতূহলস্থল করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমুদ্রকূলগামী পর্ব্বতশাখার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে চন্দ্রনাথ নামক তীর্থ আছে। এক কালে ঐ চন্দ্রনাথের পাষাণময় মন্দির ছিল। ভূমিকম্প বা স্বাভাবিক অন্য কোন ঘটনায় ঐ প্রস্তরময় মন্দির অধিত্যকা-নিপতিত হইয়াছে। মন্দিরের সোপাণ ও একখানি মাত্র প্রশস্ত প্রস্তর চিহ্ন-স্বরূপ অদ্যাপি গিরিশৃঙ্গ-সংলগ্ন আছে। যেখানে মন্দির ছিল, পর্ব্বত দ্বিধা হওয়ায় তথায় একটী অতলস্পর্শ অসূর্য্যম্পশ্য ভঙ্গ দেখা যায়। তাহারই সেতু-স্বরূপ ঐ প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। লোকে বলে কলিযুগে চন্দ্রনাথ পাতালে গিয়াছেন। এক্ষণে একটী ইষ্টকময় সামান্য মন্দিরে এক শিলাময় শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাত্রীদের পূজা হরণ করিতেছে। উভয় মন্দিরের মধ্যভাগে একটা পুরাতন বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে, কালে তাহার শাখা প্রশাখা শোভাহীন ও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ মন্দিরে অধিরোহণ দুরূহ ব্যাপার। অর্দ্ধ পথ পর্য্যন্ত একটী ইষ্টক সোপান আছে। কথিত আছে কলিকাতা

প্রদেশীয় কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মাতা অধিরোহণে অক্ষমা হইয়া আপন মৃত্যুকালে পুত্রকে ঐ সোপান বিনির্ম্মাণের উপদেশ দেন।

সোপানের বাম পার্শ্বে একটী দ্বিহস্ত-প্রস্থ পার্ব্বতীয় নির্ঝর আছে। উহার স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট জল অনবরত ঝর২ শব্দে অধিত্যকায় পড়িতেছে। যতদূর জলধারা পতিত হইয়াছে, পাষাণময় হইয়া আসিয়াছে। ঠিক যেন কে উপর হইতে একটী প্রস্তরময় জলপ্রণালী সংগঠিত করিয়াছে। উহার আদি কেহ কখন দেখে নাই; সুতরাং ইহার আখ্যা স্বর্গসম্ভূতা মন্দাকিনী হইয়াছে।

ইহার একটু উত্তরে এক উচ্চ শৃঙ্গ হইতে ঋজু পর্ব্বত পার্শ্বে একটী নির্ঝর বারি নিপতিত হইতেছে। অধিত্যকায় দাঁড়াইয়া "বোম ২" করিলে কোথা হইতে সহস্র ধারে বারি বর্ষিত হইয়া সাধককে স্নান করায়। লোকে সহস্র ধারায় স্নান করিয়া পবিত্র হয়। বাস্তবিক সহস্র ধারার রজতছটা, সুমধুর কলরব, অত্যুচ্চ হইতে শূন্যমার্গে পতন দর্শনে ও সুশীতল নির্ম্মল জলস্পর্শে শরীর ও মন পুলকিত হয়। অধিত্যকার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ম্মল বারি-নির্ঝর দেখা যায়। চট্টগ্রাম নগরে এরূপ নির্ঝর অতি সাধারণ। তাহাদের জল অতি স্বচ্ছ সুশীতল ও সুমিষ্ট।

চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের অধিত্যকায় কতিপয় অন্যরূপ নির্ঝর দেখা যায়। তাহাতে লবণাক্ত জল, বালুময় জল ও সাগ্নিক জল নির্গত হয়। উহাদিগকে লবণ কুণ্ড দধিকুণ্ড ও বাড়ব কুণ্ড কহে। বাড়ব কুণ্ডে অগ্নিশিখা ও বারি একত্র এক গহ্বর হইতে উত্থিত হইতেছে। "বোম বোম" শব্দে অথবা ক্ষণে ক্ষণে ঝলকে ঝলকে অগ্নিশিখা বারিসহ উত্থিত হয়। ঐ শিখা বারি সহ করতলে লওয়া যায়। যে স্থলে অধিক পরিমাণ অগ্নি নিঃসৃত হয়, একটী সচ্ছিদ্র বেদি নির্ম্মিত আছে। তথায় সর্ব্বদাই অর্দ্ধ-হস্ত-বেধ-বিশিষ্ট শিখা প্রদীপ্ত আছে। তাহাতে মহাদেবের চারু পাক হয়। আশ্চর্য্য এই ঐ জল অগ্নি সহ উত্থিত হইয়াও সুস্নিগ্ধ থাকে। তবে যখন অগ্নি বেদি অতিক্রম করিয়া বাপী কুণ্ডে অর্থাৎ বহিঃস্থ কুণ্ডে যায়, তখন জল ঈষৎ উত্তপ্ত হয়।

চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের নিম্নভাগে স্থানে স্থানে ছিদ্র পথ দিয়া ধূম ও অগ্নিশিখা দেখা যায়। এই সকল কারণে অনুভব হয় যে ঐ সকল পর্ব্বত পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্ট। এখন কিন্তু পর্ব্বতোপরি অগ্নির কোন চিহ্ন নাই।

চন্দ্রনাথ ব্যতীত চট্টগ্রামে আদিনাথ নামক এক তীর্থ আছে। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে একটী ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন পাহাড় এক দ্বীপে নিবেশিত আছে। আদিনাথ ঐ পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত। লোকে বলে হনূমান গন্ধমাদনের এক খণ্ড এখানে ফেলিয়া গিয়াছিল। তদুপরি স্বয়ম্ভূ মহাদেব সংস্থিত আছেন। এই তীর্থই ভারতের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমা।

চট্টগ্রামের নদী সকল অতি ক্ষুদ্র। প্রায় সকলেই পশ্চিমবাহিনী। পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া ফেণী, কর্ণফুলী ও শঙ্খ সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়াছে। কর্ণফুলীর মুখেই চট্টগ্রাম নগর অবস্থিত। ঐ নদীটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নৌ-যাত্রার উপযোগী। ঐ নদীর উচ্চ ভাগে পার্ব্বতীয় প্রদেশের রাজধানী রাঙ্গামেটে নগর। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোতকে খাল কহে। তাহার মধ্যে "হালদার" 'ডলু' "হাড়ভাঙ্গা" ও "বাঘের খাল" প্রধান। হাড়ভাঙ্গা অল্প স্থানে সাত ফের দিয়া চতুর্হস্ত-পরিমিত স্রোত হইতে ক্রোশপরিমিত খাড়ি রূপে সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়াছে। হাড়ভাঙ্গাকে নদী বলিলেও বলা যায়। হালদার ও ডলু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জলপ্রণালী, কর্ণফুলী ও শঙ্খের জলানয়ন করে। বাঘের খাল সমুদ্রের নিকটে মহেশখাড়িতে পড়িয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত পর্ব্বত হইতে নদী বা খালে নিপতিত হয়। ঐ সকল স্রোত বর্ষাকালে জলময় হয়, অন্য সময়ে শুষ্ক থাকে। উহাদিগকে ছরা কহে। পর্ব্বতে যাইতে হইলে এই সকল ছরা দিয়া পদব্রজে যাইতে হয়। পল্লীর মধ্যে মধ্যেও এইরূপ ছরা দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। এ সকল জলপ্রপাত ব্যতীত সমুদ্রকূলে অতি বিস্তীর্ণ খাড়ি সকল আছে। তদ্দ্বারা কএকটী দ্বীপ মূল দেশ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সন্দীপ ও মহেষ খাল প্রধান। সন্দীপ উত্তরে, মহেষ খাল দক্ষিণে। মহেষ খালেই আদিনাথ তীর্থ আছে। তাহারও দক্ষিণে মহেশ খাড়ির মুখে সোণাদিয়া নামক একটী নূতন দ্বীপ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে সমুদ্র অবিচ্ছেদে মূল দেশের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াছে।

এইস্থলে সমুদ্রকূলে অর্দ্ধশত-হস্ত-প্রশস্ত সাগরতরঙ্গপীড়িত, দৃঢ়বালুময় এক প্রশস্ত স্বাভাবিক পথ চট্টগ্রাম হইতে আক্যাব রেঙ্গুন মালয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। এইখান দিয়াই সচরাচর লোক চলে। এই সমুদ্রকূলের পথ ও উপরোক্ত ছরা ভিন্ন এদেশে আরও কতিপয় স্বাভাবিক পথ আছে। তাহাদ্বারা পর্ব্বতের এপার ওপার যাওয়া যায়। উহাদিগকে "ঢালা" কহে। পর্ব্বতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নভাগ দিয়া ঢালা নিবেশিত আছে। উহাতে কোন স্থলে এত উচ্চ উঠিতে হয় যে তথা হইতে দেশসমূহ ও সমুদ্র পরিদৃশ্যমান হয়, আবার কোন কোন স্থল গহ্বরমধ্যস্থ। পথও এত সঙ্কীর্ণ যে পদস্খলনে পাতালে পড়িতে হয় বলা অত্যুক্তি নহে।

পর্ব্বত ও পর্ব্বতপার্শ্বস্থ বন্ধুর ভূমি ব্যতীত সমগ্র দেশ সমতল ভূমি অর্থাৎ স্তরে স্তরে সমতল ক্ষেত্র সকল বিন্যস্ত আছে। তাহাতে কৃষিকার্য্যের অতি সুযোগ হইয়াছে। *শুকা হাজা এদেশে নাই। বৃষ্টি অল্প হইলে ক্ষেত্রে ২ ধারাপাত সঞ্চিত থাকিয়া শস্যোৎপাদন করে এবং বহুবৃষ্টি হইলে ক্রমান্বয়ে নিম্ন ক্ষেত্রে পড়িয়া

খাল ও নদী দিয়া জল নির্গত হয়। আর পর্ব্বত গুলি প্রস্তরময় না হওয়াতে তাহার পার্শ্বে বৃষ্টিজলে ভাঙ্গিয়া সময়ে সমতল ভূমিতে পতিত হয়; তাহাতেও উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়।

চট্টগ্রামের মৃত্তিকা সাধারণতঃ বালুকর্দ্দম-মিশ্রিত। উহাতে বৎসরে কোন কোন স্থলে ৪ ফসল পর্য্যন্ত জন্মে। পর্ব্বত আছে বলিয়া দেশের ভূমি জলস্তর হইতে উচ্চ নহে। চট্টগ্রামের যে কোন স্থলে ৫।৬ হাত খাদ করিলে দীর্ঘিকার, ও ৭।৮ হাত খাদে পুষ্করিণীর জল নির্গত হয়। সমুদ্র নিকট হইলেও ঐ জল লবণাক্ত বা আবিল নহে। খানা ডোবা সর্ব্বস্থলেরই জল অতি স্বচ্ছ ও মিষ্ট; বোধ হয় বালু-প্রাধান্য হেতু এরূপ হয়। কিন্তু তথাকার বায়ু তদ্রূপ নির্ম্মল নহে। বিশেষতঃ দক্ষিণ পশ্চিম সামুদ্রিক বায়ু এত দূষিত যে স্পর্শমাত্রে শিরঃপীড়া ও জ্বর উদ্ভাবন করে। ইহার কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু এই দূষিত বায়ু ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল না। কথিত আছে এক প্রবল বাত্যার পর ঐরূপ হইয়াছে। যত দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে যাওয়া যায়, যত পর্ব্বত ও সমুদ্রের কাছে যাওয়া যায়, ঐ বায়ুর দোষ অধিক ও জ্বররোগের বল অধিক দেখা যায়। সমুদ্রকূলে পর্ব্বত আছে বলিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে বৃষ্টির অভাব হয় না। এমন কি অতিবৃষ্টি সর্ব্বদাই হয়। বর্ষা কালে মাসের মধ্যে দুই দিন সূর্য্যদর্শন ও দিনের মধ্যে এক ঘটিকা অবৃষ্টি পাওয়া ভার। শীত গ্রীষ্ম ও অন্যান্য ঋতুর কোন বিশেষ দেখা যায় না; যেরূপ বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে তদ্রূপ এখানেও। গ্রীষ্ম কালে যে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই অতি দূষণীয়। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে যত পর্ব্বতের ও সমুদ্রের কাছে যাও, ঐ দূষণীয় বায়ু অধিক অনিষ্টদায়ক। সাধারণ লোকে পাহাড়ে মাটীর দোষ দেয়। পাহাড় অঞ্চলের রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ার বিরুদ্ধে সাধারণে যে অপবাদ দেয় তাহা এক দেশীয় গাথায় গ্রথিত আছে “রাঙ্গামেটে মেট্টে। লেট্টে কি তাপ উট্টে॥” অর্থাৎ রাঙ্গামেটের মাটী, ছুঁয়েছ কি জ্বর উঠিয়াছে। বোধ হয় পাহাড়ে মাটী কি জলের কোন দোষ বায়ুতে মিশ্রিত হয়—নচেৎ সামুদ্রিক বায়ু স্বাস্থ্যকর না হইয়া চট্টগ্রামেই কেন এত অস্বাস্থ্যকর হয়? উক্ত গাথারও কোন মূল থাকিবেক।

শ্রীগোঃ—

# ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

## দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ম্যাট্‌সিনি পিতার নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া দেশান্তর বাসে নির্গত হইলেন। তিনি সেভয়ের মধ্য দিয়া গমন করিয়া সিনিস্ পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশ

পর্য্যটনানন্তর জেনিভায় অবতরণ করেন জেনিভা হইতে ফ্রান্সে গমনপূর্ব্বক তথায় রাজাদেশ পর্য্যন্ত দেশান্তর বাস কাল অতিবাহিত করিবেন· এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে ম্যাট্‌সিনির মাতুল ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেন। এই জন্য ম্যাট্‌সিনির জননী পূর্ব্বেই স্থির করেন যে পুত্রের ফ্রান্সে ভ্রমণ ও অবস্থিতি কালে তদীয় ভ্রাতাই তাঁহার সহচর থাকিবেন। ম্যাট্‌সিনির মাতুল বহুদিন পর্য্যন্ত ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং ম্যাট্‌সিনির ভ্রমণসহচরত্ব কার্য্যে ব্রতী হইবার তিনিই সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন।

সুইজর্‌লণ্ডে যাইয়া ম্যাট্‌সিনি সর্ব্বপ্রথমেই সাধারণতন্ত্রী ইতিবেত্তা সিস্‌মণ্ডির (১) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ও তদীয় পত্নী উভয়েই ম্যাট্‌সিনিকে অতিশয় সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন।

সিস্‌মণ্ডি এই সময় "ফ্রান্সের ইতিবৃত্ত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে ছিলেন। তাঁহার আকৃতি হৃদয়গ্রাহিণী ও বিনয়নম্র, তাঁহার স্বভাব সরল ও অমায়িক এবং াহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ইতালীয় ছিল তিনি সস্নেহ ঔৎসুক্যের সহিত ম্যাট্‌সিনির নিকট ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতালীয়েরা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মত সকলের অনুবর্ত্তন করিতেছেন তজ্জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু এই বলিয়া আবার আপনিই ইহার মীমাংসা করিলেন যে সংঘর্ষকালে এরূপ ভাব অনিবার্য্য। সিস্‌মণ্ডি ইতালীয়দিগের মতের অপযশ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার নিজের মতও সম্পূর্ণ উদার ছিল না। তদীয় বুদ্ধি—অবিকার ও অধিকারের অবশ্যম্ভাবি ফলস্বরূপ স্বাধীনতা মাত্র উপলব্ধি করিতে পারিত; কিন্তু স্বাধীনতার সহিত একতার সামঞ্জস্যের আবশ্যকতা ও সম্ভবপরতা উপলব্ধি করিতে পারিত না। তিনি ইচ্ছা করিতেন যে সুইজর্‌লণ্ডের ন্যায় ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ গুলি বিদেশীয় শাসনের অধীনতা হইতে উন্মুক্ত হইয়া স্বদেশীয় এক শাসনের অধীন হয়, ইহা প্রার্থনীয় বা সম্ভবপর বলিয়া তিনি মনে করিতেন না।

সিস্‌মণ্ডি ম্যাট্‌সিনিকে "লিটারেরি ক্লব্" নামক একটী সভার সভ্যদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সভার সভ্যদিগের অনেক গুলিই ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তি। ইহাঁদিগের বিষয় দূর হইতে শুনিয়া ম্যাট্‌সিনির মনে যে আশালতা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া ম্যাট্‌সিনির মনে সেই আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইল। তিনি দেখিলেন যে তাঁহাদিগের কাহারও স্বাধীন যুক্তি বা স্বাধীন চিন্তা নাই।

(1) Sismondi.

তাঁহাদিগের চক্ষে ফ্রান্সই সকলই, ফ্রান্সের অনুবর্ত্তনই তাঁহাদিগের এক মাত্র লক্ষ্য। তাঁহাদিগের রাজনীতি কোন অসঞ্চালনীয় নৈতিক ভিত্তির উপর অবস্থাপিত ছিল না। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। ঘটনা-স্রোতের পরিচালন করা তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল না, তাহার অনুবর্ত্তন করাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য।

সেই সভার সভ্যদিগের মধ্যে একজন লম্বার্ডি হইতে নির্ব্বাসিত। ইহাঁর নাম জিয়াকোমো সিয়ানি (১)। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে পলায়ন করেন। যৎকালে ম্যাট্‌সিনি সিস্‌মণ্ডির নিকট হইতে বিদায় লইতেছিলেন, তৎকালে এই নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ম্যাট্‌সিনির কাণে কাণে এই কথা বলিলেন যে—যদি আপনি কিছু কায করিতে চাহেন, তাহা হইলে লিয়ন্‌স নগরে গমন করিবেন এবং যে সকল নির্ব্বাসিত ইতালীয়েরা তথাকার "কাফি ডেলা ফিনিস্" নামক হোটেলে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন। এই উপদেশ নিবন্ধন ম্যাট্‌সিনি এই ব্যক্তির নিকট চিরঋণে বদ্ধ ছিলেন।

লিয়ন্‌সে আসিয়া ম্যাট্‌সিনি ইতালীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত জীবনের স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। যে সকল নির্ব্বাসিত ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা প্রতিদিন তথায় আসিয়া জুটিতেছিলেন, সকলই সৈনিক পুরুষ। যে সকল বীরপুরুষদিগকে দশ বৎসর পূর্ব্বে ম্যাট্‌সিনি জেনোয়ার রাজপথে মনের বিষাদে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা স্পেন ও গ্রীসে স্বাধীনতা সমরে অবতীর্ণ হইয়া ইতালীয় নাম জগৎপূজ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই বীরপুরুষদিগের অনেককেই ম্যাট্‌সিনি তথায় সমবেত দেখিতে পাইলেন। এতদ্ব্যতীত বর্সো ডি কার্মিনেটি, কার্লো বিয়াঙ্কো, ভোয়ারিনো, টেডেস্কি প্রভৃতি অনেক নির্ব্বাসিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

লিয়ন্‌সে সমবেত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশই নিয়মতন্ত্র রাজত্বের (২) পক্ষপাতী। তাঁহাদিগের যে আন্তরিক বিশ্বাস এইরূপ ছিল তাহা নহে। ফ্রান্সে যেরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত, তাহার অন্যরূপ শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইতে তাঁহারা কোন মতে সাহসী হইতেন না।

ক্রমে ইতালীয় নির্ব্বাসিতেরা চারিদিক্ হইতে আসিয়া লিয়ন্‌সে মিলিত হইতে লাগিলেন। সেভয়ের আক্রমণ তাঁহাদিগের লক্ষ্য। সেভয় আক্রমণোদ্যত সৈন্যের সংখ্যা ক্রমে দুই সহস্র ইতালীয় ও কতিপয় ফরাসি শ্রমজীবীতে পরিণত হইল। অভিযানোদ্যত ব্যক্তিদিগের কোষ ধনে পূর্ণ ছিল। তাহার কারণ এই ফরাশি গবর্ণমেণ্ট এই অভিযানের পোষকতা করি-

(1) Giacomo Ciani.

(2) Constitutional monarchy.

বেন, এবং অভিযানোদ্যত ব্যক্তিগণ রাজ্য-তন্ত্রের পক্ষপাতী—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য নির্ব্বাসিত ধনী ও রাজন্যবর্গ এই অভিযানে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে এই অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতালীয় ত্রৈবর্ণিক পতাকার সহিত ফ্রান্সের ইগল্ "কাফি ডেলা ফিনিস্" হোটেলের শিখরে উড্ডীন হইতে লাগিল। অধিক কি অভিযাত্রিক কমিটির লিয়ন্সের প্রিফেক্ট-রের সহিত লেখালিখিও চলিতে লাগিল।

কিন্তু রাজচরিত্র কে বুঝে? রাজা-দিগের উপর যাঁহারাই বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই পরিণামে অনুতাপ করিতে হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনি স্বচক্ষে এই তৃতীয় বার রাজকীয় বিশ্বাসঘাতকতা অবলোকন করিলেন। প্রথম—কার্বো-নারো নায়ক চারল্‌স অ্যাল্‌বার্টের শত্রুশিবিরে পলায়ন। দ্বিতীয় মডেনার ডিউক চতুর্থ ফ্রান্‌সিস্ কর্ত্তৃক সাইরো-মিনোতি নামক ব্যক্তি দ্বারা বিদ্রোহের উত্তেজন ও পরে অষ্ট্রিয়ার উত্তেজনায় তাহার প্রাণ বিনাশন। তৃতীয় ফরাশি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হতভাগ্য ইতালীয় নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্বান্তীকরণ।

একদিন ম্যাট্‌সিনি "কাফি ডেলা ফিনিসের" দিকে দ্রুতপদে গমন করিতে-ছেন—তাঁহার মন অব্যবহিত কার্য্যের পূর্ণ আশায় উচ্ছ্বসিত—এমন সময় দেখি-লেন গবর্ণমেণ্ট প্রাকারোপরি যে একটী ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিবার জন্য অসংখ্য লোক ধাবিত হই-তেছে। সেভয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ইতালীয় অভিযান নিবারণ করাই এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য। নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরা যেন অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হয়—যাহারা মিত্ররাজ্য সকলের সীমা প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করিয়া সেই সকল রাজ্যের সহিত ফ্রান্সের সন্ধিবন্ধন শিথিলিত করিবে, তাহারা দণ্ডবিধির উচ্চতম দণ্ডে দণ্ডিত হইবে—ঘোষণাপত্র ইহাই প্রচার করিতেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ঘোষণাপত্র লিয়ন্সের প্রিফেক্টরের আফিস হইতেই প্রচা-রিত হয়।

ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন আভিযাত্রিক কমিটি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত—অভিযানোদ্যত ব্যক্তিগণ হতবুদ্ধি, ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়—কাফি ডেলা ফিনিস্ হোটেলের মস্তক পতাকাশূন্য—অস্ত্রাগার হৃতাস্ত্র—অভি-যানসেনাপতি বৃদ্ধ রেজিস্ সাশ্রুনয়ন—এবং অভিযানোদ্যত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ ফরাশিরাজের অদ্ভুত বিশ্বাসঘাতকা ভাবিয়া করতলবিন্যস্তকপোল। ম্যাট্‌-সিনি স্বচক্ষে এই সমস্ত দেখিলেন—অমনি তাঁহার মনে এই চিন্তা সমুদিত হইল—যে জাতি স্বদেশের উদ্ধার সাধন বিষয়ে বিদেশীয় রাজ্যের উপর নির্ভর করে, তাহারা এই রূপেই বিধাতার কোপানলে ভস্মীভূত হয়!

কোন কোন ব্যক্তির রাজভক্তি এত অচলা যে তাঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস

করিতে পারিলেন না যে উদারচেতা লুই ফিলিপ লিবারেলদিগের আশালতা এরূপে সমূলে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে অভিযান নিবারণ করা ফরাশি গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য না হইতে পারে। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট এই অভিযানের সহায়তা করেন নাই এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করাই এই ঘোষণা পত্রের উদ্দেশ্য। ম্যাট্‌সিনি এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত নানা বিতর্কের মূলোচ্ছেদ করিলেন যে ফরাশি গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক এই অভিযানের প্রতিকূল কিনা, সেভয়ের অভিমুখে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেই জানা যাইবে। ম্যাট্‌সিনির পরামর্শের অনুসরণ করা হইল। সেভয়ের অভিমুখে ফরাশি শ্রমজীবীবহুল এক দল সেনা যেই প্রেরিত হইল, অমনি ফরাশী অশ্বারোহী সেনা দ্বারা তাহাদিগের গতি প্রতিরুদ্ধ ও ছত্র ভগ্ন হইল। ফরাশী শ্রমজীবীরা সর্ব্ব প্রথমেই ছত্রভঙ্গ হইল। ফরাশি সেনানায়ক তাহাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন—বিদেশীয়দিগকে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে উন্মুক্ত করার ভার স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তেই নিহিত আছে। তাহাতে হস্তক্ষেপ করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাহারা সেনানায়কের এই উপদেশের মর্ম্ম বুঝিল, আর তৎক্ষণাৎ দলভঙ্গ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে সেভয়-অভিযানের উদ্যম নিষ্ফল হইল।

ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। যে সকল নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহাদিগের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনেকেই ধৃত হইলেন এবং শৃঙ্খলিত হস্তে ক্যালে নগরে আনীত ও ক্যালে হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

যৎকালে চতুর্দ্দিক্—কারারোধ, পলায়ন, ভয় প্রদর্শন ও হতাশ্বাসতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই ভীষণ সময়ে বর্গো গোপনে ম্যাট্‌সিনিকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার কতিপয় সাধারণতন্ত্রী সহচর সমভিব্যাহারে সেই রাত্রিতেই কর্সিকা যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং তথা হইতে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য লইয়া ইতালীর মধ্যভাগের নির্ব্বাপ্যমান বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবেন দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছা যে তিনিও তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। ম্যাট্‌সিনি তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কর্সিকা যাত্রার বিষয় মাতুলের নিকট সম্পূর্ণরূপে অবিদিত রাখিলেন। কেবল যাইবার সময় তাঁহাকে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিয়া গেলেন যে তিনি যেন তাঁহার কর্সিকা যাত্রার জন্য বিশেষ ভীত না হন, আর এই ঘটনা যেন তাঁহার জনক জননীর গোচর না করেন।

তাঁহারা লিয়ন্‌স হইতে যাত্রা করিয়া অবিশ্রান্ত ভ্রমণের পর মার্সেলিস্ নগরে উপনীত হইলেন। মার্সেলিস্ হইতে টুলনে, এবং টুলন হইতে এক খানি

নিয়োপলিটান্ বাণিজ্য-অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া অত্যুচ্চ-তরঙ্গমালা-সমাকুলিত সাগরের উপর দিয়া ব্যাষ্টিয়া নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। বহুদিন পরে জন্মভূমির মুখাবলোকন করিলে হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, আজ ম্যাট্‌সিনির হৃদয়ে সেই আনন্দ আবির্ভূত হইল। ইতালীয় মারুত হিল্লোলে তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ আজ পুনরুজ্জীবিত হইল।

ফ্রান্সের অত্যাচারে ও ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা বশতঃ কর্সিকা যে কি শোচনীয় অবস্থায় আনীত হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করা যায় না। তথাপি একথা অখণ্ডনীয় যে এই দ্বীপ আজও পর্য্যন্ত কি জল বায়ু, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি ভাষা, কি স্বদেশানুরাগ—সকল বিষয়েই প্রকৃত ইতালীয় ছিল। এই দ্বীপে ফ্রান্সের প্রভুত্ব শুদ্ধ শিবিরেই সন্নিবেশিত ছিল। ব্যাষ্টিয়া ও অ্যাজাসিয়ো নগরে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে, সমুদায় কার্সিকার মধ্যে সেই নগর দ্বয়ই কেবল বেতনদাতা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত কর্সিকার আর সমস্ত অধিবাসীই অন্তরে আপনাদিগকে ইতালীয় বলিয়া মনে করিত এবং বাহিরেও তাঁহা ব্যক্ত করিতে পরাঙ্‌মুখ হইত না। সকলেই উৎসুক অন্তরে কেন্দ্রোত্থ বিগ্রহের পরিণাম অবলোকন করিতেছিল; এবং সকলেরই অন্তরের বলবতী ইচ্ছা যে এই দ্বীপ জননীর সহিত পুনঃসংযোজিত হয়।

ম্যাট্‌সিনি কর্সিকার মধ্যস্থলে যত দূর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র ফরাশিদিগের প্রতি প্রজ্বলিত বিদ্বেষ ও বৈরভাব অবলোকন করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপের মধ্যস্থল পর্ব্বতমালা সমাকুলিত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসিরা প্রায় সকলেই সুদৃঢ়কায় বীরপুরুষ এবং অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত। ইহারা এই সময় রোমাগ্‌না প্রদেশের স্বাধীনতা-সমরে অবতীর্ণ হইবে সঙ্কল্প করিতেছিল; সুতরাং তাহারা ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতিকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে আপনাদিগের অধিনায়কত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই প্রভুপরায়ণ, আতিথেয় পার্ব্বতীয় জাতি সাধারণতঃ স্বাধীনপ্রকৃতি, স্ত্রীজাতি বিষয়ে অতিশয় ঈর্ষাপরতন্ত্র; সাম্যপ্রিয় এবং বিদেশীয়দিগের প্রতি সসন্দেহচিত্ত। কিন্তু ইহারা যখন জানিতে পারে যে বিদেশীয়দিগের নিকট কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, যখন জানিতে পারে যে বিদেশীয়েরা তাহাদিগের সহিত সমভাবে ব্যবহার করিতেছেন, যখন জানিতে পারে যে—যেমন সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরা অসভ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করেন—বিদেশীয়েরা তাহাদিগের সহিত সে ভাবে কথোপকথন করিতেছেন না, তখন তাহারা প্রাণ দিয়াও তাঁহাদিগের সাহায্য করিবে। ইহারা অতিশয় প্রতিহিংসা-প্রিয়, কিন্তু বরং নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি গুপ্তভাবে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবে না!

নিয়োপলিটান্ নির্ব্বাসিতেরাই সর্ব্ব-

প্রথমে কর্সিকায় কার্ব্বোন্যারিজম্ প্রচারিত করেন। সেই অবধি কার্ব্বোন্যারিজম্ তথায় একটী ধর্ম্মের ন্যায় অনুসৃত হইত। যাহারা পরস্পরের সহিত চির শত্রুতা পাশে সম্বদ্ধ, তাহারাও এই নূতন ধর্ম্মের বলে, পরস্পরের মিত্র হইয়া উঠিল। এই নূতন ধর্ম্মের বলে সকলেই যেন স্বদেশের উদ্ধাররূপ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানোৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

এইরূপ সঙ্কল্প হইল যে, যে তিন সহস্র কর্সিকান্ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিনায়ক হইয়া ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবর্গ সাগর পার হইয়া ইতালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হস্তে তৎকালে এমন অর্থ ছিল না, যে তাহাঁরা তরণোপযোগী যান ভাড়া করেন—বা যে সকল দীন দ্বীপবাসী তাঁহাদিগের সহিত সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহাদিগের অসহায় পরিবার বর্গের জন্য কিছু রাখিয়া যান। অনেকেরই নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইল, অনেকেই অর্থসাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু কেহই সে অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত করিলেন না। অবশেষে বলগ্‌নার প্রোভিসনল্ গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। কিন্তু সেই গবর্ণমেণ্ট আপনার দীনতা ও ভীরুতা গোপন করিয়া এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে—যাহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রার্থনা করে, তাহাদিগের স্বদেহের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করা উচিত!

এই বিলম্ব নিবন্ধন যে যে ইতালীয় প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সেই প্রদেশের অধীশ্বরেরা অষ্ট্রিয়ার সাহায্যে স্ব স্ব রাজ্যে শান্তি পুনঃসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

ম্যাট্‌সিনি ভগ্ন মনে ও রিক্ত হস্তে কর্সিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক মার্সেলিসে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মাতুলও তাঁহার জনক জননীর নামে তাঁহাকে তথায় প্রত্যাগত হইতে বার বার অনুরোধ করিতেছিলেন।

ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিসে প্রত্যাগত হইয়া "নব্য ইতালী"নামক চিরাভিলষিত সভার অধিষ্ঠাপনের সঙ্কল্প পুনর্গ্রহণ করিলেন।

এই সময় মডেনা, পার্ম্মা, এবং রোম্যাগ্‌নার নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ সকলেই আসিয়া মার্সেলিসে একত্রিত হইলেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমে এক সহস্রে পরিণত হইল। তাহাঁদিগের অধিনায়কগণের সহিত ম্যাট্‌সিনির পরিচয় হইল। স্বদেশানুরাগ ইহাঁদিগের ধমনীমণ্ডলে প্রবলবেগে রুধিরস্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। যে যে ভ্রমবশতঃ ইতালী-উদ্ধারের পূর্ব্বোদ্যম সকল এতদিন বিফল হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা ম্যাট্‌সিনির সহিত স্থির সঙ্কল্প করিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁহারা কখন এরূপ ভ্রমের অধীন হইবেন না।

তাঁহারা সকলেই ম্যাট্‌সিনির সহিত পবিত্রতম বন্ধুত্বসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন। এই সম্বন্ধ—লক্ষ্যের একতা, সুখ দুঃখের সহভাগিতা, বিদেশে সহবাস প্রভৃতি কারণে ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা এক্ষণে পরস্পর যে শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইলেন, মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুতেই সে শৃঙ্খল ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

ম্যাট্‌সিনি "নব্য ইতালী" নামক তদীয় অভীপ্সিত সভার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিলেন; এবং জেনোয়াস্থিত তদীয় বন্ধুবর্গের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ইত্যবসরে, সেই বৎসরের এপ্রিল মাসে কার্লো ফেলিসের মৃত্যু হওয়ায়, ১৮২১ খৃষ্টাব্দের কার্ব্বোনারো ষড়যন্ত্রী—চারল্‌স অ্যাল্‌বার্ট সার্ডিনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। চারল্‌সের সিংহাসনাধিরোহণে অনেক দুর্ব্বলপ্রকৃতি লোকের মনে প্রবল আশা জন্মিল যে ষড়যন্ত্রী রাজকুমার রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া এক্ষণে অবশ্যই স্বাভিপ্রেত সকল কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু তাহারা জানিত না যে তাহাদিগের রাজকুমার কখন কোন হৃদ্‌গত শুভকর ভাবের উন্মাদকরী উত্তেজনায় সঞ্চালিত হন নাই—দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা বৃত্তির অনুসরণই তাঁহার সমস্ত কার্য্যের লক্ষ্য ছিল। তাহারা জানিত না যে তাহাদিগের রাজকুমার যৎকালে কার্ব্বোন্যারো ষড়যন্ত্রে নির্লিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁহার হারাইবার কিছুই ছিল না; কিন্তু এক্ষণে তিনি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর; সুতরাং ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য্য না হইলে তিনি অনিশ্চিত মহত্তর সিংহাসনের জন্য নিশ্চিত ক্ষুদ্রতর সিংহাসন হারাইবেন। এরূপ বীরোচিত সাহসিকতায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তির কার্য্য নহে।

চার্লস অ্যালবার্ট—কার্বোন্যারো ষড়যন্ত্রী—সার্ডিনিয়ার বর্ত্তমান অধীশ্বর—ইতালীর উদ্ধারব্রতে অবশ্যই ব্রতী হইবেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ইতালীর অধিকাংশ অধিবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ম্যাট্‌সিনির ইতালীস্থ বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই বলিয়া পাঠাইলেন—যে তাঁহার উৎকৃষ্ট হইলেও এক্ষণে অনাবশ্যক ও অসাময়িক; যে যতদিন না সার্ডিনিয়ার নূতন রাজা তাঁহাদিগের চিরললিত আশালতার উন্মূলন করিতেছেন, ততদিন তাঁহারা কেহই এ ব্যাপারে যোগ দিতে পারিতেছেন না।

ম্যাট্‌সিনি এ উত্তরে হতাশ্বাস হইলেন না। তিনি বুঝিলেন যে যতদিন না তাঁহারা সেই মুগ্ধ আশ্বাসে বঞ্চিত হইবেন ততদিন তাঁহাকে তাঁহাদিগের সহকারিতায় বঞ্চিত থাকিতে হইবে। কিন্তু তিনি জানিতেন তাঁহাদিগকে সেই মুগ্ধ আশ্বাসে বঞ্চিত করিতে অধিক আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না; সংবাদপত্র যোগে চার্লস আলবার্টকে একখানি পত্র লিখিলেই তাঁহার সমস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

# বিজ্ঞাপন

রোপীয়েরা যে প্রকার অত্যাচার করেন, হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের চরিত্র দ্বারা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ।

"শরৎ-সরোজিনী" অপেক্ষাও কোন কোন অংশে অধিক উত্তেজক হইয়াছে। —অমৃতবাজার।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উপেন্দ্র বাবু আমাদিগকে "শরৎ-সরোজিনী" নামক এক খানি নাটক উপহার দিয়া যেরূপ পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, এই "সুরেন্দ্রবিনোদিনী" দ্বারাও আমাদের সেইরূপ, বরং অধিক পরিতোষ জন্মাইলেন।—এডুকেশন গেজেট।

নীলদর্পণের পর আর যত নাটক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের মঙ্গল হয় নাই তাহা আমরা বলি না, কিন্তু "সুরেন্দ্রবিনোদিনীর" গ্রন্থকর্ত্তা নাটক লেখার একটী নূতন আকার দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে এক জন গ্রন্থকর্ত্তা নির্জ্জন গৃহে অবস্থিতি করিয়া গ্রন্থ রচনা দ্বারা দেশের কত মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারেন। যিনি বেঙ্গল থিয়েটরে "সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর" অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি দৃঢ়রূপে জানিতে পারিয়াছেন যে দেশের ম্যাজিষ্ট্রেটেরা কিরূপ অথচ প্রবল প্রতাপান্বিত, ষ্টীফেন সাহেবের নূতন দণ্ডবিধি আইন তাহাদের হস্তে কি ভয়ানক যন্ত্র, কারাগারবাসীরা কত কৃপার পাত্র এবং তাহাদের উপর গবর্ণমেণ্ট কত নিষ্পীড়ন করেন। যাঁহারা এইরূপ গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহারা দেশের পরমোপকারী, এবং যাঁহারা দেশহিতৈষী তাঁহাদের সকলের এইরূপ গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত।—অমৃতবাজার পত্রিকা।

উপেন্দ্র বাবু যখন "শরৎ-সরোজিনী" নাটক প্রকাশ করেন, তখন লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার পরলোকগত কোন বন্ধু সেই নাটক খানির রচনা সমাপ্ত করিয়া তাঁহার প্রতি মুদ্রাঙ্কনের ভার দিয়া যান। "সুরেন্দ্রবিনোদিনীর" বেলায় তিনি লিখিয়াছেন যে সালিকাগ্রামের কোন বট বৃক্ষমূলে এই পুস্তক খানি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে তাঁহার পরলোকগত বন্ধু-ভূত হইয়া অভ্যাস গুণে এই নাটক লিখিয়া বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভূতটীর উৎপাত সহ্য করিতে আমরা সর্ব্বথাই সম্মত আছি, এবং সার রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাবিত গয়ার পথে রেলওয়ে নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইলে যদি কোন নবক্ষুপদে পিণ্ডদান করিয়া তাঁহার (নাটকলেখক ভূতটীর) উদ্ধার সাধন করিতে যান, তাহা হইলে কেবল আমরা নহি, নাটকাভিনয় দর্শনামোদী অনেক ভূতও তাঁহার (ভূতোদ্ধারসাধনেচ্ছু ব্যক্তির) প্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইবে। * * রচনার গুণে পাঠকের পদে পদে কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। চিত্তের উত্তেজন সাধনে নাটককারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। দুরাচার ম্যাক্রেণ্ডেল সাহেবের দুর্ব্ব্যবহার, বিরাজমোহিনীর বিপদ

# বিজ্ঞাপন।

এবং পরাণে কয়েদির বৈরশোধ বৃত্তান্ত গুলি পাঠ করিলে শরীরস্থ শোণিত দ্রুত-বেগে বহমান হয়।—সাপ্তাহিক সমাচার।

ইহা এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক। এদেশের বর্ত্তমান বিজ্ঞশ্রেণীস্থ লোকের কতিপয় অভিপ্রেত প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ উৎকৃষ্ট রসের সমাবেশ করিয়া নাটকখানিকে বিলক্ষণ সরসও করা হইয়াছে। ইহার লেখা অতি সার-গর্ভ রসাল প্রাঞ্জল ও পরিপক্ক। * * "সুরেন্দ্রবিনোদিনী" নাটকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি এবং দেশ প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধতাদি দোষ ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা ইহার গুণসমষ্টির তুলনায় অতি যৎসামান্য। সুতরাং ইন্দুকিরণ-নিমজ্জিত কলঙ্ক রেখার ন্যায় তাহা বড় চক্ষুগোচর হয় না।—ঢাকা প্রকাশ।

## সন ১২৮২ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

দং ১২৮১ সাল।

,, গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ৩॥০
,, দুর্গাচরণ পাল কলিকাতা ৩॥০
,, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর ৩॥০
,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমিদার টাকী ৩॥০
,, জগচ্চন্দ্র দাস গোয়াল পাড়া ৪৸৵০
,, সুরেশচন্দ্র মিত্র ভবানীপুর ৩।৵০
,, কৈলাসচন্দ্র মিত্র ভবানীপুর ৩॥০
,, দুর্গাচরণ পাল কলিকাতা ৩॥০

দং ১২৮২ সাল।

,, বিহারীলাল বসু কলিকাতা ১৲
,, বেনিমাধব মুখোপাধ্যায় ঐ ৩৲
,, বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ঐ ২৲
,, হরলাল রায় ঐ ৩৲
,, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲
,, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বহরম পুর ৩।৵০
,, রাধিকাপ্রসাদ রায় আলমপুর ১৲
,, ফকিরচন্দ্র পাল কলিকাতা ৩৲
,, প্রসাদ দাস মল্লিক ঐ ১॥০
,, তিনকড়ী মুখোপাধ্যায় জমানিয়া ৩।৵০
,, গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর সাহা ব্রাহ্মণ বেড়িয়া ৩।৵০
,, নীলমণি মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ২।০
,, শশীভূষণ বসু চন্দন নগর ১৲
,, নবীনকৃষ্ণ ঘোষ কলিকাতা ১৲
,, মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ১৲
,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমিদার টাকী ১৸৵০
,, আই, এন, সরকার মহেশপুর ৩।৵০
,, তারাকালী চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ সেন ঐ ৩৲
,, বঙ্কবিহারী গুপ্ত সিবিল সারজন ৩।৵০

,, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা ৩৲
,, পূর্ণচন্দ্র পাল মুঙ্গের ৩।৶০
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ বারুই পাড়া ১।৶০
,, প্রিয়নাথ সেন উকিল ২৲
,, ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ৯৲
,, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার ঐ ৩৲
,, গোষ্ঠবিহারী মল্লিক কলিকাতা ১৷৷০
,, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাটড়া ১৲
,, কালীচরণ সিল কলিকাতা ৩৲
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ ঐ ৩৲
,, প্রিয়নাথ সেন ঐ ১৲
,, রামগোপাল বিদ্যান্ত লক্ষ্ণৌ ৩।৶০
,, মতিলাল মিত্র কলিকাতা ৩৲
,, যদুনাথ ঠাকুর সুকদমপুর ৩।৶০
,, প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী কোরকদি ১৷৷০
,, লালবিহারি লাহিড়ি মালদহ ।৶০
,, রাজেন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা ৩৲
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲
,, ভবতারা ঘোষ ঐ ৩৲
,, নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ঐ ২৲
,, কৃষ্ণরমণ গোস্বামী জগদল ৷৷/১০
,, কৃষ্ণলাল সাহা কলিকাতা ৩৲
,, বিনোদবিহারী সেন ভবানীপুর ৩৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র পাড়ে কারাগোলা ৩।৶১০
,, যদুনাথ সেন জয়পুর ২৶০
,, আশুতোষ বসু চৌঁয়া ৩।৶০
,, বিপিনবিহারি চট্টোপাধ্যায়
টাঙ্গাইল ৩।৶০
,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
৩৲
,, যদুনাথ মুন্সী কলিকাতা ২৷৷/০
,, বলাইচাঁদ বসু কলিকাতা ৩৲

,, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার
কলিকাতা ৩৲
,, দুর্গামোহন দাস কলিকাতা ৩৲
,, কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়
মালীপোতা ৩।৶০
,, অমৃতলাল বসু কলিকাতা ১
,, উমাচরণ মণ্ডল রামজীবনপুর ৩।/০
,, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা ৩৲
,, রাজকুমার ভট্টাচার্য্য বদরগঞ্জ ১৸০
,, নবীনচন্দ্র পাল পুরুলিয়া ৩।৶০
,, সত্যজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়
মালীপোতা ৷৷০
,, ভোলানাথ পাল কলিকাতা ৩৲
,, অন্নদাপ্রসাদ সুর কলিকাতা ২৲
,, এড়িয়াদহ লায়ব্রেরী ১৷৷০
,, মহেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ণিয়া ২৲
,, নগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কলিকাতা ১৲
,, বিহারীলাল বসু ২৲
মোল্লাবেলে লায়ব্রেরী ১৲
,, কৈলাসচন্দ্র মিত্র ভবানীপুর ৩৶০
,, বাণীবর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া ৩।৶০
,, ললীত মোহন সরকার শ্রীপুর ৩।৶০
,, জগচ্চন্দ্র দাস গোয়াল পাড়া ৶০
,, গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
হোসেন পুর ৩।৶

## সং ১২৮৩ সাল।

,, ললীত মোহন সরকার শ্রীপুর ৩।৶০
,, রামগোপাল বিদ্যান্ত লক্ষ্ণৌ ১৷৷৶০

# ভর্ত্তৃহরি।

প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, সর উইলিয়ম জোন্স্ ও কোলব্রুক সাহেব ভারতের ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সময়ে যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, এতা বৎকাল পর্য্যন্ত অনেক সুধীগণ প্রয়াস করিয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের সমর্থন ও সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। বরং পূর্ব্বে যে সকল বিষয় এক প্রকার মীমাংসিত হইয়াছিল, অধুনা তৎসম্বন্ধে সংশয় ও বিসম্বাদ উত্থাপিত হইতেছে। তন্নিবন্ধন প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সাধারণের মন ক্রমশঃ বিচলিত ও সন্দেহদোলারূঢ় হইতেছে। কবি কালিদাস, জোন্স ও কোলব্রুকের মতে সংবৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের সমকালীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। অধিকাংশ এদেশীয় পণ্ডিত ঐ মতের পক্ষপাতী। কিন্তু এ বিষয়ে আর তিনটি মত প্রকটিত হইয়াছে। ডাক্তার কার্ণ প্রভৃতির মতে, তিনি শকাদিত্যের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাওদাজীর মতে কালিদাস চতুর্থ শতাব্দীর লোক। পরন্তু বেবার সাহেব আমাদের কবিকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে তুলিয়া লইতেছেন। অতএব যখন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির সময় লইয়া এত মতভেদ; তখন অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে নিশ্চিত সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। বিশেষতঃ যখন ইউরোপীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ এইরূপে অকৃতকার্য্য হইতেছেন, তখন অস্মদ্দেশীয় ক্ষীণজীবী পণ্ডিতমণ্ডলীর স্খলিতপদ ও ভগ্নোদ্যম হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

সংস্কৃত-সাহিত্য-ঘটিত ইতিহাসের এরূপ দুরবস্থা হইবার যে কয়েকটি কারণ রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ভারতবাসিগণ চিরকালই যাদৃশ পরলোকপরায়ণ, সেরূপ ঐহিকচিন্তাতৎপর নহে। এই জন্য এদেশে পরলোক-ঘটিত বৃত্তান্ত ও দেবদেবীচরিত যত প্রচুর পরিমাণে লব্ধ হয়, অন্য কোন দেশে তত দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতম দেশে যত অধিক পরিমাণে মানব জাতির ইতিহাস সংগৃহীত আছে, ভারতবর্ষে তাহার শতাংশও বিদ্যমান নাই। ইতিহাস গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতের এই অনুপম দরিদ্রতা এক প্রকার দুষ্পরিহার্য্য। তাহার প্রতিবিধানার্থ ইউরোপীয় সুধীবর্গ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে তৎপর হইয়াছেন। সংস্কৃতসাহিত্য সমুদ্রের ন্যায় অগাধ ও দুষ্পরিচ্ছেদ্য। সেই সাহিত্য-সাগর মন্থন করিয়া জোন্স' কোলব্রুক প্রভৃতি সৎপুরুষগণ

অনেক অপূর্ব্ব ও উপাদেয় বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসমস্ত বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছে। নানা অন্তরায় বশতঃ অদ্যাপি তাহাতে ঐতিহাসিক জীবন সঞ্চারিত হইতে পারিতেছে না। পল্লবগ্রাহিতা সেই সকল অন্তরায়ের মধ্যে একটি প্রধান। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখা আছে। তাহার একদেশ মাত্র অধ্যয়ন করিয়া, সমুদায়ের উপর মতামত প্রকটন করিতে অনেকে উৎসুক হন। তাহাতেই অপক্ক ও অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তের এত আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সংস্কৃতাধ্যায়ীদিগের মধ্যে পরমতাসহিষ্ণুতা দ্বিতীয় অন্তরায়। সকলেই অন্যসমর্থিত মত খণ্ডন পূর্ব্বক একটী নূতন মত প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হন; কিন্তু ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অধিক সপ্রমাণীকৃত হইল কি না। এইরূপে নিরন্তর পূর্ব্বমত খণ্ডন ও নূতন মতের সমর্থন হইতেছে, তাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ক্রমশঃ পরিষ্কৃত না হইয়া বরং আরও অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। রামায়ণ খৃষ্টের পরে রচিত; রামচরিত ভারতীয় ইতিবৃত্তের পরে সংঘটিত হইয়াছিল; কবি কালিদাস ও কাশ্মীরের শাসনকর্তা মাতৃদত্ত উভয়ে এক ব্যক্তি; ভগবদ্গীতা বাইবল হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে ইত্যাদি সিদ্ধান্ত সকল পরমতাসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত মাত্র। যদি নূতন নূতন মত উদ্ভাবন না করিয়া পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের এক এক শাখার সারসংগ্রহে নিরত হন; তাহা হইলে প্রকৃত ইতিহাসের পথ অনেক পরিষ্কৃত হইতে পারে এবং অপসিদ্ধান্তের এত বাহুল্য সম্ভবে না। জনশ্রুতির এককালে অনাদর করিয়া অনুমান ও সম্ভাবনার উপর নির্ভর করাতে অনেক বিস্ময়কর ও উপহাসজনক সিদ্ধান্ত প্রকটিত হইতেছে। ইহাকেই আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস রচনাপক্ষে তৃতীয় অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। সকল দেশেরই আদিম ইতিবৃত্তের অধিকাংশ জনশ্রুতিমূলক। বিশেষতঃ যে দেশে ইতিহাস গ্রন্থের একান্ত অসদ্ভাব, সে দেশের পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইলে, জনশ্রুতিকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবেক। অতএব ভারতের পুরাবৃত্ত উদ্ধার করিতে গিয়া, জনশ্রুতিকে হতাদর বা পরিত্যাগ করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য সন্দেহ নাই। আমরা এ কথা বলি না যে, জনশ্রুতি সর্ব্বদা অভ্রান্ত; অথবা যুক্তি বা সম্ভাবনার বিরুদ্ধ হইলেও জনশ্রুতিকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিতে হইবেক। জনশ্রুতির অনুকূলে আমরা কেবল এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে অগ্রসর আছি যে ভারতের পূর্ব্ব বিবরণ সঙ্কলন করিতে গেলে, জনশ্রুতিকে মূল ধরিতে হইবেক, কেবল অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর করিলে চলিবেক না। তদ্দ্বারা জনশ্রুতির সংস্করণ ও প্রসাধন হইতে পারে, কিন্তু উহার স্থান পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। বেদশাস্ত্রে মানব জাতির

ও ভারতের পুরাতন ইতিবৃত্ত কতদূর অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিদ্বদ্গণের অবিদিত নাই। কিন্তু সেই বেদশাস্ত্র জনশ্রুতির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিষ্যপরম্পরায় ও পুরুষপরম্পরায় কত যুগযুগান্তর চলিয়া আসিয়াছিল; অবশেষে লিপিবদ্ধ ও সংহিতাকারে পরিণত হয়। এই জন্য বেদ সামান্যতঃ শ্রুতিশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে আমরা জনশ্রুতির এত পক্ষপাতী। আমাদের বিশ্বাস এই যে পুরুষপরম্পরাগত প্রবাদকে পরিত্যাগ করিলে, ভারত-ইতিবৃত্তের ভিত্তি পর্য্যন্ত অনির্ম্মিত থাকিবেক। যাহা হউক, আর বাক্যাড়ম্বর না করিয়া, অতঃপর প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

জনশ্রুতি বলেন, ভর্তৃহরি উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ভ্রাতা ছিলেন। একদা এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একটি ফল উপহার দেন ও বলেন "মহারাজ এই ফল ভক্ষণ করিলে লোক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়"। ভর্তৃহরি নিজ প্রিয়তমা মহিষীকে সেই ফল প্রদান করেন; রাজ্ঞী তাহা ভক্ষণ না করিয়া স্বীয় প্রণয়পাত্র কোটালকে অর্পণ করেন; কিন্তু কোটাল আবার আপনার প্রকৃত প্রণয়ভাগিনী কোন রমণীকে তাহা ভোজন করিতে দেয়। ভর্তৃহরি এই সমস্ত অবগত হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন এবং সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। "নীতিশতকের" দ্বিতীয় শ্লোক তাঁহার এই অবস্থায়সূচক। তাহা এই :—

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা,
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতেচ পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা,
ধিক্‌তাং চ তংচ মদনংচ ইমাংচ মাংচ॥"

অর্থাৎ যাহাকে আমি সর্ব্বদা চিন্তা করি, সে আমার প্রতি বিরক্তা হইয়া অন্য পুরুষ কামনা করে। সে ব্যক্তি আবার অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত; পরন্তু মৎপ্রণয়ভাজন নয় এমন কোন নারী আমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে। অতএব সেই নারী, সেই পুরুষ, মদন, এই নারী ও আমি, এই সকলকেই ধিক্ থাকুক।

ভর্তৃহরি বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যকে রাজ্য প্রদান করিয়া উজ্জয়িনীর অন্তঃপাতী কোন শৈল-কন্দরে পরমার্থ চিন্তায় জীবন উদ্যাপন করেন। সেই শৈলকন্দর "ভর্তৃহরিগুম্ফ" নামে অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তাহার অভ্যন্তরে একটি বেদি আছে। লোকে বলে ভর্তৃহরি ঐ বেদিকায় বসিয়া পূজোপসনাদি করিতেন। যদিও দুই এক স্থানে বিষ্ণুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তিনি স্বরচিত শতকাবলীর মধ্যে যে ভাবে শিবের বর্ণন করিয়াছেন, মায়া এবং সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা বিষয়ে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহাতে তাঁহাকে বৈদান্তিক বলিয়া অনুমান করিলে চলে। সে যাহা হউক, ভর্তৃহরি স্বরচিত শতকত্রয়ের মধ্যে এমন কিছু বর্ণনা করেন নাই, যাহাতে তাঁহাকে কালিদাসের সমকালীন ও সম্বৎকর্ত্তা

বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ বলিতে পারা যায় না। পরন্তু উক্ত শতকাবলীর ভাষা যদিও সরস্বতীর বর পুত্রের রচনার ন্যায় মনোহারিণী ও প্রসাদ-গুণসম্পন্না নহে, তথাপি তদ্রূপ প্রাঞ্জল ও আড়ম্বর বিহীন বোধ হয়। উহা যেমন মৃচ্ছকটিকের ভাষার তুল্য অমার্জ্জিত নহে, তেমনি ভবভূতি প্রভৃতির রচনার মত সমাস-বহুল ও দুরূহার্থকও নহে। সংস্কৃত কাব্যের সামান্যতঃ তিনটি যুগ বা কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে রামায়ণ মহাভারত মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি প্রথম যুগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় যুগের আদি কবি কালিদাস এবং অন্ত কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্ট—ইহা ন্যূনাধিক সাতশত-বৎসর-ব্যাপী। তৎপরে তৃতীয় যুগের আরম্ভ হয়। ভারবি, মাঘ, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, শ্রীমদ্ভাগবৎকার প্রভৃতি তৃতীয় যুগের অন্তঃপাতী। শতকাবলীর ভাষা ও রচনা-প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, উহাকে মধ্য-যুগের অন্তর্গত এবং মধ্য যুগের চরম কবি বাণাদির অনেক অধস্তন বলিয়া বোধ হয়। যাহাহউক আমরা শতকাবলীর ভাষা লইয়া আর বাক্য ব্যয় করিব না; কারণ ভাষা হইতে সচরাচর যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সর্ব্বথা সকলের রুচিকর হয় না।

আমরা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রমাণ দৃষ্টে এই অভিমত প্রকাশ করি যে ভর্ত্তৃহরি উজ্জয়িনীর অধীশ্বর এবং সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ছিলেন। তিনি প্রথমে "শৃঙ্গারশতক" পরে বৈরাগ্যদশায় "নীতিশতক" ও "বৈরাগ্যশতক" রচনা করিয়াছিলেন। শতকাবলীর প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সকল পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ সকল পুস্তক বোম্বাই নগরের কাশীনাথ ত্রিম্বক নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলেন এক খানিতে লেখা আছে যে, "অথ ভর্ত্তৃহরি-ভূপতি-কৃত-বৈরাগ্যশতক-প্রারম্ভঃ।" আর এক খানির শেষে "ইতি শ্রীমহা-মুনীন্দ্র-ভর্ত্তৃহরিকৃতৌ বৈরাগ্যশতকস্য টীকা সমাপ্তা" এই কথা গুলি পাওয়া যায়। শৃঙ্গারশতকের এক খানি পুস্তকে লিখিত আছে "ইতি শ্রীমহাকবি চক্রচূড়ামণিনা ভর্ত্তৃহরিণা বিরচিতং শৃঙ্গারশতং দ্বিতীয়ং সম্পূর্ণং।" কিন্তু আর এক খানি পুস্তকের শেষে অনেক আড়ম্বর দৃষ্ট হইল। যথা—ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ-সামান্তনীমন্তচূড়ামণি কবিশেখর-যোগীন্দ্র-মুকুটমণি-শ্রীভর্ত্তৃহরি বিরচিতং বৈরাগ্যশতকং তৃতীয়ং পূর্ণতামগমৎ।"

উক্ত কাশীনাথ ত্রিম্বক স্বমুদ্রিত "নীতি-শতক ও বৈরাগ্য শতকের" অবতরণিকাতে বলিতেছেন যে—'ভর্ত্তৃহরি শতকাবলীর ন্যায় "বাক্যপদীয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বাক্যপদীয়ে মহাভাষ্যের নিয়মাবলী—শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। তৎসমস্ত "হরিকারিকা" নামে প্রসিদ্ধ। এখন কথা হইতেছে যে গোল্ডষ্টুকারের মতানুসারে খৃষ্টের পূর্ব্বে

১৪৪ অব্দে মহাভাষ্য রচিত হয়। এই গ্রন্থ কিছুকাল অজ্ঞাতভাবে থাকে, পরে চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি সুধীগন উহাকে সকলের নিকট সুবিদিত ও সমাদৃত করিয়া তুলেন। তদনন্তর ভর্ত্তৃহরি বাক্যপদীয় নামক বৃহৎ ব্যাকরণ গ্রন্থ শ্লোকচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়া পতঞ্জলির নিয়মাবলী—আরও অধিক প্রচারিত করিয়া দেন। অতএব বাক্যপদীয়ের রচয়িতা সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের সমকালীন হইলে, তাঁহার ও পতঞ্জলির মধ্যে এক শত বৎসরেরও অল্প অন্তর হইয়া পড়ে। কিন্তু এত অল্পকালের মধ্যে মহাভাষ্যের আদৌ অনাদর, পরে ক্রমিক প্রচার; অবশেষে বাক্যপদীয় সঙ্কলন এই সকল বহুকাল-সাপেক্ষ ঘটনা পরম্পরা কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? বিশেষতঃ তত প্রাচীন-কালে মুদ্রাযন্ত্রের অভাব ও দেশ হইতে দেশান্তরে গতায়াত নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল, তৎপ্রযুক্ত ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশ ব্যাপিয়া কোন পুস্তকাদির প্রচার হইতে গেলে বহু প্রতিবন্ধক অতিক্রম ও বহু-কাল ব্যয় হইত সন্দেহ নাই। এই জন্য ভর্ত্তৃহরি প্রথম বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ হইতে পারেন না; তাঁহাকে শকাব্দা-প্রণেতা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিলেই সকল দিক্ বজায় থাকে।”

উক্ত পণ্ডিতবর আর বলেন যে “ভর্ত্তৃ-হরি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা কিন্তু ‘বাক্য-পদীয়ের’ রচয়িতা নহেন, একথা হইতে পারে না। কারণ জনশ্রুতি এই উভয় কথারই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তাহার মধ্যে একাংশ সত্য, আর অন্য অংশ অলীক, এরূপ বলিলে চলিবে না।”

আমরা উক্ত মতের অসারত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বহু বাক্যাড়ম্বর করিব না। কেবল এই মাত্র প্রশ্ন করিব যে ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে জনশ্রুতি হইতে কিরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর দ্বারাই কাশীনাথকৃত আপত্তির খণ্ডন হইবেক। এক জনশ্রুতি অনুসারে ভর্ত্তৃহরি বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ও শতকা-বলীর রচয়িতা। দ্বিতীয় জনশ্রুতি অনু-সারে ভর্ত্তৃহরি বাক্যপদীয়ের প্রণেতা। কিন্তু এরূপ কোন জনশ্রুতি প্রচলিত নাই যে, যে ভর্ত্তৃহরি বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ও শতকাবলীর প্রণেতা, তিনিই বাক্যপদীয়ের রচয়িতা। পরন্তু এরূপ হওয়াও অসম্ভব। বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ যে ভর্ত্তৃহরি, তিনি প্রথমে রাজে-শ্বর ছিলেন, পরে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। প্রথমাবস্থায় শৃঙ্গারশতক ও দ্বিতীয় দশায় নীতি ও বৈরাগ্য শতক রচনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও কোন মতে অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি রাজা বা সংসারত্যাগী, তিনি যে বাক্য-পদীয়ের ন্যায় প্রকাণ্ড ও দুরূহ গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাভাষ্যের প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবেন; তাহা কোন মতে সম্ভবপর বোধ হয় না। বাক্যপদীয়ে এমন কোন বিষয় নাই যাহা এক জন ভোগবিলাসী রাজার কিম্বা সংসারদ্বেষী সন্ন্যাসীর

লেখনী হইতে বিনির্গত বলিয়া বোধ হয়। অতএব আমরা এই মীমাংসা করি, যে যতদূর প্রমাণপরীক্ষা পাওয়া যায়, তদনুসারে বস্তুতঃ দুই জন ভর্ত্তৃহরির অস্তিত্ব স্বীকার অপরিহার্য্য। প্রথম ভর্ত্তৃহরি সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ও শতকাবলীর রচয়িতা এবং দ্বিতীয় ভর্ত্তৃহরি "বাক্যপদীয়" নামক বৃহৎ গ্রন্থের প্রণেতা। যত দিন পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তত দিন আমরা এই দ্বিতীয় ভর্ত্তৃহরিকেই প্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্যের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। কারণ বাক্যপদীয়ে ও ভট্টিকাব্যে অসাধারণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। উভয়ই ব্যাকরণ গ্রন্থ; বিশেষের মধ্যে এই যে বাক্যপদীয়ে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম বিবৃত হইয়াছে, আর ভট্টিকাব্যে তাহার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভট্টিকাব্যের প্রণেতা—"শ্রীধরসূনু নরেন্দ্র" কর্ত্তৃক পালিতা বলভী নগরীতে ঐ কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। বোধ হয় তিনি পূর্ব্বে বাক্যপদীয় প্রণয়ন পূর্ব্বক সুধীসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এই জন্য নিজের আর অধিক পরিচয় দিবার দরকার বিবেচনা করেন নাই। দ্বিতীয় ভর্ত্তৃহরি কোন্ সময়ের লোক, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে কালিদাসের অনেক ঊর্দ্ধতন ও ভবভূতির বিলক্ষণ অধস্তন, তদ্বিষয়ে তাঁহার রচনাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। পরন্তু তদ্রচিত কাব্যের নাম ভট্টি হইল কেন, তাহার প্রকৃত মীমাংসা করা দুরূহ। বোধ হয় কবির উপাধি ভট্ট ছিল; তন্নিবন্ধন তাঁহার কাব্যের নাম ভট্টি রাখা হইয়া থাকিবেক।

এ স্থলে বোম্বাইনিবাসী ডাক্তার ভাউদাজির আপত্তির উল্লেখ করা উচিত। তিনি বলেন "সচরাচর ভর্ত্তৃহরিকে বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্র। কারণ বৈরাগ্যশতকের পঞ্চম কবিতায় বর্ণিত আছে যে উহার রচয়িতা এক জন প্রধান কবি, তিনি পুরস্কারের প্রত্যাশায় কতিপয় রাজসভায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় যথোচিত সম্বর্দ্ধনা না পাইয়া বিলক্ষণ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" আমরা এখন ঐ কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া দিব; তাহা হইলে পাঠকবর্গ ভাউদাজির আপত্তি ও আমাদের দ্বারা তাহার খণ্ডন সহজে বুঝিতে পারিবেন।

"ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং, ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা। ভুক্তং মানবিবর্জ্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ, তৃষ্ণে! জৃম্ভসি পাপ-কর্ম্ম-নিরতে! নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি॥" অর্থাৎ "অনেক দুর্গম দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই; জাতি কুলের সমুচিত অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্ফল

সেবা করিয়াছি; পরগৃহে কাকের ন্যায় শঙ্কাকুল চিত্তে অপমানে অন্ন ভোজন করিয়াছি। হা তৃষ্ণে পাপ-কর্ম্ম-পরায়ণে! তুমি এখনও বর্দ্ধমানা হইতেছ, কিছুতেই তোমার পরিতৃপ্তি হয় না।” এই কবিতাতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে ইহার রচয়িতা এক প্রধান কবি ছিলেন ও নিরর্থক অনেক রাজসভা পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বরং এরূপ বোধ হয়, যে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নানা দেশ ভ্রমণ ও অনুচিত সেবা করিয়াছিলেন এবং পরপ্রত্যাশী হইয়া কাল কাটাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক,এই শতকত্রয়ে যত উত্তম-পুরুষীয়-ক্রিয়া-বিশিষ্ট শ্লোক আছে; তৎসমুদয়কে যদি গ্রন্থকারবিষয়ক বর্ণনা বলিয়া ধরা যায়; তাহা হইলে তিনি এক অদ্ভুত পদার্থ হইয়া পড়েন। পাঠক বৈরাগ্য শতকের ৩২,৩৩,৩৪,৪১,৪২,৮৭, ৮৯,৯১ এই কয়েটি কবিতা তুলনা করিয়া দেখুন; আমাদের কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এ স্থলে খুলিয়া বলা ভাল যে আমরা প্রথমে নীতিশতকের দ্বিতীয় কবিতাটীকে ভর্ত্তৃহরি-বিষয়ক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহার প্রমাণ জনশ্রুতি। কিন্তু ভাউদাজী বৈরাগ্যশতকের পঞ্চম কবিতার যে অর্থ করিতেছেন, তাহার কোন অনুকূল তর্ক দেখাইতেছেন না। সুতরাং আমরা তৎকৃত ব্যাখা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

অধুনা আর একটী আপত্তির উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। নীতিশতকের ৭০ শ্লোক অভিজ্ঞান শকুন্তলে, ২৭ শ্লোক ও অতিরিক্ত (ক) ৭ শ্লোক মুদ্রারাক্ষসে এবং বৈরাগ্যশতকের অতিরিক্ত (ক) ৯ শ্লোক মৃচ্ছকটিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার কারণ কি? তবে কি ভর্ত্তৃহরি মুদ্রারাক্ষসকার বিশাখদত্তের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য কাশীনাথ ত্রিম্বক এই সরস উক্তি করিয়াছেন যে “ সংস্কৃত-সাহিত্যভাণ্ডারে অনেক ‘সুভাষিত’ প্রচলিত রহিয়াছে; তাহাতে পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেরই সমান অধিকার আছে। এই জন্য ঐ সকল কবিতা ভিন্ন ভিন্ন কালের কাব্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে বিরোধের কোন সম্ভাবনা নাই।” আমরা উক্ত পণ্ডিতবরের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কারণ যে সকল কবিতা গুলির কথা উল্লিখিত হইল, পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে তৎসমস্তই সাধারণ সম্পত্তি, কেবল গ্রন্থ-বিশেষের উপযোগী নহে।

(ক) See Nitisataka and Vairagya-sataka. Bombay edition.

# ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী

## তৃতীয় প্রস্তাব।

ম্যাট্‌সিনি চার্লস আলবার্টকে যে পত্র থানি লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল:—

১৮২১ খৃষ্টাব্দের কার্বোনারো ষড়যন্ত্রী রাজকুমার চার্লস আলবার্টের সার্ডিনিয়ার সিংহাসনাধিরোহণে ইতালীর অধিবাসীমাত্রেরই অন্তরে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে—যে রাজকুমার ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যে সকল প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হন এবং তৎকালে অসমর্থতা বশতঃ যে সকল প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্‌মুখ হন, এক্ষণে রাজাসনে আরূঢ় হইয়া অবশ্যই সে সকল প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ইতালীর অধিবাসীরা আহ্লাদপূর্ব্বক ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছে—তিনি সেই সময় সহচরবৃন্দকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন তাহা অবস্থাজনিত—নিজের ইচ্ছা জনিত নহে। "ইউরোপে এমন হৃদয় নাই যাহার শিরাসমূহে আপনার সিংহাসনাধিরোহণ-সংবাদ-শ্রবণে প্রবলতররূপে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; ইউরোপে এমন নেত্র নাই, যাহা এই নবজীবনে প্রবর্ত্তিত আপনার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আপনার উপর পতিত হয় নাই।"

রাজন্! আপনার সম্মুখ-জীবন-ক্ষেত্র সঙ্কটাপন্ন। ইউরোপ এক্ষণে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকার ও ক্ষমতা—কার্য্য প্রবণতা ও স্থিতি প্রবণতা লইয়া চতুর্দ্দিকে ঘোরতর সমর উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে রাজবৃন্দ বহুদিন হইতে যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক—অন্যদিকে প্রজাসাধারণ, যে সকল প্রকৃতিদত্ত অধিকার সকল হইতে এত দিন বঞ্চিত ছিল, তাহাদিগের পুনরুদ্ধারে দৃঢ় সঙ্কল্প। তর্ক বিতর্কের সময় অতীত হইয়াছে। এক্ষণে—হয় সমর, নয় প্রজাদিগের অধিকার প্রত্যর্পণ—এই দুই বিকল্পের মধ্যে যেটী ইচ্ছা আপনি অবলম্বন করিতে পারেন। প্রজারা বরং সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি তাহাদিগের প্রকৃতিলব্ধ অধিকার সকলের একটীরও পুনরুদ্ধারে পরাঙ্‌মুখ হইবে না।

রাজন্! এক্ষণে দুইটী পথ আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে বল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্রজাদিগকে করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে প্রার্থিত অধিকার সকল প্রজাদিগকে প্রদান পূর্ব্বক তাহা-

দিগের অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম পথের অনুসরণে অসংখ্য বিপদ্‌—অসংখ্য বিঘ্ন। রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত—প্রজাদিগের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্তপাত করিবেন, কি তৎক্ষণাৎ আপনার শরীর হইতে দুই বিন্দু রক্ত পতিত হইবে। এক জন প্রজার প্রাণবধ করিবেন, কি ষড়যন্ত্রীর নিষ্কোশিত অসি প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিবে। যদি দ্বিতীয় পথের অনুসরণ করিতে চা'ন, তাহা হইলে—বিচারক ও শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন, করের যথাযথ নির্দ্ধারণ ও বিনিয়োগ, দণ্ডবিধির কাঠিন্য সংযমন, এবং শাসনকার্য্যের অত্যাচার সকল নিবারণ প্রভৃতি দ্বারা আপনার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে এরূপ মনে করিবেন না। শাসনপ্রণালী অপরিবর্ত্তনীয় ভিত্তির উপর সংন্যস্ত না হইলে, রাজা ও প্রজা একটী দুশ্ছেদ্য সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ না হইলে, রাজ্যের শাসনকার্য্যে প্রজাদিগের অলঙ্ঘ্য ক্ষমতা ও অধিকার আছে স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত না করিলে—আপনার সে অভীষ্টসিদ্ধির কোন আশা নাই।

রাজন্‌! অতঃপর প্রজাদিগের প্রতি আপনার এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করে। আংশিক সংস্কার যথেচ্ছাচারের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যতদিন অযথাচারী রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কে দোষী ও কে নির্দ্দোষী তাহার নির্ব্বাচন-ক্ষমতা প্রজাদিগের হস্তে সন্ন্যস্ত না হইতেছে, যতদিন প্রজা-সাধারণ রাজদণ্ডের ঔচিত্যানৌচিত্য নির্ণয় করিবার অধিকারে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন অনুপযুক্ত কর্ম্মচারীর কর্ম্মচ্যুতিতেও প্রজাদিগের হৃদয় প্রশান্ত হইবে না; তাহারা এরূপ কার্য্যকে যথেচ্ছাচারের আর একটী অঙ্গ বলিয়া মনে করিবে। দণ্ডপ্রণালীর অবৈষম্য ও বিচারের প্রকাশ্যতা—প্রজারঞ্জনার্থ এই দুইটী বিষয় সর্ব্বথা অপরিহার্য্য।

রাজন্‌! অল্প স্বাধিকার ত্যাগে আর প্রজাদিগকে প্রশান্ত করিতে পারিতেছেন না। মানবজাতির যে সকল প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকারে তাহারা এতদিন বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, সেই সমস্তেরই পুনরুদ্ধারসাধন এক্ষণে তাহাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা রাজকীয় বিধির অধীন হইতে প্রস্তুত আছে—কিন্তু তদ্‌বিনিময়ে তাহারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় একতা চায়। তাহারা এক্ষণে বিভক্ত, বিচ্ছিন্নাঙ্গ এবং উৎপীড়িত; তাহাদিগের এক্ষণে জাতীয় নাম বা জাতীয় অস্তিত্ব নাই। বিদেশীয়েরা তাহাদিগকে দাসজাতি বলিয়া পরিহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহারা দেখিতে পায় যে স্বাধীন দেশের লোক এ দেশ দর্শন করিতে আসিয়া ইহাকে মৃত মহাত্মাদিগের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহারা দাসত্ব-হলাহলে উদর পরিপূরিত করিয়াছে, আর তাহারা পারে

না—এক্ষণে তাহাদিগের দৃঢ় সঙ্কল্প যে এ হলাহল তাহারা আর স্পর্শও করিবে না।

রাজন্! ইতালীর প্রদেশ মাত্রই যে অষ্ট্রিয়ার বিদ্বেষী তাহা বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই। আপনি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে যে ইতালীর প্রদেশ মাত্রেরই সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন তাহা বোধ হয় আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই নূতন পথ আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। আপনি এই নূতন পথে অগ্রসর হউন্—প্রজাসাধারণের উপর নির্ভর করুন্—দেখিবেন ফ্রান্স বা অষ্ট্রিয়া অপেক্ষা তাহারা আপনার অবিচলিত ও অসন্দিগ্ধ মিত্রের কার্য্য করিবে। রাজন্! আমি যে রাজমুকুটের কথা বলিতেছি—তাহা পিড্‌মণ্টের মুকুট অপেক্ষা সহস্র গুণে উজ্জ্বলতর ও মহত্তর। এই মুকুট মস্তকে ধারণ করার ভাব মনে আনিতে যে ব্যক্তির সাহস আছে, যে ব্যক্তি এই ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত আছে, যে ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এতদূর বলবতী যে সে এই মুকুটমণি হইতে সমুত্থিত কিরণমালা নিজ পাপে ও অত্যাচারে কলুষিত করিবে না, এই মুকুট—এই দেবদুর্লভ মুকুট—সেই মহাত্মারই শিরোভূষণ হইবে।

রাজন্! আপনি যদি এই ইতালীয় জাতীয় স্বাধীনতা-সমরের অধিনায়ক না হন, তাহা হইলে ইহাকে কিছুদিন বিলম্বিত করিবেন মাত্র, কখনই একেবারে নিবারিত করিতে পারিবেন না। বিধাতা ইতালীয় জাতির ললাটে ভাবী স্বাধীনতা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিধাতার লেখন কে খণ্ডন করে? "আপনি যদি ইহা না করেন, অপরে করিবে; তাহারা আপনার অভাবেও ইহা করিবে, অধিক কি আপনার বিরুদ্ধেও করিব।"

রাজন্! আপনার সিংহাসনাধিরোহণে সাধারণ আনন্দ ও সাধারণ উৎসাহ দেখিয়া আপনি ভ্রান্ত হইবেন না। আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এই আনন্দ ও এই উৎসাহের মূল কি? প্রজাসাধারণ আপনাকে তাহাদিগের সমস্ত আশা ও সমস্ত উচ্চাভিলাষের প্রতিভূ বলিয়া মনে করে এবং আপনার নাম স্মরণ মাত্র তাহাদিগের মনে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ষড়যন্ত্রী রাজকুমারের কথা সমুদিত হয়।

রাজন্! আমি আপনাকে ভূতার্থ বিদিত করিলাম। স্বাধীনতাপক্ষপাতী প্রজাবৃন্দ আপনার কার্য্যাবলীতে এই পত্রের উত্তর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল। সে উত্তর যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে ভবিষ্যৎ পুরুষ আপনাকে হয় মহত্তম পুরুষ—নয় ইতালীর শেষ প্রজাদ্রোহী রাজা—বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। এক্ষণে আপনার যথাভিরুচি।"

চাল্‌স্ আল্‌বার্টের প্রতি লিখিত এই পত্র খানি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে পারিসে পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। সেই পত্র খানির প্রথমে প্রকাশকের প্রতি লেখকের নিম্নলিখিত উক্তিনিচয় সন্নিবেশিত হয়।

"লণ্ডন, এপ্রিল ২৭, ১৮৪৭।

মহাশয়!

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমি রাজা চার্লস অ্যালবার্টকে যে পত্র খানি লিখি, তাহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনের জন্য আপনি আমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। তদুত্তরে আমি এই মাত্র বলিতেছি—যে সেই সময় হইতে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি বা যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছি, তৎসমস্তই সাধারণের সম্পত্তি। যিনি ইচ্ছা করেন, তিনিই যে কোনও প্রকারে সেই সমস্তের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন; তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

"কিন্তু আমি ইচ্ছা করি না যে এই অনুমোদন, পরামর্শ, বা উপদেশরূপে গৃহীত হয়। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিষয়টীতে সাবধান হইবেন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে রাজা প্রিন্স বা পোপ দ্বারা, কি বর্ত্তমানে কি ভবিষ্যতে, ইতালীর উদ্ধার সাধন হইবে না।

"ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলকে একত্রিত করা, বিদেশীয় অধীনতা হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করা—সামান্য রাজার কার্য্য নহে। এরূপ রাজার অসাধারণ প্রতিভা চাই, নেপোলিয়নের ন্যায় তেজস্বিনী কার্য্যপ্রবণতা চাই এবং অসামান্য ধর্ম্মপ্রবণতা চাই। অসাধারণ প্রতিভা—যদ্দ্বারা এই গুরুতর ব্যাপারের ভাব মনে অঙ্কিত করিতে পারা যায়—যদ্দ্বারা জয়লাভের সহিত অনিবার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তব্য-নিচয়ের জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নেপোলিয়নের ন্যায় তেজস্বিনী কার্য্যপ্রবণতা—সঙ্কলিত গুরুতর কার্য্যের অনিবার্য্য সহচর বিপদ্পরম্পরার সম্মুখীন হইবার জন্য ইহার প্রয়োজন নহে,—কারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সে বিপদের সংখ্যা অতি অল্পই হইবে;—কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক বন্ধন ও সর্ব্বপ্রকার সন্ধিবন্ধন ছেদনের জন্য,—রাজকীয় জীবনের যে সকল অভ্যাস ও আবশ্যকতা প্রজাদিগের অভ্যাস ও আবশ্যকতা হইতে স্বতন্ত্র ও দূরবিক্ষিপ্ত তাহাদিগের মূলোৎপাটনের জন্য,—ধূর্ত্ত ও ভীত মন্ত্রিদলের বাক্জাল ও কূট মন্ত্রজাল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য। অসামান্য ধর্ম্মপ্রবণতা—যদ্দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এতাবৎকালভুক্ত অধিকার-নিচয়ের অন্ততঃ কিয়দংশও পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। প্রজাদিগের অধিকার প্রজাদিগকে ফিরাইয়া না দিলে তাহারা সমরে ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কখনই প্রস্তুত হইবে না।

"যে সকল মহীপাল এক্ষণে পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তাঁহাদিগের কেহই এ সমস্ত গুণের আধার নহেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা, তাঁহাদিগের স্বভাব, এবং প্রজাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ অবিশ্বাস—তাঁহাদিগকে এ সমস্ত রাজো-

চিত গুণে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। বুঝি বিধাতা প্রজাদিগের সম্মুখে স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য-দিগকে এই সমস্ত রাজোচিত গুণে ভূষিত করেন নাই। যখন আমি রাজা চার্লসকে পত্র খানি লিখি তখনও আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এখনও সেইরূপ বিশ্বাস আছে। চার্লস অ্যালবার্ট যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন, তাঁহার পূর্ণ যৌবন; ১৮২১ খৃষ্টাব্দের গভীরতর প্রতিজ্ঞা সকল তখনও তাঁহার স্মৃতিতে দেদীপ্যমান,—বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের আর্ত্তনাদ তখনও তাঁহার শ্রুতিতে বিরাজমান,—তিনি প্রজাসাধারণকে অষ্ট্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবেন এই আশায় ও উৎসাহে প্রজাদিগের যে হৃদয়তন্ত্রী এক দিন বাজিয়া উঠিয়াছিল—তাহার প্রতিঘাতে তখনও তদীয় হৃদয়তন্ত্রী তাড্যমান। ইহাতেও তিনি ইতালীয়দিগের অভাব ও ইচ্ছা কি, তাহা জানিলেন না—ইহাতেও তিনি প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিলেন না।

"ইতালীয়েরা তাঁহার উপর যে প্রকাণ্ড আশাসৌধ নির্ম্মিত করিয়াছিল, আমি তাঁহার নিকট তাহা বিদিত করিয়াছিলাম মাত্র; সে সৌধ নির্ম্মাণে আমার কোন অংশ ছিল না।

"আপনি যদি মল্লিখিত সেই পত্র খানি পুনঃপ্রকাশিত করেন, তাহা হইলে—ফ্রান্সে যাঁহারা আপনাদিগকে নবদলের* স্রষ্টা ও অধিনায়ক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং নিয়মতন্ত্র রাজত্বের পক্ষপাতী বলিয়া আপনাদিগের গৌরব করিতেছেন—তাঁহারা অন্ততঃ বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদিগের এই দল নূতন দল নহে—ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয়দিগের মধ্যে যে জাতীয় দল† সংস্থাপিত হয় ইহা তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র; এবং তাঁহারা যে মত নূতন বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন সে মত সেই জাতীয় দলের মতের ছায়া মাত্র; জাতীয় দল অনেক বৎসরের প্রবঞ্চনার পর—অজস্র ভ্রাতৃরুধির পতনের পর—সে মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা সেই মতের অনুকরণ মাত্র। ইতালীয়েরা অসংখ্য বিপদ্পাতের পর,—বহুদিনের পরীক্ষার পর,—এই সত্য জানিতে পারিয়াছেন যে:—

তাঁহাদিগের সমস্ত আশা ও সমস্ত ভরসা তাঁহাদিগের নিজের উপর ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে।

আপনার

জোসেফ্ ম্যাট্সিনি।"

চার্লস আলবার্টের প্রতি লিখিত পত্রখানি সর্ব্ব প্রথমে মার্সেলিসে প্রকাশিত হয়। সার্ডিনিয়ার যে যে অধিবাসীকে

(*) A *new* Party ie the *moderate* Party.

(†) *National* Party.

ম্যাটসিনি নামতঃ চিনিতেন. ইহার এক এক খণ্ড ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ডাকের চিঠী খোলার পদ্ধতি তখন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয় নাই। তথাপি কি প্রকারে ইহার দুই চারিটী গুপ্ত মুদ্রাঙ্কন সম্পাদিত হইল। এইরূপে অনতিকাল মধ্যেই ইহা ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজা চার্ল্‌স ইহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঠও করিলেন।

অমনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সার্ডিনিয়ার সীমাস্থিত কর্ম্মচারিগণের প্রতি এই সার্কুলার জারী হইল যে—'ম্যাট্‌সিনি নামক কোন নির্ব্বাসিত ইতালীয়, যদি ইতালী প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যেন তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়'।

যাহা হউক এই পত্র প্রচারিত হইলে, ইতালীর যুবকসম্প্রদায় উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিসে বসিয়া ইতালীর একতা-সমর্থক যে স্বর মুখ হইতে সমুদ্গীরিত করিলেন, সেই স্বরের প্রতিঘাতে ইতালীর যুবকসম্প্রদায়ের নিদ্রিত-প্রায় হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল এবং সেই বাদ্যে তাঁহাদিগের হৃদয়ের নিদ্রিত বা অননুভূত হৃদয়াবেগের অতিশয় প্রাবল্য হইয়া উঠিল। ম্যাট্‌সিনি এই ভাবী শুভসূচনা সাহ্লাদে শিরোধার্য্য করিলেন। ম্যাট্‌সিনির অসমসাহসিকতা এই প্রথম উৎসাহ পাইল

যদিও যুগে যুগে ইতালীর পুরুষশ্রেষ্ঠগণের মুখ হইতে ইতালীর ভাবী একতা সূচক ভবিষ্যদ্বাণী সমুদ্গীরিত হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী তত্ত্ববিদেরা ইহাকে কার্য্যবিসম্বাদিনী রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাকে অসম্ভব-প্রলাপীর উক্তি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিলেও করা যাইতে পারে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না। ইতালীর স্বাধীন প্রদেশ সকলকে এক সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কোন একতার ভাব তাঁহারা মনে ধারণা করিতে পারেন না।

তাঁহাদিগের চিন্তা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া যতদূর ব্যাপৃত ছিল, জাতীয় স্বাধীনতা লইয়া ততদূর ব্যাপৃত ছিল না। কিন্তু যে দেশ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে?

যাহাহউক ইতালীর প্রজাসাধারণ—চার্ল্‌স আল্‌বার্ট সম্বন্ধে যে সকল ভ্রমে পতিত হন, তদীয় রাজত্বের প্রথম কার্য্য দ্বারাই সে সকল ভ্রমের অপনয়ন হয়। যে সকল লোক ১৮২১ খৃঃ তদুদ্ভাবিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে নির্ব্বাসিত হন, চার্ল্‌স রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগের স্বদেশে প্রত্যানয়ন আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহাদিগের অধিকাংশই বোধ হয় তৎপ্ররোচনা ব্যতীত কখন এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি আবার চার্ল্‌সের প্রিয় সহচর ছিলেন; তথাপি

তাঁহাদিগের স্বদেশে প্রত্যানয়ন বিষয়ে চার্ল্‌স একবারও ভাবিলেন না।

ম্যাট্‌সিনি এই ঘটনানিচয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। এই সকল শুভ চিহ্ন ইতালীর ভাবী স্বাধীনতা সূচক তাহাও তিনি বুঝিলেন। তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলীর প্রতি সাবধান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং কি প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এই সময় কার্লো বিয়াঙ্কো—যাঁহার সহিত ম্যাট্‌সিনি তৎকালে মার্সেলিসে সহবাস করিতেছিলেন—অ্যাপোফেসিমিনিস (১) নামক একটী গুপ্ত সমাজের অস্তিত্বের বিষয় ম্যাট্‌সিনিকে বিদিত করিলেন। ইহাকে একপ্রকার সৈনিক সভাও বলা যাইতে পারে। ইহার সভ্যদিগের নিকট হইতে শপথ গৃহীত হইত ও তাঁহাদিগকে পরস্পর-পরিচায়ক সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদত্ত হইত। ইহাঁদিগের মধ্যে পদ ও পদের ক্রমারোহণও প্রচলিত ছিল; এবং ইহাঁদিগের মধ্যে এরূপ কঠিন শাসন প্রচলিত ছিল যে, সে কঠিন শাসনে হৃদয়ের উৎসাহ ও ঐকাগ্রতার উৎস পর্য্যন্তও বিশুষ্ক হইয়া যাইত। অধিকন্তু এই সমাজ কোন সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল না।

কিন্তু ম্যাট্‌সিনির সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সুশিক্ষা বিধান ও বিদ্রোহের বীজ বপন—এ দুইটীই তাঁহার সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল। চিন্তা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানই তাঁহার প্রবলতর হৃদ্গত ভাবের বিষয় ছিল। বিশেষতঃ কেন্দ্রোত্থ বিদ্রোহের পতনে তাঁহার মনে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, যে সকল সমাজদ্বারা সেই বিদ্রোহ নিয়মিত ও সঞ্চালিত হইয়াছিল সে সকলের মধ্যে অবশ্যই সজীবতার পূর্ণ অভাব বর্ত্তমান ছিল। এই জন্য তিনি নূতন লোক লইয়া তাঁহার সমাজ গঠিত করিবেন স্থির করিলেন।

ইতালীকে স্বাধীন করা তাঁহার সমাজবন্ধনের এক মাত্র উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইতালীর মহত্ত্ব ও ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত করা—ইতালীকে তাহার অতীত কীর্ত্তি-নিচয়ের উপযোগিনী করা এবং ইতালীর হৃদয়ে তাহার ভাবী কর্ত্তব্যনিচয়ের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করা—তাঁহার সমাজবন্ধনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ম্যাট্‌সিনির এই উচ্চতম মতসকল ইতালীর তৎকাল-প্রচলিত সাধারণ মত-সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

ইতালী সকল বিষয়েই ফ্রান্সের মুখ চাহিয়া থাকিত। ইতালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ গুলিকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করা এবং ইতালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ গুলির স্বতন্ত্রভাবে অবস্থোন্নতি করাই—ইতালীয় সাধারণের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত ইতালীকে এক শাসনের অধীন করা, সমস্ত ইতালীকে এক শিক্ষাপ্রণালীতে দীক্ষিত করা সমস্ত

(1) Apophasimenes.

ইতালীকে এক নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা, সমস্ত ইতালীকে এক জাতিতে পরিণত করা—এ সমস্ত ইতালীয় সাধারণের বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত ছিল। ইঁহাদিগের কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ ছিল না। অধিক কি বর্ত্তমান অসহ্য ক্লেশরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা যে কোনপ্রকার শাসনপ্রণালীর এবং যে কোন ও লোকের অধীন হইতে প্রস্তুত ছিল।

ইতালী যে পর-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং স্বাধীনতা-সমরে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ—এ ভাব কেবল ম্যাট সিনিরই অন্তরে সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হয়। ম্যাট্‌সিনির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে——

আত্ম-নির্ভর-পর না হইলে কোন জাতিই স্বাধীন হইতে পারে না।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ফরাশি গবর্ণমেণ্টের জঘন্য অনুবর্ত্তিতা হইতে স্বদেশকে উন্মুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ম্যাট্‌সিনি জানিতেন যে—ইতালীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বার্থপরতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসনে "নিরভিসন্ধি আত্মত্যাগ" * দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন আশা নাই। তিনি জানিতেন যে নিস্বার্থ আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে ইতালীয়েরা কখনই বিজয়-মার্গে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তিনি জানিতেন যে অবিচ্ছিন্ন আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে ইতালীয়েরা বিজয়ী হইয়াও বহুদিন আত্মগৌরব রক্ষণে সমর্থ হইবে না।

কার্ব্বোন্যারিজম্‌ সম্প্রদায় ম্যাট্‌সিনির নিকট এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া প্রতীত হইল। অষ্টাদশ লুই এবং দশম চার্ল্‌সের রাজত্ব কালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত সমদর্শী সমাজের † ন্যায়, ইহার লক্ষ্য এত অনির্দ্দিষ্ট ছিল যে তাহা কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন। অটল বিশ্বাস ও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যতিরেকে কখনই একতা সম্পাদিত হয় না, এবং একতা ব্যতিরেকেও কখন মহতী অবদান-পরম্পরা সংসাধিত হইতে পারে না।

যৎকালে দুর্দ্দান্ত নেপোলিয়ন ইউরোপের ভস্মরাশির উপর প্রকাণ্ড একতা-সৌধ নির্ম্মাণ করেন, যৎকালে ইউরোপে এক দিকে ভাবী শুভের বলবতী আশা যুবক-হৃদয়কে এবং অন্য দিকে দুর্দ্দমনীয় সর্ব্বগ্রাসকরী বৃত্তি বৃদ্ধ-সৈনিক-হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছিল, যৎকালে এক দিকে প্রজারা দূর হইতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবী রাজ্যের মোহন মূর্ত্তির ছায়া মাত্র অবলোকন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছিল ও অন্যদিকে গবর্ণমেণ্ট অতীত ঘটনাবলীর নিদর্শন

(*) Disinterested self-sacrifice.

(†) Liberal association.

দেখাইয়া পূর্ব্বপ্রচলিত অত্যাচার সকল পুনরাবির্ভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই কালে—সেই পরস্পরবিরোধী মত সকলের সংঘর্ষ কালেই—কার্ব্বোন্যারিজম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবহেতু পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার লোকই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইল; এবং যে ভীষণ তমোরাশি তৎকালে ইউরোপ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার অভ্যন্তরে ইহার প্রকৃত অবয়ব অতি অস্পষ্টরূপেই উপলব্ধ হইতে লাগিল।

যত দিন কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায়কে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করা সম্ভবপর ছিল, তত দিন ইহা সিসিলির রাজগণের আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।* এই সামান্য উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কার্ব্বোন্যারিজম্ দেশীয় লোকের মনকে প্রকৃত লক্ষ্যের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। যদিও রাজগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া ইহা রাজকীয় উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত মূর্ত্তিধারণ করিয়াছিল, তথাপি ইহা অতর্কিতভাবে পূর্ব্বের কতকগুলি অভ্যাসের অনুসরণ করিত। এই সম্প্রদায়ের আর একটী সাংঘাতিক দোষ এই ছিল যে ইহা সমাজের উচ্চতম শ্রেণী হইতেই অধিনায়ক সকল মনোনীত করিত। ইহার এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে ইতালীর উদ্ধার উচ্চশ্রেণী দ্বারাই সংসাধিত হইবে। ইহাঁরা জানিতেন না যে বৃহৎ বিপ্লব সকল প্রজাবৃন্দ ব্যতিরেকে আর কাহারও দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। অনেক রাজনৈতিক সমাজেই এই ভয়ঙ্কর ভ্রম অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে।

কার্ব্বোন্যারিজমের আর একটী প্রধান দোষ এই ছিল যে ইহা সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজসৌধের কিরূপে মূলাকর্ষণ করিতে হয় তাহাই শিখাইত; কিন্তু কিরূপে সেই স্থলে নব সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হয় তাহা শিখাইত না।

এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা দেখিলেন যে যদিও জাতীয় স্বাধীনতা বিষয়ে সমস্ত ইতালীয়েরাই একবাক্য; তথাপি জাতীয় একতা বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে; এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জন্য ইহার অস্তিত্বের প্রয়োজন রহিল না। সেই অবধিই ইহা নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইতে লাগিল।

* কার্ব্বোন্যারিজম্ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে পুলিশমন্ত্রী মাঘেলা ও রাজা মিউরাটের যত্নে সর্ব্ব প্রথমে সিসিলি রাজ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অনতিকাল মধ্যে অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারীই ইহার অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু ১৮১৪ খৃঃ ইহা মিউরাট্ কর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া, রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। লর্ড বেণ্টিকের নিকটও ইহা এইরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। পরে যখন নেপোলিয়নের অত্যাচার নিবারিত হইয়া, পূর্ব্বপ্রকার শাসনপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন আর রাজ্যতন্ত্রের

ও জাতীয় স্বাধীনতার মধ্যে যে গুরুতর প্রভেদ আছে তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন।

তাঁহারা এই সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পতাকার উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা—এ উভয়ই অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাহাকে বলে এবং কি উপায়েই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন না; কেবল এই মাত্র বলিলেন যে ভবিষ্যতে যখন আবশ্যক হইবে তখন দেশের উচ্চশ্রেণীস্থ লোকেরাই তাহার মীমাংসা করিবেন।

এইরূপে তাঁহারা জাতীয় একতা * শব্দ স্থানে জাতীয় মিলন † শব্দ প্রয়োগ করিলেন। ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকল এক শাসনের অধীন হইবে ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকল এক সন্ধিসূত্রে পরস্পর সম্বদ্ধ হইবে,—জাতীয় মিলন শব্দে এই দুই অর্থই বুঝাইতে পারে।

সাম্য ‡ বিষয়ে এই সম্প্রদায় কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। অথবা এরূপ অস্পষ্টভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহা হইতে প্রয়োজন মত বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থও ব্যক্ত হইতে পারে।

এইরূপে কার্ব্বোনারিজম্ একতাবন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও, তৎকালে সাধারণ মনে যে সকল সন্দেহের ও প্রশ্নের আন্দোলন হইতেছিল সে সকল সন্দেহের কোন উৎকৃষ্ট মীমাংসা বা সে সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিল না। যাহাদিগকে বিপদ্‌প্রাঙ্গনে আহ্বান করিতেছে, যাহাদিগের নিকট হইতে বিবিধ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহাদিগের নিকটও ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর কোন বিবরণ প্রকাশ করিল না।

সকল শ্রেণীর লোকই ইহার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। কারণ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই ইচ্ছা এবং সকলেরই চেষ্টা যাহাতে বর্ত্তমান শৃঙ্খলা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইরূপে এই সমাজের সভ্যসংখ্যা অসাধারণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। যদিও এই সম্প্রদায়ের মত সকল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল তথাপি ইহার অধিনায়কদিগের প্রজা-সাধারণের উপর বিশ্বাস না থাকায়, তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না। প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি ও সহকারিতা প্রাপ্ত হইলে, এই সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, এই জন্যই কেবল এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা প্রজাসাধারণের সহানুভূতি ও সহকারিতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাদিগকে কোন অব্যবহিত কার্য্যে

* Unity.
† Union.
‡ Equality.

নিযুক্ত করিবেন তাঁহাদিগের এরূপ কোন ইচ্ছা ছিল না।

এই সমাজের যুবক-সম্প্রদায় উৎসাহ-পূর্ণও কার্য্যদক্ষ, স্বদেশহিতৈষী ও সাধারণতন্ত্রপ্রিয়, যুদ্ধ কুশল ও গৌরব-প্রিয়; কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায় সাম্রাজ্য-প্রিয় ও কার্য্যকুণ্ঠ, বিশ্বাস শূন্যও আশা-বিরহিত এবং শুদ্ধ নিজেরাই উৎসাহ ও সাহসে বঞ্চিত হইয়াও ক্ষান্ত নহেন—যুবকহৃদয়ের উৎসাহ ও সাহসের বীজ পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ প্রাচীন সম্প্রদায়ের হস্তে তাদৃশ যুবক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অর্পিত হইল।

ক্রমে কার্ব্বোন্যারোদিগের সংখ্যা এত অধিক হইল যে তাহাদিগের গুপ্তভাব অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। অনতিকাল মধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া দলপতিরা দলস্থ ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অবতারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সেই গুরুতর কার্য্যে তাঁহারা স্বয়ং অসমর্থ হইয়া এক জন অধিনায়কের—এক জন রাজার—অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই দিন হইতেই কার্ব্বোনারিজমের পতন আরম্ভ হইল—এই দিন হইতেই কার্ব্বোনারিজম্ একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইল।

ক্রমশঃ।

# চিন্তা তরঙ্গিণী।

হঠাৎ মনেতে কেন হইল উদয় রে?
নির্ব্বাপিত ছিল কেন জ্বলিয়া উঠিল রে?
অকস্মাৎ কোথা হ'তে, ভাবান্তর হ'ল চিতে
আবরণ চক্ষে ছিল কে হরি লইল রে
কেন কেন দেখাইলি কেন দ্বার সরাইলি
যা ছিল তা ছিল মোর কেন পুনঃ তুলিলি
প্রবল অনল বল্ কেন জ্বালাইলি রে?

২

নিদ্রিত মক্ষিকাদলে কেন জাগাইলি রে?
দারুণ দংশনজ্বালা কেন ভোগাইলি রে?
মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধে হল যন্ত্রণা করে আকুল,
বিষেতে শরীর মম জর্জ্জরিত হল রে!
একেবারে ঝাঁকে২ উড়িয়াছে লাখে২,
একেরে ধরিতে গেলে সহস্রটা দংশেরে
মাতিল যে অরিদল কেমনে নিবারি রে?

৩

সেই সে প্রকৃতি দেখ সেই সে মূরতি রে
সেই সে জগৎ দেখ সম ভাবে আছে রে!
সেই গৃহ সেই খানে সেই আমি এই স্থানে
সকলি ত চারিদিকে সেই ভাবে আছে রে,
তবে কেন হ'ল হেন, বিষবোধ হয় কেন
মানবের সুখ কেন বাড়ায় যন্ত্রণা রে?
হেরিতে তাদের কেন ফিরে না নয়ন রে?

৪

নির্দয় নিয়তি! মোর কি করিলি দশা রে
যৌবনেতে আঁখি দুটি মেলিতে দিলিনে রে
যৌবনে না দিতে পা, কপালে মারিলি ঘা,
নৃশংস! মারিলি তুই ফুটন্ত কোরকে রে!
দারুণ পাষাণ লয়ে দিলি ফেলি এ হৃদয়ে
মরিল চাপনে তার আশা-নবাঙ্কুর রে!
অঙ্কুরে দলিলে হয় এতই কি সুখ রে?

৫

অথবা——
অভাগা জীবন চির-দুখ-ভোগ তরে রে!
রাখি তবে এয়ে বল কি ফল পাইতে রে?
অবিরত শোকানলে, মন প্রাণ সদা জ্বলে,
কোথায় সে শান্তি? লোক-উপচার মাত্র রে?
দুখ গতে সুখোদয়, কভু নয় কভু নয়,
ভুলাতে নির্ব্বোধে ইহা হয়েছে কল্পিত রে
গভীর "দুঃখের নদী" কভু না শুকায় রে!

৬

কেবা বলে সুখ দুখ ভ্রমে এক চক্রে রে?
এক গেলে অন্য আসে বিধির নিয়মে রে?
কই রে কই তা হয় এই আসি দুখময়
যাপিতেছি একভাবে পোহায় না নিশি রে
এই আমি চারি ধার, দেখিতেছি অন্ধকার,
বিন্দু মাত্র শ্বেত চিহ্ন দেখি না কোথাও রে!
কেমনে বলিবে সূর্য্য—উদিবে আবার রে?

৭

আবার উদিবে সূর্য্য কেমনে বলিবে রে?
আবার কি শিশুকাল ফিরিয়া আসিবে রে?
আবার কি সেই মতে, পাব কাল কাটাইতে
সেরূপ স্বচ্ছন্দ চিতে আহ্লাদে আব্যর রে!
কে কোথা শুনেছে হেন ভাঙ্গা জোড়া লাগে
পুনঃ
ভেঙ্গেছে হৃদয় মম বার বার ঘাতে রে
জনমের মত সুখ গিয়াছে তেয়াগি রে।

৮

পাব না জেনেছি সুখ—দিবে না বিধাতা রে
সুখ মুখে শোক রাশি লিখেছিল ভালে রে,
বিন্দু মাত্র সুখ ছিল শিশুকালে, তাহা গেল,
এখন যেতেছি আমি সাগরের তলে রে!
কে আছে রে বল আর, দুঃখী সমান আমার
সংসার কারার মাঝে নাহিক দ্বিতীয় রে
সমবেদী বন্ধু বলি আলিঙ্গিব যারে রে!

৯

দ্বিতীয় হৃদয় মোর নাহিক সংসারে
দারুণ মরম ব্যথা জানাইব কারে রে
ভাই বন্ধু আছে যারা কখন জিজ্ঞাসে তারা
পাইলে সহজ বাক্য না দাঁড়ায় রে!
হৃদয় পুড়িছে শোকে জানেনা তাহতে লোকে
নানা কথা তাই কহি হৃদয় আঘাতী রে,
বাড়ায় শোকের রাশি বরষি গঞ্জনা রে।

১০

তবে আর কেন——
ত্যজিব সংসার এ যে ধরি যোগী বেশ রে!
সংসার আমার স্থান কখন ত নয় রে!
বনে বনে বেড়াইব, বনস্থলী কাঁদাইব,
গলা ছাড়ি মনভোরে দুখ গান গাহিরে
কুটিল চাহনি চাহি, বিঁধিতে সেখানে নাহি,
ছলনা করিতে কেহ আসিবে না মোরে রে!
স্নেহভাবে তারা সবে দাঁড়াইয়া রবে রে।

গঙ্গাধর শর্ম্মা।

# সরোজিনী।*

সুপ্রসিদ্ধ ইউরিপাইডিসের নাটকাবলির মধ্যে ইফিজিনিয়া অলীসে এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাহার সরল উপাখ্যান ভাগ সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল। ভ্রাতৃদ্বয় এগামেমনন Agamemnon এবং মেনেলিয়সের Menelaus সহিত ক্লাইটেমেনিষ্ট্রা Clytemnestra এবং তদীয় সহোদরা হেলেনের Helen বিবাহ হইয়াছিল। প্যারিস কর্ত্তৃক হেলেন হরণে বিখ্যাত ট্রয় যুদ্ধের উৎপত্তি। ট্রয়াভিমুখে যাত্রাকলীন সমুদ্র মধ্যে এরূপ একটি প্রতিকূল বাত্যা উত্থিত হয় যে গ্রীকসামন্তগণের পোত সমূহকে অলীস নামক স্থানে বহুকাল অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই অবস্থিতিকালে কল্‌যাস নামক আচার্য্য গণনা করিয়া বলেন ডায়ানা দেবীর কোপেই এই প্রতিকূল ব্যাত্যা সমুত্থিত হইয়াছে। সেই দেবীর কোপ শান্তি না হইলে তাহাদিগের ট্রয় যাত্রায় বিস্তর ব্যাঘাৎ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এগামেমনন যেমন দেবীর পবিত্র হরিণকে বধ করিয়াছেন, সেইরূপ রাজপুত্রী ইফিজিনিয়াকে যদি ডায়ানার সমক্ষে বলিস্বরূপ সমর্পণ করা হয় তবে একদা সমস্ত অশান্তির প্রশমনের আশা করা যাইতে পারে। এই বাক্যে সমগ্র গ্রীক সেনানী ও সামন্তগণ উন্মত্ত প্রায় হইয়া এগ্যামেমননকে কন্যা প্রদানে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। এগ্যামেমনন কি করেন, অবশেষে অগত্যা কন্যা দানে স্বীকৃত হইলেন। জনকের এই নিদারুণ আদেশে ইফিজিনিয়া বিবাহ ব্যপদেশে আনীতা হইলেন। কিন্তু বলিদান কালে দেবতারা সেই সরলা বালাকে এরূপে গ্রহণ করিলেন যে সেই বালিকা অকস্মাৎ অদৃশ্যা হইল এবং তৎস্থানে একটি ছাগশিশু পরিদৃষ্ট হইল। আচার্য্য তখন সেই ছাগশিশুর বলিদানে দেবীর কোপ প্রশান্তি করিলেন।

এই মূল উপাখ্যানের সহিত সরোজিনীর উপাখ্যানের সাদৃশ্য এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। শুদ্ধ এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সরোজিনী প্রণীত হয় নাই, ইহা ইউরিপাইডিসের এক প্রকার অনুবাদ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সামান্য অনুবাদ নহে। ইউরিপাইডিসের গ্রন্থে যে সমস্ত উপকরণ প্রদত্ত হইয়াছে সরোজিনীতে তাহা বহুল পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। দুই এক বিষয়ে সরোজিনী ইফিজিনিয়া অপেক্ষা

* সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক। পুরুবিক্রম নাটক রচয়িতা কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৯৭। মূল্য ১৷০ মাত্র।

উৎকৃষ্টতরও হইয়াছে। সরোজিনী, ইফিজিনিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; বিজয় এমিলিস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আমাদিগের গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্য মধ্যে গ্রীক আদর্শের নাটক প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য নিতান্ত যত্নশীল হইয়াছেন। পুরুবিক্রম কতদূর গ্রীক আদর্শে প্রণীত, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোন পাক্ষিক পত্রের সমালোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সরোজিনীও গ্রীক আদর্শে বিরচিত। গ্রন্থকার তন্মধ্যে ঔপন্যাসিক আদর্শের ঈষদাভাস দিবার জন্য যে প্রয়াস পান তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। সফোক্লিস এবং ইউরিপিডিসের মধ্যে ঔপন্যাসিক ভাব প্রবিষ্ট হইবার নহে। তাঁহাদিগের নাটকে গ্রীক আদর্শের চূড়ান্ত। তাহাদিগের গ্রন্থ মধ্যে নাটকীয় রস ক্রমশঃ প্রগাঢ়তর হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্য কিছু প্রবেশ করিবার যো নাই। করিতে গেলে রসভঙ্গ হইয়া পড়ে। সরোজিনীতে দুই এক স্থলে এই দোষও ঘটিয়াছে। ফতেউল্লার চরিত্র অতি চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহা অন্য নাটকে অন্য স্থানে গ্রন্থের অলঙ্কার স্বরূপ বিবেচিত হইত। কিন্তু সরোজিনীতে তাহার উপযুক্ত স্থান নাই। এখানে তাঁহার সহিত যে যে স্থানে সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি বটে, কিন্তু নাটকীয় ঘটনার সহিত তাহার অসঙ্গতি ও রসের ব্যতিক্রম আলোচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে বিরক্তও হইয়াছি।

যে নাটক অবলম্বনে সরোজিনী বিরচিত হইয়াছে, গ্রন্থকারের তাহা স্বীকার করা উচিত ছিল। যে গ্রীক আদর্শে সরোজিনী প্রণীত হইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া ও গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য হইয়াছিল। কারণ এতদ্দেশে সে আদর্শ প্রচলিত নাই। এখানে চিরকাল ঔপন্যাসিক আদর্শেরই সমাদর। যাঁহারা চিরকাল চিত্রফলকের সৌন্দর্য্য, এবং বর্ণবিভাসের ঔজ্জ্বল্য ও মাধুরীর সমাদর করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ভাস্কর্য্যের স্থির সৌন্দর্য্য সহসা সম্যকরূপে প্রতীয়মান হওয়া দুঃসাধ্য। বাস্তবিক একটী ভাস্করীয় কার্য্য এবং একখানি চিত্রফলকে যে প্রভেদ, গ্রীক জাতীয় দৃশ্যকাব্য এবং ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্যেও সেই প্রভেদ। চিত্রফলকে প্রধান চিত্র বিষয় ভিন্ন যেমন বৃক্ষ, পুষ্প, নদী, পর্ব্বত, মেঘ প্রভৃতি বস্তুতে ভূমিটী অঙ্কিত থাকে, তদ্রূপ ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্যেও প্রধান ব্যক্তি অনেক ভিন্ন অপ্রধান ব্যক্তি এবং চরিত্রের ও সমাবেশ থাকে। সম্পূর্ণ গ্রীক নাটক ফাইলক টেটিসে আমরা চারিটি মাত্র ব্যক্তি দেখিতে পাই, কিন্তু শকুন্তলায়, বিদূষক, মৎস্যজীবী, প্রহরী প্রভৃতি কত অপ্রধান চরিত্র ও লক্ষিত হয়। বাস্তবিক সংসার ক্ষেত্রে যে প্রকার পদার্থ সকল পরস্পর পরিবেষ্টিত ও সহকৃত আছে, ঔপন্যাসিক দৃশ্য কাব্যে সেই

প্রকার। কিন্তু গ্রীক আদর্শে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু উদাত্ত ও মহৎ তাহা বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে আণুবীক্ষণিক চিত্রে প্রদর্শিত হয়।—সরোজিনী, রাজমহিষী, লক্ষণ সিংহ ও বিজয় সিংহ এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। ঔপন্যাসিক ও গ্রীক আদর্শ দুইটি স্বতন্ত্র সুন্দর পদার্থ হইলেও এই দুই প্রকার র দুই সাহিত্য ভাণ্ডারে থাকা আবশ্যক।

সরোজিনী ইফিজিনিয়ার অনুবাদ হইলেও তাহার ব্যক্তিগণের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। সরোজিনী ঠিক ইফিজিনিয়া নয়; লক্ষণ সিংহ ও আগেমেমননের প্রতিকৃতি নহে। সরোজিনীর প্রকৃতিতে গ্রীক কন্যা অপেক্ষা অধিকতর কোমলতা আছে, লক্ষণ সিংহ গ্রীক রাজ অপেক্ষা অধিকতর চপলচিত্ত। ইফিজিনিয়াতে পিতৃ ভক্তি ও সৎকার্য্যের গৌরব লালসা, সরোজিনীতে পিতৃভক্তি ও প্রণয় উভয়েই সমপ্রবল, উভয়েরই প্রবলতা সুন্দর রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে, প্রণয়ের নৈরাশ্য এবং পিতৃভক্তি সরোজিনীকে গৌরব লালসায় লইয়া গেল, ইফিজিনিয়াতে গৌরব লালসা—কারণ,সরোজিনীতে তাহা ফলস্বরূপ। এই খানেই গ্রীক এবং ভারতীয় কন্যার প্রভেদ। গ্রন্থকার এইটি বুঝিয়া যে প্রকার কৌশলে সরোজিনীকে গ্রীক কন্যা হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মানবচরিত্রবোধের বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে।

গ্রীক নাটকে এখিলিসের চরিত্র অতি সামান্য। এখিলিস গ্রীক, কিন্তু বিজয় সিংহ গ্রীক নহেন। বিজয় সিংহ অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক। তিনি গ্রীশ দেশীয়ও নন, ভারতবর্ষীয়ও নন, তিনি এক স্বতন্ত্র দেশের এবং স্বতন্ত্র সময়ের লোক। ইউরোপে গ্রীশ এবং রোমের দিন অবসান হইলে যখন মধ্যে যুগের কাল রাত্রি উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর পুরুষকার সেই রাত্রিকালে দুর্ব্বলা অবলাগণের ধর্ম্ম রক্ষণে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। বিজয় সিংহ এই কালের বীর। তাহার পুরুষকার এই কাল সমুচিত। তিনি ভারতবর্ষীয় নন, তিনি ঠিক ইউরোপীয় মধ্য যুগের উপন্যাস-সমুচিত বীর পুরুষ। রাজমহিষী গ্রীক মহিষীর অনুলিপি, কিন্তু রাজপুত কন্যা সমুচিত। গ্রন্থকার নাটকীয় ব্যাপার রাজপুতনায় কল্পনা করিয়া স্বকীয় প্রয়োগ কুশলতা গুণের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। নহিলে তাঁহার নাটকীয় ব্যাপারের কল্পনা কথঞ্চিৎ অসঙ্গত বোধ হইত। রাজমহিষীর চরিত্র তিনি অতি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। এমত কি তাঁহার রাজমহিষীকে মূল আদর্শ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠতর বোধ হয়।

বিজয় সিংহকে যে রোষেনারা ভাল বাসিবেন একথা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু এ প্রণয়ও বিলক্ষণ সঙ্গত। এক এক জনকে অবলোকন করিবা মাত্র যে এক একটী যুবতীর চিত্তবিকার অকস্মাৎ উৎপাদিত হয়, রোষেনারার প্রণয় ঘটনা সেই প্রকার। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায়

এই চিত্ত বিকারের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে না। রোষেনারার চরিত্র গ্রন্থকার অতি চমৎকার ভাবে ধীরে ধীরে অঙ্কিত করিতে ছিলেন, কিন্তু কি করিবেন তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল। নাটকীয় ঘটনা অন্যবিধ হইলে রোষেনারা একটি অপূর্ব্ব চরিত্র হইত, তাহা হইলে তাহার চিত্র সম্পূর্ণ হইতে পারিত। গ্রন্থকার রোষেনারাকে প্রবিষ্ট করাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম নাটকীয় ব্যাপারের ভাগ্য অন্যবিধ হইয়া উঠিবে। বাস্তবিক অন্যদিকে নাটকীয় ব্যাপারের গতি কিয়ৎ পরিমাণে প্রয়োজিত হইয়াছিল, কিন্তু কে জানে গ্রন্থকার তাঁহাকে কেবল গ্রীক নাটকের ছাগের স্থানীয় করিয়াছেন? তাঁহার বলিদানে ভৈরবাচার্য্য যে কুসংস্কারের প্রতিফল পাইলেন এইটি ঘটনা-কল্পনার সৌন্দর্য্য। যে রূপে সরোজিনীর বলিদান রহিত হইল, তাহা হাস্যজনক হইলেও আচার্য্যেরা কেমন সময় ও অবস্থা বুঝিয়া অতি অশ্রদ্ধেয় উপায়ে ও আপনাদিগের বিদ্যা ও শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করেন ইহাই প্রদর্শন করা গ্রন্থকারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

ইফিজিনিয়া নাটকখানি বড় বৃহৎ নহে। তাহার অনতিদীর্ঘ পরিসর মধ্যে ইউরিপাইডিস্ এ প্রকার চমৎকার নাট্য সংস্থান সমূহ রচনা করিয়াছেন, যে তন্মধ্যে নাটকীয় রস ক্রমশঃ প্রগাঢ়তর হইয়াছে। আমাদিগের গ্রন্থকার উপন্যাসকে বিস্তারিত করাতে কোন কোন স্থানে রসের প্রগাঢ়তার হীনতা সম্পাদিত হইয়াছে।

ইফিজিনিয়াতে যে সমস্ত হৃদয়ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, সরোজিনীতে তাহার ন্যূনতা ঘটে নাই। কি লক্ষ্মণসিংহ, কি সরোজিনী, কি রাজমহিষী, ইহাদিগের হৃদয়ভাব এবং সেই ভাবের প্রাবল্য ক্রমে ক্রমে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সরোজিনীর হৃদয়ভাব অতি চমৎকার ভাবে পরিব্যক্ত দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। সরোজিনীতে এক দিকে পিতৃভক্তি, অন্য দিকে প্রণয়—এ দুয়েরি প্রাবল্য কেমন সুন্দরভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে। বাস্তবিক বঙ্গসাহিত্য-মধ্যে সরোজিনীর হৃদয়ভাব এক অপূর্ব্ব এবং অমূল্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সরোজিনীর হৃদয়ভাবে যে বৈচিত্র আছে, ইফিজিনিয়াতে তাহা নাই। সরোজিনীর জনকানুরাগ, পতিপরায়ণতা এবং অবশেষে গৌরবাকাঙ্ক্ষায় তাহার চরিত্রকে এরূপ বিচিত্র এবং অনুরঞ্জিত করিয়াছে যে ইফিজিনিয়াতে ততদূর দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু এ নাটকের পরিণাম অতি দোষার্হ। ইহা বিয়োগান্ত নাটকের আতিশয্য দোষে কলঙ্কিত। ইহার পরিণামে আমাদিগের হৃদয় শুদ্ধ ব্যথিত নয়, শিহরিতে লাগিল এবং অবশেষে বিদগ্ধ হইতে লাগিল। সরোজিনী যখন বলির জন্য আনীত হইয়াছেন, তখন তাহার বলির জন্য

যতই বিলম্ব ও ভৈরবাচার্য্যের নানাবিধ রচনা হইতেছিল, তখন আমাদের হৃদয়কে ধীরে ধীরে কে যেন ছুরিকাঘাতে নিদারুণ বেদনা দিতেছিল। সরোজিনী নিহত হইলেও আমরা তত বেদনা পাইতাম না। তাহার মুক্তি কার্য্যতঃ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ভাবের লাঘব হয় নাই। সেই মুক্তি নিবন্ধন বেদনার আংশিক উপশম না হইতে হইতে অকারণ রোষেণারা বধ্যভূমিতে উপস্থিত। রোষেণারার তপ্ত রুধির অবলোকন করিলাম। চিতোরের রাণী তৎপরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও যথেষ্ট নহে। চারিদিকে প্রাণ বিসর্জ্জনের ভীষণ রোল সঙ্গীত হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর প্রাণে কি এতদূর সহ্য হয়? চিতোরের রমণীগণের প্রাণবিসর্জ্জনে যে মহত্ত্ব আছে, পূর্ব্বকার নৃশংস ব্যাপারে তাহার বিপরীত ফল ফলিয়া উঠিল। এইটী গ্রন্থের প্রধান দোষ।

ইউরিপাইডিসের নাটকাবলি এই দোষাশ্রিত। গ্রন্থকার বোধ হয় ইউরিপাইডিসের নাটকাবলি পড়িয়া এই প্রকার নিদারুণ রুধির ব্যাপারে আনন্দলাভ করিতে শিখিয়াছেন। ইউরিপাইডিস কেন, সমগ্র গ্রীক পুরাণ রুধিরে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়োগান্ত নাটকের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া কখন কখন শোণিতপাতের অভিনয় দর্শনে স্বীকার করি বটে, কিন্তু চক্ষের সম্মুখে হত্যাকাণ্ড বারম্বার দেখিলে ক্রমে হৃদয়ের কোমলতা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এ পৃথিবী এত প্রকৃত দুঃখে পরিপূর্ণ, যে আমোদ করিতে আসিয়াও আমরা যদি আবার কাল্পনিক শোকে নিমগ্ন হইব ও নিয়ত অশ্রুধারায় নয়ন পরিপ্লুত হইবে তবে আর কোথায় ক্ষণেক শান্তিলাভের জন্য গমন করিব? এই জন্য ভারতবর্ষে বিয়োগান্ত নাটক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ক্ষণেকের জন্য আমোদ করিতে আসিয়া সকলেই সহাস্য মুখে গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, এই উদ্দেশে ভারতবর্ষে সকল নাটকেই শুভান্ত হইয়াছে। ইংরাজী নাটক পাঠে যখন আমরা বিয়োগান্ত নাটকের উচ্চতর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলাম, তখন বঙ্গসাহিত্য মধ্যে তাহার প্রচলন রীতি আবশ্যক বলিয়া নিশ্চিত হইল। কিন্তু তা বলিয়া সেই প্রকার নাটকের আতিশয্য দোষ আমরা সাহিত্য মধ্যে অধিক প্রচলিত হইতে দিতে পারি না। বঙ্গসাহিত্যের এখন শৈশবকাল, এবং বঙ্গসাহিত্য আমাদের নিতান্ত আদরের সম্পত্তি; অতএব এক্ষণে গ্রন্থকারগণ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত না চলিলে সে সাহিত্যের অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

সমালোচকগণ ইউরিপাইডিসের নাটকাবলির যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারই আর একটী সরোজিনীতে বিদ্যমান দেখা যায়। ইউরিপাইডিস অত্যন্ত বক্তৃতা ভাল বাসিতেন, একন্য তাহার নাটকের অনেক স্থলে বাগ্মীতার পরিচয় আছে। নাটকের ভাষা যে প্রকার সংক্ষিপ্ত অথচ ওজস্বী হওয়া উচিত, সরো-

জিনিতে সে প্রকার ভাষার সমধিক অভাব। সরোজিনীতে আবার এত পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে যে অভিনয় কালে কোন কোন অংশ পরিত্যাগ না করিলে বিরক্তি ধরিবে। একটু কৌশল প্রয়োগ করিলে এ দোষ অনায়াসে পরিবর্জ্জিত হইতে পারিত।

সরোজিনীর অন্যান্য দোষ অতি সামান্য। এজন্য আমরা তাহার উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। তবে দুই একটী উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইউরিপাইডিসের অতিরিক্ত যে উপাখ্যান ভাগ সরোজিনী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা বিশিষ্ট রূপে সংলগ্ন বোধ হয় না, তাহা ইফিজিনিয়ার উপাখ্যান মধ্যে উত্তম রূপে মিশ্রিত হয় নাই। সে অংশ যেন স্বতন্ত্র হইয়া আছে। এজন্য সমগ্র উপাখ্যানকে উত্তম রূপ সংলগ্ন বোধ হয় না। ফতেউল্লা এত বার মুসলমানের পরিচয় দিতেছে, এতবার ধরাও পড়িয়াছে অথচ সে নির্ব্বিরোধে হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইয়া আছে, এই আশ্চর্য্য!

ইউরিপাইডিসের নাটকাবলির গুণ এই, তাহা নাটকীয় সংস্থানে * পরিপূর্ণ। উপাখ্যানের ঘটনাবলির প্রাচুর্য্যে পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করিতে তিনি তত ভাল বাসিতেন না। কেবল চমৎকার ও সুন্দর নাটকীয় সংস্থান দ্বারা লোকের মন মোহিত করিব এই তাহার ইচ্ছা ছিল। এবং তাঁহার নাটকে সেই প্রকার সংস্থানই অধিক পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং সরোজিনীও ইফিজিনিয়ার এই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। সরোজিনীর মধ্যভাগকে যে [illegible] উৎকৃষ্ট বোধ হয় তাহার কারণ এই, সে ভাগের অধিকাংশ ইউরিপাইডিস হইতে গৃহীত [illegible] গ্রন্থকার যে কতিপয় দৃশ্য রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথম দৃশ্যটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার গাম্ভীর্য্য সরোজিনীর উপাখ্যানের সমুচিত বটে। ভৈরবাচার্য্যের কৌশল দ্বারা এই দৃশ্যের অলৌকিকত্ব অপনীত হইয়াছে বলিয়া ইহা অধিকতর সুন্দর বোধ হয়। কিন্তু তৎপরেই ফতেউল্লার দৃশ্যে বিপরীত রসের সঞ্চার হওয়াতে পূর্ব্ব দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে এইটি দৃশ্য যোজনার দোষ।

যাহা হউক সরোজিনীর গুণ ভাগের জন্য আমরা তাহার দোষাবলি উপেক্ষা করিতে পারি। সরোজিনী এক নূতন আদর্শের এক খানি চমৎকার নাটক হইয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এ প্রকার নাটক বঙ্গসাহিত্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বঙ্গসাহিত্য যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। এজন্য আমরা সরোজিনী প্রণেতাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাব পরিসমাপ্ত করিলাম।

শ্রীপূ—

* Dramatic Situations.

# কবিত্ব ও কাব্য সমালোচনা।

## দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সত্য এবং সৌন্দর্য্যই কাব্যের সার। অতএব যাহা কিছু এই সত্য এবং সৌন্দর্য্যের ভাব হইতে উৎপন্ন আমরা তাহাকেই কাব্য সংজ্ঞা দিতে পারি। এতদনুসারে সমস্ত কাব্যরাজ্যকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা, জড়মূর্ত্তি কাব্য ও স্বরমূর্ত্তি কাব্য। যে সৌন্দর্য্য-ভাব কবির মনে উদ্ভূত হইয়া জড়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাই জড়মূর্ত্তি কাব্য; আর যাহা কণ্ঠ এবং বীণাদির স্বরকে অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাই স্বরমূর্ত্তি কাব্য। *

ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থে খোদিত ও গঠিত মূর্ত্তি সকল, অথবা এতদনুরূপ আর যাহা কিছু কবির অন্তর্গত সৌন্দর্য্যভাবের সৃষ্টি, তাহাই জড়মূর্ত্তি কাব্য। আমরা জড়মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যকে কাব্য সংজ্ঞা প্রদান করিলাম; যেহেতু যাহারা একই আকর হইতে উৎপন্ন, এবং একই ফলের প্রসবিতা, তাহারা কেন একই সংজ্ঞা প্রাপ্ত না হইবে। আধার ভেদে একই বস্তু বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে না। কবির কাব্য-রচিত মূর্ত্তিতেও যে সৌন্দর্য্য, খোদিত, গঠিত, বা চিত্রিত মূর্ত্তিতেও সেই সৌন্দর্য্য; উভয়ই তুল্য সুখকর। আমরা এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিস্তারে এই জড়মূর্ত্তি কাব্যের বিষয় বলিব।

সৌন্দর্য্য কাব্যমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবার সময় কলা অর্থাৎ শিল্পের আশ্রয় লইয়া প্রকাশ পায়। এই নিমিত্ত যিনি কবি, তাঁহাকে কলাভিজ্ঞ হইতে হয়, নচেৎ তাঁহার সৌন্দর্য্যভাব অন্তর্নিহিতই থাকে, বাহ্য-প্রকাশের পথ পায় না। জড়মূর্ত্তি-কাব্য-রচয়িতা কবির তক্ষণী ও তুলিকা প্রভৃতিতে, এবং স্বরমূর্ত্তি কাব্য রচয়িতা কবির, বাক্য ও ছন্দবিন্যাসে পটুতা লাভ করা প্রয়োজন। প্রথমোক্ত কবি নিজে তক্ষণী বা তুলিকা ধারণে অক্ষম হইলে, অপর কোন সুদক্ষ শিল্পীর নিকট হইতে আপন অভিপ্রেত মূর্ত্তি রচনা বিষয়ে কথঞ্চিৎ সফলযত্ন হইতে পারেন, কিন্তু তাহা তাঁহার পূর্ণ পরিতৃপ্তিকর হওয়া সন্দেহ। শেষোক্ত কবির এ বিষয়ে সফলতা লাভ আরো কঠিন। যেহেতু জড়মূর্ত্তি কাব্য রচনার উপাদান ধাতু প্রস্তরাদি ও বর্ণ উভয়ই পৃথক্ পাওয়া যায়, কিন্তু স্বরমূর্ত্তি কাব্য রচনার উপাদান একমাত্র বাক্য; এই বাক্যেই গঠন, বাক্যেই বর্ণ

* আমরা জড়মূর্ত্তি ও স্বরমূর্ত্তি—কাব্যের এই দুইটী নাম নূতন প্রদান করিলাম; যেহেতু এতদনুসারে কাব্য বিভাগ ও তাহার সংজ্ঞা প্রদান—ইংরাজী বা সংস্কৃতে আমাদের জানা নাই।

এবং এই বাক্যেই জীবন ও ক্রিয়া সকলি প্রদান করিতে হয়। বাক্যের এই সকল গুণ স্বয়ং কবি ভিন্ন অপরের বুঝা বড় সহজ কথা নয়।

কলার সহিত সৌন্দর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধ সংস্থাপিত আছে। কলার যে পরিমাণে উৎকর্ষ, সৌন্দর্য্যও সেই পরিমাণে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। কালীয়দহের নীল জলরাশির উপর, ভ্রমরগুঞ্জরিত, বিকশিত কমলকাননে, পদ্মাসনা, কোমলাঙ্গী, ষোড়শী রূপসী, দুই হস্তে দুইটি করি ধারণ করিয়া একবার গ্রাস ও একবার উদ্গীরণ করিতেছে। এই একটি মনোহর সৌন্দর্য্য ভাব। জড়মূর্ত্তি কাব্য-কলা ইহাকে প্রকাশ করিবার সময়, যদি জলরাশির বর্ণ এমন ভাবে ফলান, যে উহাকে গভীর জল বোধ না হয়, যদি গুঞ্জরিত ভ্রমর সকলকে মধুপানোন্মত্ত জীবন্ত ভ্রমর বলিয়া বোধ না হয়, যদি কোমলাঙ্গীকে কঠিনাঙ্গী বলিয়া বোধ হয়; যদি ষোড়শীকে, বর্ষীয়সী বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এখানে কলার অপটুতায়, সৌন্দর্য্য ভ্রংশ হইয়া যাইতেছে। এই জন্য কাব্যকারের কলায় পারদর্শিতা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন।

জড়মূর্ত্তি কাব্যকলার অধিকার অতি অল্প; ইহা সৌন্দর্য্যের গঠন, বর্ণ ও জীবন্ত ভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু ক্রিয়ার গতি দেখাইতে পারে না। উপরোক্ত কমলেকামিনী মূর্ত্তিতে আমরা হস্তধৃত করিকে ধৃত মাত্র দেখিব, গ্রাস ও উদ্গীরণ ক্রিয়া দেখিতে পাইব না। বিজ্ঞানের কৌশল বলে কথঞ্চিৎ তাহা দেখিবারও সম্ভাবনা, কিন্তু তক্ষণী বা তুলিকার তাহা সাধ্য নয়। জড়মূর্ত্তি কাব্যে সৌন্দর্য্যের এককালে একটি ভাবের মাত্র অবতারণ হইতে পারে, কিন্তু উক্ত ভাবের কারণ প্রকাশ করিতে পারে না, বিষয়ও প্রকাশ করিতে পারে না। একটি তক্ষণ বা চিত্র মূর্ত্তি, করতল বিন্যস্ত কপোল, বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছে, আমাদের মন তাহার বিষণ্ণ ভাবে আকৃষ্ট হইল, কিন্তু সেই বিষণ্ণ ভাবের কারণ কি, তাহার বিষয় কি জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল; কিন্তু সে কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার উক্ত মূর্ত্তির সাধ্য নাই; তাহার অধিকার সেই পর্য্যন্ত। যে বস্তু যে পরিমাণে আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তিকর, তাহার সেই পরিমাণে উৎকর্ষ স্বীকার করিব। এতদনুসারে আমরা জড়মূর্ত্তি কাব্যকে সমস্ত কাব্যরাজ্যের চরম উৎকর্ষের তুলনায় নিম্ন পদবী প্রদান করিতে পারি। জড়মূর্ত্তি কাব্য, তাহার আপন অধিকার মধ্যেই চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। সমস্ত কাব্যরাজ্যের মধ্যে সে পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিকর নয়।

জড়মূর্ত্তি কাব্য সকলকে আমরা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা, তক্ষণ, গঠন, এবং চিত্র। ধাতু, প্রস্তর এবং কাষ্ঠাদি কঠিন পদার্থকে খুদিয়া যে সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, তাহাই তক্ষণ। তক্ষণে কেবল গঠনো-

কর্ষেই সকল সৌন্দর্য্যভাব প্রকাশ করিতে হয়, বর্ণ ফলনার উপায় অবলম্বিত হইতে পারে না, যেহেতু ধাতু কিম্বা প্রস্তরের উপর বর্ণ ফলান বড় সহজ কথা নয়। কাষ্ঠও বর্ণ ধারণের উপযুক্ত সুন্দর পালিস্ হয় না. এবং চটিয়া, ফাটিয়া, শুষিয়া বর্ণকে নষ্ট করিয়া ফেলে। প্রাচীন গ্রীকেরা কখন কখন তাঁহাদের তক্ষণ মূর্ত্তিকে অধিকতর জাজ্জ্বল্য-জীবন দেখাইবার নিমিত্ত বর্ণ প্রলিপ্ত করিতেন, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্যের নিমিত্ত। মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তি সকলে, গঠন ও বর্ণ উভয়ই সংযুক্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উভয়ই অতৃপ্তিকর। মৃত্তিকার গঠনে লাবণ্য সুন্দর প্রকাশ হইয়া উঠে না, এবং উহার বর্ণও কাষ্ঠের উপরকার বর্ণের ন্যায় দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়। চিত্রে আবার, মূর্ত্তির গঠনভাব হইয়া উঠে না, ছায়ামূর্ত্তি মাত্র অঙ্কিত হয়। কিন্তু ইহাতে বর্ণ প্রলেপন কৌশল অতি চমৎকার রূপে খাটে। বর্ণ ফলনার কৌশলে আমরা ছায়ামূর্ত্তিকে যেন গঠিত মূর্ত্তিই দেখিতে পাই, জীবন্ত. শ্বাসিত দেখিতে পাই; ক্রোধ, লজ্জা, ভয়াদির উপরাগ দ্বারা বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সকল বুঝিতে পারি।

জড়মূর্ত্তিকাব্যের মধ্যে চিত্রেরই কৃতকার্য্যতা বেশী। বাহ্য বিকার দ্বারা অন্তর্গত বিকার দেখানই জড়মূর্ত্তি কাব্যের উদ্দেশ্য। তক্ষণ কেবল আকারে উহা দেখাইতে পারে, চিত্র আকার এবং বর্ণ উভয়ে দেখাইতে পারে। তক্ষণ লজ্জা পীড়িতা কোন সুন্দরী কামিনীর শারীর সঙ্কোচ মাত্র দেখাইতে পারে। চিত্র শারীর সঙ্কোচের সহিত শরীরের বিবর্ণ ভাব, গণ্ডস্থলের উপরাগ প্রভৃতি বর্ণ বৈচিত্রতাও দেখাইতে পারে। আমরা এই শারীর বিকার এবং বর্ণ বিকার উভয় দ্বারাই মূর্ত্তির অন্তর্গত ভাব বুঝিতে পারি। তক্ষণ-শিল্পির শারীর বিকারে অঙ্গ সকলের ভঙ্গী কোথায় কিরূপ হয়, তদ্বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বদর্শী হওয়া উচিত। চিত্রকরের শারীরবিকারের সহিত বর্ণবিকারও বিশেষ অধ্যয়ন করিতে হয়; কারণ তাঁহাদের উভয়েরি পারদর্শিতার ও কৃতকার্য্যতার ইহাই মাত্র ক্ষেত্র; বাহ্যবিকার দ্বারাই তাঁহাদের অন্তর্বিকার প্রকাশ করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট, ক্রিয়াশূন্য, অন্তরশূন্য কোন সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিতে হইলে, ইহাঁদের কৃতকার্য্যতা সেই স্থানে সহজ। মৃত্যুশয্যায় শায়িত কোন শব, নিদ্রিত কোন প্রাণী, কিম্বা নিশ্চেষ্ট, অপ্রাপ্ত বিকার-অন্তর কোন জীব, কিম্বা সাগর, পর্ব্বত, বনস্থলী প্রভৃতি কোন জড় সৌন্দর্য্য এই সকল, স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ ভঙ্গী ও সহজ বর্ণে রচিত হইতে পারে। অন্তর বিশিষ্ট জীবের অন্তর কখন কখন দুই তিন বা তদতিরিক্ত কারণে বিকার প্রাপ্ত হয়; এই বহুবিধ কারণের অন্তর্বিকার বাহ্য উপায় দ্বারা প্রকাশ করা মানব অন্তরের এবং শরীরের উভয়

বিধ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার প্রয়োজন।

জড় মূর্ত্তি কাব্যের প্রকৃতি, অধিকার, উদ্দেশ্য, পারদর্শিতা ও কৃতকার্য্যতা বিষয়ে যাহাকিছু বলা হইল, তাহাতেই বোধ হয় উহার বিষয় একরূপ বোধগম্য হইয়াছে। আমরা এক্ষণে উক্ত রূপ স্বর মূর্ত্তি কাব্যের বিষয় কিছু বলিতে প্রবর্ত্ত হইতেছি।

বলা হইয়াছে, স্বরমূর্ত্তি কাব্যে সৌন্দর্য্য স্বরকে অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তি ধারণ করে। এই স্বর বা শব্দ দ্বিবিধ, প্রকৃতিগত এবং রচিত। এই প্রকৃতিগত এবং রচিত স্বরকে আমরা উভয়বিধ ভাষা বলিতে পারি। প্রকৃতিগত, বা স্বাভাবিক ভাষা জন্তু মাত্রেরি পৃথক পৃথক আছে, উহা তাহাদের জাতী সাধারণের বোধ্য। মানবেরও এই জাতী সাধারণ-বোধ্য ভাষা আছে। ক্রোধ, শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদিতে আমরা যে বিশেষ বিশেষ সুর তুলিয়া উহা প্রকাশ করি, ঐ সকল সুর বিশেষ দ্বারায়,আমরা অন্তরের কোন্ ভাব-বিশেষ প্রকাশ করিতেছি, তাহা মানব মাত্রেই বুঝিতে পারে। ক্রোধের বলবৎ হুহুঙ্কার, শোকের করুণা স্রোত, এবং হর্ষের উল্লাস উচ্ছ্বাস, পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রপর্য্যন্ত যাবতীয় মানবজাতী পরস্পরে পরস্পরের বুঝিবে। রচিত বা কাল্পনিক ভাষা, সমস্ত পৃথিবীর লোক বুঝা দূরে থাক্,এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশের বুঝে না। এই কাল্পনিক ভাষার সৃষ্টিই বোধ হয়, মানব কল্পনার প্রথম সৃষ্টি। মানব সভ্যতা সোপানে এতদূর আরূঢ় হইয়াও অদ্যাপি পর প্রত্যাশী এবং প্রয়োজনের দাস। অতি আদিম অসভ্য অবস্থায় মানব যে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনের দাস ও অপরের সাহায্য প্রার্থী ছিল, তাহার আর সংশয় কি? স্বজাতীর প্রতি স্বজাতী বলিয়া যে বিশ্বাস ও আকর্ষণ, ইহাই সমাজ সম্বন্ধের প্রথম কারণ। সমাজবদ্ধ হইবা মাত্রই কাল্পনিক ভাষার সৃষ্টি হইতে থাকে। এক সমাজস্থ ব্যক্তিরা পরস্পরে পরস্পরের মনোগত ভাব বুঝিতে ইচ্ছুক হয়। তখন তাহারা পার্থিব পদার্থ সকলের ও মনোদ্ভূত ভাব সকলের সাধারণের বোধ্য হইবে বলিয়া এক একটী নাম নির্দ্দেশ করিতে থাকে। এই নাম তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কল্পিত হয়। এবং এই সকল কল্পিত নাম ক্রমে তাহাদের মধ্যে ভাষা রূপ ধারণ করে। যাহা ইচ্ছারকল্পিত, তাহা সর্ব্ব সমাজে সাধারণ হইতে পারে না। এক এক সমাজে এক এক রূপ; এই নিমিত্ত কাল্পনিক ভাষা পৃথিবীতে বহুবিধ।

আমরা সুরকে ভাষা সংজ্ঞা প্রদান করিলাম, যেহেতু, যাহা কণ্ঠ, তালু, প্রভৃতি শারীর যন্ত্র সকল দ্বারা উচ্চারিত হইয়া এক অন্তকরণের ভাব অপর অন্তকরণে বুঝাইয়া দেয়, তাহা ভাষা সংজ্ঞা কেন প্রাপ্ত না হইবে। কাল্পনিক ভাষারও এই নিয়ম। বাদ্য যন্ত্রাদির সুর কণ্ঠ তালু হইতে উচ্চারিত না হইলেও, উহা কণ্ঠ সুরেরই অনুকরণ মাত্র। সুরকে

ভাষা বলিবার আরো অনেক কারণ আছে। স্বরের সহিত অন্তরের এমন নিগূঢ় সম্বন্ধ সংস্থাপিত আছে যে তাহা অন্তরই বুঝিতে পারে, বুদ্ধি তাহা বুঝিতে পারে না। অন্তরের সহিত স্বর সকলের এই সম্বন্ধ যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি একেবারে আমাদের অন্তরের সহিত কথা কহিতে পারেন। এই স্বর সকলের বর্ণমালায় প্রধানতঃ সাতটী বর্ণ আছে, এবং অর্দ্ধ এবং সিকি ভাগানুসারে আরো অনেক গুলি বর্ণ সংখ্যা হইয়া থাকে। ইহার কোন একটী স্বরকণ্ঠে বা যন্ত্রে ধ্বনিত হইলে, অন্তঃকরণও সেই ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত ও জাগরিত হয়, যেন তাহার চির পরিচিত আত্মীয় কোন কেহ তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে। অন্তর সেই স্বরকে চিনিল, কি বুঝিল সেই তাহা জানে। এই রূপ বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্বর, ক্রম নিয়মানুসারে মিলিত হইলে, অন্তকরণ একটী বৃহৎ ব্যাপার বুঝিয়া ফেলে। সৃষ্টির পূর্ব্বে একার্ণব কালে যখন কিছুই ছিল না, পরমাণুর স্বত্বাও অনুমান মাত্র, তখন তাহার ভাষাও হইতে পারে না, বস্তু না থাকিলে, ভাষা নির্দ্দেশ দ্বারা কি বুঝাইবে? এই অনন্ত শূন্য, অসৃষ্টি, ইহা আমারা ভাবনাতেও আনিতে পারি না, আমাদিগকে বুঝাইবার অন্য কোন উপায়ও নাই, যদি কিছু থাকে তবে তাহা স্বর; স্বর সকল পরস্পর মিলিত হইয়া অন্তরে এমন এক ভাবের উদ্রেক করিয়া দিতে পারে, যেন আমরা দশদিক সেই অনন্ত শূন্যময় দেখিতেছি। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ স্বরের দ্বারায় এই অনন্ত শূন্যকে মানব মনের প্রতীতি করাইয়াছেন। স্বরের দ্বারায় ঋতু সকলের ভাবাবতরণ, প্রভাত, সন্ধ্যা প্রভৃতির ভাবাবতরণ সকলি হইতে পারে। বাস্তবিক এই স্বরের ক্ষমতা অতি অদ্ভুত। আমরা স্বরকে ভাষার সার ভাষা বলিতে পারি।

এই অন্তঃকরণের ভাবোদ্দীপক, এক একটি স্বরকে এক একটি রাগ কহে। তক্ষণ বা চিত্রমূর্ত্তির ন্যায় রাগেরও অধিকার অতি সামান্য; যেহেতু রাগও তাহার উদ্দীপ্ত ভাবের কারণ বা বিষয় কিছুই বুঝাইয়া দিতে পারে না। করুণারসোদ্দীপক একটি রাগিণী শুনিয়া মনে করুণা ভাবের উদ্দীপন হইল, কিন্তু এ করুণার কারণ কি, এবং বিষয়ই বা কি? —বিচ্ছেদের করুণা, কি শোকের করুনা, কি আশা ভগ্নের করুণা, আমারা কিছুই বুঝিতে পারি না। বিচ্ছেদের করুণা যদি হয়, তবে তাহার বিবরণ কি? শোকের করুণা যদি হয় তবে তাহারি বা বিবরণ কি? আশা ভগ্নের যদি করুণা হয় তবে তাহারি বা বিবরণ কি? ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা সকল উত্তেজিত হইতে থাকে, কিন্তু রাগ এই আকাঙ্ক্ষার কিছুই তৃপ্তি করিতে পারে না।

স্বরমূর্ত্তি কাব্য প্রথমেই এই রাগ মূর্ত্তিতে উৎপন্ন হয়, এবং ক্রম-উন্নতির দ্বারায় আমাদের এক রূপ সকল আকা-

জ্ঞার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। আমরা ক্রমে তাহা দেখাইব।

বাক্যের যাহা অতীত, রাগ তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ কোন গভীর ভাবে মুগ্ধ হইলে, স্বভাবতঃ এক প্রকার সুর তুলিয়া উহা প্রকাশ করিয়া থাকে। বাক্য সে গভীর ভাবের স্বরূপ প্রকাশে অক্ষম। যাহা লঘুতর ভাব, তাহাই বাক্য প্রকাশ করিতে পারে। অতএব বাক্য রাগের সহিত সংযুক্ত হইলে অন্তঃকরণের গভীর হইতে লঘুতর ভাব পর্য্যন্ত সকলি প্রকাশ পাইতে পারে। অন্তঃকরণের গভীর ভাব, অন্তর তাহার মর্ম্ম হইতে সুরের দ্বারায় বাহ্য প্রকাশ করিতেছে, এবং ঐ গভীর ভাবের কারণ ও বিবরণাদি লঘুতর বিষয়, বাক্য ঐ সুরের সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছে। এই বাক্য সংযুক্ত সুর, স্বরমূর্ত্তি কাব্যের দ্বিতীয় সোপান। ইহার নাম গীত বা গীতি কাব্য।

সুর যখন মুগ্ধ অন্তঃকরণের আবেগ হইতে উত্থিত হয়, তখন আবেগের মান্দ্য ও প্রাবল্য অনুসারে মন্দ ও দ্রুত কম্পনে উত্থিত হইয়া থাকে। শরীর কোন আবেগে উত্তেজিত হইলে, রক্ত স্রোত দ্রুত বহিতে থাকে, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও তদনুরূপ দ্রুত হইতে থাকে; তৎকালীন শরীর নির্গত সুরও দ্রুত বিচ্ছেদে নির্গত হয়; এবং ঐরূপ আবেগের মান্দ্যাবস্থার সুরও মন্দ বিচ্ছেদে নির্গত হয়। এই দ্রুত, মন্দ প্রভৃতি, সুর বিচ্ছেদকে ছন্দ কহে।

অতএব দেখা যাইতেছে, অন্তরাবেগের ভাষা ছন্দময়ী ভিন্ন হইতে পারে না। উদাহরণার্থ দেখাইতেছি। কোন পুত্র শোকাতুরা নারী, শোকের অতি প্রবলাবস্থায়, হয়ত এইরূপ ছন্দে শোক প্রকাশ করিতে পারে। যথা—

ওরে আমার, কি হলো রে,—
বুক ফেটে, যায় যে রে,—
কোথা গেলি, প্রাণের বাছা,
কোথা গেলে, পাব তোরে,—

এই ছন্দ, শোকের প্রবলাবস্থা হেতু দ্রুত গতিতে নির্গত হইতেছে। অপর শোকের অপেক্ষাকৃত মন্দাবস্থায় হয়ত এইরূপ ছন্দে নির্গত হইতে পারে। যথা—

সোণার পুতলি আমার, কোথায় লুকালি রে
এসে দেখা দে!
তোমার বিহনে রে বাপ্, সব শূন্য দেখি রে
সংসার আধার!
সকল আশার ভরা, ডুবালি আমার রে
বিষাদ সাগরে!
পথের কাঙ্গালী তুই, করিলি আমায় রে
দ্বারের ভিখারী!

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে ছন্দ সকল অন্তর আবেগের কেমন প্রকৃতিগত। অন্তরাবেগ মূর্ত্তি চিত্রণের ইহাই রেখাকর্ষণ। এই সকল ছন্দ-রেখা আবেগ-মুর্ত্তির যথাযথ না হইয়া যদি কবির ইচ্ছানুরূপ হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে আবেগ বিকৃত মুর্ত্তি ধারণ করে। আবেগের প্রাবল্য বর্ণনে যদি আমরা দীর্ঘ যতি ছন্দ প্রয়োগ করি, তবে তাহা ছন্দের অনু-

রোধে অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে মন্দ হইয়া আসিবে। ঐরূপ আবার আবেগের মান্দ্যাবস্থা বর্ণনে যদি হ্রস্ব যতি প্রয়োগ করি, তাহা হইলে উহা কিয়ৎ পরিমাণে ছন্দের অনুরোধে প্রবল হইয়া উঠিবে। প্রফুল্ল জনক দৃশ্য, গভীর দৃশ্য, ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রভৃতি দৃশ্য বর্ণনেও ঐরূপ দৃশ্যের প্রকৃতির অনুরূপ ছন্দ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়; নচেৎ তাহাদের ও প্রকৃতি বিকৃত হইয়া যাইবে। ইংরাজী কাব্য সকলে আমরা এরূপ ছন্দ নির্ব্বাচন কৌশল বড় দেখিতে পাই না, আগা গোড়া একখানি কাব্য কখন কখন একই ছন্দে রচিত হইয়া থাকে। কাব্য বহুবিধ রসের সমষ্টি, একই ছন্দে বহুবিধ রসের অবতারণ বড়ই অস্বাভাবিক। সংস্কৃতে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্যে বর্ণনীয় বস্তুর যেখানে যেরূপ ছন্দ-রেখা স্বাভাবিক, লেখনী স্বতঃই যেন তাহা প্রসব করিতেছে। এই নিমিত্ত এক খানি কাব্য এক ছন্দে রচিত হওয়া দূরে থাকুক, রস বৈচিত্রতায় ছন্দ বৈচিত্র স্থানে স্থানে প্রতি শ্লোকেই দেখিতে পাইব। কাব্য পাঠের সময় আমরা ছন্দের অনুসরণে কখন উত্থিত, কখন পতিত হইতেছি, যেন কাব্য ক্ষেত্রের বৈচিত্রময় ভূমিতে আমরা স্বয়ংই ভ্রমণ করিতেছি। ছন্দের এই তাৎপর্য্য গ্রহণে কবির বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত; যেহেতু কাব্যকলার ইহা একটী প্রধান অঙ্গ।

ছন্দ নির্ব্বাচনে কবির যেমন সতর্কতার প্রয়োজন, বাক্য নির্ব্বাচনেও তদ্রূপ। ছন্দ যেমন বর্ণনীয় বস্তুর রেখা, বাক্য তেমনি বর্ণ। তীব্র, কোমল, গম্ভীর, ভয়ানক প্রভৃতি ভাবের বাক্য নির্ব্বাচনও তাহার অনুরূপ চাই। তীব্রভাব কোমল বাক্যে প্রকাশ করিতে গেলে বাক্যের অনুরোধে তীব্রভাবের তীব্রত্ব অনেক কমিয়া যায়। আবার কোমলভাব, তীব্র বাক্যে কিয়ৎ পরিমাণে তীব্রত্ব পায়; গম্ভীর ভাব, লঘু বাক্যে লঘুত্ব পায়, এবং ভয়ানক প্রভৃতি ভাবও, সহজ বাক্যে সহজ হইয়া আসে। বাক্যের এই তীব্র, কোমলত্ব প্রকৃতি মাত্র লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট হইল না, তাহার আর একটী প্রধান গুণ লক্ষ্য করিতে হইবে; সে গুণ এই,—বাক্য সকল যে ভাব বিষয়ে বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেই ভাব বর্ণনে, সেই সকল বাক্য প্রয়োগই উচিত; ইহার দুইটী ফল আছে; তক্ষণ প্রভৃতি মূর্ত্তিতে যেমন আমরা যে পরিমাণ প্রস্তর ধাতুকে ডুবাইয়া লাবণ্য উপরে ভাসিতে দেখি, সেই পরিমাণ আমরা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি। ভাষাতেও তদ্রূপ যে পরিমাণে আমরা ভাবার ভাষাত্ব ভুলিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের লাবণ্য উপরে ভাসিতে দেখি, সেই পরিমাণে ভাষারও উৎকর্ষ। শব্দ সকল দুর্ব্বোধ্য হইলে লাবণ্য তাহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে, তক্ষণ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য প্রস্তরাভ্যন্তরস্ত হইলে যেমন কদাকার কর্ষক বোধ হয়, ভাষাও তদ্রূপ নীরস, কর্ষক হইয়া উঠে, ও তাহার সৌ-

সৌন্দর্য্য চিত্রণ উদ্দেশ্যের বিশেষ লাঘব হয়। শব্দ সকল এক ভাবে বহুল প্রয়োগ হইয়া আসিলে, তখন আর আমাদের শব্দের শব্দত্ব প্রতি লক্ষ্য থাকে না, উহা প্রয়োগ হইবা মাত্র আমরা একেবারে উহার সহিত উহার জড়িত ভাবের প্রতিই লক্ষ্য করি। দ্বিতীয়তঃ, বাক্য বহুল প্রয়োগ হইয়া আসিলে উহা ক্রমে আমাদের প্রিয়-ব্যবহার্য্য হইয়া উঠে, এবং ক্রমে এক ভাবের পরিবর্ত্তে বহুল ভাব-শ্লেষ উহার সহিত আকৃষ্ট হইয়া যায়, উহা ক্রমে ভাষার এক একটি রত্ন স্বরূপ হইয়া উঠে। এই রত্ন সকল নির্ব্বাচন করিয়া ছন্দ সূত্রের হার গাঁথাই প্রকৃত কবির কার্য্য।

আমরা গীতি কাব্যের কথা তুলিয়াই এই ছন্দ ও বাক্যের কথা বলিলাম। যে হেতু, ছন্দ ও বাক্যই সমস্ত কাব্য কলার মূল ও আদি অবলম্বন, ইহা না বুঝিলে কোন কাব্য বিষয়ই ভাল বুঝান যাইবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুরের সহিত, বাক্য সংযুক্ত হইয়াই গীত বা গীতি কাব্য রচিত হয়। সুর জড়মূর্ত্তি কাব্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত রসের কারণ ও বিষয় কিছুই বুঝাইয়া দিতে পারে না। বাক্য তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই কারণ ও বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়। কোন ব্যক্তি সুর সংযোগে গাইতেছে যথা—

"কি জানি কি মনে মনে ভেবেছে আমায়
না দেখিলে মরে প্রাণে,
দেখিতে না চায়—
তবু কেন দেখিতে না চায়!
আপনি দেখিতে গেলে,
কত যেন নিধি পেলে;
আদর করিতে এসে,
কেঁদে চলে যায়।
কাঁদিয়ে ধরিলে করে,
থর থর কলেবরে
চেয়ে থাকে মুখ পানে
পাগলের প্রায়;
সহসা চমকে উঠে,
সভয়ে চৌদিকে ছোটে;
আবার সমুখে এসে
কাঁদিয়ে দাঁড়ায়;
ছল ছল দুনয়ন,
ম্লান চারুচন্দ্রানন,
আকুল কুন্তল জাল,
অঞ্চল লুটায়;
আবার সমুখে নাই,
কেবল শুনিতে পাই
হৃদি ভেদি কণ্ঠধ্বনি
উঠে উভরায়।
সাধে কি সাধিল বাদ!
কেন হেন পরমাদ!
কেনরে বেঘোরে মোরা
মরি দুজনায়!"

এখানে সুরের সহিত বাক্য যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ রসের কারণ ও বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। কোন ব্যক্তি, কাহার প্রেমাসক্ত হইয়াছে, সে তাহা মুখে প্রকাশ করিতে পারে না,

কার্য্যে প্রকাশ করিয়া থাকে; অপর ব্যক্তি কার্য্যের দ্বারাই তাহার সেই প্রণয় ভাব বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়া প্রণয়রসে মুগ্ধ হইয়া ঐ গান গাইতেছে। আমরা প্রণয় রসের কারণ ও বিষয় বুঝিলাম বটে, কিন্তু উহা হইতে অপর আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হইল; আমরা প্রণয়ীদ্বয়ের, প্রণয়-বৈচিত্র্যের আপূর্ব্ব ঘটনা জানিতে ইচ্ছুক হইলাম; কিন্তু গীত সেই আপূর্ব্ব ঘটনা বর্ণনা দ্বারা আমাদের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি করিতে পারে না; স্থানে স্থানে গভীর স্থলে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারের প্রতি কৌতূহল জাগরিত করিয়া দেয় মাত্র। এই আকাঙ্ক্ষা আখ্যান কাব্য নিবৃত্তি করিতে পারে। আখ্যান কাব্য আপূর্ব্ব কোন এক বিশেষ ঘটনার বিষয় সমস্ত বর্ণন দ্বারায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিয়া থাকে। আখ্যান কাব্য এই নিমিত্ত, গীতি কাব্যের উচ্চ পদবী। আমরা আগত প্রস্তাবে আখ্যান কাব্যের বিষয় বলিব।

শ্রীরামচন্দ্রমুখোপাধ্যায়।

# বসন্ত-উচ্ছ্বাস।

১

সখিরে!
কেন আজি দূর বনে পিকবালা ঝঙ্কারে,
তরল চঞ্চল স্বরে,
রাগপ্রবাহিনী ঝরে,
ভাষায়ে কানন মরি, মধুময় আসারে!
পল্লবিত তরুগণ,
কুসুমিত কুঞ্জবন,
তরুপরে নবদল সমীরণে বিহারে;
সখিরে!
কেন আজি দূর বনে পিকবালা ঝঙ্কারে।

(২)

সখিরে!
সুশীতল পরশনে, সুরভি অনিলে,
বহিতেছে অবিরল,
ফুল্ল-ফুল-পরিমল,
বসন্তের অনুরাগে ছড়াইয়া অখিলে;
বরষি কাকলীকল,
কলকণ্ঠে সুকোমল,
সরস মধুরে আজি জাগাইছে কোকিলে;
সখিরে!
বহিতেছে সুমধুর সুরভিত অনিলে।

(৩)

সখিরে!
সজ্জিত প্রকৃতি আজি নবনীল শ্যামলে,
চারু বৃন্তাসনে বসি,
মধুময় মুখশশী,
খুলিছে সোহাগে মরি ফুলবধূ বিরলে,

সমীরণ-সোহাগিনী,
বসন্তের সরোজিনী,
ফুটিতেছে শতদলে, সুবিমল কমলে ;
সখিরে !
সাজিল প্রকৃতি আজি নবনীল শ্যামলে।

( ৪ )

সখিরে !
বিকসিত ফুলজালে বিভূষিত বল্লরী,
আরণ্য প্রণয়ভরে,
আলিঙ্গিয়া তরুবরে,
নাচিতেছে সোহাগিনী সমীরণে সিহরি,
চম্পক অপরাজিতা,
তরুপরে প্রফুল্লিতা,
প্রফুল্লিতা দামে দামে যুথিবন-সুন্দরী ;
সখিরে !
বিভূষিতা বনফুলে বসন্তের বল্লরী।

( ৫ )

সখিরে !
মধুকর-করম্বিত নবচূত-মুকুলে,
চূতলতা লাজভরে,
সুকোমল কলেবরে
আবরিছে কিশলয়-নিলীময় দুকুলে,
মোহিয়া অখিল বন,
উছলিছে অনুক্ষণ,
নন্দনের পরিমল নবস্ফুট বকুলে ;
সখিরে !
ঝঙ্কারিছে মধুকর নবচূত-মুকুলে।

( ৬ )

সখিরে !
বসন্তের পরশনে, প্রফুল্লিত অন্তরে,
কুসুম ললামপরি,
ফুলময়ী রূপেশ্বরী,
মন্মথমোহিনী রতি ফুলকুঞ্জে বিহারে ;
কুসুমে সজ্জিত কায়,
অনঙ্গ সলাজে চায়,
সম্মোহন শরে মরি নিজ বক্ষ বিদারে ,
সখিরে !
দাও করতালি মৃদু হাঁসি বিম্ব অধরে।

( ৭ )

সখিরে !
এই সেই মধুমাস সেই ফুল ফুটেছে ;
বসন্তের উন্মত্ত মন,
চুম্বিয়া কুসুমানন,
ঝঙ্কারি মধুরে অলি মধুপানে মেতেছে,
মলয় মরুত হায়,
ধীরি ধীরি বহে যায়,
সেই ফুল-কিরিটিনী বনলতা সেজেছে,
সখিরে !
এই সেই মধুমাস সেই যুঁই ফুটেছে।

( ৮ )

সখিরে !
এইত সুচারু শোভা ভাসিতেছে নয়নে।
এই মধু প্রফুল্লিত,
ফুলরাজি বিকশিত,
নব রসে, কিন্তু মম জীবনের কাননে ;
যৌবন কুসুম হায়,
নীরবে শুকায়ে যায়,
হবে কি সরস আর বসন্তের স্পর্শনে ;
সখিরে !
জীবনের মধুমাস ফিরিবে কি জনমে।

শ্রীহঃ—

# বিদ্যুৎ, বজ্র ও বিদ্যুদ্দণ্ড।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভূপৃষ্ঠে ও ভূবায়ুতে তড়িৎ আছে। এই তড়িৎ কিরূপে উদ্ভূত হয় তাহা অদ্যাপি নিশ্চিত হয় নাই। অনেকে অনেক রূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন। সম্ভবতঃ কতকগুলি কারণের সমবায়েই ইহার উৎপত্তি। কেহ২ রাসায়নিক ও ভৌতিক ক্রিয়াকেই এক মাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পৃথিবীতে কত শত রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ স্বতঃই সাধিত হইতেছে। আমাদের প্রতি নিশ্বাসেই রাসায়নিক ক্রিয়া, উদ্ভিদের প্রতি নিশ্বাসেও এই ক্রিয়া। প্রত্যেক জলবিন্দুর বাষ্পীভাবেও কেহ২ তড়িতের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সকল রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেই তড়িৎ উদ্ভূত হয় না। পরিশ্রুত ( Distilled ) জলের বাষ্পাভাবেও তড়িৎ উদ্ভূত হয় না। ক্ষার বা লবণাক্ত দ্রব্য জলের সহিত মিশ্রিত থাকিলে বাষ্প যৌগিক তড়িদাক্রান্ত ও জল বিয়োগিক তড়িদাক্রান্ত হয়। জলের সহিত অম্ল মিশ্রিত থাকিলে বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ বাষ্প বিয়োগিক-তড়িদাক্রান্ত হয়। এই কারণে ইহা অনুমিত হইয়াছে যে সমুদ্র-জলের লবণাধিক্য হেতু মেঘ যৌগিক-তড়িদাক্রান্ত ও পৃথ্বী বিয়োগিক-তড়িদাক্রান্ত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের নিশ্বাসও তড়িদুৎপত্তির একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অনেকে আবার বায়ুবেগে কঠিন ও তরল বস্তুদিগের পরস্পর ও পৃথিবীর সহিত ঘর্ষণকেই বায়বীর তড়িতের ( Atmospheric electricity) কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শিলা-বৃষ্টি ও বাত্যার সময় তড়িতের অত্যন্ত আধিক্য হইয়া থাকে এবং এই কারণে ঘর্ষণ একটী প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। সে যাহাহউক বায়বীয় তড়িতের ঠিক্ কারণ স্থির হয় নাই বটে, কিন্তু ইহার কার্য্য সকল অনেক পরিমাণে নিয়মবদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিদ্যুৎ অতিবিতড়িতা-বিশিষ্ট ( high tension ) দুই বিভিন্ন তড়িতের মিলন ফল। এক প্রকার তড়িৎ মেঘে ও অপর প্রকার ভূপৃষ্ঠে থাকে। কখন২ এক মেঘের তড়িৎ অপর মেঘের তড়িতের সহিত মিলিত হইয়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। মেঘ সকল সচরাচর যৌগিক তড়িদাক্রান্ত কিন্তু কখন ২ বিয়োগিক তড়িদাক্রান্তও হইয়া থাকে।

সকলেই জানেন যে বিদ্যুৎ দৃষ্টি-সন্তাপক আলোক বিশেষ। এই আলোকের বর্ণ আমরা শুভ্রই দেখিয়া থাকি কিন্তু উচ্চ পর্ব্বতের উপর হইতে গোলাপী আভা বিশিষ্ট দেখায়। তাহার কারণ উপরের বায়ুস্তরের গাঢ়তা অল্প। বিদ্যুৎ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই ইহার অপর নাম ক্ষণপ্রভা। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হইলেও ইহা তাৎক্ষণিক ( Instantaneous ) নহে অর্থাৎ অত্যন্ত অল্পক্ষণ থাকিলেও সে সম-

য়ের পরিমাণ আছে। এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগের প্রায় এক ভাগ এই আলোকের স্থায়িত্ব। যে অল্প সময় মনে ধারণা করাও দুরূহ তাহার নির্ণয় করা যে মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ইহা হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু ইহা অতি সুনিপুণ অথচ সহজ উপায়ে নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। আপাততঃ দুর্ব্বোধ হইবে বলিয়া সে উপায়টী লেখা গেল না। তবে বিদ্যুতের স্থায়িত্ব যে অতি অল্প তাহা নিম্ন-লিখিত পরীক্ষার দ্বারা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। হুইট্ষ্টোন সাহেব ( Wheatstone ) প্রথম এই পরীক্ষা করেন। মনে কর করাতের ধারের ন্যায় দন্ত-বিশিষ্ট এক খানি চাকা এমত বেগে ঘুরিতেছে যে তাহার দন্ত গুলি দেখা যাইতেছে না। মনে কর সেই চাকা যেন অন্ধকারে এই রূপ বেগে ঘুরিতেছে, এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকিল, চাকা যত বেগেই ঘুরুক্ না সেই বিদ্যুতালোকে চাকার দন্তগুলি দৃষ্ট হইবে এবং বোধ হইবে যেন সম্পূর্ণ স্থির হইয়া আছে। তাহার কারণ বিদ্যুতালোক যে অল্পক্ষণ থাকে সে সময়ের মধ্যে চাকার ঘূর্ণন এত অল্প যে অনুভূত হয় না।

বিদ্যুদ্দাম সকল ( Flashes of lightning ) দৈর্ঘ্যে বহুক্রোশব্যাপী এবং সচরাচর আকৃতিতে করাতের ধারের ন্যায়। এইরূপ আকৃতির কারণ এইযেসেই তড়িৎ মিলনের সময় বায়ু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের গতির ব্যাঘাত সম্পাদন করে; বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ তখন লম্বভাবে যাইতে না পারিয়া বক্রভাবে যাইতে থাকে এবং এইরূপে বোধ হয় যেন ধাপেং নামিয়া আইসে কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ আকৃতিতেও আবির্ভূত হয়। সে সকল সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

বজ্র বিদ্যুতের অনুবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে। এক সময়েই উভয়ের উৎপত্তি। তবে আলোক অপেক্ষা শব্দের গতি অত্যন্ত অল্প সেই জন্য আমরা বিদ্যুতের পর বজ্রের শব্দ শুনিতে পাই। বিদ্যুতের সময় বায়ুর বিলোড়নই এই শব্দোৎপত্তির কারণ। যেখানে বাজ পড়ে সেখানে শব্দ অতি উগ্র ও ক্ষণস্থায়ী। দূর হইতে বোধ হয় যেন একটীর পর আর একটী শব্দ কখন ক্ষীণ কখন গুরু এইরূপ ক্রমে শব্দ গড়াইতেছে। ইহার কারণ বিদ্যুৎ বহু তড়িৎ-মিলনের ফল; প্রত্যেক মিলন হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয় এবং এই মিলন-স্থল সকলের দূরত্ব ও বিভিন্ন। সুতরাং দূরত্ব অনুসারে আমরা একটীর পর আর একটী শব্দ শুনিতে পাই। এবং তড়িৎ-মিলন-সকলের দূরত্ব বিভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত তত্তৎ স্থলের বায়ু-স্তরের গাঢ়তা এবং তদনুসারে শব্দের গুরুত্বও বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য শব্দ কখন ক্ষীণ কখন গুরু হয়। ১৪।১৫ মাইল অপেক্ষা অধিক দূরে হইলে আর আমরা বজ্রের শব্দ শুনিতে পাই না এবং

এই জন্য সময়ে সময়ে বিদ্যুৎ দেখিতে পাই কিন্তু বজ্রের শব্দ শুনিতে পাই না। এরূপ ঘটনা আকাশ পরিষ্কার থাকিলেও হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে।

বজ্র লৌহ-ফলকের ন্যায় বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে। এপ্রবাদের মূল আছে। বিদ্যুৎ মাটির ভিতর যাইবার সময় এরূপ গর্ত্ত করিয়া যায় যে তাহা দেখিলেই লৌহ-ফলক-কৃত বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু বস্তুতঃ ওরূপ গর্ত্ত হওয়ার কারণ স্বতন্ত্র। মৃত্তিকায় (Silicon) সিলিকন নামক যৌগিক পদার্থ সিকিভাগ আছে। বিদ্যুৎ প্রবেশের সময় মৃত্তিকাস্থ এই সিলিকন-বিশিষ্ট পদার্থ সকল দ্রব করিয়া। এবং সেই জন্য উহার প্রবেশ-পথ এরূপ চিহ্নিত দেখা যায়। এই গর্ত্ত কখন কখন ২৪ হাত ভিতর পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। যেখানে বাজ পড়ে সেখানে একরূপ বিশেষ গন্ধ উদ্ভূত হয়। বিদ্যুৎ-সংযোগে ভূবায়ুস্থ অক্‌সিজেনের রূপান্তর হয়; সে অবস্থায় তাহাকে অজোন (Ozone) বলে। এই অজোন হইতে পূর্ব্বোক্ত গন্ধের উৎপত্তি।

কখন কখন বাজপড়ার স্থান হইতে দূরে থাকিয়াও কোন কোন ব্যক্তি এরূপ সংক্ষোভ (Shock) প্রাপ্ত হয় যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহা তড়িৎ-সংক্রামণের ফল। তড়িদাক্রান্ত মেঘ সকল তাহাদের আয়ত্তিস্থ সমস্ত বস্তুতেই তড়িৎ সংক্রামিত করে। সেই জন্য ভূপৃষ্ঠ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ মনুষ্য ও অন্যান্য বস্তু সকল মেঘের বিপরীত তড়িদাক্রান্ত হয়। কিন্তু বিদ্যুতের উৎপত্তির সহিত মেঘের তড়িৎ পৃথিবীর তড়িতের সহিত মিলিয়া নিশ্চেষ্ট হয় এবং মেঘস্থ তড়িতের অভাবে মেঘের সমতড়িৎ (যাহা পূর্ব্বে তড়িত-সংক্রামণ প্রভাবে মানব দেহ হইতে পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়াছিল) পুনর্ব্বার মানব দেহে ফিরিয়া আইসে এবং তথায় বিষম তড়িতের সহিত মিলিত হয়। এই ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত হইলেই প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা।

**বিদ্যুদ্দণ্ড।** বজ্র হইতে বাটী রক্ষার জন্য যে সকল সূচাগ্র লৌহদণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে বিদ্যুদ্দণ্ড(Lightning conductor)বলে। ইহার মূলসূত্র দুইটী। প্রথমটীর উদ্দেশ্য বজ্রপতন নিরাকরণ। দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য যখন অনিবার্য্য, তখন বাটী রক্ষা।

প্রথম সূত্র—বিন্দুর ক্ষমতা (Power of points)। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জ্যামিতি-কল্পিত বিন্দুবৎ সূক্ষ্মাগ্রে তড়িতের বিততিষা (Tension) অসীম এবং বিততিষা অসীম হইলে তড়িৎ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এই জন্য বিদ্যুদ্দণ্ডের অগ্র বিন্দুবৎ সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ তড়িৎ ধাতু-দণ্ড দিয়া চালিত হইয়া তাহার অগ্রভাগ হইতে বিকীরিত হইতে থাকে এবং অল্পে অল্পে মেঘের বিষম তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া উহাকে নিশ্চেষ্ট করে। আবার এই বিকীরণে

ভূপৃষ্ঠস্থ তড়িৎ-স্তরের গাঢ়তাও অল্প হইয়া আসে। সুতরাং বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাবের সম্ভাবনা অল্পই থাকে।

দ্বিতীয় সূত্র পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে যে অধিক সঞ্চালক পাইলেই তড়িৎ তাহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবে। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে যদি কোন বাটী ধাতু-দণ্ডবিশিষ্ট হয় এবং সেই ধাতু-দণ্ডের সহিত পৃথিবীর সংযোগ থাকে তাহা হইলে বিদ্যুৎ উহারই ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবে। কারণ বাটী অপেক্ষা ধাতু-দণ্ড অধিক সঞ্চালক। সুতরাং বাটী অক্ষুণ্ণ রহিবে। আবার এই ধাতু-দণ্ড যত অধিক সঞ্চালক ধাতুতে নির্ম্মিত হয় ততই ভাল। তাম্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঞ্চালক, সুতরাং তাম্রে বিদ্যুদ্দণ্ড নির্ম্মাণ করিতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কিন্তু উহা অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া লৌহদণ্ডই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিতে না পারিলে বিদ্যুদ্দণ্ড হইতে বিপদ্ ঘটিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। সচরাচর যে প্রণালীতে ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহাতে বিপদ্ না ঘটিলেও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপ সফল হয় না। এই কলিকাতা নগরীতে উচ্চ প্রাসাদ মাত্রেই এক একটী বিদ্যুদ্দণ্ড আছে। কিন্তু সকল গুলিরই নির্ম্মাণ-প্রণালী একরূপ দোষাবহ। সকল স্থলেই লৌহ-দণ্ড গুলি বাটীর ভিত্তির কিয়দ্দূরে নিহিত এবং মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড দীর্ঘ কাষ্ঠ দ্বারা ভিত্তির সহিত সংযুক্ত। কিন্তু অসঞ্চালক কাষ্ঠের দ্বারা সংযোগ সংযোগই নয় বরং তাহাতে বিচ্ছিন্নই থাকে। এরূপ নির্ম্মাণ-প্রণালীর মূল কি তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। ইহার দোষ এই যে ইহাতে বিদ্যুদ্দণ্ডের পূর্ব্বোক্ত দুইটী উদ্দেশ্যের একটীও সম্পূর্ণ সফল হয় না। প্রথম উদ্দেশ্য—অর্থাৎ বজ্রপতন নিরাকরণ—সফল হয় না তাহার কারণ এই যে লৌহদণ্ডের সহিত বাটীর সংযোগ নাই; সুতরাং বাটীর তড়িৎ উহার অগ্রভাগ দিয়া বিকীরিত হইতে পারে না। মনে কর যৌগিক তড়িদাক্রান্ত একখানি মেঘ উপরে আছে। সেই মেঘের প্রভাবে পৃথিবীতে তড়িৎ সংক্রামিত হইবে অর্থাৎ মেঘের যৌগিক তড়িতের আকর্ষণে বিয়োগিক তড়িৎ ভূপৃষ্ঠে এবং ভূপৃষ্ঠস্থ বস্তু সকলে জমিবে। যে বস্তু যত উচ্চ তাহাতে তত অধিক তড়িৎ জমে এবং তজ্জন্য বিততিষাও অধিক হয়। এই কারণে উচ্চ বস্তু সকলেই বজ্র পতনের অধিক সম্ভাবনা। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত কারণে যখন বাটীর উচ্চ ভাগ সকলে বিয়োগিক তড়িৎ প্রধাবিত হইয়াছে তখন লৌহ-দণ্ড-দিয়া বিকীর্ণ হইতে না পারিলে উহা মেঘের তড়িৎকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে। সুতরাং উভয়ের সম্মিলনে বিদ্যুদুৎপত্তির সম্ভাবনা রহিল। আর যদি বাটীর উচ্চভাগে তড়িতের বিততিষা অত্যন্ত অধিক হয় তাহা হইলে তড়িৎ লৌহ-দণ্ড ছাড়িয়া বাটী ভেদ করিয়া ধাবিত

হইবে। সুতরাং বজ্র নিরাকরণও হইবে না বাটী রক্ষাও হইবে না। এরূপ স্থলে লৌহ দণ্ডের উপকার এই যে ভূপৃষ্ঠস্থ তড়িৎ বিকীরণ করিয়া বাটীর উপরিভাগে তড়িৎ-প্রবাহ কমাইয়া দেয় এবং তজ্জন্য সেখানে তড়িতের বিতড়িয়া অত্যন্ত অধিক হইতে দেয় না সুতরাং বিদ্যুতের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প হয়।

নির্ম্মাণ-প্রণালী। এই সকল দোষ পরিহার করিতে গেলে নিম্নলিখিতরূপে বিদ্যুদ্দণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হয়। বাটীর আয়তন বিশেষে ৬।১০ ফুট একটী রুলের মত লৌহদণ্ড বাটীর ছাদের উপর উপযুক্ত স্থানে ঠিক্ লম্বভাবে স্থাপিত করিতে হয়। এই দণ্ডের অগ্রভাগ যেন বিন্দুবৎ সূক্ষ্ম হয় এবং সেইটুকু তাম্রের হওয়া চাই। অধোভাগে ইহার বেড় যেন ৭ ইঞ্চির কম না হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে দণ্ডের উচ্চতার পরিমাণ যত, তাহার দ্বিগুণ ব্যাসার্দ্ধপরিমিত বৃত্তাকার স্থান ঐ দণ্ড দ্বারা রক্ষিত হয়। অর্থাৎ দণ্ডের উচ্চতা যদি ৮ ফুট হয়, তাহা হইলে ঐ দণ্ডের চতুর্দ্দিকে ১৬ ফুটের মধ্যে যত স্থান আছে, সমস্ত ঐ দণ্ড দ্বারা রক্ষিত হইবে। এই রূপ উচ্চতা ৯ ফুট হইলে ১৮ ফুটের মধ্যস্থ স্থান এবং উচ্চতা ১০ ফুট হইলে ২০ ফুটের মধ্যস্থ স্থান দণ্ড দ্বারা রক্ষিত হয়। এইরূপে লৌহ-দণ্ড স্থাপন করিয়া পৃথ্বীর সহিত উহার সংযোগ করিয়া দিতে হয়। এই সংযোগ লৌহদণ্ড অপেক্ষা লৌহ রজ্জু দিয়া করিলে ভিত্তির ভিতর দিয়া মাটীতে লইয়া যাইতে অনেক সুবিধা হয়। জলের পাইপের মত ভিত্তির ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া গর্ত্ত করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন কূপের জলের ভিতর চালাইয়া দিতে হয় এবং শেষ হইবার সময় দুই তিন শাখা বাহির করিয়া দিলে ভাল হয়। আর নিকটে যদি কোন কূপ না থাকে, গর্ত্ত করিয়া মাটীর নীচে ১৫ হাত পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া ঐ গর্ত্ত কাষ্ঠাঙ্গার বা কোক্ দ্বারা পুরাইতে হয়, কেননা তাহা হইলে অম্লজান বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া ধাতু প্রকারান্তর হয় না। কলিকাতায় কোন গ্যাস বা জলের পাইপের (যাহা মাটীর ভিতর থাকে) সহিত লৌহ-রজ্জুর মিলন করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

বিদ্যুদ্দণ্ডের নির্ম্মাণ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

১ম। পৃথ্বীর সহিত সংযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকা আবশ্যক।

২য়। বিদ্যুদ্দণ্ড এরূপ বৃহদায়তন হওয়া উচিত যে বিদ্যুৎ তাহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইলে যেন দ্রবীভূত হইয়া না যায়। লৌহ-রজ্জু কোন স্থলে যেন এক ইঞ্চির ন্যূন-পরিমাণ না হয়।

৩য়। দণ্ডের বিন্দুবৎ সূক্ষ্মাগ্রে শেষ হওয়া আবশ্যক।

৪র্থ। বাটীর ভিতর অধিক পরিমাণে ধাতব পদার্থ থাকিলে বিদ্যুদ্দণ্ড যেন তাহার

নিকটে না থাকে। আর বাটীর বহির্ভাগে অধিক ধাতব পদার্থ থাকিলে তাহার সহিত দণ্ডের বিশেষ সংযোগ আবশ্যক। তাহা না হইলে সেই সকল স্থলে তড়িতের আধিক্য বশতঃ অন্তর্বজাঘাত(Lateral discharges) হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে বিদ্যুতের সময় ঘটি বাটী প্রভৃতি ঘরে তুলিবার যে রীতি আছে তাহার কারণ এই। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে এ সকল তত্ত্ব অবগত ছিলেন এতদ্বারা ইহাও প্রমাণ হইতেছে।

এইরূপে বিদ্যুদ্দণ্ড নির্ম্মিত হইলে আর কোন আপত্তি থাকে না। বাটীর উপরিভাগে তড়িৎ জমিতে পারে না। সমস্ত তড়িৎ, দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্র দিয়া বিকীর্ণ হইয়া যায়। আর যদিই তড়িৎ-প্রবাহ এত অধিক হয় যে সে সমস্ত ঐ দণ্ড দিয়া বিকীর্ণ হইতে পারে না, আর যদিই সেই কারণে বিদ্যুদুৎপত্তি অনিবার্য্য হয়, তথাপি বাটী নিরাপদ রহিবে, তড়িৎ দণ্ডের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবে।

প্রচলিত প্রণালীতে এত দোষ সত্ত্বেও কেন যে উহা এত আদৃত, তাহা বলা যায় না। এই দোষ যে সকলে অবগত নহেন, তাহাও বলা যায় না। অনেকে জানিয়াও অভ্যাসের প্রভাবেই হউক, আর যে জন্যই হউক, দোষ নিরাকরণের চেষ্টা করেন না। অনেকে হয়ত বিদ্যুৎ—যাহা অশেষ অনর্থের মূল—সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য, ভাবিয়া বিদ্যুতের গতির জন্য পথ রাখিয়া তাহা হইতে বাটী বিচ্ছিন্ন রাখাই ভাল এরূপ মনে করেন। কিন্তু ইহা ভ্রম তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফলতঃ এ দোষাবহ রীতি পরিত্যাগ করাই ভাল। ইহা যে দোষাবহ ইহার অকার্য্য-করতাই তাহার প্রমাণ। প্রচলিত রীতিতে নির্ম্মিত বিদ্যুদ্দণ্ড সত্ত্বেও কত শত বাটী বজ্রাঘাতে বিখণ্ডিত হইতে দেখা গিয়াছে। উপসংহার কালে ইহা বলা উচিত যে কতিপয় বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিকের অনুবর্ত্তন করিয়াই আমরা এই প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছি। এবং বিজ্ঞান বিষয়ে যে জাতি সর্ব্বোচ্চ সে জাতির মধ্যে প্রতিভাশালী বিজ্ঞান-বিশারদ ব্যক্তিদিগের মত যে বিশেষ আস্থাজনক ইহাও বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভারতের সুখশশী যবন-কবলে নাটক। শ্রীনবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

ভারত-বিজয়।—দৃশ্যকাব্য। প্রথমাংশ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

আমরা এই দুই খানি পুস্তকের একত্র

সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ দুই খানিরই উদ্দেশ্য এক এবং বিষয়ও প্রায়ই এক। কেবল নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামের ও সম্বন্ধের এবং বস্তুরও কিঞ্চিৎ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। প্রথম খানিতে হস্তিনার রাজা পৃথুরাজ, কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী। ভারতবিজয়ে পৃথ্বীরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ প্রমথ কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা ইন্দুবালার প্রেমভিখারী। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও অনেক বৈষম্য স্বত্বেও এ দুয়ের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

প্রথম খানিতে জয়চন্দ্রের প্রিয়পাত্র অবন্তির রাজকুমার পুষ্পকেতুও পৃথ্বীরাজের ন্যায় অনঙ্গমঞ্জরীর পাণিগ্রহণাভিলাষী। পৃথ্বীরাজের সহিত রাজা জয়চন্দ্রের চিরবিদ্বেষ ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই জন্য অনঙ্গমঞ্জরীকে পৃথ্বীরাজের হস্তে সমর্পণ করা জয়চন্দ্রের কখনই ইচ্ছা ছিল না। পুষ্পকেতুকেই জামাতৃত্বে বরণ করা—তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁহার সে মনোরথ পূর্ণ হইল না। অনঙ্গমঞ্জরী পৃথুরাজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ও গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া পৃথ্বীরাজেরই অনুরাগিনী হইয়া উঠিলেন—তথাপি জয়চন্দ্র চিরবিদ্বেষ-ভাজন পাত্রের হস্তে প্রাণাধিকা দুহিতাকে কিরূপে সমর্পণ করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া পুষ্পকেতুর সহিতই তাঁহার বিবাহের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 'অনঙ্গমঞ্জরী চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিয়া—কান্যকুব্জনিবাসিনী কামন্দকীনাম্নী কোন তপস্বিনীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে নিম্নোদ্ধৃত পত্র খানি লিখিলেন:—

"হয়ত আমায় অপলজ্জ বলিয়া কতই ঘৃণা করিবেন, তা করুন্, আপনি বৈ আমার মনের দুঃখ প্রকাশ করিবার স্থান নাই। আমার ইষ্ট লাভের কোন আশা নাই, সে বিষয়ে আপনাকে যত্ন করিতেও অনুরোধ করি না। কেন অসাধ্য বিষয়ে অনুরোধ করিব? কিন্তু এই উপস্থিত অনিষ্টাপাত হইতে আমায় রক্ষা করিতে হইবে। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, পুষ্পকেতুর ত কথাই নাই, স্বয়ং পুষ্পকেতু আসিলেও আমি তাঁহাকে এই কর অর্পণ করিতে দিব না।"

অনঙ্গমঞ্জরী যে বিষয় অসাধ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কামন্দকী জয়চন্দ্রের বিজ্ঞতম মন্ত্রী সুমতির সাহায্যে তাহা সুসাধ্য করিয়া তুলিলেন। রাজা জয়চন্দ্র পুষ্পকেতুর সহিত অনঙ্গমঞ্জরীর বিবাহের দিন স্থির করিলেন; কিন্তু এই সময় কামন্দকীর ষড়যন্ত্রে পৃথুরাজ কান্যকুব্জ অবরোধ মানসে কান্যকুব্জাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। সুযোগ পাইয়া সুমতি এই বলিয়া বিবাহ বিষয়ে রাজার মত পরিবর্ত্তন করিলেন যে "মহারাজ! এখন উৎসবের সময় নয়, সামান্য লোকেও অপমান সহ্য করে না, ধূলিও পদদলিত হয়ে মস্তকে পদার্পণ করে, অতএব পৃথু কান্যকুব্জ অবরোধ না করতেই চলুন, তাকে গিয়ে আক্রমণ করা

যাক; সে অধীনে এলে নিরুদ্বেগে মহা সমারোহে অনঙ্গের বিবাহ দেওয়া যাবে। আমি এমন বল্‌ছি না যে পুষ্পকেতুই সমরে নিহত হবেন, কিন্তু আজ জীবন-সর্ব্বস্ব তনয়ার বিবাহ দিবেন, আর কাল সেই প্রাণাধিক জামাতাকে যুদ্ধে পাঠাবেন, ইহা পরিণামদর্শীর কার্য্য নয়, আমি এ বিষয়ে যখন চিন্তা করি তখন আমার হৃৎকম্প হতে থাকে।” রাজা মন্ত্রীর এই কথাতেই বিবাহের দিন বন্ধ রাখিয়া শত্রু-জয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

হস্তিনার বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইল, জয়চন্দ্র তাহার অভিনেতৃত্ব পদে পুষ্পকেতুকেই বরণ করিলেন। পুষ্প-কেতু অভিযানের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় পৃথু কান্যকুব্জ-দ্বারে উপনীত হইলেন। পৃথু-সৈন্য যার পর নাই পৌর জনের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। সেই উৎপীড়ন নিবারণ করিতে গিয়া রাজা জয়চন্দ্র ক্ষত-বিক্ষত শরীর ও মূর্চ্ছাভিভূত এবং পুষ্পকেতু অচৈতন্য হইলেন এবং সেনানীর অভাবে সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পুরী উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। এই সকল অনিষ্টপাত নিবারণের জন্য সুমতি কামন্দকীর পরা-মর্শে পৃথুর প্রতিমূর্ত্তি বরবেশে সজ্জিত করিলেন, রাজার প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা অনঙ্গ-মঞ্জরীর প্রতিমূর্ত্তির কর পৃথুর হস্তে সম-র্পিত করিলেন। পৃথু অনঙ্গমঞ্জরীর প্রতি-মূর্ত্তি দর্শনেই মোহিত হইয়া নগর-বিলু-ণ্ঠনে বিরত হইলেন।

পুষ্পকেতু মূর্চ্ছাভঙ্গের পর দেখিলেন যে সমস্ত ঘটনাই পৃথুরাজের অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুকূল—কিন্তু সকলই তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রতিকূল। সুতরাং পৃথু জীবিত থাকিতে অনঙ্গমঞ্জরীর পাণি গ্রহণের কোন আশা নাই দেখিয়া তিনি পৃথুর প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনঙ্গমঞ্জরী এই সমা-চার পাইয়া পৃথুরাজকে সাবধান করিবার নিমিত্ত নিম্নোদ্ধৃত পত্র খানি লিখেন :—

“জীবিতেশ্বর!

আপনি শুনিয়াছেন যে মন্ত্রী কন্যা-পণে সন্ধির প্রস্তাব করায় পুষ্পকেতু যার পর নাই শঙ্কিত হয়েছে। মন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় মহারাজ পাছে অসত্য-প্রতিজ্ঞ হন, এই ভয়ে সে আপনার জীবন সংহারে প্রবৃত্ত হই-য়াছে, কারণ আপনাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেই তার অভীষ্ট নিষ্কণ্টক হয়; কিন্তু আপনার সঙ্গে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইতে তার সাহস হয় না।

“এই নগরে গণপত মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করে, সে অন্যান্য বিষয়ে পাগল বটে, কিন্তু মারণ কর্ম্মে বিলক্ষণ পটু। অদ্য অমাবস্যা। আজি নিশীথ সময়ে সে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে অব-স্থিত শ্মশানে আপনার মৃত্যু কামনায় অভিচার কর্‌বে। এতে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইব এই অভিপ্রায়ে দুরাচার আমায় অগ্রে সংবাদ দিয়াছে, কারণ সে জানে যে আমি তারই প্রতি অনুরক্ত। * * * এই সংবাদ শুনিয়া আমার হৃদয় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। সত্বরে

ইহার প্রতিবিধান করিবেন ইতি।”

অনঙ্গমঞ্জরীর এই পত্র পাইয়া পৃথুরাজ এরূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন যাহাতে পুষ্পকেতুর সমস্ত ষড়যন্ত্র বিফল হইয়া গেল। পুষ্পকেতুর শুদ্ধ অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না এরূপ নহে, চণ্ডভৈরব-রূপধারী পৃথুরাজের কোন অনুচরের ত্রিশূল-মূল-প্রহারে বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইলেন।

পৃথুরাজ এই সকল কারণে এবং গিজ্‌নীর অধিপতি মামুদ ঘোরীর আক্রমণ ভয়ে কাল-বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া জয়চন্দ্রকে নিম্নোদ্ধৃত পত্র খানি লিখেনঃ-

“ মহারাজ!

আমি আর অনর্থক কালক্ষেপ করিতে পারি না, আপনি বিলক্ষণ জানেন যে গিজনীর অধিপতি যবনরাজ মামুদ ঘোরী সর্ব্বদা সিন্ধুরাজ্য সমুচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছে। চিতোরাধিপতি সোমরাজ লিখিয়াছেন, যে সে অনতিবিলম্বেই হস্তিনা অবরোধ করিবে; অতএব আমাকে সত্বরই বাটী যাইতে হইবে। এক্ষণে হয় আপনি যে পণে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা নিষ্পন্ন করুন, নতুবা যুদ্ধ করুন ইতি।”

পৃথুরাজ আরও প্রস্তাব করিলেন যে পুষ্পকেতুর প্রতি তাঁহার একামিষ-প্রভব বৈর জন্মিয়াছে। এই জন্য তাঁহার ইচ্ছা যে পুষ্পকেতুর সহিত তিনি মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রণে জয়লক্ষ্মী যাঁহার গলে জয়মালা প্রদান করিবেন, তিনিই জয়পতাকার সহিত রাজপুত্রীর কর গ্রহণ করিবেন। কিন্তু জয়চন্দ্র ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের মুখে ক্ষুদ্র করিশাবককে সমর্পণ করিতে চাহিলেন না। অবশেষে তিনি এক মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া পৃথুরাজকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন—“ আপনি যে পুষ্পকেতুর সহিত মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করেছেন, আমি তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। আমি মধ্যবর্ত্তী হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করি—আপনি ও পুষ্পকেতু উভয়ে বরবেশে সভায় আসীন হউন, আমার কন্যা স্বেচ্ছায় যাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য দিবে তিনিই তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন ইতি।”

এতদুত্তরে পৃথুরাজ এইরূপ লিখিলেনঃ—

“ মহারাজ!

আপনি একান্ত পক্ষপাতী, উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। আপনার ত্রিভুবন-ললামভূতা কন্যার মনোরথ পরিপূর্ণ হউক। অনুরক্ত স্ত্রী সংসারের সার সুখ, স্বয়ম্বর অনুরাগ পরীক্ষার প্রথম সোপান। আপনি স্বীয় কন্যাকে পতি নির্ব্বাচন করিতে নিয়োগ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আমার সুখের বিষয় কি হইতে পারে? আপনি লিখিয়াছেন আপনার কন্যা পুষ্পকেতুতে অনুরক্ত; কিন্তু আমাতে যে তিনি বিরক্ত তদ্বিষয়ে আপনি কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার মনের ভাব কি তাহা কে বলিতে পারে? ভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহার প্রতি কিরূপ কটাক্ষপাত

করেন, তাহা অগ্রে কে জানিতে পারে? অতএব আমি হতাশ হইলাম না, আপনার মতেই আমার মত ইতি।”—

সেইরূপ অনুষ্ঠান করা হইল। পৃথু ও পুষ্পকেতু স্বয়ম্বরস্থলে আসীন হইলে অনঙ্গমঞ্জরী স্বেচ্ছায় পৃথুরাজেরই গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন। তদনন্তর মহা সমারোহে রাজকন্যার সহিত পৃথুরাজের বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। অনঙ্গমঞ্জরীর চির-লালিত আশালতা পুনরুজ্জীবিত হইল। একমাত্র দুহিতা অনঙ্গ অনুরূপ বরের সহিত মিলিত হইল—এই আহ্লাদ রাজ্ঞীর শরীর ছাপিয়া পড়িল। শুদ্ধ মহিষীর কেন? রাজনন্দিনীর চিরপালিত মনোরথ সফল হওয়াতে আপামর সাধারণ সকলেরই বিশেষ সন্তোষ জন্মিল।

স্বয়ম্বরস্থলে যখন রাজপুত্রী পৃথুর দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন পুষ্পকেতু ধৈর্য্যের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। তিনি স্তম্ভিতের ন্যায়, উৎকীর্ণের ন্যায়, প্রতিবিম্বিতের ন্যায়, নিস্পন্দভাবে স্তিমিত নয়নে বসিয়া ছিলেন। আশাভঙ্গজনিত অসহ্য কষ্টের বিন্দুমাত্রও তিনি তখন লোক সমক্ষে প্রদর্শন করান নাই; কিন্তু স্বয়ম্বর হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আর সে ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। তিনি এক্ষণে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কাপুরুষোচিত জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা জয়চন্দ্র পুষ্পকেতুকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন। তিনি কাশীরাজের কন্যার সহিত পুষ্পকেতুর বিবাহ দিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বনে গমন করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পুষ্পকেতু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল বৈরশোধ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

পৃথুরাজ অনঙ্গমঞ্জরীকে লইয়া জাহ্নবী দিয়া নৌকাযোগে স্বনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুষ্পকেতুও তাঁহাদিগের অগ্রগামী হইলেন। পুষ্পকেতু জাহ্নবী তীরে কোন গিরিগুহাস্থিত কতিপয় দস্যুর সহিত মিলিত হইলেন। ঘটনাক্রমে পৃথুরাজও এক দিন জাহ্নবীতীরে সেই গিরিগুহারই নিকট নৌকা লাগাইয়া মৃগয়াদি করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দস্যুদিগের এক জন নানা প্রকার কাল্পনিক কথায় আকৃষ্ট করিয়া পৃথু ও অনঙ্গমঞ্জরীকে সেই গিরিগুহার সমীপে আনিল। তথায় আসিবা মাত্র পৃথু ও অনঙ্গমঞ্জরী উভয়েই শৃঙ্খলিত হইলেন।

দুরাচার পুষ্পকেতু অনঙ্গমঞ্জরীর প্রণয়স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইল, তখন অনঙ্গমঞ্জরীর সমক্ষেই খড়্গাঘাতে পৃথুর শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক নিজ সমীহিত সাধনে সমুদ্যত হইল। জ্বলন্তপাবক স্বরূপিণী সাধ্বী অনঙ্গমঞ্জরী বেগে পুষ্পকেতুর হস্ত ধারণ ও তাহার হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে ইহা ঘুরাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া দস্যুদিগের মনে হইল যেন উগ্র-

চণ্ডা স্বয়ং অসুর সঙ্গে রণে মাতিয়াছেন। তাহারা পুষ্পকেতুকে বলিল "রাজকুমার! ক্ষান্ত হৌন্, সতীর গাত্রে হাত দিবেন না, যে অর্থ দিয়েছিলেন তার চার গুণ নিয়ে যান, * * আমরা মহারাজের বন্ধন খুলে দিই।" এই বলিয়া তাহারা পৃথুর বন্ধন মোচন করিয়া দিল। পুষ্পকেতু এই সকল দেখিয়া ভয়ে বেগে পলায়ন করিল। পৃথুও দস্যুদিগের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া "কান্যকুব্জ ও হস্তিনার কিয়দংশ তোমাদিগকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান কর্‌ব" তাহাদিগের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া নববিবাহিতা ভার্য্যা সমভিব্যাহারে হস্তিনায় গমন করিলেন।

পৃথু হস্তিনায় প্রত্যাগত হইয়া আর অধিক দিন সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি হস্তিনায় উপনীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই, মহম্মদ ঘোরী হস্তিনা অবরোধ করিল। এদিকে পুষ্পকেতুও মহম্মদ ঘোরীর গুপ্তচর হইয়া ছদ্মবেশে পৃথু-সৈন্যের অন্তর্নিবেশিত হইল। একদিন রজনীযোগে যখন নগরদ্বাররক্ষক পৃথুর সেনানীগণ মধু পানে মত্ত হয়ে পতিত ছিল, তখন ছদ্মবেশী পুষ্পকেতু যবনদিগের সম্মুখে নগরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। যবনসেনা অনিবার্য্য বেগে নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। চতুর্দ্দিকে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইল। মামুদ ঘোরীর খড়্গাঘাতে চিতোরাধিপতি বীরবর সোমরাজ "হা ভারতভূমি!" এই বলিয়া পতিত ও মৃত হইলেন। পৃথুরাজ সখা সোমরাজের মৃত দেহ দেখিয়া যেমন পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন, অমনি কুতব ও মামুদ দুইজন সৈনিক সমভিব্যাহারে পৃথুকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল।

ছদ্মবেশী পুষ্পকেতুও সোমরাজের মৃত্যু ও পৃথুর কারাবরোধ বৃত্তান্ত হস্তিনার অন্তঃপুর মধ্যে প্রচার করিল। এই হৃদয়বিদারক সংবাদে অন্তঃপুরের যে কি অবস্থা ঘটিল—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পুষ্পকেতুর সঙ্কেতে কয়েকজন যবন অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনঙ্গমঞ্জরীকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

যে গৃহে পৃথুরাজ শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় দুই জন যবন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহারই পার্শ্বস্থ বহির্ব্বার গৃহে মূর্চ্ছিতা অনঙ্গমঞ্জরী শায়িত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহম্মদ ঘোরী পৃথুরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনেক মর্ম্মভেদী প্রশ্নে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও পৃথুরাজের অন্তঃকরণ অবিকৃত, স্বাধীন ও নির্ভীক রহিল। যবনরাজ তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু পৃথু এই বলিয়া তাহাতে উপহাস করিলেন যে কি আশ্চর্য্য "মরুনিবাসী চীরধারী যবন আজি ভারত সম্রাটের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন!"

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর যবনরাজ বলিলেন যে "পৃথুরাজ! তোমার যে কি হইবে, আমারও সে বিষয় জান্‌তে কৌতূহল জন্মেছে। পুষ্পকেতুর কৌশলেই এ রাজ্য আমার হস্তগত হইয়াছে এবং

তাঁর সঙ্গে এই সন্ধিপণ যে, যদি জয় লাভ হয় ত ভারতরাজ্য আমার এবং অনঙ্গমঞ্জরী তাঁর—"

এই কথা শুনিয়া পৃথু নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সানুনয়ে যবনরাজের নিকট এই ভিক্ষা চাহিলেন যে দুরাত্মা পুষ্পকেতু অনঙ্গমঞ্জরীর শরীর স্পর্শ কর্‌তে না কর্‌তেই তাঁহার মস্তক যেন তাঁহার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

"দুরাত্মা পুষ্পকেতু অনঙ্গমঞ্জরীর শরীর স্পর্শ কর্‌তে না কর্‌তেই"—এই কয়েকটী হৃদয়ভেদী শব্দ প্রাপ্তসংজ্ঞ অনঙ্গমঞ্জরীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন "কি! আমি জয়চন্দ্রের বীর্য্য-সম্ভবা ক্ষত্রিয়া নই? পুষ্পকেতুর সাধ্য কি যে আমার ছায়াও স্পর্শ করে! যেন সিংহই দৈববশে ব্যাধের বাগুরায় বদ্ধ হয়েছে, তা বলে শৃগালের কি শক্তি যে, সে তৎপত্নী সিংহীর অঙ্গ স্পর্শ কর্‌বে! ছি নাথ! তুমি ভার্য্যার দুর্দ্দশা দেখে আত্মবিস্মৃত হয়েছ? কৈ সে দুরাত্মা কোথায়? সে দুরাচার কাপুরুষ তোমার অপকার করবার জন্য চিরকাল পরের সাহায্য গ্রহণ করেছে।" অনঙ্গমঞ্জরী এইরূপে বলিতেছিলেন এমন সময় সেই সৈনিকবেশী পুষ্পকেতু তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"রাজপুত্রি! সূর্য্যকে গ্রাস করিবার জন্য রাহু কি অমাবস্যার আশ্রয় লয় না?—এ আর সেই ক্ষুদ্র চেতা দস্যু নয়, যে অর্থে বশীভূত কর্‌বে।"

ছদ্মবেশী পুষ্পকেতুর এই কথায় পৃথু ও অনঙ্গমঞ্জরী পুষ্পকেতুকে চিনিতে পারিলেন। তখন ক্রোধে তাঁহাদিগের হৃদয় বিকম্পিত হইতে লাগিল। শরীরে দ্বিগুণতররূপে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনঙ্গমঞ্জরী—ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ক্ষত্রিয়াধম পুষ্পকেতুকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেনঃ—

"অরে দুর্জাত! ক্ষত্রিয়াধম! * * * * আমিই যেন তোর মনে কষ্ট দিয়েছি, এই জন্মভূমি ভারত ত তোরে বক্ষঃস্থলে ধারণ করে আছেন, তুই কি বলে পদতলে দলিত হবার জন্য মাতাকে রিপুহস্তে অর্পণ কর্‌লি? ধিক্ মূঢ়! ভেবে দেখ সামান্য বৈর নির্য্যাতন কর্‌তে গিয়ে তুই কি সর্ব্বনাশ করে বসেছিস্! আমি তোরে পরামর্শ দিচ্ছি, সুবোধের ন্যায় এখনও হস্তিনাপতিকে বন্ধনমুক্ত কর, দুজনে মিলিত হয়ে সাধারণ শত্রু হ'তে জন্মভূমিকে উদ্ধার কর? এখনও চৈতন্য হ'ল না? তুই সাহায্য কর্‌তে না পারিস্ উদাসীন থাক্, একা হস্তিনাপতিই যবন হ'তে ভারত ভূমি উদ্ধার কর্‌বেন—"

এ সকল সারগর্ভ উপদেশ—পুষ্পকেতুর কর্ণে-স্থান পাইল না। তাহার দুর্দ্দমনীয় বৈরনির্যাতন-স্পৃহা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। পিশাচ—পৃথুর অঙ্গবস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাতে জ্বলন্ত লৌহের দাগ দিতে আদেশ করিল। হত-ভাগিনী অনঙ্গমঞ্জরী-আর সহ্য করিতে না পারিয়া

বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বহিষ্করণ পূর্ব্বক উন্মাদিনীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন—"ছোরা! তুমিই এ বিপদে আমার সহায়! দুরাত্মা চারিদিক্ বন্ধ করেছে, কিন্তু তোমার কিছুই কর্‌তে পারে নাই; তুমি যবনের কোষে ছিলে বটে, কিন্তু তুমি এক্ষণে আমার পরম বন্ধু! হায় তোমাকে যখন পাই তখনই যদি কণ্ঠের আভরণ করি, তা হলে আর নাথের এ বিপত্তি দেখ্‌তে হতো না; তা হয় নাই, নাথের কষ্ট দেখা এ রাক্ষসীর ললাটের লিখন, এখন আমি অশরণা, তোমার শরণাগত হলেম।" রাজপুত্রীর কাতরোক্তিতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নরাধম পুষ্পকেতু "রাজপুত্রি! তোমার সকল দুঃখের নিদান পৃথুকে ঘোর নরকে নিক্ষেপ করি" এই বলিয়া ভারতের শেষ সূর্য্য পৃথুর স্কন্ধে খড়্গ প্রহার করিল। ভারতসম্রাট্ "জীবিতেশ্বরি! —"এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করিয়াই রুদ্ধবাক্ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার সহিত ভারতের সুখসূর্য্যও অস্তমিত হইল!

নরাধম পুষ্পকেতু অনঙ্গমঞ্জরীর সমক্ষেই এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াই দ্বার মোচনান্তে রাজপুত্রীকে বলিল "রাজপুত্রি! এখন তুমি কার?"

অনঙ্গমঞ্জরী আর থাকিতে না পারিয়া—"নিষ্ঠুর! নিশাচর! পিশাচ! নরকাক! এখন আমি অনাথা! যদি আমায় চাস্, তবে আগে এই দূতীকে রুধির দানে সন্তুষ্ট কর?" এই বলিয়া পুষ্পকেতুর উদরে বেগে ছুরিকাঘাত করিলেন। এই আঘাতেই সেই নরপিশাচের মৃত্যু হইল।

অনঙ্গমঞ্জরী—"নাথ! প্রাণনাথ! জীবিতেশ্বর! যে উদ্দেশে এ দাসী এতক্ষণ জীবন রেখেছিল, তা সিদ্ধ হয়েছে; যবনের ভয় না থাক্‌লে দুরাত্মার উষ্ণ শোণিতে তোমার তর্পণ কর্‌তাম তা পার্‌লাম না। তোমার ঔরস সন্তানকে এই রক্ত পান করাই—" এই বলিয়াই স্বীয় উদরে অস্ত্র নিখাত করিলেন এবং "মাগো! বাবা গো! তোমাদের অনঙ্গ জন্মের মত চল্‌ল" এই বলিয়া পতিত হইলেন এবং পৃথুর মৃত দেহের নিকটে গমন ও বাহু দ্বারা অবেষ্টন পূর্ব্বক "প্রাণনাথ! জীবিতেশ্বর! দাসী তোমারই"—এই বলিয়া জন্মের মত নীরব হইলেন। ভারতের রাজলক্ষ্মীও তাঁহার সহিত অন্তর্দ্ধান করিলেন।

এই দুঃখান্ত নাটকখানি যে এক খানি উৎকৃষ্ট কাব্য তাহা এই উপাখ্যান ভাগ ও উদ্ধৃত অংশ গুলি পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এখানি উৎকৃষ্ট কাব্য হইলেও গল্পের জটিলতা, ভাষার অবৈষম্য, ও কল্পনার অতিবিস্তৃতি হেতু অভিনয়ের উপযোগী নহে। সুতরাং কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও ইহাকে আমরা উৎকৃষ্ট নাটক বলিতে পারিলাম না।

ভারতবিজয় অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহার বিষয়ে এক্ষণে আমরা অধিক বলিলাম না। তবে আপাততঃ এই মাত্র বলিতে পারি যে এখানি সম্পূর্ণ হইলে এক খানি মন্দ নাটক হইবে না।

# রাজভক্তি ও রাজোপহার।

স্নেহ অগ্রে নীচগামী হয়, পরে ভক্তি উর্দ্ধগামিনী হয়। বয়োবিদ্যাদি গুণে জ্যেষ্ঠ হইতে বয়োবিদ্যাদিগুণে কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ নীচগামী হইলে, বয়োবিদ্যাদিগুণে কনিষ্ঠ হইতে বয়োবিদ্যাদিগুণে জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি উর্দ্ধগামিনী হয়। সহজ কথায়—তুমি আমায় ভাল বাস ত আমি তোমায় ভক্তি করিব। ভক্তি কৃতজ্ঞতার ফল। আমরা পিতা মাতাকে ভক্তি করি, অন্যান্য গুরুজনকেও ভক্তি করিয়া থকি, ইহার কারণ কি? আমাদিগের মতে কৃতজ্ঞতা। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি দেখি যে জননী আমাদিগের ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে নিজের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল আমার শুশ্রূষায় রত আছেন। তাঁহার নিদ্রা নাই—বিশ্রাম নাই। দেখি পিতা—আমাদিগের ভরণ পোষণের জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রাণবিসর্জ্জনেও অর্থোউপার্জ্জন করিতেছেন। দেখি অন্যান্য গুরুজনও তাঁহাদিগের সেই সকল নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের অনুগামী হইতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদিগের মন সেই শৈশবেই কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়। সেই শৈশবেই ভক্তি অতর্কিতভাবে আমাদিগের হৃদয়রাজ্য অধিকার করে। আমাদিগের বিশ্লেষণশক্তি পরিপুষ্ট না হওয়ায় তখন আমরা বুঝিতে পারি না যে ইহার কারণ কি। ভক্তি যেরূপ কৃতজ্ঞতার ফল—স্নেহ সকল সময়ে সেরূপ নহে। জনক জননী বা অন্য গুরুজন দিগের মন যে সদ্যঃ-প্রসূত শিশুর প্রতি স্বতঃ স্নেহার্দ্র হয়—তাহাতে শিশুকৃত কোন প্রীতিকর কার্য্যের প্রাগ্‌ভাব নাই। সুতরাং তাহা কৃতজ্ঞতার ফল হইতে পারে না। সেই রূপ প্রজার প্রতি যে রাজার স্নেহ, তাহাতেও প্রজাকৃত কোন রাজানুরঞ্জনের প্রাগ্‌ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু রাজার প্রতি যে প্রজাদিগের ভক্তি তাহাতে রাজকৃত প্রজানুরঞ্জনের প্রাগ্‌ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বলপ্রয়োগ বা ভয়প্রদর্শনে ভক্তি জন্মিতে পারে না—কৃত্রিম ভক্তির বাহ্য প্রদর্শন মাত্র হইতে পারে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ না করিলে তিনি আমাদিগকে নরকে প্রক্ষেপ করিবেন—তিনি আমাদিগকে মুক্ত করিবেন না—ইত্যাদি ভয়প্রদর্শন দ্বারা যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিষ্কৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। ঈশ্বর তাঁহার প্রতি ভক্তি না করিলে আমাদিগকে নরকে প্রক্ষেপ করিবেন—আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন না—ইত্যাদি জানিতে পারিলে আমরা তাঁহার প্রতি

ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারি—কিন্তু ভক্তি করিতে পারি না। ভক্তি স্বতন্ত্র, ভক্তি-প্রদর্শন স্বতন্ত্র। ভয়েতে ভক্তিপ্রদর্শন হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি জন্মিতে পারে না। বলপ্রয়োগ বা ভয়-প্রদর্শনের সহিত ভক্তির সামঞ্জস্য হইতে পারে না। যে সকল পিতা মাতা পুত্র কন্যাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ভক্তি নিষ্কৃষ্ট করিতে যান, তাঁহারা হয়ত প্রায়ই অভীপ্সিত বিষয়ে অকৃতকার্য্য হন। প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ প্রায় একই জাতীয় হৃদ্বৃত্তি। কেবল আধারাধেয়ের বিভিন্নতা হেতু ইহাদিগের কার্য্য স্বতন্ত্র—সুতরাং নামও স্বতন্ত্র। ইংরাজীতে এই তিন বৃত্তিই অনেক সময় এক "লভ" অর্থাৎ প্রেম শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। আমরা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, জনক জননীর প্রতি প্রেম, পুত্র কন্যার প্রতি প্রেম, এবং স্ত্রীর প্রতিও প্রেম করিয়া থাকে। এই শেষোক্ত প্রেমকে আমরা সচরাচর প্রণয় শব্দে অভিহিত করি। এই প্রেম বা প্রণয়কে যেমন আমরা বলপ্রয়োগে বা ভয়প্রদর্শনে জন্মিতে দেখি না, সেইরূপ ভক্তি ও স্নেহরূপ প্রেমকেও আমরা বলপ্রয়োগে বা ভয়প্রদর্শনে জন্মিতে দেখি না। নিঃশঙ্ক স্বাধীন ভাব প্রণয়, স্নেহ ও ভক্তিরূপ প্রেমের উৎপত্তির অনিবার্য্য আনুষঙ্গিক। যেখানে নিঃশঙ্ক ভাব নাই, যেখানে স্বাধীনতা নাই,—সেখানে কখন স্নেহ, ভক্তি ও প্রণয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না। ঈশ্বর যদি প্রতিহিংসাপরবশ হন, তিনি যদি আমাদিগকে সতত দণ্ড-প্রদানে উদ্যত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা ভয় করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার প্রতি আমাদিগের আন্তরিক ভক্তি জন্মিতে পারে না। যে পিতা মাতা সন্তানের প্রতি সতত রুদ্রমূর্ত্তি ও খর-তরশাসন, সে পিতা মাতাকে সন্তানে ভয় করিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি সন্তানের কখন অকৃত্রিম ভক্তি জন্মিতে পারে না। যে পাপিষ্ঠ সন্তান বৃদ্ধ জনক জননীর প্রতি উৎপীড়ন করিয়া থাকে, বৃত্তিবন্ধরূপ ভয়প্রদর্শন করে, তাহাকে তাঁহারা ভয় করিতে পারেন, কিন্তু তাহার প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক স্নেহ জন্মিলেও কখন অধিক দিন থাকিতে পারে না। যে নরাধম পতি পত্নীর প্রতি ভৎর্সনা প্রহারাদি কুৎসিত ব্যবহার করেন, তাঁহাকে পত্নী ভয় করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি পত্নীর তন্ময় প্রেম থাকিতে পারে না। সেইরূপ যে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি প্রজাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করেন, অযথা কর-সংস্থাপন দ্বারা প্রজাদিগের রুধির শোষণ করেন, কঠোর দণ্ডবিধির দ্বারা তাহাদিগের হৃদয় বিকম্পিত করেন, কাপুরুষোচিত ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করেন, তাহারা মনের কথা ব্যক্ত করিলে তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করেন, বিষম(১) বিধির ব্যবস্থাপন দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেন, তাহাদিগের

(1) Unequal.

মুখের গ্রাস তাহাদিগের মুখ হইতে কাড়িয়া লন, তাহাদিগের রাজস্বের শ্রেষ্ঠাংশে স্বজাতীয়দিগের উদরপূরণ করিয়া তাহাদিগকে অর্দ্ধাশনে কঙ্কালাবশিষ্ট করেন, তাহাদিগের অশ্রুজল দেখিয়া কখন উপেক্ষা ও কখন উপহাস করেন; এরূপ প্রজাদ্রোহী রাজা বা রাজপ্রতিনিধির প্রতি প্রজাদিগের কখনই আন্তরিক ও স্বতঃপ্রবৃত্ত ভক্তি জন্মিতে পারে না—তবে তাহারা ভয়ে তাঁহার প্রতি কৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারে। তাহারা সোজা কথা ব্যাঁকা করিয়া লিখিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে। কিন্তু সে রাজভক্তির মূল্য কি ?

সত্য হিন্দুজাতির রাজভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু হিন্দুজাতীয় রাজাদিগের প্রজানুবর্ত্তিতা তাহা অপেক্ষা আরও প্রসিদ্ধ। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের চরিত্র এ বিষয়ে জগৎ-সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রামচন্দ্র হিন্দুদিগের আদর্শ রাজা। ইহাঁর প্রজারঞ্জন-বৃত্তি এতদূর বলবতী ছিল, যে তিনি প্রজারঞ্জনার্থ সমস্ত বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পতিপ্রাণা জানকীকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রজারঞ্জনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যৎকালে অষ্টাবক্র ঋষি ভগবান্ বশিষ্টের নিকট হইতে আসিয়া রামকে একমাত্র প্রজারঞ্জন ব্রতের উপদেশ দিলেন, তখন অষ্টাবক্রের প্রতি রামচন্দ্রের উক্তি শুনিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। ভক্তিস্রোত অনিবার্য্য বেগে আপনি প্রবাহিত হয়।

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদিবা
জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাম্ মুঞ্চতো নাস্তি
মে ব্যথা ॥"
উত্তররামচরিতম্।

লোকারাধনার নিমিত্ত স্নেহ, দয়া, চিরজীবনের সুখ, অধিক কি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা জানকীকে পরিত্যাগ করিলেও আমার হৃদয়ে কোন ব্যথা লাগিবে না।—এই প্রতিজ্ঞা তিনি শুদ্ধ মুখে করিলেন এরূপ নহে, কিন্তু কার্য্যেও পরিণত করিয়াছিলেন।

রাজা রামচন্দ্র নগরজনপদবাসী প্রজাবৃন্দের মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত দুর্ম্মুখ নামে এক গুপ্তচরকে সর্ব্বত্র প্রেরণ করেন। দুর্ম্মুখ আসিয়া—প্রজারা রাজা রামচন্দ্রের রাজ্যে পরম সুখী—এই সংবাদ দিল। রামচন্দ্র ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন এত স্তুতিবাদ মাত্র; আমি স্তুতিবাদ শুনিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রেরন করি নাই। আমার শাসনপ্রণালীর কোন্ কোন্ অংশে প্রজারা দোষ দেখিতে পায়, তাহা জানিবার নিমিত্তই তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; কারণ কোন্ কোন্ অংশে দোষ আছে জানিতে পারিলে আমি তাহার পরিহার করিতে পারি। সুতরাং দোষ বিষয়ে যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা বল, নতুবা অনর্থক স্তুতিপাঠের প্রয়োজন নাই+। কোন্

দুর্ম্মুখঃ। উবথ্ বস্তি দেঅং পৌর-

পাষাণ-হৃদয় প্রজা এরূপ রাজার প্রতি ভক্তিরসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে?

রামচন্দ্রের এরূপ অমানুষ চরিত্র যে শুদ্ধ আপত্তিক অর্থাৎ অবস্থার ফল এমন বোধ হয় না। এরূপ চরিত্র যে হিন্দুরাজগণের শাস্ত্রের(১) প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা রাজাদিগের জন্য যে সকল বিধির ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়াছেন,* হিন্দু রাজগণের অনেকেই যে অবিচলিত ভক্তির

জাণবদা বিয়মরিদা অহ্নে মহারাঅ দসরহস্য রামভদ্দেণ ত্তি।

রামঃ। অর্থবাদ এযঃ দোষস্তু কঞ্চিৎ কথয়, যেন স প্রতি বিধীয়তে।

(1) Law.

* রাজধর্ম্ম-বিষয়ক প্রস্তাবে মনু এইরূপ লিখিয়াছেন

"সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু॥" ৭।৮০

রাজা রাজ্যমধ্যে প্রজাদিগের নিকট হইতে সাম্বৎসরিক কর গ্রহণ করিবেন। শাস্ত্রানুসারে ঐ কর গ্রহণ করিবেন—এবং স্বরাজ্যস্থিত প্রজাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন।

"শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥" ৭।১১২

যদ্রূপ প্রাণির আহার ব্যতিরেকে প্রাণ ক্ষীণ হয়, তদ্রূপ রাষ্ট্র-পীড়নে প্রকৃতি-কোপাদি-দোষে রাজার প্রাণ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ রাজা রাষ্ট্রস্থ ব্যক্তিকে প্রাণতুল্য দেখিবেন।

"ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্ম্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দ্দিষ্ট-ফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥" ৭।১৪৪।

রাজার অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রজাপালন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে রাজা নিয়মিত কর গ্রহণ করেন তিনি অনন্ত ধর্ম্মের আধার হয়েন।

বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় লিখিয়াছেনঃ—রাজ্ঞঃ প্রজাপালনস্পরমো ধর্ম্মঃ।

প্রজাপালন রাজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

সহিত সে সকলের অনুবর্ত্তন করিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রায় সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যদি কখন এই প্রস্তাব স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পরিণত করি, তাহা হইলে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য হইতে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ তুলিয়া পাঠকবর্গের চিত্ত বিনোদন করিব। প্রস্তাব-বাহুল্য ভয়ে আমরা এখানে শুদ্ধ কালিদাসের কাব্য হইতেই কয়েকটী উদাহরণ তুলিলাম। আশা করি আপাতক ইহাতেই পাঠকগণের পরিতৃপ্তি হইবে।

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥"
রঘুবংশম।

যেমন রবি সহস্র গুণ জল বর্ষণ করিবেন বলিয়া পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করেন, সেইরূপ প্রজাদিগেরই মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন।

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥ রঘুবংশম্।

প্রজাদিগের শিক্ষাবিধান, রক্ষণ ও পালনাদি দ্বারা তিনিই তাহাদিগের পিতা ছিলেন, তাহাদিগের পিতৃগণ কেবল জন্মদাতা মাত্র ছিলেন।

"দ্বেষ্যোঽপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধম্।
ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা॥"

যেমন ঔষধ তিক্ত হইলেও পীড়িত ব্যক্তির নিকট তাহা আদরণীয়, সেইরূপ শিষ্ট ব্যক্তি শত্রু হইলেও তাঁহার আদরের পাত্র ছিল। আবার যেমন সর্পদষ্ট অঙ্গুলি প্রিয় হইলেও পরিত্যজ্য সেইরূপ আত্মীয় ব্যক্তিও অশিষ্ট হইলে তাঁহার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ছিল।

কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস দিলীপের চরিত্রবর্ণনায় এই সকল গুণাবলীর সন্নিবেশ করিয়াছেন।

"স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্।
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব॥"

রঘুবংশম্।

যে যজ্ঞে সৎপাত্রে যথাসর্ব্বস্ব দানরূপ দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়, তিনি বিশ্বজিৎ নামে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মেঘ যেমন জলবর্ষণের নিমিত্তই বাষ্প গ্রহণ করে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তিরা দান করিবার নিমিত্তই অর্থগ্রহণ করিয়া থাকেন।

কালিদাস রঘুর গুণবর্ণনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। আবার ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীসহচারিণী সুনন্দা স্বয়ম্বরে সমাগত রাজন্যবর্গের পরিচয় স্থলে মগধ রাজকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ বলিতেছে:—

"অসৌ—শরণ্যঃ শরণোন্মুখানা-
মগাধসত্ত্বো মগধপ্রতিষ্ঠঃ।
রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণঃ
পরন্তপো নাম যথার্থনামা॥"

এই রাজা শরণাগতের আশ্রয়দাতা ও প্রজারঞ্জন বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ।

আবার অষ্টম্ সর্গে অজের গুণ বর্ণনায় কালিদাস এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিষ্বচিন্তয়ৎ।
উদধেরিব নিম্নগাশতেষ্বভবন্নাস্য বিমাননা ক্বচিৎ॥"

প্রজাদিগের সকলেই মনে করিত যে রাজা সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই ভাল বাসেন যেমন সমুদ্রের নিকট সকল নদীই আদরণীয়, সেইরূপ সেই রাজার নিকট সকল প্রজাই আদরণীয় ছিল।

কালিদাস রঘুবংশীয় রাজাদিগের ও ভবভূতি রামচন্দ্রের গুণাবলীর যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন এবং মন্বাদি প্রাচীন

শাস্ত্রকারেরা রাজসাধারণের গুণাবলীর যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়—যে প্রজারঞ্জন করা, প্রজাদিগের উপকারার্থই কর গ্রহণ করা, প্রজাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা, সংক্ষেপতঃ সর্ব্বতোভাবে প্রজাদিগকে সুখী করাই হিন্দুরাজগণের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। প্রজাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করা, প্রজাদিগের প্রতি অযথা কর স্থাপন করা, প্রজাদিগের প্রতি দণ্ড-পারুষ্য প্রয়োগ করা, প্রজাদিগের নিকট হইতে গৃহীত ধন স্বার্থ সাধনে বিনিয়োজিত করা—হিন্দু রাজগণের চিন্তার অতীত ছিল।

ব্রিটিশ রাজগণ বা রাজপ্রতিনিধিগণ যতদিন না হিন্দুরাজগণের চরিত্রের অনুকরণ করিতেছেন, যত দিন না তাঁহারা "স্বদেশীয় ও বিদেশীয়"—প্রজাদিগের মধ্য হইতে এই ভেদ উঠাইয়া দিতেছেন, যত দিন না তাঁহারা মহাত্মা আকবরের ন্যায় এ দেশীয় উপযুক্ত প্রজাদিগের সম্মুখে দেশের সর্ব্বোচ্চ পদের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন, যত দিন না তাঁহারা এ দেশের ধন স্বদেশে লুটিয়া লইয়া যাওয়া হইতে বিরত হইতেছেন, যত দিন না তাঁহারা এ দেশীয় প্রজাবৃন্দকে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রদান করিতেছেন, সংক্ষেপতঃ যত দিন তাঁহারা এ দেশীয় প্রজাবৃন্দকে বিজিত বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন,—ততদিন তাঁহারা এদেশীয়দিগের নিকট হইতে কখনই অকৃত্রিম রাজভক্তি প্রাপ্ত হইবেন না। প্রজাদিগকে জ্বলন্ত অনলে প্রক্ষেপ করুন, শূলে আরোপিত করুন, তথাপি তাহাদিগের হৃদয় হইতে বিরাগের চিহ্ন অপনীত করিতে পারিবেন না। দুর্ব্বল জাতি ভয়ে বাহিরে অনুরাগ দেখাইবে—ভয়ে বাহিরে "হজুর" "ধর্ম্মাবতার" প্রভৃতি তোষামদ বাক্য বলিবে—কিন্তু ভয়ে তাহাদিগের অন্তরের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তাহাদিগের হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইতে পারে না!—তাহাদিগের নিভৃত অশ্রুবিন্দু নিবারিত হইতে পারে না!

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি এদেশীয়দিগের কিরূপ ভক্তি তাহা যুবরাজ আলবার্টকে যে সকল কবিতোপহার প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল পাঠ করিলেই অসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারা যায়। সকল গুলিতেই ভাবী রাজার প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ, সকল গুলিতেই অন্তর্নিগূহিত বিরাগচিহ্ন দেদীপ্যমান। কোন খানিতেই অকৃত্রিম ভক্তির স্রোত অনিবার্য্য রূপে প্রবাহিত হয় নাই।

ভারতবাসীরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের স্পষ্টাক্ষরে মনের কথা বলিবার অধিকার নাই। যে সকল কথা বলিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হন, সে সকল কথা ব্যতীত অন্য কথা বলিবার তাঁহাদিগের অধিকার নাই।

ভারতবাসিদিগের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র, প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক গ্রন্থ—এইরূপ ইংরাজ-স্তোত্রে পরিপূর্ণ। দুই এক খানিতে দুই একটী সত্য কথা অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি কষ্টে ব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে রাজাই বা প্রজাদিগের মন কিরূপে জানিতে পারিবেন, আর প্রজারাই বা রাজার নিকট হইতে কি শুভ ফলের আশা করিতে পারিবেন?

যে দেশে পূর্ণ সত্য বলিবার অধিকার নাই—যে দেশে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতে গেলে রাজদ্রোহিতা অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে হয়—সে দেশে রাজনীতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা প্রসূত হইতে পারে না। যুবরাজ-সাহিত্য † তাহার নিদর্শন। ইহার কোন খানিই ভাল নহে। কোন খানিই প্রশংসার যোগ্য নহে—কোন খানিতেই কবিত্ববিবর্দ্ধিনী অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শিত হয় নাই। সকল গুলিই যেন শ্রম-প্রসূত। সকল গুলিই যেন অনুরোধে লেখা—সকল গুলিই যেন লিখিতে হয় বলিয়া লেখা। কোন খানিই অনিবার্য্য ভক্তি ও প্রীতির স্রোতে উচ্ছলিত হয় নাই। সকল গুলিতেই গভীর দুঃখাবেগ, ও বলবতী ভাবী আশা পরিব্যক্ত হইয়াছে। দুঃখ-শান্তি বা আশা-পরিতৃপ্তির চিহ্ন কোন খানিতেই দৃষ্ট হইল না। দুঃখ এই বলিয়া যে দুঃখিনী জননী ভারতভূমির দুঃখ কোন বিদেশীয় রাজার দ্বারাই অপনীত হইল না; আশা এই বলিয়া যে যুবরাজ আলবার্ট সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জননী ভারতভূমির সেই দুঃখ দূর করিবেন।

যাহা হউক এই উপলক্ষে যে কয় খানি কবিতাগ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে হেম বাবুর **ভারতভিক্ষা** সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হেম বাবুর তেজস্বিনী কবিত্ব-শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে ইহাতেও পরিব্যক্ত হইয়াছে। শব্দ গুলি যেন স্রোতের জলের ন্যায় টল্ টল্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার পূর্ণ কোরস গুলি যেন পাঠকগণের মনকে পূর্ণ আনন্দে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। ভারতভিক্ষার স্থানে স্থানে অতি চমৎকার সোৎপ্রাসাক্তি পরিদৃশ্যমান হয়। আমরা ইহার দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের পরিতৃপ্তি বিধান করিব।

### আরম্ভ।

চারি দিক্ যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডল করি তোল পাড়
ভারত-ভূমে পড়িল সাড়া—

"কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর,
রাজ-দরবারে হও হে হাজির,
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা,
ছাড়ি সাঁচ্চা জুতা চুণী পান্না গাঁথা,
বিলাতি বুটেতে পদ সাজাও।

"জানু পাতি ভূমে হেলায়ে উষ্ণীষ,
পরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ,
বরাভয়প্রদ চারু করতল
তুলিয়া তুণ্ডেতে হইয়া বিহ্বল
অধর অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।

† Prince of Wales Literature.

"ভবে মোক্ষফল রাজ-দরশন,
ভারতে দেবতা বৃটন এখন,
সেই দেবজাতি-মহিষীনন্দন-
দরশনে পূর্ব্বপাপ ঘুচাও।

"কোথা কাশীরাজ, কোথা হে সিন্ধিয়া?
কোথা হলকার, রাণী ভোপালিয়া?
মানী উদিপুর, যোধমহীপাল?
হিন্দু ত্রিবঙ্কুর, শিক্ পাতিয়াল?
মহম্মদি রাজা কোথা হে নিজাম্?
কোথা বিকানির? কোথা বা হে জাম্?
ধোলপুর-রাণা, জাঠের রাও?

"পর শীঘ্র পর চারু পরিচ্ছদ,
অর্ঘোতে সাজাবে আজি রাজপদ;
কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়,
'ভারত-নক্ষত্র' বাঁধিয়া গলায়,
রাজধানী মুখে ধাবিত হও।

"ঘোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে,
কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে,
ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে,
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও।
কর রাজভেট নবাব, আমীর,
রাজদরবারে হও হে হাজির—
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
করি তোল পাড় নগর পাহাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

( শাখা )

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে
রাজেন্দ্র-কেশরী যত,
পারিষদ বেশে দাঁড়াইতে পার্শ্বে
শিরঃগ্রীবা করি নত;
দেখরে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান
আফগানস্থান ছাড়ি,
ছুটিল কাশ্মীরি ক্ষত্রিয় ভূপতি
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি;
দ্রাবিড়, কঙ্কণ, ভোট, মালোবার,
মহারাষ্ট্র, মহীসুর,
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,
অযোধ্যা, হস্তিনাপুর,
বুঁদেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,
কচ্ছ, কোঠা, সিন্ধুদেশ,
চাম্বা, কাতিয়ার, ইন্দোর, বিঠোর,
অরবলিগিরিশেষ,
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,
রাজধানী দিকে ধায়,
পালে পালে পালে পতঙ্গের মত
নিরখি দীপশোভায়;
ছুটিল অশ্বেতে রাজপুত্রগণ
চন্দ্রসূর্য্যবংশবীর;
জলধি বন্দর হিমাদ্রি ভূধর
দাপটে হয় অস্থির।—
কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়
দ্বাপরে হস্তিনামাঝে!
রাজসূয় যজ্ঞ দেখ একবার
কলিতে করে ইংরাজে!

## আরম্ভ।

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি,
মহিষীনন্দন কোলেতে এল;
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল!
আদরে ধর মা কুমারে সম্ভাষি,
আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারি মুখে,

বহু দিন তারা হয়েছে আপন
তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে !
ত্যজ শয্যা, মাতঃ অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চির দুখী তুমি চির পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
তুমি মা অভাগী অনাথা, দুর্ব্বলা,
ভজন পূজন যোগমুগধা !
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে
জগতে এখনও আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাইতে
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে ;
দেখাও, জননি, ধরিলা গো যত,
রিপুপদচিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও, চিরিয়া ক্ষতবক্ষস্থল
দিবানিশি সেথা কি শোক জাগে।
উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি,
প্রসন্ন বদনে বারেক ফের ;
মহিষীনন্দনে কোলেতে করিয়া
প্রাতে শুক্রতারা উদিল হের !

( শাখা। )

ত্যজি শয্যাতল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গভীর পাণ্ডুর বদনমণ্ডল
আলোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,
কহিল উচ্ছাসে ভারতমাতা—
"কেন রে এখানে আসিছে কুমার ?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার !
কি দেখিবে আর—আছে কি সে দিন ?
ভ্রূভঙ্গি করিয়া ছুটিত যে দিন
ভারত সন্তান নৈঋত ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা !

"ভারত কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, য়ূনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।

"ছিল যবে পরা কিরীট, কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জ্বলন্ত অনল সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি,
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগত-মাতা !

"পাব কি দেখিতে তেমতি আবার
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,
ডাকিবে কুমার 'জননী' বলিয়া
ইউরোপ, আমেরিক উচ্ছাসে পূরিয়া—
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা !

"পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—

গিরীশেরও দেখি জীবনসঞ্চার!
আমি কি একাই পড়িয়া রব?

"কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ অরে বিধি বল্ রে আমায়?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হব!

"হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী!
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্য-শালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।

"মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার দুর্গ, নিকেতন,
রাখিল মহীতে—কলঙ্ক মণ্ডিত
কাশী, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল-ঘৃণিত,
শরীরে কালিমা—দীনতা প্রতিমা—
ধরণীর অঙ্গে যেন গাথিল!

"হায়, পানিপথ, দারুণ প্রান্তর
কেন ভাগ্য সনে হলি নে অন্তর?
কেন রে, চিতোর, তোর স্বপ্ননিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেন রে রহিলি?
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম?

নিবেছে দেউটি বারাণসি তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক মোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ?
পূর্ব্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ
অরে অগ্রবন? সরযূ পাতকী,
রাহুগ্রাস চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম?

"নাহি কি সলিল হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে?

"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায়?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল তলে?"

( তৃতীয়। )

আরম্ভ।

"এলো কি নিকটে,—এলো কি কুমার?"
বলিল ভারতজননী আবার,
"কই কোথা, বৎস, আয় কোলে আয়,
অন্তর জ্বলিছে দারুণ শিখায়—
পরশি বারেক শীতল কর।

"ডাক্ একবার, ডাকিস যে ভাবে
আপনার মায়ে—ঘুচা সে অভাবে
শত বর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
( ভারতের চির আশা আকিঞ্চন )
ভুলিয়া বারেক বৃটিশ গর্জ্জন,
ভারতসন্তানে ক্রোড়েতে ধর।

"কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,
নহে তুচ্ছ কীট—এদেরও অন্তর
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তিময়—
এদেরও শরীরে শিরায় শিরায়
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা-তৃষায়,
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে;
জগতব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে;
সমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমণ্ডল—
তখনও তাহারা ঘৃণিত নহে!

"যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন;
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তো
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখনও তাহারা ঘৃণিত নহে!

"তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।

"হে কুমার মনে রেখো এই কথা—
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা
পবিত্র সে দেশ—পূত-কলেবর
কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কোটি কোটি প্রাণী ঋষি পুণ্যধর,
কবি কোটি কোটি মধুর অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে।

"শুন হে রাজন্ বনের বিহঙ্গ,
পুষিলে তাহারে যতনের সঙ্গ,
পিঞ্জরে থাকিয়া সেহ সুখ পায়!
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়!
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ!

"কোকিলের স্বরে জগত তুষ্ট;
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট?
কি ধন সে কোকিলে দেয়?
কি ধন বল বা বায়সে নেয়?
একে মিষ্টভাষা হৃদয় সরল,
অন্যে তীব্রস্বর পরাণে গরল,—
ধরা চায় সরল হৃদয়রস।

"আমি, বৎস! তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।

কি কব, কুমার, হৃদি বক্ষ ফাটে,
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে!—
"বৃটিশ সিংহের বিকট বদন
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
"কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ কিম্বা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পূজি সবারে!

"এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছা রে আমার
ভারত-সন্তানে লয়ে একবার
ভাই বলি ডাক্, হৃদি জুড়ায়!

---

যুবরাজ সাহিত্যের মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখ-যোগ্য কবিতাগ্রন্থ নবীন বাবুর ভারত উচ্ছ্বাস। এ খানি অবকাশরঞ্জিনী ও পলাশী যুদ্ধের রচয়িতার সম্পূর্ণ অযোগ্য। নবীন বাবুর অমৃত-নিঃস্যন্দিনী লেখনী হইতে যে এরূপ অসার কবিতা গ্রন্থ প্রসূত হইবে তাহা আমরা কখন মনেও ভাবি নাই। বোধ হয় রাজকর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তি এ উপলক্ষে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় তাঁহার এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নবীন যশঃ কলঙ্কিত করা উচিত ছিল না। যাহা হউক তথাপি ইহার স্থানে স্থানে নবীনবাবুর স্বাভাবিকী কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যে কয়েকটী কবিতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১৮)

" ছিল অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ যার,
আজি পরহস্তে আত্মরক্ষা তার;
অক্ষয় আছিল যার অস্ত্রাগার,
আজি অশ্রুরাশি মহাস্ত্র তাহার!
মহাকাব্য 'মহাভারত' যাহার,
মহা রঙ্গভূমি 'কুরুক্ষেত্র' হায়!
ভীষ্ম দ্রোণার্জ্জুন অভিনেতৃ যার,
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

(১৯)

" যাও যুবরাজ! রাজপুতানায়,
বীর ইতিহাসে পরিপূর্ণ যার
প্রতিপদ; যার প্রতিপদ হায়!
কীর্ত্তিস্তম্ভ কাল-সাগর-বেলায়।
এখনো 'চিতোরে' স্মৃতির নয়নে,
দেখিবে 'পদ্মিনী' চিতার অনল;
সেই স্মৃতি তব দয়ার্দ্র নয়নে,
আনিবে কি আহা! একবিন্দু জল?

(২০)

" এ মহাশ্মশানে দাঁড়ায়ে কুমার,
জিজ্ঞাসিবে যবে—'এই রাজস্থান?'
উপহাসচ্ছলে অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
করিবে উত্তর—'এই রাজস্থান!
যাও, যুবরাজ, নর্ম্মদার কূলে,
ক'বে স্রোতস্বতী কল কল স্বনে,
পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র বীরাঙ্গনাকুলে,
সম্মুখ সমরে মরিত কেমনে।

(২১)

মহারাষ্ট্র জাতি,—নিদ্রাতেও যার
শিয়রে তুরঙ্গ কটিবন্ধে অসি;

হ'লো অস্তমিত বিক্রমে যাহার,
মোগলের বিশ্বত্রাস 'অর্দ্ধ-শশী।'
'শেষ পাণিপুটে' 'এসাই' সমরে
স্বাধীনতা তরে মত্ত সিংহপ্রায়
যুঝিল যে জাতি প্রাণপন করে,
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

(২২)

"একপদ আর;—সম্মুখে 'পঞ্জাব'
বীরপ্রসবিনী, 'সিখের' জননী;
'চিলেনোয়ালায়' যাহার প্রভাব,
দেখিলা বৃটিসকেশরী আপনি।
'সিপাহি বিদ্রোহে' ভারতকলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত ধারায়,
শেই 'সিখ' জাতি—বীরের আতঙ্ক!
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

(২৩)

"আজি, সে জাতির ভস্মরাশি হায়!
সিন্ধু জাহ্নবীর নর্ম্মদার তীরে,
পড়ে আছে; ক্রমে বিধির ইচ্ছায়
হইবে বিলীন, কালসিন্ধুনীরে।
আজি ভস্মময় ভারত হৃদয়,
একটী ধমনী নাহি চলে তার

* * * *

উপসংহারকালে আমরা নবীন বাবুর নিকট নিম্ন-লিখিত শ্লোকের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিঃ—

'সিপাহি বিদ্রোহে ভারতকলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত-ধারায়,

---

যুবরাজ-সাহিত্যের মধ্যে তৃতীয় উল্লেখ-যোগ্য বাবু হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত **ভারতে সুখ**। এ খানির বিশেষ গুণ পদলালিত্য।' এই নব কবি জয় দেবের পদলালিত্যের অনুকরণে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু চিন্তার গাঢ়তা, হৃদয়ভাবের গভীরতা, বর্ণনার ওজস্বিতা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে উচ্চশ্রেণীর কবি হওয়া যায় ইহাঁতে সে সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না। আশা করি নব কবি ভবিষ্যতে কবিতা লিখিবার সময় শুদ্ধ পদলালিত্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া হৃদয়কে গভীরভাবে উচ্ছসিত করিতে চেষ্টা করিবেন। যাহা-হউক ইহাঁর "ভারতে সুখ" পূর্ব্বোক্ত দোষ গুলি সত্ত্বেও যে এক খানি সুললিত কাব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা হইতে আমরা কয়েকটী কবিতা না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না:—

৫

হেন দুঃখময় ভারত-ভবনে,
কেন শুনি আজি আনন্দের ধ্বনি?
কেন চারি দিকে কোমল নিক্কণে,
মধুর সঙ্গীতে পূরিছে অবনী?—
অকালে কি আজি জগত-জননী
আবির্ভূতা উমা ভারত-মন্দিরে;
তাই কি ভারত প্রফুল্ল-বদনী,
নিরখি সুখদা ভব-তারিণীরে?

৬

শারদ পার্ব্বণে সুধু সুখ-নীরে
ভাসে অনিবার ভারত দুখিনী,

মনের বেদনা ভুলিয়া অচিরে,
তিন দিন তরে হয় আহ্লাদিনী ;
যেই তিন দিন ঝলে সৌদামিনী
অন্ধকারময় ভারত-অম্বরে,
জ্বলে তিন দিন তিন খানি মণি
চির কারাগার ভারত ভিতরে!

৮

এতদিনে কি রে চির দুখিনীর
হ'ল অবসান অনন্ত যাতনা!
শুকাল ঝরিত নয়নের নীর!
হাসিল মলিন বদন চন্দ্রমা!
অয়ি অনাথিনি, মলিন-বসনা,
পাষাণে আবৃত তোমার কপাল,
এ জনমে আর কখন যাবে না
সেই শৈলখণ্ড, রবে চিরকাল।

৯

চল গো কল্পনে! কাজ নাই আর
বর্ণি ভারতের দুঃখের কাহিনী ;
কি হবে বর্ণিলে, চিত্তে অভাগার
উছলিবে সুধু দুঃখ-প্রবাহিনী ;
মরিলে তনয় পুত্র-বিয়োগিনী
বরষি জননী নয়ন-আসার,
কালের অন্তরে সেই অভাগিনী
পারে কি করিতে কারুণ্য-সঞ্চার ?

১৫

"অই দেখ, আঁখি করি উন্মীলিত
চঞ্চল ফেনিল অনন্ত সাগর,
নীলমণি দিয়ে করেছি সজ্জিত,
তুষিতে তোমার কোমল অন্তর ;
নীরময়-পথে, তুমি সহোদর,
আসিবে বলিয়া, আকাশ হইতে'
আহরণ করি নীলমণিস্তর,
সাজানু পয়োধি প্রফুল্লিত চিতে।

১৮

"অই শুন অই শ্যাম কুঞ্জবনে,
মত্তা কোকিলার মুখে মুখ দিয়া
ললিত পঞ্চমে মধু বরিষণে
ঝঙ্কারে কোকিল বসন্ত হেরিয়া ;
সরস বসন্তে উল্লাসে মাতিয়া
নব কোকনদে ভ্রমর গুঞ্জরে ;
পরিমল-ভারে অচল হইয়া
দক্ষিণ-অনিল মন্থরে সঞ্চরে।

২২

"বিমল স্ফাটিক আলোক-আধার
ঝুলিছে মার্জ্জিত রজত-শৃঙ্খলে,
ঝরে রাজপথে আলোক-আসার,
শত কোটি মনি কিরণ বিজলে ;
কুসুমের দাম পূর্ণ পরিমলে,
গ্রন্থিত প্রাচীরে লতায় লতায়,
কুসুমের দাম শতেক শৃঙ্খলে
বিনান জড়ান অতুল শোভায়।

২৪

দুরদৃষ্ট হায়! কর দরশন,
দেখ মা ভারতসন্তান তোমার,
অসার বিলাস করিতে সাধন,
উছলে সবার সুখ-পারাবার,
কিন্তু মা তোমার নয়ন-নীহার,
সজল প্রতিমা দেখে না নয়নে ;
সম্মানের তরে করি হাহাকার
লুটায় কেবল অন্যের চরণে।

---

যুবরাজ-সাহিত্যের মধ্যে চতুর্থ উল্লেখ যোগ্য কাব্য, সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—ভাবী পতি রাজো-ন্নতি-নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্‌স অফ ওয়েল্‌স বাহাদুরের প্রতি ভারতভূমির অভ্যর্থনা। যে কবি পদ্মিনীর উপাখ্যান লিখিয়াছেন, তিনি ভারতবাসী-মাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যদি এখন হইতে তাঁহার কবিতা গুলিকে এরূপ জঘন্য রসাভাসে পরিপূরিত করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সেই জাতীয় শ্রদ্ধা হইতে অচিরাৎ বঞ্চিত হইবেন। সত্য তিনি রাজকর্ম্মচারী, সুতরাং রাজস্তোত্র তাঁহার অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য। তাই বলিয়া কি বৃদ্ধা জননী ভারত ভূমিকে যুবতীর সাজ সাজাইয়া যুবরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়? তাই বলিয়া কি বৃদ্ধা জননীর মুখ হইতে——

"জরাজীর্ণ বটি আমি তোমায় নিরখি স্বামী
পুনরায় পাইলাম নবীন যৌবন।

—এরূপ লজ্জাকর কথা বাহির করিতে হয়?

"কে বলে ভারতভূমি বয়সে জরতী।
অপ্সরা আকারা নিত্য নবীন যুবতী॥"

—জননীর পরিচয় স্থলে তাঁহার আর কি কিছু বলিবার ছিল না? যাহা হউক রঙ্গলাল বাবুর প্রতি আমাদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে; সুতরাং তাঁহাকে আমরা অনুরোধ করি তিনি যেন ভবিষ্যতে এরূপ জঘন্য কবিতা লিখিয়া আমাদের মনে ঘৃণার উৎপাদন না করেন।

যুবরাজ-সাহিত্যের মধ্যে পঞ্চম উল্লেখ-যোগ্য কাব্য বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "প্রিন্‌স ইন্‌ ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ভারতে যুবরাজ। আমরা ইহার ইংরাজী নাম-করণ দেখিয়াই চটিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নহে। ইহার প্রধান দোষ ইহার মিলপ্রণালী বা রাইমিং †। যেমন করে হউক ইহার কবিতা গুলির শেষ অক্ষরের মিল ঘটান হইয়াছে। দুই একটী উদা-হারণ দিলেই পাঠকগণ আমাদিগের কথার অর্থ বুঝিবেনঃ—

(১) "ভূপতি পূজিতে যে সকল চাই,
এ ভারতে আর সে সকল নাই!"

(২) "বারেক কুমার, চেয়ে দেখ ওই,
রাজদ্রোহা নয়, রাজভক্ত বই।"

আমরা পূর্ব্বে যে রাজভক্তির বাহ্য প্রদর্শনের কথা বলিয়াছি, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ বাহুল্য দৃষ্ট হইল। দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারি-বেন :—

"কুমার! তোমার আজি দরশন পাইয়ে,
তোমার মঙ্গলগান মন খুলে গায়িয়ে,
ভুলেছি যতেক দুঃখ, স্বর্গের কল্পিত সুখ
ভুলেছি, ভুলেছি সবি তোমা ধনে হেরিয়ে;
ভারতে আনন্দ ধারা যায় আজি বহিয়ে।

(২) "কখনো দেখিনি যাহা,
আজি রে দেখিব তাহা;
সুভাগ্য এমন কার
জগতে আছে?

† Rhyming.

শাস্ত্রীয় বিধান এই,
যে ভূপতি, বিভু সেই,
আজি ভাবী ভূপে হেরি,
হেরিব রে বিধাতায়।"

(৩) "ঈশ হে তোমার করুণা অপার;
তোমারি প্রসাদে ভারত মাঝার
হেরিনু কুমারে, এহ'তে আবার
কি সুখ জগতে দেখিতে পাই?" ইত্যাদি

রাজভক্তির এতদূর ছড়াছড়ির অভ্যন্তরে আমরা যেন কোন গূঢ় অভিসন্ধি দেখিতে পাইতেছি। গ্রন্থকার ত রাজকর্ম্মচারী নন। তবে এরূপ স্তোত্রে তাঁহার কি অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

---

যুবরাজ-সাহিত্যের মধ্যে ষষ্ঠ উল্লেখযোগ্য কাব্য শ্রীগোপালচন্দ্র দে প্রদত্ত **রাজোপহার**। এ খানির ললাট বা মলাটে এই কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ লিখিত আছেঃ——

(১) নিঃস্বার্থে পালয়ে প্রজা তারে বলি রাজা।

(২) ধরণী ঈশ্বর নয় ধরার চাকর।
এই মনে ভাবে যেই সেই নরবর।

(৩) পক্ষপাতী নরপতি অভক্তি আধার।

এই কয়েকটী বিষয়ের দিকে প্রত্যেক রাজার লক্ষ্য রাখা উচিত।

এতদ্ভিন্নও ইহাতে অনেক সত্য এবং অনেক সারগর্ভ উপদেশ লিখিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেই সকল সত্য এবং সেই সকল সারগর্ভ উপদেশ রূপ উপকরণসামগ্রী একজন কবির হস্তে পতিত হয় নাই।

"যেমন পলাশ পুষ্প দেখিতে সুন্দর।
গন্ধ বিনা কেবা তার করে সমাদর॥"

সেইরূপ কবিত্ববিহীন কাব্যেরও আদর নাই। গ্রন্থকার এই সকল বিষয় গদ্যময় একটী ক্ষুদ্র রচনাকারে পরিণত করিলে ভাল করিতেন।

---

যুবরাজ-সাহিত্যের মধ্যে সপ্তম উল্লেখযোগ্য কাব্য—**ভারতের সুখ-স্বপ্ন**। এখানি নাটক। ইহাতে নাটকোচিত গুণ কিছুই নাই, তবে ভাষাটা নিতান্ত মন্দ নহে। গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের উপদেশ তিনি যেন এরূপ নাটক আর না লেখেন।

---

যুবরাজ-সাহিত্য হইতে আমরা যে সকল উদাহরণ তুলিলাম তাহাতে ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারতবাসীদিগের অন্তর্নিগূহিত বিরাগের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত রহিয়াছে। যে গুলি স্তোত্রে পরিপূর্ণ, সে গুলিতে কেবল মৌখিক ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। কারণ আমাদিগের বিশ্বাস প্রকৃত ভক্তি বাহ্য-আড়ম্বর-শূন্য।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট—যদি শুদ্ধ বলের উপর নির্ভর করিয়া ভারত শাসন করিতে চান তাহা হইলে কোন কথা নাই,—কিন্তু

তাঁহারা যদি বুঝিয়া থাকেন যে প্রজাদিগের অনুরাগ ব্যতীত শুদ্ধ বলে কখন অসংখ্য প্রজাকে অধিক দিন আয়ত্ত রাখা সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে তাঁহারা আয়র্লণ্ডকে যে সকল রাজনৈতিক স্বত্ত ও অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ভারতের অধিবাসীদিগকেও সেই সকল স্বত্ত প্রদান করুন। ভারতবর্ষীয় প্রজারা আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদিগের ন্যায় বলবান্, সাহসী ও অদম্য নয় বলিয়া ইহাদিগকে এরূপ হীনাবস্থায় ফেলিয়া রাখা কি সভ্যম্মানী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে স্বদেশীয় প্রজাদিগের সমান স্বত্ত ও অধিকার প্রদান করিয়া তাহাদিগের অনুরাগভাজন হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদিগের আর বিদেশীয় শত্রু হইতে এত ভয় পাইতে হইবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের বিংশতি কোটী প্রজাকে অস্ত্র প্রদান করুন্। বিংশতি কোটি প্রজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বাপক্ষ্যে অস্ত্র ধারণ করিলে কাহার সাধ্য ভারতে পদার্পণ করে? কিন্তু বিংশতি কোটী প্রজা নিরস্ত্র থাকিলে—বিংশতি কোটী প্রজা অস্ত্রবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিলে, এক লক্ষ সৈন্য লইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় অসংখ্য সেনার সহিত কত দিন যুদ্ধ করিতে পারেন? এক যুদ্ধে পরাজিত হইলে,—এক যুদ্ধে হতসর্ব্বসৈন্য হইলে—আর দ্বিতীয় যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না! হয়ত ইংলণ্ড হইতে সুশিক্ষিত সৈন্য আনার বিলম্ব সহিবে না! ভারতবর্ষীয় প্রজাবৃন্দকে অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত না করিলে আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ আকস্মিক বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার আশা নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে স্বদেশীয় প্রজাদিগের সমান স্বত্ত ও অধিকার প্রদান করিলে, তাহাদিগের হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন ভয় নাই। কারণ তখন আর তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়া মনে করিবে না। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন জন্য তখন তাহারা সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও পরাঙ্মুখ হইবে না। হিন্দুদিগের চিররূঢ় বিশ্বাস এই যে সমরে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। সেই চিরবদ্ধমূল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা মনের উল্লাসে সমরে প্রাণত্যাগ করিবে। এই জন্য আবার বলি—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিদিগকে অচিরাৎ স্বত্ত ও শস্ত্র প্রদান করুন। ইহাতে তাঁহাদিগেরই পরিণামে মঙ্গল।

যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একথা বলেন যে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পূর্ব্বোক্ত স্বত্ত ও অধিকার প্রাপ্তির এখনও উপযুক্ত হন নাই, তাহার প্রতিবাদে আমরা বলিব যে এ গুলি মনুষ্য মাত্রেরই জন্ম-স্বত্ত্ব (১)। সুতরাং তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার কাহারও অধিকার নাই। রাজা শাস-

(1). Birth-right.

নের জন্য যে গুলি অপরিহার্য্য, সেই গুলিই কেবল গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিতে পারেন।

আমাদের আরও একটী বক্তব্য আছে। যে ভারত এক দিন সমস্ত জগতের শৈশব-দোলা ছিল; যে ভারতের সন্ততিগণ এক সময় সুদূর পাশ্চাত্যে গমন পূর্ব্বক ইউরোপের অধিবাসীদিগকে ভাষা, ব্যবহার, নীতি, সাহিত্য এবং ধর্ম্ম পর্য্যন্তও শিক্ষা দিয়াছিলেন; যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যের শোণিত ইউরোপ, আমেরিকা, পারস্য, আরব এবং মিসর প্রভৃতি দেশের অসংখ্য অধিবাসীর শিরা সমূহে অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছে;—সেই সকল জাতির গাত্রচর্ম্ম হিমানীসংসর্গে ধবলিতই হউক অথবা বিষুবত্সূর্য্যের প্রখরতাপে কৃষ্ণবর্ণই হইয়া যাউক, তাহাদিগের মুখকান্তিতে, তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেই আদিম জাতির ছাঁচ অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে; তাহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত সুসভ্য রাজ্য সকল একে একে ভূমির সহিত বিলীনই হউক, নব নব জাতি সেই ভস্মরাশি হইতে সমুদ্ভূতই হউক, প্রাচীন নগরী সকলের স্থানে নব নব নগরী সকলই সংস্থাপিত হউক, তথাপি সেই আদিম জাতির অঙ্ক কাল ও ধ্বংসের যুগপৎ আক্রমণেও বিলুপ্ত হয় নাই; সেই ভারত এবং সেই ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের সন্ততিগণ যে ইংরাজ জাতির সহিত সমান স্বত্ব ও অধিকার লাভের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে ভারত হইতে পুরাকালের যাবতীয় ভাষার (ইডিয়ম) ও প্রকৃতি সকল গৃহীত হইয়াছিল, সেই ভারতের সন্ততিগণ ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার উপভোগের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে সংস্কৃত ভাষার নব আলোচনা হেতু ইউরোপে গ্রীক ও লাটিন ভাষা অধিকতর বোধগম্য হইয়াছে, সেই সংস্কৃতের জননী ভারতভূমির সন্ততিগণ ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে সংস্কৃত ভাষা হইতে সমস্ত স্লাভনিক এবং জার্ম্মানিক ভাষা সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সংস্কৃতের আবাসভূমি ভারতভূমির সন্ততিগণ ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে মনু মৈসর, হিব্রু, গ্রীক, রোমীয় এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের প্রাণদান করিয়াছেন, সেই লোকারাধ্য মনুর আবাসভূমি ভারতের অধিবাসীরা ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্তির অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে ভারতের দর্শনেতিবৃত্তকে সমস্ত জগতের দর্শনেতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা যাইতে পারে, সেই ভারতের প্রজারা ইংলণ্ডীয় প্রজার সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

পাশ্চাত্য জাতিগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে যাইবার সময় যে ভারতের আচার ব্যবহার, ভাষা ও ধর্ম্ম—অধিক কি দেব দেবীর স্মৃতি পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই আর্য্যভূমি ভারতভূমির অধিবাসীরা বৃটনীয় প্রজার সমান স্বত্ত্ব ও অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে ভারত সমস্ত প্রাচীন ও নবীন জাতির কবিত্ব ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গাথা ও সংস্কারের মূল; যে ভারত হইতেই জোরোস্তারের উপাসনাপ্রণালী, মিসরের সঙ্কেতাবলী, অধিক কি খৃষ্টের উপদেশ প্রণালী পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল; সেই ভারতের অধিবাসীরা বৃটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

মানবজাতির শৈশব দোলা—সমস্ত সভ্য জাতির আদিম আবাসভূমি—ভারত! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। প্রেম, ভক্তি, কবিত্ব ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি ভারত! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। ইংলণ্ড! তুমি স্বাধীনতা প্রিয়। সমস্ত জগতের দাসত্ব মোচন করা যখন তোমার চিরব্রত, তখন সমস্ত সভ্যজাতির জন্মভূমি ভারতভূমির দাসত্ব মোচন করিয়া সমস্ত সভ্যজগতে অতুল কীর্ত্তি লাভ কর, এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা! *

* ভারত ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বিষয়ে আমরা যাহা বলিলাম তাহা যে আমাদিগের স্বকপোল-কল্পিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেন এরূপ মনে না করেন। ভারত ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক লিখিয়াছেন। আমরা এখানে কেবল সুবিখ্যাত ফরাশি গ্রন্থকার জ্যাকোলিয়েট যাহা বলিয়াছেন তাহারই ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:———

India is the world's cradle; thence it is, that the common mother in sending forth her children even to the utmost West, has in unfading testimony of our origin bequeathed us the legacy of her language, her laws, her *morale*, her literature, and her religion.

Traversing Persia, Arabia, Egypt, and even forcing their way to the cold and cloudy north, far from the sunny soil of their birth; in vain they may forget their point of departure, their skin may remain brown, or become white from contact with snows of the West; of the civilzations founded by them splendid kingdoms may fall, and leave no trace behind but some few ruins of sculptured columns; new peoples may rise from the ashes of the

first; new cities flourish on the site of the old; but time and ruin united fail to obliterate the ever-legible stamp of origin.

Science now admits, as a truth needing no farther demonstration, that all the idioms of antiquity were derived from the far East; and thanks to the labours of Indian philologists, our modern languages have there found their derivation and their roots.

It was but yesterday that the lamented Burnouf drew the attention of his class "to our much better comprehension of the Greek and Latin, since we have commenced the study of Sanscrit."

And do we not now assign the same origin to Sclavonic and Germanic languages?

Manou inspired Egyptian, Hebrew, Greek and Roman legislation, and his spirit still permeates the whole economy of our European laws.

Cousin has somewhere said, "The history of Indian philosophy is the abridged history of the philosophy of the world."

But this is not all.

The emigrant tribes, together with their laws, their usages, their customs, and their language, carried with them equally their religion—their pious memories of the Gods of that home which they were to see no more—of those domestic gods whom they had burnt before leaving for ever.

So, in returning to the fountain-head, do we find in India all the poetic and religious traditions of ancient and modern peoples. The worship of Zoroaster, the symbols of Egypt, the mysteries of Eleusis and the priestesses of Vesta, the Genesis and prophecies of the Bible, the *morale* of the Samian sage, and the sublime teaching of the philosopher of Bethlehem.

* * * *

Soil of Ancient India, cradle of humanity, hail! Hail, venerable and efficient nurse, whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! hail, father land of faith, of love, of poetry and of science! May we hail a revival of thy past in our Western future!

Jacoleiot's Bible in India.

# এ দেশের কৃষির উন্নতি।

দিন দিনই শিক্ষিত লোকদিগের কৃষি বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকে যে কোন ব্যবসায় করে, তাহাতে অপরাপর সকলের অশ্রদ্ধা। এই অশ্রদ্ধা ব্যবসায়ের প্রতি নহে, কিন্তু ঐ ব্যবসায়ীদিগের অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রতি। তাহার প্রমাণ দেখ—এই দেশে তাঁতিদিগকে লোকে হেয় জাতি বলিয়া মনে করে; কিন্তু যাহারা কলে বস্ত্র বয়ন করে, তাহাদের কত সম্মান। এ দেশের কামারের অবস্থা দেখ, আর তার সঙ্গে বিলাতি কামারের (The chemical Engineer) অবস্থা তুলনা কর। আমাদের দেশের কৃষিব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিলাতের কৃষিব্যবসায়ীদের কত প্রভেদ একবার তাহা ভাবিয়া দেখ। ব্যবসায় এক হইলেও কেন তদবলম্বীদের এদেশে এত অনাদর আর অন্য দেশে এত আদর? বিদ্যা বুদ্ধির বিভেদই এই আদর ও অনাদরের কারণ। যদি আমাদের দেশের লোকে এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে আর কৃষিকার্য্যে তাহাদের এত অবহেলা ও অবজ্ঞা থাকিত না।

আমাদের দেশ হইতে বিলাতের কৃষকদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই সুন্দররূপ লেখা পড়া জানে; মধ্যে মধ্যে পার্লিয়ামণ্টে মহাসভার সভা পর্য্যন্তও হয়। যাহার অল্প বিস্তর অর্থ সম্বল নাই, সে আর বিলাতে কৃষক হইতে পারে না। এক এক জন কৃষকের ১০০০।১৫০০ বিঘা ভূমি। এই ভূমির চাসের জন্য ১২।১৪টী ঘোড়া ও ৯।১০ জন লোক রাখিতে হয়। কৃষিভূমির মধ্যস্থলে সাধারণতঃ বাসগৃহ থাকে। তাহার সংলগ্ন ফল ফুলের একটী বাগান আছে; তারই অতি নিকটে গোলাঘর ও গোশালা। প্রত্যেক কৃষককে প্রতি বিঘায় ২০৲।২৫৲ টাকা মূল ধন প্রয়োগ করিতে হয়। প্রতি বিঘায় বৎসরে গড়ে ৩৲।৪৲ অথবা শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা লাভ করিতে পারিলে অনেকে সন্তুষ্ট হয়। বিলাতে বৎসরে এক ফসলের অধিক প্রায়ই জন্মে না। আমাদের দেশে বৎসরে দুই ফসল অনায়াসে জন্মান যায়। যে স্থলে ইংলণ্ডে শতকরা ১ টাকা লাভ হয়, তাহাতে এ দেশে ২৷৷০।৩ টাকা লাভ হইবে। কৃষক কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্র ও অশ্ব স্বকীয় অর্থে ক্রয় করে। কৃষকের বাসগৃহ, গোলাঘর, ও গোশালা ভূস্বামী করিয়া দেন। তাহা ব্যতীত যে সকল কাজে ভূমির চির উন্নতি হয় অনেক স্থানেই ভূস্বামী তাহারও ব্যয় বহন করেন। কৃষক সাধারণতঃ ঐ টাকার বার্ষিক শত করা ৭৲। ৮৲ টাকা করিয়া সুদ দেয়। কৃষকের কর্ষণভূমি অতি

বৃহৎ ক্ষেত্র সমূহে বিভক্ত। প্রত্যেক ক্ষেত্রের আয়তন ৩০ বিঘা হইতে ১০০ বিঘা হইবে। পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ক্ষেত্র আয়তনে যত বড় হয়, কর্ষণ করিতে তত অল্প সময় প্রয়োজন করে। ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলে যতবার ঘুরিতে ফিরিতেহয়,বৃহৎ ক্ষেত্রে তত ঘুরিতে ফিরিতে হয় না; সুতরাং অনেক সময় বাঁচিয়া যায়। এই দেশে এক এক জন কৃষকের যত কৃষিভূমি, তাহা বিলাতের এক ক্ষেত্রের সমান হইবে কি না সন্দেহ স্থল।

আমাদের কৃষির যন্ত্র—লাঙ্গল, কোদাল আর মৈ। বিলাতে এ ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রকার যন্ত্র আছে। উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করিলে পরিশ্রম ও ব্যয়ের অনেক লাঘব হয়। বীজ বপনের পূর্ব্বে লাঙ্গল (plough), গ্রবর্ (grubber), মৈ (harrow), ও পেষণী (roller) ব্যবহৃত হয়। গ্রবর্ আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এদেশীয় পাঁচ সাতটী ক্ষুদ্র লাঙ্গল যেন এক খানি চৌ-কাঠে (Frame) লাগান আছে। ঘোড়ায় বা গরুতে ঐ চৌকাঠ খানি টানিয়া যায়। এই চৌকাঠে চাকা (wheel) লাগাইলে টানিতে সহজ হয়। এই যন্ত্রটীতে নীচের মাটী উপরে আসেনা, আর উপরের মাটী নীচে যায় না; কিন্তু ইংরেজী লাঙ্গলে তাহা হয়। সারি ২ করিয়া বীজ বপনের জন্য এক প্রকার যন্ত্র আছে। তাহাতে বীজ বপন করিলে এই লাভ হয় যে, শস্য ভিন্ন অন্য কিছু জঞ্জাল জন্মিলে যন্ত্রান্তর দ্বারা তাহা সমূলে বিনাশ করা যায় এবং এই সঙ্গে দুই সারির মধ্যে যে ভূমি, তাহা নাড়িয়া দেওয়া হয়। শস্য কর্ত্তনের জন্য এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাহা অতি চমৎকার। তাহাতে একজন লোক ও দুইটী ঘোড়া হইলে প্রতি ঘণ্টায় তিন বিঘার শস্য কর্ত্তন করা যায়। ভূমি সমতল না হইলে এই যন্ত্র ব্যবহার করা কঠিন; অন্ততঃ এই সমতলতার জন্য পেষণী ব্যবহার করিতে হয়। শস্য কাটিলে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য একটী অতি সহজ যন্ত্র আছে। যে সকল যন্ত্রের কথা বলিলাম, ইহার সকলই ঘোড়া বা গরুতে চালায়। আর বিচালি হইতে বীজ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আছে। ঘোড়ার দ্বারা ইহা চালান যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বিলাতে ৪। ৬ ঘোড়ায় এঞ্জিন দিয়া চালায়। তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় ৫০। ৬০ মোন বীজ এত পরিষ্কৃত হইয়া বাহির হয়, যে তাহাতে আর ধূলিটী-ও পাওয়া যায় না। ধূলা পরিষ্কার অথবা এক বীজ হইতে অন্যপ্রকার বীজ (যথা তিল হইতে গোধূম) ভিন্ন করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র (চালনী) আছে; তাহা একটী লোকের হাতে চালাইতে হয়।

বিলাতে কৃষককে গোমেষাদির আহা-রের জন্য অনেক টাকার খৈল কিনিতে হয় এবং শালগোম ইত্যাদি জন্মাইতে

হয়। ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য তাহাতে যে কোন বস্তু প্রয়োগ করা যায়, তাহার নাম ভূমি-সার। খৈল, শালগাম ইত্যাদি খাইলে গোমেষাদির মলমূত্রে যত সার হয়, কেবল ঘাসের উপর নির্ভর করিলে তত হয় না। গোবর বিলাতে এক মাত্র ভূমিসার নয়। খৈল, অস্থিচূর্ণ, সোয়ারা, চূন, লবণ, নানা প্রকার ভস্ম ইত্যাদি ভূমিসারেরও প্রচুর ব্যবহার আছে। শস্য ও ভূমির প্রকৃতি-ভেদে সারের বিভিন্নতা হয়। যে সকল ভূমি-সারের নাম করা হইল, আমাদের কৃষকেরা অনেকেই তাহার গুণ ও প্রয়োগ জানে না। আর জানিলেও তাহা ক্রয় করিতে পারে, এমন অর্থ সম্বল নাই— অনেক সারের প্রয়োগ মাত্রই সম্পূর্ণরূপ ফল প্রকাশ পায়না; কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হয়। অতি অল্প লোকই এইরূপ অপেক্ষা করিতে পারে। আর যাহারা সারের ব্যবহার জানে ও তাহা ক্রয় করিতেও পারে, তাহারাও অনেকে এ বিষয়ে তত মনোযোগ করে না। ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইলে ভূমির করবৃদ্ধি হইবে, তাহাদের অনেকেরই এই আশঙ্কা।

বিলাতে প্রতি জিলায় (County) কৃষকদের সভা আছে। ভূস্বামীরা পর্য্যন্ত এই সকল সভার সভ্য। এই সকল সভায় কি করিলে যন্ত্র, ভূমি-সার বা কৃষিপ্রণালী উৎকৃষ্ট হইবে, অর্থাৎ কি উপায়ে কৃষিকার্য্য করিয়া অধিক লাভ হইবে, তাহার আলোচনা হয়। সকল বিষয়েই একে অপরের অভিজ্ঞতা জানিতে পারে। প্রতি বৎসর এই সকল সভার ব্যয়ে কৃষি-প্রদর্শন হয়। যাহারা উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মাণ, উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদন, উৎ-কৃষ্ট প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পাদন এবং শ্রেষ্ঠ জাতীয় গোমেষাদির পরিপোষণ ও বর্দ্ধন করে, তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ ও পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সকল সভা ও প্রদর্শনের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কোন সম্পর্ক নাই। ভূস্বামী ও কৃষকেরা মিলিয়া সমুদয় উদ্যোগও ব্যয় ভার বহন করেন।

কৃষক-সন্তানেরা রীতিমত স্কুলে লেখা-পড়া আর পিতার কৃষিভূমিতে কৃষি করিতে শিখে। বিলাতে একটী অতি উত্তম কৃষি-বিদ্যালয় হইয়াছে। তথায় কৃষিবিদ্যা ও তদনুকূল বিজ্ঞান সমূহের শিক্ষা হয়। আমাদের দেশেও এইরূপ কৃষিবিদ্যালয় হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠি-য়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক একটী কৃষিক্ষেত্র আছে; তাহাতে চৌদ্দ পনর শত বিঘা ভূমি হইবে। এক এক জন কৃষকের হস্তে কৃষি ক্ষেত্রের ভার রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে নিয়ম সকল আর কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রণালী শিখিতে হয়। যাহারা কৃষকের পুত্র নয়, কৃষি শিখিতে হইলে তাহারা কেহবা এই বিদ্যা-লয়ে কেহবা অন্য কৃষকের বাড়ীতে থাকিয়া কৃষি শিখে।

কৃবিবিষয়ক অনেক গুলি সংবাদ পত্র আছে। কৃষকেরা অনেকেই তার দুই এক খানি লইয়া থাকে। স্বদেশে বা বিদেশে

কৃষি সভার আলোচনা অথবা কৃষি বিষয়ক কোন প্রকার নূতন আবিষ্কার ঐ সকল সংবাদ পত্র পড়িলেই জানিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অশেষ উপকার হয়। আমাদের দেশের কৃষকেরা প্রায়ই লেখাপড়া বিষয়ে মূর্খ। সুতরাং তাহারা কোন সংবাদ পত্র পড়িতে পারিবে না। নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এমন কি নিকটবর্ত্তী জিলায় কৃষিপ্রণালী কিরূপ, সে বিষয়েও অবগতির অভাব রহিয়াছে। বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত কৃষকেরা ভাল করিয়া লেখাপড়া না শিখিবে, অথবা যে পর্য্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরা কৃষিকর্ম্মে অর্থ ও বুদ্ধি নিয়োজিত না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আর কৃষির কোন বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বিলাতে প্রত্যেক ভূস্বামীরাই ন্যূনাধিক ১০০০ বিঘা আয়তনের নিজের কৃষিক্ষেত্র (Homefarm) আছে। এক জন কর্ম্মঠ লোকের হাতে সাধারণতঃ এই কৃষিক্ষেত্রের ভার থাকে। কিন্তু অনেক স্থানে ভূস্বামী নিজেই সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করেন। বিলাতে ভূস্বামীরা সুন্দররূপ বুঝিতে পারিয়াছেন যে কৃষির উন্নতি হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের লাভ; যে কোন প্রকারে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হউক না কেন, জমিদারের লাভ নিশ্চয়, অপরাপরের লাভ ক্ষণস্থায়ী। আমাদের দেশের জমিদারেরা অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন নহেন; কিন্তু তথাপি কৃষির উন্নতি হইলে করবৃদ্ধি অবশ্যই হইবে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পূর্ব্বোক্ত কৃষি সভায় ও কৃষি প্রদর্শনে ভূস্বামীরা অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করেন। প্রিন্স অব্ ওয়েলসের সঙ্গে যে ডিউক অব্ সাদারলাণ্ড আসিয়াছিলেন, তিনি এক জন অতি সুবিখ্যাত কৃষক। কৃষি বিষয়ে তাঁহার উদ্যোগ, উৎসাহ ও অর্থব্যয় বিলাতের সর্ব্বত্র খ্যাত। অতি গভীর কর্ষণের জন্য কয়েক দিন হইল তিনি একটী লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন; তার নাম "সাদারলাণ্ড প্লাউ"। মার্কুইস অব টুইডল্ এক সময়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। হাডিংটন সিয়ারে তাঁহার বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনিও এক জন বিখ্যাত কৃষক। কৃষি যন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে অনেক কামার ও ছুতার আছে। তিনি এক রকম লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাঁহার বাসস্থানের নামানুসারে ঐ লাঙ্গলের নাম "ইয়েষ্টর প্লাউ" হইয়াছে। অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর নাম করিতে পারি; তাঁহারা সর্ব্বাংশে কৃষক নামের উপযুক্ত। উইণ্ডসরে (Windsor) রাজবাটীর অতি নিকটে "আল্বার্ট ফার্ম" (Albert Farm) নামে মহারাজ্ঞীর অতি উৎকৃষ্ট কৃষিক্ষেত্র আছে। তথায় অনেক দেশের ভাল ভাল গরু আছে। মহারাজ্ঞী যখন উইণ্ডসরে থাকেন, তখন অনেক সময়ে তথায় যাইয়া বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন। প্রিন্স অব্ ওয়েলসেরও এইরূপ এক কৃষিক্ষেত্র আছে। অনেক কৃষিপ্রদর্শনে ইঁহারা উভয়েই শ্রেষ্ঠ গো মেষাদির

জন্য পুরষ্কার পাইয়াছেন। যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ইংলণ্ডে মহারাজ্ঞী হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই কৃষিব্যবসায় ঘৃণার্হ মনে করেন না। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও কৃষির এইরূপ সম্ভ্রম করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা স্বীয় নামের স্বার্থকতা করেন। যে সকল দেশে কৃষির এইরূপ আদর, তথায় যে তার উন্নত অবস্থা হইবে, কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

বিলাতে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি জনিত অনিষ্ট নিবারণের একটী অতি সুন্দর উপায় উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। এই উপায়টী ব্যয়-সাপেক্ষ বটে; কিন্তু ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর উপায় এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ভূমির ২।৩ হাত নীচে আর ২০।৩০ হাত অন্তরে নালা কাটিয়া তাহাতে নল পাতিয়া যায়; তার পরে ঐ নালা মাটী দিয়া ঢাকিতে হয়। এইরূপে সমস্ত ক্ষেত্রের নীচে নালা ঢাকা থাকে। বৃষ্টি হইলে মৃত্তিকা প্রবেশ করিয়া জল ঐ নলে পড়ে, এবং তাহা দ্বারা বাহির হইয়া যায়। মৃত্তিকায় অনেক দিন জল স্থির হইয়া থাকিলে শস্যের অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। যদি ভূমির নিম্নস্থ নল দ্বারা জল নির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলেও মৃত্তিকা যথেষ্ট আর্দ্র থাকে। আমাদের দেশে অনেক সময় এত বৃষ্টি হয় যে জলে মাটীর উপরিভাগ ধুইয়া লইয়া যায়। এই উপরিভাগে যত সার হেওয়া যায়, তাহা চলিয়া গেলে শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। যদি ভূমির নীচে নল থাকে, তাহা হইলে আর এই অনিষ্ট হয় না। এইরূপ ঢাকা নালার আর এক উপকার এই—শীতকালে রৌদ্রের উত্তাপে মাটী ফাটিতে থাকে, এবং যত গ্রীষ্ম বাড়ে, ততই মাটী শক্ত হইয়া আসে। এই মাটীর চাস করা সামান্য কষ্ট নয়; গর্ত্তেতে লাঙ্গল ঠেকিয়া যায়, আর কার সাধ্য যে শক্ত মাটী ভাঙ্গে? যদি মাটীর নীচে নালা থাকিত তাহা হইলে আর মাটী এত ফাটিত না। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বৃষ্টি না হইলে রৌদ্রে যে সকল ভূমিতে ঢাকা নালা আছে তার শস্য তত পুড়িতে পারে না। আবার ঐ নালার নল দ্বারা বৃক্ষাদির মূলে জল দেওয়া যায়। এইটী জল সেচন করিবার অতি সহজ উপায়। এক বিঘায় এইরূপ ঢাকা নালার জন্য ১৩।১৪ টাকা ব্যয় হয়। এই কাজটী একবার পরিপাটী মত করিলে চিরকাল থাকিয়া যায়। বিলাতে ভূস্বামীরাই ইহা করিয়া দেন। আমাদের দেশেও তাহা হওয়া উচিত। জমিদারেরা এই জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ॥০ সুদে টাকা ধার করিতে পারেন। প্রতি বিঘায় যদি ১৩৲।১৪৲ টাকা ব্যয় হয়, তার সুদ বৎসরে (শত করা মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে) ১৸০ কি ১৶০ হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐরূপ নালা করিলে প্রতি বিঘায় বৎসরে গড়ে পূর্ব্বাপেক্ষা ৩৲।৪৲ টাকার অধিক শস্য জন্মিবে।

আমাদের দেশে চাস করিবার ভাল যন্ত্র

নাই; আর যাহা আছে তাহাও মাটীর উপর দিয়া কোন মতে আঁচড়াইয়া যায় মাত্র। গভীর চাসের অভাবে শস্য অপেক্ষাকৃত অল্প জন্মে। এই গভীর চাস সম্বন্ধে অনেকের অনিষ্ট-কর সংস্কার রহিয়াছে। কিন্তু সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে চারিটী পুত্র রাখিয়া এক কৃষকের মৃত্যু হয়। কৃষক মৃত্যু কালে পুত্রদের জন্য কোন সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিল না, কিন্তু বলিয়া গেল যে আমি এক দিন একটী রত্ন পাইয়াছিলাম, তাহা অমুক ক্ষেত্রে পুতিয়া রাখিয়াছি। তাহা বিক্রয় করিয়া তোমরা চারি ভ্রাতায় ভাগ করিয়া নিবে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা রত্ন লাভের আশায় আগ্রহ সহকারে ভূমি খনন করিতে লাগিল। ক্ষেত্রখনন শেষ হইয়া গেল, কিন্তু কোথাও রত্ন মিলিল না। হতাশ হইয়া অবশেষে কৃষকপুত্রেরা ঐ ক্ষেত্রে বীজ-বপন করিল, এবং তাহাতে এবৎসর অনেক শস্য জন্মিল। পরিশ্রম সহকারে ভূমি কর্ষণ করিয়া যে প্রচুর শস্য জন্মিল, কৃষক-পুত্রেরা তাহাই পিতৃদত্ত রত্ন বলিয়া বুঝিতে পারিল, এবং প্রতিবৎসর এইরূপে বিস্তর শস্য উৎপাদন করিয়া সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিতে লাগিল। এই উপাখ্যান-টীর প্রতি ঘটনায় সত্য নিহিত রহিয়াছে। পৃথিবী যথার্থই রত্নগর্ভা; উপযুক্তরূপ কর্ষণাদি করিলে শস্যরূপে এই রত্ন লাভ করা যায়। যাহারা তাহা না করে, তাহারাই এই রত্নে বঞ্চিত হয়। অল্প-কর্ষণ করিলে মৃত্তিকা যেরূপ রৌদ্রে পুড়িয়া যায়, গভীর কর্ষণ করিলে কখনই তত পোড়ে না। বিশেষতঃ অধিক মৃত্তিকার কর্ষণ হেতু গাছের শিকড়ে অধিক জল ও অন্যান্য বস্তু উদ্ভিদের আহার্য্যরূপে সুলভ হয়। যে মৃত্তিকা কর্ষণ করা হয় নাই, তাহা ভেদ করিয়া আহার অন্বেষণ করা শিকড়ের পক্ষে কঠিন ব্যাপার; এইজন্য গভীর কর্ষণের বিশেষ প্রয়োজন। যে স্থলে নীচে অপকৃষ্ট মৃত্তিকা আছে, তথায় ইংরেজী লাঙ্গল দিয়া মৃত্তিকা উপরে আনিলে আপাততঃ অনিষ্ট হইবে। এই সকল স্থলে আমাদের দেশী লাঙ্গল অথবা ইংরেজী গ্রবর্ ব্যবহার করিয়া গভীরা-কর্ষণ করা উচিত। তাহাতে যথাকার মৃত্তিকা তথায় থাকিবে, অথচ কর্ষণ কার্য্য অতি গভীর ও সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে।

আমার বিবেচনায় এই দেশের ভূমি অর্থবৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান উপায়। উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিলে অধিকাংশ স্থলে এক্ষণকার তুলনায় দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হইবে। এই দেশের কত ভাগ অরণ্যে আবৃত। অবশিষ্ট ভাগেও যত শস্য জন্মান উচিত, তাহা হইতেছে না। অন্যান্য দেশের অপেক্ষা এই দেশের ভূমি অধিক-তর উর্ব্বরা; এই কারণে অন্যান্য জাতির উপর আমাদের যে স্বাভাবিক প্রাধান্য

রহিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতে পারিলে, অনেক জাতি আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে। দেখ. বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের অধীনে প্রায় ২,৫০,০০০ বর্গ মাইল ভূমি হইবে। মনে কর, ইহার এক দশমাংশ মাত্রে কৃষি হইয়া থাকে। এই দশমাংশে প্রায় ৫ কোটি বিঘা ভূমি হইবে। যদি কোন প্রকারে প্রতি বিঘায় বৎসরে পূর্ব্বাপেক্ষা ২ টাকা মূল্যের অধিক শস্য জন্মে, তাহা হইলেও বৎসরে ১০ কোটি টাকা করিয়া দেশের ধন বাড়িবে। উৎকৃষ্ট যন্ত্র ও ভূমিসার ব্যবহার করিলে প্রতি বিঘায় বৎসরে ২ টাকা, অথবা প্রতি ফসলে ১ টাকা করিয়া অধিক শস্য উৎপন্ন হওয়া অতি সমান্য ব্যাপার। দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে এই জন্য কত লোক কত সমুদ্র মন্থন করিতেছেন; কিন্তু সম্মুখে যে কল্পতরু রহিয়াছে, কেহ একবার সে দিকে দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। কৃষি বিষয়ে আমাদের কেহ বিরোধী নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। অমুক জাতির অধীন হইয়া আমরা উপযুক্ত মূল্যে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারি না, এই কথা বলিবার উপায় নাই। কিন্তু তথাপি কৃষির প্রতি সাধারণের অবহেলা।

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে এই দেশে—

১। প্রত্যেক জমিদারেরই অন্ততঃ দুই তিন শত বিঘা আয়তনের একটী নিজের কৃষিক্ষেত্র থাকা উচিত।

২। প্রেসীডেন্সী কলেজে যেমন এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ রহিয়াছে, বাঙ্গালা মেডিকেল স্কুল বা নর্ম্মাল স্কুলের সঙ্গে এইরূপ কৃষি বিভাগ থাকা উচিত। তাহাতে রসায়ন, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, এবং কর্ম্মকার ও সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং কৃষিবিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একটী লোক থাকিবে। আর উপযুক্ত লোকের অধীনে স্কুলের সম্পর্কে একটী কৃষিক্ষেত্র থাকিবে। ছাত্রেরা স্কুলে নিয়মাবলী আর কৃষিক্ষেত্রে কৃষিপ্রণালী শিখিবে। কৃষি বিদ্যালয়ে জমিদারদিগের বিশেষ রূপ সাহায্য করা উচিত।

৩। কৃষি বিষয়ে সহজ ভাষায় ও অল্প মূল্যে এক খানি বাঙ্গালা পত্রিকা হওয়া উচিত।

৪। বাঙ্গালা পাঠশালা সমূহে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক, কম্মকারও সূত্রধর ইহাদিগের অন্ততঃ একটী ব্যবসায়ও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

৫। বৎসর বৎসর প্রতি জিলায় কৃষি প্রদর্শন হওয়া উচিত ও উকৃষ্ট গো মেষাদির জন্য পুরস্কার দেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।*

* বাবু শ্রীনাথ দত্ত প্রেসিডেন্সি কালেজের বি, এ ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তিন বৎসর কাল ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে বিজ্ঞান ও শিল্পের আলোচনা করেন। ইনি সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি

য়াছেন। বিলাত হইতে যে কয় জন বাঙ্গালী ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহই শ্রীনাথ বাবুর ন্যায় কার্য্যকরী বিজ্ঞানও শিল্প বিদ্যা শিখিয়া আসিতে পারেন নাই। ইউরোপীয় জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারি, কৃষি ব্যতীত আমাদিগের এমন আর কোন ব্যবসায় নাই। যে ব্যক্তি বিলাত হইতে সেই কৃষির উৎকৃষ্ট প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে ভূমির উৎকর্ষসাধনে বিনিযোজিত করা ভারতবর্ষের জমিদার ও রাজাদিগের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কার্য্য। স।

# কাদম্বিনী

বিচিত্র তোমার ভাব দেখি কাদম্বিনি!
না জানি কাহার তুমি প্রেমের অধিনী।
ধরিয়া নানান বেশ, ফিরেতেছ দেশ দেশ,
প্রেমের ছলনে ছলি সংসারে রঙ্গিনী;—
তুমি, রঙ্গ-বিলাসিনী।

সমীরণ-প্রেমে ধনী ভাল ত মজিলে;
একাত্মা উভয়ে যেন, ভাবে দেখাইলে।
চলিলে সমীর, চল, না চলিলে নাহি চল,
প্রেমস্নিগ্ধ গুণে তার গাঢ় যে হইলে;—
মরি, গাঢ় যে হইলে।

২

এ নব যৌবন, যথা বৃথায় বহন,
বলি লতা, সমীপস্থে করে আলিঙ্গন;
পারাবার ক্রোড় ত্যেজে, বিমোহন সাজ সেজে
উঠিলে পবন অঙ্কে, শোভিয়া গগণ;—
মরি, রঞ্জিয়া গগণ!

ফিরিতে পবন সঙ্গে হেরিলে ভূধরে;
সুশ্যামল তনুরুচি চর্চ্চিত নির্ঝরে;
বিশাল বিস্তৃত কায়, উন্নত ললাট, তায়,
কোটি চন্দ্রময় কিবা, কলাপ বিহরে!
কিবা, কিরীট বিহরে!

৩

কোমল কিশোর কান্তি, সুবিমল শ্যাম,
অধরে বিজলী-হাসি ঝলে অবিরাম।
মরি কি মন্থর গতি, যেন প্রেমভারে অতি
ঢলিয়া পড়িছে অঙ্গ, লভিতে বিরাম;—
যেন, লভিতে বিরাম!

দেখি হেন রূপ, তব নয়ন ভুলিলা;
অনিলেরে অবহেলি, অমনি চলিলা।
প্রেম আলিঙ্গনে শৈলে, আগ্রহে হৃদয়ে লৈলে
প্রীতি অশ্রুনীরে তার তনু ভাসাইলা;
তার তনু ভাসাইলা।

পুন দেখি উষাগমে, লোহিতে সাজিয়া,
অরুণের আগে ধনী, হাসিছ বসিয়া।
কিবা প্রেম অনুরাগ, উভয়েরি নব রাগ,
দোঁহাকার রাগে দোঁহে গিয়াছ মিশিয়া।
যেন, গিয়াছ মিশিয়া।

৮

ঢল ঢল কিবা অঙ্গ, সুখের আধার,
আবেশের স্বেদ, তাহে ক্ষরে অনিবার!
প্রেম ফাঁদে পড়ি তব, তপন খোয়ায়ে সব,
দোলাইল তব হৃদে সুবর্ণের হার;—
কিবা, বিচিত্র সে হার!

৯

রাতে পুন, দেখি বড় সৌদামিনী ছটা।
জানি আমি,প্রেমিকের রাতে বাড়ে ঘটা।
ত্যজিয়া সে বিরোচনে, মিলি নিশাকর সনে,
দেখাছ সংসারে কত প্রেম ঘট ঘটা।—
কত, প্রেম ঘট ঘটা।

১০

মিলিল এবার ভাল, দেখি দুই জন!
ভুবনমোহিনী তুমি, সে রামারঞ্জন।
মলিন করি নিশিরে, বঞ্চি সুধা কুমুদীরে,
ডুবিল তোমার প্রেমে যামিনী-শোভন।
সে যে, কুমুদ-জীবন।

১১

ক্ষণে দেখি চাঁদে ফাকি দিয়ে পলায়েছ।
সংসারে ছলিয়া প্রেমে, কোথা লুকায়েছ
না দেখি পবন সঙ্গে, ভূধরের চারু অঙ্গে,
পবনের সাথে সুখে শূন্যে ফিরিতেছ।
সুখে, শূন্যে ফিরিতেছ।

১২

সহসা দিগন্তে দেখি বিঘোর মূরতি!
নাহি সে মৃদুল ভাব মনোলোভা অতি।
নাহি আর সুধা ক্ষরে, মহারোষ আড়ম্বরে,
ফাটিছে আকাশ ঘন ঘোর নাদে অতি।—
মহা ঘোর নাদে অতি!

১৩

হানিতেছ বাজ সেই প্রিয় শৈল শিরে;
ত্রাসেতে পলায় বায়ু নাহি চায় ফিরে।
মুদেছে নয়ন রবি. কোথা বা সে হিমচ্ছবি,
আকুল পরাণে অব্ধি ধরে অবনীরে;
ত্রাসে ধরে অবনীরে।

১৪

এই কি প্রেমের রীতি ওহে কাদম্বিনি?
বল দেখি কার তুমি প্রেমের অধিনী?
প্রেমাধিনী তুমি কার, নহ জানি তথ্যতার,
মনসিজ মূর্ত্তি খুজি ফিরিছ শোভিনী,
শূন্যে ফিরিছ শোভিনী।

১৫

দাঁড়াও তোমারে আমি দিব উপহার,
মানব-জীবন সার প্রেমের আধার।
ধর, দিব প্রিয়মন, প্রেমিক জনের ধন
প্রেমের মরম জানে তারে বিনা আর,
দিব কারে উপহার।

১৬

পবন হিল্লোলে লাজি, আদর লহরে,
বহিবে তোমারে মন ব্যাপ্ত চরাচরে।
অনুরাগে গাঢ় করি, রাখিবে হৃদয়ে ধরি,
ধোয়াইবে সদা অঙ্গ স্নেহের নির্ঝরে—
স্নেহ, প্রীতির নির্ঝরে।

১৭

সুখের কিরণ সাজে তনু সাজাইবে,
প্রেম-স্ফুট বাক্য হার হৃদে দোলাইবে।
প্রসন্ন মুখের হাসে, অনন্ত গোলক ভাসে,
মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মন তাই নেহারিবে,
ভুলে, তাই নেহারিবে।

১৮

দাঁড়াও প্রেমিকা, আমি দিব উপহার,
মানব-জীবন-সার প্রণয় আধার।
ধর, দিব প্রিয় মন, প্রেমিক জনের ধন,
প্রেমের মরম জানে তারে বিনা আর,
দিব, কারে উপহার।

১৯

দারুণ উত্তাপে ফাটে হৃদয় দুর্ব্বল,
ছায়ার পরশে আর নহে সুশীতল।
ধর ধর লও মন, কৃতার্থী, প্রণয়ীজন,
হৃদের বাসনা, তার করহ সফল;—
(হবে) তাহে তোমারও সফল।

# কবিত্ব ও কাব্য সমালোচনা।

## তৃতীয় প্রস্তাব।

উপাখ্যানই আখ্যান-কাব্যের মূল অবলম্বন; উপাখ্যানের প্রকৃতি অনুসারে আমরা আখ্যান কাব্যকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যথা খণ্ড-কাব্য ও মহাকাব্য। স্বকীয় ক্ষেত্রে কোন নায়ক নায়িকার যে বিবরণ, তাহাই খণ্ড কাব্য; আর সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যক্তি সাধারণের যে বিবরণ, অর্থাৎ এমন কোন মহদ্ঘটনা, যাহাতে মানবসমাজে যুগান্তর উপস্থিত করাইয়া দেয়, তাহাই মহাকাব্য। এই খণ্ড কাব্য এবং মহাকাব্যের প্রকৃতি আবার দুই প্রকার; শ্রাব্য ও দৃশ্য; শ্রাব্য-প্রকৃতি কাব্য সাধারণকে শ্রাব্যকাব্য, ও দৃশ্য-প্রকৃতি কাব্য সাধারণকে দৃশ্য কাব্য কহে। যাহা শুনিবার যোগ্য, তাহাই শ্রাব্য-প্রকৃতি, আর যাহা দেখিবার যোগ্য, তাহাই দৃশ্য-প্রকৃতি। কিন্তু শুনিবার ও দেখিবার যোগ্য প্রকৃতি কিরূপ? যাহা কেবল বাক্যের বর্ণনীয়, তাহাই শুনিবার যোগ্য, আর যাহা কেবল বাক্যে বর্ণিত হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা সুধু বাক্যের বিষয় নয়, মূল অবস্থাটি দর্শনে উপলব্ধি করার প্রয়োজন, তাহাই দেখিবার যোগ্য। মানবের জীবন কাণ্ডই উপাখ্যান; এই জীবন কাণ্ড কখন বাহ্য ও কখন আভ্যন্তরীণ কারণে প্রবল হইয়া থাকে। যাহা বাহ্যকারণে উৎপন্ন হইয়া, অন্তরের উপর কার্য্য করে, এবং যাহার কার্য্যফল আবার বাহ্যে আসিয়া পরিণত হয়, তাহাই বাক্যের বিষয়, অর্থাৎ বাক্যের বর্ণনীয়; যেহেতু বাহ্য ব্যাপার আমরা বাক্যে চিত্রিত করিতে পারি। আর যাহা আভ্যন্তরীণ কাণ্ডে উদ্ভূত হইয়া, অভ্যান্তরে কার্য্য করত, অভ্যান্তরেই পরিশেষিত

হয়, তাহাই, বাক্যের অতীত, দর্শনের বিষয়; যেহেতু, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমরা বাক্যে পূর্ণ-চিত্র প্রদান করিতে পারিনা। উহা দর্শনে সহানুভূতি দ্বারায় উপলব্ধি করিতে হয়। কোন্ অবস্থায় অন্তর কিরূপ ভাব ধারণ করে, অন্তরই তাহা বুঝিতে পারে; এই নিমিত্ত চরিত্রকে সেই অবস্থায় যথাযথ সংস্থিত করিয়া, প্রত্যক্ষ করাইতে পারিলে, তদবস্থিত অন্তর কিরূপ ভাবাপন্ন, অপর অন্তর সহানুভূতিদ্বারা তাহা উপলব্ধি করিয়া লইতে পারে।

শ্রাব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের সাধারণ ব্যাখ্যা এই হইতে পারে,—যে উপাখ্যানে বাহ্যব্যাপার প্রবল, তাহাই শ্রাব্য-কাব্য; এবং যাহাতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার প্রবল, তাহাই দৃশ্য কাব্য *। শ্রাব্য কাব্যেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপার উত্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা তাহার প্রবল বিষয় নয়; তদ্রূপ দৃশ্য কাব্যেও বাহ্যব্যাপার উত্থিত হয়, কিন্তু তাহাও তাহার প্রবল বিষয় নয়। আমরা শ্রাব্য কাব্য ও দৃশ্যকাব্যের দুইটি উদাহরণ দিব।

মহাকবি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ একখানি মহাকাব্য; ও কবিবর সেক্সপিয়র বিরচিত হ্যামলেত্ একখানি দৃশ্য-কাব্য। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে রাম-বনবাস বিভাগ দৃশ্যকাব্য বা নাটক-লক্ষাণাক্রান্ত; যেহেতু উহাতে অন্তর্ব্যাপারের কার্য্য দর্শানই সার উদ্দেশ্য। মন্থরার কুমন্ত্রণায় সরলা রাজমহিষী কৈকেয়ীর মন কিরূপে বিকৃত হইল; কিরূপে কৈকেয়ীর নিদারুণ প্রার্থনার বজ্রসম আঘাতে রাজা দশরথের অন্তর ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, যে ছিন্ন-ভিন্নতার মৃত্যু ভিন্ন আর শান্তি সুস্থিরতা সম্পাদন হইল না, এই ভাবটুকু নাটক-লক্ষণাক্রান্ত; যেহেতু ইহাতে অন্তর্ব্যাপারের পরিচালন ও ঘাত, প্রতিঘাত কার্য্যই প্রবলাংশ। তৎপরে রামের বন-গমন হইতে সীতা উদ্ধার পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই শ্রাব্য-কাব্যোচিত। রাম যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, সমস্ত উত্তর কোশল তাঁহার যৌবন-সুলভ আশালতার ক্রীড়াস্থল হইবে, সেইদিন আগত, রাম সেই চিন্তা-সুখে নিমগ্ন। নগরে ঘরে ঘরে উৎসব, পথে ঘাটে হুলুস্থূল, পুরমধ্যে মঙ্গলাচরণ, রাজসভায় পাত্র, মিত্র, মুনি, ঋষি বর্গে সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, সুমন্ত্র রথারোহণে রামকে লইয়া আসিয়া, অভিষেক আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে রাজার নিকট লইয়া গেলেন, রাম পিতৃসন্নিধানে অভিষেক আদেশের পরিবর্ত্তে সহসা চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ব্বাসন আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। এই বাহ্য দুর্দ্দৈবের আঘাতে রামের অন্তঃকরণ কিরূপ ভাবাপন্ন হইল, এবং তাহার কার্য্যফল বা কোথায় পরিশেষিত হইল,

* শ্রাব্য কাব্য এবং দৃশ্য কাব্য এই দুইটী কাব্যের প্রকৃতি-পরিশুদ্ধ নাম নয়, এবং ইহার কোন আর নাম না থাকাতে, আমরা উহাই প্রয়োগ করিলাম।

কবি তাহা দেখাইলেন; অর্থাৎ তাহার কার্য্যফল বাহ্যেই আসিয়া পরিশেষিত হইল; রাম জানকী ও লক্ষণের সহিত বনে গমন করিলেন; দুর্দ্দৈবের আঘাতে অন্তঃকরণের বিকার প্রতিঘাত প্রদানের নিমিত্ত অন্তঃকরণেই সংস্থিত রহিল না, কিম্বা তৎক্ষণাৎ দশরথের অন্তরে কোন প্রতিঘাত প্রদান করিল না। রাম শান্ত প্রফুল্ল চিত্তে, দ্বিরুক্তি না করিয়া পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জটাবল্কল পরিধান করিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। বন গমনের পর আবার দুর্দ্দৈবের আঘাত; প্রণয়ীজন প্রণয়িনীর মুখ দেখিয়া সকলি ভুলিতে পারে, রাম সীতার মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলেন; রাবণ তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব সীতা হরণ করিল। এই বিষম দুর্দ্দৈবের আঘাতে আবার রামের মন যে শোকের আঘাত প্রাপ্ত হইল, তাহা কেবল রাবণের অন্তরে প্রতিঘাত করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল না, রাবণের বলদর্পিত অবস্থার প্রতি প্রতিঘাত প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইল; বাহ্য আঘাতে বিকৃত অন্তঃকরণ বাহ্য আঘাত প্রদানেই শান্তি লাভ করিতে উদ্যত হইল। সীতা হরণ হইতে সীতা উদ্ধার পর্য্যন্ত যাবদীয় বিষয়ই এই রূপ বাহ্য-ব্যাপার-প্রবণ।

আবার সেক্সপিয়রের ওথেলো নামক নাটকে ওথেলো ও দেস্‌দিমনা একটি পবিত্র প্রণয়ের দম্পতি। উভয়ে উভয়ের প্রেমে বিগলিত ও একীভূত। ইয়াগোর কুটিল অভিসন্ধির বাক্য ওথেলোর প্রণয়গাঢ় অন্তঃকরণে বিদ্ধ হইল; সে অন্তঃকরণ শীঘ্র ভগ্ন হইবার নয়, কিরূপে ইয়াগোর মর্ম্মভেদী আঘাতের পৌনঃপুন্যে উহা অবশেষে ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; এইটুকুই বিশুদ্ধ নাটক-লক্ষণাক্রান্ত। তৎপরে ওথেলোর ভগ্ন অন্তঃকরণ সংযত হইয়া নির্দ্দোষ সরলা দেস্‌দিমনার প্রতি যে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, তাহা শ্রাব্যকাব্য ও নাটক উভয় লক্ষণাক্রান্ত; ঐ আঘাতের কেবল দেস্‌দিমনার অন্তরের উপর লক্ষ্য নয়, শরীর এবং অন্তর উভয়ের প্রতি। এই উভয়বিধ আঘাতপ্রাপ্তি কালীন দেস্‌দিমনার চরিত্র বিশুদ্ধ-শ্রাব্য-কাব্যোচিত। দেস্‌দিমনার নির্দ্দোষ সরল অন্তঃকরণ ওথেলোর মুখ হইতে অসতীত্ব অপবাদের মর্ম্মান্তিক আঘাত সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ভগ্ন হইতে লাগিল, ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু ওথেলোর অন্তরের প্রতি একটিও প্রতিঘাত প্রদান করিল না, বরং ওথেলোর ক্রোধশান্তির উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল, অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত ওথেলোর ছুরিকায় সমর্পণ করিল, তথাচ ওথেলোর অন্তরে একটি সামান্য বাক্যের আঘাতও করিল না।

দেস্‌দিমনা অপেক্ষা শকুন্তলার চরিত্র অধিকতর নাটক-লক্ষণাক্রান্ত। কণ্বমুনির শিষ্যগণদ্বারা শকুন্তলা রাজপুরীতে আনীতা হইলে, রাজা দুষ্মন্ত দুর্ব্বাসা মুনির শাপ

প্রভাবে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হওয়ায় তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না; এই সময়ে কণ্ব মুনির শিষ্যগণের ও শকুন্তলার সহিত রাজার যে কথোপকথন তাহা নাটক-লক্ষণাক্রান্ত। রাজা শকুন্তলাকে প্রথমতঃ চিনিতেই পারিলেন না, পরে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এই সকল কার্য্যে ও বাক্যে শকুন্তলার মন ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; অবশেষে যখন রাজা শকুন্তলার প্রমুখাৎ প্রণয়-স্মরণোদ্দীপক তপোবনে বেতসলতা মণ্ডপে হরিণ-শিশুকে জলপান করান বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন যে রমণী দিগের এরূপ মধুর প্রবঞ্চনা বাক্য—ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের বশীকরণ মন্ত্র স্বরূপ। গোতমী তখন তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ, শকুন্তলা তপোবনে আজন্ম-পালিতা, এ প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে জানেনা। রাজা কহিলেন, প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতীর স্বভাব-সিদ্ধ বিদ্যা। শকুন্তলা প্রবঞ্চক, এই আঘাত শকুন্তলার অন্তঃকরণে গুরুতর-রূপে লাগিল, এবং উহা প্রতিঘাত প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিল না। শকুন্তলা কহিলেন, অনার্য্য! তুমি আপনি যেমন, অন্যকেও সেইরূপ মনে করিয়া থাক;। ইত্যাদি কথোপকথন সম্পূর্ণ নাটক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা ইহার স্থুল মর্ম্মটি দেখাইবার নিমিত্ত মূল হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু ইহার সমগ্র তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে আপনার দৃশ্যটি পাঠের প্রয়োজন, যেহেতু উহাতে রাজা শকুন্তলা শার্ঙ্গরব গোতমী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মুখ হইতে এমন একটি বাক্যও নিঃসৃত হয় নাই যাহা অন্তর প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাতের ফল নয়।*

* শকু। ণং একদিঅহে বেদসলদামণ্ডবে ণলিণীবত্তভাঅণগদং উদঅং তুহ-হত্থে সণ্ণিহিদং আসী। তক্খণং সো মে পুত্তকিদও দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদও উবট্ঠিদো, তুএ অঅং দাব পঢ়মং পিঅদু ত্তি অণুকম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উদএণ, ণ উণ সো অপরিচিদস্স দে হত্থদো উদঅং উপগদো পাদুং, পচ্ছা তস্সিং জ্জেব উদএ মএ গহিদে কিদো তেণ পণঅো, এত্থন্তরে বিহসিঅ তুএ ভণিদং সব্বো সগন্ধে বীসসদি, জদো দুবেবি তুহ্মে আরণ্ণআ ত্তি।

রাজা। আভিস্তাবদাত্মকার্য্যনির্ব্বর্ত্তিনীভির্ম্মধুরাভিরনৃতবাগ্‌ভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।

গোত। মহাভাঅ! ণারিহসি এব্বং মন্তিদুং, তবোবনসংবড্‌ডিদো কখু অঅং জণো অণভিণ্ণো কইদবস্স।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে!

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু

সংদৃশ্যতে, কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ।

প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাত-

মন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি।

শকু। সরোষম্। অণজ্জ! অত্তণো

দেস্‌দিমনায় নাটক লক্ষণ নাই, কিন্তু দেস্‌দিমনা ওথেলো নাটকের মূল চরিত্র নয়, ওথেলোই উহার মূল চরিত্র, এই নিমিত্ত ওথেলো আখ্যান নাটক; শকুন্তলার শকুন্তলাই মূল চরিত্র, এই নিমিত্ত শকুন্তলা নাটক।

আমরা আগে খণ্ড কাব্যের স্থূল বিষয় কিছু বলিয়া, পরে মহা কাব্যের বিষয় বলিব।

কি খণ্ডকাব্য, কি মহাকাব্য উভয়ই আখ্যান মূলক; আখ্যান কোন নায়ক নায়িকার স্বকীয় ক্ষেত্রের হইলে উহা "খণ্ড" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, এবং উহা সাধারণ ক্ষেত্রের হইলে "মহা" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। খণ্ড কাব্য এবং খণ্ড নাটক সকল ভাষাতেই বহুল; মহাকাব্য অল্প, এবং মহা নাটক দুর্লভ। মহানাটক কোন ভাষায় আছে কি না, আমরা জানি না; কেবল জর্ম্মণ ভাষায় মহাকবি শিলার প্রণীত ওয়াল্‌ষ্টিন নামক নাটক খানি এই লক্ষণের বোধ হয়। সংস্কৃতে মহানাটক নামে এক খানি নাটক আছে, কিন্তু উহা নাটক নামে মাত্র, নাটকের গুণ উহাতে নাই।

আখ্যানকাব্যের আখ্যানই মূল অবলম্বন; আখ্যানের সৌন্দর্য্য বিন্যাসে সুকৌশল থাকিলে তাহার নায়ক নায়িকা হিঅআণুমাণেণ কিল সর্ব্বং পেক্ষসি, কোণাম অন্নো ধর্ম্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিণচ্ছন্নকূবোবমস্‌স তুহ অণুআরী ভবিস্‌সদি? তদুপরি উত্তম সংস্থান হেতুক অধিকতর শোভা ধারণ করে। আখ্যানে সৌন্দর্য্য না থাকিলে তাহার নায়ক নায়িকা, মহা সুন্দর হইলেও, কর্দ্দমের উপর রত্নের ন্যায় শোভাহীন দেখায়। নায়ক নায়িকা যদি সুন্দর হয়, তবে তাহার উপাখ্যানও অবশ্যই সুন্দর হইবে। নায়ক নায়িকায় যদি দয়া, প্রেম, ভক্তি, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি সৌন্দর্য্য সকল প্রবল রূপে থাকিল, তবে তাহাদের কার্য্য-স্রোত সংসারে যে অদ্ভুত বৈচিত্রময় হইবে তাহার ভুল কি? প্রবল স্রোতস্বতীর গতি যেমন পৃথিবীর পর্ব্বত, অরণ্য, উচ্চ, নীচতার মধ্য দিয়া বৈচিত্রময়, তেমনি সংসার ক্ষেত্রেও অদ্ভুত-আত্মার গতি কোথাও বা উচ্চ শেখর হইতে নায়াগ্রার পতন; কোথাও বা সঙ্কীর্ণ স্থানে খরতর বেগ, কোথাও বা প্রশস্ত স্থানে ধীর মন্দ গতি, কোথাও বা পৃথিবীর বক্ষঃ বিদারণ করিয়া সুন্দর ফোয়ারা, ইহাই আমরা দেখিতে চাই। পর্ব্বতের প্রতিবন্ধকের ন্যায়, জীবন-স্রোত সংসারের প্রতিবন্ধকে চিরকালের মত অচল, স্থির রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে চাই না; কিম্বা সমতল ক্ষেত্রে একই স্রোত মন্দ মন্দ বহিতেছে, তাহাও আমরা দেখিতে চাই না; স্রোতের বিবিধ ঘাত প্রতিঘাতের বিবিধ বিচিত্র সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি আমরা দেখিতে চাই।

এই উপাখ্যান রচনা বিষয়ে কবির বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। কার্য্যক্ষেত্রে নায়ক বা নায়িকাকে অবতীর্ণ করিতে

হইলে অপর চরিত্র সকলের সহিত তাহাদের সংস্রবের প্রয়োজন। এক ব্যক্তির জীবনকাণ্ডে অসংখ্য লোকের সংস্রব সম্ভব, কিন্তু মূল চরিত্রের সহিত সেই অসংখ্য চরিত্রের পরিচয় দেওয়া নিস্প্রয়োজন, এবং আখ্যানের সৌন্দর্য্য-নাশক। নদীর স্রোত তৃণক্ষেত্রের কতগুলি তৃণকে স্পর্শ করিয়া চলিতেছে, কত গুল্ম লতাকে অতিক্রম করিতেছে, আমরা তাহা দেখিতে চাই না, কেবল কোন্ কোন্ সঙ্কীর্ণ পথে স্রোত খরতর হইতেছে, কোন্ পর্ব্বতে ঠেকিয়া স্রোত গর্জ্জন করিয়া তাহাকে উল্লঙ্ঘিয়া পতিত হইতেছে, কোন হ্রদয়কে ফাটাইয়া তাহার উপর দিব্য প্রস্রবণ মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই সকল সংস্পর্শই আমরা দেখিতে চাই, এবং সেই সকল চরিত্র সংস্রবেই আখ্যান এবং আখ্যানের মূল চরিত্র অধিকতর সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া থাকে। শ্রাব্য খণ্ডকাব্যে বরং অনুচরিত্রবাহুল্য কিয়ৎ পরিমাণে সহনীয়, কিন্তু দৃশ্যখণ্ডকাব্যে তাহা সাধ্যমতে পরিবর্জ্জন করাই উচিত।

নদী যেমন সাগর উদ্দেশে প্রবাহিত, জীবনও তেমনি কোন তৃপ্তি বা শান্তিসুখ সাগর লক্ষ্য করিয়া বহিতে থাকে। নায়ক বা নায়িকার উদ্দেশ্যের সহিত অনুচরিত্র সকলের উদ্দেশ্য মিলিত হইয়া, উভয়ে এক প্রকৃতি হইলে, মিলিয়া কেমন পরিবর্দ্ধিত হয়, বিভিন্ন প্রকৃতির হইলে কেমন দ্বন্দ্বে মত্ত অথবা একের প্রাবল্যে অপরের নাশ সাধন করে, একের দুর্ব্বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিয়া উভয়েই নষ্ট হয়, এই সকলের গ্রন্থনেই আখ্যানের কলেবর রচিত হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যের গতি শ্রাব্যকাব্যে শ্রাব্যকাব্যোচিত এবং দৃশ্যকাব্যে দৃশ্যকাব্যোচিত হইয়া উঠে, অর্থাৎ শ্রাব্যকাব্যে বাহ্য প্রকৃতির কার্য্যই প্রবল এবং দৃশ্যকাব্যে অন্তঃপ্রকৃতির কার্য্যই প্রবল হইয়া দাঁড়ায়।

মূল চরিত্রের সহিত অনুচরিত্র সকলের নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে পরস্পরে পরস্পরকে আয়ত্ত করণের যে কার্য্য, তাহার মূল প্রকৃতি দুই প্রকার; উদ্দীপনা ও বিভ্রম। যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ চেতন, সংযত, দৃঢ়, উত্তেজিত ও উচ্ছ্বসিত হয় তাহাই উদ্দীপনা; আর যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ-মুগ্ধ, ভগ্ন, শিথিল, দ্রব ও প্রবাহিত হয় তাহাই বিভ্রম। কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অধীনতা ইত্যাদিতে অন্তঃকরণ জড় হইয়া পড়িলে, অথবা অপর কোন বিষয়ে স্থির দৃঢ় হইয়া বসিয়া থাকিলে উদ্দীপনা তাহার বিরূপ মূর্ত্তিতে উত্থিত হইয়া তাহাকে চেতন করায়, আঘাতে আঘাতে তাহার প্রত্যেক বিস্মৃতি-দ্বার খুলিয়া, অতীতকে প্রবল স্রোতে আনিয়া বর্ত্তমানে ফেলে, দূরকে সাজাইয়া আনিয়া নিকটবর্ত্তী করে, এবং বর্ত্তমানকে তাহার আভ্যন্তরীণ বল স্মরণ করাইয়া দেয়, তখন ভূত ও ভবিষ্যৎ, উভয় পার্শ্বের আঘাতে বর্ত্তমানের আভ্যন্তরীণ বল উচ্ছ্রিত হইয়া উঠে,

এবং জড়তা-আবরণ প্রবল তরঙ্গাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু বিভ্রম বিরূপ মূর্ত্তিতে উত্থিত হয় না, অনুরূপ অতি সঙ্গদয়রূপে উপস্থিত হয়, ভূত ভবিষ্যৎকে দূরে তাড়াইয়া দেয়, এবং মোহের দ্বারা অবশিষ্ট দ্বার সকল রোধ করিয়া [illegible] পর্য্যন্ত উপস্থিত করে এবং চেতনা হরণ করিয়া নিদ্রাভিভূতের ন্যায় কোন স্বপ্ন রাজ্যে লইয়া গিয়া, কোন প্রিয়মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখায়, ঐ মূর্ত্তি আমাদিগকে সম্ভাষণ করে, আলিঙ্গন করে, আমরা তাহার সঙ্গম সুখে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ি, এবং যেমন নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন মূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি কাব্য-মূর্ত্তি আমাদের কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইলেও, তাহার দর্শন কেমন রমণীয়, তাহার সঙ্গম কেমন সুখাবহ, আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্র সেই সকল ভাবে অভিষিক্ত, শিথিল, দ্রব হইয়া সাগরবৎ একাকার হইয়া যায় এবং সেই স্বপ্ন মূর্ত্তিকে পাইবার নিমিত্ত আমরা সকল বাধার বিপক্ষে অন্ধ ও উদ্ধত হইয়া উঠি। আমরা উদাহরণ দ্বারা দেখাইতেছি—

বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক দেবগণ পরাভূত হইয়াছেন, অনন্ত সুখ-ধাম স্বর্গরাজ্যচ্যুত হইয়া তাঁহারা ঘোর তমাচ্ছন্ন ভীষণ নরক সদৃশ পাতালপুরে লুক্কায়িত। দুঃখের অবস্থায় মন বশতাপন্ন ও জড়ভাব ধারণ করিতেছে, এমন সময় মহাশূর দেব সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া উদ্দীপন বাক্যে এইরূপ তাঁহাদের উত্তেজিত করিতেছেন—

"জাগ্রত কি দৈত্য শত্রু সুর বৃন্দ আজ?
জাগ্রত কি অস্বপন দৈত্যহারী দেব?
দেবের সমর-ক্লান্তি ঘুচিল কি এবে?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এক্ষণ?

"হা ধিক্! হা ধিক্ দেব! অদিতি প্রসূত!
সুর-ভোগ্য স্বর্গ এবে দিতিসুত বাস!
নির্ব্বাসিত সুরবৃন্দ, রসাতল ধূমে,
সমাবৃত অন্ধকারে, আচ্ছন্ন, অলস!

"দুর্ব্বিনীত, দেব দ্বেষী দনুজ-পরশে
পবিত্র অমরাপুরী কলঙ্কিত আজ,
জ্যোতির্হত, স্বর্গচ্যুত স্বর্গ-অধিবাসী,
দেব বৃন্দ ভ্রান্ত চিত্ত পাতাল প্রদেশে!

"ভ্রান্ত কি হইলা সবে? কি ঘোর প্রমাদ
চিরসিদ্ধ দেব নাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুর-মর্দ্দন' আখ্যা—কি হেতু সে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে?

"চির যোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ
অমর হইলা সবে নির্জ্জর-শরীর,
আজি সে দৈত্যের ত্রাসে শঙ্কিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে সর্ব্বপরিহরি।

"কি প্রতাপ দনুজের কি বিক্রম হেন?
ত্রাসিত করেছে যাহে সে বীর্য্য বিনাশি
যে বীর্য্য প্রভাবে দেব সর্ব্বরণ জয়ী
শতবার দৈত্য দলে সংগ্রামে আঘাতি!

"ধিক্ দেব! ঘৃণা শূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতম পুরে;

দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য সর্ব্ব তেয়াগিয়ে
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি!
"ধিক্ সে অমর নামে, দৈত্য ভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদ রজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।
"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্য ভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া?"

উদ্দীপনা এখানে বিরূপ মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া, প্রতি বাক্যে শেলবিদ্ধ করিয়া যেন দেবতাদিগকে চেতন করাইতেছে—

"হা ধিক্! হা ধিক্ দেব! অদিতিপ্রসূত!
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে, দিতিসুতবাস!
নির্ব্বাসিত সুর বৃন্দ রসাতল ধূমে,
অনারত অন্ধকারে, আচ্ছন্ন, অলস!
"ধিক্ দেব! ঘৃণা শূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এতদিন আছ এই অন্ধতমপুরে;
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য সর্ব্ব তেয়াগিয়ে
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি।

আবার ভূতকে আনিয়া নিকটবর্ত্তী করিতেছে, যথা—

"ভ্রান্ত হইলা সবে? কি ঘোর প্রমাদ!
চিরসিদ্ধ দেব নাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুর মর্দ্দন' আখ্যা—কি হেতু সে তবে
চিরযোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্যসহ,
অমর হইলা সবে, নিজ্জ্বর শরীর,

আবার ভবিষ্যতের গ্লানি দেখাইতেছে, যথা—

অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদ রজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।
দৈত্য ভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশ,
দৈত্য-পদ-রজঃ চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া?

আবার বর্ত্তমানকে তাহার আভ্যন্তরীণ বল স্মরণ করাইয়া দিতেছে, যথা—

কি প্রতাপ দনুজের, কি বিক্রম হেন?
ত্রাসিত করেছে যাহে সে বীর্য্য বিনাশি,
যে বীর্য্য প্রভাবে দেব সর্ব্ব রণজয়ী
শত বার দৈত্য দলে সংগ্রামে আঘাতি!

দেবতারা উদ্দীপনার প্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ মূর্ত্তিমান দেখিতে লাগিলেন এবং বর্ত্তমানে আপনার আভ্যন্তরিণ বল স্মরণ করিয়া সকলে চেতন, সংযত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

বিভ্রমের প্রকৃতি ইহার বিপরীত; বিভ্রম যদি কোন পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত করিতে চায়, তবে উহা বিরূপ ভাবে উপস্থিত হইয়া ধিক্কার বা আঘাতবাক্যে তাহার অবসন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে চেতন করাইতে চায় না, বরং তাহার অবসন্নতার উপর এমন একটি সুললিত মধুর হৃদয় আর্দ্রকারী করুণা বা বিষাদের সুর শুনাইতে থাকে, যে উহার প্রভাবে মন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও আত্মত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া অচেতন অবস্থায় সুরের পশ্চাৎ যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে নীত হয়, সেখানে সে দেখে, তাহার জাতিত্ব-গৌরব-লক্ষ্মী, পরিত্যক্তা, বিবর্ণ, মলিন বেশে, বিষাদে নিমগ্ন হইয়া আত্ম অবস্থা ঘোষণ করিতেছে।

সন্তান বহুকালের পর তাহার জননীকে দাসত্ব দুর্দ্দশায় নির্ব্বাসিত কোন ঘোর স্থানে পরিত্যক্ত দেখিতে পাইলে যেমন অধীর উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহার চির নির্ব্বাপিত অন্তর অনল একেবারে অগ্নিগিরির উচ্ছ্বাস ধারণ করে; যদি কেহ তখন তাহাকে বলে কল্পনা মূর্ত্তি দেখিতেছ, তাহাতে ক্ষতি নাই, সে সেই মূর্ত্তি আর শীঘ্র ভুলিতে পারে না, তাহার দর্শন, সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন অন্তকরণকে উদ্ধৃত উন্মাদ ও করিয়া ফেলে।

উত্তেজনা ও বিভ্রম উভয়েরি উদ্দেশ্য এক, কেবল প্রকৃতি স্বতন্ত্র। উভয়ই কাব্যের অঙ্গ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উদ্দীপনাকে কাব্য হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা তাহার বিশেষ কারণ কোন দেখিতে পান নাই। উভয়ই কাব্যের উদ্দেশ্য সাধনে দুইটি অঙ্গ মাত্র।

খণ্ড কাব্যে অনুচরিত্র সকলের সহিত মূল চরিত্রের এই রূপ প্রকৃতির কার্য্য সকল চলিয়া উপাখ্যান অন্ত সীমায় উত্তীর্ণ হয়। এই অন্তে গিয়া আপূর্ব্ব আখ্যানের রস বিচার হইয়া থাকে। যদি উপাখ্যান অন্তকালীন অন্তকরণকে প্রফুল্ল, প্রসারিত, ও উন্নত করিয়া কোন উজ্জ্বল ব্যাপ্ত ক্ষেত্র দেখাইয়া পরিসমাপ্ত হয়, তবে তাহাকে সুখান্ত আখ্যান (Comedy) সংজ্ঞা দেওয়া যায়। আর যদি উহা অন্তরকে গভীর, ভার, অবনত, স্তম্ভিত, বিহ্বল করে এবং অনন্ত ঘোর অন্ধকারের ক্ষেত্র দেখাইয়া পরিসমাপ্ত হয়, তবে তাহাকে দুঃখান্ত (Tragedy) সংজ্ঞা দেওয়া যায়। * আমরা অপর প্রস্তাবে আখ্যানের এই দুই বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* সুখান্ত ও দুখান্ত এই দুইটি নামও প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইল না।

# সোহাগ।

Fair the face of orient day,
Fair the tints of opennig rose:
But fairer still my Delia dawns.
More lovely far her beauty shows.
Burns·

(১)

মনোহর প্রভাতের বিকচ বদন।
যবে ফুলময়ী উষা পূরব অম্বরে;
বরষি কাঞ্চন বারি দেয় দরশন,
লাবণ্য তরঙ্গে ভাসি কোমল মন্থরে।

(২)

মনোহর গোলাপের তরল মাধুরী!
খোলে যবে বন-বালা দল সুকোমল,
উছলি কোমল কোলে অমৃত লহরী,
মোহিয়া অখিল বন, রূপে অবিরল।

(৩)

মনোহর বসন্তের অনিল চুম্বনে!
মুঞ্জরিত ফুলজালে কানন বল্লরী!
মনোহর শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যার মিলনে,
কুমুদিনী মালা গলে কুমুদ সুন্দরী।

(৪)

কিন্তু মনোহরতর! জগত ভিতরে
জীবন-ঈশ্বরী-প্রিয়া প্রতিমা অমল!
এ হতেও মনোহর, সুষমা বিতরে,
চম্পক রঞ্জিত চারু বদন কমল।

(৫)

বকুলের কুঞ্জে বসি অমৃত উছলি
মনোহর কোকিলের বসন্ত কীর্ত্তন।
বিদায়ি সঙ্গীতে যবে ছড়ায় কাকলী;
হেরি মধুমতী সন্ধ্যা লাবণ্য কানন।

(৬)

চির সৌরভিনী নব কোকনদ দামে,
মনোহর ভ্রমরের গুঞ্জন তরল!
সরস বসন্তে যবে পুলকিত প্রাণে,
চুম্বি ভ্রমরীর মুখ, গুঞ্জে অবিরল।

(৭)

সজল বরিষা কালে, বিপিনে নির্জ্জনে,
নব কাদম্বিনী দাম করি দরশন,
মনোহর ময়ূরীর সুকণ্ঠ মিলনে,
"ষড়জ সংবাদিনী কেকা" মধুর নিক্কন।

(৮)

কিন্তু মনোহরতর শ্রবণে আমার;
পূর্ণিমা নিশিতে বসি সুশৌধ শিখরে,
সোহাগে প্রেয়সী যবে বর্ষে অনিবার—
সঙ্গীত, কাঁপায়ে মরি সুবিম্ব অধরে

(৯)

মনোহর জলধরে চল সৌদামিনী!
রূপের ঝলকে যবে উজলে ভুবন;
মনোহর নীল জলে স্থির সরোজিনী!
দিনেশ-কিরণ হেম, করিলে চুম্বন।

(১০)

কিন্তু মনোহরতর, সন্ধ্যা দরশনে
সুরভি সলিলে মাজি তনু সুকুমার!
যায় যবে বিনোদিনী পতি সম্ভাষণে,
ললিত শ্রীঅঙ্গে পরি রত্ন অলঙ্কার।

(১১)

নিরখি এমন চারু রূপের প্রতীমা,
সরল সৌন্দর্য্যে মাখা কোমল মাধুরী,
কাঁদিবে মৈশরী ক্ষোভে মিশর-চন্দ্রিমা।
পলাইবে "বঙ্কিমের" "আয়েষা" সুন্দরী।

(১২)

প্রেয়সি!
প্রফুল্ল মল্লিকা তুমি রূপের কাননে।
সুবর্ণের পঙ্কজিনী যৌবন মাঝারে।
বিনোদ পূর্ণিমা তুমি শারদ গগনে।
অমৃতের তরঙ্গিণী সুদূর প্রান্তরে।

(১৩)

দেখ প্রিয়ে আজি নব বসন্ত উদয়
গুঞ্জরিত তরুলতা কোকিল কুহরে।
চুরি করি ফুল মধু মধুপ-নিচয়,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলে ফুলে উল্লাসে বিহরে

(১৪)

বল নয়নের মণি, অঙ্গের ভূষণ,
জিনি ফুল্ল কিশলয়, পেষল অধরে,
চুরি করি প্রণয়ের তরল চুম্বন।
ঋতুনাথ বসন্তের সম্মানের তরে।

শ্রীহঃ——

# জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

## পরিশিষ্ট।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

আমেরিকার স্বাপক্ষ্যে লেখনী চালনা করার অব্যবহিত দুই বৎসর কাল মিল্ যে যে বিষয়ে নিমগ্ন ছিলেন, তাহা রাজনৈতিক নহে। এই সময় অষ্টিনের মৃত্যু হয়; এবং তদীয় মৃত্যুর পর তৎপ্রদত্ত ব্যবহার-বিজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশাবলী(১) প্রকাশিত হয়। অষ্টিনের স্মৃতি মিলের হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। সেই স্মৃতির সম্মাননার জন্য, মিল্ অষ্টিনের উপদেশাবলীর সমালোচনা করিলেন। যৎকালে মিল্ বেস্থামপ্রণালীতে নবদীক্ষিত হন, তৎকালে তিনি ব্যবহার-বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করেন। সেই আলোচনার সময় এই বিষয়ে তাঁহার মনে অনেক নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়। এই সমালোচনা উপলক্ষে তিনি সেই সকল নূতন ভাব সাধারণ সমক্ষে প্রদান করেন।

কিন্তু এই দুই বৎসরের তাঁহার প্রধান রচনা—সার উইলিয়ম্ হ্যামিণ্টন প্রণীত দর্শনের পূর্ণ সমালোচনা (২)। ১৮৬০ এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হ্যামিণ্টনের দর্শন প্রচারিত হয়। মিল্ শেষোক্ত বৎসরের শেষ ভাগে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার প্রথমে ইচ্ছা ছিল, উক্ত গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মাত্র করিবেন। কিন্তু পরে দেখিলেন স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ইহার একটী সুদীর্ঘ সমালোচনা না করিলে আর এই পুস্তকের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করা হইবেনা। তাঁহার প্রথমে সংশয় উপস্থিত হইল এ কার্য্যে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা। কিন্তু অনেক বিবেচনার পর তাঁহার এই সংশয় অপনীত হইল। তিনি স্বয়ংই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

হ্যামিণ্টনের দর্শন পাঠে মিল্ নিতান্ত হতাশ হন। হ্যামিণ্টনের সহিত তাঁহার কোন মনোমালিন্য ছিল না; সুতরাং তিনি যে বিদ্বেষ বিশিষ্ট-হইয়া তদীয় গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বরং মানব জ্ঞানের "রিলেটিভিটি" অর্থাৎ সাপেক্ষতা মতের জন্য বরং হ্যামিণ্টনের সহিত তাঁহার সহানুভূতিই ছিল। কিন্তু হ্যামিণ্টনের দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশাবলী ও তৎপ্রণীত রীডের সমালোচনা পাঠ করায় মিলের সেই সহানুভূতি অনেক পরিমাণে

(1) Mr. Austin's Lectures on Jurisprudence.

(2) Examination of Sir William Hamilton's Philosophy.

শিথিলিত হইল। মিলের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে দর্শনশাস্ত্রবিষয়ে হ্যামিল্টনের মতের সহিত তাঁহার মতের সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন যে সে বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত।

এই সময় ইউরোপ দুই দার্শনিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায় সহজ জ্ঞানের (১) পক্ষপাতী; অপর সম্প্রদায় ভূয়োদর্শন (২) সংযোগজ জ্ঞানের (৩) পক্ষপাতী। প্রথম সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদিগের হৃদয়ের প্রিয় মত গুলিকে যুক্তি-নিরপেক্ষ স্বভাবজ সত্য Intutive truth বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন; তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-জ্ঞান যাহা ভাল বলিত, তাহাই তাঁহারা প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া মনে করিতেন; তাঁহারা যুক্তির আদেশ অপেক্ষা কর্ত্তব্যজ্ঞানের আদেশ অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপদেশের ভ্রান্ততা প্রদর্শন করিতে গেলে তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। মানবজাতির ব্যক্তিগত, জাতিগত ও লিঙ্গগত প্রভেদ যে অবস্থার প্রভেদে জন্মিয়া থাকে এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য প্রকৃতিসিদ্ধ, অবস্থার ফল নহে৷ প্রকৃতিসিদ্ধ সুতরাং পরিবর্ত্তাসহ। সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারক যে কোন সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবেন, যে কোন নূতন বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন, তাহাতেই এই সম্প্রদায়ের লোকের বাধা ও আপত্তি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের মতে সমাজ, নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে যে সকল সংস্কার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। সুতরাং সে গুলির আবশ্যকতা বিষয়ে কোন প্রমাণ চাহিলে তাঁহারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন। দুই একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমত ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্ত দয়ার আধার—এই সংস্কার অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কেহ এই চিররূঢ় সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্ত দয়ার আধার হইবেন, তবে জগতে এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত শোক তাপ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? যাঁহার হৃদয় অনন্ত দয়ার ভাণ্ডার, তিনি কখন শক্তি থাকিতে পরের কষ্ট ও পরের দুঃখ দেখিতে পারেন না। সুতরাং তিনি যখন পরের দুঃখ অবলীলাক্রমে দেখিতেছেন, তখন হয় তাঁহার শক্তি নাই, নয় দয়া নাই। এরূপ প্রতিবাদের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিপক্ষের উপর অকারণে বদ্ধপরিকর হইবেন। দ্বিতীয়তঃ—

(1) Intuition.

(2) Experience.

(3) Association.

আমরা যখন কোন বস্তুই অকর্ত্তৃক দেখিতে পাই না, তখন এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান জগৎ যে অকর্ত্তৃক তাহা বোধ হয় না। বহুদিন হইতে এই রূপে এই জগতের স্রষ্টার কল্পনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যখন এইরূপে কল্পিত জগৎ-স্রষ্টার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থিত হয়,—যে আমরা যখন সকল কারণেরই কারণ দেখিতে পাই, তখন জগৎ-কারণেরও যে কারণ নাই এ কথা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু জগৎ-কারণেরও কারণ কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থাপাত উপস্থিত হয়—অর্থাৎ কারণ-পরম্পরার আনন্ত্য আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং অনন্ত কারণ-পরম্পরার কল্পনা-রূপ গুরুত্বের আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা এই জগৎকেই স্বয়ং-স্পৃষ্ট বলিলে কল্পনার অনেক লাঘব হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এরূপ প্রতিবাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে সমর্থ হইবেন না; অথচ প্রতিপক্ষের প্রতি পাষণ্ড নাস্তিক প্রভৃতি গালিবর্ষণ করিবেন। ধর্ম্মনীতি বিষয়ে যেরূপ, এইরূপ রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়েও যুক্তির উপাসকদিগের এই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে অনেক অকারণ আপত্তি সহ্য করিতে হয়। এই সকল অযৌক্তিক আপত্তি খণ্ডন করিতে সংস্কারকদিগের অনেক সময় বৃথা অতি-বাহিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বভাবজ জ্ঞান মানেন না। তাঁহাদিগের মতে সমস্ত মানব জ্ঞানেরই মূল ভূয়োদর্শন ও সংযোজন। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কোন স্বভাবজ জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না। সেই সদ্য-প্রসূত শিশুতে জিজ্ঞাসাবৃত্তি ও জ্ঞানধারণা শক্তি থাকে মাত্র। জগতের সমস্ত বস্তুই তাহার জানিতে ইচ্ছা হয়, সমস্ত বস্তুই সে জানিতে চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টায় ভূয়োদর্শনে ক্রমে সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান তাহার উপলব্ধি হয়। এই সকল ভূয়ো-দর্শনজাত জ্ঞানরাশি সংযোজনী শক্তি দ্বারা এরূপ পরস্পর-সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, যে একটীর স্মরণে অপরগুলির স্মরণ অনি-বার্য্যবেগে আসিয়া পড়ে। যাঁহারা স্বভাবজ জ্ঞান মানেন না, তাঁহারা জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয়তা ও অভ্রান্ততাও স্বীকার করেন না। ভূয়োদর্শন যাঁহাদিগের জ্ঞানের আকর, তাঁহাদিগের জ্ঞান সতত পরিবর্ত্তনশীল, এবং নিত্য-সংস্কার সহ। যত দিন যায়, ততই ভূয়োদর্শনের পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ভূয়োদর্শন অপেক্ষা তাহার অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালের ভূয়োদর্শন প্রায়ই অধিক-তর পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যক্তিসম্বন্ধে যেরূপ, জাতি ও মানব সাধারণ সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রূপ। মানব জাতির শৈশবাবস্থায় যে ভূয়োদর্শন ছিল, সাধারণতঃ এখনকার ভূয়োদর্শন তাহা অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট ও উৎ-কর্ষ-প্রাপ্ত। সেই ভূয়দর্শনের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টির সহিত মানবজ্ঞান ও মানব

মতেরও উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন করা উচিত। 'যাহা ভাল বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল; সুতরাং তাহাই অনুসরণীয়'—এ সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মতের নিতান্ত বিরোধী। ইহাঁদের মতে কল্য যাহা ভাল বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, অদ্যকার ভূয়োদর্শনে হয়ত তাহা মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। সেইরূপ কল্য যাহা মন্দ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, অদ্যকার ভূয়োদর্শনে তাহা ভাল বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে কল্যকার ভূয়োদর্শনের বশীভূত হইয়া আমরা অদ্যকার অধিকতর উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট ভূয়োদর্শনের অবমাননা করিতে পারি না। অদ্যকার ভূয়োদর্শনের সম্মাননা করিতে গেলেই—কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি সকল বিষয়েই নিত্য সংস্কার ও নিত্য পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। সেই জন্যই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এত সংস্কারপ্রিয়। মিল্, তদীয় পিতা এবং অধ্যাপক বেন্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন ও জার্ম্মান্ দার্শনিকেরা প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টনের সাপেক্ষ জ্ঞান প্রচারিত হইলে, মিল্ ভাবিয়াছিলেন যে হ্যামিল্টন এই দুই সম্প্রদায়ের সংযোজক শৃঙ্খল স্বরূপ হইবেন। কিন্তু তৎপ্রদত্ত দার্শনিক বক্তৃতা সকল ও তৎকৃত রীডের সমালোচনা পাঠ করিয়া মিলের সে আশা দূরীকৃত হইল।

দার্শনিক জগতে সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টনের যেরূপ প্রতিপত্তি, তাঁহার রচনার যেরূপ মোহিনী শক্তি, তাহাতে মিল্ দেখিলেন যে তৎপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র অনাক্রান্ত থাকিলে, জগতের উন্নতি স্রোত অনেকদিনের জন্য রুদ্ধপ্রসর হইবে। তদীয় দর্শন "স্বভাবজ্ঞান" মতের দুর্গস্বরূপ। মিল্ দেখিলেন যে সেই দুর্গ সমূলোৎপাটিত করিতে না পারিলে আর স্বভাবজ্ঞান মত তিরোহিত হইবে না। তিনি দেখিলেন যে এই দুই শ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রের শুষ্ক মর্ম্ম সাধারণসমক্ষে ধারণ করিলে পর্য্যাপ্ত হইবে না; এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত করিতে হইবে। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন যে প্রথম সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হ্যামিল্টনের দর্শনের ভ্রমসকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে; হ্যামিল্টন এক্ষণে দার্শনিক জগতে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বি যশপ্রাপ্ত হইতেছেন, তিনি যে সে অতুল যশের উপযুক্ত নন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই জন্যই তিনি হ্যামিল্টনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন।

মিলের সমালোচনা প্রকাশিত হইল। অমনি চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। তিনি হ্যামিল্টন্ হইতেই নানা স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগের পরস্পরবিরোধিতা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যথাযথ

বর্ণন করিতেও বিন্দুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত হন নাই, এবং হ্যামিল্টনের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেও ত্রুটী করেন নাই। মিল্ জানিতেন যে অজ্ঞানবশতঃ তিনি যদি কোন কোন স্থলে হ্যামিল্টনের প্রতি অন্যায় আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহার অসংখ্য শিষ্য ও প্রতিবাদকেরা অবশ্যই সেই সেই স্থলে তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। মিলের সমালোচনা প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই হ্যামিল্টনের অসংখ্য শিষ্য ও স্তুতিবাদকেরা মিলের সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া অসংখ্য প্রস্তাব লিখিলেন। তাঁহারা মিলের যে সকল ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া দিলেন, তাহা সংখ্যায় অতি অল্প এবং মূল্যে অতি সামান্য। কিন্তু সংখ্যায় অতি অল্প ও মূল্যে অতি সামান্য হইলেও, মিল্ দ্বিতীয় সংস্করণকালে সেই সকল ভ্রম প্রমাদের সংশোধন করিয়া দিলেন। যাহা হউক্ সব দিক্ দেখিলে এই সমালোচনায় অনেক কায হইয়াছিল বলিতে হইবে। এই সমালোচনায় হ্যামিল্টনের দর্শনের দুর্ব্বলাংশসকল সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হয়; দার্শনিক জগতে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বি যশ উপযুক্ত সীমায় নিবদ্ধ হয়; এবং সাধারণ বিতর্কে পদার্থ ও মন সম্বন্ধে দার্শনিক মত সকলের অনিশ্চিততার মীমাংসা হইয়া যায়।

হ্যামিল্টনের সমালোচনা পরিসমাপ্ত করিয়া মিল্ অগষ্ট কম্‌টের মতাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। নানা কারণে এই গুরুতর ভার তাঁহারই উপর সন্ন্যস্ত ছিল। যৎকালে মিল্ তাঁহার ন্যায়দর্শনে অগষ্ট কম্‌টের বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, তখন কম্‌টের নাম ফ্রান্সেরও সর্ব্বত্র শ্রুত হয় নাই। মিল্ তদীয় ন্যায়দর্শনে কম্‌টের বিষয় উল্লেখ করার পর হইতে, ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই কম্‌টের পাঠক ও স্তুতিবাদক হইয়া উঠিলেন। যৎকালে মিল্ তাঁহার বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, তখন তিনি ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেরও নিকট এতদূর অপরিচিত ছিলেন, যে তদীয় নামের উল্লেখেই তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মিল্ যখন তাঁহার পুস্তকের ও তদুদ্ভাবিত মতাবলীর সমালোচনা করেন, তখন এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ সময়ে তাঁহার নাম ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র, এবং তদুদ্ভাবিত মতাবলী ইউরোপের প্রায় অনেক স্থলেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কি শত্রু কি, মিত্র সকলেই এক বাক্যে তদীয় গভীর চিন্তাশীলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি যে চিন্তা-বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিনায়ক, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। যে সকল মন গভীর শিক্ষা ও বলবতী প্রবণতা দ্বারা পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া ছিল, সেই সকল মনই তদীয় গভীর চিন্তা সকলের ধারণায় সক্ষম হইল। কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট মত গুলির সহিত তদীয় কতকগুলি দূষিত মতও সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইতে লাগিল।

অধিক কি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কমটের সেই উৎকৃষ্ট মত গুলির সহিত তাঁহার দূষিত মত গুলিরও পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এইজন্য ইহা প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল যে কোন উপযুক্ত লোক কমটের দূষিত মত গুলি তদীয় উৎকৃষ্ট মত গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণ সমক্ষে ধারণ করেন। এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণে ইচ্ছুক ও সমর্থ, মিল্ ব্যতীত তৎকালে ইংলণ্ডে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। এই জন্যই মিল্ এই গুরু ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি "অগষ্ট কম্‌ট ও তদীয় প্রত্যক্ষবাদ"(১)এই নাম দিয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউয়ের উপর্য্যুপরি দুই খণ্ডে দুইটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখেন। এই প্রস্তাবদ্বয় পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

মিলের যে সকল রচনার বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে সেই গুলিই তদীয় লেখনীর প্রধান ফল। এতদ্ব্যতীতও তিনি অনেক সাময়িক পত্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলি পরিরক্ষণের অনুপযুক্ত বলিয়া তিনি সে গুলির আর পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কন করেন নাই।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিল্ নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে তদীয় অর্থনীতি, স্বাধীনতা ও প্রতিনিধিশাসন প্রণালী গ্রন্থত্রয়ের সুলভ মুদ্রাঙ্কন করেন। ইহাতে অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল। তিনি যৎসামান্য লাভ রাখিয়া শুদ্ধ ব্যয়মূল্যে তাঁহার পুস্তকগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন। মূল্যের নিম্নীকরণে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের সংখ্যা অতিশয় বাড়িয়া গেল। কিন্তু মূল্যের নিম্নীকরণে আয় সম্বন্ধে তাঁহার যে ক্ষতি হইল, এরূপ অধিক বিক্রয়েও তাহার পূরণ হইল না। তথাচ যে যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ হইল, তাহাতেই তিনি আশাতীত সন্তোষ লাভ করিলেন।

ক্রমশঃ।

(1) "Auguste Comte and Positivism".

# উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম গদ্য কাব্য—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীদেবকীনন্দন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত।

পণ্ডিতবর গিজো বলেন "তুমি আমাকে দেশের প্রকৃতি বল, আমি তোমাকে তদ্দেশবাসীদিগের প্রকৃতি বলিব।" বস্তুতঃ প্রত্যেক জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আরব মরুময়, তথায় জীবিকা নির্ব্বাহ করা পরিশ্রম-সাধ্য, সুতরাং অধিবাসিগণ শ্রম করিতে করিতে বল-বীর্য্যশালী ও তন্নিবন্ধন যুদ্ধবিগ্রহ-প্রিয় হইয়াছে। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশে আহার প্রায় অনায়াসলভ্য। এই কারণে অধিবাসিগণ কঠোর শ্রমে অপারগ ও বিলাসী। আরবীয়গণ বীর ও উচ্চাভিলাষী, বঙ্গবাসিগণ কোমল ও ভোগী। ইহার ফল এক জাতির মধ্যে মহম্মদ, ওমার, আবুবেকার, ডেরার, আবসোফায়ান প্রভৃতি বীর পুরুষের আবির্ভাব; অপর জাতির মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, ভারতচন্দ্র, জীব গোস্বামী প্রভৃতি কবির জন্ম। যেমন আরবীয় পূর্ব্বোক্ত বীরপুরুষগণ নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহেই কাল কর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেইরূপ বঙ্গীয় কবিগণ সুললিত গীত রচনা করিয়া আপনাদিগের ও জাতি সাধারণের কোমলতা বর্দ্ধন করিয়াছেন। বঙ্গবাসিগণ প্রেমের দাস। বাঙ্গালীর গৃহ দেখ, প্রেম-পরিপূর্ণ; মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র একত্র অবস্থান করিতেছে। এরূপ দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা আর কোন জাতীয় স্ত্রীলোক কোন কালে দেখাইতে পারে নাই। স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিলে, সংসারের সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, জীবিতেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া, জ্বলন্ত বহ্নিতে শয়ন করিয়া, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া, বঙ্গীয় কামিনীর ন্যায় আর কোন্ জাতীয়রমণী দাম্পত্য প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে?

বঙ্গের অধিকাংশ লোকই প্রেমিক, সুতরাং ভাবুকও কবি। বাঙ্গালী রসিক। রসবোধ না থাকা বাঙ্গালীর গালি বিশেষ, সুতরাং বাঙ্গালী কবি। বাঙ্গালী ভাবুক, রসিক ও কবি।

অধুনা বঙ্গবাসিগণ যত বিষয়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, তন্মধ্যে কবিত্ব সর্ব্বপ্রধান-স্থলাভিষিক্ত। বঙ্কিম বাবু, হেম-বাবু, নবীন বাবু প্রভৃতির নাম সকলেই শ্রুত আছেন, উদ্ভ্রান্ত প্রেম লেখক একজন সেই দলভুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর বাবু একজন প্রকৃত ভাবুক ও চিন্তাশীল। তাঁহার গ্রন্থে প্রণয়িণী-বিয়োগ-বিধুর-সহৃদয় চিন্তাশাল ব্যক্তির হৃদয় চিত্রিত হইয়াছে। আমরা জানি চন্দ্র বাবু আপনার হৃদয় চিত্রিত করিয়াছেন। যদি অন্য বিষয়ে তিনি এরূপ চিত্র আঁকিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কবির মধ্যে গণনা করিতে সঙ্কুচিত হইব না।

প্রণয়িনি-বিয়োগ কাতর কবি কখন বা প্রণয়িনীর মুখচন্দ্র স্মরণ করিয়া নেত্রজল বিসর্জ্জন করিয়া পাঠকগণকে বিগলিত-চিত্ত করিতেছেন। কখন বা হৃদয়ের বেগে

উন্মত্তের ন্যায় জাহ্নবীতীর অথবা শ্মশান ভূমিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া প্রিয়তমার জন্য আক্ষেপ ছলে নানাবিধ কল্পনা ও কবিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। কখন বা বসন্ত কালীন প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে সকল সৌন্দর্য্যের সার প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভিজাইতেছেন। কখন বা শয়নমন্দিরে গমন করিয়া প্রিয়তমাকে না দেখিয়া বিষাদে অশেষ আপেক্ষ করিতেছেন।

প্রাণের ব্যবসায় নামক প্রস্তাবটী বড় ভাবোত্তেজক। নিম্নে তাহার একটী স্থল উদ্ধৃত হইল।

"একদিন—তখন শরতের চাঁদ আকাশে হাসিতেছিল—একদিন শেষ রাত্রে অকস্মাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল। একটি নিদ্রিতা বালিকার মুখ বড় সুন্দর লাগিল। শেষ নিশায়, মৃদু পবনে, জ্যোৎস্নাস্রোতঃ আসিয়া সেই মুখের উপর পড়িয়াছিল—বড় সুন্দর লাগিল।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেই মুখ দেখিলাম—বড় সুন্দর লাগিল। আকাশের চাঁদকে দেখিলাম—বড় সুন্দর লাগিল। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সংসার বড় সুন্দর লাগিল। বুকের ভিতর চাহিয়া দেখি,—সর্ব্বনাশ! আমার প্রাণ চুরি গিয়াছে। অনুসন্ধান করিলাম। চন্দ্রদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাল—চন্দ্রদেব হাসিয়া উঠিল। বৃক্ষ লতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহারা মাথা নাড়িল। কুসুম সুন্দরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহারা হাসিয়া এ উহার গায়ে গলিয়া পড়িল। সমীরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সমীরণ 'হায় হায়' করিল। পরদিন সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাল—বালিকা, মুখে কাপড়দিয়া হাসিয়া ঘরে হইতে পলাইয়া গেল। বুঝিলাম, সেই চোর,—নতুবা পলাইবে কেন?

সুন্দরী বলিলেন 'চোরকেই যদি চিনিলে, তবে জিনিষ ফিরাইয়া চাহিলে কেন?"

নব বসন্ত সমাগমে একটী উৎকৃষ্টভাব আছে, কবি বলিতেছেন "আমরা উভয়ে বৃক্ষের পত্র হইলাম না কেন? তাহা হইলে 'উভয়ের ভাবে উভয়ে বিভোর হইয়া, পাতায় পাতা লাগাইয়া শাখায় শাখা জড়াইয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।"

একত্বের মহত্ব বর্ণন প্রভৃতি কএকটী স্থলে চন্দ্র বাবু উৎকৃষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

উদ্ভ্রান্ত প্রেমের ভাষা মধুর, সুললিত, কিন্তু শ্রম-প্রসূত। স্বভাবে যে সৌন্দর্য্য থাকে ইহাতে তাহা নাই। লেখকের এই প্রথম উদ্যম, ভরসা করি কালে এই দোষ তিরোহিত হইবে। উদ্ভ্রান্ত প্রেমের স্থানে স্থানে ২।১টা ধর্ম্ম বিরুদ্ধে কথা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধচিত্ত হইলাম। ধর্ম্ম সমুদয় উন্নতির মূল ও চরম উৎকর্ষ, সেই ধর্ম্মবিরোধী কথা শুনিলে কে না দুঃখিত হয়? ভরসা করি চন্দ্র বাবু ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন। আমি

কোন যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া তাঁহাকে একটী মোটা কথা বলি "যদি ধর্ম্মনীতি লোকের মন হইতে তিরোহিত হয় তাহা হইলে সমাজ কত দিন চলিতে পারে ?*" চন্দ্র বাবু ২।১ জন দার্শনিকের জীবন চরিত প্রদর্শন করিয়া বলিবেন, তাঁহাদের দ্বারা সমাজের কোন অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু সকল লোকোরাইত ল্যাপ্লাস অথবা সেলীর ন্যায় পণ্ডিত ও আত্মাভিমানী নহেন, যে ধর্ম্মভয় ব্যতীতও পাপ হইতে বিরত থাকিবে।†

উপসংহার কালে আমরা চন্দ্র বাবুকে উদ্ভ্রান্ত প্রেমের ন্যায় আর ২।১ খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গ ভাষার উন্নতি সাধন করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস।

* সমালোচক এখানে "ধর্ম্মনীতি" শব্দ নীতি (Morality) অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন। লোকের মন হইতে নীতির ভাব তিরোহিত হইলে, সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটে বটে; কিন্তু ধর্ম্মের (Religion) ভাব তিরোহিত হইলে, সমাজশৃঙ্খলার কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্ম পরলোক সম্বন্ধে, নীতি ইহলোকের জন্য। সুতরাং ধর্ম্মের অন্তর্ধানে ইহলোকের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং চন্দ্রশেখর বাবুর প্রতি সমালোচক যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। স।

† কোন কার্য্যের করণে বা অকরণে ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রীত বা কুপিত হইবেন, এইরূপ পারলৌকিক আশা বা ভয় প্রদর্শন না করিয়া যদি লোকদিগের যুক্তি শক্তি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিমার্জ্জন করা যায়, তাহা হইলেই লোকে কর্ত্তব্যে নিরত ও অকর্ত্তব্যে বিরত হইতে পারে। কোন্‌টি ভাল এবং কোন্‌টী মন্দ কার্য্য এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে; কিন্তু যেটী ভাল সেটী অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যেটী মন্দ সেটী অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়—এ বিষয়ে নিরীশ্বর দেশেও কোন মতভেদ নাই। সুতরাং ধর্ম্ম ভয় ব্যতীত লোকে কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিবে না সমালোচকের এরূপ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। স।

## প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

**পতি বশীকরণ মন্ত্র**—শ্রীব্রজসুন্দর রায় প্রণীত। চাটমহর জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত।

সত্যভামার প্রতি পতি বশীকরণ সম্বন্ধে দ্রৌপদীর উপদেশ ছলে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

অদ্যাবধি অস্মদ্দেশীয় অনেক স্ত্রীলোক মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা স্বামীকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। তাহার অলীকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সচ্চরিত্রতা ও বিনয় যে স্ত্রীদিগের পতি বশীকরণের এক মাত্র উপায় ব্রজসুন্দর বাবু তাহা সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থ খানি প্রকৃত কাব্য নহে। গ্রন্থকারের তাহা উদ্দেশ্য ও নহে। এখানি যার পর নাই সরল ভাষায় বিরচিত, সুতরাং নীরক্ষর স্ত্রীলোকদিগের সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

# রসায়ন-বিজ্ঞান প্রভাবে শ্রম-শিল্পের উন্নতি।

পদার্থ সকলের পরস্পর রাসায়নিক ক্রিয়া সমূহের সম্যক্ অনুধাবনেই বর্ত্তমান শতাব্দীতে শ্রম-শিল্পের এত উন্নতি হইয়াছে। এই সকল উন্নতির মধ্যে প্রধান ২ কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিট্-শর্করা। ১৭৪৭ খৃঃঅব্দে মার্গ্রাফ সাহেব বিট্-মূলে শর্করার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সহসা সকলে অনুভব করিতে পারে নাই। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আর্চার্ড এই উপায়ে শর্করা উৎপাদন করিয়া ব্যবসায় করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই উদ্যোগ সফল হইতে আরও বিংশতি বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ রসায়ন-বেত্তা ও ফরাসি দেশীয় তাৎকালিক মন্ত্রী চ্যাপ্টাল ইহার বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু তথাপি ও তখন পর্য্যন্ত শর্করা উৎপাদনের জন্য অল্প সংখ্যক শিল্পাগারই ছিল এবং বৎসরে দেড় কোটী পাউণ্ডের অধিক শর্করা উৎপাদিত হইতনা। অধুনা ইয়ুরোপে অন্যূন আট শত শিল্পাগার বৎসর বৎসর এক শত পঞ্চাশ কোটী পাউণ্ড বিট্ শর্করা উৎপাদন করিতেছে।

গন্ধক-দ্রাবক। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে র্যাজেস্ (Rhazes) হিরাকস্ (green vitriol) চুয়াইয়া গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত করেন। তৎপরে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রণালীই চলিয়া আসিয়াছিল। লিফিভার ও লিম্রি গন্ধক ও সোরা মিশ্রিত করিয়া উহা হইতে গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত করেন। যদি ও এত পূর্ব্বে এই দ্রাবকের গুণ ও উৎপাদন প্রণালী সকলে অবগত ছিল তথাপি কি কি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ইহার উৎপত্তি হইত তাহা কেহ জানিত না। এবং ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে যখন সীসের বাক্স করিয়া প্রস্তুত করণ প্রণালীর আবিষ্কার হইল তখন হইতেই ইহার উন্নতি এবং তখন হইতেই ইহার ব্যবহারের আধিক্য ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই নূতন প্রণালীতে প্রস্তুত করণের ব্যয় লাঘব বশতঃ মূল্যের যথেষ্ট হ্রাস হয়। ডুমাস্ বলেন যে "গন্ধক-দ্রাবক সকল শিল্পের অপরিহার্য্য উপকরণ এবং যে দিন হইতে মূল্যের হ্রাস বশতঃ ইহার ব্যবহারের আধিক্য হইয়াছে সেই দিন হইতে অনেক নূতন নূতন শিল্পের আবির্ভাব হইতেছে।"

ফস্ফরস্। যাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য কত উন্মত্ত কল্পনাই কল্পিত হইল সেই ফস্ফরস্ এক্ষণে

আমাদের প্রাত্যহিক গৃহ সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে ব্রাণ্ট ইহার পুনরাবিষ্ক্রিয়া করেন কিন্তু বহু দিন পর্য্যন্ত রাসায়নিকেরা ইহা প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় নিরূপণ করিতে পারেন নাই এবং এই দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন ইহা স্বর্ণাপেক্ষাও বহুমূল্য ছিল এবং কেবল পরীক্ষণাগার (Laboratory) সকলে অদ্ভুত বস্তু বলিয়া রক্ষিত হইত। এক্ষণে ইহা এত স্বল্প-মূল্য হইয়াছে যে ভিক্ষাজীবীও ইহার ব্যবহারে সক্ষম। ইহার প্রভাবে সকল বাটী হইতেই চকমকির বাক্স তিরোহিত হইয়াছে। বাস্তবিক যে রসায়নবিদ্ অবস্থান্তরিত করিয়া ইহার অনিষ্টকর কার্য্য সকল তিরোহিত ও ইহার দীপক গুণ রক্ষণ করিয়া মানবের ব্যবহারোপযোগী করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সমাজ যে কি পরিমাণে ঋণী তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

সোডা-ভস্ম (Carbonate of Soda or Soda-ash)। এক্ষণে যে উপায়ে লবণ হইতে সোডা-ভস্ম নির্ম্মিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লেব্ল্যাঙ্ক তাহার আবিষ্কার করেন। এই সোডা বহুকাল হইতে কাচ ও সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পূর্ব্বে সামুদ্রিক উদ্ভিদের ভস্ম হইতে প্রস্তুত হইত। এবং স্পেনের সমুদ্রতীর হইতেই প্রায় এই সকল উদ্ভিদ আনীত হইত। সুতরাং শিল্পের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। পরে যখন নেপোলিয়ন সোডা প্রস্তুত করণের উৎকৃষ্ট প্রণালী আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন তখন লেব্ল্যাঙ্ক নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া পুরস্কার লাভ করিলেন।

শুক্লীকারক চূর্ণ (Bleaching powder)। কাপড়ে কোন প্রকার রঙ্ থাকিলে তাহা উঠাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। সোডা ভস্ম প্রস্তুত করিবার সময় গন্ধক দ্রাবক ও লবণ সংযোগে গন্ধক দ্রাবকের দেড় গুণ হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ইহার উপকারিতা জানা ছিল না বলিয়া কেহ ইহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত না পরন্তু ইহা বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া ভূবায়ুর সহিত মিশ্রিত হইত এবং পার্শ্ববর্ত্তী উদ্ভিদ্ সকলের সমূহ অনিষ্ট করিত। কিন্তু এক্ষণে ইহা রক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহা হইতেই শুক্লীকারক চূর্ণ প্রস্তুত হয়।

গ্যাসালোক। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে ডাক্তার ক্লেটন জানিতে পারিলেন যে উত্তাপ দ্বারা পাথুরিয়া কয়লা হইতে দীপ্য, আলোক প্রদায়ী গ্যাস পাওয়া যায় এবং এই গ্যাস সংগ্রহ করাও সহজ। এক শত বৎসর পরে এই আবিষ্ক্রিয়া লর্ড ডন্‌ডোনাল্ড দ্বারা কার্য্যে পরিণত হয়। তিনি চতুর্দ্দিকে আবৃত কয়লার চুল্লী নির্ম্মাণ করিয়া নল সংযোগে তদুদ্ভূত গ্যাস সংগ্রহ করেন এবং জ্বালাইয়া দেখেন। ফলতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে আলোকের জন্য ইহার ব্যবহার হইতে আরও অনেক দিন লাগিয়াছিল। ১৮১২ খৃঃ

অব্দে লণ্ডন নগরের রাজপথ সকল প্রথম গ্যাস দ্বারা আলোকিত হয়। পারিস নগর ১৮১৯ খৃঃ অব্দে এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীস্থ অনান্য প্রধান প্রধান নগর সকল এই আলোকের সুবিধা প্রাপ্ত হয়। গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় কয়লা হইতে আল্‌কাতরা প্রভৃতি আরও কতকগুলি বস্তুর উৎপত্তি হয়।

দর্পণ প্রস্তুত করণ। সচরাচর কাচে পারদ-স্তর লেপন করিয়াই দর্পণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে কাচে রৌপ্যস্তর সংযোগ করিবার এক সহজ উপায় উদ্ভূত হইয়াছে। যদি এই উপায় অধিকতর প্রচলিত হয় তাহা হইলে কত লোক যে পারদ-বাষ্পের সাংঘাতিক ফল হইতে মুক্তি লাভ করিবে তাহা বলা যায় না।

ফটোগ্রাফি। রসায়ন-বিদ্যা প্রভাবে শিল্পোন্নতির এই একটী অসাধারণ উদাহরণ। ফটোগ্রাফির মৌলিক অর্থ 'আলোক-লিখন'। আলোকই ইহার প্রধান উপকরণ, এবং দুইটী রাসায়নিক-ক্রিয়া গুণ ইহার সহায়। একটী ক্রিয়া এই যে আলোক সংযোগে রৌপ্য-লবণ (ক্লোরাইড্ ব্রোমাইড্ বা আইওডাইড অব্ সিল্‌বর) কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়; অন্য ক্রিয়া এই যে অকৃষ্ণীকৃত অর্থাৎ আলোক-অনাক্রান্ত রৌপ্য-লবণ সোডিক হাইপোসল্‌ফাইট্ সংযোগে দ্রব হইয়া যায়। প্যারিসের ডগার (Daguerre) ও লণ্ডনের ট্যালবট ফটোগ্রাফের বিশেষ উন্নতি করেন। ডগার রৌপ্য দ্বারা গিল্টি করা তাম্র ফলক আইওডিন বাষ্পে নিমজ্জিত করেন এতদ্বারা রৌপ্য ও আইওডিনের মিশ্রণে আইওডাইড্ অব্ সিলবর উক্ত তাম্র ফলকের উপর নিহিত হইল। এবং ইহাই তিনি ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য ব্যবহার করেন। ফটোগ্রাফ তুলিতে হইলে উক্ত তাম্র ফলক একটী অন্ধকার বাক্সর (Camera obscura) মধ্যে রাখিতে হয়। সেই বাক্স এরূপে নির্ম্মিত যে যে বস্তুর ফটোগ্রাফ লইতে হইবে সেই বস্তু হইতে প্রতিফলিত কিরণ গুলি বাক্সর মধ্যে প্রবেশ করতঃ পূর্ব্বোক্ত তাম্র-ফলকোপরিস্থ আইওডাইড্ অব্ সিল্‌বরস্তরে পতিত হইয়া উক্ত বস্তুর প্রতিকৃতি উৎপাদন করিবে এবং পূর্ব্ব কথিত রাসায়নিক ক্রিয়ার গুণে কিরণ-পতন স্থান সকল কৃষ্ণীভূত হইবে সুতরাং প্রতিকৃতি ও চিহ্নিত হইবে। তৎপরে উক্ত তাম্র-ফলক সোডিক হাইপোসালফাইডে নিমজ্জিত করিলে অকৃষ্ণীভূত স্তর সকল দ্রব হইয়া যাইবে। সুতরাং কেবল চিহ্নিত প্রতিকৃতিই তাম্রফলকে বর্ত্তমান রহিবে।

এতদ্ভিন্ন কাচ ও কাগজেও ফটোগ্রাফ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেও অনেক উন্নতি হইয়াছে।

ডগার কোন আকস্মিক উপায়ে জানিতে পারেন যে সোডিক হাইপোসালফাইডে নিমজ্জিত করিবার পূর্ব্বে পারদ-বাষ্পে নিমজ্জিত করিলে প্রতিকৃতি অধিক

স্থায়ী ও বিষদ হয়। সে যাহা হউক ফটোগ্রাফের মূল সঙ্কেত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এক্ষণে এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে দোলায়মান তরঙ্গ, দ্রুতগতি রেলওয়ের গাড়ি, নক্ষত্রপাত প্রভৃতি মুহূর্ত্তস্থায়ী দৃশ্য সকলও ইহাতে অঙ্কিত হইতে পারে। ফলতঃ ইহা দ্বারা চন্দ্রের কলা সকল, সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যালোকস্থ অগ্নিময় উচ্চস্থান সকল প্রভৃতি অনেক দৃশ্য বৈজ্ঞানিক অভিপ্রায়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিজ্ঞানই ইহার স্রষ্ঠা হইয়া বিজ্ঞানই ইহা দ্বারা উপকৃত ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

আলোক-বিশ্লেষণযন্ত্র ( Spectrum analyis ) বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে রামধনুকের মত নানাবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। ইহার কারণ লাল, সবুজ এবং গোলাপী প্রভৃতি বর্ণের কিরণ সকলের সামঞ্জস্যে সূর্য্য-কিরণের শুভ্রত্ব উৎপাদিত হয়। বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সেই কিরণ গুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা এই বিশ্লিষ্ট কিরণ গুলি দেখিলে গোলাপী, নীল ঈষৎ নীল, সবুজ, পীত, ঈষৎ পীত এবং লোহিত এই কয়েকটী বর্ণ ক্রমান্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে ঐ সকল বর্ণের মধ্যে স্থানে স্থানে একটী একটী কাল রেখা বিদ্যমান থাকে। নক্ষত্র, সূর্য্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক আলোকের প্রতিকৃতিতে ( Spectrum ) এই রেখা গুলি কালই হইয়া থাকে। কিন্তু তড়িতালোকে ও রঙ্গিল আলোকে ( অর্থাৎ অগ্নি-শিখায় কোন রাসায়নিক দ্রব্যের বাষ্পীভাবে যে আলোক রঙ্গিল দেখায় ) এই রেখাগুলি উজ্জ্বল দেখায়। এই রেখাগুলি হইতেই এই যন্ত্রের কার্য্যকারিতা। পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে বস্তুভেদে ঐ উজ্জ্বল রেখা গুলির বর্ণ, সংখ্যা ও অবস্থান বিভিন্ন হইয়া থাকে। সোডিয়ম-সম্ভূত রঙ্গিল আলোকের যন্ত্রস্থিত প্রতিকৃতিতে একটী উজ্জ্বল পীতবর্ণ রেখা একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করে, আবার পোটাশিয়মের আলোক-প্রতিকৃতিতে দুইটী উজ্জ্বল রেখা দুই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকে। এইরূপে এই রেখাগুলির দ্বারা আমরা কোন বস্তুর সত্ত্বা বা অসত্ত্বা জানিতে পারি। বস্তু যত অল্প পরিমাণই হউকনা কেন এই যন্ত্রের ক্ষমতা অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। এক গ্রেণের সহস্র ২ ভাগ দ্রব্য থাকিলে ও ইহা দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে।

সূর্য্য-কিরণ-প্রতিকৃতিতে (Solar spectrum) যে রেখাগুলি কাল হয় তাহার কারণ স্বতন্ত্র। যখন কোন মিশ্রবর্ণ আলোক—যাহা হইতেই উদ্ভূত হউক না—কোন বাষ্পের ভিতর দিয়া দেখা যায় সেই বাষ্প বা উহা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই দ্রব্য, প্রজ্বলিত অবস্থায়

যে সকল কিরণ বিকীরণ করে, ঐ সকল কিরণের গমনে উক্ত বাষ্প বাধা প্রদান করে। সোডিয়ম্ আলোকে, যে স্থলে উজ্জ্বল পীত বর্ণ রেখা দেখা যায়, ঠিক্ সেই স্থলে সূর্য্যকিরণে কাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য এই অনুমান হয় সূর্য্য সোডিয়ম-বাষ্পে বেষ্টিত। এইরূপে সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতিতে আমাদের পৃথিবীস্থ প্রায় সকল রাসায়নিক বস্তুরই সত্বা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলতঃ এই যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে কালে ক্ষুদ্র মনুষ্য এই পৃথিবীতে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ যোজন দূরবর্ত্তী নক্ষত্র গণের রাসায়নিক উপকরণ সকল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে।

সূর্য্য গ্রহণের সময় চন্দ্রের চতুঃপার্শ্বে আলোকময় পর্ব্বতের ন্যায় দৃশ্য দেখা যায় এই যন্ত্র দ্বারা তাহার প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াছে। লক্ইয়ারের পরীক্ষায় উহা প্রজ্বলিত বাষ্প-স্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়! সূর্য্য এই বাষ্প-স্তূপ দ্বারা বেষ্টিত। ইহার অধিকাংশই উদজান এবং ইহার গভীরতা অনূ্যন ৫০০০ মাইল। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা-শাস্ত্রেও এই যন্ত্রের বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। যথা প্রকৃত এবং বিকৃত রক্তের পরীক্ষা, মূত্রে আলবুমেনের সত্বা নির্ণয় করণ ইত্যাদি। ফলতঃ এত বহুফল—প্রসূ যন্ত্র যে ব্যক্তি দ্বয়ের (বুন্‌সেন ও কার্‌কফ) শ্রমের ফল তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অনশ্বরত্ব। বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধীয় এই সকল উন্নতির বিষয় বলিয়া পরিশেষে বর্ত্তমান সময়ের আবিষ্কৃত একটী মহৎ তত্ত্বের সংক্ষেপে উল্লেখ করা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাষঙ্গিক হইবেন। এই মহৎ তত্ত্ব—অনশ্বরত্ব। জগতে কিছুরই বিনাশ নাই। একটী বস্তু দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হইল! অপর একটী বস্তু উত্তাপে বাষ্পীভূত হইল। বোধ হইল যেন তাহাদের আর কিছুই থাকিলনা। কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতম একটী পরমাণু ও নষ্ট হইল না। কেবল রূপান্তরিত হইয়া অবস্থিত রহিল। এইরূপে দেখা যায় যে পদার্থের বিনাশ নাই। শুদ্ধ পদার্থ কেন বলের ও বিনাশ নাই। কামান হইতে একটী গোলা বেগে গিয়া পর্ব্বতে নিহিত হইল বোধ হইল যেন তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত বেগ উপশমিত হইল কিন্তু বাস্তবিক সে বেগ কেবল রূপান্তরিত হইল, রূপান্তরিত হইয়া পতন স্থানের সমস্ত অণুকে দ্রুতবেগে কম্পিত করিতে লাগিল এবং তাহার ফল স্বরূপ সেই স্থান উত্তপ্ত হইল। তাড়িত, স্নায়ব, রাসায়নিক প্রভৃতি বল ও এইরূপ। মানব ইহাদের স্বজনেও যেরূপ অক্ষম, বিনাশেও তদ্রূপ। এই সকল বল বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি ধারণ করে অর্থাৎ কথন স্নায়ব বল তাড়িত, কথন বা ভৌতিক বল রাসায়নিক বলে পরিবর্ত্তিত হয়।

পরিশিষ্ট। আমরা এতক্ষণ কেবল শিল্প ও

রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির বিষয়ই বলিলাম। এক্ষণে একবার সাধারণ উন্নতির বিষয় অতি সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করা যাউক। আদিম অবস্থায় মনুষ্য ও পশুতে বড় অধিক প্রভেদ ছিল না। আহার, শয়ন আশ্রয় প্রভৃতি পশু-সাধারণ অভাব সকল পূরণ করিতেই মনুষ্যের সমস্ত শ্রম ও সময় ব্যয়িত হইত। পরে যখন মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইল, একের অভাব সকল অন্যের শ্রমে পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন মানব বুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তি সকলের পরিচালনে অবসর পাইল। এই বুদ্ধি-পরিচালনে অপরিহার্য্য অভাব সকল পূরণ করিবার সহজ উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল, সুতরাং অবসর ও বাড়িল বুদ্ধি ও মনের অধিক চালনা হইতে লাগিল তখন পশু-সাধারণ পরিশ্রমে মানবের আর আস্থা রহিল না। কোন কোন দেশে ঐ সকল পরিশ্রমের ভার জিত বা ক্রীত দাস দিগের হস্তে অর্পিত হইল। এই সকল দেশের মার্জ্জিত-বুদ্ধি লোকেরা মনে করিতেন যে তাঁহারা উক্ত দাস সকল হইতে স্বতন্ত্র ও উচ্চতর জীব, এবং কার্য্যতঃ তাহাদিগকে পশু শ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত করিলেন *। নীতি-সম্বন্ধে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এ স্থলে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এত গুলি লোকের বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল ইহা বলা বাহুল্য।

সে যাহা হউক বুদ্ধির চালনায় ও প্রকৃতির পর্য্যালোচনায় যখন মনুষ্য দেখিল যে প্রাকৃতিক বল সকল ও মানবের ব্যবহারোপযোগী করা যায় তখন প্রাকৃতিক বল করায়ত্ত করিয়া শ্রম-লাঘব করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা হইল, এবং পরস্পরের সাহায্যে এই যত্ন অধিক সফল হইতে লাগিল। হোরেস্ ম্যান বলেন "যে যদি দশ জন শিক্ষিত লোকের মধ্যে এক জনের কোন নূতন আবিষ্ক্রিয়া করা সম্ভব হয় তাহা হইলে এক শত শিক্ষিত লোকের মধ্যে যে দশ জন অপেক্ষা অধিক এরূপ লোক হওয়া সম্ভব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ মানসিক শক্তি অগ্নির ন্যায়। এক খণ্ড কাষ্ঠ হয়ত জ্বলিবে না; দশ খণ্ড একত্র কর সুন্দর জ্বলিবে, আবার এক শত খণ্ড একত্র কর দশ খণ্ড কাষ্ঠে যে উত্তাপ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার পঞ্চাশ গুণ উত্তাপ উদ্ভূত হইবে।"

এই রূপে এই সকল আবিষ্ক্রিয়া হইতে শিল্পের উন্নতি, শিল্পের উন্নতি হইতে অর্থ, অর্থ হইতে মূল ধন এবং মূল ধন হইতে সমাজের উন্নতি ক্রমে ক্রমে সাধিত হইয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে উন্নতির পর উন্নতি যেন স্তরে স্তরে গ্রথিত হইতেছে এবং ক্রমাগতঃ হইতে থাকিবে। কেহ ২ বলেন সংসারে উন্নতি নাই সকলই কেবল চক্রের ন্যায়

* দাসদিগের আত্মা আছে বলিয়া গ্রীকেরা বিশ্বাস করিতেন না।

আবর্ত্তন করে। এক অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে আবার সেই অবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু এই মতানুযায়ী সংসারে আমরা কিছুই দেখিনা। ভূতত্ব বিদ্যার প্রভাবে আমরা দেখিতেছি যে যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেই পৃথিবী ও ক্রমে ২ উৎকর্ষলাভ করিতেছে। পুষ্পবিহীন বৃক্ষের পর সপুষ্প বৃক্ষ, মৎস্যের পর সরীসৃপ, সরীসৃপের পর স্তন্যপায়ী পশু এইরূপ ক্রমেই উচ্চতর জীবের আবির্ভাব হইতে হইতে সর্ব্বশেষে মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। এবং পৃথিবী ও উদ্ভিদ্‌শূন্য মরুভূমির ন্যায় অবস্থা হইতে ক্রম-আবির্ভূত জীবগণের বাসোপযোগী হইবার জন্য উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে শেষে মানব বাসোপযোগী এই সুরম্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আবার সর্ব্বশেষে আবির্ভূত মানবের আদিম অবস্থার সহিত এক্ষণকার অবস্থা তুলনা করিলে অধুনাতন মনুষ্য আদিম মনুষ্য হইতে উচ্চতর জীব বলিয়াই প্রতীত হইবে। বস্তুতঃ আদিম অবস্থার প্রকৃতি-উপাসনার সহিত এক্ষণকার প্রকৃতি-শাসন ও প্রাচীন কালের সভ্যতম জাতির মধ্যে প্রচলিত দাস-প্রথার সহিত ইদানীন্তন ব্যক্তিগত স্বত্ব ও স্বাধীনতা-ভাবের তুলনা করিলে এ মনুষ্য সে মনুষ্য নয় বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। এ স্থলে আমরা জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক উন্নতির কথা বলিতেছিনা, পরন্তু আমরা মানব-সাধারণ উন্নতির বিষয় বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত উন্নতির সীমা আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রোম আর এক্ষণে "পৃথিবীর কর্ত্রী" নন। যে গ্রীসের বীর-দর্পে ট্রয়নগর এককালে কম্পিত হইয়াছিল সে গ্রীস আর নাই। যে আর্য্যজাতি ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া ছিলেন সে আর্য্য জাতি আর নাই। মহম্মদীয় ধর্ম্মের যে অগ্নিময় ভাব যাহাকে স্পর্শ করিত তাহার উত্তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হইত তাহা আর নাই। কিন্তু এ সকলের কথা বলিনা। মানব-সাধারণ উন্নতি অক্ষয় ও অনন্ত। আমরা সার হম্‌ফ্রি ডেভি * কৃত কোন পুস্তক হইতে এই বিষয়ে একটু উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের শেষ করিব।

তিনি বলেন "মানসিক শ্রম ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ফল স্থায়ী ও অবিনশ্বর। এক রাজার প্রবর্ত্তিত শাসন প্রণালী অন্যরাজাদ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়, এক যুদ্ধের শুভ-ফল অন্য যুদ্ধ হইতে নষ্ট হয়, কিন্তু এক খণ্ড ইস্পাত একবার চুম্বক দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে চিরকাল দিগ্‌দর্শনত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করে এবং দিগন্তব্যাপী অননুমেয়-মার্গ মহার্ণব মানবের করায়ত্ত রাখে। কালের অবস্থা ভেদে বল্টিক সাগরের তীর হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরে সৈন্য ধাবিত হইতে পারে, মহম্মদের অনুচরগণ অন্য কোন জাতির সংঘর্ষে চূর্ণীকৃত হইতে পারে, এবং এসিয়ায় বৃটনের আধিপত্য তৈমুর লঙ্গ বা জেঙ্গিস খাঁর সাম্রাজ্যের ন্যায়

* (Sir Humphry Davy's Consolations in travels)

পরিণাম লাভ করিতে পারে, কিন্তু যে বাষ্পীয় পোত ডেল্ওয়ার বা সেণ্ট লরেন্স নদীতে ভাসমান রহিয়াছে ইহার ব্যবহার চিরকালই থাকিবে এবং এক সভ্য জাতির সভ্যতা অন্য অসভ্য মরুময় প্রদেশে গিয়া রোপিত করিবে"।

শ্রীকানাইলাল দে।

# কবিত্ব ও কাব্য সমালোচনা।

## চতুর্থ প্রস্তাব।

আমরা এই প্রস্তাবে খণ্ড-কাব্যের উপাখ্যানের "দুঃখান্ত" ও "সুখান্ত" বিষয়ের আলোচনা করিব। "দুঃখান্ত" ও সুখান্ত অর্থে আমরা কি বুঝাইতে চাহি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ গভীর, ভার, অবনত, স্তম্ভিত ও বিহ্বল ভাব ধারণ করে, এবং দিঙ্মণ্ডল অনন্ত অন্ধকার দেখিতে থাকে, তাহাই "দুঃখান্ত"; আর যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ প্রফুল্ল, প্রসারিত, ও উন্নত হইয়া ব্যাপ্ত উর্জ্জ্বল রাজ্য দেখিতে থাকে, তাহাই "সুখান্ত"। অন্তঃকরণের দুঃখ-ভাবকে বিশ্লিষ্ট করিতে হইলে, প্রধানতঃ গম্ভীরত্ব, ভারত্ব, অবনতি, স্তম্ভন ও বিহ্বলত্ব প্রভৃতি মূল ভাবগুলি পাওয়া যায়। এবং যে কোন ঘটনা বলির দ্বারা উপাখ্যান এই সকল ভাবের উদ্দীপন করিয়া পরিসমাপ্ত হইলেই তাহাকে দুঃখান্ত সংজ্ঞা দিতে পারা যায়; উহা বিয়োগে বা বিচ্ছেদেই হউক অথবা তাহা না হইয়া, অপর কোন কারণেই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। এদেশীয় সাধারণ লেখক ও পাঠকবর্গ উপাখ্যানের অন্তে নায়ক নায়িকার মৃত্যু বা চিরবিচ্ছেদ ঘটিলেই দুঃখান্ত-উপাখ্যান সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সমগ্র উপাখ্যানের ফল অন্তঃকরণে কি ভাব ধারণ করিল তাহা বিচার করিয়া দেখেন না। উপাখ্যানের প্রবলাংশ যদি নায়ক নায়িকার জয়োল্লাসে পরিপূরিত হইয়া, অন্তে আসিয়া কোন কারণে তাহাদের বিয়োগ বা বিচ্ছেদ ঘটে, এবং ঐ বিয়োগ বা বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ যদি মূল উপাখ্যানের আনন্দ উল্লাসের সহিত তুলনায় এত লঘু হইয়া পড়ে, যে তাহার প্রতি আমাদের অনুধাবন বিশেষ প্রবল না হয়, তাহা হইলে উপ্যাখ্যানের অন্তে নায়ক নায়িকার বিয়োগ বা বিচ্ছেদ সত্ত্বেও আমরা মূল উপাখ্যানকে দুঃখান্ত সংজ্ঞা দিতে পারিনা, উহা সুখান্ত। উপাখ্যানের রস-স্রোত যেটি প্রবল হইয়া অপরটির অন্তে গিয়া দাঁড়ায়, আমরা উপাখ্যানকে সেই রসান্তক উপাধি দিতে পারি। সেক্‌সপিয়ারের "হ্যাম্‌লেট" একখানি দুঃখান্ত উপাখ্যান; কিন্তু ইহাকে

দুঃখান্ত উপাখ্যান বলি কেন? উপাখ্যানের নায়ক হ্যাম্‌লেট্ শেষে মরিলেন বলিয়াই কি? কিন্তু যদি শেষে হ্যাম্‌লেট্ লেয়ারটিসের বিষাক্ত ছুরিকার আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া, তাঁহার পিতৃ-হন্তা পিতৃব্যের মৃত্যুসাধনান্তর তাহার পরেও জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে কি হ্যামলেট্ উপাখ্যানকে আমরা সুখান্ত উপাধি দিতে পারিতাম?—না, হ্যামলেট্ উপাখ্যান, হ্যামলেট্ জীবিত থাকিলেও, যে স্থানে অন্ত হইয়াছে ঐ স্থানে অন্ত হইলে, উহা সুখান্ত না বলিয়া আমরা উহাকে দুঃখান্ত বলিতাম। কবি হ্যামলেটের বিষম বিকৃত ঘোর অন্তররাজ্যে আমাদিগকে যেখানে লইয়া আসিয়াছেন, ঐ স্থানে উহার অন্ত করিয়া হ্যামলেট্‌কে জীবিত রাখিলেও, আমরা কেবল মৃত্যু হইতে হ্যামলেট্‌কে রক্ষিত এবং তাঁহার পিতৃহন্তা পিতৃব্যের প্রাণনাশ মাত্র করিতে দেখিতাম, যে যে কারণে তাঁহার অন্তঃকরণে গ্লানি ও বিষম বিকারে ঘোরান্ধকারময় হইয়া উঠিয়াছিল, পিতৃহন্তার প্রতি প্রতিহিংসা লওয়াতেই তাহার অপগম হইল কিনা, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না; তাঁহার মন মৃত্যুকালেও কতকগুলি আশা করিতেছিল; আমরা তাঁহাকে জীবিত থাকিয়া সেই সকল আশার সফলতা সাধক অপর একটি দৃশ্য দেখিলেও, তত্রাচ সমস্ত উপাখ্যানকে "সুখান্ত" সংজ্ঞা দিতে পারিতাম না। মৃত্যু কালের তাঁহার প্রবল আশা এই, যেন সাধারণ লোকে তাঁহাকে দুর্ব্বৃত্ত পিতৃব্য হন্তা মনে না করে; তন্নিমিত্ত তিনি তাঁহার বন্ধু হোরেসিওকে কহিতেছেন—

I am dead, Horatio :——
You that look pale and tremble at this chance,
That are but mutes or audience to this act,
Had I but time (as this fell sergeant, death,
Is strict in his arrest), O, I could tell you,—
But let it be :—Horatio, I am dead ;
Thou liv'st ; report me and my cause aright
To the unsatisfied.

পুনশ্চ কহিতেছেন—

O, God! Horatio, what a wounded name,
Things standing thus unkown, shall live behind me!
If thou didst ever hold me in thy heart,
Absent thee from felicity awhile,
And, in this harsh world draw thy breath in pain,
To tell my story.

আমরা যদি হ্যামলেট্‌কে জীবিত থাকিয়া সাধারণ সমক্ষে নিজমুখে তাঁহার দোষাপনোদন করিতে দেখিতাম, ও

তৎপরে সাধারণের জয়োল্লাসে তাঁহাকে সিংহাসনাধিরোহণ করিতে দেখিতাম, তাহা হইলেও আমাদের অন্তঃকরণের দুঃখভার অপনীত হইত না, আমরা কেবল হ্যাম্‌লেটের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিতাম মাত্র, অন্তর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতাম না। যে যুবরাজের যৌবন-সুলভ আশা ভরসায় বিকসিত অন্তঃকরণ, পিতার হঠাৎ মৃত্যুর সন্দেহে এবং মাতার দেবর [illegible] বিষণ্ণ ও ম্লান হইয়াছিল, এবং তৎপরে যাঁহার অন্তঃকরণ পিতার প্রেতমূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার প্রমুখাৎ তাঁহার নৃশংস গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া সংসারের কাণ্ডে স্তম্ভবৎ ও প্রতিহিংসায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়া ছিল, এবং তৎপরে যে অন্তঃকরণ প্রণয়িনী অফিলিয়ার মৃত্যুতে উন্মত্তবৎ হইয়াছিল, এত আঘাতে ঘোর বিচ্ছিন্ন সেই অন্তঃকরণ যে কেবল পিতৃ-হন্তার প্রতি প্রতিহিংসা লইয়া ও রাজপদ পাইয়াই একেবারে প্রফুল্ল ও বিস্ফারিত হইয়া উঠিত এবং তৎক্ষণকার তাহার যে সুখ তাহা এত দুঃখরাশির উপরেও ভাসিয়া উঠিত আমরা তাহা অনুমান করিতে পারিনা। হ্যামলেট্ উপাখ্যানকে সুখান্ত করিতে হইলে কবিকে হ্যামলেটের দ্বিতীয় জীবন চিত্রিত করিয়া অপর এক-খণ্ড কাব্য উহার পরে লিখিয়াই উপসংহার সংযোজিত করিতে হইত। এই কাব্যে হ্যামলেটের চিরবিষণ্ণ অন্তঃকরণকে পূর্ণ প্রফুল্ল, বৈরাগ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাংসারিক সুখে অনুরাগী ও সুখী, আঘাত-ক্ষত সকল সুস্থ ও সবল এবং আশা ভরসার কার্য্যে জীবনকে পরিপ্লুত করিয়া চিত্রিত করিতে হইত, এবং তবে উহা আমাদিগকে হ্যামলেটের এত দুঃখ ভুলাইয়া, তাঁহার সুখে সুখী করিতে পারিত। এবং তখন আমরা হ্যাম্‌লেট্ উপাখ্যানকে সুখান্ত উপাখ্যান সংজ্ঞা দিতে পারিতাম।

গ্রীক ভাষায় এমন অনেক নাটক আছে, যাহা দুঃখের ঘটনায় মাত্র অন্ত হয় নাই, কিন্তু উহা দুঃখান্ত সংজ্ঞার অন্তর্গত। ইউমিনাইডিস (Euminides) ফাইলক্‌টেটিস্ (Philoctetis) এবং কিয়ৎ পরিমানে ইডিপস্ কলোনিয়স্ (Œdipus Coloneus) এবং অনেক গুলি ইউরিপাইডিসের (Euripides) নাটকেরও সুখের ঘটনায় অন্ত, কিন্তু তাহারা দুঃখান্ত-সংজ্ঞাধারী।

ভারতবর্ষীয় কবিগণের উপাখ্যান প্রায়ই সুখ দুঃখের সমতায় রচিত হইত, কিম্বা, সুখ-প্রবল করিয়া রচিত হইত কিন্তু দুঃখ-প্রবল রচনার বিষয়ে তত আদর ছিলনা। এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার নিষেধ সূত্র ও লিখিত আছে। কিন্তু কি কারণে যে ভারতবর্ষীয় আলঙ্কারিকেরা উপাখ্যানকে দুঃখান্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায় না। বোধ হয় রঙ্গ ভূমি হইতে মানব কবির মনসিজ অসামান্য দুঃখ-ভারাবনত অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া সাংসারিক কোন্ সামান্য সুখের দ্বারায় আর

তাহার অপনোদন করিবে, এবং দুঃখ ভারে বিকৃত মন স্ফূর্ত্তি বিহনে যে সংসারে কোন কার্য্যকারী হইবে না, ও শারীরিক ও মানসিক-রোগ-করীও হইতে পারে, এবং এরূপ দুঃখের পৌনঃপুন্যে মন দুঃখ বিষয়ে অসাড় হইয়া যাইতে পারে, এই সকল ভাবিয়াই হয়ত তাঁহারা উপাখ্যান দুঃখে পরিশেষিত করিতে নিষেধ বিধি করিয়াছিলেন।

মানব অন্তরে দুঃখ এবং ঘোর বিষয় দেখিবার একটি প্রবৃত্তি আছে, কবি তাহা বুঝিয়া তাহারি অনুরূপ সামগ্রী রচনা করিয়া থাকেন। অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, দুঃখ এবং ঘোর বিষয়ের নিমিত্ত মানবের প্রবৃত্ত জন্মে কেন? ইহার অনেকে অনেক প্রকার উত্তর দিয়া থাকেন। কেহ কহেন, আমাদের এই অপেক্ষাকৃত সুখময় ও সুস্থির জীবনের সহিত, কোন দুর্দ্দৈব-পীড়িত জীবনের দুর্দ্দশার তুলনায় ইহাকে যে সুখময় ও সুস্থির বলিয়া বোধ হয়, তন্নিমিত্তই আমাদের দুঃখ ও দুর্দ্দশা দেখিবার প্রবৃত্তি জন্মে। শ্লেগেল (Schlegel) সাহেব ইহার এই উত্তর দেন, যে যখন আমরা কোন দুঃখান্ত উপাখ্যানের পাত্রের প্রতি গাঢ় অনুরক্ত হই, তখন আমরা আত্মত্ব ভুলিয়া যাই, এবং পাত্রের দুঃখে দুঃখী হইয়া পড়ি, সুতরাং অবস্থার তুলনায় সুখোৎপত্তির সম্ভাবনা কি? এবং যদি আমরা পাত্রের দুঃখে দুঃখী না হই, তবে ইহা স্বীকার্য্য যে উপাখ্যান তাহার উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অপরেরা কহেন, যে কাব্যে পাপী ব্যক্তির শাস্তি ও ধার্ম্মিকের পুরস্কার দেখিয়া আমরা নৈতিক উন্নতি লাভ করি; অ্যারিষ্টটল্ (Aristotle) কহেন যে দুঃখান্ত উপাখ্যানের তাৎপর্য্য এই, যে, উহা দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণকে দুঃখে দুঃখী এবং ভয়ে ভীত করিয়া, আমাদের হৃৎবৃত্তি সকলকে পরিমার্জ্জিত করে; এইরূপ নানা জনের নানা মত। কিন্তু উক্তরূপ নৈতিক উন্নতিলাভও কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, যেহেতু উৎকৃষ্ট কাব্যেও আমরা পাপের স্পর্দ্ধা, এবং ধর্ম্মের অবনতি দেখিয়াছি; এবং হৃৎবৃত্তির পরিমার্জ্জন ও তাহার উদ্দেশ্য নয়, যেহেতু কাব্যে হৃদ্বৃত্তিকে মলিন করিবার উপাদানও থাকে। অপর সম্প্রদায় কহেন যে আমাদের মন সংসারের নিত্য কর্ম্মে অলস ও অসাড় হইয়া পড়িলে, আমরা প্রবল উত্তেজনা ও অন্তরাবেগের কার্য্য সকল দেখিবার নিমিত্ত রঙ্গভূমে আকৃষ্ট হই। শ্লেগেল (Schlegel) কহেন, এরূপ প্রয়োজন আমাদিগের অন্তকরণে উপলব্ধি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা দেখিবার নিমিত্ত কাব্য দর্শনের স্পৃহা কেন, উহাত, প্রাচীন রোমকেরা যেমন পশুযুদ্ধ দেখিতেন তদ্রূপ পশুযুদ্ধ দর্শনেও পরিতৃপ্ত হইতে পারে। দুঃখময় ঘোর দৃশ্য সকল দেখিবার প্রবৃত্তি মানব অন্তরে উদ্ভূত হয় কেন, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্লেগেল নিজের এই মত ব্যক্ত করেন, যে, অভিভূতকারী দুঃখো-

দীপক কোন উপযুক্ত সংস্থিত উপাখ্যানে আমরা যে আনন্দ অনুভব করি, তাহা হয়ত কবি-কল্পিত মানব প্রকৃতির মহত্ত্ব দর্শনে হইয়া থাকে, না হয় উহা বাহ্য বিশৃঙ্খল কার্য্যস্রোতের সহিত উন্নত-প্রকৃতি বস্তু সকল যে সংস্থিত রহিয়াছে তাহা দেখিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে; অথবা এই উভয় দেখিয়াই উৎপন্ন হইবার সম্ভব।*

শ্লেগেল্ যেমন অপর সকল মতের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন, আমরাও তেমনি তাঁহার মতের বিরুদ্ধে বলিতে পারি, যে উৎকৃষ্ট এমন অনেক দুঃখ-প্রবল উপাখ্যানে আমরা মানব প্রকৃতির মহত্ত্ব দর্শনের বিপরীতে, উহার দৌর্ব্বল্য ও অবনতিই দেখিয়া থাকি। যদি কেহ সিরাজদ্দৌলাকে নায়ক করিয়া দুঃখ-প্রবল কোন উপাখ্যান লেখে, এবং তাঁহার চরিত্রকে ভীরুতা, দৌর্ব্বল্য ভোগাসক্ততা প্রভৃতি তুচ্ছ গুণে সজ্জিত করে, তত্রাচ দুর্দ্দৈবের ঘোর কুচক্রে পতিত নিঃসহায় সিরাজদ্দৌলার মৃত্যু দৃশ্যে আমাদের কম উত্তেজনা হইবে না। আমাদের মন তখন মানব প্রকৃতির মহত্ত্ব,নীচত্ব বিচার ভুলিয়া গিয়া, সমদুঃখে দুঃখী হইয়া পড়িবে।

কি কারণে যে মন দুঃখজনক ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে কৌতূহলী হয়, তাহা মনই জানে; উহা মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি জটিল, দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন। মহান্ মানব কেন, আমরা সামান্য পশু পক্ষীর দুঃখ দেখিতেও সময়ে সময়ে ধাবিত হই, এবং এই দুঃখ যে পরিমাণে অধিক এবং ঘোরতর, সেই পরিমাণে উহা আমাদের উপভোগের বস্তু হইয়া উঠে।

দুঃখের সহিত দুঃখ বোধ করা, এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্যে ভীত হওয়া, মানব প্রকৃতির এক প্রকার সুখ। ইহার কোন সমবায় কারণ আছে, আমাদের বোধ হয় না; ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, ইহা মানবের প্রকৃতি। কবি মানবের এই প্রকৃতিগত ইচ্ছা বুঝিয়াই, তদনুরূপ উপাখ্যান রচনা করিয়া থাকেন। দুঃখান্ত উপাখ্যানের অন্তঃসার কি, আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিছু বলিব।

* The satisfaction, therefore, which we derive from the representation, in a good tragedy, of powerfull situations and overwhelming sorrows, must be ascribed either to the feelings of the dignity of human nature, excited in us by such grand instances of it, as are therein displayed, or to the trace of a higher order of things, impressed on the apparently irregular course of events, and mysteriously revealed in them; or perhaps to both these causes conjointly.

(Schleogel's dramatic literature chap V.)

অন্তঃকরণের গভীরত্ব, ভারত্ব, অবনতি, স্তম্ভন ও বিহ্বলাদি ভাবই দুঃখ। যে সকল ঘটনাবলির দ্বারায় এই সকল ভাব অন্তঃকরণে গাঢ় এবং গাঢ়তর হইতে থাকে, তাহাই দুঃখান্ত উপাখ্যানের উপযোগী। শ্লেগেল্ কহেন আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা এবং বাহ্যিক অধীনতা, এই দুইটি দুঃখান্ত জগতের দুইটি কেন্দ্র। এবং ইহাদের উভয়ের বৈষম্যই উভয়ে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। * প্রাচীন গ্রীসীয়দিগের দুঃখান্ত উপাখ্যান বিষয়ে এই রূপ জ্ঞান ছিল। সেক্‌সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ, দুঃখান্ত উপাখ্যান, কিন্তু ইহার দুঃখান্ত ভাব কিসে প্রবল বা পরিস্ফুট হইয়াছে? যে ম্যাক্‌বেথ ডাকিনীগণের প্রলোভন বাক্যের অধীন হইয়া স্ত্রীর উত্তেজনায়, নৈতিক বল হারাইয়া চোরবৎ গৃহাগত অতিথি প্রভুর গভীর নিশায় গুপ্ত হত্যা সাধন করিলেন, এবং ক্রমে ভয়ের অধীন হইয়া বন্ধু বান্ধবগণেরও গুপ্ত চর দ্বারা হত্যা সাধনে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা কোথায়? আবার যে ম্যাক্‌বেথ, সৈনাধ্যক্ষ হইতে, গ্লামিসের থেন এবং তৎপরে কডরের থেন, এবং তৎপরে রাজপদ পাইয়া সমস্ত ক্ষমতা আপনার করায়ত্ত করিয়া স্কটলণ্ড দেশকে আপনার ইচ্ছার ক্রীড়াস্থল দেখিতে লাগিলেন, তাঁহারই বা বাহ্য অধীনতা কৈ? আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার ও বাহ্যিক অধীনতার দ্বন্দ্বের প্রাবল্যে ম্যাক্‌বেথ উপাখ্যান দুঃখান্ত হইয়া উঠে নাই। ম্যাক্‌বেথের অন্তঃকরণ যে যে কারণে গভীর ঘোর ভাব ধারণ করিতে লাগিল, আমাদের অন্তঃকরণ তাহার অনুসরণে ক্রমে ঘোর হইতে ঘোর স্থলে নীত হইয়া এমন ভয়ঙ্কর ভাব অবশেষে দেখিল যাহা দুঃখপূর্ণ ভয়ঙ্কর দৃশ্যের চরম সৃজন। আমরা সংক্ষেপে দুঃখান্ত উপাখ্যানের একটি উদাহরণ দিতেছি।

সেক্‌সপিয়রের ওথেলো উপাখ্যানে, ওথেলো ও দেস্‌দিমনা উভয়ে উভয়ের প্রেমে গাঢ় আকৃষ্ট; সে আকর্ষণ সামান্য বলে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে, সে সম্মিলনও সামান্য সুখের পরিণাম নহে। দেস্‌দিমনার পিতা ব্রাব্যান্‌সিও (Brabantio) সেই সম্মিলন পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইলেন। ওথেলেও হেয়, কদাকার, মুর (Moor) জাতি হইয়া তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিবে; তিনি বিনিস নগরীর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এবং রাজসভার সভ্য, ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই লজ্জাকর। দেস্‌দিমনার অন্তঃকরণ পিতার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিল, তাঁহার দেহ তাঁহার গৃহদ্বার অতিক্রম করিল,

* Inward liberty and external necessity are the two poles of the tragic world. It is only by contrast with its opposite that each of these ideas is brought into full manifistation. (Schlegel's dramatic litrature, chap V. Black's English translation.)

অভিলাষ-সাগর অভিলাষ সাগরে আসিয়া মিলিত হইল। রাজ্যের নিয়ম, কন্যা পিতার অবাধ্য হইয়া, পিতার ইচ্ছানুরূপ বরকে বরণ না করিয়া অপর বরকে বরণ করিলে, প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে। ব্র্যাব্যান্‌সিও কন্যার এই সম্মিলন বিচ্ছেদের নিমিত্ত দেস্‌দিমনার প্রতি এই ভয়ঙ্কর রাজ দণ্ডের আঘাত প্রার্থনা করিলেন, এবং ওথেলোর প্রতি, তাঁহার কন্যাকে কুহক বিদ্যায় ভুলাইয়া হরণ করিয়াছে এই ঘোর অত্যাচারের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। কিন্তু শুভাদৃষ্টের ঘটনায় তাঁহারা উভয়েই এই ভীষণ দণ্ডের হাত হইতে নিস্তার পাইলেন; তাঁহাদের সুখের আকাশ তখন মেঘমুক্ত হইয়া ব্যাপ্ত কিরণে ভাসিতে লাগিল। কিন্তু ওথেলোর আকাশ কিরূপে আবার ঘোর হইতে ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিদ্যুৎ চমকে আলোড়িত হইতে লাগিল এবং পরিশেষে ভীষণ বজ্রাঘাতে কিরূপে প্রাণসম প্রেয়সী পত্নী কোমলহৃদয়া সরলা দেস্‌দিমনার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল, আমরা তাহার স্থূল ঘটনাস্থল কয়েকটি দেখাইয়া দিব। ইয়াগোর অভীষ্টসাধক কুমন্ত্রণাই ইহার একমাত্র বিষয়। ক্যাসিও, ওথেলোর অধীনস্থ সেনাপতি, এবং প্রিয় বন্ধু; ইয়াগোও সৈন্যদলের একজন প্রধান পদবীধারী, কিন্তু প্রধান সেনাপতি ওথেলোর নিকট ক্যাসিওর বিশেষ আদর তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি ক্যাসিওর প্রতি সেনাপতির মন ভঙ্গ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্যাসিও ওথেলোর যেমন প্রিয়পাত্র, দেস্‌দিমনারও প্রিয় পাত্র ছিলেন, দেস্‌দিমনা তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ইয়াগো এই ভাল বাসা সূত্র অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির মানস করিলেন। দেস্‌দিমনার সরল ভালবাসাকে তিনি কলঙ্কের কালিমায় সাজাইলেন, এবং সেনাপতির সুখোদ্দীপ্ত মনে প্রথমতঃ বাগ্‌জালে তাহার ছায়া প্রদান করিলেন। নির্ম্মল বিশ্বাস ক্ষেত্রে সে ছায়া শীঘ্র পতিত হইবার নয়. প্রেমের অনুকূল বায়ুতেও তাহা শীঘ্র স্থির হইবার নয়, ওথেলো কহিতেছেন—

"Nor from mine own weak merits will I draw
The smallest fear, or doubt of her revolt;
For she had eyes; and chose me: no, Iago;
I'll see, before I doubt; when I doubt, prove;
And, on the proof, there is no more but this,—
Away at once with love, or jealousy"

কিন্তু অবশেষে ইয়াগোর অনেক বাক্‌-ভঙ্গীতে তবে উহা ওথেলোর মনে কথঞ্চিৎ স্থান পাইল; স্থান পাইবা মাত্র

অন্তর কি ভাব ধারণ করিল, আমরা সেই চিত্রটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"——O curse of marriage,
That we can call these delicate creatures ours,
And not their appetites! I had rather be a toad,
And live upon the vapor of a dungeon,
Than keep a corner in the thing I love,
For others uses"

এই চিত্রটি কেবল আক্ষেপ ও বিষাদের বর্ণে পূর্ণ। আবার দেস্‌দিমনার মুখ দেখিয়া তিনি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন; দেস্‌দিমনাকে আসিতে দেখিয়া কহিতেছেন—

"——Desdemona comes:
If she be false, O, then heaven mocks itself!—
I'll not belive it"

ওথেলো দেস্‌দিমোনার মুখ দেখিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত উহা ভুলিলেন বটে, কিন্তু, দেস্‌দিমনার সহবাস তাঁহার ঘোর যন্ত্রণাকর হইয়া উঠিল; যে বস্তুতে স্বর্গীয় সুখে সুখী, সে বস্তু ঘোর নরক, ইহা সহসা বিশ্বাস হয়না, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সন্দেহ বিদূরিত হয়, ততক্ষণ তাহাতে সুখও হয় না; যে বস্তু যত মূল্যবান্‌, তাহার বিয়োগ ও তত যন্ত্রণাকর; ওথেলোর দেস্‌দিমনার সহবাসে সুখ বোধ হইলনা, ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, তিনি স্বর্গের স্বর্গত্ব প্রমাণের জন্য ব্যাকুল হইলেন; যাহা বিনা তাঁহার জীবন ঘোর অন্ধকার। তিনি পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া ইয়াগোর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—

"Avaunt! begone! thou hast set me on the rack:"

* * *

"I had been happy, if the general camp,
Pioneers and all, had tasted her sweet body,
So I had nothing known: O now for ever,
Farewell the tranquil mind! farewell content!"

* *

"And O you mortal engines, whose rude throats"
The immortal Jove's dread clamors counterfeit,
Farewell; Othello's occupation's gone!"

ইয়াগো তখন কহিতেছেন—

"Is it possible?—My lord—

ওথেলো পুনর্ব্বার ক্রোধভরে কহিতেছেন—

"Villain, be sure you prove my love a whore;
Be sure of it; give me the ocular proof;

বিস্মাদের অন্তঃকরণ এক্ষণে যন্ত্রণায় বিধূমিত হইতেছে; এক্ষণে প্রমাণ ও তৎপরে প্রতিহিংসা।

"Arise, black vengeance, from thy hollow cell!

*

O, blood, Iago, blood!

আমরা আর এরূপভাবে আদ্যন্ত উপাখ্যানের অনুসরণ করিব না, দুঃখান্ত উপাখ্যান কিরূপ ভাবে গভীর এবং গভীর-মূর্ত্তি ধারণ করে আমরা তাহার দুই একটি ক্রম দেখাইলাম। ওথেলো উপাখ্যান শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই সকলের তাহা বিশেষ উপলব্ধি হইবে। ইয়াগো ক্যাসিওর গৃহে দেস্‌দিমনার প্রতি ওথেলো যে প্রণয়োপহার রুমাল প্রদান করেন, তাহা দেস্‌দিমনা ক্যাসিওর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দিয়াছেন দেখাইয়া যে প্রমাণ নিদর্শন করিলেন, এবং ওথেলোর, স্বচক্ষে তাহা দর্শনে, অন্তঃকরণ যে ভীষণতর ভাব ধারণ করিল, তদপরে যে দৃশ্যে, আমরা ওথেলোকে দেস্‌দিমনা হত্যা করিয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে দেখিলাম, তাহা যে কিরূপ গম্ভীর, স্তম্ভন, বিহ্বলকারী, তাহা উক্ত উপাখ্যানের আদ্যন্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন ব্যতীত সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারেনা।

দুঃখান্ত উপাখ্যানের ইহাই প্রকৃতি। ইহা ক্রমে ঘোর এবং ঘোরতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তঃকরণকে একেবারে গম্ভীর, ভার-অবনত, স্তম্ভিত ভাবে বিহ্বল করিয়া ফেলে। আমরা ইহার পর প্রস্তাবে সুখান্ত উপাখ্যানাদির কথা বলিব।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# মেহের আলি।

## প্রথম অধ্যায়।

চট্টগ্রাম সহরের কিঞ্চিৎ উত্তর ভাগে হাট হাজারী ও রামগড় যাইবার রাস্তায় পথিকদের আশ্রয় স্বরূপ এক উদ্যান ও মসজিদ্ আছে উহাকে ঝবঝবা বটতলা কহে। উহার সংলগ্ন পশ্চিমে সীতাকুণ্ড পর্ব্বতের এক ভাগ অতি সন্নিকট দেখা যায়। পূর্ব্ব ভাগে গ্রাম সমূহও হরিৎ ধান্য ক্ষেত্র। উদ্যানের বৃক্ষ গুলি প্রাচীন, তাহাতে পরগাছা সমূহের অপূর্ব্ব ফুল দলে শোভমান আছে। রৌদ্র-পীড়িত পথিক এই স্থানটীকে অতি মনোহর দেখেন। উদ্যানের ছায়া অতি শীতল। মধ্যে যে উপাসনালয় আছে তাহাতে মুসলমান পথিকগণের বড় সাহায্য হয়। নিকটে এক ক্ষুদ্র স্বচ্ছবারি পুষ্করিণীও আছে। স্থানটী নির্জ্জন বটে। একটী

মাত্র ভগ্ন আপনি ঐ স্থানের রক্ষক; উহাও ঐ মসজিদের মোল্লার দোকান। সময়ে রাস্তার ধারে পথিকমণ্ডলী এবং দুই একটী বনগামী রাখাল ও কাঠুরিয়া ভিন্ন তথায় জনাগম নাই।

একদা দিবা প্রহরেক গতে কতিপয় দেশীয় মুসলমান ঝবঝব্যা বটতলায় মণ্ডলীকৃত ভাবে উপবেশন করিয়া আগ্রহের সহিত কি পরামর্শ করিতেছে। অপেক্ষাকৃত প্রধান এক ব্যক্তি মৃণ্ময় গুড় গুড়িতে তামাক টানিতে টানিতে বাকর আলি নামক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বুঝিয়াছিস্ যাহা বলিতে হইবে, ভুলিস না। আর যদি এমন কথা জিজ্ঞাসা করে যাহা শিখান হইল না, বলিস্ মনে নাই।" বাকর কহিল "আমি ভুলিবার পাত্র নহি,—আমায় ত বরাবর পরক করে দেখেছ? কিন্তু যদি জমীর চৌহদ্দীর চৌহদ্দী জিজ্ঞাসা করে কি জবাব দিব?" "যাহা হয় বলিস, তোকে সর্ব্ব শেষে গুজরাইব, তোর কথা খণ্ডন করে কে?"

অপর এক ব্যক্তি কহিয়া উঠিল "ও ভাই মোক্তার! আমিত সব বলিব, কিন্তু আমার জমীদার যে মৌলভির পক্ষে স্বাক্ষী।" "তোর জমীদার তোর কি করিতে পারবে? আমি তোর লাখেরাজ করে দিব ভয় কি? আর তোর জমীদারও স্বাক্ষ্য দিতে আসিবে না, তাহার উপর বেণা কাম্নন জারি করিয়াছি।" আর এক জন কহিল—"আমার চাচাত মিথ্যা কহিবার লোক নহেন, আর তিনি স্বাক্ষ্য দিলে আমাদের সকলের ভর ভাঙ্গিবে।"

মোক্তার ভ্রমরবৎ দশন-পংক্তি বিকশিত করিয়া চক্ষু ও কপোলের শিরা সকল কুঞ্চিত করিয়া বিকট হাস্য হাসিলেন, পরে অল্পকেশময় দীর্ঘ পক্ক শ্মশ্রু দন্তে দন্তে আবদ্ধ করিয়া মস্তক চালন করিয়া কহিলেন "শর্ম্মা আট ঘাট বেঁধেছেন! তাহারও উপর বেণা কাম্নন জারি হইয়াছে। তিনবার গত বৎসর তাহার ঘর জ্বালা হইয়াছে, আর রাঙা ঘোড়া ছুটিবার কি ভয় করিবে না? যেই দ্বারের বেণাটী প্রাতে উঠে দেখিবে, আর আদালতে স্বাক্ষ্য দিতে সাহস করিবে না।"

মোক্তারের শিক্ষা শেষ হইল; তখন তিনি যাহাকে যাহাকে যে যে বিষয়ে স্বাক্ষ্য দিতে হইবে, সংক্ষেপে স্মরণ করাইয়া মেহের আলি নামক এক ব্যক্তিকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন "মেহের তোকেত হাজিরই করিব না। যদি আদালত জিদ করেন কোন এক উকীলের পোষাক পরাইয়া দিব। তুই গম্ভীর ভাবে বড় মানুষের ন্যায় এই এই কথা বলিবি। তুই আর বৎসর রেঙ্গুন গিয়া টাকা রোজকার করে এনেছিস, মোবারক ও মাহামুদ আলি তোর সঙ্গী ছিল ও-জানে। সেই টাকায় নীলামে জমী কিনিবার জন্য আমাকে বলেছিলি, এবং ঐ জমীটা নীলাম সময় হাজির হয়ে

২০০ টাকা গাণ দিলি পরে বাকী টাকা [illegible] এ সকলের [illegible] আলি গাইদী নবিস। পরে তুই জমী দখল লয়ে দখলীকার আছিস তাহার স্বাক্ষী মকবুল ও বাকর আলি, চোয়াজিদ্ চাষী। মৌলভির পুত্র মেহের আলি শিশু, সে টাকাই বা পাইবে কোথা, কি করেই বা নীলাম কিনিবে? আর তাহার দখল নাই, বয়নামা নাই। আর মৌলভির সঙ্গে যে তোর বিবাদ আছে তাহার স্বাক্ষী আবদুল ও আকবর আলি ও আমি। আর যত বিশেষ কথা. জিজ্ঞাসা করিবে, তুই বলিস তোর গমস্তা ফজর আলি জানে, তুই বিদেশে থাকিস্ জানিস্ না। কি বলিবি বল দেখি?"

মেহের ঢোক্ গিলিতে গিলিতে কতক কতক বলিল, মোক্তার সংশোধন করিতে লাগিলও সাহস দিতে লাগিল। মোক্তার একটী বৃক্ষের শিকড়ের উপর বৃক্ষে ঠেস দিয়া এবং পথকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া ছিল; মধ্যে মধ্যে বক্র হইয়া কে আসিতেছে না আসিতেছে দেখিতে ছিল। এমত সময় একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অনুচর সহ পথে দৃষ্টিগোচর হইলেন। ঐ ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে মোক্তারের মুখচক্র দৃষ্টে বিরক্তি ভাবে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইলেন। উদ্যানের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দাঁড়াইয়া জনৈক অনুচরদ্বারা মোক্তারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মোক্তার অনিচ্ছা স্বত্বেও আহ্বান অবহেলন করিতে পারিলনা। উত্তরীয় বস্ত্র মস্তকে জড়াইতে জড়াইতে ঐ অভ্যাগত ব্যক্তির সম্মুখে ক্ষুদ্র এক সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

উভয়ের আকার প্রকার সম্পূর্ণ বিসদৃশ। অভ্যাগত দীর্ঘকায়, শুভ্র, সম্ভ্রান্তবেশধারী. মোক্তার খর্ব্বাকৃতি, ইতর, মলিনবেশযুক্ত। একের শ্বেত বিস্তারিত শ্মশ্রু প্রকৃত আরব আদলের আনন শোভমান ও শ্রদ্ধাবান্ করিয়াছে; মোক্তারের মসী ফ্যাসনের বিশ্রী মুখ গাছকতক ক্ষুরে পশ্বাকৃতি ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। অভ্যাগত ভদ্রোচিত স্থির নয়নে আপাদ মস্তক স্বীয় ঘৃণ্য সমকক্ষকে দেখিলেন. ভয় ও ঘৃণা যুগপৎ আননের ভাবে প্রকাশিত হইল। মোক্তার সে দৃষ্টি সহ্য করিতে অক্ষম, চক্ষু মিট্ মিট্ করিতে করিতে অধোবদনে রহিল। অভ্যাগত কহিলেন, "আসগর আলি, এই পাহাড়ে তুমি গোচারণ ও ইন্ধন বহন করিতে, স্মরণ হয়? এই মসজিদে যেরূপ কাতর ভাবে আমার আশ্রয় চাহ মনে হয়? আর এই বৰ্দ্ধিত দেহ, এই বিদ্যাবুদ্ধি, এই অহঙ্কৃত মোক্তারী কাহা কর্ত্তৃক মনে হয়? বল দেখি আসগর, পিতার ন্যায় তোমাকে স্নেহ করেছি কিনা?"

আসগর মুখটী তুলিলেন, বসন্তচিহ্নে বিকৃত নাসিকায় আলোক পাতে কদর্য্য মূর্ত্তি বিকাশিত হইল, মুখটী প্রকৃতিঅনুযায়ী সঙ্কুচিত করিয়া কহিলেন "আপনি

এমন অনেককেইত মানুষ করিয়াছেন!" বলিয়া মস্তক ঘুরাইয়া পুনঃ অধোবদন হইলেন। কথার ভাব এই যে, মোক্তার নিজগুণেই সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অভ্যাগতের সাহায্যে বহুতর লোক প্রতিপালিত হইয়াছে আর কেহ ত তদ্রূপ হয় নাই। কথার ভঙ্গীটী ভাল নহে অভ্যাগত জানিয়াও উপেক্ষাভাবে বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।

"আসগর, তোমায় ভাল বাসিতাম, বিশ্বাস করিতাম; এজন্য আমার যথা সর্ব্বস্ব তোমার হস্তে রাখিয়া ছিলাম। অবশেষে জানিলাম তুমি সে স্নেহ, বিশ্বাসের পাত্র নহ,—তাই কর্ম্মচ্যুত করিলাম। তজ্জন্য তুমি আমার কিনা অনিষ্ট করিয়াছ! একেত কর্ম্মে থাকিতে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছিলে, আবার কর্ম্ম পরিত্যাগে প্রতিহিংসায় আমার বহুতর সম্পত্তি ধ্বংস করিতে বসিয়াছ। বল দেখি ইহাতেও কি আমি তোমার অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়াছি? তোমার বিশ্বাসঘাতকতা, তঞ্চকতা কতবার প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে যথেষ্ট দণ্ড দিতে পারিতাম। তাহা করা দূরে থাকুক বরং যখন বিপদে পড়িয়াছ আমি বাঁচাইয়াছি। এক্ষণে আমার পুত্রের যৌতুক সম্পত্তি হরণ জন্য কৌশল করিতেছ। কেন এত দুরভিসন্ধি কেন এত দুর্ব্বুদ্ধি? বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়, অনুগত হও, এখনও ক্ষমা করিব।"

যেরূপ তেজস্বীভাবে এই কথা গুলি বলা হইল, বক্তৃতাকারকের আকার প্রকার অবস্থাও ভদ্রতার সহিত তাহার বিলক্ষণ সামঞ্জস্য হইয়াছিল; মোক্তার যে তাহার প্রত্যুত্তর দিবে আশা করা যায়না। কিন্তু আসগরআলি মোক্তার, অভ্যাগতের ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি, অবস্থা ও ভদ্রতায় শ্রেষ্ঠ না হউক, দম্ভে ও দৃঢ়তায় কোন রূপে ন্যূন নহে। বসন্তবিকৃত বিস্তারিত নাসিকা পুনশ্চ পরিদৃশ্যমান হইল, গ্রীবা সুদৃঢ় হইল ও একটী একটী চর্ব্বিত কথায় মোক্তার কহিল "বিশ্বাসঘাতকতা কি করিয়াছি? আপনার স্বার্থসাধন জ্ঞানীর কর্ম্ম, নির্ব্বোধে তাহাকে যাহা বলুক। এক পক্ষেই কি বিশ্বাসঘাতকতা? আমার গুণে আপনার ধনসম্পত্তি কি রক্ষিত হয় নাই, আমার ক্ষমতায় কি আপনার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয় নাই? আমাকে কি অমনি প্রতিপালন করিয়াছেন? আমার মূল্য যে কি, তাহা দেখিতেছেন আরও দেখিবেন! আমার গুণের প্রতি কি আপনি কৃতজ্ঞ? তবে কেন বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ দেন? জানেন না আদালত আছে, হুরমতের নালিশ চলে? মৌলভি সাহেব! আর আমি আপনার চাকর নহি, একটু সাবধানে কথা কহিবেন।"

মৌলভি অধীন ব্যক্তি হইতে কখনই এত কটু ভাষা শুনেন নাই; মোক্তার হইতে এমন দুঃসাহসিক বক্তৃতা আশা করেন নাই। ক্রোধে অভিমানে তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, উরুদ্বয় কম্পিত, অধর অশ্বত্থপত্রবৎ বিকম্পিত, চক্ষুদ্বয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। এই

ক্রোধের ফল কি হয় আশঙ্কা করিয়া একজন অনুচর মৌলভির কাণে কাণে কহিলেন "মহাশয়! মোক্তার ইতর লোক, দুষ্ট লোক, তাহার দলবল সঙ্গে। এখানে স্বীয় সম্মান অনুরোধে সাবধান হইবেন"। মৌলভি বুঝিলেন, অধোমুখে রহিলেন, দুই এক ফোটা অশ্রুপাত হইল, দুঃখে নহে, ভয়ে নহে, অভিমানে। পরে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে মোক্তারের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আবর্জ্জনা মধ্যে কাল সর্প দেখিলে ভৃত্য যেরূপ সম্মার্জ্জনী হস্তে ভাবে মারি কি না মারি—ইচ্ছা ও ভয়ে সংগ্রাম হয়—মৌলভি মোক্তারের নবভাব দৃষ্টে সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে অনুচরের পরামর্শও মোক্তারের শেষ কথা মনে লাগিল, মৌলভি সাবধান হইলেন।

আসগর এতক্ষণ মুখ তুলিয়া দেখিতেছিল মৌলভি কি করেন। তাহার ভয় ছিল না, বরং তিনি ছল প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাঁহার সেই খর্ব্ব দেহে, মলিন বেশে, বিকৃত আননে ও সঙ্কুচিত লোচনে এক প্রকার তেজ ছিল, যাহা মৌলভির ক্রোধের ন্যায় প্রদীপ্ত নহে; কিন্তু বিলক্ষণ দৃঢ় ও স্থায়ী। মৌলভির কোপ প্রধূমিত প্রজ্জলিত ও নির্ব্বাপিত হইতে সকলে দেখিল; কিন্তু মোক্তারের ক্রোধ কখন হইল—আছে কিনা, গেল কিনা, কেহ জানিল না। তবে মোক্তার কিয়ৎক্ষণ আপন প্রথার বিপরীত মস্তক উন্নত করিয়া স্থির ভাবে রহিল দেখা গেল, এবং অনেক পরে মস্তক নামাইয়া শ্মশ্রু দন্তে দন্তে চর্ব্বণ করিতে লাগিল দেখা গেল। সে যেরূপ নির্ভীক ছিল মৌলভির সমকক্ষ হইতে যে তাহার কোন সঙ্কোচ ছিলনা প্রকাশ পাইল।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মৌলভি কহিলেন "ভাল আমাকে না মান, ঈশ্বরকে ভয় করিও! এত ঔদ্ধত্য অসহ্য।" এমন সময় একজন ব্যক্তি আসিয়া মৌলভিকে কহিল স্বাক্ষীরা কেহ আসিল না, আসিবে না; মোক্তার প্রত্যেকের ভবনদ্বারে গৃহদাহচিহ্নস্বরূপ বেণা রাখিয়া দিয়াছে। মৌলভি উত্তপ্ত হইয়া মোক্তারকে কহিলেন "মনে করিয়াছিস কি! হাকিম কি এত মূর্খ তোর কৃত কার্য্য বুঝিবেনা! তিনিও একজন মৌলভি এবং ধার্ম্মিকও বটেন, সয়তানের কুহকে পড়িবার লোক নহেন, দেখিস্ তোর কি দুর্দ্দশা হয়, এবার আর ক্ষমা নাই"।

"দেখিব" মোক্তার মুখভঙ্গী করিয়া তাচ্ছিল্য ভাবে কহিল। মৌলভি যেন শুনিতে পাইলেন না এই ভাবে দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। মোক্তার দ্বেষের সহিত মৌলভিকে দেখিতে লাগিল; পরে ধীরে ধীরে মনে মনে আপনাকে জয়ী স্থির করিয়া, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে দল মধ্যে প্রবেশ করিল।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেই দিবস অপরাহ্ণে সেই ঝবঝব্যা

বটতলার ভগ্ন আপণির সম্মুখে রাজপথের উপর সেই সম্ভ্রান্ত মৌলভি এক চৌকীতে বসিয়া আছেন। ভৃত্য পিত্তলের গুড় গুড়ীতে তামাক দিয়া ফুৎকার দিতেছে; এক জন দীর্ঘ ছত্র গুটাইয়া তদলম্বনে দণ্ডায়মান আছে এবং দোকানী কিঞ্চিৎ কুব্জ হইয়া মৌলভি সাহেবের কথা শুনিতেছেন। মৌলভি সহচর এক ব্যক্তি এবং দোকানীর সহিত মকদ্দামা পরাজয়ের অবস্থা বলিতেছেন। অন্যায় করিয়া মোক্তার তাঁহার প্রধান সম্পত্তি হরণ করিল পরিতাপ করিতেছেন। মধ্যে দোকানী পরিতাপ করিতেছে ও আদালতকে নিন্দা করিতেছে।

মৌলভি নিকটস্থ কুলগাম গ্রামের প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি দয়া ধর্ম্ম ও ধন ঐশ্বর্য্যে সুবিখ্যাত। কুল গ্রামের আমীর আলি মৌলভির ভদ্রতা ও বদান্যতায় উপকৃত হয় নাই ঐ অঞ্চলে এমত লোক নাই। তাঁহারই নিজ ভৃত্য আসগর আলি মোক্তার যে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ ও সর্ব্বনাশ করিবে কেহ অনুভব করে নাই। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিষয় মোক্তার নষ্ট করিয়াছে কিন্তু এবার তাঁহার একটী প্রধান সম্পত্তি নষ্ট হইল। তিনি মোক্তার দ্বারা প্রভূত অর্থে আপন বালক মেহের আলির নামে একটী তালুক ক্রয় করেন। মোক্তার অপর এক জন মেহের আলি নাম ধারীকে উঠাইয়া তাহা হরণ করিল। মৌলভি অনেক বলিলেন হাকিমের মন ফিরিল না। বেণা কানুন ভয়ে মৌলভির সাক্ষী আসিল না ও মোক্তার জয়ী হইল।

এখন আমীর আলি মৌলভি সাহেবের চেতনা হইল যে, মোক্তার সামান্য শত্রু নহে, আর আদালত সামান্য স্থল নহে। সত্য ধর্ম্ম ও ন্যায় থাকিলেই যে সংসারে নির্ব্বিঘ্নে থাকা যায় তাহাও নহে। এখন বুঝিলেন ক্রমে ক্রমে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব গিয়া তিনি নিঃস্ব হইতে পারেন। এই চিন্তায়, তাঁহার অত্যন্ত ক্ষোভ হইয়াছিল কিন্তু তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। সুতরাং ধর্ম্মপথে থাকিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফকিরী আশ্রয় করিতে হয় তাহাতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

এমত সময় আসগড় আলি মোক্তার দলবল সহ উপনীত হইল; মৌলভিকে দেখিয়া বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিল। তথা হইতে শুনিতে পাইল মৌলভি কহিতেছেন "ভাল, কালের গতিকে যদি সর্ব্বস্ব যায়, মনের সুখ লয় কাহার সাধ্য? ও পাষণ্ডের মনের সুখ দেয় কাহার সাধ্য?" আসগর কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিল, "হয়েছে কি? যাহা আছে সব যাবে! ভিটায় পুকুর হবে! তাহাতেও মনের সুখ যাইবে না? যাহাতে মনের সুখ যায় আসগরের তাহাও সাধ্য আছে! আসগরের শুভ অদৃষ্ট কে খণ্ডন করিতে পারে?"

মৌলভি সাহেব যেন শুনিতে পাইলেন না, সহসা উঠিয়া গ্রামাভিমুখে গেলেন। মোক্তার শ্মশ্রু উল্টাইয়া দন্তে দন্তে

ধরিলেন ও বিকট হাস্যে কহিলেন 'দেখিলে বাবা! আসগরের বুদ্ধি কৌশল। মানুষে মানুষের যাহা করিতে পারে, পৃথিবীতে যত দুঃখ ক্লেশ আছে, আসগর হইতে তাহার স্বাদ পাইবে বিলম্ব হইবে না।" পথিক দুই এক জনের হৃৎকম্প হইল, দলস্থ লোক কহিল সাবাস ভাই।

মোক্তারের দলবল লইয়া গামে যাইতে সন্ধ্যা হইল। সহসা এক জন অন্ধকারে মোক্তারের হাত ধরিল। মোক্তার চীৎকার করিল, সঙ্গীলোক পলাইল. কারণ এদিক ওদিক দুই জন অন্ধকারে তাড়াইয়া আসিতেছিল দেখিল। আততায়ী মোক্তারের কর্ণ ধরিয়া এমত ঘুরাইল যে সে মনে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে বুঝিল, মৌলভির পুত্র মেহের আলির ভৃত্য, ঐ মকদ্দমা পরাজয় জনিত কোপ প্রতিশোধার্থ আসিয়াছে। মোক্তার কাপুরুষ, প্রাণের ভয় অনেক করে. কারণ সংসারে অনেক সুখ ভোগ তাহার কল্পনা পথে রয়েছে। বুদ্ধি পূর্ব্বক কহিল, "মুরাদখাঁ! আমীর আলির গ্রহ-বৈগুণ্য হইয়াছে, বৃথা তৎপক্ষ সমর্থনে লাভ কি? আমার কাছে আয় তোকে ভাল চাকরী দিব।" মুরাদ উত্তর না করিয়া মোচড়টা দৃঢ়রূপে কসিয়া দিল, আসগর কুব্জ হইয়া পড়িল, এমত সময় চতুর্দ্দশবর্ষীয় একটী বলিষ্ঠ বালক আসগরের বক্ষঃস্থলে এক পদাঘাত করিল। আসগর ভূতলে অজ্ঞানবৎ পড়িল।

ঐ অবসরে বালকটী তাহার বক্ষঃস্থলে বসিয়া দুই হস্তে আসগরের গলদেশ এমত চাপিয়া ধরিল যে তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তপূর্ণ, জিহ্বা বহির্গমনোন্মুখ হইল এবং শরীর-গ্রন্থি শিথিল হইল। আসগর এতক্ষণ ভাবিয়া আসিয়াছিল, মনের আশা পূর্ণ হইল, মৌলভির ঐশ্বর্য্যে অবিলম্বে সুখভোগী হইব এবং মৌলভিকে সবংশে নিপাত দেখিয়া আহ্লাদিত হইবেন; এক্ষণে আপন অন্তিম দশা ভাবিয়া হতাশ হইলেন। করেন কি? না হস্ত উত্তোলনে সক্ষম না বাক্যস্ফুরণে সক্ষম মুরাদ খাঁ তাহার হস্তদ্বয় মস্তকের উপর দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে, আর এক জন পদদ্বয় ধরিয়াছে। তত্রাপি আসগর অঙ্গ দোলাইয়া বক্ষঃস্থ বালককে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

এমত সময় মৌলভি সাহেব সমুপস্থিত। আসগর ভাবিল এইবার গেলাম। মৌলভি আসিয়া বালকের হস্ত ধরিয়া তুলিলেন ও কহিলেন "ধিক্ মেহের আলি! তুমি অদ্যাপি সুবোধ হইলে না? সয়তানের দণ্ড আমাদের নিজ হস্তে লওয়া কি উচিত? আমার কথা অবহেলা করো না, নরহত্যা মহাপাতক।" মৌলভির কথায় আসগর মুক্তি পাইল, এবং জনৈক আততায়ী মৌলভির আদেশে জল লইয়া তাহার মুখ চখে দিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। মৌলভি কহিলেন "খোদা তোমায় ক্ষমা করুন! আসগর পরের মন্দ ইচ্ছা করিও না।" আসগর অধোবদনে বসিয়া রহিল। মৌলভিপুত্র

মেহের আলিও ভৃত্যগণ লইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি পুত্রকে না দেখিয়া অনিষ্টাপাত আশঙ্কায় এতদূর এসেছিলেন। শত্রুই হউক, তথাপি এক জন নরের হত্যা নিবারণ করিলেন ভাবিয়া হৃষ্টমন হইয়া গেলেন।

সেই রজনীর অৰ্দ্ধভাগে কুলগ্রামের দক্ষিণ মাঠের মধ্যে যে এক ক্ষুদ্র সমাধি স্থল আছে, তাহার উপর তিন জন ব্যক্তি জ্যোৎস্নালোকে উপবিষ্ট ছিল। এক জন ঐ আসগর আলি মোক্তার, আর এক জন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফজর আলি এবং তৃতীয় আসগরের দলস্থ স্বাক্ষী বাকর আলি। আসগর কহিল "আমীর আলি মৌলভির সর্ব্বনাশ না করিলে আমার পৃথিবীতে থাকায় সুখ নাই। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহার ভিটায় পুষ্করিণী দিব; সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিব, তাহার স্ত্রীকে কাড়িয়া লইব এবং তাহার দুর্দ্দান্ত বালক মেহের আলির প্রাণবধ করিব; যদি তোমাদের বল বুদ্ধি থাকে, সাহস থাকে, আমার সহিত সত্য কর, শপথ কর।" বাকর কহিল "ও ভাই মোক্তার তুমি জান মৌলভির বিরুদ্ধে বাক্য দিয়াই আমার শরীর, আর তোমার প্রসাদেই আমার সংসারসুখ। আমাকে তুমি যাহা বলিবে অনাপত্তিতে করিব তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মৌলভির বাঁদী গুলি আমায় দিবে?" আহ্লাদে হী হী করিয়া বাকর হাসিল, জ্যোৎস্নায় তাহা বিকট দেখাইতে লাগিল। মোক্তার কহিল যদি আমার আশ্রয়ে থাক, তোমার কোন আশা অপূরণ থাকিবে না। এক্ষণে ফজর আলি কি বল?"

"চাচা! তোমায় আমায় কি ভিন্ন? তোমার অবমাননা যে করেছে, তোমার প্রাণবধ করিতে যে উদ্যত হইয়াছিল, সে কি আমারও পরম শত্রু নহে? আমার একটী ভিক্ষা (তুমি শ্বশুর হও রাগ করিও না) শুনেছি আমীর আলি মৌলভির ভাবী পুত্র-বধূ মেহেরউন্নিসা নাকি বড়ই সুন্দরী ও বিদ্যাবতী; আমি তোমার কন্যা আমীর জানকে অবহেলা করিব না, তবে মেহেরকে নিকাহা করিতে পাই এমন করিবে।" আসগড় ঈষৎ হাসিয়া কহিল এর জন্য এত কেন। সে তোমারই রহিল। আর বিষয় কার্য্য জন্য কি এক কন্যার অনুরোধ কেহ মানে? প্রতিজ্ঞার জন্য, প্রতিপত্তির জন্য, শত কন্যা বলি দেওয়া যায়।"

তখন তিন জনে আপন আপন দক্ষিণ হস্ত একত্র করিয়া একটী গোরের উপর রাখিল। বাম হস্তে মুখ ও দাড়ী বুলাইয়া কল্‌মা পড়িল এবং কহিল "আমরা যদি যথার্থ মুসলমান হই ও যথার্থই গোলামনবী পীরের আওলাদ হই, এই পীর সাহেবের গোর স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তিন জনে একমন্ত্রীওএকহৃদয় হইব, আমীর আলি মৌলভির সর্ব্বস্ব নাশও সবংশ ধ্বংশ করিব, করিব, করিব, করিব।" তিন জনে গভীর নার-

কীর স্বরে সমস্বরে বলিল "আমাদের গোর পর্য্যন্ত এই শপথ রহিল।" সকলে একটু একটু কবর মৃত্তিকা বস্ত্রে বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

কুলগ্রামে আমীর আলি মৌলভির ভবন অতি বিস্তীর্ণ ও অপেক্ষাকৃত শোভমান ছিল। সম্মুখে একটী অঙ্গন; তাহাতে একটী স্বচ্ছবারি দীর্ঘিকা, তাহার উপর উভয় পার্শ্বে এক এক বাঁধা ঘাট ছিল। পশ্চিমে উপাসনালয় ও পূর্ব্ব-পার্শ্বে চিড়িয়া খানা ও পশ্বালয় ছিল। উত্তরে এক অঙ্গনে গৃহপালিত পশ্বাদি ও পক্ষী সমূহ ও ধান্যাদি ছিল। তাহার উত্তর পার্শ্ব সুদীর্ঘ এক দেউড়ী ঘর ছিল; তদুত্তর বহিরঙ্গণও তদুত্তর ঝলি পার্শ্বে অন্তঃপুর অঙ্গন। বহিরঙ্গণের একপার্শ্বে বৈটক খানা, একপার্শ্বে গৃহ মসজিদ। অন্তঃপুরে একটী আওলা সহ বড় ঘর ও দুই চারিটী চালা ঘর ছিল। অন্তঃপুরে এক ধারে ঝলি ঘেরা পুষ্করিণী ও এক ধারে বাঁদী গোলামের বাস সমূহ। সমস্ত ভবনের চতুর্দ্দিকে গড়খাই জল।

ঐ সকল ঘরের আর চিহ্ন নাই, মোক্তারের ডিক্রীজারিতে তাবৎ ভগ্ন ও নিলীন হইয়াছে। দেউড়ী হইতে বড় ঘর পর্য্যন্ত যে স্থান ছিল তাহাতে এক পুষ্করিণী খনিত হইতেছে। শত শত খননকারী নিযুক্ত হইয়াছে। একদল, যেখানে বড ঘর ছিল ঠাওরাইয়া খুড়িতে আরম্ভ করিল। একজন সোৎসাহে কোদাল পাড়িতে পাড়িতে দলস্থ এক ব্যক্তিকে সম্বোধিয়া কহিল "ওবা জাফর গ্যা, এস্তে আইয়ো, মৌলভি সাহেবের বড় ঘর কোপা, টেঙ্গা পাইবি।"

জাফর কহিল, "হাঁচা? কোস্তে বড় ঘর আছিল? কোন্যা মৌলভি সাহাব?"

যে প্রথম সম্বোধন করে তাহার নাম রমজু খাঁ। রমজু কহিল;

"দুর অভাগ্যির ফুত, মৌলভিকে নজানিসনা? ঐ যে মসজিদে আছে ঐ সাহাব।"

জাফর। "য্যা! ওর টেঙ্গা কোডে? টেঙ্গা থাকিলে আর জারিতে ঘর যায়? সব ঝুট বাত।"

রমজু "আহাহা! মৌলভি বড় জাইন্টু মান আছিল, ওই দুকোণার দুই থাম্বা মৌলভির দেউড়ীর আছিল, ডাঙ্গর দেউড়ী, আর বড় ঘর যে আছিল দুহাজার টেঙ্গা দাম। ১০ হাজার টেঙ্গার জিনিস আছিল। কল্ পেঁছপীড়া খুঁড়ি মনা এক আঁড়ি টেঙ্গা পাইয়ে। বাঁদীর ফুত ফজরগ্যা বাড়ি লইয়ে। আগ্রি দুগা মোহর পাইই ফজর গ্যা টের নপাইয়ে। আজ্ঞি মৌলভিকে দিই মৌলভি ন লইয়ে, একগো জোর করি তার পোয়াকে দিই, একগোয়। আগ্রি রাক্কি।"

জাফর। মৌলভিকে দিল্ ক্যা?

রমজু। মৌলভির ধর্ম্মের টেঙ্গা যে

লইবে মরিবে। আনিয়া ঘোড়া লুকাইয়ে, আজ অব হইয়ে কি হয়!

জাফর। টেঙ্গা আছিল ত মৌলভি ন দিইল কা, ঘড় বেচাইয়ে কিএর লাই?

রমজু। চোরা করি আসগরগ্যা নীলাম করাইয়ে; মৌলভি টেঙ্গা দিইল হাকিম ন লইয়ে। আসগরগ্যা বড় সয়তান! মৌলভির খাইয়ে মানুষ মৌলভির চাকর আছিল, এখন মৌলভির নামে মিছে মকদ্দমা করি সব কাড়ি লইছে। মৌলভি ভাল লোক, কিছু ন কয়। মসজিদ দেবতার বলি ডিক্রী ন হয়, মসজিদে মৌলভি আছে।

জাফর। উহার কিছু ন আছে?

রমজু। ওম্মারে মা! এখনও ওঁয়ার একগোয়া লাক টেঙ্গার জাঁহাজ মক্কায় আছে। ১০ হাজার ঠেঙ্গার জেওয়ার আছে আর কিছু জমীদারী আছে। সব হাত লাগছে না; যখন ওই যে মোক্তার-গ্যার মাথা খাইবে। মৌলভির পোয়ার বড় জোর। পোয়া আমরাকে মারিতে আস্যে, অঞ্চি অনেক সমঝাই আমরা গাবুর; বুড়ো আর কিছু ন কয়। পোয়া ডাঙ্গর হইলে আসগর গ্যার মুণ্ড চিবাইয়ে খাইবে; আর ঐ দিঘিতে যে মাটী ফেলিতেছি উঠাইয়ে এ পুকুর বুজাইবে।'

জাফর। মৌলভি তবেত কম লোক নয়। এখনও এত বিষয় আছে? রমজু কহিল "মৌলভিত এখন ফকীর হইয়ে; আগে ১০০ গোলাম আছিল, সব পলাইয়ে। দুগা হাতী, দসস্যুয়া ঘোড়া জানয়ার ঢের আছিল; গয়াল, কাল-সার হরিণ, ময়ূর, কয়লা নাম জানে কনে? রোজ শওয়া লোক ঐ মসজিদে ফকীর গরিব আসিত। ধর্ম্মের সংসার এমন হইবে কনে জানে? আসগর গ্যা জাহান্নমে যাক" বলে জোরে কোদাল ফেলিল।

এমত সময় মোক্তারের ভ্রাতুষ্পুত্র ফজর আলি, যে কোড়া খাটাইতেছিল, আসিয়া কহিল "দেখিস্ রমজা যা পাবি আমাকে দেখাবি! তোদের বকসিস দিব।" রমজা চুপি ২ কহিল "তোর মাথা দেখায়ম্ বাঁদীর পুত" প্রকাশ্যে কহিল "আঁওরার কিসমতে ত কিছু ন আছে, আঁওরাত একগোয়া কড়ি ও ন পাই, বুড়া-মিঞা সব লই গিয়ে।"

মোক্তার গোপনে মৌলভির ভবন নীলাম করায়: যে দিবস ভবন ভাঙ্গিতে আসে মৌলভি টাকা লইয়া আদালতে যায়; কিন্তু কোন মতেই নীলাম রহিত হইল না। মৌলভি অগত্যা সপরিবারে মসজিদে গিয়া রহিলেন। মৌলভির এখনও কিছু কিছু জমী আছে প্রজাও আছে, তাহারা মোক্তারের প্রতিশোধ লইতেও পারিত, কিন্তু মৌলভি সয়তানের দণ্ড নিজ হস্তে লইবেন না, সুতরাং তাঁহার অনুগতেরা হতাশ হইল। মোক্তার দেখিল মৌলভি কিছু করিতে পারিলনা, পরে ঐ ভবন স্থলে পুষ্করিণী খুঁড়িয়া উত্তম দীর্ঘিকাটী ভরাট করিল। তাহার প্রতিজ্ঞা কিয়দংশে সিদ্ধ হইল।

মৌলভি স্ত্রী পুত্র লইয়া মস্‌জিদে আছেন, কোরান পড়েন ও সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে ভাবেন ও উপদেশ দেন। তাঁহার বিচরণ স্থল পার্শ্বস্থ কবর ভূমি। ঐ দিবস অপরাহ্নে মৌলভি ও তাঁহার উকীল মুন্‌সী মাগন দাস উভয়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

মৌলভি কহিলেন "মুন্‌সী সাহেব, আর আমাকে মকদ্দামার উপদেশ দিবেন না, আমি দুনিয়া-দারীতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছি। আমার যাহা ছিল গিয়াছে যাহা আছে বিদায় করিতেছি। কেবল মাত্র স্ত্রীর অলঙ্কার ও জাহাজটীতে হাত দেই নাই; যত দিন জীবিত থাকিব বিবিকে কষ্ট দিতে পারিবনা। আর পুত্রটীকে সঙ্গে রাখিব নচেৎ সে বড় দুর্দ্দান্ত কখন্ কি ক'রে বসিবে। মাগন দাস অনেক বুঝাইলেন যে, সংসারী লোকের পক্ষে ফকির হওয়া দুষ্কর। স্ত্রী পুত্র কোথায় ফেলিবেন? আর ভয়ই বা কি? অলঙ্কার বেচিয়া আর কিছু খরচ করিয়া শেষ চেষ্টা দেখা উচিত। অগত্যা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বিদেশে যাওয়া উচিত। মৌলভি তাহাতেই সম্মত হইলে মাগন দাস কহিলেন তিনি ইচ্ছা করেন ত তাঁহার দেশে পটীয়াতে তাঁহাকে যথেষ্ট স্থল দিয়া বাস করান। তাহাই স্থির হইল, কেবল মক্কা হইতে বিবির জাহাজটী আসিবার ও এখানে যে জমীজিরাত আছে তাহা পুত্রের নামে দান করিবার অপেক্ষা রহিল।

মাগনদাস অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিদায় হইবার কালে মৌলভি তাঁহাকে একটু বসিতে কহিয়া মসজিদ মধ্যে গেলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে হস্তে একটী বস্ত্রমণ্ডিত দ্রব্য আনিলেন। খুলিলে প্রকাশ হইল একটী মখমল ও সুবর্ণ খচিত আবরণে একটী মহামূল্য-রত্নমণ্ডিত ছুরিকা। মৌলভি কহিলেন "মুনসী সাহেব, আপনি আজকাল বিনা বেতনে যে এত সাহায্য করিতেছেন তাহার জন্য বড়ই কুণ্ঠিত ও বাধিত আছি। আমি দরিদ্র হইয়াছি কি করিতে পারি? যাহাহউক আমার স্মরণার্থ এই ক্ষুদ্র বস্তুটী রাখুন।" মুনসী নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন "মৌলভিসাহেব ক্ষমা করুন। আপনার যে কিছু করিতে পারিতেছিনা ইহাতে বড়ই দুঃখিত আছি। যদি আপনার দিন হয় আমার প্রাপ্তির ক্রুটী হইবেক না। এই বস্তু মূল্যবান্ ও সুরুচি-বিশিষ্ট দেখিতেছি। আপনি অবশ্য অনেক সাধ করিয়া ক্রয় করেছিলেন। আমরা শান্ত হিন্দু ছুরিকায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। আপনি উহা নিজের জন্য কি পুত্রের জন্য রাখুন।" মৌলভি ছল ছল লোচনে স্বরভঙ্গ ভাবে বলিলেন—"সত্য বলিয়াছেন এটী আমার সাধের দ্রব্য; আপন বংশ হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিব স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু আমার পুত্র যেরূপ উত্তপ্ত-স্বভাব তাহার হস্তে ইহা ন্যস্ত করিলে কোন্ দিন আত্ম-হত্যা কি নর-হত্যা ঘটিবে, এজন্য ইহাকে বিদায়

করিতে ব্যস্ত আছি। আপনি পৃথিবীতে আমার একমাত্র বন্ধু আছেন, তাই আপনাকে দিতে চাহি! উকাল আর কিছু কহিতে পারিলেন না—কৃতজ্ঞ হইয়া উপঢৌকন লইয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই রজনীতে সেই মসজিদের অভ্যন্তরে মৌলভি এক গ্রাস আহার করিয়া তৃপ্ত বোধ করিলেন এবং আপন স্ত্রীকে সম্বোধিয়া কহিলেন "সত্য কহিতেছি প্রিয়ে! তোমার হাতের কি অনিবর্ব্বচনীয় গুণ, আমি অনেক পোলাও কালিয়ে খাইয়াছি; কিন্তু এমন ঝোল রুটী কখন খাই নাই।" বিবি ঈষৎ হাসিলেন, তাঁহার সুন্দর আনন ইহাতে আরও মনোহর হইল। অমিয় ভাবে বীণা-বিনিন্দিত স্বরে কহিলেন "তুমিত আমার সব ভাল দেখ, তোমার প্রশংসার অনেক বাদ দিতে হয়। আমি কি রাঁধিতে জানি? কিন্তু তুমি ভাল বাস বলে আমার ইহাতে বড় আমোদ। বাস্তবিক যখন ঐশ্বর্য্য ছিল এমন সুখ কখনও পাই নাই। আমিত সুখী আছি, কিন্তু তোমার দুঃখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রিয়তম! আর কেন জিদ কর, আমার অলঙ্কার লও, তুমি পূর্ব্ববৎ হও, নচেৎ এছার দেশ পরিত্যাগ করিব। যখন ভবনের দিকে চাহি ও কোড়াদের দেখি হৃদয় ফাটিয়া যায়। যখন মেহের একাকী বেড়ায় দেখি অন্তরে বড় ব্যথা হয়। আর যখন তুমি ম্রিয়মান হইয়া কবর স্থানে বসে থাক এবং পথিক লোক জন তোমায় সেলাম না করিয়া চলিয়া যায়, আমার দুঃখের সীমা থাকেনা।" বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার দেহ ভাসিয়া গেল।

মৌলভির স্ত্রী অদ্যাপি দ্বাত্রিংশ বর্ষের ঊর্দ্ধবয়স্কা হন নাই। একমাত্র সন্তান হওয়ার এবং চিরকাল সুখে থাকার জন্য তাঁহার বয়স আরও ন্যূন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি গৌরবর্ণা অর্দ্ধগত-যৌবনা ও সুকোমল-আননা। তাঁহার মুখশ্রী অতি মধুর। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও কৃষ্ণবর্ণ তারক-মণ্ডল সর্ব্বদা চঞ্চল। বিশেষত, অশ্রুপূর্ণ হইলে উহা অতি শোভমান হইত। কেশপাশ আর তেমন সুসজ্জিত নাই, তত্রাপি সেই সুশ্যাম সুচিক্কণ কেশে গৌরবর্ণ মুখপদ্ম অতি বিশদ দেখাইতেছে। কপাল, দেশ সুগোল এবং কপোলদ্বয় সুপুষ্ট।

ভ্রূলতা নাসিকা ওষ্ঠাধর চিবুক সুপটু চিত্রকরের অঙ্কিত বোধ হয়। অশ্রুজলে ভাসমান হইয়া সে বদনের এক অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে। গ্রীবা ক্ষীণ অথচ সুগোল এবং কণ্ঠদেশে অদ্যাপি মহামূল্য রত্নহার যথেষ্ট আছে। ক্লেশে ও দুঃখে যদিচ রমণী অতি কৃশাঙ্গী হইয়াছেন তথাচ অদ্যাপি কণ্ঠাস্থি পরিদৃশ্যমান হয় নাই। অঙ্গাবরণের গোলাকৃতি ছিদ্র দিয়া বক্ষস্থলের মধ্যভাগ স্বর্ণ মণ্ডলের ন্যায় প্রদীপ্যমান। সুন্দরী বাম হস্তে আপন পুত্র মেহেরের মস্তক ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে ক্ষুদ্র সুগোল অঙ্গুলিতে কিঞ্চিৎ রুটী ও সুরুয়া লইয়া মেহেরের

মুখে দিলেন। মেহেরের মুখটা অবিকল তন্মাতার মুখচ্ছবির প্রতিবিম্ব বলিলে বলা যায়। সেই বিস্ফারিত কৃষ্ণবর্ণ ঢল ঢলে লোচন, সেই দুগ্ধফেননিভ বিশদ গৌরবর্ণ, সেই সুগোল কপাল সুপুষ্ট কপোল এবং চিত্রলিখিতবৎ ভ্রুযুগল নাসিকা ও বদন। তবে বয়সন্যূনতা হেতু অধিক কমনীয়তা প্রকাশমান। পিতা মাতার দুঃখে মেহেরেরও চক্ষু ছল ছল করিতেছিল।

মৌলভি এক দৃষ্টিতে সেই ছবি দেখিতেছেন। যে সুগোল মণিবন্ধ-সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলিচয় আহারীয় ধরিয়াছিল তাহা দেখিতেছেন, কি যে সুগোল ভুজে মেহেরের মস্তক ধরিয়াছেন তাহা দেখিতেছেন; কি বাম হস্ত উত্তোলনে পরিদৃশ্যমান বাম কক্ষ ও বক্ষঃস্থল তাহারই রমণীয় শোভা দেখিতেছেন, তিনিই জানেন। একবার প্রণয়িনীর চন্দ্রানন, একবার স্নেহময় তনয়ের মুখশ্রী দেখিলেন। চিত্রকর যেরূপ রমণীয় দৃশ্য নিস্তব্ধ ভাবে দেখে, তেমনি মৌলভি সেই রমণীয় ছবিটা দেখিতে লাগিলেন। রমণী কহিলেন "প্রিয়তম! আমার এত যে দুঃখ কিন্তু তোমাকে দেখে ও মেহেরকে স্পর্শ করে সব ভুলি। এক দণ্ড না দেখিলে অন্ধকার দেখি। আজ দুঃখ হইতেছে কি করে তোমায় ফেলে থাকি, কারণ কল্য আমাকে পিত্রালয়ে একবার যাইতে হইতেছে।" মৌলভি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "সহসা পিত্রালয়ে যাইবার হেতু কি?" "আমার ভ্রাতার অন্তিম কাল উপস্থিত। দেখি যদি শেষকালে তাহাকে ধর্ম্মপথে ফিরাইতে পারি; নচেৎ চরমকালে তাহাকে একবার না দেখিলে মনে ব্যথা রহিবে।"

মৌলভি কহিলেন তাঁহার ঐ ঘটনা বিশ্বাস হয় না। তাহার শ্যালক মোক্তারের অনুগত, হয়ত কি এক প্রবঞ্চনা করিয়া বসিয়াছে। রমণী কহিলেন তাহার আশঙ্কা নাই, মিথ্যা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিবেন এবং সে কেন পাষণ্ড হউক না ভ্রাতা হইয়া ভগিনীর কি প্রাণ নাশ করিতে পারিবে? বরং সতর্কতা জন্য অলঙ্কারাদি রাখিয়া যাইবেন। মৌলভি কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার বিচ্ছেদই ভয়, অলঙ্কার যাউক আর থাকুক। অলঙ্কার কাড়িয়া যদি তোমায় ফিরে দেয় এই আমার যথেষ্ট লাভ। কিন্তু মেহের-আলির তোমার সঙ্গে যাওয়া হইবে না, কারণ সে হয়ত এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। নিতান্ত যাইবে যদি বুড়ী বাঁদীকে লইয়া যাও ও শীঘ্র দিনে দিনে আসিবে। আমার বড় ভয় হইতেছে।" রমণী ভ্রাতার অমঙ্গল সংবাদে কাতরা ছিলেন, স্বামীর আশঙ্কা বৃথা ভাবিয়া পরদিবস পিত্রালয়ে গেলেন। কিন্তু সকলি আসগর আলি মোক্তারের চাতুরী। সে মৌলভির স্ত্রী ও বৃদ্ধা পরিচারিকাকে আবদ্ধ রাখিয়া মৌলভির শ্যালকের এক পরিচারিকা দিয়া সংবাদ পাঠাইল, ঐ শ্যালকের পীড়া বৃদ্ধি হই-

রয়াছে, সে রজনীতে মৌলভির স্ত্রী আসিতে পারিবেন না।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

চট্টগ্রাম সহর ও ঝবঝবা বটতলার প্রায় মধ্য ভাগে রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী উচ্চ ভূমি দেখা যায়। তাহার উপর এক মসজিদ স্থাপিত আছে। শ্রুত হওয়া যায় পূর্ব্বে এই স্থানে মুনসেফি কাছারী ছিল। এক জন মৌলভি এখানকার মুনসেফ ছিলেন। কাছারী গৃহটী অতি সামান্য, তাহার মধ্য ভাগে এক খানি তক্তাপোষের উপর একটী লাল রেখাময় পাটী ছিল। পাটীটাতে এত কালি পড়িয়াছে ও এত ধর্ম্ম ও তৈলের চিহ্ন হইয়াছে, যে উহা সতরঞ্চির ন্যায় রূপ ধারণ করিয়াছে। একটী তৈলাক্ত-আবরণ-যুক্ত "(গাদী)" উপাধান মুনসেফের স্থান নির্ণীত করিয়াছে। এক পার্শ্বে পান দান ও পিকদান, এক পার্শ্বে আলবলা। মস্তকে একটী ছিন্ন বিছিন্ন ধূলি ধূসরিত চন্দ্রাতপ। গৃহের চতুঃপার্শ্বে পানওয়ালা তামাকওয়ালা বসিয়া আছে। গৃহের ভিতরে স্থানে স্থানে এক এক চেটাই পাড়িয়া ও দপ্তর লইয়া উকীল মোক্তার ও কাগজ বিক্রীওয়ালা বসিয়া আছে। গৃহমধ্যে লোকে লোকারণ্য ঠেলে যাওয়া ভার। হট্ট অপেক্ষা তথায় গোলোযোগ অধিক। আবার মধ্যে মধ্যে মকদ্দমাবাদীর উত্তরীয়ে শুষ্ক মৎস্য বাঁধা থাকায় তাহারা সৌরভিতও বটে। প্রায় পঞ্চাশৎ মৃন্ময় গুড়গুড়ী চলিতেছে।

এজলাসের, পশ্চাৎ ভাগে একটী সামান্য বেড়া দেওয়া ঘর, সেটি মুনসেফের খাস কামরা। তথায় গামলায় জল আছে, একটী বদনা আছে, পানীর জল জন্য একটী কুজিও আছে এবং নমাজ জন্য একটী বিছানা পাড়া আছে। গৃহের আরও একটী আসবাব আছে, কাষ্ঠের এক তেকাটার উপর এক খানি কোরাণ রহিয়াছে। মুনসেফ যে খোদাপরস্ত তাহার চিহ্ন এজলাস হইতেই জাজল্যমান।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে সহসা জন কএক চাপড়াশ ধারী পেয়াদা আসিয়া ভিড় টেঙ্গাইতে লাগিল। "মুনসেফ সাহেব এত সকালে কেন?" লোকে বলিতে বলিতে পথ ছাড়িয়া দিল। মুনসেফের মাথায় ময়লা পাগড়ী এক কালে উহা আরবী ফ্যাসনের ছিল। মিহী চাপকানে বক্ষঃস্থলের অর্দ্ধেক মাত্র ঢাকিয়াছে, ঢলঢলে ইজারের প্রান্ত ভাগ ধূলি ও ময়লায় কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, সম্মুখে কোঁচার ন্যায় থোবনাওয়ালা ইজারবন্দ ঝুলিতেছে। মুনসেফ পান চর্ব্বণ করিতে করিতে ও একটী ছোট হাত গুড়গুড়িতে তামাক টানিতে টানিতে এজলাসে বসিলেন। উকীলেরা সম্মুখে হাজির হইলেন এবং আমলারা নথি লইয়া চৌকীতে বসিলেন, মুন্সেফ তাকিয়া ঠেস দিয়া বাম হস্তে উদর বুলাইয়া ও দক্ষিণ হস্তে খড়িকা খুঁটিতে-

ছেন ও পিকদানকে ভারগ্রস্ত করণোদ্যোগে গৃহ ফাটাইতেছেন। "আজ বড় আহার হইয়াছে" গম্ভীর ভাবে হুজুর বলিলেন। এক জন হিন্দু উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন "হুজুরের কি আহার হইল?" মুনসেফ দন্ত বিকাশ দ্বারা সহর্ষ ভাব প্রকাশ করতঃ কহিলেন "তোমাদের অবতার ভোজন করিলাম।" মুনসেফের সংস্কার আছে গাভী হিন্দুর দেবতার অবতার। উকীলের মুখ চিরকালই অবাধ্য, উকীল কহিলেন "বড়টা না ছোটটা?" মুনসেফ ছোট বড় অবতার জানিতেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন ছোট বড় অবতার কি?

উকীল কহিলেন "গোস্তাগি মাফ হউক, বরাহ অবতার বড়, কূর্ম্ম অবতার ছোট।" উভয়ই হারাম। মুনসেফ সাহেব তোবা তোবা করিলেন।

রসিকতার হ্রাস জন্যই হউক অথবা কার্য্যের ভিড় প্রযুক্তই হউক তৎক্ষণাৎ কার্য্যারম্ভ হইল। আমলারা দুই এক কথায় বাজে কাজ সারিয়া নথি পেষ করিলেক। কোন্ মকদ্দমা অগ্রে পেষ হইবে প্রথমেই ইহার বিবাদ উঠিল। সেরেস্তাদারের পার্শ্বে এক বিবাদী দণ্ডায়মান ছিল। সে ৩ টাকা নজর মুনসেফ সাহেবের সম্মুখে রাখিল। মুনসেফ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "তিন রোপেয়া? হাম ঘুষ লেতা হায়? উঠাও।" সেরেস্তাদার গা টিপিয়া কি বলিয়া ছিল, বিবাদী আস্তে ব্যস্তে আর দুই টাকা তাহাতে রাখিল। মুনসেফ কথঞ্চিৎ হ্রস্ব স্বরে কহিলেন 'পাঁচ রোপেয়া? হাম ঘুস লেতা হায়? দরিয়ামে ফেঁক দেও।' বিবাদী অপ্রতিভ হইয়া টাকা তুলিল এবং আর দিতে পারিবে না এবং মুনসেফ রাগিয়াছেন বুঝিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, এমত সময় মুনসেফ একজন পেয়াদাকে কহিলেন 'লে যাও উস্‌কো'। বিবাদী ভাবিল তাহাকে বুঝি জেলে দেয়। সেরেস্তাদার কহিয়া দিল 'পেয়াদা যা বলে করিস'। বিবাদী পেয়াদার নির্দ্দেশ মতে খাসকামরায় গামলার জলে ৫ টাকা দরিয়ায় ফেলে দিয়া এজলাসে আসিল। হুকুম হইল কাল মকর্দ্দমা হইবে। বিবাদী অদ্যই বিচার চাহে। সেরেস্তাদার চুপি চুপি কহিলেন 'বেটা আজ যে ডিক্রীর দিন, হাকিম কি তোর জন্য অনিয়ম করিবেন? কাল আসিস।'

একটী বড় মকর্দ্দমা পেষ হইল, এক পক্ষে মুনসী আমজাদ আলি আর এক পক্ষে মুনসী মাগন দাস, উভয়ই প্রধান উকীল। আমজাদ আলি বাদীর পক্ষে, তাহার পার্শ্বে আসগর আলি মোক্তার, তিনিই বাদী। আমজাদ আলি ফারসীতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তাহার স্থূল কথা এই। ধর্ম্মাবতার! এই মকদ্দমায় বাদী আসগর আলি মোক্তার, বিবাদী কুলগ্রামের মৌলভি আমীর আলি। তিনি নিজ দোষে উচ্ছিন্ন গিয়াছেন এবং নিরীহ আসগর আলিকে সর্ব্বদা মকদ্দমা করাইয়া ক্লান্ত করিতেছেন। মৌলভি হুজুরের সদ্বিচারে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব

খোয়াইয়াছেন আর কি তাঁহার প্রভুত্ব ঐশ্বর্য্য চলে? আদালতে সকলের অহঙ্কার চূর্ণ হয়। তিনি পরস্ব অপহরণ করিয়া মৌলভির অযোগ্য পার্থিব সুখ ভোগ করিতেন, ধর্ম্মাবতার তাঁহাকে যথার্থ ফকীর হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। স্ত্রী ও দৌলত সঙ্গে সঙ্গে যায়, তিনি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দূর করিয়াছেন। অসহায়া রমণী কি করে, পিত্রালয়ে আসিল। আবার মৌলভি সুরাপান করিয়া সেখানে আসিয়াও অত্যাচার করে সুতরাং অবলা নিকাহা করিয়া আসগর আলির আশ্রয় লইয়াছে। আসগর আলির বদান্যতা হুজুরে অবিদিত নাই। (মুনসেফ সাহেব গম্ভীরভাবে শিরশ্চালনে সম্মতি দেখাইলেন)। আসগর আলি শাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়াও স্ত্রীকে দখল পান না। মৌলভি পরিত্যক্ত স্ত্রীকেও নিজালয়ে লইয়া যাইবার চেষ্টিত এবং সে দুর্দ্দান্ত লোক, এজন্য বাদী আদালতের হুকুম বিনা মৌলভির বল হইতে আপন স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে অক্ষম। ধর্ম্মাবতার শাস্ত্রজ্ঞ, বিবাদীর অশাস্ত্রীয় ব্যবহার ও অন্যায়াচরণ বিলক্ষণ জানেন ও তাঁহার দুর্দ্দশায় ঈশ্বরের বিচারও প্রকাশমান! হুজুরকে আর কি জানাইব?

উকীলের বক্তৃতায় হাকিম ও আমলাগণ সহর্ষ হইলেন। মাগন দাস মুনসী টিকিটী ভাল করিয়া বাঁধিয়া উত্তর আরম্ভ করিলেন। তিনিও ফারসীতে কম বলেন না।

"ধর্ম্মাবতার বাদী একজন মকদ্দমাকারী নীচলোক, বিবাদীর অকৃতজ্ঞ ভৃত্য, সে মিথ্যা সাক্ষীর দলবলে কুলগ্রামের অতি ধনী মানী সম্ভ্রান্ত মৌলভি আমীর আলি সাহেবের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।" প্রতিপক্ষের উকীল কহিলেন উনি মিথ্যা কহিতেছেন ও আদালতের উপর দোষারোপ করিতেছেন এবং নগিছাড়া কথা কহিতেছেন। আদালত বিবাদীর উকীলকে সতর্ক করিয়া কহিলেন "মাগন দাস! আদালতের সকলেই আসগর আলির দানশীলতা অবগত আছে। কুল গ্রামের মৌলভির ৫ টাকাও কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তবে তাহাকে ধনী কিরূপে বলিতেছ।' সেরেস্তাদারও কহিল 'হুজুর যাহা কহিতেছেন সত্য, কুলগ্রামের মৌলভির টাকা আমরা কখন দেখি নাই।' মাগন দাস নীরব, তিনি বার বার তাঁহার মক্কেলকে বলিয়াছিলেন আদালতে কিছু না দিলে মকদ্দমা পাওয়া যায়না, মৌলভি ধর্ম্মভীত উৎকোচ দেওয়া পাপ বলিয়া দেন নাই ও সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন। যাহা হউক কথঞ্চিৎ বুদ্ধির সহিত কহিলেন—

"ধর্ম্মাবতার! আদালতে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই যে ঠিক কে বলিতে পারে? মিথ্যা সাক্ষী প্রবঞ্চনা আদালতে ঢের আছে, এখানে রাত দিন, দিন রাত হয়; না হইলে ধর্ম্মশীল সম্ভ্রান্ত কুলগ্রামের আমীর আলি মৌলভির আর এমত দশা এবং দুষ্ট মোক্তার আসগর আলির এত প্রাদুর্ভাব? দুরাত্মা, মৌলভির সর্ব্বস্বান্ত

করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার শ্যালকের পীড়া হইয়াছে মিথ্যা ভাণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে আবদ্ধ করিল, এক অসম্ভব উদ্বাহ ভাণে মৌলভিকে অপমানিত ও তাঁহার স্ত্রীকে যন্ত্রণা দিতে চাহে! বিবাহ এরূপ স্বামীপুত্র ত্যাগে কি সম্ভব ?"

এতক্ষণ লোকে মনে করিতেছিল সত্য কহিতেছে বলিয়া পাছে হাকিম ইহাকে দণ্ড দেয় এবং হাকিমও ভাবিতেছিলেন কি করিয়া উকীলের সাহসিক বচনকে দমন করেন। শেষ কথায় প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন তাই বটে মাগন দাস এত কথা বলিতেছ। তোমাদের হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা অসম্ভব, হিন্দুরা মরামানুষের স্ত্রী হয়। জ্ঞানী লোকে কি আর সেই রূপ করে? তোমরা স্ত্রীকে দশবার তাড়াও আবার লও, আমাদের ওটী চলেনা। মৌলভি স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছেন, সে বিবাহের পূর্ব্বে যেমন স্বাধীনা কুমারী এখনও তদ্রূপ হইল, পুনর্ব্বার বিবাহ করণে যুক্তিতে দোষ কি ?"

মাগন দাস কহিলেন সে "যাহা হউক মৌলভির স্ত্রী যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন, কি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? মোক্তার কর্তৃকই তাঁহার নামে এক মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তিনি যখন আদালতে আইসেন নাই তখন ইহাতে বিশ্বাস কি?"

"আহাহা!" মুন্সেফ হাস্য করিয়া কহিলেন "তাইতে বলি হিন্দুর কর্ম্ম নহে আইন বুঝা। পরদানিশীন স্ত্রীলোক কি আদালতে আইসে? আদালত স্বয়ং গিয়া তদারক করিতে পারেন।" প্রতিপক্ষের উকীল কহিলেন কুলগ্রাম অতি নিকটবর্ত্তী, আমান পাঠান যাউক। মুন্সেফ কহিলেন "ভাল কথা, আদালতের সাবকাশ কম, জিন্নত আলি তুমি গিয়া বিবাদিনী রকিমন্নিসার এজেহার আন। মাগন দাস বারবরদারী দাও।" মাগন দাস জানেন আমীনও যাহা হাকিমও তাহা। অর্থ না হইলেই অনর্থ। অতএব কহিলেন বক্তৃতার সময় প্রমাণ সংশোধন হইতে পারে না।

মুন্সেফ দেখিলেন আমীনের আপত্তি হইয়াছে আর ছাড়েন কৈ? মোক্তারকে খরচা দিতে হইল এবং জিন্নত আলি তাত্রদী নবীস পরওয়ানা লইয়া গেল। পরে অন্যান্য মকদ্দমার পর বেলা ৩ টার সময় আমীন আসিল। রকিমন্নিসার খোদ বর্ণনানুযায়ী এজেহার আনিয়া দাখিল করিল এবং মকদ্দমা পুনর্ব্বার বক্তৃতা হইয়া শেষ হইল। মুন্সেফ সেরেস্তাদারকে মকদ্দমার হাল বুঝাইতে বলিলেন, সেরেস্তাদার যথাসাধ্য বাদীর পক্ষে জানাইল। হাকিম খোদাপরস্ত নমাজ না করিয়া হুকুম দেন না। খাস কামরায় গেলেন। তথায় আমীনকে কোরাণ স্পর্শে শপথ করাইয়া জানিলেন, মফঃস্বলে ৫ টাকা পাইয়াছে, তাহাকে ১ টাকা দিয়া ৪ টাকা লইলেন ও গামলার দরিয়া হইতে টাকা উদ্ধার করিলেন।

মোক্তার পূর্ব্বে তাহা কথামতে পুরাইয়া রাখিয়াছিল। পরে এজলাসে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন "আমি জানি না খোদা জানে।—মকদ্দমা ডিক্রী" বলিয়া বসিলেন।

আসগর আলি আস্ফালনের সহিত বাহিরে আসিল, পয়সা ছড়াইয়া আদালতে বদান্যতা জানাইল, আর একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিল "এতেও কি মনের সুখ যায় না।" যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল সেই মৌলভি সাহেব তখন মকদ্দমার সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন। আসগর আলির কথা হৃদয়ে বাজিল, শ্মশ্রুতে হস্ত দিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কহিলেন "খোদা!" ঐ এক কথায় তাঁহার সকল দুঃখ প্রকাশ হইল। ঐ এক কথায় তাঁহার সকল ভাব ব্যক্ত হইল আর ঐ এক কথায়ও শান্তি হইল।

মৌলভি তদবধি শয্যাগত হইলেন, এত যে মনের স্ফূর্ত্তি, নির্ভর ভাব, সন্তোষ,—উপস্থিত স্ত্রীবিচ্ছেদে সব নষ্ট হইল। সংসারে আর তিল মাত্র সুখ নাই। আশা নাই। মৌলভির অন্তিমকাল উপস্থিত। মেহের আলিকে ডাকিয়া মৌলভি কহিলেন "মেহের আমার পীড়া সাংঘাতিক, আমার জীবন সংশয়। তুমি বালক, তোমাকে কি কহিব? ঈশ্বর তোমার সহায় থাকিবেন, যদি একটু সাবধানের সহিত কার্য্য কর উপকার হয়।" মেহের অসময় বিপৎপাতে কিছু দৃঢ় হইয়াছেন, গম্ভীরও হইয়াছেন, আগ্রহের সহিত কহিলেন "কি করিতে হইবে? বাবা! আমি আর কি বালক আছি, যাহা আদেশ করিবেন করিব।" মৌলভি সহর্ষ ভাবে তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া কহিলেন "বাপ আমার তুমি বেশ ঠাণ্ডা ও সুবোধ হইয়াছ দেখিতেছি; একবার গোপনে সতর্কভাবে জানিয়া আসিতে পার, তোমার মাতাকে মোক্তার যে ডিক্রী জারিতে দখল লইতে চেষ্টা করিতেছে কি হইল। দেখিও কোন গোল বাঁধাইওনা তাহা হইলে আমার সহিত আর দেখা হইবে না।" মেহের আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেলেন।

মৌলভি নিরুপায় হইয়া মেহেরকে পাঠাইলেন, কিন্তু তজ্জন্য চিন্তিতও হইলেন। একবার ভাবিলেন তিনি ছিলেন কি, হলেন কি! বাস গেল আশা গেল, সংসারে স্ত্রীপুত্র ছিল, সে স্ত্রীকেও শত্রু কাড়িয়া লইল। তৎসঙ্গে যাহা কিছু বাকী সম্পত্তি ছিল তাহাও গেল। এক্ষণে যে অল্প স্বল্প জমী যাহা পুত্রের নামে আছে, তাহাও থাকা দায়। যে পরম শত্রু তাহাকে এত হীনবল করিল তাঁহার বালক পুত্র কি তদ্বিরুদ্ধে রক্ষা পাইবে? তিনি মকদ্দমাকে প্রথম প্রথম উপেক্ষা করিতেন যে সামান্য বিষয় গেল গেল। শেষে যখন সর্ব্বস্ব যাইবার হইল, তিনি পার্থিব ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিলেন, মনে করিলেন মনের সুখ লয় কে? পরে যখন তাঁহার ভাবী পুত্রবধূ মেহেরন্নিসার বিরুদ্ধে মোক্তার আপন

ভ্রাতুষ্পুত্র ফজরআলির বিবাহ হইয়াছে বলে মিথ্যা ডিক্রী করে, মৌলভির মনোভঙ্গ হয়। বিদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; সহসা এই আশ্চর্য্য মকদ্দমায় আপন প্রণয়িণী স্ত্রীকে হারাইলেন। আদালতের অসীম শক্তি তখন বুঝিলেন। মোক্তারের প্রতিহিংসা কত ভয়ঙ্কর তখন জানিলেন।

এমত সময় মেহের আলি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিল; তাহার অস্বাভাবিক ভাবে ও মুখশ্রী দেখে মৌলভি নিতান্ত আশঙ্কাযুক্ত হইলেন। ভাবিলেন হয়ত প্রিয়া রকিমন্নিসা শত্রু-হস্তগত হইয়াছেন। হৃদয়ে শেলাঘাত লাগিল, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইল। তথাপি সাহস পূর্ব্বক মেহেরকে জিজ্ঞাসা করায় মেহের নীরস হাস্যে কহিয়া উঠিল, "আর কোন ভয় নাই—মা এমন স্থানে লুকাইয়াছেন, আসগরের সাধ্য নাই, আদালতের সাধ্য নাই তথায় যায়।" মৌলভি কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিলেন 'কোথায় লুকাইলেন? এমন স্থান কোথায়?" মেহের কহিল তম্মাতা ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া মোক্তারের হস্ত এড়াইয়াছেন। শুনিবা মাত্র মৌলভি নিস্তব্ধ হইলেন। অবশেষে ভগ্নস্বরে কহিলেন "মেহের তোমাব মাতা উত্তম করিয়াছেন বটে আমিও তথায় চলিলাম; কিন্তু তোমার এখনও সময় হয় নাই।" বৃদ্ধ, পুত্রের জন্য অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাহার হস্ত আপন হস্তে রাখিয়া তাহাকে শপথ করাইয়া কহিলেন "মেহের! আমি অবর্ত্তমানে তুমি তিলার্দ্ধ এ দেশে থাকিও না; কিন্তু অন্তিমকালের আমার দুইটী কথা রাখিও; (১ম) যত কেন দুঃখ ক্লেশ হউক না আত্মহত্যা করিও না (২য়) যত কেন অত্যাচার কেহ করুক না নরহত্যা করিও না। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" পরদিবস বৃদ্ধ কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন।

## পঞ্চম অধ্যায়।

মৌলভির ভাবী পুত্রবধূ মেহেরন্নিসা অনাহারে বিশ্রী ও শীর্ণ হইয়াছেন। বয়স ষোড়শাধিক হইবে না। কৃশতা হেতু কিঞ্চিৎ দীর্ঘ দেখা যাইতেছে। অস্থিময় শরীরের উপর এক খানি হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র দিয়া ঘেরিলে যেরূপ হয় আকারটী সেইরূপ হইয়াছে। নাসিকা, হনু, কণ্ঠা ও পঞ্জরের অস্থি বহির্গত হইয়াছে। রৌদ্রে, গৌর বর্ণ পীত হইয়াছে এবং তৈল বিহনে কেশের অগ্রভাগ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। তত্রাচ অদ্যাপি সুদীর্ঘ নয়নদ্বয়ের কৃষ্ণ বর্ণ ও পক্ষ্মদল ও ভ্রূলতার কৃষ্ণবর্ণ ঘুচে নাই। অধরের লোহিতবর্ণ, কেশের দীর্ঘতা; বদনের সৌন্দর্য্যও দেহের লালিত্য নষ্ট হয় নাই। অদ্যাপি গতির ভঙ্গী ও স্বরের মাধুর্য্যে ভদ্রতা প্রকাশমান। দেখিলে বিলক্ষণ বোধ হয় অল্প দিনের শুশ্রূষায় মেহেরন্নিসা রমণীরত্ন হইবেন। দুর্ব্বল হইয়া মেহেরন্নিসার আকার সুন্দর ছবিটীর ন্যায় হইয়াছে।

মেহেরন্নিসা জানেন তাঁহার বিবাহ জন্য এক সম্ভ্রান্ত-সন্তান গুণবান ও রূপবান যুবা স্থির হইয়াছিল। দৈব-ঘটনায় বিবাহ হয় নাই এবং যেমন তাঁহাদের তেমনি বরেরদেরও যথোচিত দুর্দ্দশা হইয়াছে। মধ্যে ঐ বিবাহ ভঙ্গের জন্য দুষ্ট শিরোমণি আসগর আলি মোক্তার সচেষ্ট হইয়াছিল, কি মামলা মকদ্দমাও করিয়াছিল। মেহেরন্নিসার দাদী পুরাতন সম্বন্ধ অদ্যাপি ভাঙ্গিতে এবং তদ্ভিন্ন নূতন সম্বন্ধে মন দিতে অনিচ্ছুক। দুর্দ্দশা জন্যই হউক বা অন্য কোন হেতুতে হউক মেহেরন্নিসার বিবাহ লইয়া আর কথা নাই। কুমারী স্বাধীনভাবে বনে বনে বেড়ান ও কাষ্ঠাহরণে আপনারও দাদীর জীবন চালান।

মেহেরন্নিসা বালিকা কালে বড় আদরের ছিলেন। অসামান্য রূপবতী ছিলেন ব'লে সকলে ভাল বাসিত। আবার মৌলভির ইস্তামতে সুশিক্ষিতা বলিয়া সর্ব্বগুণান্বিতা ছিলেন। ভাবী পতি মেহেরআলিকে ভাল করে দেখেন নাই; কিন্তু কল্পনায় তাঁহার একটী রূপ অন্তরে গড়িয়াছিলেন। নিশ্চয় যে তাঁহার পত্নী হইয়া রাজ-রাজেশ্বরী হইবেন আশা ছিল। ঘটনা-স্রোতে সে আশা গিয়াছে এখন কাহার সহিত বিবাহ হয়, কি প্রকার অবস্থা হয়, জ্ঞান নাই। দাদী তাহা জানেন, মেহেরন্নিসা সে বিষয়ে চিন্তা করেন না। বাল্য কাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পড়িতে না পড়িতে অনাহার ক্লেশ, যখনই বা চিন্তা করেন। ছেলে ধরাকে যেমন ভয় হয় মোক্তারকে তেমনি ভয় হইত। বিবাহ হয় নাই; কিন্তু বিবাহের কথা বার্ত্তা সমস্ত ঠিক হইয়াছে। বালিকা তাহার কি বুঝিবে?

মেহেরন্নিসা জঙ্গলের পল্লব ভাঙ্গিতেছেন, জড় করিতেছেন ও এক একবার এদিক ওদিক ছুটীয়া বেড়াইতেছেন। কখনও বা ফারসী বয়েত আবৃত্তি করিতেছেন এবং কখনও বা নৃত্য করিতেছেন। দাদী ডাকিলেই দৌড়িয়া গিয়া কাষ্ঠ জড় করেন, বনের লতা দিয়া তাড়ী বাঁধিয়া মস্তকে লয়েন, বৃদ্ধাকে যষ্টি দ্বারা ধরিয়া গ্রামে যান ও যাহা কিছু অর্জ্জন হয় তাহাতে কাল যাপন করেন। বৃদ্ধা কার্য্য করিতে অক্ষম; তবে নাতিনীর রক্ষক-স্বরূপ জঙ্গলে ও হাটে যান। বৃদ্ধা জঙ্গলে বৃক্ষতলে বসিয়া থাকেন। এক এক বার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইলে রোদন করেন এবং মেহেরকে ডাকিয়া আনিয়া দাড়িধরে চুমোখান, তাহাতেই তাঁহার অশ্রুমোচন হয়। মেহেরও তখন চাপল্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীরভাবে থাকেন, দাদীর কিছু দুঃখ হইয়াছে এই জানেন, অত বুঝেন না। বৃদ্ধা প্রত্যহই নিত্য আহার চিন্তায় ব্যস্ত, মেহেরের বিবাহের কি হইবে ভাবিবার অবসর পাননা। একদা মেহেরন্নিসা গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে ও কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে জঙ্গলের বহুদূরে এক নিভৃত স্থানে পড়িয়াছেন। চতুর্দ্দিকে জঙ্গলও পাহাড় কোথায় পথ পাওয়া ভার।

মেহের পথ পাইলেন না। মেহের এক বার দৌড়েন, আবার ফিরেন, দাদীকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন, আবার কাঁদেন। ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহর হইল, সূর্য্য প্রখর হইল, পক্ষীকুল নীরব হইল। মেহের পথ ভুলিয়া অধ্যবসায় সহকারে গহন বনের দিকে গিয়াছেন, ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিলেন, তৃষ্ণায় কাতরা হইয়াছেন। যিনি কখন বনে উপবনে কি পল্লীগ্রামে গিয়াছেন, প্রখর সূর্য্যকিরণ সময়ে মধ্যাহ্নের এক প্রকার স্তম্ভিত ভাব বুঝিতে পারেন; সেটী অতি ভয়ঙ্কর সময়, নির্জ্জনে অরণ্যে তৎকালে থাকিলে ভয় হয়। মেহের বিপদে পড়িয়াছেন ভয় করেই বা করেন কি? স্থির হইয়া বসিয়া আছেন এবং কর্ণদ্বয় সতর্ক হইয়া রহিয়াছে।

এমত সময়ে পর্ব্বত-চূড়ার উপর গুণ গুণ স্বরে নরকণ্ঠ-বিনির্গত অর্দ্ধোচ্চারিত সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিলেন। মেহেরের আশা হইল, সাহস হইল। কণ্টক বন দিয়া পাহাড়ে উঠিলেন। জঙ্গলে পরিপূর্ণ, জনমানবের চিহ্ন নাই। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া একটী ঝোপের পার্শ্বে বসিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে অতিসন্নিকটে ব্যঞ্জন-সম্বরণ শব্দ পাইলেন। নিশ্চয় কোন মনুষ্য আছে বোধে মেহেরন্নিসা কহিলেন, "ওখানে কেও?" "বন্যজন্তু, গ্রাম্যজন্তু এখানে কেন?" মেহের উত্তর শ্রবণে আশ্চর্য্য হইলেন তথাপি বীণাবিনিন্দিত কিশোর-পুরুষ-স্বর শ্রবণে সাহস হইল, লোকটী ভীতিস্থল নহে। কাতর স্বরে কহিলেন "আমি পথ ভুলিয়াছি, তৃষ্ণায় কাতর।" কিয়ৎপরে অদূরে জঙ্গল হইতে এক সুদৃশ্য যুবা পুরুষ নির্গত হইল।

যুবার বর্ণ গৌর কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে। বয়স বিংশ হইবে ওষ্ঠে গুম্ফের রেখা মাত্র প্রকাশ। মস্তকে বনলতার আভরণ, গলে বনপুষ্পমালা, কটিদেশে মলিন চির মাত্র। সমস্ত শরীর প্রায় অনাচ্ছাদিত। যদি বয়স ও অঙ্গ সৌষ্ঠব ও মুখশ্রীতে মাধুর্য্য না থাকিত, মেহেরন্নিসা ভয়ে চীৎকার করিতেন। মেহেরন্নিসার কটিদেশে একটী কাঁথা মাত্র ছিল। অঙ্গের বস্ত্র ফেলিয়া আসিয়াছেন। যুবাকে দেখিবা মাত্র সঙ্কুচিত হইয়া কটিদেশের কাঁথায় বক্ষস্থল বাঁধিয়া কথঞ্চিৎ অঙ্গাবৃত করিলেন। যুবা অভ্যাগতের আপদা-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, পরে সঙ্কেত করিয়া একটী নিভৃত পথ দিয়া আপন কুঞ্জ মধ্যে আনিলেন।

কুঞ্জের বহির্ভাগ নিবিড় জঙ্গল, ভিতরে কাঁটা জঙ্গলের ঘন বেড়া। পথটীতে ও কাঁটা ঝোপ ফেলা আছে, যুবা তাহা উঠাইয়া এক কুটিল বক্রগতি পথে মেহেরকে লইয়া এক পরিচ্ছন্ন অঙ্গনে উপস্থিত হইল। অঙ্গনটী অনুমান বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, পঞ্চদশ হস্ত প্রস্থ। স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ রৌদ্র নিবারণ ও শোভা জন্য আছে, তাহাতে দুই একখানা শিলাও নিবেশিত আছে। কোন স্থানে

শুষ্ক কাষ্ঠে সঞ্চিত আছে। একাধারে একটী পর্ণাচ্ছাদিত সামান্য কুটীর আছে। তাহাই যুবার আবাস বোধ হইল। কুটীরের একদিকে একটী মৃগচর্ম্ম-শয্যা আছে, শিরোদেশে মৃত্তিকা উচ্চ আছে বলিয়া উপাধানের ন্যায় বোধ হয়। এক দিকে রন্ধন হইতেছে। মধ্যভাগে দুই একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত আসন আছে, একটীতে মেহেরন্নিসাকে বসাইয়া যুবা বহির্গত হইলেন। মেহেরন্নিসা এই নিভৃত স্থল অতি মনোহর দেখিলেন। যুবার ভদ্র দৃষ্টি ও ভদ্র ব্যবহারে তাঁহার ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না। তিনি ভাবিতেছেন, গ্রামে ক্লেশে ও দুঃখে থাকা অপেক্ষা এরূপ অরণ্য বাস আনন্দজনক। পথ চিনিলে এক এক বার আসিবেন সঙ্কল্প করিলেন। বিশেষতঃ যুবার প্রতি তাঁহার বড়ই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

যুবা হরিৎ-পত্র-সংযুক্ত একটী পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া আনিয়া মেহেরের হস্তে দিলেন, স্বয়ং কলসী ধরিয়া আস্তে আস্তে জল ঢালিলেন, মেহের সানন্দ মনে পান করিলেন। যুবা রন্ধনের কার্য্যে বসিয়া সাধু ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন বৃত্তান্ত কি? মেহেরন্নিসা আপন পথভ্রম আদ্যোপান্ত বিবরণ করিলেন। যুবা জানিলেন রমণীর গম্য স্থল ক্রোশদ্বয় দূর, আবার উচ্চ নীচ ভূমিও কণ্টকারণ্য ও মধ্যাহ্ন প্রযুক্ত উহা বহুক্লেশকর, বিশেষতঃ রমণী অনাহার। অতএব কহিলেন "যদি আপত্তি না থাকে যৎকিঞ্চিৎ আহার কর, আমি সঙ্গে করিয়া তোমায় রাখিয়া আসিব, যাইতে সন্ধ্যা হইবে।" মেহেরের কিছুতেই আপত্তি ছিল না, তবে বৃদ্ধা পিতামহীর জন্য ভাবিতেছিলেন। কহিলেন "দাদীও অনাহার ও আমার জন্য চিন্তিত।" যুবা কহিলেন নিরুপায়! দুই জন অনাহার অপেক্ষা এক জন ভাল, আর তুমিত অতদূর এখন যাইতে পারিবে না। এখান হইতে দুই ক্রোশের অধিক পথ। মেহেরন্নিসা নীরবে ভাবিতে লাগিলেন।

যুবা কহিলেন "ঘর কোথায়?"— "কুলগ্রামে।" যুবা সঙ্গিনীর মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন 'নাম?' 'মেহেরন্নিসা।' যুব বিকশিত লোচনে মেহেরন্নিসার আপাদমস্তক দেখিলেন, মস্তক হেঁট করিলেন, চক্ষে হস্ত দিলেন, দুই এক ফোটা জলও চক্ষু হইতে পড়িল। যুবা রন্ধনে মনোযোগ দিলেন। "কিয়ৎ কাল মৌনভাবের পর কহিলেন "বিবাহ হইয়াছে?" 'বলিতে পারি না।' যুবা বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে চাহিলেন। মেহেরন্নিসা কহিলেন 'সম্বন্ধ হয়েছিল, এক বিবাহের ফয়সালা হইল, আর এক—,কিন্তু আমি কাহাকেও বিবাহ করি নাই।' যুবা বিস্মিত-বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন 'পছন্দ কোনটী?' 'দরিদ্র আমার আবার পছন্দ কি? একটীকে একবার দেখেছিলাম, আর একটীকে দেখিও নাই। একটীকে দেখে ছিলাম তখন আমি ছেলে মানুষ।' 'কোনটী ও তোমায়

গ্রহণ করে নাই? আর কি বিবাহ হইবে না?' 'আল্লা জানে! আমি কোন পুরুষকে জানি না।'

অন্ন প্রস্তুত হইল একটী মাত্র পাত্র; উভয়ে একত্র আহার হইল। রমণী ক্ষুধা জন্য হউক, গল্পে অন্যমনস্কতা জন্য হউক, যুবার প্রতি ভয় বা শ্রদ্ধা জন্যই হউক, যন্ত্রের ন্যায় যুবার অনুমতিমতে কার্য্য করিলেন। আহারান্তে যুবা কতিপয় পুষ্প আনিয়া রমণীর সম্মুখে দিলেন, নব পল্লবশাখায় কিয়ৎকাল বীজন করিলেন এবং মৃগচর্ম্ম পাতিয়া দিয়া অতিথিকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া আপনি কুটীর হইতে নির্গত হইলেন ও এক লতামণ্ডপে গিয়া বসিলেন। রমণী শয়ন করিলেন কিন্তু ইচ্ছা ছিল আরও কিছু গল্প স্বল্প করিতেন। তিনি বড়ই প্রীত হইয়াছেন. পিতামহী যদি না থাকিতেন এ স্থল ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর যুবা রমণীকে লইয়া ঝবঝবা বটতলাভিমুখে পাহাড় দিয়া আসিলেন। আহারান্তে আলস্য জন্য হউক রৌদ্রোত্তাপ জন্য হউক, বন্ধুর ভূমিতে চলিবার ক্লেশে হউক অথবা পদতলে কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার জন্যই হউক, মেহেরন্নিসা কিয়ৎ ক্ষণ আসিয়া অচলা হইলেন। বেলাও আর নাই, সূর্য্যাস্ত হইলে রমণীর আত্মীয়কে বনে দেখা পাওয়া ভার হইবে; যুবা রমণীর মৌনভাবরূপ অনুমতি লইয়া তাঁহাকে বাহুদ্বয়ে লইয়া সতেজে সহর্ষে পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যেখানে বৃদ্ধা আছেন তথায় উপনীত হইলেন। বৃদ্ধা এক বৃক্ষ-তলে নিদ্রিত পড়িয়াছিলেন। অনাহার ও ভাবনায় ক্লান্ত হইয়াছিলেন। পৌত্রীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া যুবাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যুবা বৃদ্ধাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার বাটীতে দিয়া গেলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঝবঝবা বটতলার মসজিদের পশ্চাতে যে পাহাড় দেখা যায় তাহার বাম পার্শ্বে এক নিম্ন স্থল আছে; তদ্দ্বারা একবার পশ্চিম ও একবার দক্ষিণ মুখে পাহাড়ে পাহাড়ে গেলে পশ্চিমে আরও একটী পাহাড় পাওয়া যায়। কাষ্ঠাহরণকারীগণ এই খানে সর্ব্বদাই আসে ইহা গ্রামেরও সন্নিকট এবং অরণ্যেরও সন্নিকট। এই ভিতরের পাহাড়ের উপর একটী অশ্বথ বৃক্ষ আছে। রাখালেরা পশু হারাইলে ইহার উপর উঠিয়া দেখে। কিন্তু যাহারা দূর বনে না যায় এখানে আসে না। মাসের মধ্যে দুই চারি জন মাত্র এখানে আসে।

ঐ বৃক্ষোপরি একদা বেলা প্রহরেক সময়ে একটী মনুষ্য বসিয়া আছে। লোকটী দরিদ্র বটে কারণ মলিন বস্ত্র পরিধান। ভদ্রবংশোদ্ভব বটে, কারণ সুরম্য হর্ম্মের ভগ্নাবশেষের ন্যায় শরীরের স্থানে স্থানে ভূতপূর্ব্ব শ্রীর চিহ্ন দেখা যায়।

বয়স নবীন, মুখ কমল, বিশেষতঃ

লোচনদ্বয় বুদ্ধির পরিচয় দেয়। নবীন পুরুষ দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক বৃক্ষের এক নিম্নতর শাখায় বসিয়া কি ভাবিতেছেন। নয়নদ্বয় চল চল করিতেছে; বোধ হয় যেন জলে ভাসিতেছে। বৃক্ষতলে এক বোঝা কাষ্ঠ বনলতায় আবদ্ধ। যুবা এদিকে ওদিকে চাহিয়া মুক্ত কণ্টে একটী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি চলিল।

সঙ্গীত।

মেহের জান, মম প্রাণ,
জগতে এক ঐ।
তার সনে, ভ্রমি বনে, মনের সুখ পাই॥
ধন নাই, মান নাই, বান্ধব বা কৈ।
বাস ছাড়া, আশ ছাড়া, সংসার-সুখ নাই॥১।
মেহের জান, মম প্রাণ; সংসারে এক ঐ।
ভয় করি, পরিহরি, পলায় বা সেই॥
মেহের জান, মম প্রাণ, জগতে এক ঐ।
তার সনে, ভ্রমি বনে, মনে সুখ পাই॥২।

সঙ্গীতের ভাবে যুবা মুগ্ধ হইয়াছেন, কে কোথায় দেখেন নাই। সহসা কেহ যেন তাঁহার লম্বিত পদ স্পর্শ করিল। যুবা চমকিত হইয়া, নিম্নে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া একজনকে দেখিলেন। অমনি যুবার আনন প্রফুল্ল হইল, শরীরে উৎসাহ প্রবেশিল, মনে চাপল্য জন্মিল। কহিলেন,

"মেহেরজান কতক্ষণ।"
"নাম ডেকেছ যতক্ষণ॥"
"আমি, আপনার নাম ডেকেছি।"
"আমি আপনাপনি এসেছি॥"

মেহের জান কহিল "এখন নাম"

"নামিবনা।" "কেন?" "যে উঠাইয়াছে নামাক?" "কে উঠাইয়াছে?"

"যার জন্য উঠিয়াছি।"

মেহেরজান, যুবার পা ধরিয়া টানিয়া নামাইল। যুবা হাসিতে হাসিতে নামিয়া তৎক্ষণাৎ মেহেরজানকে ধরিয়া বৃক্ষ-শাখায় তুলিল। মেহের হাসিতে হাসিতে কহিল "পড়ে যাব পড়ে যাব।" "আমায় নামালে কেন? আমিও তোমায় তুলিব।" বৃক্ষশাখাটী অনুচ্চ ছিল এবং বিলক্ষণ প্রশস্ত ছিল। বিশেষতঃ পশ্চাতে বৃক্ষের গুড়ি ঠেস দিয়া বেশ বসা যায়। যুবা তরুণীকে তথায় বসাইয়া আপনি পার্শ্বে বসিলেন ও বৃক্ষ-কোটর হইতে দুই ছড়া বন-পুষ্পমালা লইয়া একছড়া নিজগলে ও একছড়া কুমারীর গলে দিয়া কহিলেন, "মেহেরজান, দেখ দেখি কেমন দেখাইতেছে! যেন হিন্দুদের বরকন্যা।"

কুমারী হাসিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে বিবাহ কেন করিব?"

"তুমি যে আমার স্থিরীকৃত কনে।" তখন যে রাজরাণী হইতাম, এখন কি কাটকুড়ানী হইতে বিবাহ করিব?" "যদি রাজরাণী করিতে পারি?" "কি করে?" "আমি আক্যাব রেঙ্গন গিয়া অর্জ্জন করিয়া তোমার জন্য ঐশ্বর্য্য আনি, যদি তুমি মন দাও, কথা দাও।

"ঈস" "সত্য বলিতেছি, একবার বল, আমি যাই।" "কি বলিব?" 'যে তুমি আমাকে বিবাহ করিবে।" "আমরা

কোথায় থাকিব।” “ঐটীই চিন্তাস্থল।

“তবু একবার বল।”

কুমারী কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন “আগে রাজা হও তবে মহিষী হইব।”

যুবা তরুণীর হস্ত ধরিয়া সানন্দ বচনে কহিলেন “মেহের জান! আমি শপথ করিতেছি তোমারই জন্য বন ছাড়িলাম, সংসারে প্রবেশ করিলাম, জীবনের প্রতি আবার আস্থা জন্মিল এবং ঈশ্বর করেনত আবার গ্রামে গিয়া তোমাকে লইয়া বাস করিব।”

মেহের জানও কথায় না প্রকাশ করুন, অন্তরে অতীব আনন্দিতা হইয়া ছেন। শরীর লোমাঞ্চিত, বদনে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। সহসা কহিলেন “নামাইয়া দাও” “দিবনা, তুমি প্রত্যহ পলাও আজ জব্দ করে রাখিব।” “দাদীকে বলে দিব।” “দিলেইবা, তুমিত আমার হুল্ হীন্।” “যখন তেমনি হবে তখনত?” কুমারী নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অগত্যা যুবা সাহায্য করিয়া নামাইয়া দিলেন।

তরুণী ক্ষিপ্রহস্ত—কাষ্টের বোঝা মস্তকে লইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল, এবং বলিতে বলিতে গেল,

“মেহের আলি, চতুরালী, সব আমি বুঝেছি,
“হাবামেয়ে. একলাপেয়ে, সকলইত কাড়িলে॥
“রাজরাণী, যদি আমি, হ’তেওনা পেয়েছি।
“সময় পেয়ে, ফাঁকি দিয়ে বিয়ে ক’রে ফেলিলে॥

মৌলভির পুত্র মেহের আলি পিতৃআদেশানুযায়ী আপন পিতার মৃত্যুর পর স্বদেশ ছাড়িলেন, এমত নহে। একেবারে সংসারের প্রতি নর জাতির প্রতি বিরক্ত হইলেন। মেহেরের বয়ঃক্রম তৎকালে অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র; কিন্তু ঐ সময়েই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। সহসা পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া একবার ভাবিলেন তাবৎ বিপদের মূল আসগর আলি মোক্তারের প্রাণনাশ করেন, তাঁহার কাছে আইন আদালত নাই, নিজ বাহুবলই তাঁহার আদালত। তৎক্ষণাৎ পিত্রাদেশ স্মরণ হইল, যত কেন অত্যাচার কেহ করুকনা নরহত্যা করা হইবেক না। মেহের ঐ জন্যই আত্মহত্যাও করিতে পারিলেন না। অবশেষে অরণ্য মধ্যে একটী কুটীর প্রস্তুত করিয়া মৃত্যু অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। নর জাতির প্রতি, সংসারের প্রতি, জীবনের প্রতি, তাঁহার বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। পৃথিবীতে যে কেহ আছে যাহাকে তিনি চাহেন, কি কোন বস্তু আছে যাহা প্রার্থনীয়, মেহেরের এমন বিশ্বাস ছিল না।

যে দিন মেহেরন্নিসা অতিথি হয়েন এবং নিজ পরিচয় দেন সহসা মেহের আলির পূর্ব্ব সম্বন্ধ কথা স্মরণ হয়। পূর্ব্বসম্বন্ধীয়ের প্রতি মহানুভূতি অনুভব করেন। “বন্য জন্তু” এই বার গ্রাম্য জন্তু সহবাস আকাঙ্ক্ষা করিল। ঝবঝব্যা

বটতলার নিকট বনে মেহেরন্নিসা কাষ্ঠাহরণ করেন, মেহেরআলি তৎসন্নিকটে আবাস প্রস্তুত করিয়া মেহেরন্নিসার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। উপরোক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষতলে তাঁহাদের মিলন স্থল ছিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। উভয়ের সম দুর্দ্দশা। উভয়ই বনচারী, তরুণবয়স্ক ও সরল-হৃদয়, কেনই বা তাঁহাদের সখ্য ও প্রণয় হইবে না? তাঁহারা অবাধে বনমধ্যে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতেন; তাঁহাদের একত্র বিচরণ ও নির্জ্জনে কথোপকথন যে ভাল দেখায় না, কেহ বলিবার নাই। বৃদ্ধা বন প্রবেশ পথে বৃক্ষতলে মেহেরের অপেক্ষায় থাকিতেন, মেহের যে কাষ্ঠাহরণ না করিয়া এরূপ ক'রে বেড়ান কি করিয়া জানিবেন, যেহেতু যথা সময়ে মেহের কাষ্ঠভার মস্তকে করিয়া উপস্থিত হইতেন। সেই কাষ্ঠভার মেহের আলি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন।

মেহেরআলি মেহেরন্নিসাকে আদর করে "মেহের জান" বলিতেন। ঐ নাম ধরিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন এবং ঐ সঙ্গীত-স্বরে আকৃষ্টা হইয়া মেহেরন্নিসা উপনীত হইতেন। মেহের-ন্নিসা জানিতেন যুবা তাঁহাকেই উল্লেখ করিয়া গান করেন, তাহাতে পরম প্রীতও ছিলেন। তত্রাপি কৌমারিক কুটিলতা প্রযুক্ত তাঁহার নাম ব্যবহার জন্য অনুযোগ করিতেন। মেহের আলিও কৌশলে কহিতেন তিনি 'মেহের জান' অর্থাৎ নিজ প্রাণকে সম্বোধন করেন মেহেরন্নিসার নাম করেন না। যেমন কপট প্রশ্ন তেমনি কপট উত্তর, প্রশ্নও কিছু নয় উত্তরও কিছু নয়, বাক্-ছল মাত্র প্রণয়ীযুগলের উদ্দেশ্য; বস্তুতঃ উভয় মেহেরের একই হৃদয় হইয়াছিল। কিছুকাল পরে যুবা উক্তরূপে পরিণয় প্রস্তাব করেন এবং সফলও হয়েন। মেহের আলির তীব্র হৃদয়ে ভাবোচ্ছ্বাস সামান্য নহে। সাংসারিক বিপৎপাতে তিনি একেবারে অরণ্যবাসী হয়েন; পরে একবার মেহেরন্নিসার প্রতি অনুরাগে তাঁহার জীবন-স্রোত প্রত্যাবৃত্ত হইল। এক্ষণে প্রণয়িনীকে রাজরাণী করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবেন এই ইচ্ছা বলবতী হইল। তাঁহার যে ইচ্ছা সেই কথা ও সেই কার্য্য। অবিলম্বে তিনি মেহেরন্নিসাকে আশ্বাস দিয়া আক্যাবে গমন করিলেন। পাথেয় সংগ্রহ জন্য তিনি পর্ব্বতের অপর কূলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শরীরে প্রভূত বল ছিল; আবার ইচ্ছার তেজে তাহা দ্বিগুণিত হইয়াছিল। তিনি অল্প দিনে আক্যাব যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করিলেন মাত্র এমন নহে, মেহেরন্নিসার কএক দিন দিনপাত হয় এমত সম্বলও দিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

(চিত্তবিনোদিনীর প্রণেতা কর্ত্তৃক লিখিত।)

# শরীর ও মন।

যদি গুণ দেখিয়া পদার্থের নির্ণয় করিতে হয়, তবে শরীর ও মন দুই স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া অবধারিত করিতে হয়। শরীরের গুণ মনে নাই, মনের গুণ শরীরে নাই। শরীরে যে প্রকার গুণ সমূহ বিদ্যমান দেখি, মনঃপদার্থে তৎসদৃশ কিছুই দৃষ্ট হয় না; মনঃপদার্থে অন্যবিধ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। শরীরে জড় পদার্থের গুণ অনেক বর্ত্তমান আছে, কিন্তু মনে তাহা নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মনে যে সমস্ত গুণ বর্ত্তমান, তজ্জন্য মনকে এক স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ না বলিলে সেই সমস্ত বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট পদার্থের পৃথক্ জ্ঞান উপলব্ধি হয় না। এ জন্য আমরা এ দুই পদার্থকে এক বলিতে চাহি না। কারণ তাহা হইলে প্রত্যক্ষের অপলাপ করা হয় এবং প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে হইলে সকল প্রমাণের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হয়। এ জন্য আমরা শরীর ও মনকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

কিন্তু শরীর সামান্য জড়পদার্থ নহে। সামান্য জড়পদার্থের গুণ ইহাতে সমুদায় বর্ত্তমান আছে, তদ্ব্যতীত শরীরে যে কতিপয় গুণ দেখা যায়, তাহা সামান্য জড়পদার্থে নাই। শরীরের এই কতিপয় বিশেষ গুণ বর্ত্তমান থাকাতে ইহা শারীর পদার্থ বলিয়া বাচ্য হইয়াছে। যেমন উদ্ভিজ্জ পদার্থ সামান্য জড় পদার্থ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ প্রাণি-শরীরও পৃথক্। উদ্ভিজ্জ পদার্থে জড় পদার্থের এক প্রকার বিশেষ সমাবেশ, শারীর পদার্থে জড়পদার্থের অন্যবিধ সমাবেশ। উদ্ভিজ্জে জড় পদার্থ যে রূপে সংস্থিত শারীর পদার্থে সেরূপ নহে।

জড় পদার্থের সম্মিলনের ফল যে অশেষবিধ তাহা রসায়ন বিদ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে। উদ্ভিজ্জ পদার্থে জড় পদার্থের যে প্রকার সমাবেশ, ও সম্মিলন তাহাতে উদ্ভিদের জীবন স্বরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছে। শারীর পদার্থের ফল কেবল প্রাণ নয়, তৎ সঙ্গে আবার চেতনার উৎপত্তি দেখা যায়। আমরা প্রাণী মাত্রেরই চেতনা দেখিতে পাই। প্রাণী বিশেষে এই চেতন পদার্থের গুণের ন্যূনাধিক্য ঘটিলেও সে সমুদায় গুণ যে জড় পদার্থ হইতে এক বিভিন্ন চেতন পদার্থের গুণ তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রাণী মাত্রেই এই চেতনা বর্ত্তমান, এবং প্রাণী ভিন্ন কোন খানে চৈতনার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না।

উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রাণ আছে, শরীরেরও প্রাণ আছে। উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রকৃতিস্থ থাকিলে তাহা জীবিত থাকে।

শরীরও তদ্রূপ প্রকৃতিস্থ থাকিলে তাহা জীবিত থাকে। কতক গুলি নিয়ম প্রতিপালিত হইলে উদ্ভিদ ও প্রাণী শরীর জীবিত থাকে। এই নিয়ম গুলির যে প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে, সেই পরিমাণে উদ্ভিদ ও শরীর প্রকৃতিস্থ থাকে। অতএব জীবন ও প্রাণ, উদ্ভিদ এবং শরীরের বিশেষ প্রকার অবস্থার নাম মাত্র। জীবন ও প্রাণ বলিলে কোন বিভিন্ন পদার্থ বুঝায় না। যখন আমরা বলি বৃক্ষের জীবন আছে, অমুক প্রাণীর জীবন আছে তখন তাহাদিগকে আমরা মৃত অবস্থা হইতে পৃথক করি মাত্র। চেতনার নিয়ম এই যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ চেতনা থাকে। জীবিত থাকিয়াও যে কখন কখন অচেতন হই তাহা চেতনারই নিয়ম-সঙ্গত। তখন একেবারে চেতনা বিরহিত হই না, তাহা স্থগিত থাকে মাত্র। চেতনার নিয়মই এই। যেমন জড় পদার্থের বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে চেতনারও অনেক গুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। চেতনার ক্ষণিক অপসরণ এই বিশেষ নিয়মাধীন। মৃত অবস্থায় কেবল আমরা একেবারে চেতনা বিরহিত হই। কারণ সে অবস্থায় শরীরের চেতনা কখনই দৃষ্ট হয় নাই। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

যদি বল জড়পদার্থ হইতে যে মনঃপদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহার দৃষ্টান্ত কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, জড়পদার্থ যে স্থলে শারীর পদার্থরূপে পরিণত দেখা যায়, সেই স্থলেই মনঃ-পদার্থের উৎপত্তি। সামান্য জড়পদার্থের সমাবেশ অথবা সম্মিলনে মনঃ-পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব। তুমি যদি জড়পদার্থ হইতে শরীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পার, আমরা ও সেই শরীর মধ্যে প্রাণ ও চেতনপদার্থ দেখাইতে পারি। প্রকৃতির নিয়ম এই। যেখানে উৎপত্তির নিয়ম ঠিক থাকে, সেখানে ফলের নিয়মও ঠিক হইবে। জড়পদার্থ হইতে জড়পদার্থের উৎপত্তি যেমন সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে, প্রাণি-শরীরে তেমনি চেতনার উৎপত্তি সর্ব্বক্ষণেই প্রতীয়মান হইতেছে।

এখন কথা এই, কীটাণু হইতে বৃহৎকায় হস্তী পর্য্যন্ত প্রাণীগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ আছে, তেমনি তাহাদিগের চেতনা-সংস্কারের নানাবিধ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় কেন? আবার করীর যে পশুসংস্কার তাহা মানবজাতির মন হইতে এত প্রভিন্ন কেন? ইহার সদুত্তর মহাত্মা ডারউইন সাহেব প্রদান করিয়াছেন।

মানবীয় শরীর ও মস্তিষ্ক যেরূপে সংগঠিত এরূপ কোন প্রাণীর মস্তিষ্কই সৃষ্ট নহে। অন্য কোন প্রাণীর মস্তিষ্ক ও শারীর কৌশল যদি মানব সদৃশ হইত, তাহা হইলে সেই প্রাণী যে মনোবিশিষ্ট হইত, অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা যে বাষ্প উৎপন্ন হয় ও আবদ্ধ থাকে, সেই বাষ্পের

যে কার্য্য, তাহা অন্য কোন বাষ্পে পরিদৃষ্ট হয় না। বাষ্পীয় যন্ত্রকে ভগ্ন করিয়া ফেল, তাহা হইতে আর বাষ্পের উৎপত্তি হইবে না, এবং যদি বাষ্পের উৎপত্তি হয়, সে বাষ্পের দ্বারা পূর্ব্ববৎ কার্য্য হইবে না। তদ্রূপ মানবীয় শারীর কৌশল ও মস্তিষ্কে যে মনঃপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আর কুত্রাপি ঘটিতে পারে না। অপরাপর জীব জন্তু ও প্রাণী শরীরের গঠন প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ শক্তি অথবা সংস্কার-সম্পন্ন চেতনার উৎপত্তি হইয়াছে। এজন্য এক প্রাণীর সংস্কারের ভাব আমরা অন্য প্রাণীতে দেখিতে পাই না। চেতনা যাবতীয় প্রাণীতেই বিদ্যমান, কেবল তাহার প্রকার-গত প্রভেদ দ্বারা কখন পশুসংস্কার কখন মন বলিয়া অভিহিত হইতেছে। চেতনার প্রকৃতিগত প্রভেদ কোন থানেই দৃষ্ট হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে এই চেতনার শক্তি ও কার্য্যাদি বিভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া, আমরা তাহার প্রকৃতিগত প্রভেদ প্রতিপন্ন করিতে পারি না। ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণি-জগৎ যেমন উচ্চাধো-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে, সেই জগৎ মধ্যে চেতনার যে একটী জ্ঞান জগৎ দৃষ্ট হয়, তাহাও তদ্রূপ প্রণালীবদ্ধ হইয়া আছে। চেতনার ক্রমোন্নতি অনুসারে আমরা প্রাণীগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছি। চেতনার সর্ব্বোচ্চতায় মানব জীবমণ্ডলীমধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর যেখানে চেতনা কেবল ঈষৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞান মাত্র বলিয়া মানবের চক্ষে প্রতীয়মান হই-তেছে, সেই কীটাণুকে আমরা সর্ব্ব-নীচ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। ঈষৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান যেমন পশুসংস্কারে উন্নত হইয়াছে, পশুগণও তেমনি কীট পতঙ্গ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে অবস্থিত হইয়াছে। পশু-সংস্কার আবার মানবীয় বুদ্ধিতে উত্থিত হইয়া, মনুষ্যকে সর্ব্বোচ্চ পদে উত্থাপিত করিয়াছে। কীটাণুর সামান্য জ্ঞানকে আমরা যখন মানবীয় মনের সহিত তুলনা করিতে যাই, তখন মন এবং কীটাণুর চেতনাকে যেন বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। কিন্তু যখন কীটাণুর ইন্দ্রিয়-সংস্কারের সহিত ঠিক তদূর্দ্ধ শ্রেণীর জ্ঞানভাবের তুলনা হয়, তখন তাহাদিগের সৌসাদৃশ্য কেমন সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইতে থাকে। চেতনারাজ্যের এই ক্রমোন্নতি ভাব চেতনার প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য নহে, তাহা চেতনার ক্রমশঃ বিস্ফুরণ মাত্র। প্রাণি-শরীরের বৈচিত্র্য অনুসারে এই চেতনার ও বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে।

প্রাণিরাজ্যের কথা দূরে থাক, মনুষ্য দেহের নিয়ম-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা কি দেখিতে পাই না, শরীর যেমন বয়ঃসহকারে পরিপুষ্ট ও পরিণত হইতে থাকে, মন ও তেমনি ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়? লরেন্স তাঁহার মানব সম্বন্ধীয়

প্রবন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "সদ্যঃপ্রসূত মনুষ্য-শিশুকে কি মনোবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়? আমরা কি দেখিতে পাই না, বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই শিশুর মন আমাদিগের চক্ষের সমক্ষে যেন সৃষ্ট হইতেছে?" বাস্তবিক মনুষ্যজীবনের বিভিন্ন সময়ে মনের ও অবস্থা বিভিন্ন হইতে থাকে। মানবের বাল্যাবস্থায় মানসিক প্রকৃতির সহিত তদীয় প্রৌঢ়াবস্থায় অন্তঃপ্রকৃতির তুলনা করিলে, মনের অবস্থার কত প্রভেদ দেখা যায়। বয়োবৃদ্ধি নিবন্ধন যৌবন অতিক্রম করিলে মানবের স্বাভাবিকই যে বিজ্ঞতা, যে গাম্ভীর্য্য জন্মে তাহা আর কোন কারণেই উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার অতি বার্দ্ধক্য হেতু মানসিক শক্তির যে প্রকার হ্রস্বতা হয়, তাহা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না। যিনি যত কেন পণ্ডিত হউন না, যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুতেই অপনীত হইবে না। এ সমস্ত প্রকৃতির অখণ্ড নিয়ম। এই নিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে কি প্রতীতি হয় না, যে শরীরের অবস্থার সহিত মনের অবস্থা নিশ্চয় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শারীর-বিধানবিৎগণ (Physiologists) এই স্থানে একটী আপত্তি উত্থাপিত করেন তাঁহারা বলেন "আমরা শারীর বিদ্যায় জানিতেছি মনুষ্য-দেহ প্রতি দশ বৎসর অন্তর একেবারে এরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যে তাহাকে আর পুরাতন দেহ বলা যাইতে পারে না; প্রতি দশ বৎসর অন্তর মনুষ্য-দেহ নূতন হইতেছে। পুরাতন দেহ বিনষ্ট হইয়া যখন নূতন দেহ হইতেছে, তৎসঙ্গে মনও বিনষ্ট হইয়া যায় না কেন? প্রত্যুতঃ পুরাতন মন বরং উন্নত ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে।" যাহা শারীরিক নিয়ম তাহা অবশ্য আমরা স্বীকার করিব। আমরা স্বীকার করি মনুষ্য-দেহ প্রতি দশ বৎসর অন্তর নূতন পদার্থে পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহা এক দিনে হইতেছে, না ধীরে ধীরে দশ বৎসরে হইতেছে? দেহের পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার পুষ্টি সাধন হইতেছে, না তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে? দশ বৎসর পূর্ব্বে যিনি যেমন ছিলেন, দশ বৎসর পরে তাঁহার দেহের এত কি পরিবর্ত্তন ঘটে, যে তাঁহাকে আর চিনিতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি যেমন তিনি সেই ব্যক্তিই থাকেন। দেহের অভ্যন্তরে যে পরমাণু-ঘটিত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা দেহেরই নিয়ম, তাহাতে মনের কিছুই বিপর্য্যয় হয় না। দেহের এইরূপ পরিবর্ত্তনেই দেহের বৃদ্ধি এবং দেহের বৃদ্ধি সহকারেই মনের উন্নতি; ইহাই শরীর ও মনের নিয়ম। মন, শরীর হইতে উৎপন্ন হইলে, শরীরের স্ফূর্ত্তি-বর্দ্ধক নিয়ম হেতু, মনের কেন বিনাশ সাধন হইবে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। বরং শরীরের যাহাতে স্ফূর্ত্তি হইবে, মনেরও তাহাতে স্ফূর্ত্তি হইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। দেহ হইতে মন একবার উৎপন্ন হইলে মনের যাহা

নিয়ম, তাহা মনেই বর্ত্তমান থাকিবে। এবং সে নিয়ম এই, শরীরের আভ্যন্তরিক-পরমাণু-সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন হেতু মনের কিছু বিপর্য্যয় ঘটে না, সেই আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনে শরীরের বরং বৃদ্ধি হয় এবং তৎ সহকারে মনেরও স্ফূর্ত্তি হয়, এবং সেই আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনে দেহের শেষাবস্থায় যখন তাহা হ্রাস হইতে থাকে মনও তখন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমশঃ শক্তি-হীন হইতে থাকে। অতএব শারীর-বিধানবিৎ সুধীবর্গের প্রতিপক্ষতা যে অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই অনুভূত হইতে থাকে।

পদাথবিৎ দার্শনিক প্রিস্‌ট্‌লী কহেন* যখনি আমরা দেখিতে পাই, কোন ব্যক্তির শিরো-ভঙ্গ হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে মস্তিষ্ক দেশ বিনষ্ট হইয়াছে, তখনি আমরা দেখিতে পাই অমনি তাহার চিন্তা এবং বিবেচনা শক্তিও তিরোহিত হইয়াছে। এতদ্দর্শনে নির্ব্বিরোধে কি এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে মস্তিষ্ক দেশই মনের আবাস স্থান। এবং যখনি দেখিব কাহার চিন্তা এবং বিচার শক্তির ত্রুটি ঘটিয়াছে তখনি নিশ্চয় জানিব তাহার মস্তিষ্ক দেশেরও কোন গোলযোগ হইয়াছে।" এতদ্ব্যতীত আমরা প্রত্যহই কি প্রত্যক্ষ করিতেছি না শরীরের সহিত মনের কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ? শরীর অসুস্থ ও রোগগ্রস্থ হইলে মনও চঞ্চল এবং অধীর হইয়া পড়ে। বাতুলের চিকিৎসা কি মস্তিষ্কের চিকিৎসা নহে? দৈহিক সুখ বোধ হইলে কি মনের প্রশান্তি হয় না? আমরা প্রত্যহই কার্য্যকালে দেখিতে পাই শারীরিক সুখ বিধানে মানসিক প্রফুল্লতা জন্মিতে থাকে। এ প্রকার অগণ্য দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করে যে শরীরের সহিত মনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহারা পরস্পর পরস্পরের বেদনায় ব্যথিত হয়, এবং পরস্পরের সুখে সুখী হয়। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার বিচার করিতে গিয়া দার্শনিক পণ্ডিতগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা বলেন শরীর ও মন এ দুই স্বতন্ত্র ও পৃথক পদার্থ ছিল, কেবল ঈশ্বর ইহাদিগকে একত্রে সম্মিলিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা বলেন শরীর ও মনের যে সম্বন্ধ তাহা সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহাদিগের এই রূপ যোগ স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহারা এইরূপ সম্বন্ধে পরস্পর নিবদ্ধ আছে। কিন্তু যাহারা বলেন শরীর হইতে মন উৎপন্ন, তাঁহারা এই সম্বন্ধকে আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ একটি কোটি বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রথমোক্ত পণ্ডিতগণ আরও বলেন দ্বিতীয় দলভুক্ত ব্যক্তিরা সম্বন্ধ মাত্রকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে একটি অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দ্বিতীয় দলস্থ ব্যক্তিগণ উত্তর দেন, আমরা যে কার্য্যের যে কারণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অর্থাৎ

(*) Priestley L. L D, in his Disquisitions upon Matter and Spirit, published in 1777.

আমরা শরীরকে যখন মনের অব্যবহিত কারণ রূপে প্রতিপদে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তখন তাহার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন কি? শরীর ও মন পূর্ব্বে যে পৃথক ছিল, এবং এক্ষণে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে, এ কথা মানিতে গেলে সমগ্র বাস্তবিক ঘটনা ও দৃষ্টান্তকে অবহেলা করিয়া অনুমান করিতে হয়, যে শরীর মনের ব্যুৎপাদক কারণ নহে। তাহা শরীর হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র ছি., এবং ঈশ্বর তাহাদিগের সমাবেশ ঘটাইয়া দিয়াছেন। অতএব আমা[illegible] মত প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ আর তোমা[illegible]দগের সিদ্ধান্ত অনুমানসিদ্ধ। যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ সিদ্ধান্ত [illegible] কার্য্যের অবধারণা হইতেছে, সেথা[illegible] একটি আনুমানিক মত গ্রহণ ক[illegible]র আবশ্যক কি? আমরা পদার্থতত্ত্বে কিরূপ কার্য্য করিতাম? পদার্থ তত্ত্বে আমরা কি মহাত্মা নিউটন * নির্দ্দিষ্ট এই দুই নিয়মের অনুসরণ করি না? প্রথম নিয়ম এই যে, যে কারণ দ্বারা যে কার্য্যের নিমিত্ত অনায়াসে অবধারিত হইতে পারে, তদ্ব্যতীত অপর কারণের অনুমান করিবার আবশ্যক নাই। দ্বিতীয় নিয়ম এই, একই প্রকার কার্য্যের, যতদূর সাধ্য, একই প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। পদার্থতত্ত্বে আমরা এই দুই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া অগ্নিকে ধূমের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি, এবং বায়ুর অভিঘাতকে শব্দের হেতু বলিয়া থাকি। যেখানে আবার ধূম দৃষ্টি করি, এবং শব্দ শুনিতে পাই, সেখানে তদুৎপাদক অগ্নি ও বায়ুর অভিঘাতের অস্তিত্ব অবশ্য অনুমান করিয়া লই। তোমরাও পদার্থতত্ত্ব নির্ণয় কালে এই রূপ করিয়া থাক; কিন্তু তখন যাহা কর; আশ্চর্য্য এই আত্মতত্ত্ব নির্ণয়কালে সেই তত্ত্বপ্রণালী ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিবর্জ্জন কর। সাধারণ প্রচলিত ধর্ম্মের কোন অন্ধ বিশ্বাস তোমাদিগের এতদূর প্রিয় পদার্থ, যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রণালী পরিত্যাগ করিতে বরং একদা প্রস্তুত আছ, কিন্তু সেই অপরীক্ষিত ও অন্ধ ধর্ম্মমত পরিবর্জ্জনে সম্মত নহ। ধর্ম্মের অনুরোধে তোমরা কি ন্যায় পথ ও বিচারপদ্ধতি পরিহার করিবে? তবে আর তোমাদিগের মনুষ্যত্ব কোথায়? ধর্ম্মের অনুরোধে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবহেলা করিয়া একটি অনুমানকে অনায়াসে গ্রহণ করিতেছ, কারণ সেই অনুমান ধর্ম্মমতের সহিত সমঞ্জসীভূত হয়। অতএব তোমাদিগের অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাসই, বিজ্ঞান পথের তত্ত্বনির্ণায়ক। তোমাদিগের অনুমান বিচার-সিদ্ধ নহে, ধর্ম্মবিশ্বাস-সিদ্ধ। আমরা এরূপ অনুমান গ্রাহ্য করিতে পারি না। আমরাও তোমাদিগের সহিত স্বীকার করি যে পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় মন শরীরস্থ রহিয়াছে। কিন্তু আমরা স্বীকার করি না যে এই শরীর রূপ পিঞ্জর হইতে মনের উৎপত্তি হয় নাই, এবং শরীরের

* Sir Isaac Newton.

বিনাশের সহিত মনের বিনাশ সাধন হইবে না। আমরা পক্ষীকে স্বতন্ত্রভাবে আকাশে উড়িতে দেখিয়াছি. শাবকাবস্থায় নীড়স্থ দেখিয়াছি, তাহাকে পিঞ্জর মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছি, এবং পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিলেই আবার দেখিব, বিহঙ্গ আবার পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল. স্বর্ণ পিঞ্জর পক্ষিহীন পড়িয়া রহিল। কিন্তু মনে করুন আমরা এরূপ কিছুই দেখি নাই। বিহঙ্গকে আমরা কখন পিঞ্জর হইতে বিচ্ছিন্ন দেখি না। যেখানে পিঞ্জর দেখিয়াছি, সেখানে তন্মধ্যস্থ বিহঙ্গকেও অবলোকন করিয়াছি। বিহঙ্গকে কখনই স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে দেখি নাই। যেখানে বিহঙ্গ দেখিয়াছি, সেইখানেই তাহাকে পিঞ্জরবদ্ধ দেখিয়াছি। সে স্থলে কি আমরা অনুমান করিব না, বিহঙ্গ পিঞ্জর হইতেই উৎপন্ন? আবার যখন পিঞ্জরের বিনাশ হইয়াছে, বিহঙ্গকে আর স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পাই নাই, সেখানে কি অনুমান করিতে পারি, পিঞ্জরের বিনাশ হইলেও বিহঙ্গের বিনাশ নাই। অতএব এরূপ অবস্থায় আমরা বিহঙ্গকে পিঞ্জর হইতে উৎপন্ন না বলিয়া থাকিতে পারি না। তবে আমরা শরীর ও মনের বেলায় অন্যরূপ বিতর্ক করি কেন? মনকে কি শরীর হইতে কখন পৃথগাবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়াছি? মনকে কি আমরা অন্য কোথা হইতে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি, যে বলিব তাহা শরীর হইতে উৎপন্ন নয়? যেখানে আমরা জীবিত শরীর দেখিয়াছি, সেই থানেই চেতনা এবং যেখানে শরীর মৃত হইয়াছে, তাহার বিনাশ সাধন হইয়াছে, সেই থানে চেতনার ও কোন নিদর্শন পাই নাই। চেতনাকে আমরা কখন স্বতন্ত্র ভাবে দেখি নাই। তবে আমরা কিরূপে বলিতে পারি, দেহ ব্যতীত চেতনার ব্যুৎপত্তি কারণ অন্য কিছু থাকিতে পারে? অতএব তোমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই কেন হউক না, বিচার ও তর্ক দ্বারা কখন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে চেতনা ও মন শরীর হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ক্রমশঃ।

শ্রীপূ—

## প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

**বঙ্গের পুনরুদ্ধার নাটক।**—শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষাল প্রণীত। কলিকাতা নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। দ্বিতীয় গিসায় উদ্দীনের বিরুদ্ধে বিটুর ও রংপুরের জমিদার গণেশবাবুর যে অভ্যুত্থান, তাহাই অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত। স্বদেশানুরাগ উদ্দীপন করিবার জন্য বঙ্গভাষায় যে কয় খানি নাটক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহাদিগের অন্যতম।

# জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

## পার্লেমেণ্টীয় জীবন।

আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে উপনীত হইলাম। বীণাপাণি এত দিন তদীয় লেখনীতেই কেবল বিরাজ করিতেছিলেন, রসনায় বিকাশ পাইবার কোন সুবিধা পান নাই। এক্ষণে শেষ দশায় সেই সুবিধা ঘটিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মিল্‌কে হাউস্ অব্ কমন্‌সের সভ্য মনোনীত করার প্রস্তাব হইল।

মিল্‌কে পার্লেমেণ্টের মেম্বর করিবার নিমিত্ত যে এই সর্ব্ব প্রথম প্রস্তাব হয় এরূপ নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন আয়র্লণ্ডের ভূমি-বিষয়ক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেন, তখন মিষ্টার লুকাস্ এবং মিষ্টার ডফি প্রভৃতি আয়র্লণ্ডের সাধারণ দলের অধিনায়কেরা তাঁহাকে আয়র্লণ্ডের সাধারণ দলের প্রতিনিধি করিয়া হাউস্ অব্ কমন্‌সে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তৎকালে মিল্ ইণ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইণ্ডিয়া হাউসের কর্ম্ম পরিত্যাগের পর মিলের বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে পার্লেমেণ্টে আসীন দেখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সে ইচ্ছা যে ফলবতী হইবে আপাততঃ তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অনেকে মিলের মনে এরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কোন ইলেক্টরাল্ সমাজই † তাঁহার ন্যায় কেন্দ্র-বহির্ভূত-মতাবলম্বী ব্যক্তিকে পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত করিতে চাহিবেন না। বিশেষতঃ যাঁহার কোন স্থানীয় সংস্রব বা লোকপ্রিয়তা নাই, এবং যিনি মত বিষয়ে কোন দলের প্রতিনিধি হইতে চাহেন না, বিপুল অর্থ ব্যয় ব্যতীত তাদৃশ লোকের পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু মিলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে যাঁহারা সাধারণ কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্দেশে এক পয়সাও ব্যয় করা উচিত নহে। তাঁহার মতে পার্লেমেণ্টে সভ্য মনোনীত করিবার জন্য যে সকল ব্যয় যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য্য, রাজকোষ বা স্থানীয় চাঁদা দ্বারাই সেই সকল সাধারণ ব্যয়ের নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। যদি কোন ইলেক্টরাল্ সমাজ কোন ব্যক্তি-বিশেষকে পার্লেমেণ্টে আপনাদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছার সফলতা সাধনের নিমিত্ত তাঁহারা যদি

† Electoral Body.—ইংলণ্ডে যাঁহারা পার্লেমেণ্টে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইলেক্টরেল্ সমাজ কহে।

ন্যায়-সঙ্গত ও অপরিহার্য্য ব্যয়ভূষণ করেন, তাহাতে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না; কিন্তু সেই ব্যয়ের সমস্ত বা আংশিক ভার প্রার্থীর (১) বহন করাই মূলতঃ দূষণীয়; কারণ ইহা এক প্রকার পার্লেমেন্টের আসন ক্রয় করার সমান। এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দিলে দুইটী অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ অনেক স্বার্থপর ধনবান্ লোক স্বার্থ সাধনের জন্য পার্লেমেন্টে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ যে সকল সাধু সচ্চরিত্র ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি পার্লেমেন্টে নিজ-প্রবেশ-নিমিত্তক ব্যয় ভার বহনে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ, রাজ্য সেই সাধু ব্যক্তিদিগের নিঃস্বার্থ সেবায় বঞ্চিত হইবে।

অর্থব্যয় ব্যতীত যদি পার্লেমেন্টে প্রবেশ নিতান্তই অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা যাঁহাদিগের পার্লেমেন্ট-প্রবেশের একমাত্র উদ্দেশ্য, এরূপ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে পার্লিয়ামেন্ট প্রবেশোদ্দেশে ন্যায়সঙ্গত অর্থ ব্যয় করা নীতিমার্গবিরোধী, মিল্ এরূপ বলিতেন না। কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে যে সেই নিরপেক্ষ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্য কোন ব্যাপারে নিবিষ্ট না হইয়া পার্লেমেন্টে প্রবেশ করিলে দেশের অধিকতর উপকার করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তিনি এ উদ্দেশে অর্থব্যয় করার পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। নিজসম্বন্ধে তদীয় প্রতীতি সম্পূর্ণ প্রাতকূলই ছিল। তিনি জানিতেন যে শুদ্ধ লেখনী বিচালন করিয়া তিনি দেশের যে পরিমাণে উপকার করিতে পারিবেন, পার্লেমেন্টের কাষ্ঠমঞ্চকে আসীন হইয়া দেশের সে পরিমাণ উপকার সাধন করিতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি স্থির করিলেন যে, পার্লেমেন্ট প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করা দূরে থাকুক, তিনি বিনা অর্থব্যয়ে ও ইহাতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন না।

কিন্তু শ্রমজীবিশ্রেণী মিল্‌কে পার্লেমেন্টে আপনাদিগের প্রতিভূ স্বরূপ প্রেরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এ প্রস্তাব অচিরাৎ রূপান্তর ধারণ করিল। মিল, পার্লেমেন্টে প্রবেশ করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে পার্লেমেন্টে প্রবেশ করা অপেক্ষা লেখনী বিচালন দ্বারা তিনি দেশের অধিকতর উপকারসাধন করিতে পারিবেন। সুতরাং পার্লেমেন্টে প্রবেশের জন্য তনি স্বয়ং কোনও চেষ্টা করিবেন না; কিন্তু যদি কোন ইলেক্‌টরাল্ সমাজ তদীয় কেন্দ্রবহির্ভূত মত সকল জানিয়াও তাঁহাকে পার্লেমেন্টে আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগের অনুরোধ অবহেলা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মিল্ শ্রমজীবিশ্রেণীর ইচ্ছার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সরল ভাবে

(1) Candidate

এই মধ্যে এক পত্র লিখেন যে—পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত হইবার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা নাই, সুতরাং তজ্জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে বা কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন; আর বিশেষতঃ তিনি সভ্য মনোনীত হইলেও তাঁহাদিগের স্থানীয় বিষয়ে সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে পারিবেন না। সাধারণ রাজনীতি বিষয়ে তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টাক্ষরে সে সকলের উত্তর দিলেন এবং সফ্রেজ সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন যে তাঁহার মতে একই নিয়মে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও পার্লেমেণ্টের প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার প্রদান করা উচিত এবং তিনি যদি পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত হয়েন তাহা হইলে তথায় এবিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিবেন। ইংলণ্ডীয় ইলেক্টরাল্ সমাজের নিকট এরূপ প্রস্তাব এই সর্ব্ব প্রথমে উপস্থিত হয়। এরূপ প্রস্তাব করার পরও যে তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন ঈশ্বর স্বয়ং আসিলেও এমন স্থলে সভ্য মনোনীত হইতেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, পার্লেমেণ্টে সভ্য মনোনীত করণে পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির সমান অধিকার—এই সাধারণমত-বিরোধী মতের ব্যক্তীকরণের পরও মিল্ সভ্য মনোনীত হওয়াতে স্ত্রীজাতির অধিকার কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পড়িল।

মিল্ নিজ মত হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলেন না, এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিলেন না, এবং কাহারও নিকট গমন করিলেন না, তথাপি তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইলেন। যে দিন তিনি সভ্য মনোনীত হইলেন, তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান। ইলেক্টরেরা নানাবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, নানাবিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহারা মিলের নিকট হইতে স্পষ্ট ও অপ্রতিরুদ্ধ উত্তর পাইলেন। কেবল এক বিষয়ে—তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত সম্বন্ধে—তিনি প্রথম হইতেই বলিয়াছিলেন যে কোন উত্তর দিবেন না; ইলেকটরেরা ইহাতে তাঁহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরং প্রসন্নই হইয়াছিলেন। উত্তরের গুণাগুণ যাহাই থাকুক, ধর্ম্ম ভিন্ন সকলবিষয়েই সরল ও নির্ভীক ভাবে উত্তর দেওয়ায় মিল্ ইলেক্টরাল্ সমাজের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটীমাত্র উদাহরণ দিলেই পাঠকগণের প্রতীতি জন্মিবে। "পার্লেমেণ্টীয় সংস্কার বিষয়ে কয়েকটী চিন্তা" নামক মিল্‌রচিত একখানি পুস্তিকায় লিখিত ছিল—যে যদিও অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা ইংলণ্ডের শ্রমজীবীরা মিথ্যা কথা কহিতে কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করেন, তথাপি

তাঁহারা সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী। মিলের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এই কথা গুলি বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া ইলেক্‌টরাল্‌ সমাজের সম্মুখে ধারণ করেন। এই ইলেক্‌টরাল্‌ সমাজ শ্রমজীবিশ্রেণী-গঠিত ছিল; সুতরাং এ কথা গুলি তাঁহাদিগের প্রীতিকর বোধ না হওয়ায়, তাঁহারা মিল্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি ইহা লিখিয়াছেন কি না। মিল্‌ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"লিখিয়াছি"। "লিখিয়াছি" এই শব্দটী মিলের মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে না হইতেই, গভীর প্রশংসা ধ্বনি সেই সভাকে প্রতিধ্বনিত করিল। শ্রমজীবিশ্রেণী এতদিন পর্য্যন্ত পার্লেমেণ্টে যত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই কখন তাঁহাদিগের প্রশ্নের অপ্রীতিকর উত্তর দিতে সাহস করেন নাই; সকলেই তাঁহাদিগের মনের কথা গোপন করিয়া ইলেক্‌টরাল্‌ সমাজের তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত অপ্রকৃত কথা বলিয়াছেন; যাহাতে ইলেক্‌টরাল্‌ সমাজ বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এরূপ কথা সাহসপূর্ব্বক কেহই বলেন নাই; ইলেক্‌টরাল সমাজ এতদিন যেরূপ উত্তর শুনিয়া আসিতেছিলেন আজ তাহার বিপরীত উত্তর শুনিলেন। ইহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অবমানিত মনে করিলেন না। তাঁহারা একেবারেই বুঝিতে পারিলেন যে এরূপ নির্ভীক ও সত্যপ্রিয় লোকই তাঁহাদিগের বিশ্বাসপাত্র হইবার যোগ্য। শ্রমজীবীরা সকল বিষয়েই পূর্ণ সরলতা ভাল বাসিতেন। এই গুণ থাকিলে, সহস্র অপরাধ তাঁহাদিগের নিকট মার্জ্জনীয়।

মিলের এই দুঃসাহসিক উত্তর শ্রবণ করিয়া মিষ্টার্‌ ওড্‌গার নামক একজন শ্রমজীবী উঠিয়া বলিলেন যে শ্রমজীবিশ্রেণী ইচ্ছা করেন না যে তাঁহাদিগের প্রকৃত দোষ তাঁহাদিগের নিকট হইতে গোপন করা হয়। তাঁহারা বন্ধু চান, স্তুতিবাদক চান না। যদি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করেন যে শ্রমজীবিশ্রেণীতে কোন দোষ বিদ্যমান আছে, ও সেই দোষের অচিরাৎ সংশোধন আবশ্যক এবং তদনুসারে তিনি তাঁহাদিগেকে তদ্বিষয়ে বিদিত করেন, তাহা হইলে শ্রমজীবিশ্রেণী তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়া তাঁহার নিকট গুরুতর ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন। সভাস্থ সকলেই অন্তরের সহিত ওড্‌গারের এই কথার অনুমোদন করিলেন।

মিল্‌ যদি সভ্য মনোনীত না হইতেন, তথাপি তাঁহার আক্ষেপের কোন বিষয় ছিল না। কারণ এই ঘটনায় দেশের অসংখ্য লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ইহাতে শুদ্ধ যে তাঁহার ভূয়োদর্শন পরিবর্দ্ধিত হইল এরূপ নহে, ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক মত সকল বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইল, এবং যে যে স্থানে পূর্ব্বে তাঁহার নামও শ্রুত হয় নাই, সেই সেই স্থানে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হওয়ায়,

তাঁহার পাঠকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহার রচনার প্রভাবও অধিকতর অনুভূত হইতে লাগিল। পার্লেমেণ্টের যে তিন অধিবেশনে রিফর্ম বিল্ (১) রাজবিধিতে পরিণত হয়, সেই তিন অধিবেশনেই মিল্ পার্লেমেণ্টের মঞ্চকে উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে পার্লেমেণ্টই মিলের চিন্তার একমাত্র বিষয় ছিল। মিল্ প্রায়ই পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা করিতেন। এই বক্তৃতা সকল তিনি কখন কখন লিখিয়া লইয়া যাইতেন, অনেক সময় মুখে মুখেই করিতেন। পার্লেমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর সংস্রবে আসিবার মিলের একটী প্রধান নিয়ম ছিল। অপরের দ্বারাও যে সকল বিষয় সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, সে সকল বিষয় তাঁহার প্রিয়তম হইলেও তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। 'যে সকল বিষয়ে লিবারেল্‌মতাবলম্বী ব্যক্তিরাও তাঁহার সহিত ভিন্ন-মত বা উদাসীন, সেই সকল বিষয় সমর্থনের নিমিত্তই তিনি বদ্ধ-পরিকর হইতেন। এই সময় প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে পার্লেমেণ্টে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, মিল্ প্রাণপণে তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। পার্লেমেণ্টে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি প্রেরণ ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব (২)বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেন তাহা তৎকালে পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ কর্তৃক তদীয় বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের বিজৃম্ভন বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ অচিরাৎ জানিতে পারেন যে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি প্রেরণ-প্রস্তাব উন্মাদ-বিজৃম্ভন নহে। কারণ মিল্ পার্লেমেণ্টে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেই, রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন-সূচক প্রতিধ্বনি আসিতে লাগিল; সুতরাং এ প্রস্তাব যে সময়োপযোগী তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইল। মিল্ যে বিষয় শুদ্ধ নৈতিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বার্থসিদ্ধিতে পরিণত হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া তিনি যে শুদ্ধ পার্লেয়ামেণ্টেরই বিরাগ-ভাজন হইবেন এরূপ নহে, দেশের সমস্ত লোকের উপহাসের পাত্র হইবেন। এরূপ জানিয়াও তিনি শুদ্ধ কর্ত্তব্যানুরোধে এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রস্তাবে তিনি দেশের লোকের অপ্রিয় না হইয়া অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইংলণ্ডের স্ত্রীসমাজের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন।

রাজধানীর সভ্য বলিয়া তাঁহার উপর আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল; রাজধানীতে মিউনিসিপাল্ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা

(1) Reform Bill
(2) Personal Representation

করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এই বিষয়ে সাধারণ সভার এতদূর ঔদাসীন্য ছিল, যে তিনি একজন সভ্যকেও আত্মপক্ষ-সমর্থক পাইলেন না। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে এবিষয়ে তিনি পার্লেমেণ্টের বাহিরে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। একদল কর্ম্মঠ বুদ্ধিমান্ লোক বাহির হইতে নানাপ্রকারে তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহারা বাহিরে এবিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিতে-ছিলেন। অধিক কি বলিতে গেলে এ প্রস্তাবের মূল তাঁহারাই। তাঁহা রাই ইহার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া মিলের হস্তে সমর্পণ করেন। মিল্‌কে কেবল সেই পাণ্ডুলেখ্য পার্লেমেণ্ট সকাশে সন্নীত করিতে, এবং যতক্ষণ সেই পাণ্ডুলেখ্য হাউস্‌নির্দ্দিষ্ট কমিটির নিকট ছিল, ততক্ষণ তাহার পক্ষ-সমর্থন করিতে হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই পাণ্ডুলেখ্য যে বিভিন্ন আকারে রাজবিধিতে পরিণত হয়, তাহার কারণ এই আন্দোলন। যে সকল বিষয়ে এক দিকে সাধারণ হিত এবং এক দিকে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক হিতের পরস্পর সংঘর্ষ উত্থিত হয়, সে সকল বিষয় কিছুদিন এইরূপই যবস্থব অবস্থায় থাকে; পরিশেষে সাধারণ হিতে-রই জয় লাভ হয়।

তৎকালে অগ্রগত লিবারালিজম্(১)পার্লে-মেণ্টে অতিশয় উপহাসের বিষয় ছিল; এই জন্য প্রধান প্রধান লিবারেল্‌-মতাব-লম্বী হাউসের সভ্যেরাও এই মতের সমর্থনে অগ্রসর হইতে সাহস করি-তেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে পার্লেমেণ্টে যে কার্য্য অপরের দ্বারা সংসাধিত হইবার নহে, তাহাতেই হস্তক্ষেপ করা মিলের নিয়ম ছিল। সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অগ্রগত লিবারালি-জম্ মতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই জন্যই এক জন আইরিস্ সভ্যকর্ত্তৃক আয়লণ্ডের স্বাপক্ষ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হয়, মিল্ সে সকলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। বিখ্যাত বাগ্মিক মিষ্টার ব্রাইট্, মিষ্টার লারেন্, মিষ্টার পটার এবং মিষ্টার হাড্‌ফীল্ড এই চারিজন ভিন্ন পার্লেমেণ্টের আর কোন সভ্যই তাঁহার অনুসরণ করিতে সাহস করেন নাই। আয়র্লণ্ডে হেবিয়স্ কর্পস্ বিধি কিছুদিনের জন্য রহিত হয়; সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসান হইলে আয়-র্লণ্ডের শত্রুরা আরও কিছু দিন ইহা স্থগিত রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন। মিল্ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে তিনি আয়র্লণ্ডের প্রতি ইংলণ্ডের অবিচার ও আয়র্লণ্ডে ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীর দূষণীয়তা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তৎকালে ফেনীয়ান্‌দিগের প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণের রাগ এত-দূর প্রবল ছিল, যে ফেনীয়ানেরা ইংল-ণ্ডের যে সকল অবিচার ও অত্যাচারের

(1) Advacnced Liberalism.

উপরে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে সকলের উপর আক্রমণ করা আর ফেনীয়ান্দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা সমান বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য মিলের প্রস্তাবে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। মিলের বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলেন। মিল্ও তাঁহাদিগের উপদেশের সারগর্ভতা বুঝিলেন এবং রিফরম্ বিলের সাধারণ তর্ক বিতর্কের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহার তুষ্ণীম্ভাব দেখিয়া মনে করিলেন যে মিল্ পরাভূত হইলেন; সুতরাং তাঁহার জন্য তাঁহাদিগের আর উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। তাঁহারা মিলের এই কল্পিত পরাভব লইয়া তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক রহস্য বিদ্রুপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই রহস্য বিদ্রূপই মিলের পরিণাম-শুভকর হইয়া উঠিল। যাঁহারা আয়র্লণ্ড বিষয়ে পূর্ব্বে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, মিল্ অন্যায়রূপে অবমানিত হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহারাও মিল্-কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। এইজন্য রিফরম্ বিলের আলোচনার সময় মিল্ যখন দ্বিতীয়বার আয়র্লণ্ডের স্বাপক্ষ্যে বক্তৃতা করিলেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা অধিকতর সমাদৃত হইল। পার্লেয়ামেণ্টে তাঁহার সম্মান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ক্রমেই তাঁহার শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জাতীয় ঋণের পরিশোধের স্বাপক্ষ্যে যে বক্তৃতা করেন, এবং টোরি অধিনায়কদিগের প্রতি যে সোৎপ্রাসোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাতে পার্লেমেণ্টে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অধিকতঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। তিনি তদীয় প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী গ্রন্থের কোন স্থানে স্থিতিশীলদিগকে "বুদ্ধিশূন্য দল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া তাঁহার প্রতি ভীষণ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহাতে মিলের কোন অপকার না হইয়া, তাঁহাদিগেরই সবিশেষ অপকার হইল। এই আন্দোলনে এখন হইতে সকলেই তাঁহাদিগের নামের সহিত "বুদ্ধিশূন্য দল" এই পরিচায়ক বিশেষণ সংযোজিত করিতে লাগিল। যাহা হউক "তাঁহার কথাতে কেহই কর্ণপাত করিবেন না" পার্লেমেণ্ট প্রবেশের সময় মিলের মনে যে এইরূপ ভয় সঞ্চারিত হয়, সে ভয় এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইল। তিনি কোন বিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিলে, এখন আর শ্রোতৃ-সংখ্যার অভাব থাকিত না। তথাপি তিনি তদীয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পরিমিতভাষী হইলেন। যে বিষয়ে বিশেষরূপে তাঁহার বক্তৃতা প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়েই তিনি বাক্যব্যয় করিতে লাগিলেন; এবং যাহা অন্য দ্বারাও সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকিতে লাগিলেন। পার্লেমেণ্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনের সময় তিনি যত গুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আয়র্লণ্ড,

শ্রমজীবীশ্রেণী এবং মিষ্টার ডিজ্‌রেলীর রিফরম্‌ বিল্‌ বিষয়ক বক্তৃতাত্রয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আয়র্লণ্ড ও শ্রমজীবিশ্রেণী বিষয়ক প্রস্তাব দ্বয় তাঁহার হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি গ্লাড্‌ষ্টোনের রিফরম্‌ বিল্‌ উপলক্ষ করিয়া শ্রমজীবিশ্রেণীর পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। ইহার অব্যবহিত পরে, লর্ড রসেলের মন্ত্রিত্বপদ পরিত্যাগ এবং টোরি গবর্নমেণ্টের মন্ত্রিত্ব পদে অধিরোহণের পর, শ্রমজীবিশ্রেণী কর্তৃক হাইড্‌ পার্কে একটী সাধারণ সভা আহূত হয়। পুলিস্‌ কর্ম্মচারীরা সমবেত ব্যক্তিদিগের গতিরোধ করায় তাহারা রেল্‌ ভাঙ্গিয়া পার্কের ভিতর প্রবেশ করে। মিষ্টার বীল্‌স্‌ এবং শ্রমজীবীদিগের অধিনায়কেরা পুলিসের প্রতিরোধে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই তথা হইতে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে পুলিসের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। অনেক গুলি নিরীহ ব্যক্তি পুলিস কর্তৃক অপমানিত হইলেন। এই ঘটনায় শ্রমজীবিশ্রেণীর ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দ্বিতীয় বার পার্কে সভা আহ্বানের সঙ্কল্প করিলেন এবং অনেকেই সশস্ত্র আসিতে স্বীকৃত হইলেন। গবর্ণমেণ্টও এই সংবাদ পাইয়া এই উদ্যম নিবারণের জন্য সৈনিক সজ্জা আরম্ভ করিলেন। এই সংঘর্ষের পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর পরিণাম নিবারণের জন্য মিলের বলবতী চেষ্টা ফলবতী হইল। মিল্‌ পার্লেমেণ্টে শ্রমজীবীশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার নিন্দনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এ দিকে শ্রবজীবীশ্রেণীকে বলিলেন তাঁহারা হাইড্‌পার্কে সভা আহ্বানের প্রস্তাব পরিত্যাগ করুন্। তাঁহাকে বীল্‌স, কর্ণেল ডিকেন্‌স প্রভৃতি অধিনায়কদিগকে এ প্রস্তাবে সম্মত করিতে চেষ্টা করিতে হয় নাই। তাঁহারা প্রথম হইতেই ইহাতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এবং আর সকলকেও ক্ষান্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রমজীবিশ্রেণী তাঁহাদিগের প্রথম সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। মিল্‌ অবশেষে এক উপায় অবলম্বন করিলেন, তিনি বলিলেন হাইড্‌ পার্কে দ্বিতীয় বার সভা সন্নিবেশিত করিতে গেলে নিশ্চয় সৈনিক দলের সহিত সংঘর্ষ উত্থিত হইবে। এই সংঘর্ষ পরনির্দ্দিষ্ট দুই ঘটনায় মাত্র ক্ষমণীয় হইতে পারে। প্রথমতঃ যদি কার্য্যস্রোত এরূপ অবস্থায় নীত হইয়া থাকে যে আকস্মিক বিপ্লব প্রার্থনীয়। দ্বিতীয়তঃ যদি তাঁহারা আপনাদিগকে সেই বিপ্লব সংসাধন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করেন। শ্রমজীবীশ্রেণী এই প্রশ্নে নীরব হইলেন। আকস্মিক বিপ্লব প্রার্থনীয়; বা তাঁহারা তৎসম্পাদনে সমর্থ—এ কথা তাঁহারা

বলিতে পারিলেন না; সুতরাং অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁহারা মিলের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। মিল্ এই সমাচার মন্ত্রিবর ওয়াল্ পোলের কর্ণগোচর করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে ওয়াল্পোলের মস্তক হইতে যেন গুরুতর ভার অপনীত হইল এবং মিলের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার আর ইয়ত্তা রহিল না।

শ্রমজীবীরা হাইড্পার্ক বিষয়ে হতাশ হইয়া অবশেষে এগ্রিকল্টরাল্ হলে সভা আহ্বান করা স্থির করিলেন। তাঁহারা মিল্কে তাঁহাদিগের সভায় উপস্থিত থাকিতে এবং বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা মিলের অনুরোধ রাখিয়াছিলেন; সুতরাং মিল্ তাঁহাদিগের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। পার্লেমেণ্টে এবং এই সকল সভায় বক্তৃতা করিবার সময় মিল্ সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং আত্মসংযম ভুলিয়া যান—টোরি লেখকেরা মিলের উপর এই বলিয়া গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু টোরি দলের জানা উচিত ছিল, মিলের বক্তৃতার উত্তেজনী শক্তি ব্যতীত তাঁহারা ভয়ঙ্কর বিপৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেন না। সে সময় মিল্, গ্লাড্ষ্টোন এবং ব্রাইট্ এই তিন জন ভিন্ন আর কেহই শ্রমজীবীদিগকে সেই ভীষণ সংঘর্ষ হইতে বিরত করিতে পারিতেন না। কিন্তু ব্রাইট্ তৎকালে নগরে উপস্থিত ছিলেন না, এবং গ্লাড্ষ্টোন কোন বিশেষ কারণে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; সুতরাং একমাত্র মিল্ ব্যতীত টোরিদিগকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার আর কেহই ছিলেন না।

কিছুদিন পরে শ্রমজীবিশ্রেণীর অভ্যুত্থানের প্রতিশোধ লইবার জন্য টোরি গবর্ণমেণ্ট পার্কে সাধারণ সভা আহ্বান নিষেধক এক বিল্ অবতারিত করিলেন। মিল্ শুদ্ধ স্বয়ং এই বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে; তিনি অনেক গুলি অগ্রগত লিবারেল্কে ইহার বিরোধী করিয়া তুলিলেন, এবং আপনি তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সমবেত যত্নে বিল্ পরাভূত হইল। টোরিরা এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় বার হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন না।

মিল্ আয়র্লণ্ড বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। পার্লেমেণ্টীয় সভ্যদিগের যে দল মন্ত্রিবর লর্ড ডর্বীর নিকট ফেণীয় বিদ্রোহী সেনাপতি বর্কের জীবন ভিক্ষা করিতে যান, তিনি তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই দলের অধিনায়কেরা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পার্লেমেণ্টের অধিবেশনের সময় আয়র্লণ্ডের চর্চ্চবিষয়ক প্রশ্ন এরূপ পারদর্শিতার সহিত করায়ত্ত করেন, যে মিল্কে এ বিষয়ে শুদ্ধ তাঁহাদিগের স্বপক্ষতা অবলম্বন ভিন্ন আর কিছুই করিতে হয় নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড রসেলের মন্ত্রিত্ব কালে

আয়র্লণ্ডের ভূমি সংস্কার বিষয়ে যে বিল্ প্রস্তাবিত হয়, তদুপলক্ষে মিল্ একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। তৎকালে ভূমি-বিষয়ে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। ঐই কুসংস্কারবশতঃ সেই বিল্ প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডর্বীর মন্ত্রিত্ব-কালে পুনরায় সেই রূপ আর একটী বিল্ অবতারিত হয়। এ বিল্টীও প্রথম বিল্টীর ন্যায় দ্বিতীয় বার মাত্র পাঠনার পর প্রত্যাখ্যাত হয়। ইত্য-বসরে আইরিস্ প্রজাদিগের মনের অবস্থা দিন দিন ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের প্রতি বিষাক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা আর এক্ষণে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না। ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হওয়াই তাঁহাদিগের একমাত্র প্রার্থনা—এবং এক মাত্র ইচ্ছা হইয়া উঠিল। যাঁহাদিগের চক্ষু ছিল, তাঁহারা দেখি-লেন যে কি রাজনৈতিক কি সামা-জিক সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত আয়র্লণ্ডকে আর শান্ত করি-বার উপায়ান্তর নাই। মিল্ দেখি-লেন এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় তিনি নীরব থাকিলে অধিকতর অনিষ্টের সম্ভা-বনা। এই ভাবিয়া তিনি লেখনী ধারণ করিলেন; এবং "ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড" নামক একটী প্রস্তাব লিখিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পার্লেমেণ্টার অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকা-কারে প্রকাশিত করেন। এই প্রস্তাবে এক দিকে আয়র্লণ্ডকে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করা হইল যে ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে শুভকর নয়; এবং অন্য দিকে পার্লেমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করা হইল যেন আয়র্লণ্ডের ভূমি বিষয়ক ও অন্যান্য প্রশ্নের অচিরাৎ সুমীমাংসা করা হয়। এই পত্রিকায় তিনি আয়র্ল-ণ্ডের প্রজাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করে ভূমিতে স্থায়ি স্বত্ব প্রদানের, এবং কোন্ কোন্ ভূমির উপর কিরূপ কর নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত তন্নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আসেসর নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

মিলের প্রস্তাব আয়র্লণ্ড ভিন্ন আর কুত্রাপি আদৃত হইল না। ইহা যে ইংলণ্ডে আদৃত হইবে মিল্ এরূপ আশাও করেন নাই। তিনি যে সকল সংস্কা-রের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত না হইলে, আয়র্লণ্ডে যে কখনই শান্তি সংস্থাপিত হইবে না—তিনি তাহা অসন্দিগ্ধ রূপে জানিতেন। এই জন্যই তিনি এ স্থলে কিছু না বলিয়া নীরব থাকা অনুচিত বলিয়া মনে করিলেন। আর বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিলে, লোকে ততদূর অগ্রসর হইতে না পারুক, অন্ততঃ মধ্য বিন্দু পর্য্যন্তও গমন করিবে। মিলের এই পত্রিকা প্রচারিত না হইলে গ্লাড্‌ষ্টোনের আইরিস্ বিল্ কখনই পার্লেমেণ্টে অনুমোদিত হইতে পারিত না। আয়-র্লণ্ডের ঘটনা এত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে অচিরাৎ গুরুতর

সংস্কার সম্পাদিত না হইলে ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা এবং সেই সংস্কার সংসাধনের জন্য কতক গুলি সম্ভ্রান্ত লোক দলবদ্ধ হইয়াছেন—ইংলণ্ডের প্রজাদিগের মনে এরূপ প্রতীতি না জন্মিলে গ্লাড্‌ষ্টোনের আইরিস্ বিল্ পার্লেমেণ্টে অবতারিত হইয়াই প্রত্যাখ্যাত হইত। ব্রিটিস্ প্রজাসাধারণের, অন্ততঃ উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর, এই একটী প্রকৃতিগত ধর্ম্ম যে কোন একটী পরিবর্ত্তনের অনুমোদন করিতে হইলে, তাঁহারা অগ্রে জানিতে চান যে সেই পরিবর্ত্তনটী মাধ্যমিক কি না। তাঁহারা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব মাত্রকেই প্রথমে চরম (১) ও সমাজদ্রোহী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যখন এমন দুইটী পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হয়, যাহার একটী অন্যটী অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগত, তখন তাঁহারা প্রথমোক্তটীকে চরম ও সমাজদ্রোহী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া শেষোক্তটীকে মাধ্যমিক বলিয়া অবলম্বন করেন। এখানেও ঠিক্ সেইরূপ ঘটিল। মিলের প্রস্তাবটী চরম বলিয়া পরিত্যক্ত হইল বটে, কিন্তু গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত মাধ্যমিক বলিয়া অবলম্বিত হইল। মিলের প্রস্তাব অগ্রে প্রস্তুত না হইলে, গ্লাড্‌ষ্টোনের বিল্ও চরম বলিয়া পরিত্যক্ত হইত।

আয়র্লণ্ডবিষয়ে মিলের যে পত্রিকা প্রচারিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল যে গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট করে ভূমির উপর প্রজাদিগের চিরস্থায়ি স্বত্ব সংস্থাপিত করিবেন। ইহাতে যদি ভূম্যধিকারীরা অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট উচিত মূল্যে তাঁহাদিগের ভূমিসম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন; অথবা ইচ্ছা করিলে তাঁহারা প্রজাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধে ভূমিসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারেন। মিল্ জানিতেন যে ভূম্যধিকারীরা এরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মেও তাঁহাদিগের ভূমিসম্পত্তি রক্ষা করিবেন, তথাপি গবর্ণমেণ্টের মশোহারাভোগী হইবেন না। কিন্তু লোকে মিলের প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তাঁহারা মিলের প্রস্তাবের মর্ম্ম বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ ও প্রচারিত করিলেন। তাঁহারা এরূপ রটনা করিলেন যে মিল্ গবর্ণমেণ্টকে আয়র্লণ্ডের সমস্ত ভূমিসম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়া একমাত্র ভূম্যধিকারী হইতে উপদেশ দিতেছেন। মিল্ মিষ্টার মাগায়ারের প্রস্তাব ও মিষ্টার ফর্টেস্কুর বিল্ উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম সংশোধনার্থ দুইটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাদ্বয় মিলের অনুমতিক্রমে আয়র্লণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এই সময় আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্যভার মিলের মস্তকে ন্যস্ত হয়। এই সময় জামেকার নিগ্রোরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। এই অভ্যুত্থান ইংলণ্ডের অবিচার দ্বারা প্রথমে উত্তেজিত হইয়া, অবশেষে ভয়ে ও ক্রোধে

(1) Extreme.

বিদ্রোহে পরিণত হয়। এই সূত্রে জামেকার অসংখ্য নির্দ্দোষী লোকের জীবন কোর্ট্‌স মার্সেলের (২) আদেশে নৃশংস সৈনিক পুরুষ দ্বারা নির্দ্দয়রূপে হত হয়। বিদ্রোহ নিবারিত হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কোর্ট্‌স মার্সেল্‌ উপবিষ্ট থাকে। অসি নিষ্কোশিত ও বন্দুকাদি নির্ম্মুক্ত-মুখ হইলে যে সকল ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল কাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা, এ ক্ষেত্রে সে সমস্তই ঘটিয়াছিল। লোকের ধন, প্রাণ, মান কিছুই নিরাপদ ছিল না। যাহার সম্পত্তি আছে, সে সর্ব্বস্বান্তীকৃত হইল। যে সম্পত্তি-বিহীন অথচ সন্দেহ-পাত্র, সে শাণিত অসির খরধারায় বা বন্দুক-মুখে পতিত হইল। বালবনিতা বেত্রাহত হইল। অত্যাচারের আর সীমা পরি-সীমা রহিল না। ইংলণ্ডের যে সকল লোক এতদিন নিগ্রো দাসত্বের সমর্থন করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই এই ঘাতুকদিগের নৃশংস কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। মিল্‌ দেখিলেন যে এরূপ ঘটনা বিনা দণ্ডে অতীত হইলে ইংলণ্ডের বিপুল যশে একটী গভীর কলঙ্করেখা পতিত হইবে। এইজন্য তিনি পার্লেমেণ্টের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। এই আন্দোলন উত্থাপিত করার পর কোন কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। তথা হইতে শুনিলেন যে জামেকার স্বপক্ষে কতকগুলি ভদ্রলোক দলবদ্ধ হইয়াছেন; জামেকার বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ও তৎপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তদনুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহারা একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন; এই সভার নাম তাঁহারা জামেকা কমিটি রাখিয়াছেন; এবং চতুর্দ্দিক্‌ হইতে এই সভার সভ্যসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সংবাদে মিলের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সেই স্থানান্তর হইতেই সেই সভার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার নিমিত্ত নিজ নাম প্রেরণ করিলেন। এবং অচিরকাল মধ্যেই নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সভার কার্য্য সম্পাদন জন্য স্বয়ং বিশেষ শ্রম ও যত্ন করিতে লাগি-লেন। জামেকার এই ঘটনা যদি অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু এই শোচনীয় ব্যাপার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহা-দিগের মুখে আর কথা নাই। তাঁহারা শুদ্ধ তুষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার অনুমোদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে, স্পষ্টাক্ষরে ইহার সমর্থন করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই।

মিল্‌ দেখিলেন এই ঘটনা দ্বারা শুদ্ধ নিগ্রো দিগেরই প্রতি ন্যায়পরতাব ব্যাঘাতসম্পা-দিত হইয়াছিল এরূপ নহে; ইহাদ্বারা গ্রেট্‌ ব্রিটেন ও ইহার অধীন দেশ সকলেরও স্বাধীনতার লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়া

(2) Courts martial.

উঠিল। এক্ষণে এই প্রশ্ন অভ্যুত্থিত হইল যে ব্রিটিশ প্রজারা কোন নির্দ্দিষ্ট দণ্ডবিধির অধীন, কি সৈনিক যথেচ্ছাচারের অধীন; ব্রিটিশ্ প্রজাদিগের দেহ ও জীবন এখন হইতে দুই বা তিন জন ভূয়োদর্শন-বিরহিত অপরিণত-বুদ্ধি বিশৃঙ্খল-স্বভাব নৃশংস সৈনিক পুরুষের দয়ার উপর নির্ভর করিবে, কি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিবে; কোন গবর্ণর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলেই দুই তিন জন অজাতশ্মশ্রু সৈনিক পুরুষের উপর প্রজাদিগের দেহ প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবেন কি না। ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা কেবল বিচারালয় দ্বারাই হইতে পারে। এইজন্য জামেকা কমিটি এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কমিটি স্থির করিলেন যে জামেকার গবর্ণর আয়ার্ (১) এবং তাঁহার প্রধান প্রধান সহযোগিদিগের নামে ইংলণ্ডের ফৌজদারি আদালতে অভিযোগ করিতে হইবে। সভাপতি চার্লস বক্সটন ইহাতে স্বীকৃত না হইয়া সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। এই শূন্য আসনে মিল্ অভিষিক্ত হন। মিল্ পার্লেমেণ্টে এই সভার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কখন বা তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের নানাবিষয়ে প্রশ্ন করিতে হইত, কখন বা তাঁহাকে কমিটির প্রতিনিধি বলিয়া পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগের নিকট হইতে ক্রোধোদ্দীপক কর্কশ বাক্য সকল শুনিতে হইত। বক্সটন্ জামেকাবিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে, মিল্ তদুপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহা—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল্ পার্লেমেণ্টে যত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে—সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কমিটি প্রায় দুই বৎসর কাল এই বিষয়ের জন্য ঘোরতর লড়িলেন; ফৌজদারী আদালতে আইন অনুসারে যত কিছু চেষ্টা সম্ভব সমস্তই করিলেন; কিন্তু কিছুতেই বিশেষ ফলোদয় হইল না। ইংলণ্ডের একটী টোরি কাউণ্টির ম্যাজিষ্ট্রেট্ দিগের নিকট এই মকদ্দমা উপস্থিত করায় তাঁহারা ইহা ডিস্‌মিস্ করিলেন। কিন্তু বাউ ষ্ট্রীটের ম্যাজিষ্ট্রেট্ দিগের নিকট এই নালিশ উত্থাপিত করায়, তাঁহারা এই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া কুইন্‌স বেঞ্চের লর্ড চীফ্ জষ্টিস্ সার্ আলেক্‌জণ্ডার কক্‌বরণের নিকট ইহা বিচারার্থ সমর্পণ করিলেন। কক্‌বরন্ চার্জ প্রদানের সময় এই বিষয়ে বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনতার দিকেই হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওল্‌ড বেলী গ্রাণ্ড্ জুরি দ্বারা জামেকা কমিটী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিল্ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, এই মকদ্দমার বিচার হইতে পারিল না। ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীরা নিগ্রো-প্রভৃতির প্রতি প্রভুশক্তির অসদ্ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ডের কোন ফৌজদারী আদালতে যে দণ্ড প্রাপ্ত হন, ইহা ইংলণ্ডের অধিবাসিদিগের অতিশয় অপ্রী-

(1) Eyre.

তিকর। যাহাহউক তাঁহাদিগের চেষ্টায় একটী বিশেষ উপকার হইল। নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে ইংলণ্ডের চরিত্র কিয়ৎ পরিমাণে সংরক্ষিত হইল। সকলে জানিতে পারিল যে ইংলণ্ডে অন্ততঃ জন কতক মনীষী আছেন, যাঁহারা—যাহাতে উৎপীড়িতদিগের প্রতি সদ্বিচার হয়—তজ্জন্য কোন উপায়ই অনবলম্বিত রাখিবেন না। (২) ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ ফৌজদারী আদালত স্বাধীনতার স্বাপক্ষ্যে এক অবিসম্বাদিত মত প্রচার করিলেন। (৩) রাজকর্ম্মচারিদিগকে সাবধান করা হইল যে তাঁহারা যেন অতঃপর এরূপ নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন; তাঁহারা ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদিগকে যে ব্যয় ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে তাহা নিতান্ত সামান্য হইবে না।

যৎকালে জামেকা বিষয়ে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, তৎকালে মিল্ নানা স্থান হইতে নানা প্রকার বেনামী চিঠি প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ডের নৃশংস অধিবাসিদিগের মধ্যে অনেকেই যে নৃশংসহৃদয় এবং তাহাদিগের অনেকেরই যে জামেকার হত্যাকাণ্ডের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এই পত্রগুলি তাহার নিদর্শন। এই পত্র গুলিতে মিলের প্রতি নানা প্রকার রহস্য বিদ্রূপ ও কটূক্তি পর্য্যন্ত ও প্রযুক্ত, এবং গুপ্তহত্যার ভয় পর্য্যন্তও প্রদর্শিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ।

# কবিত্ব ও কাব্য সমালোচনা

## পঞ্চম প্রস্তাব।

সুখান্ত আখ্যান, দুঃখান্ত আখ্যানের ঠিক বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত; উহা অন্তঃকরণকে ক্রমে বিকশিত, বিস্তৃত ও উন্নত করিতে করিতে একটি প্রশস্ত সুখ-ক্ষেত্র দেখাইয়া পরিসমাপ্ত হয়। আমরা দুঃখান্ত উপাখ্যানের প্রকৃতির বিষয় আলোচনার সময় সুখান্ত উপাখ্যানের প্রকৃতিও একরূপ দেখাইয়াছি। উপাখ্যানের শেষ ঘটনাটি কেবল মিলন, সৌভাগ্য ইত্যাদি কোন সুখজনক ঘটনায় পর্য্যবসিত হইলেই উহা সুখান্ত সংজ্ঞা পাইতে পারে না। সুখান্ত ও দুঃখান্ত অর্থে, উপাখ্যানের শেষ ঘটনাটিতেই যে কেবল সুখ বা দুঃখ জনক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা নয়; আপূর্ব্ব উপাখ্যানের সুখ, দুঃখ উভয় রসের যেটী প্রবল হইয়া, একটিকে অতিক্রম করিয়া অপরটি তাহার অন্তে গিয়া দাঁড়ায়, উপাখ্যানকে আমরা সেই রসান্তক সংজ্ঞা দিয়া থাকি। সুখান্ত দুঃখান্ত অর্থে সুখ দুঃখ ঘটনান্ত বুঝিতে হইবে না, সুখ-রসান্ত দুঃখ-রসান্ত বুঝা উচিত।

একটি রসকে প্রবল করিতে হইলে,

তাহার বিপরীত রসের সহায়তার প্রয়োজন; কিন্তু বিপরীত রস স্বয়ং অধিক প্রবল হইয়া যেন উদ্দেশ্য রসকে লঘু করিয়া না ফেলে। বিপরীত রসের সহায়তা ব্যতীত কোন রস প্রবল রূপে দেখাইতে পারা যায় না; নীল মেঘের উপরেই বিদ্যুতের অধিক দীপ্তি। সেক্সপিয়র ডন্ক্যান্কে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইবার এবং ম্যাক্বেথের তীক্ষ্ণ ছুরিকার স্পর্শ অনুভব করাইবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে সুন্দর শোভা দেখাইতেছেন, এবং সুন্দর সমীরণের সুখময় স্পর্শানুভব করাইতেছেন। ডন্ক্যান্ ম্যাক্বেথের দুর্গসমীপস্থ হইয়া কহিতেছেন—

"This castle hath a pleasant seat; the air
Nimbly and sweetly recommends itself
Unto our gentle senses."

কালিদাস শকুন্তলার প্রণয়সুখোজ্জ্বল অন্তরপটে, দুর্ব্বাশার শাপের বিড়ম্বনা কালি ঢালিলেন, উহা কিয়ৎ পরিমাণে গাঢ় করিলেন, তদপরে উহা অপসৃত করিয়া রাজার সহিত সম্মিলনে, তাঁহার অন্তকরণকে মেঘমুক্ত রবির ন্যায় দ্বিগুণ কিরণে উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। সুখ দুঃখ কোন উদ্দেশ্য রসের প্রাবল্য এই রূপেই সংসাধিত হইয়া থাকে। একটি রসেরই আদ্যন্ত প্রবাহ ধৈর্য্য লোপকারী হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত রস-বৈচিত্র্যতারও প্রয়োজন। আমরা সুখান্ত উপাখ্যানের উদাহরণার্থে, একটী উপাখ্যানের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে দেখাইব।

কবি বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরী উপাখ্যান—এই উপাখ্যানে দুইটি নায়ক এবং দুইটি নায়িকা। নায়ক-দ্বয় চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন; নায়িকা-দ্বয় কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা। চন্দ্রাপীড় প্রিয় বয়স্য বৈশম্পায়ন ও সৈন্য সামন্তসহ দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া পশ্চিম উত্তরদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, কৈলাশ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হেমজট নামক কিরাতদিগের সুবর্ণপুর নাম্নী নগরী আক্রমণ ও অধিকার করিয়া পরিশ্রান্ত সৈন্যগণসহ কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। একদা মৃগয়ার্থ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিন্নর মিথুনের অনুসরণে সৈন্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী দূরবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ঐ স্থানে অচ্ছোদ নামক সরোবরে শরীরের কান্তি দূর করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা সরসীর উত্তর তীরে বীণা-তন্ত্রী-মিশ্রিত সঙ্গীতধ্বনি শুনিলেন, এবং তাহার অনুসরণে কিয়দ্দূর আসিয়া পর্ব্বতের নিম্নদেশে এক মন্দিরে শূলপাণির প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থানে পবিত্র-মূরতি পরমাসুন্দরী নবীন-যোগিনী মহাশ্বেতার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইল; তিনি সেই অলৌকিক প্রতিমার নবীন-বয়সে কঠোর তাপসব্রতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তাপসী আত্ম বৃত্তান্তের কথা স্মরণে রোদন করিয়া

উঠিলেন। চন্দ্রাপীড় বুঝিলেন মহাশ্বেতা কোন গভীর মর্ম্ম-পীড়ায় উদাসিনী। কবি মহাশ্বেতার এই মনসিজ মুরতির আবির্ভাব করিয়াই দুঃখের ছাঁয়ায় সহসা তাঁহাকে ম্লান করিয়া ফেলিলেন। চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার প্রমুখাৎ পুণ্ডরীক সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও প্রণয়োদ্ভব বৃত্তান্ত শুনিলেন; তাঁহার বিরহে পুণ্ডরীকের প্রাণ পরিত্যাগ, পুণ্ডরীকের দেহ হরণ ও ভবিষ্যৎবাণীর বৃত্তান্ত সকলি শুনিলেন। কবি দেখাইলেন মহাশ্বেতা স্বর্গীয় প্রণয়ের প্রতিমূর্ত্তি; তাঁহার দৈব বিড়ম্বনার দুঃখে আমরা বিষম দুঃখিত হইলাম; কিন্তু দুঃখ আমাদিগের উপর জয় লাভ করিতে পারিল না; আশা আমাদিগের প্রবল, দৈববাণী আমাদিগের আশাকে জাগরুক করিয়া রাখিয়াছে। মহাশ্বেতার অদৃষ্টে এই দুঃখাবতারণ তাঁহার মিলন-সুখকে সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত মাত্র। এইরূপ দুখের সহায়তা বিনা সুখের প্রাবল্য-সাধন অন্য উপায়ে এত পরিমাণে কখনই হইতে পারিত না। চন্দ্রাপীড়ের বৃত্তান্তও এই রূপ; কাদম্বরীর সহিত প্রথমতঃ প্রণয়, তৎপরে বিচ্ছেদ ও বিড়ম্বনা, এবং তৎপরে সম্মিলন সুখের সীমা। আদ্যন্ত উপাখ্যানে কবির মন্ত্রণা অতীব জটিল ও রমণীয়, সে সমস্ত উল্লেখের আমাদের প্রয়োজন নাই। আখ্যায়িকা পাঠেই তাহা অনুভূত হইতে পারে। আমরা কেবল দেখাইলাম সুখান্ত উপাখ্যানে দুঃখের সহায়ে সুখস্রোত কেমন প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করে; দুঃখ সুখকে জয় করিতে পারে না, সুখ পরিশেষে দুঃখকে অধঃকৃত করিয়া তাহার উপরে প্রবল রূপে ভাসিতে থাকে।

যে উপাখ্যানের সুখের প্রকৃতি গুরু এবং সারবান না হইয়া, লঘু এবং অসার হইয়া উঠে, তাহাকে "প্রহসন" সংজ্ঞা দেওয়া যায়। ইহাতে মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা, লঘুচিত্ততা, অসারতার খাম্‌-খেয়ালী প্রভৃতি চিত্রিত হইয়া থাকে। সুখান্ত উপাখ্যানের সহিত প্রহসনের প্রকৃতিগত বৈপরীত্য আছে; সুখান্ত উপাখ্যান সহানুভূতিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আকর্ষণ করিয়া থাকে; প্রহসনে পরম্পরা সম্বন্ধে উহার উৎপত্তি হয়। সুখান্ত উপাখ্যানে নায়ক নায়িকার ভাবে অন্তঃকরণ আশু অনুলিপ্ত হইয়া পড়ে, প্রহসনে অন্তঃকরণ নির্লিপ্ত থাকিয়া তাহার উপর ক্রীড়া করিতে থাকে। মহাশ্বেতার ভাবে আমরা অনুলিপ্ত হইয়া পড়ি, "ডন কুইক্সোটের" ভাবে নির্লিপ্ত থাকিয়া উহার উপর অন্তঃকরণের ক্রীড়া দেখি। কিন্তু এই অন্তঃকরণের ক্রীড়ার শেষ ফল অনুলিপ্ততা বা সহানুভূতি। 'ডন কুইক্সোটের'' বুদ্ধি-ভ্রংসতা ও অসারতায় আমরা যতই কেন হাসি না, কিন্তু সে হাসি ক্ষণস্থায়ী; হাসির পরে সহানুভূতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত, সৎবংশজাত, মহাত্মা ডন্‌কুইক্সোটের, উচ্চ এবং মহৎ অভিলাষকে বাতুলতায় পরিণত হইতে দেখিয়া,

আমরা সেই বাতুলতায় কেবল হাসিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিনা; এমন মহতী বুদ্ধির ভ্রংসতা দর্শনের পরক্ষণেই সহানুভূতি দ্বারা দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই রসিকতাই উৎকৃষ্ট রসিকতা, সহানুভূতিই যাহার শেষ ফল! এতদ্‌সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ লেখক "কারলাইল" একস্থানে কহিয়াছেন— "True humor springs not more from the head, than from the heart; it is not contempt, its essence is love; it issues not in aughter, but in still smiles which lie far deeper"। প্রহসনের হাই সার প্রকৃতি; ইহার উদাহরণের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। আমরা আখ্যানমূলক খণ্ডকাব্যের স্থূল কয়েকটী বিষয় একরূপ বলিলাম, এক্ষণে মহাকাব্যের স্থূল বিষয় কিছু বলিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন নায়ক নায়িকার স্বকীয় ক্ষেত্রের ঘটনাবলি লইয়া যে উপাখ্যান রচিত হয়, তাহার ' নাম খণ্ড কাব্য; আর সাধারণ ক্ষেত্রের ব্যক্তি সাধারণের কোন বিশেষ প্রসঙ্গ লইয়া যে আখ্যান রচিত হয়, তাহাব নাম মহাকাব্য। মহাকাব্য সকলই কবি-কল্পনার সুমহৎ ও গৌরবোজ্জ্বল কীর্ত্তি; ইহার মহত্ত্ব ও গৌরব সাধনের নিমিত্ত কবি ব্যক্তিবিশেষ হইতে জনসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করেন; এবং ব্যক্তি বিশেষের শক্তি হইতে জনসাধারণের শক্তি, তাহার উপর মানবীয় শক্তির অতিরিক্ত অমানুষিক শক্তির আকর দেব-প্রকৃতির পর্য্যন্ত আবির্ভাব করিয়া মহদ্ব্যাপারের আড়ম্বর করিয়া ফেলেন; আকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ হইয়া আর কোন দিকে তাহার পথ খুঁজিয়া পায় না, যেহেতু মহাকাব্যেই কবি-কল্পনার মহৎ হইতে মহৎ এবং অতীত হইতে অতীত বিষয়ের সৃষ্টি দেখাইয়া থাকেন; আকাঙ্ক্ষার এই খানেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি, এই নিমিত্ত আমরা মহাকাব্যকে কাব্যোন্নতির চরম সোপান বলিতে পারি। ইহার রচনায় মানবীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পূর্ণ পরিচয় ও কল্পনার উচ্চতম উড্ডয়নের প্রয়োজন। কবি মহাকাব্য রচনায় কেবল মানব-প্রকৃতির জ্ঞান লইয়াই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; দেশ কাল ভেদে সামাজিক রীতি, নীতি, বিদ্যা, ধর্ম্ম, বিশ্বাস এবং ভূবৃত্তান্ত পর্য্যন্তও তাঁহাকে জানিতে হয়, কারণ ইহারই উপরে তাঁহার কল্পনা স্থাপিত হইয়া থাকে। মানব স্বভাব আপন আপন ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ক্ষেত্রে কিরূপ কাজ করে তাহাই দেখান তাঁহার মূল উদ্দেশ্য, এই হেতু তাঁহাকে বহুতর চরিত্র সমবেত করিতে হয়, এই সকল চরিত্রের প্রত্যেকেরই প্রকৃতিগত বিবিধ বৈচিত্র্য অথচ সেই বৈচিত্র্য সকল একই উদ্দেশ্যে কিরূপ সংযত, এবং তাহার তারতম্যের কি ফল কবি তাহা দেখাইয়া থাকেন। ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য হোমর প্রণীত "ইলিয়দ"; ভারতবর্ষীয়

মহাকাব্য সকলের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতই সর্ব্ব প্রধান। পৃথিবীর মধ্যে এই তিন খানি কাব্যই কবি-কল্পনার অদ্ভুত সৃষ্টি। এই তিন খানি মহাকাব্যেরই উপাখ্যান সর্ব্ব সাধারণই অবগত আছেন; আমরা সেই উপাখ্যানের পুনরুল্লেখ না করিয়া কেবল মহাকাব্যের লক্ষণ গুলি উহাতে দেখাইয়া দিব। হোমর-প্রণীত ইলিয়দ মহাকাব্যের বিষয় অতি সামান্য; "একিলিসের ক্রোধ" ইহার অবলম্বিত বিষয়। থেসেলিয়ার রাজা একিলিস্ বহুল গ্রীসীয় সম্প্রদায় মধ্যে একটী ব্যক্তি মাত্র এবং তাঁহার ক্রোধ একটি সামান্য বিষয়; কবি ইহাই অবলম্বন করিয়া জাতি-সাধারণ লক্ষ লক্ষ মানবের ভাগ্য একত্র সম্বদ্ধ করিয়া প্রলয় ঘটনার ন্যায় মহাসমর ঘটনার অবতারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন করিয়া মহত্তের চরম সৃজন হইল। একিলিসের ক্রোধের উৎপত্তি, এবং তাহার ভয়ঙ্কর ফল জন-সাধারণের ভোগ্য না হইলে কখনই সেই ক্রোধের বিষয় মহাকাব্যের বিষয় হইতে পারিত না। আমরা এই সর্ব্বনাশক ক্রোধোৎপত্তির বিষয়ে কবির সূক্ষ্ম ও সুন্দর কৌশল উদ্ভাবনের ঘটনাটী দেখাইবার পূর্ব্বে, তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্তটী সংক্ষেপে বলিব; যেহেতু মহাকাব্যের উৎপত্তির মূল কৌশল তথায় ন্যস্ত রহিয়াছে।

ট্রয় নগরের রাজপুত্র পারিস্ গ্রীসাধিপতি এগামাম্ননের ভ্রাতা মেনেলেয়সের পত্নী হেলেন্‌কে হরণ করিয়া ট্রয়নগরে আসেন; এই অপমানে জাতীয় উচ্ছ্বাস উপস্থিত হইল, সমস্ত গ্রীস্যাধিপতিরা একযোগ হইয়া, সসজ্জিত পোতারোহণে সাগর অতিক্রম করিয়া ট্রয়নগর আসিয়া অবরোধ করিলেন। গ্রীসীয় অধ্যক্ষগণ এগামাম্ননকে প্রধানাধ্যক্ষ করিয়া আপনারা তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া রহিলেন। যুদ্ধ আবহমান জয় পরাজয়ে চলিতে লাগিল। প্রকৃতি-গত বৈচিত্র্যের দ্বন্দ্ব সাধারণ উদ্দেশ্যে লয় পাইয়া কিছুকাল চলিল; তৎপরে তাহার প্রাবল্যে সাধারণ উদ্দেশ্য ভাঙ্গিয়া গেল। এই স্থলেই একিলিসের ক্রোধোৎপত্তির কারণ। কিরূপে এক উদ্দেশ্যে পরিণত বিভিন্ন প্রকৃতি পরস্পরের বিরোধী হইয়া উঠিল; সেই কৌশল টুকুই কবির মানবচরিত্র-পরিজ্ঞানের এবং কাব্যকলার বিশেষ কৌশল। এগামাম্নন্, মেনেলেয়স্, নেস্টার, ইউলিসিস্, একিলিস্, আ্যাজাক্স প্রভৃতি সকলেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। ইহাঁদের প্রত্যেকেই স্বকীয় ইষ্টজ্ঞান প্রবল রহিয়াছে; সাধারণ ইষ্ট-জ্ঞানের সহিত কখন উহা পরিতৃপ্তি পাইয়া একতানে বাজিতেছে, কখন বা তাহা না পাইলেও সংযমিত রহিয়াছে, কিন্তু উহা এতক আন্তরিক আঘাত পাইয়া উহার বিরুদ্ধে বাজে নাই, কবি সেই আন্তরিক আঘাত প্রদানের কৌশল পাতিলেন। গ্রীসীয়েরা এতদিন যে সকল নগর বা দুর্গ অধিকার বা জয় করিতেছিলেন,

তাহার লুণ্ঠন সকলে বিভাগ করিয়া লইতেছিলেন, স্বকীয় ইষ্ট সিদ্ধ হইয়া সাধারণ ইষ্টের সহিত মিলিয়া এক-ধ্বনি করিতেছিল। এগামাম্‌নান্‌, একিলিস্‌, আজ্যাক্স প্রভৃতি সকলে আপন আপন মনোমত এক একটী ট্রোজান সুন্দরী বন্দিনা গ্রহণ করিয়াছিলেন; বিজয়ী বীরপুরুষের অন্তঃকরণ যশো-গৌরবের ন্যায় প্রণয়-গৌরবে অধিক মুগ্ধ; তাঁহারা আপন আপন প্রিয়ার প্রণয়-লালসায় গাঢ় অনুরক্ত; কবি এই অনুরাগের মূলে আকর্ষী বাঁধাইলেন, এবং এমন স্থানে বাঁধাইলেন যাহাতে সমস্ত গ্রীসীয় ঠাট আলোড়িত হইতে লাগিল। গ্রীসীয়েরা নিকটস্থ কয়েকটী নগর লুণ্ঠন করিয়া অন্যান্যলুণ্ঠন সামগ্রীর সহিত ক্রাইসেইস্‌ ও ব্রাইসেইস্‌ নামক দুইটী পরমাসুন্দরী কামিনীকে বন্দিনী করিয়া লইয়া আইসেন; তন্মধ্যে প্রথমটীকে এগামাম্‌নান ও দ্বিতীয়টীক একিলিস্‌ গ্রহণ করেন। ক্রাইসেইসের পিতা ক্রাইসেস্‌ আপোলো দেবের পুরোহিত ছিলেন, তিনি নিজ কন্যার বন্ধন মোচনার্থে উপযুক্ত অর্থ লইয়া গ্রীসীয় শিবিরে আসিয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এবং অর্থ দিতে স্বীকার হইয়া অনেক অনুনয় বিনয়ে আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন; সমস্ত গ্রীসীয় যোদ্ধা একবাক্যে ক্রাইসেইসের মুক্তির পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এগামাম্‌নান্‌ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগে পুরোহিতকে শিবির হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। পুরোহিত কাতর অন্তঃকরণে সাগর-উপকূলে আসিয়া আপনার ইষ্টদেব উদ্দেশ্যে মনঃদুঃখের কথা জানাইয়া সজল নয়নে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পুরোহিতের দুঃখে অ্যাপোলোদেবের গ্রীসীয়দিগের প্রতি ক্রোধোৎপত্তি হইল, এবং তাঁহার ক্রোধে গ্রীস শিবিরে মহামারি উপস্থিত হইয়া সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। পশুপাল এবং মানুষ রাশি রাশি মরিয়া সমর ক্ষেত্রকে শবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন একিলিস্‌ একটি সভা আহ্বান করিয়া, সভামধ্যে গ্রীস্‌দিগের পুরোহিত কাল্‌কসের প্রতি, মহামারির কারণ নির্দ্দেশের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কাল্‌কস্‌ ক্রাইসেইস্‌কে মুক্তি না দেওয়াই ইহার কারণ, সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিলেন; এবং আরো কহিলেন যে পর্য্যন্ত না ক্রাইসেইস্‌কে বিনা নিষ্ক্রয়ে মুক্তি দেওয়া হইবে, সে পর্য্যন্ত মহামারি কখনই থামিবে না। আগামাম্‌নন্‌ এই বাক্য শ্রবণে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হইয়া কহিলেন তিনি ক্রাইসেইস্‌কে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছেন, যদি গ্রীসীয়েরা তাঁহার নিজের ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন। অ্যাজাক্স ইউলিসিস্‌, প্রভৃতি সকলেই আপন আপন জয়-লুণ্ঠন বস্তু পরিত্যাগ করিবেন, এবং ক্রাইসেইসের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে একিলিসের ব্রাইসেইস্‌কে প্রদান করিতে হইবে। একিলিস্‌ ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া অ্যাগামান্‌নকে ভর্ৎসনা করিলেন; উভয়ে

ঘোর বিতণ্ডা হইল, অবশেষে অ্যাগামামনন্ স্বজোরে ব্রাইসেইস্‌কে একিলিসের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। একিলিসের ইহাই ক্রোধের কারণ; একিলিস্ ক্রুদ্ধ অন্তঃকরণে নিজ সৈন্যদল পৃথক্ করিয়া লইয়া সাগরমধ্যে গিয়া নঙ্গর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন. এবং তাঁহার জননী থেটিসের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁহা দ্বারা জুপিটারকে উত্তেজিত করিয়া গ্রীসীয়দিগের বিপক্ষ করিয়া তুলিলেন। হেক্‌টরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এই অবধি গ্রীসীয়দিগের ঘোর দুর্দ্দশা ঘটিতে লাগিল। আমরা দেখাইলাম. স্বকীয় ইষ্টের প্রাবল্যে কিরূপে সাধারণ ইষ্ট ভাঙ্গিয়া যায়। এই সাধারণ ইষ্ট ভাঙ্গিয়া ইহার ফল ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিতে লাগিল। দেবতাদেরও মধ্যে পক্ষপাতিত্ব-জ্ঞান প্রবল হইয়া তাঁহারাও আপন আপন প্রিয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘোর বিবাদে উন্মত্ত হইলেন। যুদ্ধের তরঙ্গে সাগরকূল টলমল করিতে লাগিল। জনসাধারণের ইষ্ট অনিষ্টের সহিত তুলনায়, স্বকীয় ইষ্ট অনিষ্ট কত লঘু ও সামান্য তাহা আপাততঃ মানুষের বোধ হয় না. মানুষের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে স্বকীয় ইষ্ট অনিষ্টের প্রতি আকর্ষণই বেশী; কিন্তু যখন জনসাধারণের ইষ্ট অনিষ্টের ব্যাপকক্ষেত্র তাহাদের দৃষ্টি পথে একবার পতিত হয়, তখন স্বকীয় ইষ্ট অনিষ্টকে ছার বলিয়া বোধ হইতে থাকে. এমন কি তখন সর্ব্বস্বার্থের কারণ নিজের জীবন দানেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। গ্রীক্‌দিগের দুর্দ্দশায় একিলিসের অন্তঃকরণ কাঁদিতেছিল, তাঁহার প্রিয়বন্ধু পেট্রোক্লস্ হেক্‌টরের হাতে জীবন হারাইলেন, তিনি দেখিলেন তাঁহারই স্বকীয় অনিষ্টের প্রতিহিংসার নিমিত্ত এই সকল মহৎ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাঁহার ক্রোধ দুঃখের ছায়ায় তখন ম্রিয়মাণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। এ দিকে এগামামনন ও তাঁহার স্বার্থপরতাজনিত মহৎ অনিষ্টোৎপত্তির ফল উপলব্ধি করিয়া মৃদু ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে সহজেই উভয়ের পুনঃ-সম্মিলন সংসাধিত হইল। একিলিসের ক্রোধ শান্তি লাভ করিল। সাধারণ উদ্দেশ্য আবার প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। এই প্রাবল্যের ফল ট্রোজান অদৃষ্টের দীপ্ত দিনমণি হেক্টরের বধ। এই ঘটনার পরই কাব্যের শেষ। কবির কেবল একিলিসের ক্রোধের উৎপত্তি ও শান্তি দেখান মাত্রই উদ্দেশ্য, অতএব তিনি যুদ্ধের পরিণাম দেখাইতে কাব্যকে বিস্তৃত করেন নাই। মহাকাব্য এইরূপ সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রাবল্য দেখাইয়া পরিসমাপ্ত হয়। ইলিয়দ মহাকাব্য ব্যক্তিগত সূত্র অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইল এবং উহারই অন্তে অন্ত লাভ করিল বটে, কিন্তু উহার প্রবল স্রোত সাধারণ উদ্দেশ্য। কবি ব্যক্তিগত ইষ্টোদ্দেশ্যকে প্রবল করিয়া তাহাদ্বারা সাধারণ উদ্দেশ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এবং এক ভাগকে অচল

নিশ্চেষ্ট সাগর মধ্যে স্থাপিত করিয়া পর ভাগকে লইয়া কার্য্য দেখাইলেন; এবং পরিশেষে আবার উভয় ভাগকে একত্রিত করিয়া তাহার কার্য্যফল হেক্টরের বধ সাধন করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। রামায়ণ মহাভারতও এই রূপ জনসাধারণের উচ্ছ্বাসের চিহ্ন। এই দুই গ্রন্থও ইলিদের ন্যায় ব্যক্তিগত স্বার্থ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া আরব্ধ হইয়া পরিশেষে সাধারণ উদ্দেশ্য স্রোতে পরিণত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে যত প্রকার কার্য্যের কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহার সকলই এই মহাকার্য্যের অন্তর্বর্ত্তী। মহাকার্য্যের মধ্যে কোন স্থানে গীত, কোন স্থানে নাটক, কোন স্থানে শ্রাব্য কাব্য প্রভৃতির খণ্ড উপাখ্যান সকলই বিদ্যমান আছে। এই নিমিত্ত একমাত্র মহাকাব্যকেই কাব্যরাজ্যের পূর্ণ কলেবর বলিতে পারা যায়, অপর কাব্য সকল ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র।

মহাকাব্যের ন্যায় মহানাটক প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায় না, উহা অতীব বিরল, এমন কি কোন ভাষায় বিশুদ্ধ মহানাটক আছে কিনা সন্দেহ। সচরাচর যে সকল নাটক দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রায়ই নায়ক নায়িকার ব্যক্তিগত উপাখ্যান মাত্র। কতকগুলি নাটক সাধারণ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া আরব্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা ব্যক্তিগত স্বার্থ-স্রোতের সহিত মিলিয়া তাহাকেই অবশেষে পরিপুষ্ট করিতেছে। প্রকৃত মহানাটকের সৃষ্টি হইলে আমরা কাব্য-রাজ্যের মধ্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি দর্শন করিতাম। জন সাধারণের অন্তঃকরণের আবেগ জনসাধারণের অন্তঃকরণে ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে; সাগরের সহিত সাগরের দ্বন্দ্ব-দৃশ্য, কি রমণীয় গম্ভীর দৃশ্যই দেখিতাম! আমরা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতের দ্বন্দ্বই দেখিয়াছি। সাগরের দ্বন্দ্ব এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। ভবিষ্যতে হয়ত এমন মহামতি কবিও জন্মিতে পারেন, যাঁহার প্রসাদে আমরা উক্ত মূর্ত্তিও দেখিতে পাইব।

আমরা এই প্রস্তাবের আদি প্রস্তাব হইতে যে কয়েক প্রকার কাব্যের বিষয় আলোচনা করিয়া আসিলাম, সেই কয়েক প্রকার কাব্যই কাব্যরাজ্যের প্রধান বিভাগ। এতদ্ব্যতীত অপর যে সকল বিভিন্ন-নাম-ধারী কাব্য, তাহারা হয়ত কেহ ইহারই রূপান্তর, বা ইহারই অন্তঃগত মাত্র। আমরা বিভিন্ন প্রকার কাব্যের কেবল একটি একটী উদাহরণ দিয়া সার সত্য গুলি দেখাইয়া আসিয়াছি; পরিপুষ্ট ও ব্যাপক করিয়া কাব্য ও কবিত্ব সমালোচনা করিতে গেলে, অনেকপর্ব্ব পুস্তক লিখিতে হয়। আমাদের বর্ত্তমান সাধারণ গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গ কাব্যের বিশেষ সার সত্য গুলি না জানাতেই, তাঁহারা কাব্যের প্রকৃত অবতারণ ও রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। এই নিমিত্তই আমাদের এই চেষ্টায় কিয়ৎ পরিমাণে হস্ত ক্ষেপ করা মাত্র। আমরা

ইহার পর প্রস্তাবে কাব্যের ফলের বিষয় কিছু বলিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# শাসন-প্রণালী।

মনুষ্য সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ ভিন্ন অন্য প্রকারে মনুষ্যের অবস্থিতি অসম্ভব। আমরা যতদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যের ইতিহাস অবগত হইতে পারি তাহাতে দেখি যে একটী মনুষ্য কদাচ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিত না। প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ মীমাংসা করিয়াছেন, যে সুচারু রূপে সমাজ গঠনের প্রারম্ভে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ পরিবারবর্গ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। পূর্ব্বতন আর্য্যজাতিগণের মধ্যে যে এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন পরিবারবর্গ বিদ্যমান ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণেও যে সকল অসভ্য জাতির মধ্যে কোন প্রকার সুগঠিত সমাজ নাই, তাহাদিগের মধ্যে এক একটী পৃথক্ পরিবারবর্গ দৃষ্টিগোচর হয়।

অনেক গুলি সুবিধার নিমিত্ত মনুষ্যগণ ক্রমশঃ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে সর্ব্বদাই নানা প্রকার বিপদের আশঙ্কা হইতে পারে। হিংস্র জন্তু এবং তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক দুষ্ট-স্বভাবনরবেশধারী রাক্ষসগণ হইতে নানা প্রকার ভয়ের কারণ উপস্থিত হইত। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ধন এবং প্রাণ নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইত্যাদি কারণ বশতঃ বিপৎ হইতে পরস্পর সংরক্ষণার্থ মনুষ্যবর্গ ঐক্যাবলম্বন পূর্ব্বক কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ পৃথিবীর নানা স্থানে সংস্থাপিত হইল। ক্রমে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার সুবিধা সকলেরই বোধগম্য হওয়ায় যাহারা প্রথমতঃ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার বিদ্বেষী ছিল তাহারাও অবশেষে সমাজের সহিত যোগ দিল। আবার অনেকানেক ক্ষুদ্র সমাজ পরস্পর সাহায্য করণের নিমিত্ত এক দলবদ্ধ হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও মহাদেশের উৎপত্তি হইল। বস্তুতঃ অনেক স্থলে এইরূপ ঘটিয়াছিল যে যাহারা একত্র সমাজবদ্ধ হইল তাহাদের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে তাহারা সকলেই একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান। প্রাচীন গ্রীসইতিহাসে ইহার বহুল উদাহরণ দেখা যায়।

যে কারণেই আদৌ সমাজের সৃষ্টি হউক না কেন তাহার মূল অভিপ্রায় এই যে সাধারণ কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে

সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি বিধান করা। কিন্তু দলবদ্ধ হইতে হইলেই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে দলপতি করিতে হয়। সমাজস্থ সমস্ত ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রধান হইলে কোন রূপেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। যাহার যাহা ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিলে অচিরাৎ সমাজ লয় প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত অপরাপর লোক দলপতির অনুগত হইয়া চলিত। তিনি যাহা আজ্ঞা করিতেন আর আর সকলে তাহা শিরোধার্য্য করিত। এই রূপ আজ্ঞা প্রতিপালন ও বশ্যতা স্বীকার দ্বারা মানবমণ্ডলী সভ্যতার প্রথম সোপানে অধিরোহণ করিল। কিন্তু যখন বহিঃস্থ কোনরূপ বিপদ্ সমাজকে আক্রমণ না করে, তখন সমাজস্থ জনগণের মধ্যেই নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ সময়ে সকলেই একপক্ষ অবলম্বন করাতে পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য জন্মিত। কিন্তু এই ঐক্যের কারণ তিরোহিত হইলে আপনাদিগের মধ্যে হিংসা দ্বেষ অসূয়ার কারণ উপস্থিত হইত। সুতরাং শান্তির সময়েও সমাজের মধ্যে কোন না কোন প্রকার শাসনপ্রণালীর আবশ্যকতা অনুভূত হইল।

আমরা মনুষ্য-হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাই যে তাহা কতকগুলি উৎকৃষ্ট এবং কতকগুলি অপকৃষ্ট গুণের সমষ্টি। আদিম অবস্থায় নিকৃষ্ট গুণ গুলি সমধিক প্রবল ছিল। অদ্যাপিও তাহাদের বিশেষ ন্যূনতা ভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যমণ্ডলী অনেক পরিমাণে সভ্যতার উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে, তথাপি বহুল অনর্থের মূল সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। এক্ষণেও পরস্পরের প্রতি প্রকৃত সৌহার্দ্য সংস্থাপিত হয় নাই। এক্ষণেও লোক মাত্রই কেবল আত্মসুখে একান্ত নিরত রহিয়াছে। অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানারূপ বিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে, অনেক নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ আত্মসুখপরতন্ত্রতাকে নিন্দা করিয়া ভূতলস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে পরহিতে রত করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়াছেন। তথাপি পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শন করিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়।

বস্তুতঃ অন্যায়াচরণ না থাকিলে মানব সমাজে কোন প্রকার শাসনের প্রয়োজন হইত না। যদি পরহিংসা এবং পরদ্বেষ অবনীতল হইতে এককালে তিরোহিত হইত, তাহা হইলে কোনপ্রকার শাসনপ্রণালীর কিছু মাত্র কার্য্যকারিতা থাকিত না। মানবনিচয় নিরোগ ও সুস্থ-শরীর হইলে ভীষকবৃন্দের কোন প্রয়োজন থাকে না। তদ্রূপ যদি জনগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ না করিত তাহা হইলে ধর্ম্মাধিকরণ এবং তৎসংসৃষ্ট অসংখ্য ব্যাপারের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। কিন্তু

ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে অশেষবিধ অনর্থের মূল সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, পৃথিবীস্থ যাবতীয় দেশে কোন না কোন প্রকার শাসনপ্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল গুলিরই মুখ্য উদ্দেশ্য অনিষ্ট নিবারণ করা। কিন্তু কেবল অনর্থের উচ্ছেদ হইলেই যে মানব সমাজের সম্যক্ প্রকারে সুখোৎপত্তি হয় তাহা নহে। যত প্রকার কষ্টের কারণ আছে তাহা বিনাশ করিয়া সুখোৎপাদনের নিমিত্ত-ও নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কেবল দুষ্টের দমন হইলেই যে উৎকৃষ্ট রূপে শাসনপ্রণালীর কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে শিষ্টের পালনও যথাবিহিত রূপে করা উচিত। আদৌ অনিষ্টাপাত নিবারণ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি নিদূরিত হইলে যে যে রূপে মানব সমাজ উচ্চতর উন্নতি লাভ করিতে পারে, যাহাতে নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহের উপর মনুষ্যের অধিকতর ক্ষমতা জন্মিতে পারে এবং আহার বিহারের উৎকৃষ্টতর উপায় সকল উদ্ভাবিত হইতে পারে, প্রত্যেক শাসন-প্রণালীর তাহার সুবিধা বিধান করা কর্ত্তব্য। সকল প্রকার অনর্থপাতের মূলোচ্ছেদ করা এখন পর্য্যন্ত মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। সুতরাং যতদূর সাধ্য ততদূর পর্য্যন্ত বিপত্তি সমস্ত প্রতাড়িত করিয়া যথোচিত রূপে অভীপ্সিত পদার্থের রক্ষণাবেক্ষণ করত মনুষ্য সমাজের সুখ-বর্দ্ধন করা শাসনপ্রণালীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদ্দ্বারা মনুষ্যের সাধ্যানুযায়ী যত্ন সহকারে নানা প্রকার অপায় নিষ্কাশন পুরঃসর সমাজস্থ মনুষ্য-মণ্ডলীর যতদূরসম্ভব হিত সাধিত হইতে পারে প্রত্যেক শাসন-প্রণালীর সেইরূপ সমস্ত উপায় অবলম্বন করা উচিত। তাহা হইলেই সেই শাসনের অন্তর্গত সমুদায় লোক সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে এবং ইহলোকে যত পরিমাণে সুখভোগ করা সম্ভবপর ততদূর সুখী হইতে পারে।

এই প্রকারে অহিত নিবারণ ও হিত সাধনের নিমিত্ত প্রত্যেক শাসন প্রণালীর ৩টী প্রধান অঙ্গ থাকা আবশ্যক। একটী অঙ্গের অসদ্ভাব থাকিলে শাসন প্রণালীর কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে না।

১। ব্যবস্থাপক। অহিত নিবারণের নিমিত্ত এবং মঙ্গল সাধনের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থাপক বিভাগের কর্ত্তব্য কার্য্য। ঐ ব্যবস্থাদ্বারা অনেক গুলি কার্য্য একেবারে নিষিদ্ধ করা হয় এবং যদি কেহ সেই কার্য্যে লিপ্ত থাকে তবে তাহাকে দণ্ডার্হ হইতে হয়। এতদ্ভিন্ন যাহাতে প্রজাগণ সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে ব্যবস্থাপয়িতাগণের সর্ব্বদা সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। তাঁহাদিগের স্কন্ধে অতি গুরুভার ন্যস্ত থাকে। তাঁহারা যে সমুদায় নিয়ম প্রকটন করিবেন অপরাপর সকলে অক্ষুব্ধ চিত্তে ঈশ্বর-বাক্য স্বরূপ তাহার অনুসরণ করিবে। এই নিমিত্তই লোক-

দিগের অধিকতর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য হিব্রু, হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদিগের ব্যবস্থাপকেরা তাঁহাদিগের ব্যবস্থা দেব-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন। বাইবেলে লিখিত আছে যে মুসা সিনাই পর্ব্বতের উপরে স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে দশটী অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। বেদ-চতুষ্টয় ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যাহা হউক ব্যবস্থা-প্রণয়ন-কারিদিগের যাহাতে সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ জন্মিতে পারে এবং যতদূর সম্ভব দুঃখ বিনষ্ট হইতে পারে এইরূপ উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য এবং এই মূল মন্ত্রটী সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের চিত্ত-ক্ষেত্রে জাগরূক থাকা উচিত। নতুবা তাঁহারা তাঁহাদিগের গুরুভারের অযোগ্য এবং তাঁহাদিগের প্রণীত বিধিব্যবস্থাও অসার ও অসম্পূর্ণ।

নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী না থাকিলে কোনরূপেই সমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনা হইতে পারে না। কার্য্য-বিশেষের নিষ্পাদনের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করা সমাজের অসভ্যাবস্থাতেই ঘটিয়া থাকে। একটী সমাজ যত পরিমাণে সভ্যতার উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে, তাহার নিয়মাবলীও তত পরিমাণে বিধিবদ্ধ হইবে; এবং সেই সমুদায় নিয়মের তৎপরিমাণে খণ্ডন ও রূপান্তর করণ প্রয়োজন হইয়া উঠিবে।

২। বিচারক। সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার অন্যথাচরণ করিলে বিচারালয়ে দণ্ডিত হইতে হয়। নিষিদ্ধাচরণ করিলে যে সমস্ত দণ্ডের নিয়ম থাকে তদনুসারে দণ্ড না দিলে সমাজের বিশৃঙ্খলার আর পরিসীমা থাকেনা। এইরূপ অবস্থায় স্বেচ্ছাচার প্রবল হওয়াতে সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া যায় এবং অচিরকাল মধ্যেই সমাজ লয় প্রাপ্ত হয়। বিচারকগণের স্বহস্তে নিয়ম প্রস্তুত করিবার কোন ক্ষমতা নাই। ব্যবস্থাপকবর্গ যে সমস্ত নিয়ম প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেব ধীর ও প্রশান্ত ভাবে সেই গুলি শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করিতে হয়। সেই সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগের না দক্ষিণ না বাম দিকে যাইবার ক্ষমতা আছে। ব্যবস্থাপয়িতৃগণ সাধারণতঃ নানা-বিধ বিধি ব্যবস্থা প্রস্তুত করিবেন এবং বিচারকগণ কার্য্যতঃ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সেই গুলি প্রয়োগ করিবেন। যদি ব্যবস্থা জটিল অথবা দুর্ব্বোধ হয় তাহা হইলে তাঁহারা সেই গুলির গূঢ় অর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য সকলকে বুঝাইয়া দিবেন এবং এতদ্বিষয়ে বিচারকগণ উকীল প্রভৃতি আইন ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়া থাকেন।

৩। সম্পাদক বা কার্য্যকারী (executive)। ব্যবস্থাপক ও বিচারকগণের নানা রূপ আজ্ঞা বহন করা সম্পাদক বিভাগের কার্য্য। যে সমস্ত ব্যক্তি সমাজের অনুশাসনের বিরুদ্ধে কার্য্য করে তাহাদিগকে

ধৃত করিয়া বিচারালয়ে আনয়ন করা এবং বিচারালয়ে যে আদেশ হয় তাহা প্রতিপালন দ্বারা সমাজের শান্তি রক্ষা করা এই বিভাগের কার্য্য। এতদ্ভিন্ন সমাজের নানা প্রকার হিতকর ব্যাপারের অনুষ্ঠানও এই বিভাগের অন্তর্গত। যথা স্থপতি কার্য্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি অসংখ্য কার্য্যকলাপ সম্পাদক বিভাগের মধ্যে পরিগণিত। বস্তুতঃ সমাজের হিতসাধনের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক ও বিচারক বিভাগ হইতে যে সমস্ত অনুজ্ঞা প্রকাশিত হয় তাহার সম্যক্ প্রকার পরিপালনই সম্পাদক বিভাগের কর্ত্তব্য কার্য্য।

শাসন-প্রণালীর এই প্রধান অঙ্গত্রয় একাধারে অবস্থিতি করিতে পারে অথবা একাধিক ব্যক্তি দ্বারা ঐ সমস্ত কার্য্যপ্রণালী সম্পাদিত হইতে পারে। এক অথবা বহুসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এইজন্য শাসনপ্রণালীও নানাবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। শাসনপ্রণালী প্রধানতঃ দ্বিবিধ যথা (১) রাজতন্ত্র—(২)সাধারণতন্ত্র। রাজার ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে রাজতন্ত্র আবার দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে যথা— (ক) যে দেশে রাজা স্বেচ্ছাচারী, কোন নিয়মের বশবর্ত্তী নহেন; যেখানে রাজার অনুজ্ঞা ব্যতীত অন্য কোন বিধি ব্যবস্থা নাই, তাহাকে যথেচ্ছাচার রাজতন্ত্র বলা যায়। যথেচ্ছাচারী রাজার উদাহরণ, ভারতবর্ষে আরঞ্জীব প্রভৃতি মোগল সম্রাটগণ। যেখানে রাজা যথেচ্ছাচরণ করিতে পারেন না, অপরাপর প্রজাগণের ন্যায় তাঁহাকেও কতগুলি নিয়মের নির্দ্দিষ্ট বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয় এবং প্রকৃতিবর্গের উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়, তাহাকে নিয়মতন্ত্র রাজ্য নামে আখ্যাত করা যাইতে পারে। যথা ইংলণ্ডীয় নিয়মতন্ত্র রাজ্যপ্রণালী। ব্রিটেনের অধীশ্বর বা অধীশ্বরী পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার বাক্যের অন্যথাচরণ করিতে পারেন না।

২। সাধারণতন্ত্রও অল্প বা বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্ষমতার বিস্তার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে। পুরাবৃত্তে অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে কয়েক জন মাত্র ব্যক্তি সমুদায় ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া প্রজা শাসন করিয়াছেন (ক) কোন কোন দেশের উচ্চবংশসম্ভূত ব্যক্তিগণের ক্ষমতাতিশয্য নিবন্ধন তাঁহারাই দেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। (খ) অথবা বংশ মর্য্যাদার প্রতি আস্থা না রাখিয়া কোন কোন দেশ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ দ্বারা শাসিত হইত। প্রথম প্রকার শাসন-প্রণালীকে কুলীন-তন্ত্র এবং দ্বিতীয় প্রকারকে আঢ্যতন্ত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত নাই, প্রত্যুত সকলেরই শাসন সম্বন্ধে সমান অধিকার আছে তাহাকেই প্রকৃত সাধারণতন্ত্র বলা যায়। এক্ষণে কোন্ প্রকার শাসনপ্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং

কোন্ কোন্ দেশের পক্ষে কি প্রকার শাসনপ্রণালী বিশেষ উপযোগী তদ্বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত। কোন্ প্রকার শাসনপ্রণালী কি পরিমাণে অনর্থের উচ্ছেদ এবং অভীপ্সিত পদার্থের রক্ষণাবক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রমোহন মজুমদার।

# বজ্রাঘাতে মৃত্যু।

আমরা মৃত্যুকে ভয় করি কেন? যাহাদের জন্য আজীবন দুঃখে শোকে, উঠিয়া পড়িয়া এতকাল অতিবাহিত করিলাম, যাহাদের মুখ দেখিলে সমস্ত কষ্ট বিদূরিত ও সুখ দ্বিগুণিত হয়—যাহারা হৃদয়ের অতি নিকটতম, অধিক কি যাহাদের সহিত আমাদের জীবন একসূত্রে বদ্ধ, তাহাদের নিকট হইতে, হয়ত চিরকালের মত যাইতে হইবে—যে সকল আশা যে সকল ইচ্ছা যত্নের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম এবং যাহাদের জন্য কত অসাধ্য সাধন করিয়াছি, সেই সকল একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হইবে এই সকল ভাবিলে কি চিত্ত ভীত হয় না? অপরন্তু এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াও, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও, মৃত্যুর পর আবার আমাদের কি পরিণাম হইবে?—কোন পরিণাম হইবে কিনা—যদি কিছু হয়ত নরক বা তৎসদৃশ যন্ত্রণা ভোগ সে পরিণামের প্রকৃতি কি না এবম্বিধ চিন্তা সকল হইতেও কি ভয়ের উৎপত্তি হয় না? বস্তুতঃ এসমস্ত ভাবিলে সকলেরই চিত্ত ভয়ে বিহ্বল হয়। কিন্তু এ সকল ভিন্ন কি ভয়ের আর কোন কারণ নাই? পাঠক! যদি কখন হৃদয়ে মর্ম্মভেদী আঘাত পাইয়া থাক, যদি কখন নৈরাশ সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, তবে তুমি অনুভব করিতে পারিবে যে কখন কখন মানব হৃদয়ে এমন তরঙ্গ উঠে যে জীবনের কোন বন্ধনই মানস-তরি বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, তখন উহা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া বেগে প্রধাবিত হয়। তখন আর পরিণামের ভয় থাকে না। তখন অন্তরস্থিত প্রজ্বলিত বহ্নির নিকট নরকাগ্নিও তুচ্ছ বোধ হয়। তখন ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে জীবনের শেষ হউক। কিন্তু তথাপি মরিতে সাহস হয়না কেন? যিনি কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির কণ্টক-শয্যায় বিলুণ্ঠন দেখিয়াছেন—যিনি কোন গলরজ্জু ব্যক্তির বিকট বদন ও অঙ্গ বিক্ষেপ দেখিয়াছেন—তিনি বলিতে পারেন কেন। তিনিই জানেন মৃত্যুর সহিত কত যন্ত্রণার

ভাব মিশ্রিত। এই যন্ত্রণা হইতে মানবের নিস্তার নাই। যে দুই এক জন ইহার ভীষণ হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, তাঁহারা পুণ্যবান্ বলিয়া প্রখ্যাত হন। তাঁহাদিগের পুণ্যের শরীর, সুতরাং সজ্ঞানে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু পাঠক ইচ্ছা করিলে তুমি আমিও সচ্ছন্দ হাসিতে হাসিতে অজ্ঞাতভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে মহানিদ্রায় অভিভূত হইতে পারি। ইহাতে কোন পুণ্যবলের আবশ্যকতা করে না। অনেক রূপ মৃত্যু আছে, যাহাতে এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। পাঠক! আমি জানি তুমি যদি বুদ্ধিমান্ হওত দেখাইয়া দিলেও সে পথ অবলম্বন করিবে না। কিন্তু তথাপি জানায় অনেক লাভ আছে। মানবের প্রকৃতি এরূপ যে কোন বস্তুর অভাব বোধ না হইলেও তাহা করায়ত্ত থাকিলে মন সুস্থ থাকে এবং ইচ্ছা হইলে পাইব না এরূপ মনে হইলে নিরভাবেও অভাব বোধ হয় ও মন তজ্জনিত ক্লেশ অনুভব করে। এই দুঃখময় সংসারে যখন ইচ্ছা হইবে তখনই অক্লেশে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া এ দুঃখের অবসান করিতে পারি এই জ্ঞান কতক সান্ত্বনা। কিন্তু পাঠক! শুদ্ধ জ্ঞানবলে বলীয়ান্ থাকাই ভাল, জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন যেন না হয়।

অনেকের সংস্কার আছে যে মৃত্যুর কারণ যত ক্ষণস্থায়ী হয় যন্ত্রণা ততই অধিক হয়। এই সংস্কারানুসারে তাঁহারা ভাবেন যে বজ্রাঘাতে যাহাদের মৃত্যু হয় তাঁহারা অতি তীব্র আঘাত অনুভব করে। কিন্তু ইহা ভ্রম। মস্তিষ্ক আমাদের সকল অনুভূতির আধার। শরীরে কোন আঘাত লাগিলে শিরা সকল দ্বারা সেই আঘাত মস্তিষ্কে চালিত হয় এবং তখন আমরা সেই আঘাত অনুভব করি। যদি কোন আঘাত, যে কোন কারণেই হউক, মস্তিষ্কে উপনীত না হয়, আমরা সে আঘাতের সংজ্ঞা লাভ করিতে পারি না।

অনেকে বাজিকরদিগের নিকট দেখিয়া থাকিবেন যে দুইটী জল-পরিপূর্ণ গ্লাস—এরূপ পরিপূর্ণ যে ঈষৎ নাড়িলেই জল পাত্রচ্যুত হইয়া পড়ে—কিয়ৎ ব্যবধানে কোন সমতল ক্ষেত্রে রাখিয়া একটী কাষ্ঠদণ্ড ঐ গ্লাস দ্বয়ের উপর স্থাপন করতঃ ঐ কাষ্ঠদণ্ডের মধ্যস্থলে যষ্টি দ্বারা সজোরে আঘাত করিলে ঐ কাষ্ঠদণ্ড দুই খণ্ড হইয়া দুই দিকে পড়িয়া যায় কিন্তু গ্ল্যাস হইতে এক বিন্দু জলও বিচ্যুত হয় না। ইহার কারণ এই যে যষ্টির আঘাত কাষ্ঠদণ্ডের মধ্যস্থল হইতে প্রান্তদেশে সঞ্চালিত না হইলে গ্ল্যাসের জল বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু আঘাত এত বেগে প্রদত্ত হয় যে প্রান্তে সঞ্চালিত হইবার পূর্ব্বেই কাষ্ঠদণ্ড ভগ্ন হইয়া পড়িয়া যায়। এই রূপ আহত অঙ্গ হইতে আঘাতের জ্ঞান মস্তিষ্কে নীত হইতেও সময় লাগে এবং এই কারণে মস্তিষ্ক হইতে দূরবর্ত্তী অঙ্গের আঘাত ঈষৎ বিলম্বে অনুভূত হয়।

হেলম্‌হল্ট্‌জ্‌ ( Helmholtz ) নিরূপণ করিয়াছেন যে শিরার সঞ্চালন শক্তি শব্দের গতির দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে প্রায় এক শত ফীট। সুতরাং পঞ্চাশ ফীট দীর্ঘ একটী তিমি মৎস্য লাঙ্গুলে আহত হইলে আঘাত প্রদান করিবার অর্দ্ধ সেকেণ্ড পরে উহা জানিতে পারিবে। শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে এই শিরাসঞ্চালন ভিন্ন সংজ্ঞা (Consciousness ) উপলব্ধি হইতে বিলম্ব হইবার আরও একটী কারণ আছে। তাঁহারা বলেন যে—সংজ্ঞা সকল আমাদের মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ আণবিক অবস্থানের ( Molecular arrangements ) ফল; আমাদের প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক ইচ্ছায় মস্তিষ্কের অণু সকল বিভিন্ন ভাবে সংস্থিত হয়। ইচ্ছা ও চিন্তা সকলের পরস্পরের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাঁহাদের অনুরূপ মস্তিষ্কের অবস্থান সকলের পরস্পর সম্বন্ধও সেইরূপ। ভালবাসা ও ঘৃণা অন্তরের দুই বিরুদ্ধধর্ম্মী বৃত্তি। একের অনুরূপ মস্তিষ্কের অবস্থান অন্যের বিপরীত হইবে। মনে কর ভালবাসায় যেন মস্তিষ্কের অণু সকল চক্রাকারে বাম হইতে দক্ষিণে যাইতেছে, তাহা হইলে ঘৃণায় সেই অণু সকল দক্ষিণ হইতে বামে যাইবে। কিন্তু কোন ভৌতিক পরিবর্ত্তন আণবিকই হউক আর আকারগতই হউক, সময় বিনা সাধিত হয় না। সুতরাং শিরা দ্বারা মস্তিষ্কে কোন ভাব চালিত হইবার পরেও মস্তিষ্কের সেই ভাবের অনুরূপ অবস্থানে স্থাপিত হইতেও সময় লাগে এবং তাহার পর আমাদের সংজ্ঞা হয়। হেল্‌ম্‌হল্ট্‌জ্‌ বলেন যে মস্তিষ্কের এই রূপ অবস্থানান্তর হইতে এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ লাগে। এই রূপে ঐ তিমি মৎস্যের পক্ষে,আঘাত প্রাপ্ত হইবার পর ঐ আঘাত শিরার দ্বারা মস্তিষ্কে চালিত হইতে অর্দ্ধ সেকেণ্ড লাগিল; এবং সংজ্ঞা লাভের উপযুক্ত আণবিক বন্দোবস্ত করিতে মস্তিষ্কের এক দশম সেকেণ্ড লাগিল। তখন তাহার সংজ্ঞা হইল এবং সংজ্ঞা হইবা মাত্র মস্তিষ্ক হইতে আহত স্থানে আদেশ প্রেরিত হইল 'আত্মরক্ষা কর'। এই আদেশ শিরা দ্বারা বাহিত হইয়া যথা স্থানে আসিতে আর অর্দ্ধ সেকেণ্ড লাগিল। এই রূপে পঞ্চাশ ফীট দীর্ঘ একটী তিমি মৎস্যের আঘাত প্রাপ্তি হওয়ার পর, উহার সংজ্ঞা লব্ধ হইয়া মস্তিষ্কের আদেশ প্রাপ্তি হইতে এক ও এক-দশম সেকেণ্ড লাগে।

এক্ষণে দেখা যাউক কোন্ কোন্ স্থলে মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহা সহজেই ধারণা করা যায় যে এমন কোন আঘাত পাওয়া যাইতে পারে যাহাতে শিরা সকল তৎক্ষণাৎ বিকল হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাদের সঞ্চালন শক্তি আর থাকে না; সে স্থলে আঘাত যত তীব্রই হউক না, অনিষ্ট যত গুরুতরই হউক না, সে আঘাত সে অনিষ্টের কারণ চিরকালই কেন কার্য্য করুক না, জীবিত থাকিয়াও আমরা

তাহার সংজ্ঞা লাভ করিতে পারি না। আবার মনে কর শিরা সকল আপন কার্য্যে সক্ষম আছে, কিন্তু সংজ্ঞা লাভ করিবার জন্য মস্তিষ্কের অবস্থানান্তরিত হইতে যে সময় আবশ্যক করে তাহার শেষ হইতে না হইতে আঘাত হেতু মস্তিষ্কের সে ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে, মস্তিষ্ক আর ইচ্ছানুরূপ রূপান্তর হইতে পারে না। এরূপ স্থলে যদিও সে আঘাত হইতে আমাদের মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি মৃত্যুকালীন আমাদের কোন অনুভূতিই হয় না। এরূপ স্থলে অজ্ঞাতভাবে জীবনের শেষ হয়। এরূপ মৃত্যু হঠাৎ জীবনের অভাব (Negation of life) ভিন্ন আর কিছুই না। এইরূপ শোষোক্ত মৃত্যুঅনেক প্রকারে ঘটিয়া থাকে। বন্দুকের গুলি মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে এই রূপ হয়। মস্তক ভেদ করিয়া গুলি যাইতে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ লাগে। এই সময়ের মধ্যে মস্তিষ্ক সংজ্ঞালাভোপযোগী অবস্থানে পরিণত হইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মস্তিষ্কের এই কার্য্যে একদশম সেকেণ্ড লাগে। সুতরাং গুলি দ্বারা আহত ব্যক্তি কিছুই অনুভব করে না। এবং মৃত্যুর পর এরূপ ব্যক্তির মুখের প্রশান্ত ভাব এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া থাকে। সময়ে সময়ে এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে যে গুলির আঘাতে মৃত্যু হয় না, কিছুকাল অচৈতন্য থাকিয়া পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যক্তিদিগের নিকট জানা গিয়াছে যে অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বে তাহাদের কোন অনুভূতিই হয় নাই।

বন্দুকের গুলি অপেক্ষাও অধিক দ্রুতক্রিয়া অনেক আছে। বিদ্যুতের ক্রিয়া ইহার অন্যতম। বিদ্যুতের প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে বিদ্যুৎ অতি ক্ষণস্থায়ী। ইহার গতিও অত্যন্ত দ্রুত। এমন কি এক সেকেণ্ডের মধ্যে চন্দ্রলোক হইতে আমাদের পৃথিবীতে আসিতে পারে। এবং এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ ইহার স্থায়িত্ব। অনেকে বলিতে পারেন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে বিদ্যুৎ ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষণ থাকে। বাস্তবিকও আমাদের পক্ষে ইহা অধিক ক্ষণ থাকে। তাহার কারণ আলোকের সত্ত্বা বিলুপ্ত হওয়ার পরও এক ষষ্ঠসেকেণ্ড তাহার ভাব চক্ষু-পুত্তলীতে রক্ষিত হয়। ইহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। অন্ধকার রাত্রিতে অনেকেই হাউই উঠিতে দেখিয়াছেন। হাউই যে পথ দিয়া উঠে বা যে পথ দিয়া নামে, সেই পথ একটী উজ্জ্বল রেখা বলিয়া বোধ হয় কেন? সমস্ত পথেইত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থাকে না। হাউই যেমন বেগে চলিয়া যায় অগ্নিময় ভাগও সেই সঙ্গে যায়। তবে সমস্ত পথ অগ্নিময় দেখাইবার কারণ কি? চক্ষু-পুত্তলীতে আলোক ভাবের সংরক্ষণই ইহার কারণ। ক্ষণপূর্ব্বে হাউই যেখানে ছিল সেখানে এক্ষণে অগ্নি নাই বটে, কিন্তু ক্ষণ পূর্ব্বে

সেই স্থান হইতে যে আলোক বিকীরিত হইয়াছিল, চক্ষু-পুত্তলীতে সে আলোক রহিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব স্থানের সহিত বর্ত্তমান অবস্থানের অগ্নির মিলন চক্ষু পুত্তলীত হইল এবং এই রূপ পর পর মিলন হইয়া পূর্ব্বোক্ত উজ্জ্বল রেখার উপলব্ধি হয়।

যদি বন্দুকের গুলি বেগের দ্রুতত্তায় কষ্টানুভূতি ব্যতিরেকে জীবন সংহার করিতে সক্ষম হয়; তবে বিদ্যুৎ, যাহার বেগ এত অধিক, উহা অপেক্ষা অধিক সক্ষম। এই সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি হইতে সংগৃহীত নয়, পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত। অনেক বজ্রাহত ব্যক্তি সংজ্ঞা লাভ করিয়া এই মতের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ এ জুন জর্ম্মনি দেশে কোন স্থানে এক জন সৈনিক পুরুষ পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি আসায় এক বৃক্ষতলে গমন করিলেন। একটী স্ত্রালোক তাঁহার পূর্ব্বেই সেই বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছিল। সৈনিক পুরুষ মস্তকোত্তোলন করিয়া সেই বৃক্ষ নিবিড়পত্র কি না দেখিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ বজ্রাহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন বটে কিন্তু অচৈতন্য হন নাই। সৈনিক পুরুষ স্ত্রীলোকটীর যত্নে কয়েক ঘণ্টা পরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিলেন যে তিনি মস্তকোত্তোলন করিয়া বৃক্ষের দিকে চাহিয়াছিলেন এই পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণ আছে ইহার পর যে কি হইয়াছিল তাহার কিছুই জানেন না।

প্রোফেসর টিণ্ডাল * এক দিন শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নিকটে ১৫ টী লিডেন জারের একটী ব্যাটারী আছে। অনবধান বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তিনি সেই ব্যাটারি সংক্রান্ত তার স্পর্শ করেন। স্পর্শ করিবা মাত্র চেতনা অপহৃত হইল। জীবন ক্ষণকালের জন্য স্থগিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার চেতনা লাভ করিলেন। চেতনা হইবা মাত্র দর্শকদিগকে ভীত হইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন দৈব ক্রমে এইরূপ তড়িৎ-সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে অত্যন্ত ইচ্ছা করিতেন। তাঁহার সে ইচ্ছা আজ ফলবতী হইল। তিনি যে সংক্ষোভ পাইয়াছিলেন তাহার স্মৃতি বা অনুভূতি কিছুই ছিল না। কেবল অবস্থা দেখিয়া যুক্তি বলে সেই সংজ্ঞা-শূন্য মুহূর্ত্তের অভাব মনে পূরণ করেন। তাঁহার মানসিক সংজ্ঞা লাভ হইতে বিলম্ব হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার চাক্ষুষ শিরা সকল এরূপ বিকল হইয়া গিয়াছিল যে তিনি তাঁহার সমস্ত শরীর খণ্ড বিখণ্ড দেখিতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল যে হস্তাদি, অঙ্গ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া শূন্যে ঝুলিতেছে। ফলতঃ অনেক ক্ষণে সেই শিরা সকল সহজ ও সুস্থ অবস্থায় পরিণত হইল।

* See Tyndal's Fragments of Science

বজ্রাহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কখন কখন একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্ট হয়। মৃত ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যে অবস্থায় যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছিল মৃত্যুর পর ও সেই অবস্থায় সেই ভাবে লক্ষিত হয়। ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। (১)* কোন স্ত্রীলোক ফুল তুলিতে তুলিতে বজ্রাহত হয় মৃত্যুর পর দেখা যায় যে তাহার শরীর খাড়া হইয়া আছে এবং ফুলটী হাতে রহিয়াছে। (২) জন কতক চাষা পরিশ্রমের পর মাঠেই আহার করিতেছিল এমন সময় হঠাৎ বজ্র পড়িয়া সকলের মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল ঠিক্ যেন তাহারা আহার করিতেছে। কাহারও অর্দ্ধোত্থিত গ্রাস হস্তেই রহিয়াছে কাহারও বা হস্ত পানীয় পাত্রে রহিয়াছে এইরূপ হঠাৎ দেখিয়া বোধহইয়াছিল যে তাহারা তখন ও আহারে প্রবৃত্ত ছিল। (৩) এক জন অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে আহত হন অশ্ব আরোহীকে লইয়া তিন ক্রোশ গমন করে এবং মৃত আরোহী এতাবৎকাল সহজ ভাবে অশ্ব পৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনা সকল শুদ্ধ বজ্রাঘাতে কেন সকল প্রকার হঠাৎ মৃত্যুতেই হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে মৃত্যু কালে ঐ সকল ব্যক্তি যন্ত্রণা অনুভব করে নাই।

* See Wharton's Medical Jurisprudence 884

যন্ত্রণা অনুভব করিলে সম্পূর্ণ স্থির থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয় সুতরাং সম্পূর্ণ স্থির থাকিতে না পারিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের অবস্থা ও ভাব সংরক্ষণ করা কোন মতেই হইতে পারে না।

অনেকের সংস্কার আছে যে বজ্রাহত ব্যক্তি পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। কিন্তু বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইলে বাহিরে আঘাতের চিহ্ন অতি অল্পই দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যে বস্তু তড়িতের বিসরণে যত বাধা প্রদান করে সেই বস্তু তত অধিক আহত হয়। কিন্তু মানব দেহ উত্তম সঞ্চালক ও ইহার আয়তন ও অল্প নয়। মেঘের সমস্ত তড়িৎই ইহার ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইতে পারে সুতরাং মানব দেহ বিদ্যুদ্দণ্ডের ন্যায় তড়িৎপ্রবাহের একটী সুগম পথ স্বরূপ হয়। এই জন্য বজ্রাঘাতেও মানব দেহ অক্ষুণ্ণ থাকে। বহিশ্চিহ্নের মধ্যে কতকগুলি সামান্য সামান্য দৃষ্ট হয়। বিদ্যুতের প্রবেশ ও বহির্গমন পথ প্রায়ই ত্বকে চিহ্নিত হয়। শরীরস্থ অসঞ্চালক বস্তু সকল হয় দগ্ধ না হয় খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। কেশ সকল প্রায়ই অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়া থাকে। বস্ত্র সকল কখন কখন দগ্ধ কিন্তু প্রায়ই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ সামান্য সামান্য চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

সে যাহা হউক আমরা বলিয়াছি যে সকল প্রকার হঠাৎ মৃত্যুতেই যন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং তাহার

কারণ দেখাইয়াছি। এবং আমরা আরও বলিয়াছি যে শিরা সকল বিকল হইলে জীবিত থাকিয়াও যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারি না এবং যে কারণে হইয়া থাকে তাহাও বলিয়াছি। এবং এই দুইটী প্রতিপন্ন করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

শ্রীম—

# বিলাপ।

ওরে বাপ্ অবিনাশ রহিলি কোথায়!
ভাসাইয়া অভাগীরে অকূল পাথারে
জনমের মত কিরে লইলি বিদায়?
একবারে কাঙ্গালিনী-করিলি আমারে?

২

আধ 'মা' 'মা' বলে কোলে আয় রে আমার
বক্ষে রাখি বাছা তোরে জুড়াই জীবন।
তোরে হারা হ'য়ে দেখি সংসার আঁধার,
তুই রে আমার, অবি, অঞ্চলের ধন!

৩

জনম-দুঃখিনী তোর অভাগিনী মাতা,
তুই তার এক মাত্র সুখের নিলয়;
সে সুখেও বাদ কিরে সাধিলা বিধাতা?
বিষমাখা শোক-শেলে বিঁধিলা হৃদয়?

৪

সারা দিন খেলি, দিবা অবসান হ'লে,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধূলি আলয়ে ফিরিতি,
অমনি ভুলিয়া তোরে লইতাম কোলে;
বক্ষে রহি মার প্রাণ শীতল করিতি!

৫

কুসুম-কোমল-কর-পল্লব যুগলে
দুঃখিনীর গলদেশ করিয়া বেষ্টন,
সুধাইতি কত প্রশ্ন আমারে, অঞ্চলে
মুছায়ে দিতাম তোর ও চন্দ্র-বদন।

৬

সরল মধুর দৃষ্টে মার মুখ পানে
যবে অবিনাশ! তুই রহিতি চাহিয়া,
কত যে হ'তাম সুখী কেহ নাহি জানে!
শোক দুঃখ জ্বালা যত যেতাম ভুলিয়া!

৭

দেখরে আইল নিশি ঘোর অন্ধকার;
সকল (ই) ফিরিল ঘরে; এমন সময়
কোথায় রহিলি তুই বাছারে আমার!
নাহি হেরে তোরে, বাপ্, বিদরে হৃদয়।

৮

এমন সময়ে তুই ঘুমে অচেতন;
নীরবে জননী তোর শিয়রে বসিয়া,
ধীরে ধীরে তাল-বৃন্ত করিয়া ব্যজন
দুরন্ত মশকবৃন্দে দিত খেদাইয়া!

৯

একাকিনী, এক ভাবে, বসিয়া তথায়
যতবার দেখিতাম ও চাঁদ-বদন,
তত বার ভাসিত রে অশ্রুনীরে, হায়,
জনম-দুঃখিনী মার বক্ষের বসন!

১০

যত দেখিতাম তোরে, প্রাণের ভিতর
দেখিবার তত আর (ও) বাসনা বাড়িত;
ধীরে চুম্বিতাম তোর কুসুম-অধর,
ধীরে তোর মুখ-পদ্মে নয়ন ঝরিত!

১১

ধীরে ধীরে ফোটে যথা আকাশ-রতন
কত যে ফুটিত আশা এ ছার অন্তরে;
কত যে, বসিয়া তথা, সুখের স্বপন
দেখিতাম, মনে হ'লে পরাণ বিদরে!

১২

দেখিতাম তোরে আমি যৌবন সীমায়,
পূর্ণ দেহ—পূর্ণিমার যেন শশ-ধর;
জড়িত সর্ব্বাঙ্গ যেন স্বর্গীয় শোভায়;
নয়নে বিমল জ্যোতিঃ ললাট সুন্দর!

১৩

বাম পার্শ্বে বসি তোর, গৃহ আলো করি,
লক্ষ্মীরূপা পুত্রবধূ ভুবন-মোহিনী;
বরাঙ্গ, খচিত হেম-অলঙ্কারে, মরি,—
অবতীর্ণা ভবে যেন ত্রিদিব-বাসিনী!

১৪

হায় অবিনাশ! তুই অকালে আমার
নবীন আশার লতা সমূলে নাশিলি!
দিবসে ভুবন তুই করিলি আঁধার!
অকূল পাথারে মোরে ভাষায়ে চলিলি!

১৫

সত্য কিরে দেখিব না এ দেহ থাকিতে
তোর মুখ? শুনিব না সুধামাখা কথা?
তোরে বুকে করি বাপ্, আর কি শুইতে
এ জনমে পারিব না? ঘুচিবে না ব্যথা?

১৬

চক্ষে সেই রূপ মোর রয়েছে জাগিয়া!
নিরখি, যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন,
সেই অবিনাশ মোর আছে দাঁড়াইয়া!
সেই কমনীয় কান্তি! সহাস্য বদন!

১৭

কখন নিশ্চয় যেন ভাবি মনে মনে,
কোমল বরাঙ্গ তোর ধূলায় ধূষর
রেখেছি যতনে তুলি হৃদয়-আসনে;
ধীরে ধীরে চুম্বিতেছি তোর বিম্বাধর!

১৮

ধীরে ধীরে কভু তোর ক্লান্ত কলেবরে
ভাবি যেন করিতেছি কর সঞ্চালিত;
কভু মনে হয় যেন গুন্ গুন্ স্বরে
গাইতেছি গান তোরে করিতে নিদ্রিত!

১৯

নিবায়ে আশার দীপ গেলিরে চলিয়া,
পোড়াইতে নিশি দিন কেনরে আবার
পশ্চাতে স্মৃতির শিখা রাখিলি জ্বালিয়া?
অবিনাশ! এ যন্ত্রণা সহে নারে আর!

২০

এ ভীষণ অন্ধকারে রহিলি কোথায়?
না জানি কতই হলি ক্ষুধায় কাতর!
আয়, যাদুমণি! আয়, মার বক্ষে আয়!
'মা' বলিয়া একবার জুড়াবে অন্তর!

শ্রীদী—

# ভারতীয় মহাভাষা।

ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত দেশ। ইহা বহুতর প্রদেশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। এই সমস্ত ভাষা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) সুপ্রসিদ্ধ আর্য্যজাতির ভারতাধিকারের পূর্ব্বতন আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা, যথা—বঙ্গদেশে সাঁওতালি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভড়, পঞ্জাবে গুর্খা, মধ্য ভারতবর্ষে গণ্ডী, বোম্বাই ও রাজস্থানে ভীল, দক্ষিণ ভারতে তুদস্, এবং সিন্দুদেশের নিকটে কোল ইত্যাদি।

২। প্রকৃত আর্য্যবংশ-সম্ভূত জাতিগণের ভাষা যথা কাশ্মীর, পঞ্জাবী বা জাঠকী, মূলতানী, রাজপুতী, হিন্দি, কান্যকুব্জী, বুন্দীলাখণ্ডী, মৈথিলী, বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী, গুজ্জরাটী, কচ্ছী।

৩। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত দ্রাবিড়ী ভাষা সমূহ যথা তামিল, তৈলঙ্গী, মলয়ালম্, কর্ণাটী প্রভৃতি।

প্রথম প্রকার ভাষা সমূহ ভিন্ন অপর দুইটীরই প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। দ্বিতীয় প্রকারের সমস্ত ভাষাই স্বতঃ পরতঃ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তৃতীয় প্রকারের ভাষা গুলি স্পষ্টতঃ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই বটে, কিন্তু ভূরি ভূরি সংস্কৃত শব্দ এই ভাষা সমুদায়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেকানেক পণ্ডিতের মত এই যে প্রাচীন আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত বা পুণ্য ভূমিতে বসতি করিতেন। দাক্ষিণাত্যস্থ পূর্ব্বতন অধিবাসীগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিলেন।

অতএব প্রথমোক্ত অসংস্কৃত ভাষা গুলির উপর তাদৃশ আস্থা প্রকাশ না করিয়া আমরা প্রচীন আর্য্যদিগের প্রিয়তম সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় মহাভাষা নামে, আখ্যাত করিলাম। কিন্তু সংস্কৃত এক্ষণে মৃত ভাষা। ইউরোপের লাটিন গ্রীক্ ভাষার ন্যায় সংস্কৃত আর পৃথিবীর কথিত ভাষার মধ্যে পরিগণিত নহে। এই সমস্ত পুরাতন ভাষার আলোচনা কেবল উচ্চতর শিক্ষার একটী অঙ্গ স্বরূপ। যেমন ভূতত্ত্ব-বিদ্যার পূর্ব্বতন স্তর-বিমিশ্র প্রস্তরীভূত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তিবৎ জন্তুর বিষয় কেবল প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ আলোচনা করেন এবং তদ্দ্বারা আধুনিক প্রাণিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানারূপ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন; সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাও এক্ষণে ভাষা তত্ত্ববিদ্গণের মনোযোগ আকর্ষণ করি-

তেছে। এতদ্দ্বারা ভাষা বিজ্ঞানের প্রভূত পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এমন কি যত দিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ছিলেন; তত দিন পর্য্যন্ত ভাষা-বিজ্ঞানের কিছুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় অধিকার হওয়ার পর হইতেই ভাষা বিজ্ঞান উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু হায়! সংস্কৃতের জীবন্ত ভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার আর পূর্ব্বতন গৌরব নাই। পূর্ব্বকালীন প্রভাব নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ সংস্কৃত শব্দ গুলি দেবতুল্য মনে করিতেন এবং সংস্কৃত ভাষাকে তদনুরূপ শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতেন। এক্ষণে তাঁহাদিগকেই আমাদের দেবতা বলিয়া ভ্রান্তি হয়। তাঁহারা সাধারণ মানুষ ছিলেন আমাদের এমত বিশ্বাস হয় না। আমরা বহ্বায়াসে যৎ কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতে পারি এবং অতি কষ্টে দুই একটী মনের ভাব তাহাতে ব্যক্ত করিতে পারি কিন্তু পূর্ব্বকালে ভদ্র ব্যক্তি মাত্রই প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন। তখনকার যে হেয় প্রাকৃত ভাষা ছিল তাহাই রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা হিন্দি উড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশের ভাষার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক উন্নতির বর্ণন সমাধা হয়। দুরন্ত যবনগণের হস্তে সংস্কৃত ভাষা বিনষ্ট হইল এবং দেশের লোকদিগের অবনতিও এক শেষ হইল। তখন আর তাঁহারা পূর্ব্ববৎ গৌরবান্বিত সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী রহিলেন না। আপনাদিগের হীনাবস্থা-সূচক অসংস্কৃত ভাষা দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা না করিয়া তাঁহাদিগের একেবারে মূর্খ হইলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ বাক্‌শক্তি-বিরহিত পশু ও তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যল্প প্রভেদ রহিল। ইতর পশুরা তবু স্বাধীন ছিল, ইচ্ছানুসারে আহারবিহার করিতে পারিত; কিন্তু পতিত আর্য্যকুল চিরকালের নিমিত্ত অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন। জাতীয় গৌরব, মান মর্য্যাদা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইল। সামান্য ধন সম্পত্তি রক্ষা করিতে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের সৃষ্ট ভুবন-বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষা যে সমূলে উৎপাটিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিত-নিচয়ের অধ্যবসায়ে ও যত্নে অনেক পরিমাণে সংস্কৃতের পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছে। পবিত্রনামা সার উইলিয়ম জোন্স ইহার প্রথম উদ্যোক্তয়িতা; তৎপরে বোরণুফ্, বপ্ গোল্ড ষ্টুকার, মক্ষমূলর, মোনিয়ার উইলিয়াম্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ—যাঁহাদের নাম স্নেহের সহিত অনন্তকাল আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে—তাঁহারা এই পুণ্যক্ষেত্রে অবতরণ করতঃ অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন

আমাদের বর্ত্তমান রাজপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়াদি সংস্থাপন করিয়া সংস্কৃত ভাষা পাঠ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন—তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদের সুচেষ্টায় অগণ্য অগণ্য যুবক সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিতেছে এবং প্রাচীনতম আর্য্যগণের বুদ্ধির গভীরতা, কল্পনার মাধুর্য্য ও রচনার চাতুর্য্য অবলোকনে প্রীত ও চমৎকৃত হইতেছে। ইহাঁদিগের নিকট বোধ হয় যেন চিরবিচ্ছিন্ন পরলোকগত কোন আত্মীয় নরবেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুনরায় স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিতেছে। তাঁহারা যেন সেই পুনরুজ্জীবিত বান্ধববরের সহিত কথোপকথনে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। অতএব পুনঃপ্রাপ্ত-জীবন কোন বন্ধুকে যেরূপ আদর ও যত্নে রাখিতে হয়, আমাদের চিরলব্ধ সংস্কৃত ভাষাকেও সেইরূপ রক্ষা করা উচিত। আর একটী পরমাহ্লাদের বিষয় এই যে সংস্কৃত এক্ষণে যে নবীন কলেবর ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে তাহাতে তাহার পূর্ব্বতন যে কিছু দোষ ছিল তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ বিরাজমান নাই। প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ যে সমস্ত অশ্লীল ভাবাদি রচনায় নিরত থাকিতেন, পাশ্চাত্য সভ্যতাগমে সে গুলি সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা এক্ষণে অবিকৃতমনা বিশুদ্ধচেতা কুমারীর ন্যায় জন সাধারণের অধিকতর আদরভাজন হইবে।

আমরা ইংলণ্ডের সুশাসনে যে কত প্রকার মঙ্গলময় ফল লাভ করিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। আমরা সকলে যে এক ভারতবর্ষ দেশের অধিবাসী এবং তন্নিমিত্ত ভারতস্থ সমস্ত ব্যক্তির যে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের সহিত ব্যবহার করা উচিত, তাহা আমরা ইংরাজাধিকারের পরে শিক্ষা করিয়াছি। পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাসাদিতে আমরা পাঠ করি যে অনেকানেক হিন্দুরাজগণ সমস্ত ভারতবর্ষ একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুকালের নিমিত্ত এই রূপ অবস্থা ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। অধুনা ইংরাজ শাসনের অধীনে প্রকৃত রূপে ভারতবর্ষ একচ্ছত্র হইয়াছে এবং সমস্ত ভারতবর্ষবাসী এক শাসনপ্রণালীর অন্তর্গত হইয়া বাস করাতে পরস্পরের মধ্যে ক্রমে ও ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে আর মহারাষ্ট্রীয়গণ "বর্গী" নামে বিখ্যাত হইয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করে না এবং ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুজাতিগণ আর পরস্পর শোণিতস্রোতে মাতৃভূমিকে কলঙ্কিত করে না। এক্ষণে বাষ্পীয় শকটের প্রভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ ঐকীভূত হইয়াছে এবং সর্ব্বদাই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদিগের একত্র সমাগম সর্ব্বত্র সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে এই সমস্ত লোকের মধ্যে জাতীয় কোন উৎকৃষ্ট সাধারণ ভাষা প্রচলিত নাই। যখন একজন মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাই

প্রদেশের যুবকের সহিত কলিকাতাস্থ কোন বিদ্যালোক-সম্পন্ন ব্যক্তির কথোপকথন করিবার আবশ্যকতা জন্মে, তখন উভয়েই হয়ত বিলাতীয় নচেৎ জঘন্যতম উর্দ্দু ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং অনেকে বলিতে পারেন যে ইউরোপ খণ্ডে যেরূপ ফরাশী ভাষা সকল জাতিতেই বুঝিত এবং ফরাশী ভাষা ইউরোপ খণ্ডের সাধারণ ভাষা রূপে পবিগণিত ছিল; সেইরূপ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকে কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দি বা উর্দ্দু বুঝেন সুতরাং উর্দ্দু হিন্দিই তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী ভাষা।

কিন্তু দীপ্যমান সূর্য্যালোকের পরিবর্ত্তে কে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রদীপের আলোক ইচ্ছা করে? সুস্নিগ্ধ নির্ঝরিণী নিকটে থাকিতে কে কূপোদক পান করিতে প্রয়াস পায়? সুচারু-হর্ম্ম্যস্থিত দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কে কুটীরস্থ পত্রশয্যার পক্ষপাতী হয়? কি পরিতাপের বিষয় যে বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও ভারতবর্ষবাসীরা তাহা হইতে বঞ্চিত! তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ যে অক্ষয় ভাণ্ডার তাঁহাদিগের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা তাহার ব্যবহারানভিজ্ঞ। সংস্কৃত ভাষা ভারতবাসিদিগের সাধারণ সম্পত্তি অথচ তাঁহারা তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে অক্ষম!

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে যতপ্রকার ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, সকল গুলিই সংস্কৃত ভাষার ছায়া স্বরূপ। সংস্কৃতের সমবর্ত্তী ও সহযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা হইতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রদেশ-বিশেষের ভাষাকে অপর প্রদেশের লোকেরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত হইতে পারে। বাস্তবিকও হিন্দি বা উর্দ্দু ভাষার আর তাদৃশ উন্নতি নাই। ইউরোপ খণ্ডে যদিচ ফরাসী ভাষা সাধারণ ভাষা ছিল; তথাপি বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষাও অনেক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে। আজ কাল সকল দেশেই তাহাদের আলোচনা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডদেশবাসী ভদ্রমণ্ডলী পূর্ব্বে যেরূপ ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতেন, এক্ষণে ফরাসী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান ও অপরাপর ভাষাও সেইরূপ আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ ইদানীন্তন বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দি ভাষা অপেক্ষা বহুতর গুণে অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এতদবস্থায় ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ সমস্ত লোকেরই একবাক্য হইয়া বাঙ্গালা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি সমুদায় ভাষার জননী-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষাকে উচ্চতর আসন প্রদান পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষাকেই ভারতবর্ষের সাধারণ বা মধ্যবর্ত্তী ভাষা বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। সকলেই আপনাদিগের মধ্যে আপন আপন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু যখন

তাঁহাদের কোন মধ্যবর্ত্তী ভাষার আবশ্যক হয় তখন সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করা বিধেয়। সংস্কৃতই ভারতীয় মহাভাষা হইবার উপযুক্ত।

অনেকে এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, যে ইংরাজেরা আমাদের বর্ত্তমান রাজা। ইংরাজী আমাদের রাজকীয় ভাষা। ভারতবর্ষস্থ প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কৃতবিদ্য লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন। আদালত ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত আছে। তবে এরূপ জীবন্ত সাধারণ ভাষা পরিত্যাগ করিয়া মৃত ভাষার পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা স্বরূপ বাতুলতায় প্রয়োজন কি? প্রাচীনাকে কে নবীনা করিতে পারে? আকাশকুসুমের প্রত্যাশায় কে বসিয়া থাকিতে পারে? যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই তাহার বিফল চেষ্টায় ফল কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে সংস্কৃতের ন্যায় সম্পূর্ণ ভাষা ভূমণ্ডলে কুত্রাপি নাই। শব্দের লালিত্য এবং শ্রুতি-মধুরতা গুণ সংস্কৃতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে গ্রীক ও লাটিন ভাষা অপেক্ষাও সংস্কৃত অধিকতর উৎকৃষ্ট ভাষা। মনুষ্যের কণ্ঠ হইতে যতপ্রকার শব্দ বিনির্গত হইতে পারে, সংস্কৃত বর্ণ গুলি দ্বারা সে সমস্ত সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হয় *। ইংরাজী অর্থাৎ রোমান ২৬টী বর্ণ দ্বারা ৪৩টী বা ততোধিক বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় প্রায় সমুদয় ভাষাতেই বর্ণ-বিন্যাস একরূপ, এবং উচ্চারণ অপরপ্রকার। বিদেশীয়দের প্রায় এক একটী শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভ্যাস করিতে হয়। তথাপি কোন কোন উষ্ণ-শোণিত কঠিন-মস্তিষ্ক ইংরাজ ভারতবর্ষের নানা প্রকার ভাষার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ লোপ করিয়া কেবল মাত্র রোমান বর্ণ গুলি (A. B. C. D. &c.) ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন। এক পঞ্জাব দেশেই ৫। ৬ প্রকার অক্ষর প্রচলিত আছে। বিলাতীয় মহাপুরুষদের অভিপ্রায় এই যে একমাত্র রোমান অক্ষর গুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া উপরোক্ত গোলযোগ দূরীকৃত হউক। টেবেলিয়ান সাহেব এই মতের প্রথম উদ্ভাবয়িতা। তৎপরে ভারতবাসীদিগকে যিনি মিথ্যাবাদী জুয়াচোর নাম দিয়াছেন, সেই বিখ্যাত-নামা মেকলে সাহেব এই মতের প্রতিপোষকতা করিয়াছেন। কিছুদিন হইল ড্রু সাহেব নামে এক ব্যক্তি এতৎসম্বন্ধে বিলাতে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে

* তবে যাবনিক; (বড়কাপ্) ও এবং ইংরাজী সংস্কৃত কোন বর্ণদ্বারা উচ্চারিত হয় না। কিন্তু এবম্প্রকার অসভ্যতা-পরিজ্ঞাপক কুৎসিতা ধ্বনি যত উচ্চারিত না হয় ততই মঙ্গল।

উক্ত মত সাধারণ্যে পরিগৃহীত হয় নাই। ইংরাজী প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্য হইয়া স্বীকার করেন যে রোমান্ বর্ণ গুলি অসম্পূর্ণ। সুতরাং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার জন্য রোমান অক্ষর গুলি ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করাতে মূর্খতার এক শেষ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের কোটী কোটী লোকের মহা অনিষ্ট সংঘটন হইবে। কেবল অত্যল্প-সংখ্যক ইংরাজী সিবিলিয়ান্দিগের কিছু সুবিধা হইবে। যদি প্রকৃতরূপে সকল ভাষার বর্ণগুলির একীকরণ আবশ্যক হয় (এবং তাহা কে না স্বীকার করিবে?) তাহা হইলে দেবনাগর অক্ষর অথবা তাহার অবান্তর ভেদ অন্য কোন প্রকার অক্ষর ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষাতে ব্যবহার করার চেষ্টায় যথার্থতঃ ভারতবর্ষের উপকার হইতে পারে। এক্ষণেও সময় যায় নাই সুতরাং এই বিষয়ে যত আন্দোলন হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

২য়। অনেকে এরূপও বলিতে পারেন যে সংস্কৃত অতি দুরূহ ভাষা। ইহা শিক্ষা করিতে অনেক সময় আবশ্যক করে। এই আপত্তির নিরাকরণে এই রূপ বলা যাইতে পারে—যে পৃথিবীতে যত গুলি ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেকটী শিক্ষা করিতেই প্রায় সমান যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক করে। মনুষ্য একেবারে বিশেষ কোন ভাষা শিখিয়া জন্ম গ্রহণ করেন না। অতএব যেরূপ ইংলণ্ডের বালক বালিকাগণ অগ্রে অল্প পরিমাণে মাতৃভাষা ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে গ্রীক্ লাটিন্ ভাষা শিখিয়া থাকে, সেই রূপ ভারতের বালক বালিকার পক্ষে জনক জননীর কথিত বাঙ্গালা হিন্দি উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই ভাষার নিদান-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা অতি সহজ এবং একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। মাতৃভাষা ও ভারতীয় ভাষা সকলের মূল স্বরূপ সংস্কৃতের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় ভাষাও অবশ্য শিখিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ সংস্কৃতের বিরুদ্ধে এই রূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যদিও সংস্কৃত ভাষায় কাব্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্র এখনও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে এবং আমরা তাহার অধিকারী বটে; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকের নিতান্ত অসদ্ভাব। কিন্তু যত্ন ও পরিশ্রমের অসাধ্য যে কার্য্য নাই তাহা আমরা ইংরাজী ভাষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব। ইংরাজীর অসম্পূর্ণ বর্ণ বিন্যাস ও শব্দের অভাব সত্ত্বেও ইংরাজীতে বিজ্ঞানের উচ্চ উচ্চ সমুদায় ভাব সুন্দররূপে প্রকাশিত হইতেছে, এবং মনোহর কবিত্বের ভাবও উত্তমরূপে বর্ণিত হইতে পারে। ইংরাজজাতি মধু মক্ষিকার ন্যায় পরিশ্রম সহকারে নানাবিধ ভাষা হইতে বাক্য ও ভাব সমুদায় আশ্চর্য্য কৌশল সহকারে স্বকীয় ভাষার মধ্যে বিনিবেশিত

করিয়াছেন। আমাদের দেশে এতাদৃশ প্রযত্নের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। সংস্কৃত ভাষা কামধেনু স্বরূপ। যখন ইচ্ছা হয় ইহা হইতে সুমিষ্ট ক্ষীর দোহন করা যাইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা কল্পতরু বিশেষ। ইহার নিকট যাহা ইচ্ছা কর তাহাই পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আধুনিক যে কিছু বিজ্ঞান সংস্কৃতে বিদ্যমান নাই, তাহা অতি সহজে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত হইতে পারে।

কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে কোন রূপ যত্ন ও পরিশ্রমের আশা কোথায়? ভারতের ভাষা মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে এবং ভারতবাসীগণও বিগত- [illegible]ন হইয়াছে। তবে যে ইতিহাসাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে এক্ষণে মনুষ্য বসতি করে তাহারা প্রকৃত মনুষ্য নহে মনুষ্যের ছায়া মাত্র। যদি তাহারা কাল-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চৈতনা প্রাপ্ত হয় এবং আত্মোন্নতির নিমিত্ত প্রয়াস পায় তাহা হইলে তাহারা পুনরায় প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে। যদি তাহাদের সেই পূর্ব্বতন বলবীর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি পুনরায় তাহাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হয়—তাহা হইলেই তাহারা পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিবে। যদি তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের সেই বিশুদ্ধ আর্য্য ভাষা পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাহাদিগের জিহ্বা হইতে নিঃসৃত হয় তাহা হইলে তাহারা পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারিবে। এরূপ ঘটনা কোন্ কালে কোন্ স্থানে ঘটে নাই। মৃত নর কখন পৃথিবীতে পুনরাগমন করে নাই। মৃত ভাষা কখন সজীব হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার সহোদরা স্বরূপ গ্রীক ও লাটিন ভাষা আর পুনরায় জীবিত হইল না। কিন্তু যদি হিন্দুগণ তাঁহাদিগের প্রাক্তন ভাষার জীবন দান করিতে সমর্থ হয়েন তাহা হইলে তৎসঙ্গে তাঁহারাও নবজীবন লাভ করিবেন। যদি সংস্কৃত সমস্ত ভারতবর্ষের বিদ্বন্মণ্ডলীর কথিত ভাষা হয় তাহা হইলেই প্রকৃত ভারতের উদ্ধার হইবে। তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একতাবন্ধনে নিবদ্ধ হইবে। বাঙ্গালা হিন্দি প্রভৃতি অসংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত জনগণের ভাষা হউক কিন্তু যাঁহারা প্রাচীন আর্য্যগণের সন্তান বলিয়া গৌরব করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের কণ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা বিনির্গত হওয়া উচিত। যদি পিতৃ-পৈতামহিক সুরম্য সুদৃঢ় উচ্চ প্রাসাদ কাহারও ভাগ্যে ঘটে তাহা হইলে সেই মনোহর অট্টালিকার যথা-কথঞ্চিৎ জীর্ণ সংস্কার করিয়া তাহাতে বাস করা বিধেয়, না ভিক্ষুকের ন্যায় অপর ব্যক্তির বাটীর বহির্ভাগে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করা উচিত? আর্য্যসন্তানগণ নিদ্রিত থাকিও না। আর ছায়ার ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিও না। পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর। পূর্ব্বভাব ধারণ কর। পূর্ব্বভাষা শিক্ষা কর। দেখিবে পূর্ব্বের ন্যায় গৌরবান্বিত হইবে।

শ্রীচ—

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সমদর্শী—or the Liberal, A monthly Theistic Journal, ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে প্রকাশিত। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ দ্বারা সম্পাদিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৷০ আনা মাত্র। এখানি প্রথম শ্রেণীর একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা। ইহার উদ্দেশ্য ব্রাহ্মদিগের অন্তরে স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক করা। যাঁহারা একেশ্বর-বাদী বা ব্রাহ্ম নহেন তাঁহারা অর্থ ও ইচ্ছা থাকিলে ইহার পাঠক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। সম্পাদক এক প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নিবারণ করিতে গিয়া, আর এক প্রকার সাম্প্রায়িকতায় পতিত হইয়াছেন। তিনি এই পত্রিকার নাম "সমদর্শী" দিয়া অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। যখন ইহা সকলকে সমভাবে দেখিতে পারিতেছে না, তখন ইহার নাম 'সমদর্শী' না হইয়া "ব্রাহ্মসমদর্শী" হওয়া উচিত ছিল। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা অতর্কিত ভাবে প্রচলিত হইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য এরূপ এক খানি পত্রিকার আবশ্যকতা আমরা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করি। কিন্তু আমাদিগের ইচ্ছা এখানি এরূপ সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত না হইয়া প্রশস্ততর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়। ধর্ম্ম বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে লিখিব না, একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্ম না হইলে কাহাকেও ইহার লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিব না, এরূপ সঙ্কীর্ণ ও অনুদার ভাবের সম্পাদকের ন্যায় সুশিক্ষিত ও উদারচেতা ব্যক্তির অন্তরে স্থান পাওয়া উচিত নহে। বিলাতী কনটেম্পরারী রিভিউএর প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম আলোচনা। কিন্তু তথাপি ইহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল লিখিত থাকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম প্রচার, কিন্তু তথাপি ইহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রস্তাব লিখিত থাকে। উক্ত উভয় পত্রিকাতেই "লেখকদিগকে একেশ্বরবাদী" হইতে হইবেই বলিয়া কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই। ইচ্ছা করি এ পত্রিকা খানিও উক্ত পত্রিকা দ্বয়ের উদার প্রণালীর অনুবর্ত্তন করে। তাহা হইলে পত্রিকা খানির প্রচার অধিকতর হইবে এবং উদ্দেশ্যও অধিকতর পরিমাণে সংসাধিত হইবে। সম্পাদক আমাদিগের পরম বন্ধু। এই জন্য আমরা

তাঁহাকে এত স্বাধীনতার সহিত উপদেশ দিলাম। আশা করি তিনি বন্ধু জনের উপদেশ উদার ভাবে গ্রহণ করিবেন, এবং সেই উপদেশের যদি কোন সার-গর্ভতা থাকে, তাহা গ্রহণ করিবেন।

রচনার প্রাঞ্জলতা ও চিন্তার গভীরতা বিষয়ে এখানি প্রথম শ্রেণীর কোন পত্রিকার ন্যূন নহে। ধর্ম্মের সহিত যতদূর উদারতা ও স্বাধীনতা সম্ভব, এই পত্রিকায় ততদূর উদারতা ও স্বাধীনতা সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ইহার ইংরাজী প্রবন্ধ গুলি প্রধানতঃ সম্পাদক দ্বারা লিখিত। সংস্কৃত কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ইংরাজী কালেজের উপাধিধারী ছাত্রদিগের ন্যায় ইংরাজী জানেন না, যাঁহাদিগের মনে এই ভ্রম বিদ্যমান আছে, তাঁহারা যেন ঐ ইংরাজী প্রবন্ধ গুলি পাঠ করেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই ভ্রম নিশ্চয়ই অপনীত হইবে। ইহার উদ্দেশ্য অধিকতর প্রশস্ত হইলে, এ পত্রিকা থানি যে সর্ব্বত্র অধিকতর সমাদরে পরিগৃহীত হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

যৌবনে যোগিনী। ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ভারতের সুখশশী যবন-কবলে ও ভারত-বিজয়ের ন্যায় এখানিও পৃথ্বীরাজঘটিত। ভারতের সুখশশী যবনকবলের ন্যায় এখানিরও নায়ক পৃথ্বীরাজ। কিন্তু যৌবনে যোগিনীর নায়িকা গুজরাট-রাজকুমারী মায়াবতী—কান্যকুব্জ-রাজকুমারী অনঙ্গমঞ্জরী নহে। উভয় নাটকের এইটীই বস্তুগত প্রধান বিভেদ। ভারত-বিজয়ের নায়ক পৃথ্বীরাজসেনাপতি প্রমথ এবং নায়িকা কান্যকুব্জ-রাজকুমারী অনঙ্গমঞ্জরী। সুতরাং ভারতবিজয়ের সহিত যৌবনে যোগিনীর নায়ক নায়িকাগত কোনও সৌসাদৃশ্য নাই। তথাপি এই তিন থানি নাটকেরই উদ্দেশ্য এক, এবং প্রধান ঘটনা একই। তিন থানি নাটকেরই উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ উদ্দীপন, তিন থানিরই সাধারণ ঘটনা পরস্পর-বিরোধজনিত ভারতের অধঃপতন। তিন থানিই এক তানে ভারতের অধঃপতন সঙ্গীত গাইয়াছে। এ সঙ্গীত আমাদের শ্রুতি-সুখকর নহে। কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের প্রতিহিংসা সাধন করিতে গিয়া নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেন—ভারতের স্বাধীনতার সহিত নিজের স্বাধীনতা হারাইলেন; পৃথ্বীরাজ গুজরাটরাজদুহিতা মায়াবতীর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা রক্ষায় শিথিলপ্রযত্ন হইলেন; এ সকল সংবাদে আমাদের সুখ নাই, শান্তি নাই। আমাদের নাটকের নায়কের জন্য আমরা এক্ষণে এক একটী উইলিয়ম্ টেল্, এক একটী রবার্ট ব্রুস্, এক একটী ওকনেল্, এক একটী ম্যাট্সিনি, এক একটী গ্যারিবল্ডি, ও এক একটী ওয়াসিংটন্ চাই; এবং আমাদিগের নাটকের নায়িকার জন্য

এক একটী কালী, এক একটী জোয়ান্ অব্ আর্ক, এক একটী ব্রৈলবিলা, ও এক একটী ম্যাডেম্ রোলাণ্ড চাই। প্রণয়! প্রণয়! প্রণয়! আমাদের নাটককারেরা, আমাদের কবিরা, আমাদের আখ্যায়িকা লেখকেরা প্রণয় ভিন্ন আর কোন বিষয়েই লিখিতে জানেন না। বাঙ্গালীর হৃদয়—হিন্দুর হৃদয়—প্রণয়ে ডুবুডুবু। ইহাকে আর প্রণয়পয়োধিতে অধিকতর নিমজ্জিত করিতে হইবে না। যথেষ্ট হইয়াছে! এক্ষণে আমরা শৌর্য্য চাই, বীর্য্য চাই, একতা চাই। অধঃপতন সঙ্গীতদ্বারা তাহার শিক্ষা হইতে পারে না। আমরা আর ভারতবিজয়, বঙ্গবিজয় কাব্য পড়িতে চাহিনা। তাহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে আমরা সিংহলবিজয়, পারস্যবিজয়, যবনবিজয় প্রভৃতি কাব্য পড়িতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের গ্রন্থকারগণের হৃদয় এখন এই দিকে চালিত হয় ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক বাসনা।

**পাপের প্রতিফল-নাটক।**— শ্রীকেদার নাথ ঘোষ বি, এল্ প্রণীত। নূতন স্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র। বিমলা ও তদীয় ভগিনী বংশীধর মল্লিক নামক বর্দ্ধমানের জনৈক ধনাঢ্য বণিকের সহিত অলৌকিক ও লৌকিক বিবাহ সূত্রে সম্বদ্ধ হন। সাধারণ ভাষায় —বিমলা বংশীধরের প্রণয়িণী ও তৎসহোদরা বংশীধরের স্ত্রী ছিলেন। বিমলার গর্ব্ভে বংশীধরের মতিলাল, হীরালাল, চুনিলাল ও কানাইলাল নামক চারি পুত্র জন্মে। এবং তদীয় ভগিনীর গর্ব্ভে এক স্বামীর ঔরসে যাদবচন্দ্র ও ভাবিনী নামক ভাই ও ভগিনী জন্মে। বংশীধর অতুল সম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার বিষয়ের বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ টাকা। তাঁহার নিজের হস্তে নগদ সার্দ্ধ তিন লক্ষ টাকা ছিল। তিনি নিজের বিষয় হইতে আর অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লইয়া চারি লক্ষ করিয়া বিমলার গর্ব্ভজাত চারিপুত্রকে সমভাগে দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় যাদবচন্দ্রকে দিয়া যাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যাদবচন্দ্রের উপর বিষয়ের সমস্ত ভার ছিল, সুতরাং বংশীধর বিষয় হইতে ৫০ হাজার টাকা লইবার জন্য যাদবের অনুমতি চাহিলেন। দুর্ব্বিনীত যাদব পিতার যথেষ্ট অবমাননা করিলেন এবং কিছুতেই পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বংশীধর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যদি যাদব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত বিষয় বিমলার পুত্র-চতুষ্টয়কে প্রদান করিয়া যাইবেন। বিষয় তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার কে গতি রোধ করে?—যাদব উদ্ধত-স্বভাব, তিনি পিতার প্রস্তাবেও সম্মত হইবেন না, এবং প্রাণ থাকিতে বিষয়ও হস্তান্তরিত হইতে দিবেন না। অবশেষে তিনি বয়স্য কমলের পরামর্শে পিতার প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে দিবস বংশীধর যাদবের সহিত বিবাদ করিয়া রজনীতে মেল ট্রেন যোগে বাটী যাইতেছিলেন, সেই দিবসই ষ্টেসন হইতে বাটী

যাইবার পথে পিতার প্রাণ বধ করিবার নিমিত্ত যাদব কয়েক জন ঘাতুককে প্রেরণ করেন। ঘাতুকেরা স্বকার্য্য সাধন করিয়া যাদবের নিকট প্রতিশ্রুত পুরস্কার লইতে আসিলে, যাদব তাহাদিগকে চোর বলিয়া পুলিশে অর্পণ করেন। ঘাতুকেরা যাদবের এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধান্ধ হইয়া আমূল সমস্ত বিবরণ পুলিশের নিকট প্রকাশ করিল। যাদব পিতৃহন্তা বলিয়া ধৃত হইলেন এবং বিচারপর্য্যন্ত হাজতে রহিলেন। অনুতাপানল তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল—ডনকানের বধের পর ম্যাক্‌বেথের মনের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যাদবেরও মনের এক্ষণে সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় যাদব কণ্ঠে ছুরিকা প্রদান পূর্ব্বক সেই কারাগৃহেই সংসারলীলা সম্বরণ করিলেন। এই সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটীই এই দুঃখান্ত নাটক খানির মূল সূত্র। এই নাটক খানিতে কয়েকটী চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। যাদব উদ্ধত-স্বভাব বটেন, কিন্তু নীচমনা নহেন। দুর্দ্দমণীয় বিষয় বাসনায় ও জঘন্য সংসর্গ দোষেই তাঁহার তাদৃশ দুর্ম্মতি ঘটিয়াছিল। পিতৃবধের পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার মনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে তিনি স্বভাবতঃ নৃশংস ছিলেন না। দুষ্ট স্বরস্বতী কমলের পরামর্শের অনুবর্ত্তনেই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। বিমলায় হিন্দুরমণীর অপূর্ব্ব ছবি প্রদত্ত হইয়াছে—পতিপ্রাণা সাধুশীলা পত্নীর একটী সুন্দর মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যাদবের স্ত্রী সুলোচনায় একটী সরলা কোমল-হৃদয়া হিন্দুবালার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। দেবেন্দ্রে বন্ধুর উপমান স্থল মেণ্টরের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে মানব হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে বিচরণ-সমর্থ তাহা তাঁহার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে। পরিবার-বিশেষের গ্লানি যদি এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য না হয় তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র নাটক খানিকে বাঙ্গালা ভাষার এক খানি বিশুদ্ধ কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

দম্পতী-মিলন—অর্থাৎ যুবরাজের সহিত ভারতেশ্বরীর সাক্ষাৎকার। কলিকাতা বীডন যন্ত্রে শ্রীদুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। এখানি যুবরাজসাহিত্যের অন্যতম। যুবরাজসাহিত্যের সমালোচনার সময় আমরা এ বই খানি খুঁজিয়া পাই নাই। এজন্য তৎকালে ইহার কোন উল্লেখ করিতে পারা যায় নাই। দুর্গাচরণ বাবুর কবিত্ব শক্তির আমরা পূর্ব্বে অনেক পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু এখানিতে তাঁহার স্বাভাবিকী কবিত্বশক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না। বোধ হইল যেন তিনিও হুজুগে পড়িয়া এখানি লিখিয়াছেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে বৃদ্ধা জননী ভারতভূমিকে যুবতীর সাজ সাজাইয়া যুবরাজ অ্যাল্‌ব্যার্টের হস্তে সমর্পণ করিতে এবং যুবরাজকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে

তাঁহার মত সহৃদয় লোকও লজ্জা বোধ করেন নাই।

কবিতা-কৌমুদী—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র। রাজকৃষ্ণ বাবু এক জন সুলেখক। তাঁহার অনেক গুলি কবিতা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। এবং সকল গুলিতেই কিয়ৎ পরিমাণে কবিত্ব শক্তি প্রকটীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাঁকে এক জন কবি বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। গদ্য অপেক্ষা পদ্যে উপদেশ দিলে বালক বালিকাদিগের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়, এই জন্য রাজকৃষ্ণ বাবুর এই উদ্যম। আমাদিগের বিশ্বাস রাজকৃষ্ণ বাবুর এই উদ্দেশ্য কিয়ৎমাণে সংসিদ্ধ হইয়াছে।

জয়দেব-চরিত—শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। গীতগোবিন্দ সংস্কৃত গীতিকাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। জয়দেব তাহার রচয়িতা। রজনী বাবু সেই জয়দেবের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। সুতরাং রজনী বাবু আমাদের কতদূর আদর ও যত্নের জিনিস সহৃদয় পাঠকমাত্র তাহা বুঝিবেন। রজনীবাবুর জয়দেব-চরিতে গভীর গবেষণা ও গাঢ়তর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রজনী বাবু সংস্কৃত কালেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র। তাঁহার জয়দেব-চরিতে যথোচিত পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিক কি মক্ষমূলর প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গও তাঁহার পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। আমরা ইহার সবিশেষ সমালোচনা করিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু নানাকারণে করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা আশীর্ব্বাদ করি রজনী-বাবু মধ্যে মধ্যে এইরূপ গ্রন্থ লিখিয়া সাধারণের প্রীতি-বিধান করুন্।

গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব—প্রথম খণ্ড শ্রীপদ্মনাভ ঘোষাল ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা পুরাণ-প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। আমরা এই পুস্তক খানি প্রায় আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। ইহার প্রত্যেক পত্রে লেখকদিগের গভীর গবেষণা ও সংগ্রহকারিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য মহৎ ও বিষয় অতিশয় বিস্তৃত। ইহার উপক্রমণিকা বিভাগের প্রথম অধ্যায়ে—বঙ্গের প্রাচীন অবস্থা ও সীমা; গৌড় ও বঙ্গের উৎপত্তি ও সীমানির্দ্দেশ; বাঙ্গালা নামের প্রথম উদ্ভব ও প্রচার; আর্য্যজাতির সমাগম; অসভ্যদিগের আবাস—দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রেতাযুগ অবধি লর্ড নর্থব্রুকের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম অধ্যায়ে ভাষার উৎপত্তি; অপভ্রংশের প্রথম কাল; নৈৰুক্তিক প্রমাণ; ব্যাকরণের প্রয়োজন; পাণিনি উদ্ভবে প্রাকৃত ভাষার প্রাবল্য

প্রকাশ, বররুচির উৎপত্তিতে ভারতস্থ বহুবিধ বর্ত্তমান ভাষার উৎপত্তি নির্ণয়; বাঙ্গালা সংস্কৃতেরই অপভ্রংশ, কদাপি প্রাকৃতজাত নহে;—দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব;—এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বিভক্তি প্রয়োগ বিষয়ে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ঐক্য প্রভৃতি বিষয় বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। এত গুরুতর বিষয় সকলের প্রতি যে যথোচিত ব্যবহার এত সংক্ষেপে করা যাইতে পারে ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এত বিষয় একত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে,যে সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া অন্যূন ৫।৬ খান ইতিহাস লেখা যাইতে পারে। ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে দ্বাপর হইতে লর্ড নর্থব্রুকের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের, পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। আমরা ইহাতে সংগ্রহকারদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা ৫০০ পৃষ্ঠায় এরূপ গুরুতর কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। যাহা হউক সংগ্রহকারেরা ভারতের ইতবৃত্ত-লেখকদিগকে যে খাদ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ইতিবেত্তৃগণের অনেক দিনের আহার চলিবে।

ভিখারিণী—সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত, উপন্যাস, জীবনবৃত্তান্ত ও ইতিহাসাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। বিগত কার্ত্তিক মাস হইতে প্রকাশিত। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵১০ মাত্র। সমাজ-দর্পণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যশোদানন্দন সরকার ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে এই পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হইবে। ইহার রচনা ও বিষয় গুলি মন্দ নহে।

কমল-কলিকা—কাব্য। শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তাঁহার নবীন কাব্যখানি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া, তিনি ইহার নাম কমলকলিকা রাখিয়াছেন। তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে এ অবস্থায় ইহাকে সাধারণের গোচর করা উচিত নহে; এবং ইহাকে পরিণত অবস্থায় আনয়ন করা তাঁহার সাধ্যের অতীত। গ্রন্থকারগণের এরূপ সারল্য ও বিনয়শীলতা অতিশয় প্রশংসনীয়। এ কাব্যের দুই এক স্থানে কবিত্ব শক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেল।

বঙ্গবিধবা—রূপক। শ্রীবিরাজমোহন চৌধুরী প্রণীত। বহরমপুর এমেটিয়র নাট্যাভিনয় সমাজ দ্বারা প্রকাশিত। বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ আনা মাত্র। ইহাতে ভারতবিধবা লইয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ঘোরতর বিবাদ বর্ণিত হইয়াছে। ভাবী স্বর্গীয় সুখের আশা দেখাইয়া ভারতবিধবাদিগকে বিধবা-বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করা এই রূপকের উদ্দেশ্য। আমাদের ইহা ভাল লাগিল না।

স্বপ্ন-প্রয়াণ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। এত বড় বিস্তৃত কবিতাগ্রন্থ আজ কালের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। ইহার অবয়ব ৮ পেজী ডিমাই ফর্ম্মার ২৪৩ পাত। আমরা ইহার আদ্যন্ত পড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। ইহাতে নানা প্রকার নূতন নূতন ছন্দ ও নূতন নূতন ভাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা ইহার আদ্যন্ত পড়িতে পারি নাই; সুতরাং ইহার সবিশেষ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

কলির দশ দশা!! প্রহসন। শ্রীকানাই লাল সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য।০ চরি আনা মাত্র। আমরা এরূপ নাটককারদিগের জ্বালায় অস্থির। দুই পাত পড়িতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়, সুতরাং ইহার সবিশেষ সমালোচনা কিরূপে করিব? আমাদিগের প্রেস আছে, নতুবা বলিতাম এরূপ গ্রন্থ আর না লিখিলে ভাল হয়।

কর্ণাটকুমার—দৃশ্যকাব্য। গ্রেট্ ন্যাসনেল থিয়েটরের নিমিত্ত শ্রীসত্যকৃষ্ণ বসু সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। কলিকাতা নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র। এই নাটকখানি উক্ত থিয়েটরে দুই তিন বার অভিনীত হইয়াছে। কর্ণাট-কুমার রঞ্জন ইহার নায়ক এবং উজ্জয়িনী-রাজকন্যা প্রমদা ইহার নায়িকা। প্রণয়ের জয় ঘোষণা করা অন্যান্য বাঙ্গালা নাটকের ন্যায় এখানিরও প্রধান উদ্দেশ্য। এরূপ নাটক দ্বারা আর আমাদিগের পরিতৃপ্তি সাধন হয় না। এখানিতে নাটকোচিত গুণের অপ্রতুল আছে, আমরা এরূপ বলিতেছি না। তবে এরূপ নাটক অনেক হইয়াছে; আমরা এক্ষণে নূতন রকমের নাটক দেখিতে ইচ্ছা করি।

চারুপ্রভা—নাটক। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা পিপল্‌স ফ্রেণ্ড যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ছয় আনা মাত্র। ইহাতেও সেই রাজা, সেই রাজমহিষী, সেই রাজকন্যা, সেই রাজমন্ত্রী, সেই সখী, সেই দূত, সেই প্রেম, সেই যৌবন! এক খানি নাটকেতেই এরূপ সহস্র নাটকের প্রতিবিম্ব পতিত রহিয়াছে। সুতরাং এক খানি পড়িলেই আর সব গুলির ভাবার্থ বুঝা যায়। এই জন্য এক খানা পড়িলে আর অপর গুলি পড়িতে ধৈর্য্য থাকে না। আশা করি নাটককারগণ আমাদিগকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। এ খানির রচনা নিতান্ত মন্দ নহে।

অজয়েন্দু-নাটক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা বিডন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। এখানিও ঐ এক ছাঁচে ঢালা। যৌবনে যোগিনী, ভারতবিজয় ও ভারতের সুখশশী যবনকবলে প্রভৃতির ন্যায় এ খানিতেও ক্ষত্রিয় ও যবনের পরস্পর বিরোধ ও প্রণয়ের জয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহারও রচনা মন্দ নহে।

# জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

## পার্লেমেণ্টীয় জীবন ও উপসংহার।

মিল্ পার্লেমেণ্টে অনেক গুলি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত আয়র্লণ্ড ও জামেকা বিষয়ক প্রস্তাব ও নিম্ন-লিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পার্লেমেণ্টীয় অধিবেশনের শেষ ভাগে একটী একষ্ট্রাডিসন্ বিল্ (১) প্রস্তাবিত হয়। রাজনৈতিক পলাতকদিগকে বিদ্রোহ অপরাধের জন্য তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যে সকল কার্য্য বিদ্রোহের অপরিহার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী আনুষঙ্গিক, তদনুষ্ঠানের অপরাধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলে, বিচারার্থ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করাই এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিল্ এই আকারে পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, ইংলণ্ডকে বিদেশীয় যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের প্রতিহিংসা সাধন পাতকের অংশভাগী হইতে হইত। কিন্তু মিল্ এবং আর কতিপয় অগ্রগত লিবারেল্ তাহা হইতে দিলেন না। তাঁহাদিগেরই সমবেত যত্নে এই বিল্ প্রত্যাখ্যাত হইল। এই বিলের প্রত্যাখ্যানের পর মিল্ ও আর কতিপয় পার্লেমেণ্টীয় সভ্য পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক একষ্ট্রাডিসন্ সন্ধিবিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিবরণ প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হন। তাঁহাদিগের বিবরণ প্রকাশের পর একষ্ট্রাডিসন্ বিল্ পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া নূতন আকারে পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া বিধি রূপে পরিণত হয়। এই বিধিতে নির্দ্দিষ্ট হয় যে কোনও রাজনৈতিক পলাতক কোনও রাজনৈতিক অপরাধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইবেন না। তাঁহারা যদি অভিযুক্ত হন এবং কোন ইংলণ্ডীয় বিচারালয়ে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে তাঁহারা যে অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন তাহা রাজনৈতিক, তাহা হইলে কোন মতেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইবে না। এইরূপে মিল্ কর্ত্তৃক ইউরোপের স্বাধীনতা ও ইংলণ্ডের যশ সংরক্ষিত হইল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পার্লেমেণ্টীয় অধিবেশনের সময় উৎকোচ নিবারণের জন্য ডিস্‌রেলী যে ব্রাইবারী বিল্ অবতারিত করেন, মিল্ বিশেষরূপে তাহার স্বপক্ষতা সাধন করেন। রিফরম্ অ্যাক্ট্ পাস হওয়ায় উৎকোচ প্রথা নিবারিত না হইয়া বরং পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই প্রথা যাহাতে সর্ব্বথা নিরাকৃত হয়, মিল্ তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

(1) Extradition Bill.

তিনি কতিপয় সহযোগীর সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত বিলের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিলেন। এই পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত বিল্ বিধিবদ্ধ হইয়া উৎকোচ প্রথার অনেক পরিমাণে নিরাকরণ করিল।

ডিস্‌রেলীর রিফরম্ বিল্ উপলক্ষে মিল্ আর দুইটী গুরুতর বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন। দুইটীই প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী-বিষয়ক। একটী ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে, অপরটী স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে। পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার আছে বটে; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই হস্তে প্রতিনিধি মনোনীত করণের ভার অর্পিত হইলে, কার্য্যের অনেক অসুবিধা ঘটে। এইজন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোকের উপর এই ভার অর্পিত হইয়া থাকে। ইহাঁরাই ইলেক্‌টর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ইলেক্‌টরের সংখ্যা লোকসংখ্যা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইত না। এখন হইতে লোকসংখ্যা অনুসারে ইলেক্‌টরের সংখ্যা নির্দ্দেশ করাই মিলের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশে মিষ্টার হেয়ারের প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীর উপর একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন; এবং স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন যে এই প্রণালী ইংলণ্ডে অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত না হইলে ইংলণ্ডের মঙ্গল নাই। মিলের এই উত্তেজনা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফলবতী হইল। পার্লেমেণ্ট আপাততঃ অতি অল্পসংখ্যক কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীতে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। কিন্তু এই আংশিক সংস্কারে সবিশেষ ফলোদয় হইল না।

প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী বিষয়ে মিলের চেষ্টা ততদূর সফল হইল না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়ে তিনি অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন। পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার এতদিন শুদ্ধ পুরুষেরাই হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে এতদিন এই প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিল্ এই অন্যায় নিবারণার্থ স্ত্রীজাতিকেও এই অধিকার প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। যে যে নিয়মে পুরুষজাতিকে ইলেক্‌টর করা হয়, সেই সেই নিয়মে যেন স্ত্রীজাতিকেও ইলেকটর করা হয়, ইহাই মিলের প্রার্থনা। পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার এই সময়ে নূতন রিফরম্ অ্যাক্‌ট অনুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত হয়। এমন সময়েও যদি স্ত্রীজাতিরা তাঁহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কখনও ইহা প্রাপ্ত হইবেন এরূপ আশা সুদূরপরাহত হয়। এই ভাবিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মিল্ এ বিষয়ে একটী আন্দোলন উত্থাপিত করেন। তিনি অসংখ্য বিখ্যাত স্ত্রীলোকদিগের নাম স্বাক্ষরিত করিয়া পার্লেমেণ্টে এই বিষয়ে এক খানি আবেদন করেন। যৎকালে মিল্ পার্লে-

মেণ্টে এই আবেদন প্রদান করেন, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে দুই চারি জন চিন্তাশীল সভ্য ব্যতীত আর কেহই ইহার স্বপক্ষতা সাধন করিবেন না। কিন্তু এই বিষয় পার্লেমেণ্টে উপস্থিত হইলে, যখন সর্ব্বশুদ্ধ অশীতি জন সভ্য ইহার প্রতিপোষক হইলেন, তখন বিস্ময় শুদ্ধ মিল্‌কে কেন—সকলকেই অভিভূত করিল এবং মিল্ ও তদীয় দলের উৎসাহের আর পরিসীমা রহিল না। উৎসাহের আরও বিশেষ কারণ এই যে, মিষ্টার ব্রাইট্—যিনি প্রথমে ইহার বিরোধী ছিলেন—মিল্ ও তদীয় দলপতিদিগের বক্তৃতায় প্রতীত হইয়া তাঁহাদিগেরই মতের অনুবর্ত্তন করেন। মিল্ পার্লেমেণ্টে যতগুলি কার্য্য করিয়াছিলেন. তন্মধ্যে তিনি এইটীকেই তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠার কারণ বলিয়া মনে করিতেন।

মিলের পার্লেমেণ্টীয় জীবনের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, প্রায় সমস্তই বলা হইল। কিন্তু তিনি যখন পার্লেমেণ্টীয় কর্ত্তব্য সাধনে প্রধানতঃ নিযুক্ত ছিলেন, তখনও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অমূল্য সময়ের কিয়দংশ অতিবাহিত হইত। পার্লেমেণ্টীয় গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের পর যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহার অধিকাংশই তাঁহার চিটি পত্রের উত্তর লিখিতেই পর্য্যবসিত হইত। পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই তিনি অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে মনোবিজ্ঞান, ন্যায়দর্শন ও অর্থনীতি শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নসকলের মীমাংসার্থ অসংখ্য পত্র প্রাপ্ত হইতেছিলেন যে সকল পত্র পাঠে মিলের প্রতীতি জন্মিত যে লেখকদিগের বুদ্ধি সেই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা বুঝিতে সক্ষম, তিনি তাঁহাদিগেরই পত্রের উত্তর দিতেন। কিন্তু এবম্বিধ পত্রের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে তিনি তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত উত্তর মাত্র দিতে সমর্থ হইতেন। কতকগুলি পত্র বড় বড় লোকের নিকট হইতেও আসিতে লাগিল। সেই সকল পত্রে মিলের রচনাবলীর ভ্রম প্রমাদাদি প্রদর্শিত হয়। মিল্ অতি উদারপ্রকৃতি ছিলেন; সুতরাং তিনি সে সকল পত্রে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া পরম আনন্দের সহিত সেই সকল পত্রের উপদেশানুসারে নিজ ভ্রম প্রমাদ সকল সংশোধন করিয়া লইলেন। কিন্তু যে দিন হইতে তিনি পার্লেমেণ্টের মঞ্চকে আসীন হইলেন, সেই দিন হইতে তিনি অন্যবিধ পত্রও পাইতে লাগিলেন। যাহার যে কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিবার কারণ ছিল, যাহার যে কোন অভাব পূরণের আবশ্যকতা ছিল, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া এবং সেই সেই অভাব নির্দ্দেশ করিয়া মিলের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। মিল্ যাঁহাদিগের প্রতিনিধি হইয়া পার্লেমেণ্টে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই মিলের উপর এরূপ গুরু ভার অর্পণ করেন নাই। যে নিয়মে মিল্ তাঁহাদিগের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে

স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা হইতে রেখা মাত্রও বিচলিত হন নাই। যাহা হউক মিল্ যে সকল পত্র পাইতে লাগিলেন তাহাদের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল, যে সে সকলের উত্তর প্রদান করা তাঁহার পক্ষে অতি দুর্ব্বহ ভার বলিয়া প্রতীত হইল।

যৎকালে মিল্ পার্লেমেণ্টীয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি অধিবেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালেই কেবল লেখনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। সেই সকল অবসর কালে তিনি আয়র্লণ্ড-বিষয়ক প্রস্তাব ভিন্নও আরও কয়েকটী বিষয় রচনা করেন। তন্মধ্যে তদীয় প্লেটোবিষয়ক রচনা (১) এবং সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু বিশ্ব বিদ্যালয়ে বক্তৃতাই সর্ব্বপ্রধান। প্লেটোবিষয়ক রচনা সর্ব্ব প্রথমে এডিন্‌বরা রিভিইএতে প্রকাশিত হইয়া পরে তদীয় "ডেজার্টেসন্স এণ্ড ডিস্কসন্স্" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেণ্ট্ অ্যাণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টরের পদে অভিষিক্ত করেন। এই অভিষেক উপলক্ষেই মিলের পূর্ব্বোল্লিখিত বক্তৃতা। শাস্ত্রের কোন্ কোন্ শাখার উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত, কিরূপ প্রণালীতেই বা তাহাদের আলোচনা হওয়া উচিত, কিরূপে আলোচিত হইলে তাহাদিগ হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তির সম্ভাবনা, এবং কিরূপেই বা অনুসৃত হইলে তাহাদিগ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলের সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয়ে মিল্ যে সকল চিন্তা ও মত আজন্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তিনি সে সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। পুরা-প্রচলিত লাটিন্, গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা সকলের অধ্যয়নের সহিত, নব-প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানের অনুশীলন যে উচ্চ শিক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি প্রবলতর যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। যে প্রাচীন ভাষা সকলের অধ্যয়ন ও বিজ্ঞানের অনুশীলন উচ্চ শিক্ষা বিধান পক্ষে পরস্পর-সহযোগী, সেই অধ্যয়ন ও অনুশীলন যে অনেক সময় উচ্চ শিক্ষা বিধানপক্ষে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ যে সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর লজ্জাকর দূষিতাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলেন। মিলের এই বক্তৃতা যে শুদ্ধ উচ্চ শিক্ষার উত্তেজনা করিয়া দিল এরূপ নহে; সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও মনে উচ্চ শিক্ষার শাখা প্রশাখাদি বিষয়ে এত দিন যে সকল কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া ছিল, তাহারও নিরাশ করিল।

এই সময়ে তিনি আরও একটী গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন; কিন্তু পার্লেমেণ্টে থাকিতে থাকিতে তাহা সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই গুরুতর বিষয়—পিতৃদেব-রচিত

(1) The Essay on Plato.

"মানবমনের কার্য্যকলাপের বিশ্লেষণ" (১) বিষয়ক প্রস্তাবের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশন। ইহা দ্বারা তিনি যে শুদ্ধ পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এরূপ নহে, মনোবিজ্ঞানের প্রতিও তাঁহার প্রকৃত কর্ত্তব্যসাধন করা হইয়াছিল। তিনি টিপ্পনী লিখিয়া সেই সুন্দর পুস্তকখানির মত গুলিকে উন্নত বিজ্ঞান ও দর্শনের উপযোগী করিয়া দিলেন। এই গুরুতর কার্য্যে তিনি একাকী প্রবৃত্ত হন নাই। সুবিখ্যাত দার্শনিক মিষ্টার বেইন্, বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিষ্টার গ্রোট্ এবং সুবিখ্যাত শব্দশাস্ত্রজ্ঞ মিষ্টার ফিন্‌ডিলেটার--এই তিন জনে এই বিষয়ে প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল টিপ্পনী প্রদত্ত হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধভাগ তৎকর্ত্তৃক লিখিত এবং অপরার্দ্ধ মিষ্টার বেইন্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। দর্শনেতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে সকল টিপ্পনী প্রদত্ত হয়, তাহার সমস্তই গ্রোটের শ্রমসম্ভূত; এবং শব্দশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল অভাব প্রপূরিত হয়, তাহা ফিণ্ডেলেটারেরই যত্নে। যৎকালে জেম্স মিলের পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনোবিজ্ঞানের স্রোত প্রতিকূল দিকেই প্রধাবিত ছিল; ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মত তখনও সম্যকরূপে প্রচারিত হয় নাই; এইজন্যই ইহা তৎকালে সাধারণ জনগণের নিকট ততদূর আদৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা কতিপয় মনীষীর মনে এরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করে, যে তাঁহারা ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মতের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এবং ইহাঁদিগেরই যত্নে এই মতের স্বাপক্ষ্যে যে অনুকূল পবন উত্থাপিত হয়, তাহারই প্রবাহ হেতু বর্ত্তমান সময়ে ভূয়োদর্শন মনোবিজ্ঞানের এতদূর প্রভাব। বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যতগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মিষ্টার বেইন্ ও জেম্স মিলের পুস্তকদ্বয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই খানিই উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ইত্যবসরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে—যে পার্লেমেণ্ট রিফরম্ অ্যাক্ট পাশ করেন—তাহার অধিবেশন ভঙ্গ হইল। মিল্ গতবার ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃকই পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরিত হন। কিন্তু নব প্রতিনিধি মনোনীত করণকালে মিলের নাম পরিক্ষিপ্ত হইল। তিনি ইহাতে কিছুমাত্রও বিস্মিত হইলেন না। এই ঘটনার দুই তিনি দিন পূর্ব্বেও তাঁহার পৃষ্টপোষকেরা ভাবিয়াছিলেন যে তিনি এবারও ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন। সুতরাং মিল্ পরিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন বটে, কিন্তু বিস্মিত হইলেন না। মিল্ যে পরিক্ষিপ্ত হইবেন তাহা তাঁহার ও তদীয়

(1) The Analysis of the Phenomena of the Human Mind.

বন্ধুদিগের বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের কারণ ছিল না। তবে যে, কিরূপে তিনি একবার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন, এবং একবার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াই বা দ্বিতীয় বার কেন পরিক্ষিপ্ত হইলেন, ইহাই তাঁহাদিগের বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল।

মিল্ যে দ্বিতীয়বার পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহার গুরুতর কারণ ছিল। টোরি গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে নিজ অস্তিত্বের জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এক্ষণে কোন বিবাদে কৃতকার্য্যতা লাভ করা তাঁহাদিগের নিকট প্রাণধারণের একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইল। তাঁহারা জানিতেন পার্লেমেণ্টে মিলের অবস্থিতি তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতা লাভের প্রধান অন্তরায়। এইজন্য তাঁহারা এই দ্বিতীয় বারে মিলের পরিক্ষেপের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। মিল্ যখন প্রথমবারে প্রতিনিধি মনোনীত হয়েন, তখন টোরিদিগের তাঁহার প্রতি কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহারা তাঁহার উদার মতের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব ছিল না; বরং অনেকেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট অথবা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু মিলের পার্লেমেণ্টীয় নির্ভীক ও স্বাধীন কার্য্যকলাপ দেখিয়া এক্ষণে সকলেই তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন; এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয়বার পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিতে না পারেন, তজ্জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মিল্ তদীয় রাজনৈতিক রচনাবলীতে লোকতন্ত্রের (১) বিরুদ্ধে যে সকল বক্তব্য আছে, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া স্থিতিশীলেরা এইরূপ রটনা করিয়া দেন যে তিনি লোকতন্ত্রের বিরোধী। তাঁহারা ভাবিলেন বুঝি মিল্ তাঁহাদিগেরই দলভুক্ত হইলেন। কিন্তু মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির ন্যায় লোকতন্ত্রের প্রতিকূল পক্ষ মাত্র দেখিয়াই প্রতিহত হইত না; অনুকূল পক্ষও ধারণা করিতে সমর্থ হইত। তাঁহারা যদি মিলের রচনাবলী আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে, মিল্—লোকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে—সে সকলের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াও, অবশেষে লোকতন্ত্রের অনুকূলেই অসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে লোকতন্ত্র হইতে যেসকল অসুবিধা ঘটিবারও সম্ভাবনা; সেইগুলি নিবারণের জন্যই তিনি কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে বলেন মাত্র। মিল্ যেমন এক দিকে টোরিদলের ও স্থিতিশীলদিগের বিশেষ বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া উঠিলেন, তেমনই অন্যদিকে লিবারেল্-দিগেরও অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যে যে বিষয়ে অন্যান্য লিবারেল্দিগের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য ছিল এবং যে যে বিষয়ে

(1) Democracy.

লিবারেলেরা সাধারণতঃ উদাসীন ছিলেন, সেই সেই বিষয়েই প্রধানতঃ মিল্ পার্লেমেণ্টীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। যে যে বিষয়ে লিবারেল্দিগের সহিত তাঁহার মতের একতা ছিল, সে সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতেন না; সুতরাং লিবারেলেরাও তাঁহাকে আপনাদিগের পক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ মিলের কতকগুলি কার্য্যে অনেকেরই মনে তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। জামেকার গবর্ণর মিষ্টার আয়ারের প্রতি তাঁহার ব্যবহার, অনেকেই ব্যক্তিগত উৎপীড়ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাড্লর পার্লেমেণ্টে প্রবেশের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য তিনি যে চাঁদা প্রদান করেন, তাহাতেও তিনি লোকের বিশেষ বিরাগভাজন হন। মিল্ নিজের পার্লেমেণ্টে প্রবেশের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না বটে; কিন্তু যাঁহাদিগের পার্লেমেণ্টে প্রবেশ একান্ত প্রার্থনীয়,তাঁহাদিগের পার্লেমেণ্টে প্রবেশনিমিত্তক ন্যায্য ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা দেওয়া তিনি অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার পার্লেমেণ্টে প্রবেশ সাধনার্থ যে ব্যয়ের সম্ভাবনা তাহার নির্ব্বাহার্থ যখন সাধারণে চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন,তখন তিনিও অন্যান্য উপযুক্ত পাত্রদের তন্নিমিত্তক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে আপনাকে ধর্ম্মতঃ বাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য তিনি যে শুদ্ধ ব্রাড্লর পার্লেমেণ্টে প্রবেশ সাধনের জন্যই চাঁদা দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে,অন্যান্য শ্রমজীবিশ্রেণীপ্রার্থিদিগেরও প্রবেশ-সাধন-নিমিত্তক ব্যয়নির্ব্বাহার্থে প্রচুর চাঁদা প্রদান করেন। শ্রমজীবিশ্রেণী ব্রাড্লর প্রধান পৃষ্ঠবল ছিলেন। তাঁহার নিজেরও বিশেষ ক্ষমতা ছিল। শ্রমজীবিশ্রেণীর নিকট ব্রাডল যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া মিল্ তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মিলের প্রতীতি জন্মিল যে ব্রাড্ল ডিমাগগ্ (১) নহেন। যাঁহারা আপন ইচ্ছানুসারে সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত ও উন্মাদিত করিতে পারেন, তাঁহারাই উক্ত বিশেষণে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ম্যাল্থসের মত ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সকলেও লোকতান্ত্রিক দলের সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি ডিমাগগ্—মিল্ ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যাঁহারা শ্রমজীবিশ্রেণীর লোকতান্ত্রিক মতসকলের পক্ষপাতী হইয়াও স্বাধীন ভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে সক্ষম, যাঁহাদিগের হৃদয় সাধারণ মতের বিরোধেও ব্যক্তিগত স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে বিকম্পিত হয় না,—এরূপ লোকের পার্লেমেণ্টে প্রবেশ যে একান্ত প্রার্থনীয় তাহা মিল্ বিশেষরূপে জানিতেন। এইজন্যই ব্রাড্লর পার্লেমেণ্ট-প্রবেশ সাধ-

(1) Demagogue.

নের জন্য মিলের এত যত্ন ও এত চেষ্টা। ব্রাড্‌লর ধর্ম্মবিরোধী মত সকল সত্ত্বেও তিনি যে পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ইহা মিল্ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেন। যদি মিলের মনে সাধারণ হিতের উপর আত্মস্বার্থ-জ্ঞানের প্রাবল্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি কথনই ব্রাড্‌লর ইলেক্‌সন্-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা দিতে পারিতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে ব্রাড্‌লর বিরুদ্ধে সাধারণ মত এতদূর প্রবল, যে ব্রাড্‌লর স্বপক্ষতা সাধন করিতে গেলে তাঁহার নিজের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবেক। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। ব্রাড্‌লর স্বপক্ষতা সাধনই তাঁহার পার্লেমেণ্টে পুনঃ-প্রবেশের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। তাঁহার শত্রুরা এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ইলেক্টর-দিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিল। এদিকে তাঁহার টোরী প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্ত হস্তে উৎকোচ প্রদান ও অন্যান্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এদিকে মিলের পক্ষে পার্লিমেণ্টে পুনঃপ্রবেশের জন্য সৎ বা অসৎ কোন প্রকারই উপায় অবলম্বিত হইল না। এই সকল কারণ-পরম্পরার সমবায়েই মিল্ প্রথমবার কৃতকার্য্য হইয়াও দ্বিতীয়বার কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

মিল্ ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন না এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র, তিন চারিটী কাউণ্টী প্রার্থী হইবার জন্য মিল্‌কে আহ্বান করিয়া পাঠাইল। যদিও প্রার্থী হইলে মিলের অকৃতকার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, এবং যদিও বিনাব্যয়েই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিত; তথাপি তিনি আর আপনাকে নির্জ্জনবাস-জনিত শান্তিসুখে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি আপনাকে কোন মতেই অবমানিত মনে করিলেন না। তাঁহার পরিক্ষেপ সংবাদে নানা স্থানের নানা লোকের নিকট হইতে তাঁহার নিকট দুঃখসূচক পত্র আসিতে লাগিল। যে সকল লিবারেল্‌দিগের সহিত মিল্-পার্লেমেণ্টে একত্র কার্য্য করিতেন, তাঁহারাও তাঁহার পরাজয়ে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। পরাজয়ে মিলের মনে যদি বিন্দুমাত্রই দুঃখ হইয়া থাকে, এই সাধারণ মহানুভূতিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইল।

আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের চরম সীমায় উপনীত হইলাম। তাঁহার জীবনের এই অংশে কোনও গুরুতর ব্যাপার অভিনীত হয় নাই। তিনি পার্লেমেণ্ট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যয়নে ও গ্রন্থরচনায় এবং দক্ষিণ ইউরোপের গ্রাম্য জীবনের উপভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়ই তথায় অবস্থিতি করিতেন; কেবল বৎ-

সরে দুইবার কতিপয় সপ্তাহ মাত্র লণ্ডনের অদূরে আসিয়া বাস করিতেন। এই সময়েও তদীয় লেখনী ও জিহ্বা পর-হিত সাধনে সতত নিরত ছিল। তিনি অনেক সাময়িক পত্রে—বিশেষতঃ বন্ধুবর মর্লের পাক্ষিক সমালোচনায়—অনেক গুলি প্রস্তাব লিখিয়া পাঠান এবং স্ত্রীজাতির অধীনতা নামক যে পুস্তক খানি অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশিত করেন। বৃদ্ধ চ্যাটামের ন্যায় এই পরিণত বয়সেও তিনি সাধারণ সভায় অনেক বার বক্তৃতা করেন; এবং ভাবী পুস্তকাবলীর জন্য উপকরণসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময় নিষ্ঠুর কালকীট তদীয় জীবনতন্তু ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্তর্গত আভিনে নামক নগরে তদীয় পত্নীর সমাধিমন্দিরের অদূরবর্ত্তি কুটীরে, এরিসিপেলস্ রোগে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু হয়। সেই দিনই অপরাহ্নে তড়িৎবার্ত্তাবহ যোগে ভারতে সংবাদ আসিল যে স্ত্রীজাতির প্রধান সহায়—ভারতের পরম বন্ধু—স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সমর্থক—পণ্ডিত-শিরোমণি—ব্রিটিশ-কহিনুর মিল্ নাই। ভারতের জীর্ণ-দেহে এই বজ্রাঘাত অতি গুরুতর লাগিল। ভারত অতি দুঃখিনী দীনা। তার পক্ষে এ ক্ষতি অপূরণীয়। ব্রিটনের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে প্রকৃত ভারত-হিতৈষী অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয়। পার্লেমেণ্টে কত শত প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ভারতহিতৈষী বর্ক,সেরিডান্,মিল্, ফসেট্, এবং ব্রাইট্ প্রভৃতি কয়েকজন ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

মিল্ যৎকালে পার্লেমেণ্টীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন পার্লেমেণ্টে ভারতীয় কোন গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত হয় নাই। উত্থিত হইলে তিনি যে ভারতের পক্ষই সমর্থন করিতেন, তাহা তাঁহার জামেকা ও আয়র্লণ্ডের প্রতি ব্যবহার দেখিলেই স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে।

মিল্ যে ভারতের প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন তাহার এরূপ আনুমানিক প্রমাণ ভিন্নও দুই একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ক যে প্রসিদ্ধ লিপি প্রেরিত হয়, তাহার রচনাকার্য্যে মিলের ভূয়সী সহায়তা ছিল। মিল্ তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করেসপনডেন্‌স বিভাগের পরীক্ষকের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত, তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। সুতরাং উক্ত লিপিও মিলের দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হইয়াই ভারতে প্রেরিত হয়। মিলের লিবার্টি নামক পুস্তকে যে সকল মত পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং তিনি সেণ্ট অ্যাণ্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের

বক্তৃতাকালে শিক্ষা বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল মতের সহিত এই ভারতীয়শিক্ষা-বিষয়ক-লিপি-প্রচারিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য উপলক্ষিত হয়। তাঁহার মতে চৌর্য্যপ্রভৃতি অপরাধের দণ্ড প্রদান করাই যে রাজার প্রধান কার্য্য তাহা নহে। রাজার প্রজাদিগের প্রতি যতগুলি কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেক প্রজার সুশিক্ষা বিধানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কি ধনী, কি নির্ধন, কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি উচ্চ, কি নীচ—সকলেই যাহাতে বিদ্যাভ্যাস করে, রাজার তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রাচীন ও নবীন ভাষা সকলের অনুশীলনের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা যাহাতে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়েও রাজার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। প্রজাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। মিলের শিক্ষাবিষয়ক মতানুসারে ভারতের শিক্ষাপ্রণালী যে কিয়ৎ পরিমাণে অনুসৃত হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিল্ যে ভারতের পরমহিতৈষী ছিলেন তাহার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাজ্ঞী কর্ত্তৃক স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণকালে মিল্ কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যৎকালে রাজ্ঞী ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে নিজের হস্তে গ্রহণ করেন, তখন মিল্ তাহার ভীষণ প্রতিবাদ করেন। রাজ্ঞীকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে আবেদন করেন, মিল্ই তাহা লিখিয়া দেন। রাজ্ঞীর স্বহস্তে ভারত শাসনভার গ্রহণের প্রতিকূলে মিল্ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। সবিস্তর বিবরণ আমরা আগামী বারে স্বতন্ত্র প্রস্তাবাকারে প্রকাশ করিব। তৎকালে কি ভারতবাসী কি ব্রিটনবাসী—কেহই মিলের যুক্তির গভীরতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মিলের পরামর্শের অনুসরণ না করার অশুভ ফল ভারতবাসিদিগকে এক্ষণে পদে পদে ভোগ করিতে হইতেছে। অযোধ্যার বেগমদিগের সর্ব্বস্বাপহরণের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-প্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিংসের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। কিন্তু কুমা বাই ও লক্ষ্মী বাই প্রভৃতির প্রতি সাধুজনবিগর্হিত ব্যবহারের জন্য রাজ্ঞী-প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুকের কি হইল? অধীন বণিক্‌দলের প্রতিনিধির সামান্য অপরাধও পার্লেমেণ্ট বা রাজ্ঞী ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু রাজ্ঞীর প্রতিনিধির গুরুতর অপরাধও কি রাজ্ঞীর নিকট ক্ষমণীয় নহে? এবং কোন গুরুতর অপরাধেও রাজ্ঞীর ভারত-প্রতিনিধিকে দণ্ডার্হ করেন, পার্লেমেণ্টের কয়জন সভ্যের এরূপ সাহস আছে?

মিল্ ও কম্‌ত—উনবিংশ শতাব্দীর দুই প্রদীপ্ত সূর্য্য—আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তা-স্রোতের নেতা। মিলের বুদ্ধির বিশ্লেষণী শক্তি অতি প্রবল, এবং কম্‌তের বুদ্ধির সংশ্লেষণী শক্তি অতি প্রখর। এক জনের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা অধিক, অন্যতরের বুদ্ধির প্রশস্ততা ও বিশালতা অধিক। মিলের বুদ্ধি তমোগুণান্বিত, কম্‌তের বুদ্ধি রজোগুণান্বিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহাদের সংহার করাই মিলের বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য; এবং নূতন দর্শন, নূতন বিজ্ঞান, নূতন ধর্ম্মনীতি, নূতন রাজনীতি, নূতনসমাজের সৃষ্টি করাই কম্‌তের বুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য। মিল্ পণ্ডিত-শিরোমণি সূচ্যগ্র-বুদ্ধি চার্ব্বাক্ দর্শনপ্রণেতা বৃহস্পতির প্রতিকৃতি; কম্‌ত মীমাংসাপটু চিন্তানিমগ্ন ধীরমতি সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা মুনিপ্রবর কপিলের প্রতিকৃতি। বৃহস্পতি ও কপিলের ন্যায় ইহাঁরা উভয়েই আমাদের পূজ্য, উভয়েই আমাদের আদরের ধন। প্রথমাবস্থায় ইহাঁদিগের দুই জনেরই অনেক বিষয়ে মতের একতা ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হইয়া উঠিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক শাসন লইয়াই প্রধানতঃ এই মতভেদ উত্থিত হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সামাজিক শাসনের প্রাবল্য হইলে জগতের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইবে, সুতরাং তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে—ইহাই মিল্-ভাষ্যের মূল সূত্র। এবং সামাজিক শাসনের উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রাবল্য হইলে জগতে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার সংঘটিত হইবে; সুতরাং তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে—ইহাই কম্‌ত-ভাষ্যের মূল মন্ত্র। এ বিষয়ের পূর্ণ সমালোচনা করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাবে এ বিষয়ের সমালোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত রহিল।

অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে মিলের মত সকলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমালোচনা করিতে আমাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিল।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই—যাঁহারা মানসিক পরিণতির সহিত সমভাবে হৃদয়ের উন্নতি দেখিতে চান; যাঁহারা সন্তান সন্ততিদিগের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন; যাঁহারা বুদ্ধির অসাধারণ তীক্ষ্নতার সহিত অলৌকিক ধৈর্য্যের বিমিশ্রণ দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে চান; যাঁহারা ব্যক্তিগত অবিশৃঙ্খলিত স্বাধীনতার সহিত বিপুল মানবপ্রেমের সামঞ্জস্য দেখিতে ইচ্ছা করেন; যাঁহারা গভীর মানসিক চিন্তার সহিত প্রগাঢ় প্রণয়ের অবিসম্বাদ দেখিতে কুতুহলী; লোকপ্রচলিত কোন প্রকার ধর্ম্মপ্রণালীর অবলম্বন ব্যতীত ও সাধু ও সচ্চরিত্র হওয়া সম্ভব যাঁহারা তাহার পরীক্ষা করিতে চাহেন; তাঁহাদিগের সকলেরই জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত

ও তদীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করা উচিত। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি কখন মানব-জাতির উপকর্ত্তাদিগের পূজা জগতে প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহা হইলে সেই দেব-তালিকা হইতে কম্‌ত ও মিলের নাম কখনই পরিত্যক্ত হইবে না।

সমাপ্ত।

# ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা নিবারণের উপায় কি?

## পরিত্যক্ত শিশুদিগকে কে রক্ষা করিবে?

যত দিন মনুষ্য—তত দিন নরহত্যা সংসারে হইয়া আসিতেছে। পুরুষ-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা, শিশু-হত্যা ততদিন। যতদিন মনুষ্য, মনুষ্যের ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপু সকলও ততদিন। রিপু সকল দমন করা সহজ নহে। শিক্ষা বলে অভ্যাসের গুণে মানব রিপু দমন করিতে পারেন, কিন্তু সে অভ্যাস, সে শিক্ষা সমাজের সকলের সম্ভবে না। যে সকল ব্যক্তি আপনাদের ক্রোধ লোভাদি রিপু আপনারা দমন করিতে না পারে, তাহাদিগকে সাবধানে রাখিবার জন্য নানা প্রকার রাজ-নিয়ম, সমাজ-নিয়ম। দণ্ডবিধির গুরুতর ধারা সকল তাহাদিগের জন্য

সমাজে অপরাধ দুই প্রকার, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। রিপু সকলের উত্তেজনায় মানব যে অপরাধ যে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহাকেই আমরা স্বাভাবিক অপরাধ বলিলাম।—ক্রোধ লোভাদি রিপুর উত্তেজনায় নরহত্যা করা এই স্বাভাবিক অপরাধের অন্তর্ভূত। যে অপরাধ কোন রিপুবিশেষের সাক্ষাৎ উত্তেজনায় কৃত না হয়, যে দুষ্কর্ম্ম লোকে সহসা করিতে বাধ্য নহে, যে অপরাধ করিবার কোন বিশেষ গূঢ় কারণ থাকে, যে অপরাধ করিতে লোকে কতক অংশে শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহা সমাজের চক্ষে তত দোষের বলিয়া নিন্দনীয় নহে। কোথাও বা যে অপরাধ সমাজের চক্ষে প্রশংসনীয় তাহাকে আমরা অস্বাভাবিক অপরাধ বলিলাম। বাঙ্গালীদিগের গঙ্গাসাগরে শিশু-নিক্ষেপ, অসভ্য জাতিদিগের দেবোদ্দেশে নরবলী, ভারতবর্ষীয় অসভ্যজাতি বিশেষের বৃদ্ধ মাতা পিতাকে ভক্ষণ, রাজপুত ও শিকদিগের কন্যা হত্যা; পতি বিয়োগে পত্নীকে সংমৃতা করণ এবং অধুনাতন সকল সভ্য-দেশীয়-দিগের ভ্রূণ-হত্যা, বা সদ্যোজাত শিশুর প্রাণ বিনাশ এই সকল অস্বাভাবিক অপরাধের মধ্যে নিবিষ্ট।

আর দুই প্রকার হত্যা আছে যাহা রাজনীতির অনুমোদিত।—যুদ্ধে যে

অসংখ্য অসংখ্য মানবের জীবন বিনষ্ট হইতেছে তাহা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত। দুই জন সামান্য লোকে যদি কোন গুরুতর কারণে কলহ করিয়া এক জন আর এক জনকে সহসা হত্যা করিয়া ফেলে তাহা হইলে সে মহাপাপ হইল। সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। অপরাধীকে এক জনের প্রাণের জন্য আপন প্রাণ অবশ্যই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। দুর্ভাগার প্রাণত যাইবেই, আবার তাহার উপর লজ্জায় মুখ দেখান ভার। সে অপরাধ করিয়াছে, তাহার আর কোন রূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই, সমাজের সে নিতান্ত কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত লঘুতর বিষয় লইয়া দুই দেশের রাজা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন, সে কলহে দোষ নাই।—সে কলহের নাম যুদ্ধ। সে কলহে সহস্র সহস্র লোক বিনাপরাধে হত হইল, তাহাতে কোন দোষ নাই, হত্যাকারীদের বরং তাহাতে মহা গৌরব। কারণ সেত সামান্য কলহ নহে, সে মহাযুদ্ধ। তাহাতেত দুই চারি জনের হত্যা সম্পাদিত হয় নাই; অসংখ্য অসংখ্য মানবের জীবন নষ্ট হইয়াছে—সুতরাং তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। রাজনীতি বলিতেছেন ইহাতে কোন দোষ নাই। আমরা কোন্ সাহসে বলিব যে দোষ আছে ? তবে ইহাকে কে হত্যা মধ্যে পরিগণিত করিবে ?—খুনের জন্য খুন করিতে দণ্ডনীতি উপদেশ দিতেছেন, তাহাকেও আমরা অপরাধ মধ্যে গণিত করিতে পারিলাম না।—আমরা না পারি, রাজনীতি না বলুন, কিন্তু কখনও না কখনও এই দুই প্রকার হত্যা কার্য্যকে সমাজ অপরাধ মধ্যে পরিগণিত করিবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর হত্যা অপরাধের বিষয়ে কোন কথাই বলিব না, দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গেই আমাদের এই প্রস্তাবের সম্বন্ধ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আবার আমরা কেবল শিশুহত্যা বিষয়ে দুই চারি কথা বলিব, সকল প্রকার অপরাধের সমালোচনা আমরা করিব না।—গঙ্গাসাগরে শিশু নিক্ষেপের বিষয়ে আমরা কোন প্রকার আন্দোলন করিব না;—সে বিষয় অতীত মধ্যে পড়িয়াছে। রাজপুত্র ও শিখদিগের কন্যা হত্যার কথা আমরা সংক্ষেপে সমালোচন করিব। প্রস্তাবান্তরে তাহার বিস্তারিত সমালোচনের ইচ্ছা রহিল। দেবোদ্দেশে—যজ্ঞস্থলে—শিশুহত্যা এখন আর কোন সভ্যদেশে প্রচলিত নাই, তাহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কোন কথাই বলিব না। ব্যাখ্যা মুখে লেখনী হইতে যাহা বহির্গত হয় তাহাতেই পাঠকবর্গ সন্তুষ্ট হইবেন।—যে মহাপাপ অতি পূর্ব্বকাল হইতে সমাজে সমান বেগে চলিয়া আসিতেছে, যাহার নিবারণের অনেক উপায় হইতেছে কিন্তু বিশেষ ফল কিছুতেই হইতেছে না, যে মহাপাপ সভ্যদেশ মাত্রকে কলুষিত করিয়াছে ও করিতেছে

প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিশর, যিহুদা যে মহাপাপের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই; নব্য ভারত যে পাপের প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; নব্য ইউরোপ ও আমেরিকা যে মহাপাপের স্রোতে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে আমরা সেই ভয়ানক মহাপাপের আন্দোলন এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে করিতে চাহি। ভ্রূণহত্যা ও সদ্যোজাত শিশুহত্যার বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাহি। কি কি কারণে এই মহাপাপ সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে; এই মহাপাপের নিবারণের জন্য কোন্ দেশে কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে; উপায় কতদূর সফল হইয়াছে; এ মহাপাপের জন্য দায়ী কে; কি উপায় করিলে এ মহাপাপের নিবারণ হইতে পারে; কোনও দেশে কখনও সে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল কি না; আমরা এই সকল বিষয়ের সংক্ষেপে সমালোচনা করিব।

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ স্বাভাবিক। মাতা সন্তানকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন, এ স্নেহ; ভালবাসা শিখিতে হয় না। সকল জন্তুরই ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।—তথাপি শিশুহত্যা সমাজে বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে!—আমরা যদি এই পৃথিবীর অধিবাসী না হইতাম, যদি চন্দ্রলোকে কিম্বা সূর্য্যলোকে আমাদের অধিবাস হইত, আমরা যদি সহসা এই পৃথিবীতে আসিয়া এখানকার শিশুহত্যার কথা শ্রবণ করিতাম; তাহা হইলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে মাতা আপনার পেটের ছেলেকে নষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, আমাদের পিতৃপিতামহগণ যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, ইতিহাস যাহার সাক্ষ্য দিতেছে সে বিষয় অবশ্যই আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে।

এই অস্বাভাবিক, আসুরিক কার্য্যের কারণ কি? সন্তান-হত্যার অপেক্ষা আর পাপ নাই। তবে এই গুরুতম পাপের স্রোত এত প্রবল কিসে?—একথা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বুঝিতে অধিক দূর যাইতে হয় না। অধিক বিদ্যা বুদ্ধি আবশ্যক করে না।—সমাজের দোষেই এই মহাপাতকের এত প্রবল বেগ।——দরিদ্রতা নিবন্ধনই সমাজের অধিকাংশ পাপকর্ম্ম। সামাজিক নিয়মের দোষেই সমাজের অধিকাংশ দুষ্কর্ম্ম। সমাজের দরিদ্রতা সমাজের নিজের দোষে; সমাজের অপধর্ম্ম সমাজের নিজের দোষে। সমাজের যত অনিষ্ট, যত অত্যাচার, যত পাপ, যত ক্লেশ এই দুই গুরুতম দোষে হইয়া থাকে। সমাজে যদি দরিদ্রতা না থাকিত, তাহা হইলে এত হত্যা, এত দস্যুবৃত্তি, এত তস্করতা সমাজে কখনই থাকিতে পারিত না।—সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ দিলীপের সময়ে কেবল "শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা" —অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সে সময়ে সমাজে দরিদ্রতা এত অধিক ছিল না।

শিশু হত্যাও অনেক সময়ে দরিদ্রতা নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অপধর্ম্ম তাহার প্রধান কারণ। সমাজে যদি কোন প্রকার অপধর্ম্ম প্রবেশ করিতে না পারিত তাহা হইলে, এত ভ্রূণ হত্যা, এত শিশু-হত্যা আমাদিগকে কখনই দেখিতে হইত না।

পিতা মাতা দরিদ্র হইলে তাহাদের সন্তান হত্যা করা নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহই তখন তাহাদিগকে সেই হত্যাকাণ্ডে উত্তেজিত করিয়া থাকে। যে অভাবে, যে দুঃখে, আপনারা ক্লেশ পাইতেছে, সেই অভাবে সেই দুঃখে আপনাদের প্রাণাধিককে তাহারা নিক্ষিপ্ত করিতে কোন মতেই সম্মত হইতে পারে না, আপনারা যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, প্রাণাধিক পুত্র কন্যা সেই যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এ কথা মনে হইলেই তাহাদের সমস্ত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তাহাদের বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়। তখন যাহাতে প্রাণাধিক সন্তানকে সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে পারে, তাহার উপায় অনু-সন্ধানেই তাহাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত যত্ন প্রযুক্ত হয়। হায়! দরিদ্রের আর কি উপায় আছে! দুর্ভাগোরা উপায়ান্তর না দেখিয়া একমাত্র ভয়ঙ্কর আসুরিক উপায়কেই প্রধান উপায় বলিয়া স্থির করে। বুদ্ধির বিকার হইয়াছে। জ্ঞানের লেশ মাত্রও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।—ভাল মন্দ কে তাহাদিগকে বুঝাইবে? সন্তান-হত্যা মহাপাপ এ কথা তখন তাহাদের মনে কিরূপে স্থান পাইবে?—দুর্ভাগা জনক জননী সন্তানের জীবন নষ্ট করিল! যাহার জীবনের জন্যে আপনাদের জীবন প্রদান করিতে পারে, সেই স্নেহের ধনের জীবন নষ্ট করিল, স্নেহের জন্যই সেই স্নেহাধারের জীবন নষ্ট করিল! ছেলেকে বড় ভাল বাসে বলিয়াই তাহারা সেই দুধের ছেলের প্রাণ বিনষ্ট করিল!—এ দোষ কাহার? এ মহাপাপের জন্যে কে দায়ী?—অবশ্য সমাজ। সমাজ ভিন্ন অন্য কেহই দোষের ভাগী নহে। এ পাপের যদি কিছু দণ্ড থাকে সমাজকেই তাহা ভোগ করিতে হইবে। দরিদ্রতা কেন সমাজে রহিয়াছে? এক জনের সোনার খাট আর এক জনের ছেঁড়া চ্যাটা কেন? একজনের অর্থ ক্রমে স্তূপাকার হইয়াছে, যে অর্থের কোন ব্যবহার নাই, আর একজনের উদরান্নের অভাব, এরূপ অত্যাচার সমাজে কেন? ইহার জন্যে কে দায়ী, আমরা সহস্রবার বলিব সমাজ। সমাজ ভিন্ন অন্য কেহই নহে। এ অত্যাচারের মূল স্বার্থপরতা। সমাজের শিক্ষা সেই স্বার্থপরতার উপদেশ দিতেছেন, সমাজের অপধর্ম্ম সেই স্বার্থ-পরতার উপদেশ দিতেছেন, সমাজের নীতিশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র সেই স্বার্থপরতার উপদেশ দিতেছেন। তবে সে অপরাধ সমাজ ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে?—সমাজের অপধর্ম্ম তারস্বরে বলিতেছে পরিণীতা ভিন্ন অন্য স্ত্রীর সংসর্গ করিলে

মহাপাপ। রাজবিধি সেই অপধর্ম্মের ছায়াবৎ অনুসরণ করিতেছে।—বেশ্যা-গমন করিলে অপধর্ম্ম সম্মুখে নরক প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছে! দুর্ভাগা দরিদ্রের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। প্রকৃতির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার তাহার শক্তি নাই, সমাজ তাহাকে সেরূপ শিক্ষা দেন নাই। বেশ্যা গমন করিলে তৎক্ষণাৎ নরক। দুর্ভাগার যখন নিতান্ত অসহ্য হইবে তখনই কেবল আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিবে এরূপ বন্দোবস্ত করিলে নরক্ভোগ। দুর্ভাগিনীরও সেই দশা বরং তাহার দশা আরও শোচনীয়, কারণ সে স্ত্রীজাতি। সামাজিক নিয়মের কর্ত্তা পুরুষ; সামাজিক নিয়মের কর্ত্তা পুরুষ; ধর্ম্মের কর্ত্তা পুরুষ। সকল দিকেই পুরুষ। স্বার্থপরতা মনুষ্যের অভ্যাসলব্ধ, পুরুষও স্বার্থপর। তবে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর দশা শোচনীয় না হইবে কেন?—ফল কি হইল?—দুর্ভাগা ও দুর্ভাগিনীর পরস্পর পরিণয় সম্পন্ন হইল। যখন পরিণয় হইল, দুই দেহে এক হইল, "অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্ম্মাসং" যুক্ত হইল। তখন আর তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া রাখে কে? সমাজ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিবেন না, ধর্ম্ম তাহাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিবেন না, আইন তাহা-দিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিবেন না। ইহার উপর তাহাদের রিপুর প্রভাব ত স্বভাবতঃ আছেই, তাহাদের স্নেহ ভালবাসা আর দরিদ্রতানিবন্ধন তিরোহিত হইয়া যায় নাই। সুতরাং দুর্ভাগার সহিত দুর্ভাগিণী একস্থানে বাস করিতে লাগিল, একস্থানে আহার করিতে লাগিল, এক স্থানে শয়ন করিতে লাগিল। ফল যাহা হইল তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন, দুর্ভাগাদের বৎসর বৎসর সন্তান হইতে লাগিল, সমাজে ভিক্ষু-কের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে দেশে স্বাধীনতার প্রভাব আছে সেখানে দুর্ভাগ্য পিতা মাতার একমাত্র চিন্তা হইল, কিসে ভিক্ষা হইতে—উপবাস হইতে হতভাগ্য সন্তানগুলিকে রক্ষা করি, কাজেই অনেক সময়ে শিশু-হত্যারূপ মহাপাপকেই একমাত্র উপায় অবলম্বন করিতে হইল।—ইউরোপে স্বাধীনতা আছে, দরিদ্রতানিবন্ধন শিশুহত্যা সেই জন্য ইউরোপেই অধিক হইয়া থাকে! ভারতবাসীরা ভিক্ষুকের জাতি—বাঙ্গা-লীরা ভিক্ষুকের জাতি। দরিদ্রতা জন্য এ দেশে শিশুহত্যা প্রায়ই করিতে হয় না। যাহারা বংশানুক্রমে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের দরি-দ্রতা-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। দরি-দ্রতা কাহাকে বলে হয়ত তাহারা তাহাই জানে না; তবে দরিদ্রতানিবন্ধন শিশু-হত্যা তাহারা কেন করিবে? যাহারা বংশানুক্রমে দাসত্ব করিয়া আসিতেছে সন্তানদিগকে দাসত্বে বদ্ধ করিতে তাহা দের ভয় কেন হইবে?—আমেরিকার দাসগণ সন্তানোৎপাদনে কিছুতেই কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু ইউরোপের অষ্টাবিংশ

শতাব্দীর সার্ফগণ জমীদারের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া সন্তানোৎপাদনের মহাপাপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের এক প্রদেশের এক অত্যাচারী জমীদারের জমীদারী শুদ্ধ সমস্ত প্রজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা কোন মতেই বিবাহ করিবে না, বিবাহ করিলেই সন্তান হইবে: পাছে সন্তানেরাও আবার অত্যাচারীর অত্যাচারে ক্লেশ পায় এই ভয়ই তাহাদিগকে বিবাহ-পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল। ক্রমাগত ৯ বৎসরের মধ্যে এক জনও বিবাহ করা দূরে থাকুক বিবাহের ইচ্ছাও প্রকাশ করে নাই। যুবক যুবতীরা বরং উপায়ান্তরে আপনাদিগের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিত তথাপি কোন মতেই পরস্পর সংসর্গ করিত না। ক্রমেই সে প্রদেশে প্রজার অভাব হইতে লাগিল। আমেরিকার ন্যায় সেখানে দাস ক্রয় করিবার সুবিধা ছিল না। কাজেই জমীদারকে জমাদারী বিক্রয় করিয়া পলায়ন করিতে হইল। যিনি নূতন জমীদার হইলেন, তাঁহার অত্যাচার রহিল না। প্রজাদের অবস্থা ক্রমে উন্নত হইল। তবে তাহারা বিবাহ করিল। জমীদারেরও উন্নতি হইল। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা, এরূপ অধ্যবসায় সর্ব্বদা কে দেখিতে পায়? ইউরোপে দেখিলাম বলিয়া ভারতে কি এই রূপ দেখিতে পাইব?—সিংহ মধ্যে দেখিলাম বলিয়া কি শৃগালমধ্যেও এই রূপ দেখিতে আশা করিব?—অহো! বিড়ম্বনা!—দরিদ্রতানিবন্ধন শিশুহত্যা অসভ্যদেশে হইতে পারে না। অসভ্য দেশে দরিদ্র নাই। সেখানে সকলেই সমান। সেখানে অভাব অল্প। যাহা অভাব আছে তাহা সকলেরই আছে, সে অভাবের জন্যে তাহারা কোন ক্লেশ ভোগ করে না। বনের ফল মূল, মৃগয়ালব্ধ মৃগ মহিষ তাহাদের উদর তৃপ্তি করে, বৃক্ষের বল্‌কল তাহাদের রাজপরিচ্ছদ, পর্ব্বতের গুহা তাহাদিগের অট্টালিকা; তবে তাহারা দরিদ্র কিসে? তাহারা দরিদ্র নয়, সেই জন্য সন্তান হইলে তাহারা নষ্ট করে না, সন্তান প্রতিপালনের তাহাদের ভয় নাই। তাহারা নিজে দুঃখ ভোগ করে না, তাহাদের সন্তানেরাও কোন রূপ দুঃখ ভোগ করিবে না; তবে কেন তাহারা স্নেহের বস্তুকে বিনষ্ট করিবে?—তবেইত দেখিতেছি সভ্য হইতে অসভ্য ভাল, ভাল হইতে মন্দ ভাল।—কিন্তু সে দোষ কার? সেওত সমাজের। সমাজ যেমন ক্রমে আমাদিগকে সভ্য করিতেছেন, সেই রূপ অসভ্যাবস্থায় আমাদের অবস্থা যেমন সমান ছিল, এখনও কেন কতকটাও সেই রূপ রাখুন না। সমাজ তাহা রাখিতেছেন না, আমরাও বলিতেছি—দোষ সমাজের, সমাজই সকল দোষের ভাগী।

আমরা কি সাধে বলিতেছি সভ্য হইতে অসভ্য ভাল।—সভ্য অপেক্ষা অসভ্য অধিক সভ্য?—সভ্যের কাজ দেখিয়া আমরা

সভ্যকে অসভ্য অপেক্ষা অধিক অসভ্য বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমরা অসভ্যদিগকে অশ্রদ্ধা করিতে পারি। আপনারা সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, আপনাদের সুখের সীমা নাই বলিয়া চারিদিকে ঢাক বাজাইতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক আমরা কি? বাস্তবিক আমাদের কার্য্য কিরূপ?—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে আমরা অসভ্য হইতেও অধিক অসভ্য, আমাদের কাজ দেখিয়া অসভ্যেরাও ভীত হয়, লজ্জিত হয়। আমরা দরিদ্র বলিয়া আমাদিগকে আপনাদের পুত্র কন্যা বিনষ্ট করিতে হইতেছে। অসভ্যেরা তাহা করে না। আমরা সভ্য বলিয়া আমাদের অপরিণয়-জাত শিশুদিগকে আমরা রাক্ষসের ন্যায় বিনষ্ট করিতেছি। আমাদের শিশুগণ প্রকৃত প্রণয়-জাত হইয়াও যদি তাহারা পরিণয়-জাত না হয় তাহা হইলেই তাহারা কৃমিবৎ পরিত্যজ্য। তাহারা সমাজের হীনতম। তাহারা আমাদের সকল অনিষ্টের কারণ। সুতরাং তাহাদিগকে যে কোন প্রকারেই হউক আমরা দূরীভূত করিব। তাহাদের সহিত যে আমাদের কোনরূপ সম্পর্ক আছে, ইহা আমরা কোন মতে স্বীকার করিব না। স্বীকার করা দূরে থাকুক যাহাতে কেহ কোন মতে জানিতে—সন্দেহ করিতে না পারে আমরা প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিব। আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্যে—লোকনিন্দার হাত হইতে আমাদিগকে বাচাইবার জন্যে—ধর্ম্মের পবিত্র রাজ্যে আপনাদিগকে রাখিবার জন্যে আমরা সেই সন্তানের প্রাণ বিনষ্ট করিব; কিন্তু কোন মতেই তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।—আমরা সভ্য বলিয়াই আমাদিগকে এইরূপ করিতে হয়, কিন্তু অসভ্যদিগকে এ মহাপাপে নিমগ্ন হইতে হয় না। সেইজন্যেই বলিতেছি, আমরা সভ্য হইয়াও অসভ্য অপেক্ষা অধিক অসভ্য।—এ দোষ কাহার?—সমাজের অপধর্ম্মের। পরিণয়-জাত না হইলেই সেই সন্তানকে হেয় বলিয়া কে স্থির করিল?—সমাজের অপধর্ম্ম। প্রণয় হইলে পরিণয় হইল না, এ কথা আমাদিগকে কে শিখাইল? সমাজের অপধর্ম্ম। বিবাহ না করিয়া—একটা চির-বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া—নিতান্ত আবশ্যক হইলে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিলে মহা পাপ হয়—এ বিজ্ঞতা আমাদিগকে কে বলিয়া দিল?—সমাজের অপধর্ম্ম। সমাজ সেই অপধর্ম্মকে পূজা করিতে লাগিল। সামাজিক নিয়ম সকলও সেই অপধর্ম্মের পাঠান্তর মাত্র হইল।—সমাজের অপধর্ম্মই সকল অনিষ্টের মূল। অপধর্ম্ম এই শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যাকে সমাজে আনিল; তাহার সহচর রাজনিয়ম সেই হত্যাকাণ্ডের আর কিছুই করিতে না পারিয়া অপরাধীদিগের শাসনের জন্যে নানা প্রকার কঠোর দণ্ডবিধির সৃষ্টি করিল; অপরাধীর জীবনও দণ্ডবিধির অধীন হইল—পাপের অপেক্ষা প্রায়শ্চিত্ত অধিক নিষ্ঠুর হইল। কিন্তু

হইলে কি হয়, রোগের মূল নষ্ট না করিয়া যতই কেন কঠিন ঔষধ প্রয়োগ কর না রোগ নির্মূল হইবে না।—যে স্নেহময়ী জননী আপনার গর্ভজাত শিশুকে লজ্জা ভয়ে, নিন্দা ভয়ে, আত্মীয় পরের উৎপীড়ন ভয়ে বিনষ্ট করিতে সাহস করিল; প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম আত্মজকে নষ্ট করিতে পারিল; দণ্ডবিধি তাহাকে কি ভয় দেখাইবে? মাতা সন্তানের মঙ্গলের জন্যে আপনার প্রাণ অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই মাতা যখন পাষণ্ড সমাজের পাষণ্ডতম নিয়মের ভয়ে আপনার হৃদয়ের হার, নয়নের তারাকে স্বহস্তে উৎপাটিত করিতে সাহস করিল, তখন দণ্ডবিধি তাহাকে কি ছার জীবনের ভয় দেখাইবে? এই জন্যেই কঠোরতম দণ্ডবিধিও এ মহাপাপ সমাজ হইতে কখনও তিরোহিত করিতে পারে নাই, কোন কালে পারিবেও না। যাঁহারা কেবল দণ্ডবিধির উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক পাপের নিবারণ চেষ্টা করেন, তাঁহারা অতিনির্ব্বোধ। তাঁহারা এক অনিষ্ট নিবারণ করিতে গিয়া সহস্র সহস্র নূতন অনিষ্টের সূত্রপাত করেন। আমরা তাঁহাদিগকে সমাজের কণ্টক বই আর কি বলিতে পারি?—এদিকে আপাততঃ এই কথা গুলি বলিয়াই আমাদিগকে অন্য দিকে যাইতে হইতেছে। আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে, শিশুহত্যা, শিশুত্যাগ—ভ্রূণ হত্যা সমাজে কতদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কোন্ দেশে কোন্ ধর্ম্মের সময় এই মহাপাপের বেগ কখন কিরূপ।

ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ যে সমাজ যত সভ্য হইতেছে এই মহা পাপের ততই বেগ বাড়িতেছে—সকল পাপেরই ক্রমে বেগ বাড়িতেছে।—আমরা নব্য সমাজের বিষয়েই এইকথা বলিলাম, আধুনিক সমাজের বিষয়েই এই কথা বলিলাম। আমরা দেখিতেছি, মনুর সময়ে ভারতে এ পাপের প্রভাব ছিলনা। মনুর সময়ে এ মহাপাপ করিবার কাহারও প্রয়োজন ছিলনা। দরিদ্রতা নিবন্ধন শিশু হত্যাও তখন কোন মতেই হইতে পারিতনা। তখন লোকের অভাব ছিলনা বলিলেই হয়। অন্য কারণেও শিশুহত্যা তখন কেন হইবে? মনুর সময়ে বিবাহের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহাতে কাহাকেও গুপ্ত প্রণয় করিতে হইতনা। মনুর সময়ে যে দ্বাদশ প্রকার পুত্র সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহাতে কাহাকেই জারজ বলিয়া ঘৃণিত হইতে হইতনা, তবে কেন জননী সন্তান হত্যা করিবেন?—কেনই বা ভ্রূণহত্যা করিতে যাইবেন? মনু যে বিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সমাজে ভ্রূণ হত্যা, শিশু হত্যা কোন মতেই হইতে পারিত না; সেই কারণেই মনু ভ্রূণহত্যার কোন রূপ শাসন করিয়া যান নাই।—ভ্রূণহত্যা বলিতে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক গর্ভনষ্ট করাকেই মনে করিতেছি। পাঠক গণও তাহাই বুঝিবেন।

"হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেব ব্রতঞ্চরেৎ।

রাজন্যবৈশ্যৌ চেজ্যানামাত্রেয়ীমেব চ স্ত্রিয়ম্।"

স্ত্রী পুরুষ কি নপুংসক এ তদ্রূপে অবিজ্ঞাত ব্রাহ্মণ ভ্রূণ এবং যাগপ্রবৃত্ত ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য রজস্বলা ব্রাহ্মণী এই সকলের হত্যায় ভ্রূণ হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনাত্রেয়ী বধে উপপাতক এবং সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অনাত্রেয়ী অর্থাৎ ঋতুস্নাতা স্ত্রীবধে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।—মনু ১১। ৮৮।—এখনকার ন্যায় ভ্রূণ হত্যা, কিম্বা শিশুহত্যা যদি মনুর অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে মনু অবশ্য প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ের বিধি নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। বাস্তবিকও মনুর সময়ে সেরূপ বিধির কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা মহম্মদও গুপ্ত প্রণয়জাত সন্তানের কিম্বা গর্ভের নাশের কোন রূপ দণ্ড বিধিবদ্ধ করিয়া যান নাই।—তিনি যেরূপ বিজ্ঞতাসহকারে ধর্ম্মের সূত্র সকল রচনা করিয়াছেন তাহাতে এরূপ বিধির কোন প্রয়োজনই নাই। বাস্তবিকও মনুর পর আর কোন সমাজ-সংস্কারকই এরূপ বিজ্ঞতাসহকারে আপনার মন্তব্য বিধিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। এরূপ উদার সমাজ-সংস্কারকও আমরা আর দেখিতে পাইনা। তবে চৈতন্য যে এবিষয়ে মহম্মদের ন্যূন নহেন তাহা আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে। মহম্মদ বিবাহের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে জারজ সন্তান বলিয়া সমাজে কেহই ঘৃণিত হইতে পারেন না। পরিণয় না করিয়া প্রণয় হইলেও সমাজে কোন রমণীই পাপিষ্ঠা বলিয়া হেয় হয়েন না। তবে কেন শিশুহত্যা ভ্রূণ হত্যা সমাজে স্থান পাইবে। মহম্মদ যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যাহা ভাল বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, মুসলমান সমাজে সে নিয়ম এখনও অনেক উপকার করিতেছে। তবে মহম্মদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে কি না তাহা মুসলমানেরাই বলিতে পারেন। সত্য, পরদার গমনের শাস্তি মহম্মদ অতি কঠোর করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি যদি অপরাধীরা আন্তরিক অনুতাপ করে তাহা হইলে সে অপরাধের মার্জ্জনা আছে।—মহম্মদ বিবাহের যেরূপ উদার নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন তাহাতে পরদারগমনের কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি যদি কেহ সে পাপে প্রবৃত্ত হয় তবে তাহার কঠিন দণ্ড ব্যবস্থা করিতে মহম্মদের অবশ্যই অধিকার ছিল।

"If any of your women be guilty of whoredom, produce four witnesses from amongst you against them, and if they bear witness against them, imprison them in separate apartments, until death release them, or God affordeth them a way to escape. And if *two* of you commit the like wickedness punish them both: *but if they repent and amend* let

them both alone; for God is easy to be reconciled and merciful. (Sale's Koran chap VI).

মহম্মদ পরদারগমনের এই কঠোর দণ্ড বিধিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অপরিণয়-জাত শিশু কিম্বা গর্ভ নষ্ট করিলে অপরাধের কোনরূপ দণ্ডই বিধান করেন নাই। নিশ্চয়ই শিশুহত্যা বা ভ্রূণ হত্যার সম্ভাবনা ছিল না, নতুবা তাঁহার মত দূরদর্শী ব্যবস্থাপকের এবিষয়ে ভ্রম হইতে পারেনা।—আরও দেখিতে হইবে, মহম্মদের সময়ে আরবীয়েরা অপেক্ষাকৃত অসভ্য ছিল; সে সময়ে গুপ্তপ্রণয় জন্য শিশুহত্যা, ভ্রূণ হত্যা কাহাকেও করিতে হইতনা, সেই কারণেও মহম্মদের এবিষয়ে কোন প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলনা। সমাজের অবস্থা নিবন্ধন বর্ত্তমানে কোন প্রয়োজন রহিল না; মহম্মদ যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন তাহাতে ভবিষ্যতেও কোনরূপ প্রয়োজন রহিল না, সুতরাং মহম্মদ কোন ব্যবস্থাই করিলেন না।

দুঃখের অবস্থায় আরবীয়েরাও শিশুহত্যা করিত। নতুবা কোরাণে নিম্নলিখিত উপদেশ কেন থাকিবে?

"Kill not your children from fear of being brought to want. We will provide for them and for you, verily the killing them is a great sin."—( Sale's Koran chap XVII).

যেমন শিশুদিগকে ভরণ পোষণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে আরবীয়েরা তাহাদিগকে নষ্ট করিত সেইরূপ পুরাকালীন ইহুদিদিগের ন্যায় তাহারা দেবোদ্দেশেও সন্তান নষ্ট করিত।

"In like manner have their companions induced many of the idolaters to slay their children, that they might bring them to perdition, and that they might render their religion obscure and confused unto them."

——"Some tribes of the Arabs destroyed their daughters alive by burying, so soon as they were born; if they apprehended that they could not maintain them, or by offering them to their idols, at the instigation of those who had the custody of their temples"—(note).

"They are utterly lost who have slain their children foolishly &c." (Sales Koran chap VI).

যে দুই কারণে শিশুহত্যার সম্ভাবনা মহম্মদ সে দুই প্রকার শিশুহত্যারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন, শিষ্যদিগকে সে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। গুপ্ত প্রণয়ের শিশু-হত্যা ভ্রূণহত্যার বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়ো-

জন দেখেন নাই; কিছু বলেন নাই। চৈতন্য-প্রচলিত ধর্ম্মে যে এ সকল মহাপাপের কোন প্রকার প্রয়োজন নাই, সকলেই বিদিত আছেন; আমরা সে বিষয়ে অধিক কথা বলিব না।—আমরা চৈতন্যদেব-প্রচারিত পবিত্রতর ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। এখনকার অপবিত্র ভেকধারী বৈষ্ণব দিগের অধর্ম্মময় অপবিত্র অপধর্ম্মের কথা বলিতেছি না।

রাজপুত ও শিকদিগের ভিতর কন্যা-হত্যা কত দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা স্থির করিয়া কেহই বলিতে পারেন নাই। তবে যে এ প্রথা প্রাচীন নহে তাহা এক প্রকার স্থির করিয়া বলিতে পারা যায়। মনুর সময়ে এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা ছিল না স্থির। ক্রমেই যত বিবাহের নিয়ম সকল কঠিন হইয়াছে, কন্যার বিবাহের পণ যেমন ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে, রাজপুতদিগের কন্যা-হত্যা-রোগও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে। অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে, কন্যাবিবাহে অতিরিক্ত পণ দিতে হয়—তাহা না হইলে সমান ঘরে উপযুক্ত পাত্র মিলে না, এই জন্যই রাজপুতেরা কন্যা হত্যা করিয়া থাকে। পঞ্জাবের শিকদিগের সম্প্রদায়বিশেষেরও এই রূপ।—শিকদিগের মধ্যে বেদী সম্প্রদায়ের ভিতর কন্যা হত্যা প্রচলিত ছিল। প্রবাদ, নানকের পৌত্র ধরম চাঁদ বেদী কন্যার বিবাহে কোন কারণ বশতঃ অবমানিত হইয়া এই শাপ দিয়াছিলেন, যে তাঁহার বংশে যেন কন্যা সন্তান জীবিত না থাকে। তাঁহার পুত্রেরা ভীত হওয়াতে ধরম চাঁদ বলেন যে যদি তাঁহার বংশীয়েরা বরাবর ধর্ম্মপথে থাকে, তাহা হইলে বংশে কন্যা সন্তান জন্মিবে না। প্রবাদ যাহাই হউক, রাজপুতদিগের ন্যায় বেদী শিকদিগেরও কন্যাহত্যা বিষয়ে অহঙ্কার ও অতিরিক্ত যৌতুক দানই এই পাপের মূল কারণ।

রাজপুতদিগেরও কন্যা হত্যা সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ আছে, সে বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ এ প্রবন্ধে করিব না।—রাজপুতদিগের কন্যা-হত্যা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এ পাপের কারণ বৃথাভিমান এবং দরিদ্রতা। বাদশাহ জাঁহাগীর এই পাপ নিবারণের জন্যে একটী আইন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাদশাহকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু জাঁহাগীরের আইনে কোন ফল দর্শে নাই। কেবল আইনে কি ফল দর্শিতে পারে? জাঁহাগীরের প্রায় এক শত বৎসর পরে জয়পুরের রাজা মহারাজ জয়সিংহ এই মহাপাপ নিবারণের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, কন্যার বিবাহের সময়ে অতিরিক্ত যৌতুক দিতে হয়; সকলের সে শক্তি থাকে না, সেই কারণেই এই মহাপাপের এত প্রশ্রয়। জয়সিংহ স্বরাজ্যমধ্যে অতিরিক্ত যৌতুক-দান-প্রথা নিবারণের অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনিও সফলপ্রযত্ন হইতে

পারেন নাই। জয়সিংহের পরে আর কোন হিন্দু রাজাকে এদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে দেখা যায় না।

অনন্তর ১৭৮৯ খৃ অব্দে নবরাজ ইংরাজ দিগের এ বিষয়ে যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন কালেই এই মহাপাপ নিবারণের প্রথম চেষ্টা হয়। মহাত্মা জোনাথান্ ডন্কান্ এই পাপ নিবারণের প্রথম উদ্যোগী। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এক জন সিবিল সার্ব্বেণ্ট ছিলেন। ডন্কান্ সাহেব ১৭৮৯ সালে বারাণসীর রেসিডেণ্ট। সেই সময়েই তিনি বারাণসী প্রদেশের সমীপস্থ স্থানের রাজকুমার-নামধারী রাজপুতদিগের কন্যা হত্যার বিষয় প্রথম জানিতে পারেন। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে সর জন সোর আসিয়াটিক সোসাইটীতে এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।—রাজকুমারদিগের কন্যা হত্যা নিবারণের জন্য মহাত্মা ডন্কান্ অনেক উপায় স্থির করিয়াছিলেন। তিনি রাজকুমারদিগের নিকট হইতে এরূপ একরার নামা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তাহারা প্রাণপণে কন্যা হত্যা নিবারণের চেষ্টা করিবে।—যে ব্যক্তি একটী কন্যাকে জীবিত রাখিয়া তাহার ভরণ পোষণ করিবেন তিনি যথেষ্ট পুরস্কার পাইবেন, এইরূপ প্রস্তাব মহাত্মা ডন্কান্ গবর্ণর জেনেরলের নিকট করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বড় লাটেরও এ বিষয়ে অমত ছিল না, কিন্তু বিলাতের মহাপ্রভুরা বড় লাটের এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেননা। কাজেই ডন্কানের প্রস্তাব গৃহীত হইল না। এদিকে রাজকুমারদিগের একরারনামাও কেবল নামমাত্রাবশিষ্ট হইল এবং আপাততঃ মহাত্মা ডন্কানের চেষ্টা বিফল হইল।

ডন্কান্ বঙ্গদেশে বিফলপ্রযত্ন হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার চেষ্টা এই সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইল না। কিছু দিন পরেই তিনি বম্বের গবর্ণর হইলেন। এই পদে থাকিয়া তিনি বরোদা প্রভৃতি স্থানের কন্যাহত্যা নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বরোদার দুইজন রেসিডেণ্ট ওয়াকর ও কার্ণাক্ তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃঃঅব্দে কণ্যাহত্যা অপরাধে নয়ানগরের রাজার ৫০০০ টাকা জরিমানা হইল। এই মহাপাপ নিবারণের চেষ্টাও যথেষ্ট হইল, কিন্তু আশানুরূপ ফল্ হইল না। অপরাধ গবর্ণমেণ্টের—তত্ত্বাবধানের শিথিলতাই সেই অপরাধের মূল। রাজপুতানার কণ্যাহত্যা বিষয় ১৮২১ সালে মহাত্মা সার জন মাল্কলম্ প্রথমে গবর্ণমেণ্টকে, জানান। তাঁহার ১৫ বৎসর পরে উইল্কিন্সন সাহেব এই মহাপাপ নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করেন। ইহাঁরই সময়ে এই বিষয়ে প্রথম আইন হয়।—কণ্যা বিবাহে অতিরিক্ত পণ দিতে হয় বলিয়াই রাজপুতেরা কন্যাহত্যা করিয়া থাকে সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজপুতেরা অনেক সময়ে স্বমুখেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছে।——"Pay our Daughters'

marriage portions and they shall live, was the reply of many Rajpoots to the British officers,"—Bishop Heber.

এই সময় হইতেই কন্যাহত্যা নিবারণের প্রকৃত চেষ্টা আরম্ভ হইল। এ দিকে রাজপুতানায় মহাত্মা উইল্‌কিন্‌সন ও দিকে আজিম গড়ে মহাত্মা তমাসন ও মণ্টোগমারী, মইন্‌পুরীতে অন্‌উইন্‌ আগরায় গবিন্‌স অমৃত সহরে মহাত্মা জন্‌ লরেন্স, ক্রমে ক্রমে সকলেই কন্যাহত্যা নিবারণের জন্যে সমরে অবতরণ করিলেন। ফলও যাহা হইল তাহা অপ্রকাশ নাই। এই মহাপাপ যে প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে তাহাও সকলে জানেন। কারণ নষ্ট হইলেই কার্য্য নষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? রাজপুত গণ যে যে কারণে কন্যাহত্যা করিয়া আসিতেছিল সে সে কারণ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়াছে; তাহাদের সেই গুরুতর মহাপাপেরও ক্রমে তিরোভাব হইয়া আসিতেছে।—কিন্তু যে মহাপাপের এখনও সকল কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, বরং সমাজের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে মহাপাপের পাপমূল সকলের অন্যায় বৃদ্ধি হইতেছে, সে ভ্রূণহত্যা ও শিশুহত্যার নিবারণের কি উপায় হইতেছে? কোন্‌ দেশেই বা কবে কি উপায় হইয়াছিল?

ইতিহাস বলিতেছেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে শিশুহত্যা-অপরাধের দণ্ড প্রায় অনেক দেশেই ছিল না। ভারতে ছিল না তাহা আমরা দেখাইয়াছি। ভারতে সে দণ্ডের প্রয়োজন ছিল না। গ্রীস, রোম, যিহুদা কোন দেশেই শিশুহত্যার দণ্ড ছিল না। অপরাধের অসদ্ভাব ছিল না, কিন্তু দণ্ডের কোন প্রকার ব্যবস্থা ছিল না। বোধ হয় প্রাচীন ব্যবস্থাবিৎগণ বুঝিয়াছিলেন, দণ্ড যতই কেন কঠোর হউক না, অপরাধের কারণ নষ্ট না করিলে অপরাধের কখনই তিরোভাব হইবে না। তাঁহারা যে একেবারে ভুল বুঝিয়াছিলেন তাহা আমাদের বোধ হয় না। শিশুহত্যা ভ্রূণ-হত্যা যে সমাজের সকল প্রকার অপরাধ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক তাহাও প্রাচীন গ্রীক, রোমান, ও যিহুদী জাতি বেশ বুঝিতে পারিতেন; নতুবা তাঁহাদের আমলে শিশুহত্যা প্রথার পরিবর্ত্তে শিশুত্যাগের প্রথা এত সাধারণ হইল কেন? "শিশুহত্যা করিলে তাহার আর বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আপনাদের পাপ গোপন হইল বটে কিন্তু প্রিয়তম সন্তানধনের শেষ হইয়া গেল। যদি সেই সদ্যোজাত শিশুকে হত না করিয়া তাহাকে অলক্ষিত ভাবে কোন প্রকাশ্য স্থানে—রাস্তার ধারে, হাটে, বাজারে, সরাইয়ে, স্নানের ঘাটে, তেমাতা পথে, সমুদ্র তীরে, কূপ প্রান্তে কিম্বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে ফেলিয়া রাখি তাহা হইলে হয়ত কোন সদয়হৃদয় লোক করুণা-প্রেরিত হইয়া আমার সেই হৃদয়ের পুত্তলীকে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারেন; বাছার

আমার হয়ত জীবন রক্ষিত হইতে পারে; জাদু হয়ত ভবিষ্যতে সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে, আমি জননী হইয়া পেটের ছেলের যাহা না করিতে পারিলাম অন্যে হয়ত তাহা করিতে পারিবে, তবে আমি প্রিয়তম সন্তানকে কেন নষ্ট করিব? সসন্তান গর্ভই বা কেন নষ্ট করিব?" প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অনেক হতভাগিনী জননীর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইযাছিল, অনেক জননীই এই চিন্তার অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন। আথেন্সের সাইনোসারজেস্ (Cynosarges) এবং রোমের কলম্না লাক্টেরিয়া (Columna lactaria) এই সকল হতভাগিনী জননীর যে কত উপকার করিয়াছিল তাহা ইতিহাস বলিয়া দিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রীস ও রোম যাহা করিয়াছিলেন অন্যান্য প্রাচীন জাতি তাহা সে পরিমাণে করিতে পারেন নাই। হিন্দু সে বিষয়ে অনেক দোষের ভাগী।

খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচারের পর ভ্রূণ হত্যা-শিশুহত্যা, এবং শিশু ত্যাগ নিবারণের অনেক ব্যবস্থা হইতে লাগিল। রোমের প্রথম খৃষ্টান সম্রাট্দিগের সময়ে শিশুত্যাগের কোন দণ্ড ব্যবস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু এই পাপের নিরারণের অনেক উপায় বিহিত হইয়াছিল। পরিত্যক্ত শিশুদিগের রক্ষণ ও ভরণ পোষণের অনেক সরকারী উপায় হইয়াছিল। কিন্তু এই মহাপাপের কারণ সকল পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রবল রহিল, কাজেই কার্য্যের বেগও সমান প্রবল রহিল। পরিত্যক্ত শিশুর সংখ্যা হ্রাস না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্যবস্থাপকদের মনে ভয় হইল। এই মহাপাপ নিবারণের তাঁহারা উপায়ান্তর দেখিতে পাইলেন না। শিশুত্যাগ করিলে শিশুহত্যার দণ্ডভোগ করিতে হইবে এই শাসন তাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইল।—সমাজের সর্ব্বনাশ হইল, লঘুতর পাপ নিবারণ করিতে গিয়া গুরুতর মহাপাপের সূত্রপাত হইল। শিশুহত্যা করিলেও প্রাণদণ্ড, জীবিত শিশুর জীবন আশা করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও জীবনদণ্ড; বাড়ার ভাগ লোকাপবাদ, সমাজের অনাদর, অশ্রদ্ধা, আত্মীয় জনের উৎপীড়ন; তবে জননী সন্তানকে নষ্ট না করিবে কেন? জীবিত সন্তানকে পৃথিবীগর্ভে পুতিয়া না ফেলিবে কেন?—সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ না করিবে কেন? পূর্ব্বে গ্রীস ও রোমে যে পাপের বেগ অনেক অল্প ছিল, খৃষ্টান সম্রাট্দিগের সময়ে—খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচারের পর—সেই পাপের বেগ ভয়ানক প্রবল হইল। পূর্ব্বে যে সকল শিশুর পরিত্যক্ত হইয়া জীবনের অনেক আশা ছিল এখন সেই সকল শিশুর জীবনের আর কোন আশাই রহিল না।—পূর্ব্বে থিব্স ভিন্ন সমস্ত গ্রীস্ দেশেই শিশু-পরিত্যাগের প্রথা ছিল, পরিত্যক্ত-শিশুর রক্ষণাবেক্ষণেও কোন না কোন উপায় হইত, পূর্ব্বে রোমের পরিত্যক্ত শিশুদিগের জীবন রক্ষারও উপায় যথেষ্ট ছিল। কেবল

ইজিপ্ত এ সুখে বঞ্চিত ছিল। এখন খৃষ্টান সম্রাট্‌দিগের রাজত্বকালে শিশু-পরিত্যাগের পরিবর্ত্তে শিশুহত্যারই প্রথা অধিক প্রচলিত হইল। ৩৩১ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ কন্‌ষ্টান্‌টাইনের রাজত্বকালে শিশুত্যাগ নিবারণের জন্য প্রথম নিয়ম প্রচারিত হয়। "শিশুত্যাগ করিলে শিশু-হত্যার দণ্ডভাগী হইতে হইবে" এই নিয়ম তিনিই প্রথম প্রচলিত করেন। কিন্তু যাহাতে এই মহাপাপের কারণ নষ্ট হয়, সেবিষয়েও কন্‌ষ্টান্‌টাইনের যত্ন অল্প ছিলনা। তিনি প্রস্তাব করিলেন, যে কেহ আপন সন্তান পরিত্যাগ করিবে সে আর কথনও কোন প্রকারে সে সন্তা-নের মুখ দেখিতে পাইবে না। সম্রাট্ মনে করিলেন এইরূপ ভয় দেখাইলে আর কেহ আপনার সদ্যোজাত শিশু পরিত্যাগ করিবেনা, কিন্তু তাঁহার এই ব্যবস্থার পরিণাম আশানুরূপ হইলনা। শিশুপরি-ত্যাগ প্রথা সমান বেগে চলিতে লাগিল! সম্রাট্ পরিত্যক্ত শিশুদিগের ভরণ পোষ-ণের ব্যবস্থা সুচারু রূপে করিয়া দিলেন। ইতালী ও আফ্রিকার সর্ব্বত্রই সরকারী কোষাগার হইতে পরিত্যক্ত শিশুদিগের ভরণ পোষণের ব্যয় প্রদত্ত হইতে লাগিল। ভ্রূণ-হত্যা, শিশুহত্যা, শিশু-বিক্রয়, নিবারণের নানা প্রকার চেষ্টা হইতে লাগিল,—অবশেষে সম্রাট্ ভালেন-টিনিয়ান ও গ্রাটিয়নের সময়ে—চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিশু-পরিত্যাগ-নিবারণের বিশেষ আইন প্রচলিত হইল। কন্‌ষ্টান্‌টাইন যাহা ব্যবস্থাপিত করি-য়াছিলেন ইহাঁরা তাহাই সম্যকরূপে প্রচ-লিত করিলেন। "শিশু পরিত্যাগ করিলে শিশু-হত্যার অপরাধে দণ্ডিত হইতে হইবে" এই নিয়ম এত দিন ব্যবস্থাপত্রে ছিল, এখন ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল।—কাজেই যে শিশু-পরিত্যাগের সংখ্যা কমিয়া শিশুহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ইহা আমরা অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইব। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে শিশু-হত্যার ভাগ অল্প ছিল তাহা কেহই অস্বী-কার করিতে পারিবেন না। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যে কেবল শিশুহত্যা অল্প হইত এরূপ নহে। পরিত্যক্ত শিশুদিগের ভরণ পোষণের বন্দোবস্তও উত্তমরূপ ছিল—তাহা ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছেন। যে সকল পরিত্যক্ত শিশুর কেহ ভার লইতনা সরকার হইতে তাহাদের উপযুক্ত উপায় বিধান করা হইত।—যে থীব্‌সে শিশুত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল, সেই থীব্‌সেও নিরুপায় দুঃখী সন্তানের ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত সরকার হইত হইত।—কিন্তু অনেক স্থলেই সরকারকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইতনা! অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যক্ত শিশুগণকে লইয়া আপনারা মানুষ করিত। তখন দাসত্ব প্রথা প্রচ-লিত ছিল, পরিত্যক্ত শিশুকে যে ব্যক্তি মানুষ করিবে সে তাহারই দাস হইবে, এই নিয়ম তখন প্রচলিত ছিল। কাজেই একটী দাসের লোভে এক ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক অনায়াসেই একটী পরিত্যক্ত

শিশুকে লইয়া মানুষ করিত। কাজেই তখন প্রকৃত পরিত্যক্ত শিশুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। এই জন্যই পরিত্যক্ত শিশুর আশ্রয় স্থানের তত অধিক প্রয়োজন ছিলনা। তথাপি প্রচীন গ্রীসে ও রোমে মাতৃত্যক্ত শিশুদিগের আশ্রয়ের স্থান ছিল না এরূপ বলিতে পারা যায় না।

অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরিত্যক্ত শিশুদিগের রক্ষণের স্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ৫২৯ খৃঅব্দে সম্রাট্ জষ্টিনিয়ান ব্যবস্থা করিলেন "পরিত্যক্ত শিশুরা দাস নহে।" যখন এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইল তখন যে সাধারণে পরিত্যক্ত শিশুদিগকে প্রতিপালন করিতে বিরত হইল তাহা স্থির। স্বার্থপর মানবজাতি স্বার্থশূন্য কার্য্য করিবে ইহা কে মনে করিতে পারে? সাধারণে যখন পরিত্যক্ত শিশু গ্রহণে বিরত হইল, তখন তাহাদিগকে কে গ্রহণ করিবে? মাতৃ-ত্যক্ত দুর্ভাগা শিশু সাধারণ-পরিত্যক্ত হইল, তখন সমাজ ভিন্ন তাহাদিগকে আর কে গ্রহণ করিবে? —রাজাই তখন সমাজের প্রতিনিধি, রাজাই সমাজ। রাজা তাহাদিগকে অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। সম্রাট্ জষ্টিনিয়ান ন্যায়পরায়ণ অন্বর্থ রাজা ছিলেন। তিনি সেই পরিত্যক্ত শিশুদিগের গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন, তাহাদিগের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিলেন, তাহাদের থাকিবার উপযুক্ত স্থান স্থির করিলেন, তাহাদের শিক্ষার ভার উপযুক্ত লোকের হস্তে প্রদান করিলেন।—সে স্থান গির্জ্জা এবং মঠ। সে শিক্ষক পাদরী ও মঠধারী খৃষ্টানগণ। রাজাদেশে এই সকল মঠ ও গির্জ্জার স্বতন্ত্র বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। সম্রাট্ জষ্টিনিয়ানের কীর্ত্তি বিরাজিত হইল। যে খৃষ্টধর্ম্ম শিশুত্যাগের কঠোর দণ্ড বিধিবদ্ধ করিয়া শিশুহত্যার বেগ বাড়াইয়া ছিল সেই খৃষ্টধর্ম্মই আবার পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের উপায় বিধান করিল। এ ধর্ম্মের মর্ম্ম কে বুঝিতে পারিবে!

সম্রাট্ জষ্টিনিয়ান্ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরিত্যক্ত অসহায় শিশুদিগের যে আশ্রয় স্থান ব্যবস্থা করিলেন, ক্রমে সেই রূপ আশ্রয় স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মঠধারী খৃষ্টসেবকেরা এই মহাপুণ্যকর্ম্মে ব্রতী হইলেন, তাঁহারা সকলেই সংসারত্যাগী, অবিবাহিত, অপুত্রক ছিলেন; মাতৃত্যক্ত শিশুগণ তাঁহাদের যত্নের সামগ্রী হইয়া উঠিল। ইহাদের জীবন রক্ষা করা, ইহাদিগকে মানুষ করিয়া শিক্ষিত করা, ইহাদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করা তাঁহাদিগের জীবনের এক প্রধান কাজ হইয়া উঠিল।—যেমন ইউরোপের রাজধানী রোম নগরী হইতে খৃষ্টধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতে লাগিল, এই অনুষ্ঠানও সেই সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। ইতালী, জর্ম্মাণী, ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল, ইংলণ্ড প্রভৃতি সকল দেশে

খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এই মহাহিতকর ধর্ম্ম ব্যাপারের স্রোত ধাবিত হইল। বাস্তবিক মঠধারী খৃষ্ট-সেবকেরা এই মহা হিতের জন্য সমাজের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহারা যদি সমাজের আর কোন উপকার না করিয়া কেবল অনাশ্রয় মাতৃহারা শিশুদিদিগের জীবন রক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে মানুষ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তথাপি তাঁহারা চির কালের জন্য সমাজের পূজ্য হইয়া থাকিতেন।

মহাত্মা জষ্টিনিয়ান্ যদি এই মহাপুণ্যকর প্রণালীর সূত্রপাত না করিতেন, মঠধারী মহাপুরুষেরা যদি এই প্রণালীর এরূপ প্রতিপোষক না হইতেন, তাহা হইলে সমাজের কত প্রাণীবই না জীবন অকারণ বিনষ্ট হইত?—শিশু ত্যাগ করিলে শিশুহত্যার অপরাধী হইতে হইবে এই কঠোর দণ্ডবিধি যদি প্রচলিত না হইত তাহা হইলেও আর কত নিরীহ, নিরপরাধী প্রাণীর জীবন রক্ষিত হইত· তাহা কে না শত মুখে স্বীকার করিবেন? —কিন্তু হায়! মনুষ্য-স্বভাবের কি বিচিত্র গতি! এক দল অতি-বিজ্ঞ সম্প্রদায় আছেন তাঁহাদের মতে, এই সকল পরিত্যক্ত শিশুদিগের আশ্রয় স্থান গুলি সমাজের মহৎ অপকার সাধন করিতেছে। এই সকল অতিবুদ্ধি, অতি-বিজ্ঞ, সঙ্কীর্ণহৃদয় মহাপ্রভুরা বলেন যে "এই সকল আশ্রয় স্থান গুলি সংসারে পাপের প্রশ্রয় দিতেছে। যদি পরিত্যক্ত শিশুদিগের গ্রহণের, রক্ষার, শিক্ষার এরূপ বন্দোবস্ত না হইত তাহা হইলে গুপ্ত প্রণয় ক্রমে উঠিয়া যাইত।"—ধন্য বুদ্ধির তেজ। ধন্য হৃদয়ের উদারতা!—গুপ্ত প্রণয় যদি তোমাদের চক্ষুতে এতই কলুষিত বলিয়া বোধ হয়, একটা শালগ্রাম কিম্বা দুই খানা যিশুপুরাণ হস্তে করিয়া একজন পুরোহিত বা একজন পাদরীর সম্মুখে দুইটা হিব্রু কিম্বা চারিটা সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিলেই যদি পরিণয় হয়। হৃদয়ে গরল থাকিলেও যদি মুখে একটু চরণামৃত লাগাইলে সমস্ত পবিত্র বলিয়া স্থির হয়, হৃদয়ের মিলন হইলেও যদি পরিণয় সাধন না হয়, তবে পরিণয়বিধির সংস্কার কর। মনু ও মহম্মদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ কর।—অকারণ জীবহত্যা করিবার তোমাদের কোন অধিকার নাই। যাহার প্রতি যাহার প্রণয় নাই তাহার সহিত তাহাকে কেন এক করিতে যাও? কন্যা পুত্রের হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেন তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের দিকেই আপনাদের সমগ্র সংকীর্ণ বুদ্ধি প্রেরিত কর?—পুত্র বিবাহ করিতে না চাহিলে কেন তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ কর? কালে ভদ্রে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিলে কেন তাহাকে তিরস্কার কর? কেন তাহার সম্মুখে জীবন্ত নরকের প্রতিমূর্ত্তি আনিয়া হাজির কর? তোমরা আপনাদের ভ্রম দেখিতে পাইবে না; আপনারা সংসারে যে কত অনিষ্ট করিতেছ তাহা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিবে না; সমাজের নানাবিধ অনিষ্ট করিতে আপনারা ক্ষান্ত

হইবে না। আবার যদি কোন মহাত্মা সমাজের কোন ইষ্টসাধন করেন তাহাকে পরম অনিষ্ট বোধ করিয়া সেই ইষ্টের মূল উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিবে, এ দুর্ব্বুদ্ধির দমন কে করিবে? কে তোমাদিগকে শাসন করিবে? সমাজ তোমাদের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছে, তোমরা এ সংসার হইতে অপসৃত হও। তোমাদের অভাবে সমাজের কোন ক্লেশই হইবে না।—আমি সভ্য ইউরোপবাসীদিগকেই এই কথা বলিলাম, এরূপ সভ্যদেশেও এমন সকল অসভ্য নরাধম এখনও জীবিত আছে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

ভারতের কথা ছাড়িয়া দেও, হতভাগ্য ভারতের চারিদিকেই দুঃখ! প্রাচীন ভারত যেমন সকল সুখে সুখী ছিলেন এখন আবার কপালগুণে—তেমনি সকল দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতে ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা, ছিল না বলিলেই হয়। মনু যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে এ সকল মহাপাপ সমাজে স্থান পাইত না। ভারতের কপাল দোষে মনুর মত ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। ভারতের কপাল দোষে নানা মুনি মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; নানা মুনি নানা প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে মনু-ব্যবস্থাপিত বিবাহপদ্ধতি গুলি একে একে উঠিয়া যাইতে লাগিল। একমাত্র প্রাজাপত্যই ক্রমে সমস্ত হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম্য বিবাহ বলিয়া গৃহীত হইল, ক্রমেই মনু-ব্যবস্থাপিত দ্বাদশ প্রকার পুত্রত্বের মধ্যে দুই চারি প্রকার মাত্র বিবাহ ধর্ম্ম্য বলিয়া প্রচলিত রহিল।—মানবের স্বভাব সেই সমানই রহিল। মানব পূর্ব্বেও যেরূপ কাজ করিত এখনও সেইরূপ কাজ করিতে লাগিল; কিন্তু সমাজসংস্কারক মহাবিজ্ঞদিগের দৌরাত্ম্যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যে সকল কাজ ধর্ম্ম্য বলিয়া শ্রদ্ধেয় ছিল এখন সেই সকল কাজই অধর্ম্ম্য বলিয়া অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিল।—পূর্ব্বে যে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ বলিয়া চতুর্দ্দিকে প্রথিত হইয়াছিলেন, এখন সেই যুধিষ্ঠির সেইরূপ ধার্ম্মিক থাকিয়াও সমাজের কলঙ্ক মাত্র হইলেন।—সেই ভীম, সেই অর্জ্জুন, সেই নকুল সহদেব, সেই ধার্ম্মিকবর দাতা কর্ণ এখন সমাজের অবজ্ঞার পাত্র হইলেন।—পূর্ব্বে যে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী প্রাতঃস্মরণীয়া ছিলেন; এখন সেই অহল্যা, সেই দ্রৌপদী, সেই কুন্তী, সেই তারা; সেই মন্দোদরী, পাপীয়সী পিশাচী মধ্যে পরিগণিত হইলেন।—পূর্ব্বে যে ব্যাস সমস্ত আর্য্য সমাজের ধার্ম্মিক চূড়ামণি ব্যবস্থাপক ছিলেন, এখন তাঁহাকে নীচ বলিয়া সমাজ হইতে দূরীভূত করা হইল। ভীষ্ম এখন জারজ বলিয়া তিরস্কৃত হইলেন। চমৎকার সমাজ সংস্কার! চমৎকার শাস্ত্রের প্রভাব! বিধবা-বিবাহও অপ্রচলিত হইল! শাস্ত্র যাহাকে বজায় রাখিল

লোকাচার আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিল! বাল-বৈধব্যদগ্ধা কোমলহৃদয়া কুমারীর পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইল!—ভ্রূণ-হত্যা, শিশুহত্যার স্রোত ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। মনুর উপদেশ অধর্ম্ম্য বলিয়া নিষিদ্ধ হইল—এই মহাপাপের স্রোত আরব্ধ হইল। বিধবা-বিবাহ উঠিয়া গেল—সেই স্রোতের বেগ দ্বিগুণ হইল। ইহাতেই ভারতের দুঃখ শেষ হইল না। ভারতের পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতি বলে, ইহ জন্মের মহাপাপে বল্লাল জন্ম গ্রহণ করিলেন। বঙ্গসমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করিলেন। বল্লালের উদ্দেশ্য যাহাই হউক আমরা তাহা দেখিতে চাহি না। সে উদ্দেশ্য দেখিবার আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল কার্য্য দেখিতে বাধ্য; বল্লাল সমাজের কি অনিষ্ট করিয়াছেন আমরা তাহাই দেখিতেছি।—বাস্তবিক বল্লাল এবং তাঁহার বংশীয়গণই আমাদের অনেক অনিষ্টের কারণ, বল্লাল কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া বাঙ্গালী সমাজে ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যার স্রোত চালাইয়াছেন। তাঁহার বংশীয় লাক্ষ্মণেয় বাঙ্গালীদিগকে চিরজীবনের জন্য দাস করিয়া গিয়াছেন; কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করিয়া বল্লাল যে পাপের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, নরাধম দেবীবর আসিয়া সেই পাপের স্রোত সর্ব্বতোগামী করিয়া দিল। মনুর পর, একে একে কত মহাপুরুষই আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া গেলেন। ভবিষ্যদ্‌বংশায়দিগের মস্তকে বজ্রপাত করিয়া গেলেন।

আমরা বিলক্ষণ জানি পরিণয়-বিধির এখন শীঘ্র কোন সংস্কার হইবে না, বহু বিবাহ অশাস্ত্রীয় হইলেও শীঘ্র ইহার নিবারণ হইবে না। বিধবা-বিবাহ-শাস্ত্রসম্মত হইলেও লোকাচার শীঘ্র তাহা গ্রহণ করিবে না। ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যার স্রোতও কিছুমাত্র হীনবেগ হইবে না।—দণ্ডবিধি যতই কঠোর ধারার সৃষ্টি করুন না, অপধার্ম্মিকেরা আপনাদের অপধর্ম্মের যতই গৌরব প্রচার করুন না, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে যেখানে সেখানে যতই কেন নূতন নূতন নরক দেখাইয়া দিউন না;—যত দিন কারণ নষ্ট না হইবে ততদিন সে ভয়ঙ্কর মহাপাপের কোন মতেই নিবারণ হইবে না।—আবার যত দিনে না এক জন মনু বা এক জন মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে সক্ষম হইবেন, ততদিন আমাদিগকে এই মহাপাপ ভোগ করিতেই হইবে।—তবে যাহার উপায় আছে তাহা আমরা না করিব কেন? আমরা শিশুহত্যা নিবারণের কোন উপায় করিতে পারিব না বলিয়া পরিত্যক্ত শিশুদিগের আশ্রয়ের জন্য কোন বন্দোবস্ত না করিব কেন? ইউরোপ ও আমেরিকাতে পরিত্যক্ত শিশুদিগের জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, ভারতে সেরূপ না হইবে কেন? পুনাতে যাহার সূত্রপাত হইয়াছে কলিকাতায় তাহার কোন প্রসঙ্গও না হইবে কেন?—ভ্রূণ-

হত্যা, নিবারণের উপায় কি ?—পরিত্যক্ত শিশুদিগকে কে রক্ষা করিবে ?

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত।

# তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত।

অন্যান্য বিজ্ঞানাপেক্ষা তড়িৎ-বিজ্ঞানকে আধুনিক বলিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তড়িৎপদার্থের নিজ দ্রুতগামিতার বেগেই যেন উক্ত বিজ্ঞান অতি অল্প কালের মধ্যে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভৌতিক বিজ্ঞান মধ্যে ইহার কিছু সামান্য প্রধান্য নহে। তড়িৎ-বলের অদ্ভুত কার্য্য সমূহ যাদৃশ বিস্ময়জনক তেমনি মানব-হিতকর। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এরূপ আশা করিয়া থাকেন যে, এই বিদ্যার আরও উন্নত অবস্থায় মৃত দেহে জীবন সঞ্চার পর্য্যন্তও সম্ভবপর হইবে। এরূপ বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত নিঃসন্দেহ আদরণীয় হইবে, এই আশায় আমরা ইহার সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমান উন্নতি পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

খৃঃ পূঃ ৬০০ ছয় শত বৎসরের পূর্ব্বে ইতিবৃত্তে তড়িৎ-কার্য্যের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। কথিত আছে ঐ সময়ে গ্রীসদেশীয় সপ্ত সাধু ' The seven Sages মধ্যে মিলিটস্ নিবাসী থেল্স্—Thales সর্ব্বপ্রথম তাড়িত তরলের কার্য্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখেন যে তৃণ-মণি—Amber ঘর্ষণ করিলে অতি লঘু পদার্থকে আকর্ষণ করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন তড়িৎ-কার্য্য তিনি দেখেন নাই। উক্ত আকর্ষণের কারণ তিনি এই নির্দ্দেশ করেন যে, এম্বার একপ্রকার সজীব পদার্থ হইবে। ঘর্ষণ দ্বারা উহা কার্য্যকর হইয়া উঠে। এইরূপে উত্তেজিত হইলে উহা এক-প্রকার অতি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য এবং আটাময় বাষ্প ক্রমিক বিনির্গত করিতে থাকে। ঐ বাষ্প কিছুদূর যাইয়া পুনরায় অনবরত তৃণ-মণিতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে। পথিমধ্যে লঘুপদার্থ সমূহ উহার আটাতে সংলগ্ন হইয়া উহার সহিত তৃণ মণিতে নীত হয়।

থেল্সের ৩০০ শত বৎসরের পর ইতিবৃত্তে তাড়িতাকর্ষণের দ্বিতীয় উল্লেখ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, থিওফ্রাষ্টস্ Theophrastus. লিন্কিউরিয়ম্ * বা

* ধুনা বা রজনের ন্যায় আটাবিশিষ্ট এক প্রকার উদ্ভিদ পদার্থ বিশেষ। ইহা প্রায় সমুদ্র তীরে পাওয়া যায়। ইউরোপে

টুরমেলিন্‌কে Lyncurium crystal or Tourmalin লঘু পদার্থ আকর্ষণ করিতে দেখিয়াছিলেন।

তৎপরে প্লিনী কর্ত্তৃক টর্‌পিডো Torpedo মৎসের আঘাত ( Shock ) প্রদানকারী গুণ-বিশিষ্ট তারের উল্লেখ মাত্র আছে দেখা যায়। তৃণ-মণি এবং টুর্‌মেলিনের আকর্ষণী শক্তির সহিত এই গুণের যে কোন সম্বন্ধ আছে, অথবা ইহা যে তাড়িত তরলের শক্তি বিশেষ তাহা ১৭০০শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইউষ্টেথিয়স্ Eustathius কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহেন টাইবিরিয়স্ রাজার জনৈক ভৃত্যের বাতরোগ টর্‌পিডোর আঘাত দ্বারা আরোগ্য হয়। তড়িতের সাহায্যে মানব শরীরের অসাধ্য ব্যাধি অপনয়নের এই প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি আরও বলেন যে গথ ( Goths ) রাজা উলিমার তাঁহার নিজ দেহ হইতে ইচ্ছামত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতে পারিতেন। এবং তৎকালে জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত পরিচ্ছদ পরিধান এবং উন্মোচন কালীন নিজ শরীরাভ্যন্তর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতেন।

ইহার পর প্রায় ১২০০ শত বৎসর অতিবাহিত হয়। তন্মধ্যে তাড়িৎকার্য্যের কোনও অভিনব আবিষ্ক্রিয়া প্রকাশিত হয় নাই। ১৭ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডাক্তার গিল্‌বর্ট্, ডি ম্যাগ্‌নিট্ De Magnete নামক এক খানি গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহাতে তৃণ-মণি এবং টুরমেলিন্ ব্যতীত তিনি প্রায় সমস্ত মূল্যবান প্রস্তর, কাচ, গন্ধক, লাক্ষা, রজন প্রভৃতি অন্যূন ২০ টী তাড়িত পদার্থ Electrics পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। অধিকন্তু তিনি ইহাও সপ্রমাণ করেন যে, ইহারা ঘর্ষিত হইলে কেবল লঘু পদার্থই আকর্ষণ করিবে এমত নহে, ফলতঃ পদার্থ মাত্রকেই আকর্ষণ করে। এবং এই আকর্ষণী শক্তির প্রভূত উদ্ভাবনা-জন্য শুষ্ক বায়ু এবং দ্রুত ও অল্প ঘর্ষণ প্রয়োজন। আর্দ্র বায়ু, বৃষ্টি এবং শীতাতিশয় তাড়িত কার্য্যের বিশেষ প্রতিরোধক। উক্ত ডাক্তার মহোদয় এই সমস্ত তাড়িততত্ত্ব আবিস্কার জন্য "তড়িৎ-বিজ্ঞানের পিতা" নামে অভিহিত হন। কিন্তু তাঁহার বহুল পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা সম্ভূত উপপত্তি সমূহ অনেকাংশে ভ্রম-মূলক। যথা তিনি উভয় তাড়িতাকর্ষণ এবং চুম্বকার্ষণের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, চুম্বক এবং লোহা উভয়ই পরস্পরকে আকর্ষণ করে; কিন্তু ঘর্ষিত বা উত্তেজিত তাড়িত পদার্থই সহজাবস্থ বস্তুকে আকর্ষণ করে; আকৃষ্ট

বল্‌টিক্ * সমুদ্র এবং উত্তর আমেরিকার সেব্‌ল্ অন্তরীপের উপকূলে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা স্বাদ ও গন্ধহীন, এবং ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ।

সহজাবস্থ-পদার্থ নিশ্চেষ্ট বা আকর্ষণ-বেগ-রহিত। এবং যেমন চুম্বকের আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণ উভয় গুণই আছে, তদ্রূপ তড়িতের না থাকিয়া তাহার কেবল আকর্ষণ মাত্র আছে।

গিলবর্টের আবিস্কারের পর ৬০ বৎসরের মধ্যে তড়িৎবিদ্যার আর কোনও উন্নতি হয় নাই। ঐ সময়ের পর বএল্ Boyle তড়িৎ-তত্বক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি বহুযত্নে তড়িতের পূর্ব্বাবিষ্কৃত গুণ এবং কার্য্য গুলি পরীক্ষাসিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাড়িত পদার্থের, সংখ্যাও গুটিকতক বৃদ্ধি করেন। এই তত্ত্ব-বেত্তাই ঘর্ষিত তাড়িত পদার্থ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাশমান হইতে প্রথম দর্শন করেন বলিয়া খ্যাত আছেন। কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার আলোক দর্শন মাত্রই ঘটিয়াছিল। ঐ আলোক যে তাড়িত তরলের রূপ মাত্র এবং তাহার নিয়ম এবং কার্য্যাদি, তিনি কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি থেল্‌স-কল্পিত তড়িতের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুত তৎকালীন তত্ত্ববেত্তা মাত্রেই ঐ মতাবলম্বী হয়েন। এবং উহা সত্য বলিয়া "বিজ্ঞান তত্ত্বে"—Philosophical Transactions—লিপি বদ্ধ হইয়া প্রচারিত হয়।

ইহারপর ম্যাগ্‌ডি বর্গের Magdeburgh শাসনকর্ত্তা Burgomaster অটো গ্যারিক্ Otto Guericke বায়ু যন্ত্রের Air Pumps আবিষ্কারক, তড়িৎ তত্ত্বের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনিই প্রথম তড়িৎ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই মহাত্মার পূর্ব্বগত পণ্ডিতগণ, কাচ, গালা, অথবা গন্ধকের একটী দণ্ড বা চাক্‌তিকে হাত কিম্বা রেশমি রুমাল দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তড়িৎ উদ্ভাবন করিতেন। এ প্রকারে এক সময়ে যৎসামান্য তড়িৎ উৎপন্ন হইত। সুতরাং তদ্দ্বারা অনেক পরীক্ষা চলিত না। গ্যারিকের যন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তড়িৎ উত্তেজিত হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে প্রচুর পরীক্ষাও চলিল। তাঁহার যন্ত্রের স্থূল অবয়ব এই রূপ; তিনি প্রথমতঃ গন্ধকের একটী বর্ত্তুল প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে তাহাকে এক মেষ-দন্তে স্থাপিত করতঃ দন্তের দুই শেষ ভাগ দুইটী পায়ার উপর স্থাপিত করিলেন। এবং পায়াদ্বয় একখানি শুষ্ক এবং প্রশস্ত কাষ্ঠের তক্তাতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন। বর্ত্তুলটী এরূপ ভাবে স্থাপিত রহিল যে মেষ দন্তের এক শেষ ভাগে একটী হাওল সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা দন্তকে ঘুরাইলে বর্ত্তুলটীও ঘূর্ণিত হয়। তিনি এক হস্তে বর্ত্তুলকে এই রূপে ঘুরাইতে থাকিতেন, এবং অপর হস্তে এক খানি রেশমের রুমাল বর্ত্তুলের গাত্রে সংস্পৃষ্ট রাখিয়া ধরিতেন। এ প্রকারে বর্ত্তুল ঘর্ষিত হইলে তড়িৎ উৎপন্ন হইত। এই যন্ত্রের সাহায্যে এত অধিক পরিমাণে তড়িতোদ্ভাবিত হইল যে উহা অগ্নি

স্ফুলিঙ্গ রূপে প্রকাশমান হইল। এবং তৎসঙ্গে শব্দও শ্রুত হইল। ইতিপূর্ব্বে তড়িতের কেবল আকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার আলোক-প্রদান-কারিতা এবং শব্দ-জনকতা, এই দুইটী অভিনব গুণ নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্যারিক কর্ত্তৃক তড়িতের আরও একটী প্রধান গুণ নির্ণীত হয়; তাড়িত প্রতিক্ষেপণ। তিনি পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে পক্ষীপালক কোন ঘর্ষিত পদার্থ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইলে উহা কিয়ৎক্ষণ ঘর্ষিত স্থানে সংলগ্ন থাকিয়া প্রতিক্ষিপ্ত হয়। প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া পদার্থান্তরের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাকে স্বীয় অতিরিক্ত প্রাপ্ত তড়িৎ প্রদান না করিলে পুনরায় আকৃষ্ট হইবে না। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে আকর্ষণকালীন পালকের যে দিক্ ঘর্ষিত স্থানে সংসৃষ্ট থকে, প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার সেই দিকই ঐ ঘর্ষিত পদার্থাভিমুখে থাকে।

ইহার অব্যবহিত পরে জগৎ-বিখ্যাত নিউটন মহোদয়ের মাধ্যাকর্ষণের Gravitation আবিষ্ক্রিয়া তাৎকালিক তত্তানুসন্ধায়ী মাত্রের মনকে এরূপ আকৃষ্ট করে যে তড়িৎবিজ্ঞানের চর্চ্চা কিছুকাল স্থগিত থাকে। উক্ত মহাত্মা এই বিজ্ঞানের প্রতি কথঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তৎ কর্ত্তৃক এই একটী অভিনব সত্য প্রতিপাদিত হয় যে তড়িৎ আকর্ষণ এবং প্রতিক্ষেপণ কাচের মধ্য দিয়া কার্য্যকারী হয়। কাচের এক দিকে ঘর্ষণ দ্বারা তড়িৎ যুক্ত করিলে অপর দিকও তড়িৎ-আক্রান্ত হয়।

ইহার পর ডাক্তার ওয়ালের Wall তত্ত্বানুসন্ধান বিশেষ রূপে উক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এম্বাবের এক খণ্ড সুবৃহৎ দণ্ড লইয়া তাহাকে রেশমি বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ গ্যারিকের যন্ত্রাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তড়িৎ উদ্ভাবনে কৃতকার্য্য হয়েন। ওয়াল সাহেব কর্ত্তৃক বিদ্যুৎ এবং তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের একতা প্রথম অনুমিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে এ স্থলে ডাক্তার মহোদয়ের নিজের লেখা অবিকল উদ্ধৃত হইল। "এম্বারের ঘর্ষণ দ্বারা বহু-সংখ্যক পট্ পট্ শব্দ শোনা গেল, এবং প্রত্যেক শব্দের সহিত একটী করিয়া অগ্নি-কণা দৃষ্ট হইল। সর্ব্বাপেক্ষা ইহাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম যে ঐ অগ্নিকণা নির্গমন কালীন তাহার নিকট অঙ্গুলি প্রদান করিলে উত্তম রূপ আঘাত করে। এই আলোক এবং শব্দ আমার বিবেচনায় অতি সামান্যতঃ বিদ্যুৎ এবং বজ্রতুল্য বলা যাইতে পারে।"

ইহার পর ৪০ বৎসরের মধ্যে এই বিজ্ঞানের আর কোন উন্নতি দেখা যায় না। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তড়িৎবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক প্রচারের ১৩০ বৎসর পরে তড়িতের পরিচালক এবং অপরিচালক পদার্থের প্রভেদ স্থিরীকৃত হয়। এই মহতী আবিষ্ক্রিয়া আকস্মিক ঘটনা দ্বারা ষ্টিফেন্ গ্রে Stephen Gray

কর্ত্তৃক প্রথম সূত্রপাতিত হয়। কোন সময়ে তিনি এক খণ্ড কাষ্ঠকে সূতার দ্বারা ঝুলাইয়া তাহাতে তড়িৎ প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহাতে প্রথমতঃ অকৃত-কার্য্য হয়েন। যে হেতু কাষ্ঠখণ্ডে তড়িৎ প্রদান মাত্র উহা (তড়িৎ) কিয়ৎক্ষণ তথায় দোলন সূতার দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যাইতে লাগিল। তখন হুইলার সাহেব Wheeler তাঁহার সহকারী পরীক্ষক তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন যে উক্ত সূতা স্থূলাকার প্রযুক্ত তড়িৎ শীঘ্র সঞ্চালন করিতেছে। সূতা আরও সূক্ষ্ম হইলে ঐরূপ শীঘ্র সঞ্চালন করিতে পারিবে না। তদনুসারে তাঁহারা সূক্ষ্মতর রেশমের সূতা ব্যবহার করিলেন এবং পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্য লাভ করিলেন। তাহাতে অধিকতর উৎসাহিত হইয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভাশয়ে রেশমের সূতার পরিবর্ত্তে আরও সূক্ষ্ম ধাতব তারের ব্যবহার করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহাদিগের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না, যখন দেখিলেন যে তারের দ্বারা ঝুলাইয়া সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইলেন। এক্ষণে তাঁহারা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে সূতা, রেসম এবং ধাতব তার এই তিন পদার্থের পরিচালকতা গুণের তারতম্য বশতঃই এই রূপ ঘটিল। তাহাদিগের অঙ্গের স্থূলতার সূক্ষ্মতার উপর কিছুই নির্ভর করে নাই। সুতরাং ধাতব তারই সর্ব্বোত্তম পরিচালক সপ্রমাণ হইল। ক্রমশঃ।

শ্রীঅঃ—

# কবিত্ব ও কাব্য সমালোচনা

## ষষ্ঠ প্রস্তাব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কাব্যের সার সৌন্দর্য্য, এবং সৌন্দর্য্যের সার মুগ্ধতা। কিন্তু এরূপ মুগ্ধকারী সৌন্দর্য্য সৃজনের মূল উদ্দেশ্য কি? স্বীকার করি মুগ্ধতাতেও এক প্রকার সুখ আছে, অদ্ভুত সৃষ্টিদর্শনেও এক প্রকার আনন্দ আছে, কিন্তু এই সুখ ও আনন্দ পর্য্যন্তই কি কাব্যের চরম লক্ষ্য? ইহার অতীত কি কাব্যের আর কোন লক্ষ্য নাই?—আছে, সুখ এবং আনন্দ উপভোগের যে পরিণাম ফল তাহাই কাব্যের চরম লক্ষ্য। এমন অনেক প্রকার সুখ ও আনন্দ আছে, যাহার উপভোগে অন্তঃকরণ সংকীর্ণ, অসার ও অবনত দশা প্রাপ্ত হয়; আবার এমন অনেক প্রকারের সুখ ও আনন্দ আছে যাহার উপভোগে অন্তঃকরণ প্রসারিত সারবান্ ও উন্নত দশা প্রাপ্ত হয়। কাব্য এই শেষোক্ত প্রকার সুখ ও আন-

ন্দের সৌন্দর্য্যই সৃজন করিয়া থাকে। আমরা দেখাইতেছি কিরূপে এইরূপ সৌন্দর্য্য সৃজন দ্বারায় কাব্য অন্তঃকরণকে প্রসারিত, সারবান্ ও উন্নত করিয়া থাকে।

বাল্যাবস্থায় এবং অসভ্য অবস্থায় মানবের হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকল সংকীর্ণ ও অপরিস্ফুট থাকে, ক্রমে শিক্ষাদ্বারা উহা পরিস্ফুট ও প্রসারিত হইয়া আসে। এই শিক্ষা কেবল গুরুউপদেশ নয়,দর্শন ও আলোচনা। দর্শন ও আলোচনাই প্রকৃত শিক্ষা, গুরুউপদেশ কেবল উহাদের পথের সহায় মাত্র। দর্শন ও আলোচনার পথে স্বয়ং গমন করিয়া সত্য আহরণ না করিলে সে সত্যের কোন মূল্য নাই; মানব অন্তরের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে উহা কিছুই নয়। একজন পণ্ডিত যদি কোন একটি বালক বা একজন অজ্ঞ লোকের নিকট কহেন যে সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে না, পৃথিবীই সূর্য্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে। বালক বা অজ্ঞ পণ্ডিতের এই কথায় বিশ্বাস করিলেও তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি সম্বন্ধে পূর্ব্বজ্ঞান ও বর্ত্তমান জ্ঞান উভয়ই সমান। যখন বালক বা অজ্ঞব্যক্তি স্বয়ং জ্যোতিষ দর্শনের অনুসরণ করিয়া নিজ বুদ্ধিদ্বারায় সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবে তখনই তাহার বুদ্ধি-বৃত্তির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে, নচেৎ আলোচনার অভাবে অন্তঃকরণের উন্নতি সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা উভয়ই সমান। আলোচনাতেই অন্তঃকরণ প্রসারিত, সারবান্ এবং মহৎকার্য্য-সাধনোপযোগী উন্নত দশা প্রাপ্ত হয়।

সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্ এবিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। দর্শনে হৃৎবৃত্তি সকলের এবং আলোচনায় বুদ্ধিবৃত্তি সকলের উন্নতি। এই দর্শন ও আলোচনা উদ্দীপক স্বাভাবিক আকর্ষণ কেবল সৌন্দর্য্য; সুন্দর বস্তুতেই হৃদয় নয়ন মন আগে আকৃষ্ট হয় এবং সুন্দর বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান বৃত্তি স্বতঃই জাগরিত হইয়া উঠে। অতএব কার্য্য একমাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টিদ্বারায় এই উভয়বিধ বৃত্তি সকলকে চেতন ও উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে। আমরা এক একটি করিয়া উহা দেখাইতেছি।

যে অন্তঃকরণ সহসা কোন ভাবে বিগলিত হইতে চাহে না, কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে চাহেনা; কঠিন, এবং আপন স্বার্থেই আপনি আবদ্ধ, তাহাকে বিগলিত ও আকৃষ্ট করিবার সৌন্দর্য্যই একমাত্র উপায়। সৌন্দর্য্যে যে মন আকৃষ্ট বা বিগলিত না হয় তাহার আর কোন ঔষধ নাই; মহাকবি সেক্সপিয়রের মতে সে ব্যক্তি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডার্হ। যাহা হউক, আমরা সে অন্তঃকরণে গুরুতর দণ্ডের আশা করি না করি উহার শোচনীয় দশায় দুঃখিত; পশুদিগের অন্তঃকরণও সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের দয়াবৃত্তিকে প্রসারিত করিতে হইলে, কবি একটি সুন্দর ছবি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদের মানস চক্ষুর

আগে উহাকে ধরিয়া দেন, উহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে আমাদের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, এবং ঐ আকৃষ্টতা ক্রমে গাঢ় এবং এবং গাঢ়তর করিয়া, অবশেষে সেই সৌন্দর্য্য ছবিকে কবি সহসা দুর্দ্দশাতলে নিক্ষেপ করিয়া দেন। তখন আকৃষ্ট অন্তঃকরণ উহার সহিত প্রসারিত হইয়া উহারি দুঃখে গিয়া ঝাপ দেয়; পরে কবি আবার উহাকে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর দুঃখে নিক্ষেপ করিতে থাকেন, এবং অন্তঃকরণ ক্রমে উহার সহিত প্রসারিত হইয়া চলিতে থাকে, অবশেষে কবি দুঃখের চরমতলে সৌন্দর্য্য ছবিকে নিঃক্ষেপ করেন; আমাদের অন্তঃকরণও উহার সহিত ক্রমে দূর দূর দৃষ্টে আকৃষ্ট হইয়া দুঃখ এবং দয়ার বিষয়ে চরম প্রসারিত হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে কবি অন্তঃকরণের অপর সকল বৃত্তিকেও প্রসারিত করিয়া থাকেন। বৃত্তি সকল আপন আপন প্রকৃতির অনুরূপ বিভিন্ন কাব্যের বিভিন্ন সৌন্দর্য্য ছবির অনুসরণে পুনঃপুনঃ প্রসারিত হইয়া অবশেষে সেই প্রসারিত কলেবরে বল অর্জ্জন করিতে থাকে এবং ক্রমে সারবান্ হইয়া দাঁড়ায়; এবং একবার সারবান্ হইয়া দাঁড়াইলে, তখন সামান্য বিষয় সকল উহার কাছে তুচ্ছ হইয়া পড়ে, উহা স্বয়ংই মহৎ কার্য্য সকল দেখাইবার নিমিত্ত উন্নত হইয়া উঠে। এই রূপে কার্য্য কেবল একমাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টিদ্বারা মানব অন্তরকে প্রসারিত, সারবান্, ও উন্নত করিয়া উহার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেয়। আমরা একটি উদাহরণদ্বারা ইহা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতেছি—

বাল্মীকি সীতাকে দুঃখের অবস্থায় ফেলিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কিরূপ মনোহর মূর্ত্তিতে সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন; আমরা সীতার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে আর আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। সীতার উৎপত্তির মূলেতেই সেই সৌন্দর্য্য; তিনি সামান্য মানব মানবীর ঔরসজাত নন, তিনি ইন্দ্রজাল-সমুদ্ভূতা। এই স্থানেই আমাদের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যায়। এই ইন্দ্রজাল-সমুদ্ভূতা সীতা আবার হেয় অবস্থায় পালিত হইলেন না, তিনি রাজর্ষি জনক রাজার প্রিয় পালক দুহিতা হইলেন; তাঁহার পরিণয় ব্যাপারে আবার ধনুকভাঙ্গা পণ হইল; আমরা এই ব্যাপারে, দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব প্রভৃতির মহা সভা ও সমারোহ দেখিলাম; এই সকল কৌতুহলজনক ঘটনার কারণ-স্বরূপিণী সীতার প্রতি আমাদের আস্থা ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল; তিনি পরিশেষে সামান্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হইলেন না; উত্তর কোশলাধিপ মহারাজা দশরথের তনয় তাড়কাহন্তা সুকুমার, প্রিয়দর্শন, নবজলধর-শোভন-মূর্ত্তি, রামচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হইলেন; এরূপ যুগল মিলনে আমাদের অন্তঃকরণের আকাঙ্ক্ষার সাধ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু সীতার প্রতি আমা-

দের অন্তঃকরণ বিশেষ আকৃষ্ট ও অনুলিপ্ত হইবার সময় এখনো আসে নাই; উহা রামের বনগমন সময়। এই সময়েই সীতার অন্তর্বীরত্বের পরিচয়; একদিকে চতুর্দ্দশবর্ষ ভীষণ অরণ্যে পরিভ্রমণের অপার দুঃখ; অপরদিকে উক্ত পরিমাণ কাল স্বামী সুখের বঞ্চনা; সীতা বাহ্যিক দুঃখকে পরাজয় করিয়া স্বামি-সুখকে রক্ষা করিতে পারেন কি না, এই সঙ্কট পরীক্ষা স্থলে কবি তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সীতা দেখাইলেন তিনি বাহ্যিক দুর্দ্দৈবে ভীত নন; তিনি ভ্রূভঙ্গে উহাকে জয় করিয়া স্বামী সহ অপার দুঃখ-সাগরে প্রফুল্লচিত্তে ঝাঁপ দিলেন। স্বামীসহ বনগমনে বিনির্গত দেখিয়া আমাদের মন জয়োল্লাসে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। কবির এইরূপে সীতাকে সৌন্দর্য্যময়ী করিয়া তাঁহার অদ্ভুত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য গুণে আমাদিগকে আকৃষ্ট করা হইল; এখন তাঁহাকে দুঃখে নিক্ষেপ করা অবশিষ্ট রহিল। রাবণ কর্তৃক সীতা হৃত হইলেন, এবং অশোক বনে বিষম যন্ত্রণা মধ্যে রক্ষিত হইলেন। এখন এই সীতার হাহাকার শব্দে কোন্ মূঢ় ব্যক্তির হৃদয় না উচ্ছসিত হইয়া উঠিবে? যে মূঢ় ব্যক্তি সংসারের সামান্য বিরহিণীগণের আর্ত্তনাদে কখন কর্ণপাতও করে নাই, সেও সীতার দুঃখে না দুঃখিত হইয়া থাকিতে পারিবে না; কারণ সীতা সামান্য নন, কবির কৌশল-জাত অদ্ভুত সৃষ্টি; অদ্ভুতত্বের প্রতি কাহার ও মন আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তি সকলের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জন্মিতে জন্মিতে আমরা ক্রমে সামান্য প্রকৃতি সকলের প্রতিও সমদুঃখে দুঃখী হইতে শিখি। এইরূপে সমবেদনার যে পরিমাণ পরিবর্দ্ধন, সেই পরিমাণে স্বার্থ মানব-হৃদয় ছাড়িয়া পলায়ন করে; যেহেতু অপরের দুঃখে দুঃখী হইবার সময়, আমরা আত্মত্ব ভুলিয়া যাই, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত হইতে পারি। স্বার্থ যে পরিমাণ সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করে, এবং সমবেদনার যে পরিমাণ পরিবর্দ্ধন হইতে থাকে, সংসারও সেই পরিমাণে স্বর্গ-স্বরূপ হইয়া উঠে। কোম্‌তের মনসিজ (Ideal) এই, স্বার্থ এককালে ভুলিয়া যে দিন মানুষ মানুষের নিমিত্ত হইবে, সেই দিনই মানব সমাজের চরম উন্নতি। এইরূপ মনোসিজ অবস্থায় লইয়া যাইবার কাব্যই কেবল একমাত্র উপায়; অতএব কাব্যের তুল্য উৎকৃষ্ট শিক্ষার উপায় সংসারে আর কিছুই নাই। ভারতবাসীগণের অন্তঃকরণ যে এত নৈতিক শোভায় রমণীয়, ভারতের কাব্যবহুলতাই তাহার প্রধান কারণ। সীতা, দয়মন্তীর অনুকরণে আমরা আজিও এই ভারতে সহস্র সহস্র সীতা, দময়ন্তী দেখিতেছি।

সীতাকে দুঃখের পর দুঃখের অবস্থায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, আমাদিগের অন্তঃকরণও সীতায় আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার দুঃখে নীত হইতে হইতে প্রসারিত হইয়া চলিল, সীতার প্রত্যেক

দুঃখের স্রোতে স্থায়ী হইয়া দৃঢ়তা বা সারত্ব অর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং সীতার সদৃশ কার্য্য করিবার নিমিত্ত ভবিষ্যতের জন্য উন্নত হইয়া রহিল। কাব্য এইরূপে অন্তঃকরণকে প্রসারিত, সারবান্ ও উন্নত করিয়া দেয়।

কাব্যের দ্বিতীয় ফল উহাতে আমাদিগকে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু করিয়া তুলে। সৌন্দর্য্য হইতেই কৌতূহলের উৎপত্তি; কোন সুন্দর বস্তুতে মন প্রথমতঃ আকৃষ্ট হইলেই তৎপরে উহা সেই সুন্দর বস্তুর ঘটনার কারণ জানিতে ইচ্ছুক হয়। জলস্রোতে একটী ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার কারণ জানা অপেক্ষা লোকে ইন্দ্রধনুর কারণ জানিতে আশু কৌতূহলী হইয়া উঠে; এই নিমিত্ত সামান্য সামান্য ঘটনাবলির অভ্যন্তরস্থ মহদুপকারী সত্য সকলের আবিষ্কার হইতে এত সুদীর্ঘ কাল লাগিয়া থাকে। রজ্জুবদ্ধ দোদুল্যমান ঝাড় যে বায়ু প্রভৃতির প্রতি-বন্ধকতা না পাইলে অনন্তকালই একরূপ ভাবে দুলিতে থাকে, এই সত্য আবিষ্কারের নিমিত্ত গালিলিওর মত মহান্ আবিষ্ট-চেতার জন্ম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; বৃক্ষের ফল-পতন ঘটনা হইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারের জন্য নিউটনের জন্ম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সত্য বটে অতি সামান্য ঘটনাও নূতন ঘটিবার সময় আমাদের কারণ অনুসন্ধানের কৌতূহল কিয়ৎ পরিমাণে উত্তেজিত করিয়া থাকে, কিন্তু সে কৌতূহল এত অধিক পরিমাণে উত্তেজিত হয় না যে মানুষ সহসা আলস্যের ভার কাটাইয়া তাহার কারণ জানিতে পরিশ্রমের কষ্ট স্বীকারে ইচ্ছুক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যেরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংসারের ঘটনাবলি, বুদ্ধির অপরিপক্কতা অবস্থায় আমাদিগের চক্ষে পুনঃ পুনঃ ঘটায়, বুদ্ধির পরিপক্কতার অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে হইতে উহাদিগের কৌতূহল-উদ্দীপন-ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস ও জড়বৎ হইয়া পড়ে। কবি এই সকল ঘটনার উপর কল্পনার সৌন্দর্য্য মিশাইয়া উহাকে অদ্ভুত ও নূতন করিয়া আমাদিগের চক্ষুর আগে উহাকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করেন; আমাদিগের জড়বৎ অসাড় অন্তঃকরণেও উহা হইতে পুনর্ব্বার কৌতূহল শিখা জ্বলিয়া উঠে, এবং আমাদিগের বুদ্ধি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া, ক্রমে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে ধাবিত হইতে থাকে। বায়ুর হিল্লোলে বৃক্ষ পত্র কাঁপিতেছে, স্রোতে কুসুম ভাসিয়া যাইতেছে, আকাশে চাতক উড়িতেছে, ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলির প্রতি আমাদের মন কবি গাঢ় আকৃষ্ট করিয়া তুলেন, এবং ইহা হইতেই আমরা ক্রমে সামান্য বিষয়েরও ভাবুক হইয়া উঠি। আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি সকল এইরূপে সূক্ষ্ম ও দূরগামিনী হইয়া উঠে। অন্তঃকরণ যে যে পরিমাণে ভাবুক হয় সেই সেই পরিমাণে উহার কল্পনা শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং যে পরিমাণে কল্পনার পরিবর্দ্ধন;

সেই পরিমাণে মানুষের সৃষ্টি-ক্ষমতা জন্মে, এবং সৃষ্টি হইতেই সাংসারিক সুখ সৌকর্য্যের বিবিধ উপায় সাধিত হইয়া থাকে।

কাব্যের তৃতীয় ফল আনন্দ প্রদান। মানুষের মন স্বভাবতঃ ক্রীড়াসক্ত; ইহ সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে মানুষের মন কেবল প্রয়োজনের শৃঙ্খলেই আবদ্ধ; কিন্তু ফাক পাইলেই উহা অতীত কোন রাজ্যে উড্ডয়নের নিমিত্ত ব্যাকুল। কিন্তু সেই অতীত রাজ্য কি? আমরা পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে বলিয়াছি, উহা সেই সৌন্দর্য্য রাজ্য, সৌন্দর্য্য স্থলেই মন মুক্ত ও স্বাধীন, এবং সৌন্দর্য্য স্থলেই মনের আনন্দের খেলা। আমরা দেখিয়াছি কঠোরপরিশ্রমী ব্যক্তিরাও পরিশ্রম কালীন সঙ্গীত গাইয়া থাকে; তাহাদের শরীর সংসারের প্রয়োজনে আবদ্ধ থাকিলেও মন সৌন্দর্য্য ক্ষেত্রে পলাইয়া আনন্দের খেলায় ভাসিতে থাকে। কাব্য সেই সৌন্দর্য্যের চরম সৃজন করিয়া আনন্দের চরম প্রদান করিয়া থাকে।

আমরা দেখাইলাম এই এক মাত্র কাব্য দ্বারা মানুষের হৃদ্-বৃত্তি সকলের চরমোৎকর্ষ, বুদ্ধি-বৃত্তি সকলের চরমোৎকর্ষ, এবং আনন্দের খেলার উৎকৃষ্টতর-রাজ্য-সৃজন সম্পাদিত হইয়া থাকে। সভ্যতা অনুসারে মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি সকল যে পরিমাণে পরিমার্জ্জিত হইয়া আসে, সেই পরিমাণে মানুষ রসাস্বাদক হয়, এবং উৎকাব্য সকল সৃজনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। মেকলে সাহেব ও অপর কতক গুলি ব্যক্তি ইহার বিপরীত-মতাবলম্বী; তাঁহারা কহেন, সভ্যতার বৃদ্ধি অনুসারে মানুষের কাব্য রচনার ও কাব্য রসাস্বাদনের ক্ষমতা ক্রমে কমিয়া আসিবে। আমরা ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি না. যে হেতু বুদ্ধি বৃত্তি যে পরিমাণে পরিমার্জ্জিত, অনুভূতির সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন বস্তুর বিষয় বুদ্ধি আমাদিগকে যে পরিমাণে বুঝাইয়া দেয়, অনুভূতিও সেই পরিমাণে তাহার রসাস্বাদন করিতে থাকে। পথে পতিত এক খণ্ড প্রস্তরকে এক জন অজ্ঞ ব্যক্তি পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু এক জন পণ্ডিত সেই প্রস্তর খণ্ডকে কুড়াইয়া লইয়া তাহার বিবিধ-বিষয়ক কৌশল আলোচনা করিতে করিতে প্রভূত আনন্দে মগ্ন হইতে থাকিবেন। আমরা দেখিতেছি, সভ্যতার বৃদ্ধি অনুসারে মানুষের অনুভূতি শক্তিও বেশী হইতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে রসাস্বাদন শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া সুন্দর বিষয়ের গভীরতলে আমাদিগকে লইয়া গিয়া মুগ্ধ করিতেছে। সেক্সপিয়রের নাটকাবলি এক দিন লোকের মনে যেরূপ আনন্দ দিয়াছিল, এক্ষণকার আনন্দের সঙ্গে তাহার অনেক তারতম্য; বুদ্ধি-বৃত্তির বৃদ্ধি হেতুক অনুভূতি শক্তির বৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ। আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান রঙ্গভূমির দর্শকবর্গ সাধারণতঃ আজ কাল

যেরূপ নাটকাভিনয়ের বাহিক ব্যাপারেই মাত্র আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যে নাটকে কাটাকাটি, আস্ফালন, প্রজ্জ্বলিত চিতায় পতন, ইত্যাদির ভাগ বেশী, তাঁহারা সেই নাটকেই অধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন; নাটকীয় পাত্রগণের আভ্যন্তরীণ কার্য্য কলাপের সূক্ষ্ম দর্শন সকলের যে আনন্দ, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির অভাবে তাঁহারা তাহা অনুভবের অধিকারী হইতে পারিতেছেন না। ইংলণ্ডেও এক দিন এই দশা ছিল; লোকে হ্যামলেৎ নাটকের অভিনয় অপেক্ষা, তদপেক্ষা অধিক বাহ্যাড়ম্বর-বিশিষ্ট নাটকে অধিকতর আনন্দ বোধ করিত, এবং ঐরূপ নাটকের তৎকালে আদরও অধিক ছিল।

কাব্যের রসাস্বাদনের কথা এই—কাব্যের রচনার কথাতেও আমরা বলিতে পারি যে, বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধিতে যেরূপ অনুভূতির বৃদ্ধি, অনুভূতির বৃদ্ধিতেও তদ্রূপ কল্পনার বৃদ্ধি; এবং কল্পনার বৃদ্ধি হইলেই কাব্যের উৎকর্ষ সৃষ্টি হইয়া থাকে; ইহার পরিচয় বর্ত্তমান শতাব্দির গেটে; এই গেটে; হইতেই বর্ত্তমান ইউরোপের সাহিত্য রাজ্য পুনর্ব্বার নব জীবন পাইয়াছে। মেকলে সাহেব যে বলেন বালকের ন্যায় অজ্ঞ-প্রকৃতি না হইলে, কবি হওয়া যায় না বা কাব্যের রসাস্বাদন করা যায় না, ইহার আমরা তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না; বরং আমরা দেখিতেছি, পণ্ডিত অপেক্ষাও পণ্ডিত না হইলে কবি হওয়া দুষ্কর এবং কাব্যের রসাস্বাদন করাও দুষ্কর। মেকলে সাহেবের মত খণ্ডনের নিমিত্ত তাঁহার তর্ক সকল এখানে আনিয়া তাহার বিচার করা আমাদের এ স্থলের উপযোগী নয়, সুতরাং আমরা তাহার অধিক আলোচনায় বিরত থাকিলাম। আমরা এ সম্বন্ধে বকল্‌স সাহেব যে কথা কহিয়াছেন তাহারি অনুমোদন করি. বকল্‌স সাহেব কহেন "মানব-অন্তর-পরিজ্ঞান ও তাহার সূক্ষ্মতা দর্শনে কবিরাই শ্রেষ্ঠ।" মেকলে সাহেব যদি কতক গুলি উৎকৃষ্ট কবিকে মানব সমাজের অর্দ্ধ সভ্য অবস্থায় জন্মিতে দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তবে তাহা ভ্রম; যেহেতু কবিরা যে কোন কালেই কেন জন্ম গ্রহণ করুন না, তাঁহারা এককালে সভ্যতা-সুলভ বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনার উৎকর্ষ লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন; ঐরূপ কিন্তু লোক-সংসারে অতি বিরল। সভ্যতার বৃদ্ধিঅনুসারে কাব্যের রসাস্বাদন ও কাব্য-সৃজনের ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে, এ কথা স্থির। এবং আমরা বলিতে পারি, এককালে সভ্যতার চরম অবস্থায় মানুষের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আমোদের শেষ হইতে পারে; যেহেতু সৃষ্টবস্তু অনন্ত হইলেও মানুষের ক্ষমতার সীমা আছে, এবং সেই সীমাপর্য্যন্ত বস্তুর দর্শন ও তত্ত্ব জানার শেষ হইলে আর তাহাতে আমোদ থাকিবে না; তখন কল্পনার সৌন্দর্য্য দেখাই মানুষের শেষ আশ্রয় হইবে। এক্ষণে যে কাব্য দ্বারায়

হৃদয়বৃত্তি সকলের প্রসারণ, বুদ্ধি-বৃত্তির সূক্ষ্মতা সম্পাদন সংসাধিত হয় এবং যাহা-দ্বারা মন আনন্দের খেলার উৎকৃষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা মানবের উপাদেয় বস্তু আর কি আছে; মানুষের মনুষ্যত্বের নিমিত্ত আর কোন্ বস্তুর অভাব আছে যাহা কাব্য প্রদান করিতে পারেনা?

যাহা হউক কাব্যে এই সকল বিষয় সংসাধিত হইলেও আমরা এইসকল গুণের নিমিত্তই কাব্যকে ভাল বাসিতে বলি না, কাব্যকে কাব্যের নিমিত্ত ভাল বাসাই উচিত। আমরা এসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক কারলাইলের অভিপ্রায় টুকু উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম।—

"On all hands, there is no truce given to the hypothesis, that the ultimate object of the poet is to please. Sensation even of the finest and most rapturous sort, is not the end, but the means. Art, is to be loved, not because of its effects, but because of itself; not because it is useful for spiritual pleasure, or even for moral culture, but because it is art, and the highest in man, and the soul of all Beauty. To inquire after its utility, would be like enquiring after the utility of a God, or what to the Germans would sound stranger than it does to us, the utility of virtue and religion".

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# শরীর ও মন।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদিগের সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক পণ্ডিত-গণ পদার্থোৎপত্তির পর্য্যালোচনা করিয়া কিরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন? আমরা যাহাকে চেতনা বলিয়াছি সাঙ্খ্যদর্শনে তাহা মহত্তত্ত্ব নামে অভিহত হইয়াছে। মহর্ষি কপিল কহেন এই মহত্তত্ত্ব মূল প্রকৃতিরই বিকৃতি অর্থাৎ মূল প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার মতে প্রকৃতিই চেতনার কারণ। সাঙ্খ্যদর্শনের পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত ভগবান্ পতঞ্জলিও গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শাঙ্কর দর্শনের সার সংগ্রহ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "উল্লিখিত এক একটী পঞ্চভূতের এক একটী সত্বাংশ হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক জন্মে। অর্থাৎ আকা-

শের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা, এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মে। আর ঐ পঞ্চভূতের পঞ্চ সত্ত্বাংশ মিলিত হইলে তাহা হইতে অন্তঃকরণের উদ্ভব হয়।"*

শাঙ্কর দর্শনের মায়াবাদ ইউরোপের কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিতের দর্শনপ্রণালীতে বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্তমতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় জগৎই মিথ্যা। এই অদ্বৈতমতে নিখিল জড় জগৎ যে কেবল আমাদিগের মিথ্যাদৃষ্টি-সমুদ্ভূত তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও কহেন জড়জগতের সম্যক্‌জ্ঞান আমাদিগের কিছুই সম্ভব নহে। আমাদিগের জড়ের জ্ঞান মানসিক ভাব মাত্র। মানসিক-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কতকগুলি সংস্কার ব্যতীত আমাদিগের জড়জগতের জ্ঞান আর কিছুই নাই। আকার, বিস্তৃতি, বর্ণ প্রভৃতি জড়ের কতিপয় গুণজ্ঞানকেই আমরা জড় পদার্থ বলিয়া জানি, এবং এই পর্য্যন্তই আমাদিগের জ্ঞানের সীমা, ইহার অতিরিক্ত জড়পদার্থের কোন জ্ঞান সম্ভব নহে। অতএব নিখিল জড়জগৎ মানসিক ভাব মাত্র। যে পদার্থে জড় গুণনিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে, সে পদার্থের সত্ত্বার কোন প্রমাণ নাই। কারণ, যে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা জড়ের গুণগ্রামের প্রতীতি জন্মে, সে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে কিছু জড় পদার্থের সত্ত্বার প্রতীতি জন্মিতে পারে না। বাস্তবিক যে জড়পদার্থ নাই একথার অর্থ তাহা নহে। একথার অর্থ এই যে, জড়পদার্থের সত্তার বিশ্বাস কেবল অনুমান-সিদ্ধ, প্রমাণ-সিদ্ধ নহে। জড়পদার্থ নামক কোন পদার্থ থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার অবস্থিতির কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। আমাদিগের এরূপ কতক গুলি ইন্দ্রিয় আছে যদ্দ্বারা জড়পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি হয়; কিন্তু আমাদিগের এমত কোন ইন্দ্রিয় নাই যদ্দ্বারা তাহার সত্তার জ্ঞান উপলব্ধি হইতে পারে। চক্ষুর দ্বারা আমরা জড়পদার্থের বর্ণাদি গুণের উপলব্ধি করি, স্পর্শ শক্তি দ্বারা তাহার ঘনত্ব প্রভৃতি গুণের জ্ঞানার্জ্জন করি, কিন্তু কোনও শক্তিতে তাহার সত্তার জ্ঞান অবগত হইতে পারি না। তাহার সত্তার জ্ঞান কেবল মনঃ-সম্ভূত। মন, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সমস্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে, সেই জ্ঞানের আধারের প্রতি বিশ্বাস, মনের স্বতঃসিদ্ধ ভাব। অতএব জড়পদার্থের জ্ঞান আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা তাহার কোন আংশিক জ্ঞান নহে, মনের ভাব মাত্র। ইহাকে মনের সৃষ্টি বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না।

এই তর্ক অবলম্বন করিলে আত্ম-শরীর এবং সকলই মানসিক ভাব মাত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। কিন্তু এই

* শ্রীজয় নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ দেখ।

তর্ক আত্মঘাতী। যে মন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মভাবে পর্য্যবসিত করিতেছে, যে মন কহিতেছে, আমি ব্যতীত আর কোন বস্তুর সত্তার প্রমাণ নাই, সেই মন, সেই তর্ক দ্বারাই আত্ম সত্তাও অপ্রমাণিত করিতেছে। কারণ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যদি মানসিক ভাব মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তবে নিজ মনকেও কতিপয়-ভাব-সমষ্টি ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? "আমি ভাবিতে পারি, এই জন্য আছি" —ডেকার্টের* এই সুপ্রসিদ্ধ মূল সূত্র একটী সম্পূর্ণ ন্যায় বাক্য নহে। ইহাও অনুমান-মূলক। সুতরাং এই তর্কের অনুবর্ত্তী হইতে হইলে কি জড়পদার্থ, কি মন, কি বেদান্তবাদীর একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং ব্রহ্ম, সকলই অসত্য হয়। তাহা হইলে জগতে কিছুই নাই, সমুদয় ভ্রান্তি, সমুদায় মিথ্যা দৃষ্টি মাত্র। সমুদায় ভ্রান্তি, সমুদায় মিথ্যা দৃষ্টিই বা কিরূপ তাহাও অভাবনীয়।

যে তর্কে, তর্কের মূলই কিছুই নাই, সে তর্ক নিতান্ত পরিহার্য্য। এই জন্য আমরা শরীর ও মনের বিদ্যমানতা, এই প্রস্তাবের আদিতেই অবিতর্কিত ভাবে গ্রহণ করিয়াছি।

ঈশ্বরবাদী বলেন, মনের গুণ ও ধর্ম্মাদি ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন, এ জন্য তাহা দেহ সম্ভূত হইতে পারে না; তাহা স্বতন্ত্র সমুৎপন্ন; ঈশ্বর আত্মাকে আপন চেতন-স্বরূপ প্রকৃতি প্রদান করিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরবাদী মনের সহিত ঈশ্বর-সত্তার এই মাত্র প্রভেদ করেন যে ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত, মন সসীম ও সান্ত পদার্থ। এই প্রভেদ হেতু আত্মা ও ঈশ্বর পদার্থে অনেক প্রভেদ ঘটিয়াছে।

কিন্তু ঈশ্বরবাদীর ঐশ্বরিক ভাব কি? তিনি ঈশ্বরকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন। তিনি ঈশ্বরকে চেতন-স্বরূপও বলেন। অতএব তাঁহার মতে ঈশ্বর চেতনস্বরূপ ও সৃষ্টিকর্ত্তা।

প্রথমতঃ। চেতনস্বরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা সকল পদার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মনকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। মনও চেতনার প্রকৃতি ধারণ করে। ঈশ্বর চেতন পদার্থ, মনও চেতন পদার্থ। পদার্থের প্রকৃতি যখন এক, তখন তাহা এক স্থানে অসীম এবং অন্য স্থানে সসীম হওয়াতে সেই চেতনাদ্বয়ের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না। পদার্থ বিবেচনা করিতে গেলে তাহারা দুইই এক, কেবল সীমায় বিভিন্ন। এক্ষণে বিবেচ্য এই, যিনি নিজে চেতন, তিনি আবার চেতন পদার্থকে কিরূপে সৃষ্টি করিবেন। ইহা আমরা বুঝিতে পারি না, ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ। ঈশ্বরবাদী বলেন, ঈশ্বর চেতন-স্বরূপ এবং আত্মসম্ভূত। ঈশ্বরের আর অন্য সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। একথা স্বীকার করিতে গেলে, অবশ্য বলিতে হইবে, যে ঈশ্বর আত্ম-সৃষ্টিকারী। তবে

* Descartes.

চেতন-স্বরূপের আত্মসৃষ্টির শক্তি আছে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মনও চেতন পদার্থ; মনও তবে আত্মসম্ভূত ও নিজে নিজের সৃষ্টিকর্ত্তা না হইয়া অন্য চেতন পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট হইবে কেন তাহা বুঝা যায় না। চেতন পদার্থের ধর্ম্ম যাহা তাহা সকল চেতন পদার্থে বিদ্যমান থাকিবে। ঈশ্বর কিরূপে আত্মসম্ভূত, তাহা অনুভব করা যে প্রকার দুষ্কর, মনও কেন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইবে তাহাও অনুভব করা সেই প্রকার কঠিন। বাস্তবিক সূক্ষ্মদর্শী ঈশ্বরবাদী এই দুই সমস্যার কিরূপে খণ্ডন করিয়াছেন আমাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে তাহা প্রতীত হয় না।

তৃতীয়তঃ। ঈশ্বরবাদী বলেন, ঈশ্বর চেতনস্বরূপ এবং জগতের সৃষ্টির কারণ। তাঁহার মতে কেবল একমাত্র ঈশ্বরেরই পদার্থ জ্ঞান আছে। কারন পদার্থ জ্ঞান না থাকিলে তিনি কিছুরই সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। মনুষ্যে পদার্থের গুণ ও ধর্ম্মাদি অবগত হইতে পারে, কিন্তু কোন্‌টী কি পদার্থ তাহা জানে না। মনুষ্যের যদি পদার্থ জ্ঞান থাকিত,-তিনিও সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহার পদার্থ-জ্ঞান না থাকাতে তিনি সৃষ্টি গুণ-বিরহিত হইয়াছেন। মনুষ্য যদি জানিতেন জড় পদার্থ কি, তাহা হইলে তিনিও জড় পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারিতেন। মনুষ্য যদি জানিতেন যে, তাপ অথবা আলোক কি পদার্থ তাহা হইলে তিনি হয় তো একটি সূর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিতেন। এই পদার্থ-জ্ঞান না থাকাতে মনুষ্য সৃষ্টি করিতে পারেন না। এক্ষণে বিচার্য্য এই, যে যদি ঐশ্বরিক প্রকৃতি, ও মনের প্রকৃতি একবিধ হইল, তবে ইহাদিগের মধ্যে এপ্রকার মৌলিক বিভিন্নতা কেন সম্ভাবিত হয়। অনন্ত চেতন স্বরূপের পদার্থজ্ঞান সম্পূর্ণ, সান্ত চেতনার পদার্থজ্ঞান না হয় অসম্পূর্ণ হউক। কিন্তু সান্ত চেতন-স্বরূপ মন কেন একেবারে পদার্থ জ্ঞান বিরহিত হইবে এ বিষয় আমরা বুঝিতে পারি না। অনন্ত চেতন-স্বরূপের সহিত সান্ত চেতন পদার্থের যদি প্রকৃতিগত কিছু বৈলক্ষণ্য থাকে, তবেই এ প্রকার মৌলিক বিভিন্নতার তাৎপর্য্য থাকা সম্ভব। নহিলে অবশ্য বলিতে হইবে, সান্ত চেতন-স্বরূপ মন যে প্রকার পদার্থ, জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর সে প্রকার পদার্থ নহে। ঈশ্বর বাদী এ কথা বলিলে বরং তাঁহার কথার কিছু তাৎপর্য্য থাকে। নহিলে তিনি বলুন, জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা যে কি পদার্থ তাহা আমি কিছুই জানি না। জগৎসৃষ্টিকর্ত্তাকে মনঃপদার্থের সদৃশ বলিতে গেলে, অসংখ্য তর্কের উৎপত্তি হইবে।—

অতএব অখিল জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর যে মনকে স্বকীয়-প্রকৃতি-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য বরং নিজ মনের শক্তি অনুসারে, জগৎসৃষ্টি মধ্যে, কতিপয় গুণের উপলব্ধি করিয়া সেই গুণাবলি

ঈশ্বরে আরোপ করিয়াছেন, এবং স্বকীয় মানসিক শক্তি অনুযায়ী ঈশ্বরের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই প্রতীত হইতেছে। ঈশ্বরবাদীর ঈশ্বর মনকে সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার মনই তাঁহার ঈশ্বরকে সৃষ্ট করিয়াছে!

এই কথা যদি স্বীকৃত হয়, তবে আমরা মনের উৎপত্তির অন্য কারণের অবশ্য অনুসন্ধান করিব। অন্য কারণের অনুসন্ধান করিতে গিয়া, মানবীয় গবেষণা প্রণালীয় যাহা অনুমোদনীয় হইবে, মনের সেইরূপ ব্যুৎপত্তি কারণ গ্রাহ্য করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কারণ, বৃথায় নানা প্রকার অনুমান পথ অবলম্বন করা অপেক্ষা, যুক্তি পথে যাহা প্রতীত হইবে তাহাই গ্রহণ করা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

যাঁহারা বলেন শরীর হইতে মন উৎপন্ন হয় নাই, উহা স্বতন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি উহা কি শরীরের পরে, না পূর্ব্বে, না এক সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছে। কারণ, যদি বল শরীরের সঙ্গে সঙ্গে উহার উৎপত্তি, জরায়ু মধ্যে শরীরের যখন প্রথম সঞ্চার হইল, তৎক্ষণাৎ অমনি সেই শরীরে চেতনা সঞ্চারিত হইল, তাহা হইলে আমরা, বলিব এ তর্ক আমাদিগেরই পক্ষ সমর্থন করিতেছে। আর যদি ধর, শরীরের প্রথম উৎপত্তির পর চেতনার উৎপত্তি হইল, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিব শরীর হইতে চেতনার উৎপত্তি হইল। কেবল যদি শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে মনের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই অবশ্য বলিতে হইবে, শরীর চেতনার ব্যুৎপত্তি কারণ নহে। এক্ষণে বিচার্য্য এই শরীর ও চেতনার মধ্যে কাহার উৎপত্তি প্রথম হইল। অগ্রে শরীরের উৎপত্তি, না অগ্রে চেতনার উৎপত্তি? যদি স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমফল-স্বরূপ শুক্রপাতে দেহের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, শরীরের উৎপত্তি অগ্রে। তৎপূর্ব্বে যদি চেতনার উৎপত্তি হইয়া থাকে, প্রতিবাদিরা বলুন, কোন্ সময়ে চেতনা শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহাদিগকে আরও বলিতে হইবে, দেহ মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে, সেই চেতনা কত কাল সৃষ্ট হইয়াছিল ও কি প্রকার অবস্থায় বা অবস্থিত ছিল। সে অবস্থার বিষয় মনের কি কিছু স্মরণ থাকে? কিছুই নহে। আমাদিগের পক্ষে আমরা বলি, শরীর হইতে পৃথক্ চেতনার অবস্থা আমরা অনুমানও করিতে পারি না। যাঁহারা শরীর বিনাশের পর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান অনুমান ও ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে সেই আত্মার পূর্ব্বাবস্থা অনুমান করিতে সঙ্কুচিত হয়েন কেন বুঝিতে পারি না। অতএব আত্মার পরকাল অনুমান করিলে তাহার পূর্ব্বজন্মও স্বীকার করা আবশ্যক। যাহা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেও কেন থাকিতে পারিবে না, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আত্মার পূর্ব্বজন্মের

কি কিছু প্রমাণ আছে? আত্মার পরকালের যে প্রকার প্রমাণ আছে আত্মার পূর্ব্বজন্মেরও সেই প্রকার প্রমাণ। তবে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না কেন? কারণ পূর্ব্বজন্ম তাঁহাদিগের ধর্ম্মমতের বিরোধী হয়, কিন্তু পরকাল সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুমোদিত। অতএব যুক্তি ও প্রমাণে যাহাই কেন হউক না, প্রতিবাদিরা পূর্ব্বজন্ম পরিত্যাগ করিলেন, সুবিধার জন্য পরকাল গ্রহণ করিলেন।

প্রতিবাদিরা বলেন, শরীর হইতে চেতনার উৎপত্তি এই জন্য সম্ভব নহে, যেহেতু জড়পদার্থ হইতে কখন চেতন পদার্থ সম্ভূত হইতে দেখি নাই। চেতনার যাহা গুণ,জড়পদার্থে তাহার কিছুই নাই। সুতরাং জড়পদার্থ কিরূপে চেতনার কারণ হইতে পারে? জড়পদার্থের যে সমস্ত গুণ আমরা স্বীকার করি, চেতনায় সে প্রকার কোন গুণ দৃষ্ট হয় না। চেতনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার গুণাবলি পরিদৃষ্ট হয়। জড় পদার্থের বিস্তৃতি আছে, চেতনার বিস্তৃতি নাই; জড়পদার্থের আকার ও রূপ আছে,চেতনার তাহা কিছুই নাই। চেতনার গুণাবলি অন্যবিধ। চেতনার জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি গুণের পরিচয় জড়পদার্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এপ্রকার জড়পদার্থ যে বিভিন্ন-গুণধারী চেতনার উৎপত্তি কারণ হইবে, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব কথা। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, জড়পদার্থ কি অন্যবিধ পদার্থের উৎপত্তির কারণ হয় নাই? তাপ ও বলের উৎপত্তি কোথা হইতে হয়? যে বলদ্বারা বাষ্পীয় শকট সহস্র যোজন ব্যবধান প্রহরেক মাত্রে অতিক্রম করিতেছে, তাহা কি জড়পদার্থ সম্ভূত নহে? অথচ বলুন দেখি, বলের রূপ, আকার, বিস্তৃতি কি প্রকার? বল কি কখন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়াছে? তাপ সম্বন্ধেও কি এই কথা সত্য নহে? ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে জড়পদার্থের যে আরও কত গুণ আবিষ্কৃত হইতে পারে কে বলিতে পারে? অতএব জড়পদার্থ হইতেও যে অন্যবিধ-গুণ-বিশিষ্ট পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর তাহা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তবে শরীরে যে প্রকার জড়পদার্থের সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাতে চেতনার উৎপত্তি কেন অসম্ভব হইবে আমরা বুঝিতে পারি না। জড়পদার্থ শরীররূপে পরিণত হইলেই তাহার ফল স্বরূপ চেতনার উৎপত্তি হয়, অন্যথা তাহা সম্ভব নহে।

আমরা দেখিতে পাই, সকলের মন সমান নহে। যে ব্যক্তি যেমন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার তদনুযায়ী মনের প্রকৃতিও হয়। জনক জননীর যে প্রকার স্বভাব থাকে, সন্তান সন্ততিরও সেই প্রকার স্বভাব জন্মে। শিক্ষাদ্বারা যিনি যত কেন মনের উন্নতি সাধন করুন না, বংশসম্ভূত কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রত্যেকের স্বভাবে প্রতীয়মান হইবেই হইবে। শিক্ষা ও বিদ্যাপ্রভাবে এই লক্ষণ গুলির কিয়ৎ পরিমাণে বিপর্য্যয়

সাধন করা সম্ভব বটে, কিন্তু কেহ একেবারে তাহাদিগের মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই বিশেষ লক্ষণ গুলি সম্পন্ন হইয়াই যেন মনের জন্ম হয়। বংশের ধারানুযায়ী কেমন এক এক জনের স্বভাবে বিশেষ কতকগুলি গুণ অথবা দোষের সমাবেশ দেখা যায়, কিছুতেই তাহা অপনীত হইবার নহে। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেকের মন যে প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ধাতু সম্পন্ন শরীর হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাতে এই সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করিতেছে। বীজে যাহা নিহিত থাকে, ফলে তাহার পরিচয় হয়। পদার্থ তত্ত্বে আমরা এই সত্যের প্রমাণ দেখি, মনস্তত্ত্বেও আমরা সেই সত্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করি।

ক্রমশঃ।

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

**কবিতা-কলাপ**—দ্বিতীয় ভাগ। শান্তিপুর পুরাতন ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তি বিরচিত। শ্রীরামপুর—মাহেশ সত্যযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ মাত্র। সকলেরই কবি হইতে ইচ্ছা হয়। সেই বিশ্বজনীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া রামলাল বাবু অনেক পরিশ্রমে কতিপয় কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবিতা গুলিতে তাঁহার শ্রম সুস্পষ্ট রূপে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। তিনি শ্রম করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার শ্রম সফল হয় নাই।

**ললিত কাব্য**—শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। সত্য বাবু বঙ্গসুন্দরী-রচয়িতা কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুগত শিষ্য। তিনি গুরুর অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির প্রাণপণে অনুকরণ করিয়াছেন, এবং অনুকরণ করিয়া কিয়ং পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু অনুকরণে কখন সুকবি হওয়া যায় না; এই জন্য আমরা সত্য বাবুকে অনুরোধ করি তিনি যেন ভবিষ্যতে আর অনুকরণে প্রবৃত্ত না হন। অধীনতায় কোন শক্তিরই পূর্ণ বিকাশ হয় না; সুতরাং কবিত্ব-শক্তিরও যে হয় না তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

**দর্শক**—সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। কলিকাতা জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত। এখানির লেখা মন্দ নহে, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।